শুকতারা-র
১০১ ভূতের গল্প
৩

মুখে আমরা প্রায়ই বলি বটে ভূতটুত বিশ্বাস করি না, ওসব আমাদের কুসংস্কার, কিন্তু সেরকম পরিবেশে গিয়ে পড়লে অতি বড়ো অবিশ্বাসীরও গা ছমছম করে, মনে মনে রামনাম জপতে শুরু করেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, ভূত বিশ্বাস করি বা নাই করি ভূতের গল্প করতে আমরা সকলেই ভালোবাসি। এদেশে এবং বিদেশে যাঁরা ভূতের গল্প লিখে বিস্তর নাম করেছেন তাঁদের বই হাতে পেলে ছাড়া যায় না। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালান পো-র মতো বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকও ভূতের গল্প লিখেছেন। সেসব গল্প ছোটরা তো বটেই, বড়োরাও পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন।

শুকতারা অনেক দিনের পত্রিকা, বহু বিখ্যাত লেখক অনেক রকম ভূতের গল্প এখানে লিখেছেন। সেই সব গল্প থেকে সেরা ভূতদের নির্বাচন করে আমরা একশো এক ভূতের গল্প প্রকাশ করার পরিকল্পনা করি কয়েকবছর আগে। সে বই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাতে উৎসাহিত হয়ে আমরা আরো একশো এক ভূতের গল্প বার করি, সেই বইও দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। সেই জন্যেই এবার এই তৃতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা। তখন যাঁরা লিখতেন তাঁরাও যেমন সব নামী-দামি লেখক, এখনকার লেখকরাও কিছু কম যান না, তোমরা যারা ভূতের গল্পের পোকা তারা প্রত্যেকে জানো এঁরা কেমন লেখেন। এই খণ্ডে যাঁরা আছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, স্বপনবুড়ো, আশাপূর্ণা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মহাশ্বেতা দেবী, হিমানীশ গোস্বামী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অজেয় রায়, মানবেন্দ্র পাল, সমরেশ মজুমদার। এছাড়া আর যাঁদেরই লেখা আছে তাঁরা কেউই তোমাদের অপরিচিত নন, সকলের লেখাই 'শুকতারা'র পাতায় তোমরা পড়েছ।

একটা দুটো নয়, এরকম লেখকদের লেখা একশো এক ভূত তৈরি হয়ে আছে তাদের ভূতুড়ে কাণ্ড তোমাদের জানাবার জন্যে। কাজেই এসব পড়ে সময় নষ্ট না করে বইয়ের পাতা ওলটাও।

শুকতারা-র
১০১ ভূতের গল্প
৩
দেব সাহিত্য কুটীর
১৮৬০

শুকতারা-র
১০১ ভূতের গল্প
৩
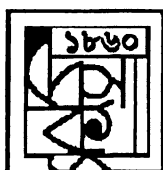
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

SUKTARAR 101 BHUTER GALPO ❸
(A Collection of 101 Ghost Stories)
Code : 87 S 33

Dev Sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel : 2350-4294/95/7887
E. Mail : dev_sahitya@rediffmail.com
Website : www.debsahityakutir.com
Email : dev_sahitya@rediffmail.com

ISBN : 978-93-5060-079-5

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৬, মাঘ ১৪২২
পূনর্মুদ্রণ ঃ ডিসেম্বর ২০১৬, অগ্রহায়ণ ১৪২৩
পূনর্মুদ্রণ ঃ মে ২০১৮, বৈশাখ ১৪২৫

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি এম'স
প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪
পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণ সংস্থাপন ঃ বেঙ্গল
পি টি এস, ৬, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম দাশগুপ্ত

দাম ঃ ২৭৫.০০ টাকা

ভূমিকা

সত্তরের কাছাকাছি বয়স হতে চলল যে শিশু-কিশোর পত্রিকার, যার সমবয়সী পত্রিকা ছিল শুধু 'শিশুসাথী' আর 'মৌচাক', কিন্তু সে দুটি পত্রিকাও এখন লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায়, অথচ শুকতারা সেদিনও ছিল, দীর্ঘদিন রাজত্ব করার পর আজও দাপটে শিশুদের নয়নের মণি হয়ে আছে। এমন কোনো জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না যাঁরা এই পত্রিকায় লেখেননি। শুধু লিখেছেন বললে ভুল হয়, দীর্ঘদিনের এই পত্রিকায় তাঁরা বিচিত্র ধরনের বহু গল্প লিখেই ছোটদের মন জয় করেছেন।

গল্প তো অনেক ধরনেরই থাকে, তার মধ্যে ছোটরা বেশি ভক্ত বোধহয় ভূতের গল্পের। যেসব জনপ্রিয় লেখক এখানে নিয়মিত গল্প লিখেছেন, তাঁরা নিয়মিত ভাবেই ভূতের গল্পও লিখেছেন প্রচুর। আমরা এখনও শুকতারা পত্রিকায় বিশেষ ভৌতিক সংখ্যা বার করি দুটি, এ ছাড়া পুজো সংখ্যাতেও ভূতের গল্প থাকে বেশ কিছু। কাজেই লেখকরা এ জাতীয় গল্প লিখবার সুযোগ পান প্রচুর। এই কারণেই শুকতারা পত্রিকার পাতায় হাজার হাজার ভূত অপেক্ষা করছে যারা তাদের ভুলে গেছে তাদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ করার জন্যে। এত ভূত ছড়িয়ে আছে আমাদের পত্রিকার পাতায়, তাদের একসঙ্গে একটি বইয়ের মধ্যে ধরতে পারলে ছোট-বড়ো সকলের কাছেই তা উপাদেয় হত, এই চিন্তা থেকেই বেশ কয়েক বছর আগে আমরা শুকতারার ১০১ ভূতের গল্পের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করি। প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা খুদে পাঠকমহলে এমন সাড়া ফেলে দেয় যে সেটা আমাদের বিপুল পরিমাণে উৎসাহিত করে। এরপর আরো একটি সংকলন করি ওই একশো একটি গল্প দিয়েই এবং যথারীতি তা নিঃশেষিত হয়ে যায় অতি তাড়াতাড়ি। সুতরাং এবার আরো একটি সংকলন প্রকাশ করতে সাহসী হলাম। জানি এর পরেও ভূতের ভাঁড়ার আমাদের ফুরোবে না। সেকালের লেখকদের মধ্যে ছিলেন হেমেন্দ্র কুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা, মুরারিমোহন বিট, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, বিশু মুখোপাধ্যায়। এঁদের লেখার ভাঁড়ার আজও ফুরোয়নি আমাদের। এই সঙ্গে আছেন সদ্যপ্রয়াত বা একালের লেখক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অদ্রীশ বর্ধন এবং আরো অনেকে।

এরকম ধরনের সংকলনে সেরা গল্পটি নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। আগের দুটি সংকলনে সতর্কতার সঙ্গে এ কাজে সাহায্য করেছেন শ্রী রূপক চট্টরাজ। এই সংকলনও তাঁর সহায়তা ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হত না। তাঁকে এর জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। আগের দুটি সংকলনের মতো এটিও ছোট-বড়ো সকলের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

কলকাতা বইমেলা, **প্রকাশক**

২০১৬

নিবেদন

শুকতারা পত্রিকার ১০১ ভূতের গল্পের দু-দুটি সংকলন উপহার দিয়েও ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকাদের পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারিনি বুঝতে পারছি। অবশ্য এর কারণ, ভূতের গল্পের এই সংকলনগুলি শুধু যে ছোটরা পড়ে তা তো নয়, ছোটদের বকাবকি করে তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এ বই যে বড়োরাও কাড়াকাড়ি করে পড়েন। কাজেই আরো চাই, আরো চাই রব তো উঠবেই। সেজন্য অবশ্য চিন্তা নেই। সাতষট্টি বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে ছোটদের মনের মতো পত্রিকা 'শুকতারা'। হাজার হাজার ভূত পত্রিকার পাতায় হুটোপটি করছে, দুশো বইয়ের পাতায় বাঁধা পড়লেও আরো অনেক থাকে। সেই হুটোপাটি করা ভূতদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে আরো একশো এক ভূতকে এবার উপহার দিলাম তৃতীয় খণ্ডে। অবশ্য বিশিষ্ট কবি শ্রীরূপক চট্টরাজ এই নির্বাচনে সাহায্য না করলে কাজটা আমার পক্ষে এত সহজ হত না। আশা করি আগে যেমন হয়েছে এবারও তাই হবে—বইয়ের পাতা থেকে মুখ তোলার অবকাশ পাবে না ছোটরা, অবশ্য সেই ভৌতিক ভোজে বাদ পড়বেন না ছোটদের বাবা-কাকারাও।

কলকাতা বইমেলা,
২০১৬

প্রকাশক

সূচীপত্র

ভৌতিক চক্রান্ত

শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায়

এক

শিল্পী প্রমোদ রায়ের নাম অনেকেরই কাছে সুপরিচিত। আমি উদীয়মান চিত্রকর ও ভাস্কর, প্রমোদ রায়ের কথা বলছি। ছবি আঁকায় এবং মূর্ত্তি গড়ায় তার সমান খ্যাতি।

সে বাস করত নিমচাঁদ মল্লিক ষ্ট্রীটের একখানা ভাড়াবাড়ীতে। স্ত্রী ছাড়া তার পরিবারে আর কোন লোক নেই, কাজেই বাড়ীখানা ছোট হলে'ও সে কোন অসুবিধা বোধ করত না। নীচের তলায় ছিল তার কারুকক্ষ বা 'ষ্টুডিয়ো'।

তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল দিব্য নির্ভাবনায়, কিন্তু হঠাৎ হলো এক মুস্কিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এক নোটিশ এসে হাজির, এ বাড়ী ছেড়ে তাকে উঠে যেতে হবে।

কলকাতায় তখন ভাড়াবাড়ীর একান্ত অভাব, পাড়ায় পাড়ায় উদ্বাস্তুদের ভিড়। মোটা টাকা সেলামী এবং ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ ভাড়া দিতে চাইলেও খালি বাড়ি পাওয়া ভার হয়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বাড়ীওয়ালাই পুরাতন ভাড়াটিয়া উঠে গেলে খুসি হয়, নুতন ভাড়টিয়া বসিয়ে বেশী লাভ করবার লোভে।

প্রমোদ বাড়ীওয়ালার দাবী সহজে মানতে রাজি হ'ল না। বাড়ীওয়ালা নালিশ করলে। মামলা হ'ল এবং মামলায় হেরে গেল প্রমোদই। বাড়ী ছাড়বার জন্য সে সময় পেলে মাত্র একমাস।

দুই

ইতিমধ্যে ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব কাণ্ড!

প্রমোদের ঠিক পাশের বাড়ীতে থাকত নরহরি দাস, মফস্বলের লোক, কলকাতায় বাস করত ব্যবসসূত্রে। মাঝখানের একটা পাঁচিল টপ্‌কালেই তাদের বাড়ীর ছাদ থেকে অনায়সে প্রমোদের বাড়ীর ছাদের উপরে এসে পড়া যেত।

নরহরির চেহারাখানি ছিল আদর্শ গদীওয়ালার মত—মোটাসোটা, বেঁটেসেটে, কালোকালো দেহ; চাঁদের মত গোলাকার মুখমণ্ডল; সাজগোজও তথৈবচ। সে পরম বৈষ্ণব, মাথায় চৈতন্যচুটকি, কপালে ও নাসিকায় তিলকমাটির চিহ্ন এবং কণ্ঠদেশে তিনসার তুলসীর মালা।

অথচ তার অত্যন্ত দহরম-মহরম ছিল মহা শাক্ত ভৈরব ভট্‌চাযের সঙ্গে। ভৈরবের চেহারা ছিল লম্বায়-চওড়ায় দশাসই, হাস্য ছিল অট্টহাস্যের মত এবং বাক্য ছিল হুঙ্কারের মত। তান্ত্রিক ক্রিয়া ছিল তার পেশা এবং মদ্য আর মাংসই ছিল তার প্রধান পানীয় ও খাদ্য।

কিন্তু চেহারায় ও চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকলেও ভৈরব ও নরহরি দুজনের নেশা ছিল এক এবং সেটা হচ্ছে দাবাখেলা।

রোজ সন্ধ্যাবেলায় নরহরি তাম্বুল চর্ব্বণ করতে করতে এবং ভৈরব তামাকু টানতে টানতে দাবাবোড়ের ছকের সামনে ব'সে খেলায় বিভোর হয়ে থাকত। সে সময়ে তাদের দেখলে

লোকে বলাবলি করত, "এও এখন সম্ভবপর, যখন বাঘে আর গরুতে মিলনই বা অসম্ভব হবে কেন?"

কিন্তু এমন মিলনেও তাগ্‌ড়া পড়ল। আচম্বিতে মেনিন্‌জাইটিস্ রোগে নরহরি হ'ল গতাসু এবং সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে দেশে চ'লে গেল তার পরিবারবর্গ। ভেঙে গেল সেখানকার দাবাবোড়ের সান্ধ্য আসর।

তিন

নরহরির মহাপ্রস্থানে ভৈরব ভট্‌চায্ দুঃখ পেলে বটে, কিন্তু পরম আনন্দ লাভ করলে তার বাড়ীওয়ালা ক্ষেত্র বা ক্ষেতু মল্লিক।

নরহরি ভাড়া দিত মাসিক পঞ্চাশ টাকা। ক্ষেতু মল্লিক এখন জো পেয়ে দাবি ক'রে বসল এককালীন একহাজার টাকা সেলামী এবং মাসিক দেড় শো টাকা ভাড়া। দিনকাল যা পড়েছে তার দাবি নিশ্চয়ই অপূর্ণ থাকত না। এমন কি, হবু ভাড়াটিয়ারা আনাগোনাও সুরু ক'রে দিলে।

কিন্তু সহসা সঙ্ঘটিত হ'ল এক রোমাঞ্চকর ও অভূতপূর্ব্ব ঘটনা।

এক পূর্ণিমার রাত্রে পথ দিয়ে চলতে চলতে নরহরিদের পরিত্যক্ত, তালাবন্ধ, খালিবাড়ীর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বদন চাটুয্যে দেখলে এক বিসদৃশ দৃশ্য!

বারান্দার একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে মুখ ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢেকে এক সন্দেহজনক মূর্ত্তি!

বদন চেঁচিয়ে বললে, "কে ওখানে দাঁড়িয়ে?"

কোন সাড়া নেই।

বদনের সঙ্গে ছিল টর্চ, সে টপ্ ক'রে চাবি টিপে আলো জ্বেলে যা দেখলে, তা সম্ভবপরও নয়, যুক্তিসঙ্গতও নয়।

সে মূর্ত্তি হচ্ছে নরহরি দাসের!

তার পেটের পিলে চম্‌কে গেলেও, নিজের চোখের ভ্রম ভেবে বদন চাটুয্যে আরো ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করলে। উঁহু, মোটেই চোখের ভ্রম নয়, ও মুখ অবিকল নরহরি দাসের! ভয়ে সাদা হয়ে গেল বদনের বদন, ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে "আঁ" বলে পাড়াকাঁপানো চীৎকার ক'রে সে ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে দৌড় মারলে নিজের বাড়ীর দিকে।

চার

বলা বাহুল্য, খবরটা পাড়ার ঘরে ঘরে র'টে যেতে দেরী লাগল না।

ক্ষেতু মল্লিক তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললে, "বদ্‌না ব্যাটা ভাংচি দিতে চায়! নরহরি ছিলেন পরম বৈষ্ণব মানুষ, তিনি এখন গোলোকধামে ব'সে মনের সুখে বিশ্রাম করছেন, কোন্ দুঃখে আবার এই ছাই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন?"

কিন্তু নরহরি যে এখনো সশরীরে বিরাজ করছে তার ঐ ভাড়াবাড়ীতেই, পাড়ার আরো কেউ কেউ তার অকাট্য চাক্ষুষ প্রমাণ পেলে। তবে দিনের বেলায় তাকে দেখা যায় না এবং দিনের বেলায় তাকে দেখবার আশাও কেউ করে না।

ফলে দাঁড়াল এই ঃ প্রথমতঃ, নরহরির বাড়ীর সুমুখ দিয়ে লোকে রাত্রে পথ চলাই ছেড়ে দিলে। দ্বিতীয়তঃ, হবু-ভাড়াটিয়ারা ক্ষেতু মল্লিককে একেবারেই বয়কট করলে। বিনা ভাড়াতেও নরহরির বাড়ীতে বাস করবার মত লোকও আর পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না।

অবস্থা যখন এই রকম, ঠিক সেই সময়ে তান্ত্রিক ভট্‌চায্ এসে বাসনা প্রকাশ করলে, "ক্ষেতুবাবু, নরহরিদের বাড়ীখানা আমি ভাড়া নিতে চাই!"

নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে না পেরে ক্ষেতু মল্লিক বললে, "তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ ক্ষেতুবাবু! আমি হচ্ছি তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা আমাকে দেখলেই ভয়ে পিঠটান দেবার পথ পাবে না!"

ক্ষেতু মল্লিক তাড়াতাড়ি বললে, "ঠিক বলেছ ভট্‌চায্‌! তোমার সঙ্গে আমিও একমত।"

—"কিন্তু আমি হচ্ছি গরীব মানুষ, মাসে ত্রিশ টাকার বেশী ভাড়া দেবার শক্তি আমার নেই।"

—"বেশ তাই সই।"

পাঁচ

নরহরির বাড়ীতে এসে জাঁকিয়ে বসল ভৈরব ভট্‌চায্‌। সত্যসত্যই মনে মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, বৈষ্ণবের প্রেতাত্মা কিছুতেই শাক্তের নিকটবর্ত্তী হবার সাহস প্রকাশ করতে পারবে না।

এবং যখন প্রথম দুই রাত্রির মধ্যে নরহরির চৈতনচুটকি পর্য্যন্ত দেখা গেল না, ভৈরব তখন পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তন্ত্রের অপূর্ব্ব মহিমা সম্বন্ধে জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল।

তারপরই এল অমাবস্যার রাত্রি।

দোতলার একটি ঘরে পূজার উপকরণ নিয়ে আসনাসীন হ'ল ভৈরব ভট্‌চায্‌। নরহরির ভয়ে পথ নির্জ্জন, কোথাও টু শব্দটি পর্য্যন্ত শোনা যায় না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, ঘরের ভিতরে জ্বলছে হারিকেন লণ্ঠনের টিম্‌টিমে আলো।

ভৈরব একমনে দুই চক্ষু বুঁজে মন্ত্র জপ করছিল।

আচমকা একটা বিকৃত, অনুনাসিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল "ভৈঁরঁব, এঁকচাঁল দাঁবাঁ খেঁলবেঁ ভাঁয়াঁ?"

ভয়ঙ্কর চম্‌কে গিয়ে ভৈরব চোখ খুলেই দেখে, ঘরের দরজার কাছে পা থেকে গলা পর্য্যন্ত ধব্‌ধবে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং নরহরি ছাড়া অর কেউ নয়! ভৈরবই সব চেয়ে বেশী চিনত নরহরিকে, তার চোখের ভ্রম হবার জো নেই।

তারপর আর কিছু নয়, বিকট এক আর্ত্তনাদ এবং ভৈরবের ভূমিতলে পতন ও মূর্চ্ছা!

ছয়

ক্ষেতু মল্লিক হতাশ ভাবে স্থির করলে, ঐ ভুতুড়ে বাড়ীখানা ভেঙে ফেলে একেবারে নতুন বাড়ী তৈরি করবে।

কিন্তু হঠাৎ যখন শিল্পী প্রমোদ রায় এসে নরহরির বাড়ীখানা ভাড়া নিতে চাইলে, তখন ক্ষেতু মল্লিকের চেয়ে বিস্মিত লোক পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না বোধ হয়।

প্রমোদ বললে, "কলকাতায় খালি বাড়ী দুর্লভ, অথচ বাড়ীওয়ালার হুকুমে আর এক হপ্তার মধ্যেই আমাকে উঠে যেতে হবে। সুতরাং আমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন তো?"

ক্ষেতু মল্লিক বললে, "বেশ বাবা, অমি বেশী ভাড়াও চাই না, তুমি মাসে পঁচিশটি ক'রে টাকা দিও।"

—"তাহ'লে এই পাঁচশ টাকা অগ্রিম নিয়ে তিন বছরের কড়ারে আমাকে চুক্তিপত্র লিখে দিন।"

—"আচ্ছা।"

সাত

পাশের বাড়ীতে উঠে যাবার জন্যে প্রমোদ নিজের 'ষ্টুডিয়ো'র ছবি ও প্রতিমূর্ত্তিগুলোকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করছে, এমন সময়ে তার স্ত্রী নমিতা এসে ভয়ে ভয়ে বললে, "ওগো, নরহরিবাবুর বাড়ীতে গিয়ে আমি থাকত পারব না।"

—"কেন?"

—"কেন, তা কি তুমি জানো না?"

প্রমোদ হাসিমুখে নমিতার হাত ধ'রে ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা সাদা চাদর একধারে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, একটা খড়ের কাঠামোর উপরের বসানো রয়েছে নরহরির রং করা মাটি-দিয়ে-গড়া মুখমণ্ডল!

নমিতা হতভম্ব!

প্রমোদ বললে, "আমি হচ্ছি ভাস্কর, নরহরির মুখ আমি অনায়াসেই গড়তে পেরেছি। পাঁচিল টপকে পাশের বাড়ীতে যাওয়াও আমার পক্ষে কঠিন হয় নি; আমাকে সাহায্য করেছে আবছা রাত, মানুষের স্বাভাবিক ভয় আর কুসংস্কার!"

পৌষ ১৩৬০

অমর ধাম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মাসখানেক ধরে শরীরটা খারাপ হয়েছে। যা খাই, অম্বল হয়। বিকালে মাথার যন্ত্রণা। রাতে ঘুম নেই। কাজে একেবারে উৎসাহ পাচ্ছি না। পাড়ার ডাক্তার বলল, ওষুধে সাময়িক উপকার হতে পারে, স্থায়ী কিছু হবে না। তার চেয়ে বরং ভাল জায়গায় চেঞ্জে চলে যান। মাস দুয়েক থাকলেই সেরে যাবেন।

কোথায় যাব তাই নিয়েই এক সমস্যা। এক এক বন্ধু এক এক রকম উপদেশ দিতে লাগল। কেউ বলল, ভুবনেশ্বর, কেউ হাজারিবাগ, আবার কেউ দেওঘর।

কি করব, কোথায় যাব যখন ভাবছি, তখন হঠাৎ অমলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফাঁকা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি, আচমকা পিঠে কার স্পর্শ।

ফিরে দেখি অমল। কলেজ ছাড়ার পর অমলের সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

আমাকে দেখে অমল বলল, চেহারা যে বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার বললাম।

শুনে অমল বলল, ওসব ভুবনেশ্বর দেওঘরের চিন্তা ছেড়ে দাও। ওখানে কিছু হবে না। তুমি মিলনপুরে চলে যাও। তিন দিনে তোমার অম্বল সেরে যাবে।

মিলনপুর কোথায়? কখনও তো নাম শুনি নি।

অমল হাসল, বেশী লোক নাম শোনে নি বলেই তো জায়গাটা এখনও ভাল আছে। ভিড় হলেই জলবায়ু বদলে যায়।

যাব কি করে? থাকব কোথায়?

কোন অসুবিধা নেই, আমার বাবা একটা বাংলো কিনেছিল মিলনপুরে। এখন কেউ যায় না। আমিও তো এখন অন্য জায়গায় থাকি, তবে লোক আছে। তার কাছে আমার নাম কর। কোন অসুবিধা হবে না।

অমল আরও বলল, গিরিডি স্টেশনে নেমে বাসে তের মাইল। মিলনপুরে নেমে অমরধাম বললেই যে কোন লোক দেখিয়ে দেবে। তুমি চলে যাও। শরীরটা সারিয়ে এস।

তাই গেলাম।

মিলনপুরে যখন নামলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। চারদিক অন্ধকার। একদিকে নীচু নীচু পাহাড়। তার কোলে ঘন অরণ্য। আর একদিকে সরু নদী, প্রায় নালার মতন, কিন্তুকি জলের গর্জন। স্রোত পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে।

টর্চ জ্বেলে কোন রকমে এগোতে লাগলাম। সরু পায়ে চলা পথ। লাল মাটি। মাঝে মাঝে কালো পাথর। অন্যমনস্ক হলে হোঁচট খাবার আশঙ্কা।

পথের একপাশে একটা মুদির দোকান। মুদি ঝাঁপ বন্ধ করছিল, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম।

এখানে অমরধাম কোথায় বলতে পার?

মুদি লণ্ঠন তুলে কিছুক্ষণ আমার দিকে দেখে বলল, সেখানে তো কেউ থাকে না। বাড়ি একেবারে জঙ্গল হয়ে গেছে।

বুঝলাম, মুদি বাড়িটার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখে না। জঙ্গল হলে কি অমল আমাকে আসতে বলত। এমন হাতে পারে মালী হয় তো বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার করে না। তাতেই আগাছা জন্মেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, বাড়িটা কোন্ দিকে বল?

মুদি বলল, সোজা চলে যান। সামনে একটা নীচু টিলা দেখবেন, সেটা বাঁদিকে রেখে ঘুরে যাবেন। এক জায়গায় গোটা চারেক শাল গাছের মেলা। পাশে সাহেবদের গোরস্থান। সেটা ছাড়িয়ে একটু এগোলেই সাদা পাঁচিল ঘেরা অমরধাম।

এক হাতে সুটকেস, আর এক হাতে টর্চ। সাবধানে এগোতে লাগলাম। রাত নটার বেশী হয় নি, কিন্তু এই জনমানবহীন ঘন জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার জায়গায় মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, ঝোপে ঝোপে জোনাকির ঝাঁক, মাঝে মাঝে পায়ের কাছে খর খর শব্দ করে কি যেন সরে যাচ্ছে। সাপ হওয়াও বিচিত্র নয়।

এক সময়ে নীচু টিলা পেলাম। গোরস্থানও। অন্ধকারে অনেকগুলো আলোর ফুটকি। সম্ভবতঃ শেয়ালের চোখ। বড় শেয়াল অর্থাৎ বাঘ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

যাক, অবশেষে অমরধাম পাওয়া গেল। বেশ ভাল বাংলো। অন্ততঃ এক সময়ে বেশ ভালই ছিল, এখন অযত্নে জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। জলের পাইপে আগাছা হয়েছে, সামনের চাতাল শ্যাওলায় সবুজ হয়ে আছে।

গেট ঠেলতে ক্যাঁচ করে বিশ্রী একটা শব্দ করে গেট খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগলাম। বার দশেক কড়া নাড়ার পর দরজা খোলার শব্দ হল।

বারান্দায় গলা শোনা গেল, কে?

আমি ওপর দিকে মুখ তুলে বললাম, আমি অমলের বন্ধু। আমার আসার কথা ছিল।

আরে পার্থ না? তোমার জন্যই তো অপেক্ষা করে রয়েছি। দাঁড়াও, দরজা খুলে দিচ্ছি।

আমার নিজের খুব অবাক লাগল। কে লোকটা? আমার নাম জানল কি করে? তবে কি আমাদের কোন বন্ধু আমার মতন শরীর সারাতে এখানে এসে উঠেছে।

নীচের দরজা খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে এক ঝাঁক চামচিকে উড়ে গেল। আর একটু হলেই তাদের ডানা আমার মাথায় লেগে যেত।

লম্বা চেহারার একটি লোক আমর দু' কাঁধে দু' হাত রেখে বলল, ও পার্থ, কত যুগ পরে দেখা বল তো?

টর্চের আলোটা তার দিকে ফেরালাম।

লম্বা পুলক। আমাদের কলেজে দুজন পুলক ছিল, তাই একজন লম্বা পুলক আর একজন বেঁটে পুলক।

তারপরের কথাটা মনে হতেই মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা প্রবাহ নামল। বুকের শব্দ দ্রুততর।

তাই তো শুনেছিলাম, বছর পাঁচেক আগে টালা ব্রিজের কাছে লম্বা পুলক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলক মোটর সাইকেলে ছিল, সামনাসামনি এক লরীর সঙ্গে ধাক্কা, পুলক আর তার মোটর সাইকেল দুইই একেবারে ছাতু হয়েছিল।

কি, সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি?

পুলক তাড়া দিল।

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, না, চল। একটা কথা ভাবছিলাম।

কি কথা?

শুনেছিলাম দুর্ঘটনায় তুমি মারা গেছ। বছর পাঁচেক আগে।

পুলক খুব জোরে হেসে উঠল।

আরে এক রকম মরাই তো। দেখ না, বাঁ পায়ে একদম জোর পাই না। হাসপাতাল থেকে সোজা এখানে চলে এসেছি। বলতে নেই, এখন বেশ ভাল আছি ভাই, এখানকার জল-হাওয়ায় খুব উপকার পেয়েছি। এস, ভিতরে এস।

শরীর খুব পরিশ্রান্ত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে আমারও ভালো লাগছিল না। কোন রকমে কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

স্নান করবে তো? পুলক জিজ্ঞাসা করল।

এত রাতে? নতুন জায়গায়? সাহস হচ্ছে না।

আরে গরম জলে স্নান করে নাও। শরীর ঝরঝরে লাগবে। গরম জল এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান সেরে বাইরে আসতে দেখি টেবিল সাজিয়ে পুলক বসে আছে। প্লেট ভর্তি গরম ভাত আর মুরগির মাংস।

এখানে রান্না করে কে?

পুলক বলল, রান্না, বাসনমাজা, ঘরদোর পরিষ্কার সবই মুংলা করে। এদেশী লোক। ভারি কাজের।

তুমি খাবে না?

আমি সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে খেয়ে নিই। নাও, তুমি আর বসে থেক না। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। শুয়ে পড়। ওটা তোমার ঘর।

এ ঘরে ঢুকেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সিঙ্গল খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা। মাথার কাছে টিপয়ের ওপর জলের গ্লাস। ভোরে উঠে আমার যে জল খাওয়ার অভ্যাস, এটা পুলক জানল কি করে?

শুয়ে পড়লাম। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র গভীর নিদ্রা।

মাঝরাতে পেঁচার বিদকুটে ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাথার কাছে খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো বিছানার ওপর এসে পড়েছে। ঘরের সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই চমকে উঠলাম। বরফের মতন ঠাণ্ডা স্পর্শ। চোখ খুলেই রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমারই বালিশে মাথা দিয়ে একটা কঙ্কাল শুয়ে। একটা হাত প্রসারিত। সেই হাতটা আমার শরীরে ঠেকেছিল।

আর্তনাদ করে উঠে বসলাম।

কি, কি হল পার্থ?

পুলক খাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কালের দিকে আঙ্গুল দেখাতে গিয়েই দেখলাম, বিছানা খালি। কোথাও কিছু নেই।

না, তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। সর, আমি না হয় তোমার পাশে শুই।

লজ্জা পেয়ে মাথা নাড়লাম, না, না, তোমায় শুতে হবে না। তুমি যাও।

পুলক সরে গেল।

ঘুমোবার চেষ্টা করতে করতে নতুন এক চিন্তা মনে এল। শোবার আগে আমি তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, তা হলে পুলক ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে? উঠে আর পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে উঠেই দেখলাম ঘরের দরজা ভিতর থেকে খিল দেওয়া। এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ভিতরে ঢোকার আর কোন পথ নেই।

তাহলে পুলক কাল রাতে ঘরের মধ্যে ঢুকল কি করে?

দরজা খুলতেই পুলককে দেখলাম। বাগানে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল রাতে তার ঘরে ঢোকার কথা বলতেই সে হেসে উঠল খুব জোরে।

তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছ। আমি আবার কখন তোমার ঘরে ঢুকলাম?

স্বপ্ন? তা হবে! কিন্তু এত পরিষ্কার স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখি নি। এখনও চোখের সামনে যেন ঘুমন্ত নরকঙ্কালটা দেখতে পাচ্ছি।

মুখ-হাত ধুয়ে নাও। মুংলা এখনই চা দিয়ে যাবে।

বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার পাতা। মাঝখানে গোল বেতের টেবিল।

হাতমুখ ধুয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। উল্টোদিকের চেয়ারে পুলক বসে বলল, মুংলা, পার্থবাবুর চা নিয়ে এস।

চা আর টোস্ট নিয়ে যে এল তাকে দেখে আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এমন বীভৎস চেহারা আমি জীবনে দেখি নি।

গায়ে চিমটি কাটলেও এক তিল মাংস উঠবে না, এমনই শীর্ণ চেহারা। চোখ দুটো এত ভিতরে ঢোকা যে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সরু কাঠির মতন হাত-পা। ঝকঝকে দাঁতের পাটি সর্বদাই বাইরে।

চা-টোস্ট দিয়ে চলে যেতে আমি বললাম, লোকটার চেহারা দেখলে ভয় করে।

পুলক বলল, মানুষের চেহারা আর কতটুকু? ছাল ছাড়ালে সবাই সমান। মুংলার চেহারা যেমনই হোক, লোকটা কিন্তু খুব কাজের। তাছাড়া নিজের লোক ছাড়া আমরা তো আর যাকে-তাকে রাখতে পারি না।

নিজের লোক মানে?

মানে খুব জানাশোনা। একেও এখানকার গাঁ থেকে অমলই যোগাড় করে এনেছে।

খেতে খেতে বললাম, তোমার চা-টোস্ট কই?

পুলক উত্তর দিল, আমি এসব খাই না ভাই। সহ্য হয় না। ভোরে উঠে ছোলা ভিজানো খাই আদা দিয়ে।

একটু থেমে পুলক বলল, তুমি বস। আমি একটু ঘুরে আসি।

এখন আবার কোথায় যাবে?

একবার পোস্ট অফিসে যাব, তাছাড়া আরও দু-এক জায়গায় ঘুরে আসব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা কর না। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।

সারা দিনটা পুলক ফিরল না। সন্ধ্যার সময়ও না।

মুংলাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, বাবুর ফেরার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোথায় কোথায় যে যান—

খাবার সময় এক কাণ্ড। বসে খাচ্ছি, পাশে মুংলা দাঁড়িয়ে। তাকে বললাম, একটু তরকারি নিয়ে এসে তো, আর দু'খানা রুটি।

মুংলা চৌকাঠের কাছ পর্যন্ত গিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে তরকারি আর রুটি এনে দিল। ঠিক মনে হল এগুলো নিয়ে কে যেন বাইরে অপেক্ষা করছিল।

কিছু আর জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু এ বাড়ির বাতাসে কেমন যেন ভয়ের গন্ধ। মনে হয় অশরীরী আত্মারা আনচে-কানাচেয় লুকিয়ে আছে।

সেই রাত্রেই দারুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। পুলক তখনও ফেরেনি।

ঘুম আসে নি, বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ বাইরে খরখর আওয়াজ। পাশা দু-হাতে রগড়ালে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনই।

আস্তে আস্তে উঠে জানলার খড়খড়ি খুলে বাইরে চোখ রাখলাম। ম্লান চাঁদের আলো। খুব স্পষ্ট নয়, আবার একেবারে অস্পষ্টও নয়।

উঠানে একটা গুঁড়ির ওপর দুটো কঙ্কাল ঘেঁষাঘেঁষি বসে। একজনের হাত আর একজনের গলায়। আর একটু দূরে একটা গাছের ডাল ধরে মুংলা দোল খাচ্ছে। কি লম্বা চেহারা। সারা দেহে

কোথাও একতিল মাংস নেই। চোখের দুটো গর্ত থেকে গাঢ় লাল রং বের হচ্ছে।

অজান্তেই মুখ থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কাল দুটো ফিরে দেখল। চোখ নেই, তবুও কি মর্মভেদী দৃষ্টি। বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেল।

আশ্চর্য কাণ্ড! একটু একটু করে কঙ্কাল দুটোর মাংস লাগল। সেকেণ্ড কয়েক-এর মধ্যে দুটি পূর্ণ মানুষের মূর্তি ফুটে উঠল।

তখন আর চিনতে অসুবিধা হল না। একজন পুলক, আর একজন অমল।

কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় ফিরে গেলাম।

সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। যা দেখেছি তারপর ঘুমানো সম্ভবও নয়। বাইরে খটখট শব্দ। মনে হল একাধিক কঙ্কাল মূর্তি উঠানে পায়চারি করছে। সেই শব্দের সঙ্গে পেঁচার ডাক, বাদুড়ের ডানার ঝট্‌পটানি মিশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করল।

ভোর হতে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করি নি। সুটকেসটা হাতে নিয়ে ছুটতে লাগলাম। বের হবার সময় রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের আওয়াজ আসছিল। একটু পরেই হয় তো মুংলা চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। দিনের আলোতেই মুংলার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই।

ছুটতে ছুটতে যখন মুদির দোকানের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন মুদি সবে দোকানের ঝাঁপ খুলছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, এক গ্লাস জল।

মুদি আমাকে দেখে অবাক। বোধ হয় জীবন্ত দেখবে আশাও করে নি। জল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি অমরধাম থেকে আসছেন?

হ্যাঁ।

খাওয়াদাওয়ার কি করতেন?

মুদির কাছে কিছু বলতে ইচ্ছা হল না। শুধু বললাম, কেন, মুংলা রাঁধত। মুদির মুখটা হাঁ হয়ে গেল। দুটো চোখ বিস্ফারিত।

কাঁপা গলায় বলল, মুংলা মানে মুংলা মুণ্ডা? মুংলাকে তো বছর পাঁচেক আগে অমরধাম-এর এক গাছের ডালে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

আত্মহত্যা?

কি জানি, অনেকে বলেছিল, বিষয়সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় ভাইপোরাই নাকি মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

আর দাঁড়াই নি। গিরিডি না পৌঁছানো পর্যন্ত শান্তি নেই। অমরধাম-এর বাসিন্দারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে হাজির হলেই সর্বনাশ।

বাকীটা শুনলাম গিরিডির স্টেশন মাস্টারের কাছে। ওই বাড়ির অমলবাবু মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন। বছর দুয়েক আগে তাঁকে ঘাড় মটকানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে পাওয়া গিয়েছিল। গিরিডি থেকে পুলিসের কর্তা গিয়েছিল, কিন্তু খুনের কোন হদিস হয় নি।

মাথাটা ঘুরে উঠল। তাহলে কলকাতায় রাস্তায় অমলের সঙ্গে দেখা, আমাকে মিলনপুরে আসার আমন্ত্রণ করা, এসবের কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

আর পুলকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু, এ তো আমার জানাই ছিল। নিজেদের দল বাড়াবার জন্যই কি আমাকে ডেকে আনা হয়েছিল? তাহলে মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিল যে!

গলায় পৈতা আছে বলেই কি?

কি জানি, যত ভাবি এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাই না।

আষাঢ় ১৩৮৭

ভূতে বিশ্বাস কর?

স্বপনবুড়ো

ভেবে দেখতে গেলে সত্যিই চিন্তার কথা!

ভূত-প্রেত-দৈত্যি-দানা-শাঁকচুন্নি, একানড়ে, মেছো ভূত আর গেছো ভূত.......এদের আর হামেশা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

যত বিজলী বাতি জ্বল্‌ছে, কলের জল পড়ছে—শহর গড়ে উঠছে..........কলকারখানার চিমনি আকাশ ভেদ করে উঠ্‌ছে ওপরে—ততই ভূতগুলো যেন ভয় পেয়ে কোথায় উধাও হযে যাচ্ছে।

বন কেটে শহর বসানো হচ্ছে সেটা সত্যি আনন্দের কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভূতের বংশ যে লোপ পেতে বসল—এই দরকারী কথাটা কেউ ভেবে দেখ্‌ছে না এইটেই আমার আপত্তি।

অথচ ছেলেবেলায় গ্রাম দেশে মানুষ হয়েচি, পথ চল্‌তে কত খবর পেতাম আশে-পাশের ছেলেদের কাছে! কোন্ গাছে ব্রহ্মদৈত্যি থাকে, কোন্ স্যাওড়া গাছে পা ঝুলিয়ে রাত্রের শেষ প্রহরে শাঁকচুন্নি নাকী সুরে কাঁদে! কোন্ দুটো গাছের মগডালে দাঁড়িয়ে দুটো একানড়ে মড়ার মাথা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে......এ সব আমাদের একেবারে মুখস্থ ছিল।

শহরের মানুষ হয়ে আমাদের ছেলেবেলার প্রতিবেশী ভূতকে বেমালুম ভুলতে বসেছি! এ অপরাধের কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত আছে?

অনেকে আবার ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতের গল্প চাট্‌নীর মতো চেখে চেখে উপভোগ করে। আমাদের গাঁয়ে একটা লোক ছিল—সে নিজে তামাক খেতো না, কিন্তু যেখানে জমিদারবাবু অম্বুরী তামাক টান্‌তেন—তার আশেপাশে ঘুরত। অম্বুরী তামাকের গন্ধটা নাকি আসল। টেনে সময় নষ্ট করা কোনো কাজের কথা নয়।

তাই ত' বলি, ভূত বিশ্বাস করি আর না-ই করি—ভূতের গল্প শুন্‌তে বাধা কি? বরং ভালোই লাগে নানা জাতীয় ভূতের রসালো গল্প শুন্‌তে।

ছেলেবেলায় ভূতের গল্প শুন্‌তে আমিও খুব ভালোবাস্‌তাম। তারই একটা সুন্দর কাহিনী আজ তোমাদের উপহার দিচ্ছি। ভালো লাগ্‌লে "শুকতারা" সম্পাদককে জানিয়ে দিও। তখন আমর ঝুলি হাতড়ে দেখবো, নতুন কি কাহিনী তোমাদের উপহার দেওয়া যায়।

বহুকাল আগে বাঙ্‌লা দেশের এক গ্রামে এক জমিদার ছিলো। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে তার জমিদারী। তার হুমকিতে নাকি বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খেতো। যেমন ইয়া লম্বা দশাসই চেহারা, তেমনি বিরাট তার গোঁফ্। এই জমিদারের নামে সবাই একেবারে থরহরি কাঁপত।

এই জমিদার প্রজাদের ওপর ভারী অত্যাচার করত। জুলুম করে পাওনার বেশী টাকা আদায় করত, পাইক পাঠিয়ে ক্ষেতের ফসল নিতো লুটে; আর না দিলে রাত্তিরের অন্ধকারে ঘরে দিত আগুন লাগিয়ে। এই জমিদারের ভয়ে প্রজাদের মনে এতটুকু শান্তি নেই। কিন্তু মুখ ফুটে কেউ প্রতিবাদ করবে—এমন বুকের পাটাও কারো ছিল না।

যতদিন শরীরের রক্ত গরম ছিল—জমিদার এইভাবে সবাইকার ওপর অত্যাচার করে চল্‌লো। কিন্তু ধীরে ধীরে এই জমিদারও বুড়ো হয়ে এলো—আগেকার সে উদ্যম আর নিজের মধ্যে খুঁজে পেতো না জমিদার। এর ওপর এক নতুন ব্যাধি হল সেই জমিদারের।

অদ্ভুত সে অসুখ।

সারারাত্তির চোখের পাতা এক করতে পারে না জমিদার। মাঝে মাঝে কেমন যেন চম্‌কে ওঠে। অকারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা শয্যায় বসে থাক্‌তে হয়—তবু ঘুম একেবারেই উঁকি-ঝুঁকি মারে না! জমিদার একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল।

তাইত! কে তার চোখের পাতা থেকে ঘুম কেড়ে নিলে? যদিও বা গভীর রাত্রে একটু তন্দ্রা আসে—অম্‌নি দুঃস্বপ্ন দেখে চম্‌কে চম্‌কে ওঠে জমিদার!

যার দাপটে সারা অঞ্চলের লোক থরহরি কাঁপে, সে কি না ঘুমকে শায়েস্তা করতে পারলে না! বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ডাকিয়ে জমিদার অনেক শান্তি-স্বস্ত্যায়ন করলে; অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়।

জমিদারবাবুর বিরাট বপু ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো।

এইবার জমিদার গাঁয়ের প্রবীণ কবরেজমশাইকে ডেকে পাঠালে।

লাঠি ঠুক্‌ঠুক্‌ করতে করতে এলেন সেই বৃদ্ধ কব্‌রেজমশাই। নাড়ি টিপে দেখ্‌লেন, চোখের পাতা টেনে নিরীক্ষণ করলেন, মাথার খুলি ঠুকে মাথা নাড়লেন, বুক পরীক্ষা করে কি যেন আবোল-তাবোল বক্‌বক্‌ করলেন—তারপর দুই নাকের ফুটোয় নস্যি গুঁজে দিয়ে মন্তব্য করলেন, —হুঁ! বায়ু কুপিত হয়েছে। সারা জীবন ধরে যত লোকের সর্বনাশ করেছেন আপনি—তাদেরই দীর্ঘনিঃশ্বাসে আপনি ঘুমুতে পারছেন না।

শুনে জমিদার শিউরে উঠলেন।

বল্লেন, তাহলে আমার উপায়? কিছুতেই কি আমি আর ঘুমুতে পারবো না? সারাজীবন কি আমার অনিদ্রায় কাট্‌বে?

মাথা নেড়ে কব্‌রেজমশাই উত্তর দিলেন, অবশ্যি ওষুধ আমি দেবো। মাথা নেড়া করে ঘৃতকুমারীর পাতা মালিশ করতে বল্‌বো। কিন্তু তাতেই কি ব্যাধি সারবে?

—তবে?

ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে জমিদার।

প্রবীণ কব্‌রেজমশাই একবার একটু গুছিয়ে বসেন। বলেন, দেখুন জমিদারবাবু, তা হলে একটা কথা খুলেই বলি। সারাজীবন আপনি মানুষের ওপর অত্যাচার করে যে পাপ করেছেন—তার স্খালন হতে পারে যদি আপনি জনসাধারণকে জলদান করেন।

—জলদান?

—হাঁ, জলদান। আপনি জানেন, এই অঞ্চলের লোক পানীয় জলের অভাবে গ্রীষ্মের দিনে বড় কষ্ট পায়। আপনি যদি একটি বিরাট দীঘি কাটিয়ে দেন—তাহলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দু'হাত তুলে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করবে। কলসী ভরে নিয়ে যাবে সবাই শীতল পানীয়। ওদের কণ্ঠ শীতল হবে—আর সেই সঙ্গে আপনার চোখেও নেমে আসবে ঘুম।

কব্‌রেজ মশায়ের কথা শুনে আশ্বস্ত হল জমিদার। বল্লে, বেশ, আপনার পরামর্শ আমি মাথা পেতে নিলাম। প্রজাদের জন্যে আমি বিরাট জলাশয় খনন করবো। তাদের বুক জুড়োক, আর আমিও ঘুমিয়ে বাঁচি।

খুশী হয়ে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন গাঁয়ের প্রবীণ কব্‌রেজমশাই।

জমিদার তখন তার বিশ্বস্ত রক্ষী ও পাইক নীলকণ্ঠকে ডেকে পাঠালো।

বিরাট কালো কুচ্‌কুচে চেহারা এই নীলকণ্ঠের। রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে, তাকে দেখ্‌তে পাওয়া দায়!

এই নীলকণ্ঠকে দিয়ে জমিদার সারা জীবন ধরে যে কত কুকীর্ত্তি করিয়ে নিয়েছে—তার আর হিসেব-নিকেশ নেই।

নীলকণ্ঠের গায়ে অসুরের শক্তি। লম্বায়-চওড়ায় একেবারে মোষের মত। আর একটা মস্ত বড় গুণ নীলকণ্ঠের, জমিদারের একটি মুখের কথায় সে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও পিছপা নয়। আর এ রকম বিশ্বাসী মানুষ দু'টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই নীলকণ্ঠ সব সময় জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তো। নীলকণ্ঠের হাতে প্রাণ সঁপে দিয়ে জমিদার নিশ্চিন্ত!

অবশেষে জমিদার নীলকণ্ঠের ওপর দীঘি খননের সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে।

—বুঝ্‌লে নীলকণ্ঠ, যত টাকা লাগে—পাঁচটা গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে এই বিরাট দীঘি খুঁড়তে হবে। যাতে সবাই এসে নিজ নিজ বাড়ীতে পানীয় জল তুলে নিয়ে যেতে পারে। ওরা সবাই আকণ্ঠ পান করে আমায় আশীর্ব্বাদ করুক—আর আমার চোখে নেমে আসুক ঘুম।

স্বয়ং জমিদার বলেছে—এর ওপর আর কথা কি আছে? নীলকণ্ঠ কোমর বেঁধে তৈরী হয়ে নিল।

জমিদার শুধোলে, ক'জন লোক তুমি সঙ্গে নেবে বলো—সঙ্গে অনেক টাকা-কড়ি থাক্‌বে ত!

মাথা নুইয়ে নীলকণ্ঠ উত্তর দিলে, এই হাতের লাঠি থাক্‌তে আমি আর কাউকে ভয় করিনে হুজুর। টাকা-কড়ি সব কোমরে বেঁধে নেবো। রাত্তিরের অন্ধকারে তীরের মতো ছুটে যাবো—কাক-পক্ষীতেও জান্‌তে পারবে না।

জমিদার শুনে ভারী খুশী।

হ্যাঁ, এই রকম মানুষই ত' চাই।

নিশিথ রাত্রি!

ঝড়ের বেগে একা যেন উড়ে চলেছে নীলকণ্ঠ।

হঠাৎ একটা কাল প্যাঁচা ডেকে উঠ্‌ল না?

হাতের লাঠি শক্ত করে ধরে এগিয়ে চলে নীলকণ্ঠ।

ভূত?—নীলকণ্ঠ তাকে থোড়াই কেয়ার করবে! তবু মনে মনে আওড়ায়—

"—ভূত আমার পুত—
পেত্নী আমার ঝি—
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে
করবি আমার কি?"

সামনে কয়েকটা গাছের মাথ কেন দুল্‌ছে?

একানড়েরা ওখানে আসর জমিয়েছে নাকি?

আসল কথাটা কিন্তু একেবারে আলাদা! নীলকণ্ঠ যে প্রচুর অর্থ নিয়ে আজ রাত্রে রওনা হয়েছে—সে কথা একদল ডাকাত কি করে জান্‌তে পেরেছে। তারাই আগে থেকে নীলকণ্ঠের যাবার পথে গাছের ওপর চড়ে বসে আছে।

অন্ধকারে সে কথা নীলকণ্ঠ টের পাবে কি করে? পল্লীঅঞ্চলে রাত-বিরেতে ভূতের ভয়টাই প্রধান। নইলে নীলকণ্ঠের মতো জোয়ান মরদ অন্য কিছুর ভয় পাবে কেন?

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হুম্‌-হুম্‌ শব্দে সে এগিয়ে চলে।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড পাথর এসে পড়ে নীলকণ্ঠের মাথার ওপর। অন্ধকারের ভেতর এই আক্রমণের জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আর পাথরটা এমন বেমক্কা এসে তার মাথার খুলিতে আঘাত করল যে, সঙ্গে সঙ্গে ঘিলু বেরিয়ে গেল! মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল নীলকণ্ঠ।

ডাকাত দল এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। নইলে সাম্‌না-সাম্‌নি ওর পথ রোধ করবার ক্ষমতা কারো ছিল না! চট্‌পট্‌ ওরা গাছের ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল। তারপর নিমেষের মধ্যে কোমর থেকে টাকা-কড়ি সরিয়ে নিয়ে একেবারে হাওয়া!

এই খবর যখন জমিদারের কাছে পৌঁছুলো—তেলে-বেগুনে একেবারে জ্বলে উঠল মানুষটা। একে ত' সারা রাত্তির ঘুম হয় নি! তার ওপর সকাল হতেই এই দুঃসংবাদ! আগুনের ভাঁটার মতো ঘুরতে লাগ্‌লো জমিদারের দুই চোখ। হুঙ্কার দিয়ে উঠল মানুষটা।

—কী! আমি কি একেবারে মরে গেছি নাকি? আমার জমিদারীতে আমার পাইককে ঘায়েল করে—ব্যাটাদের একটা ঘাড়ে ক'টা করে মাথা? ওরে, কে আছিস? আস্তাবল থকে আমার ঘোড়া বের কর—

উল্কাবেগে ছুটে চল্লো জমিদারের শিক্ষিত ঘোড়া। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই গাছের তলায় গিয়ে হাজির হল জমিদার। নীলকণ্ঠের দিকে আর তাকানো যায় না। মাথার ঘিলু বেরিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—আর কাক শকুনি গৃধিনীর দল সেইগুলো খাচ্ছে। একটা কাক আবার নীলকণ্ঠের চোখ ঠুক্‌রে খাচ্ছিল।

এই নীলকণ্ঠ ছিল জমিদারের সর্ব্বক্ষণের সাথী। চোখ মেলে আর দেখা যায় না—এই বীভৎস দৃশ্য। সেইখানেই পাঁচখানি গ্রামের লোকদের জড় করে জমিদার ঘোষণা করলে, যে ডাকাতদের সন্ধান দিতে পারবে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল এই কথা। ভয়ে ডাকাতদল এক বনে গিয়ে আশ্রয় নিলে। লোকালয়ে বেরুবার সাহস আর তাদের রইল না।

আবার নেমে এলো কালো অমানিশার রাত্রি।

জমিদারের চোখে এতটুকু ঘুম নেই। প্রেতের মতো মানুষটা নিজের বাগানের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে। তার চোখ দুটি ভাঁটার মতো জ্বলছে। দূর থেকে কেউ দেখলে মনে করবে, বুঝি বাঘের চোখ।

হঠাৎ একটা কালো বেড়াল বিশ্রী সুরে ডেকে উঠল—ম্যা—ও—

ওপরে আকাশের পানে তাকালো জমিদার। সেখানে কালপুরুষ কিসের ইঙ্গিত করছে?

রজনীর তৃতীয় প্রহরে দূরের বনে শেয়াল ডেকে উঠল। কিন্তু জমিদারের কানে সে অশুভ ডাক পৌঁছুলো না।

গাছের পাতাটি অবধি নড়ে না........এমনি সব চুপচাপ! আজ কি এই অমানিশার প্রভাত হবে না?

যেন দম বন্ধ হয়ে আসে জমিদারের। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমতে থাকে জমিদারের কপালে।

একটা অসহ্য গুমোট!

জমিদারের মনে হল—চীৎকার করে কাউকে ডাকে। কিন্তু গলা দিয়ে তার কোনো স্বর বেরুলো না।

হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে জমিদার দেখে, অন্ধকারের বুকে আর একটা গাঢ় অন্ধকার যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠ্‌ছে!

সেই ধোঁয়াটা এগিয়ে আস্‌ছে জমিদারের দিকে; ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে একটি আকৃতি গ্রহণ করল!

তাই ত! এ যে নীলকণ্ঠ!

অন্ধকারের ভেতর দিয়েও বুঝ্‌তে কষ্ট হল না যে,—নীলকণ্ঠের কপাল বেয়ে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝড়ছে!

শিউরে উঠ্‌ল জমিদার। চীৎকার করে কি যেন বল্‌তে চাইলে। কিন্তু সে বুঝি একেবারে বোবা হয়ে গেছে। কোনো কথাই কণ্ঠ দিয়ে বেরুতে চায় না।

নীলকণ্ঠ আরো একটু এগিয়ে এসেছে। হাতের ইসারায় সে জমিদারকে ডাক্‌লে—

তার পেছন-পেছন আসতে ইঙ্গিত করলে।

জমিদার মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চল্লো সেই ছায়ামূর্ত্তিকে অনুসরণ করে।

নীলকণ্ঠ জমিদারের শয়নকক্ষে এসে ঢুকলো। স্তব্ধ বিস্মিত ও নির্ব্বাক জমিদার তার পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হল।

কি আশ্চর্য্য! নীলকণ্ঠ যে তার বন্দুকটা দেখিয়ে দিচ্ছে!

যন্ত্র-চালিতের মতো জমিদার হাতে তুলে নিল বন্দুক, টোটা ভর্ত্তি করলে বন্দুকে—তারপর আবার নীলকণ্ঠের নির্দ্দেশমতো ঘোড়ার আস্তাবলে এসে হাজির হল।

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সেরা ঘোড়াটিকে দেখিয়ে দিলে নীলকণ্ঠ।

কলের পুতুলের মতো জমিদার সেই ঘোড়ার ওপর চড়ে বস্‌ল।

ধনুক-থেকে-ছোঁড়া তীরের মতো উড়ে চল্‌লো জমিদারকে পিঠে নিয়ে সেই দ্রুতগতি অশ্ব।

আগে আগে চলছে নীলকণ্ঠের সেই ছায়ামূর্ত্তি।

কোথায় যেতে হবে,—কোন অঞ্চলে থাম্‌বে গিয়ে এই উল্কা-গতি ঘোড়া—কিচ্ছু জানে না জমিদার। ঘোড়ার গায়ের ফ্যানায় জমিদারের জামা-কাপড় ভিজে উঠল।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে আরোহী আর বাহনের।

অশরীরীর নির্দ্দেশে এগিয়ে চলে জমিদারের শিক্ষিত অশ্ব।

এ কী! এ যে একেবারে ঘোর আঁধার বন!

নিশির ডাকে কোন মরণের মুখে আজ ছুটে চলেছে জমিদার।

কিন্তু ফেরবার ত' আর উপায় নেই।

সারা জীবন নীলকণ্ঠ আদেশ পালন করেছে......আজ মরণের পারে গিয়ে সে জমিদারকে আদেশ করতে ফিরে এসেছে!

দুর্ব্বার সেই হুকুম!

অমান্য করবার উপায় নেই জমিদারের।

বনের কাঁটা গাছের আঁচড়ে হাত-পা ছড়ে গেল জমিদারের। তবু ঘোড়ার লাগাম টানা হয় না।

সামনেই যে নীলকণ্ঠের ছায়া আরো এগুতে বলে।

আঁধার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে শুধু জেগে ওঠে ঘোড়ার খুরের টগবগ—টগবগ শব্দ!

হঠাৎ দেখা গেল—বনের একেবারে মাঝখানে মশালের আলো জ্বল্‌ছে—একটি ভাঙা মন্দিরের সামনে।

প্রেতাত্মার ইঙ্গিত পেয়ে এইবার ঘোড়ার গতি মন্থর হয়ে আসে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ঘোড়া—অর সেই সঙ্গে তার পিঠে ঘর্ম্মাক্ত ও পিপাসার্ত্ত জমিদার।

নীলকণ্ঠের ছায়া একটি বড় বট গাছেদর আড়ালে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো। হাত তুলে কি ইসারা করে দেখালে মশালের আলোতে ঘিরে বসা মানুষগুলোকে।

জমিদাদর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখ্‌লে, তারই দেওয়া টাকা-কড়িগুলো ডাকাতদল ভাগ

করে নিচ্ছে। খুব ফিস্‌ফিসে গলায় ওরা কথা বলছে। দু'একজনের চাপা আপত্তিও কানে ভেসে এলো।

টাকার ভাগ নিয়ে বুঝি ডাকাতগুলোর মধ্যে কথা কাটা-কাটি শুরু হয়েছে।

নীলকণ্ঠের ছায়া প্রতিহিংসার জন্যে একবার দুলে উঠ্‌ল—তারপর হাত তুলে আবার কি বোঝাতে চাইলে—

এইবার জমিদার মরিয়া হয়ে বন্দুক তার হাতে তুলে নিলে—

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুড়ুম্—

তারপরই কয়েকটি কণ্ঠের মর্ম্মভেদী চীৎকার। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদের শব্দ.....

বাদ বাকিগুলো বুঝি ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

জমিদার বাঘের মতো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাম্‌নে—

আরো এক ঝাঁক গুলি বৃষ্টি!

রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা।

জমিদার টাকার থলিটা হাতে তুলে নিলে।

না, টাকা খোয়া যায় নি।

আবার এক লাফে ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠল জমিদার। তারপর নক্ষত্রগতিতে যে পথ দিয়ে এসেছিল—সেই পথেই ফিরে চল্লো—

জমিদারের টাকায় বিরাট এক দীঘি খনন করে হয়েছে। পল্লীবধূরা প্রতিদিন সাঁঝের বেলা কলসী ভরে জল নিয়ে যাচ্ছে—

পাঁচটি গাঁয়ের তৃষ্ণার জল!

জমিদার তার ভবনের পালঙ্কে শুয়ে আছে। অম্বুরী তামাকের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

হঠাৎ হাত থেকে নলটা খসে পড়ে গেল জমিদারের।

দুই চোখে এতদিন পর নেমে এসেছে ঘুম। জমিদার অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু এখনও গভীর রাত্রে কার আর্ত্তনাদ শুনে পাঁচটা গাঁয়ের লোকের রাতের ঘুম অকস্মাৎ ভেঙে যায়!

লোকে বলে নীলকণ্ঠের কান্না!

কিন্তু সে কান্নার স্বর ঘুমন্ত জমিদারের কানে পৌঁছয় না!

জৈষ্ঠ ১৩৬৪

চোরের আবার ভূতের ভয়

আশাপূর্ণা দেবী

"আর আমিই যেন কালিয়া-পোলাও খাচ্ছি।" গদাই ঝেঁজে উঠে বলে।

"আহা রাগারাগির দরকার কি—" হারু বলে, "আমি বলি কি—শহর ছাড়িয়ে একটু এদিক-ওদিক দেখলে হয় না?"

"কেন, শহর ছাড়িয়ে এদিক-ওদিকের লোকের খুব পয়সা আছে বুঝি? না কি তারা আমাদের জন্যে রাতে দরজা খুলে রেখে দেয়?"

গদাই বরাবর একটু রোখা, হারু ওরই মধ্যে একটু ঠাণ্ডা মেজাজ। বহুদিন থেকে দু'জনে একত্রে যুক্তি-পরামর্শ ক'রে 'জগতের সেরা ব্যবসাটি' চালিয়ে আসছে। কিন্তু ইদানীং ব্যবসা বড়ই মন্দা। এখন বড়লোকের বাড়ির দেয়াল-টেয়ালগুলো সব কংক্রীটের, উঠোনের পাঁচিলগুলো দু'মানুষ ভোর উঁচু, তাও একটু কোথাও ফাঁকা থাকলো তো কাঁচের টুকরো পুঁতছে, তারের জাল ঘিরছে, আরো কত কি। কোন্ ফাঁক দিয়ে তবে চুরি-কার্যটি সেরে নেবে এরা?

বেচারাদের ওইটাই তো জীবিকা?

হাসছো? আহা চোররা কি মানুষ নয়? খাবে না ওরা?

হারু বলে, "তা বলছি না, তবে ওসব দিকে বাড়িগুলো পুরনো-টুরনো, সিঁদ-কাঠিতে কাজ হতে পারে।"

গদাই মুখখানা সিঁটিয়ে দু'হাতে গা চুলকোতে চুলকোতে বলে, "কাজ আর ছাই হবে! চল দেখি, আজ পুল পেরিয়ে চেৎলার ওদিকে চলে যাই।"

"কিছু সন্ধানে আছে নাকি?" হারু বলে মহোৎসাহে।

গদাই ভারী মুখে বলে, "সন্ধানে-টন্ধানে কিছু নয়, তবে বলছিল রেমোটা ওখানে নাকি—।"

হারু বলে, "বাঃ, রেমো সন্ধান দিচ্ছে? তা' সে নিজে কেন চেষ্টা করছে না?"

"সে? তাকে জেল থেকে এসে অবধি এখন রোজ রাত্তিরে থানায় গিয়ে হাজরে দিতে হচ্ছে।"

হারু একটা বিরাট নিশ্বাস ফেলে বলে, "তা হবে বৈ কি! আমরা বেচারারা গরীব চোর কি না? আর এই রাজ্য জুড়ে যে কত চুরির কারবার চলছে—তার লোখা-জোখা আছে? কি ক'রে বুদ্ধি খাটিয়ে চুরিটি করবে এই চিন্তায় যত বুদ্ধিমান মাথা খাটছে, তা'তে কোন দোষ নেই কেমন? তারা যে বড়লোক চোর।"

গদাই ফের রেগে ওঠে, "আরে, বাবা রাখ, তোর বড় বড় কথা! কত রাত্তিরে বেরুবি তাই বল।"

হারু বলে, "যেমন বেরোই, রাত একটা-দেড়টা।"

"আচ্ছা।"

রাত দেড়টা নাগাদ চেৎলার পুলের ওদিকে দুই বন্ধু মিলিত হল। যথারীতি পরনে একটা ছোট হাফ প্যান্ট, সর্বাঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে তেল মাখা, মুখে ভুষোর কালি ঘষা। এই সাজ ক'রে আর মা কালীর নাম স্মরণ ক'রে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল গভীর অন্ধকারে।

তা' আজকে ওদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন! হঠাৎ দেখল একটা পুরনো পুরনো কিন্তু বেশ বড় বাড়ির খিড়কির দরজটা খোলা পড়ে রয়েছে।

"জয় মা কালী।"

বললো হারু ফিসফিস করে, "মনে হচ্ছে মা আজ মুখ তুলে চাইবেন।"

গদাই বলে, "চুপ। টুঁ শব্দটি নয়।"

মস্ত বড় বাড়িটা কত ঘর দরজা দালান, সব ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

আস্তে আস্তে, দু'জনে সুড়ুৎ ক'রে খোলা দরজা দিয়ে দালানে ঢুকে পড়ে! দালান থেকে ঘরে! আশ্চর্য আশ্চর্য! পর পর সমস্ত দরজাগুলোই খোলা। এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড জীবনে কখনো দেখেনি ওরা! স্বয়ং ভগবান কি হারু-গদায়ের দুঃখে বিগলিত হয়ে একে একে সব কপাট খুলে রেখেছেন? তাহলে ভাগ্যের কপাটও খুলে যাবে নাকি এবার?

হারু বাতাসে পাতা নড়ার মতো ফিসফিসিয়ে বলে, "কি রে গদা, হানাবাড়ি-টাড়ি নয় তো? আমার কিন্তু কেমন ভয় করছে।"

"থাম হেরো—" গদাই দাঁতে দাঁতে ঘষে বলে, "চোরের আবার ভূতের ভয়! আমার বিশ্বাস, যে ব্যাটা দোর বন্ধ করে, সে দৈবাৎ ভুলে গেছে—"

গদাই কথাটা শেষ না করতেই হারু চমকে উঠে বলে, "এ-ই কিসের শব্দ রে?"

শুনে গদাইও থমকায়।

সত্যিই কিসের শব্দ? হুঁ হুঁ, চিঁ চিঁ!

মানুষের? না ভূত প্রেত পেত্নী শাঁকচুন্নীর?

কান খাড়া করে শুনতে লাগল ওরা!

নাঃ, মানুষের ব্যাপারই বটে!

অন্ধকার ঘুটঘুটে এই বাড়িখানার কোন্ কোণের দিকের একটা ঘর থেকে খুব রুগ্ন মানুষের চিঁ চিঁ গলার আওয়াজ ভেসে আসছে, "কার পায়ের শব্দ রে? কেষ্ট এলি না কি? কেষ্ট! অ কেষ্ট! কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস? কখন থেকে একটু জল চাইছি।"

অন্ধকারে দু'জনে চুপচাপ!

খানিক পরে হারু বলে, "ব্যাপার বুঝতে পারছিস্? বাড়ির কোথাও কোনখানে একটা রুগী আছে, সেটাই 'জল জল' করে চিল্লা চিল্লি করছে।"

হারুর কথাই সত্যি।

সেই চিঁ চিঁ শব্দের মধ্যে থেকে শোনা যায়—"কেষ্ট অ কেষ্ট, গলাটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, জল দে একটু।"

আশ্চয্যি 'কেষ্ট'-নামক কাউকেই কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। না সাড়া না শব্দ!

"বাড়িতে ওই রুগীটা ছাড়া আর কেউ নেই!" হারু বলে।

গদাই বলে, "ওই কেষ্টটাই তা'হলে কোথাও গেছে।"

"ছেলে বোধহয় বুড়োর?"

"হ'তে পারে। কিন্তু মনে হচ্ছে মিথ্যে এলাম। এ বাড়িতে কি কিছু মিলবে?"

"আরে বাবা, এত বড় বাড়িতে বাসনপত্তরও কি কিছু নেই? চল না ওই পাশের ঘরটায়।"

যে ঘর থেকে আওয়াজ আসছিল তার পাশের ঘরে ঢুকে খুব সন্তর্পণে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালো গদাই। না, ঘরে কেউ নেই। কিন্তু জিনিসপত্রই বা কই? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো সেল্ফ,

একটা মস্ত লম্বা টেবিল, একটা মুখ-খোলা খালি কাঠের সিন্দুক সব খোলা হাঁ-হাঁ করছে। কোনখানে কিছু নেই।

"বাবা রে, যেন রূপকথার গল্পের মতন নিঝুমপুরী প'ড়ো বাড়ি!" বললো গদাই।

"চ পালাই! আর দরকার নেই বাবা!" হারু বলে।

"পালাবি? হেস্তনেস্ত একটা না দেখেই?"

ততক্ষণে সেই চিঁ চিঁ কণ্ঠ যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "কে, কে, পাশের ঘরে কে কথা কইছে? কেষ্টা এলি? এলি তো আমার কাছে আয়।"

"নাঃ, বুড়োটা জ্বালালে!" বললো গদাই, "চেঁচামেচি শুনে কে কম্‌নে থেকে এসে পড়বে। গলাটা টিপে দিয়ে শেষ ক'রে ফেললেই আপদ চোকে!"

"কী আপদ!" হারু বলে, "কোথাও কিছু জুটবে কি না, তাই বুঝতে পারছি না, আর এ ছোঁড়া কিনা খুনের দায়ে ফাঁসি যেতে চায়। চল না দেখিগে ও ঘরে। রুগ্ন বুড়োটা একা অমাদের দু'জনের আর কি করবে?"

"তা' সত্যি, আর তেমন কিছু করে, গলা টিপে দেওয়া তো আছেই হাতে।" গম্ভীরভাবে বলে গদাই।

অতএব সাহসে ভর ক'রে দুই স্যাঙাৎ এ ঘরে ঢুকে এসে দাঁড়ায়।

ঘরে মিটমিট ক'রে একটি প্রদীপ জ্বলছে, চৌকির ওপর একটি জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ কি অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে? নইলে এরা দোরের পাশে দাঁড়াতে ও বলে উঠল কেন, "কে? কে? ওখানে কে?"

বলা বাহুল্য—এরা চুপ!

এবার বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ওঠে, "কেন এমন করছিস কেষ্ট? কাকে এনেছিলস? কার সঙ্গে কথা কইছিস? কানা অন্ধ মানুষের সঙ্গে কি তোর তামাসার সম্পর্ক? তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক গেলাস জল দে বাবা!"

কানা অন্ধ!

চমকে ওঠে হারু-গদাই!

একটা বিরাট দৈত্যের মত বাড়িতে শুধু একটা অন্ধ বুড়ো?

এমন তো কখনো দেখা যায় না!

কিন্তু। অন্ধ যখন, তখন আর ভয় কী? ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা।

পায়ের শব্দে বুড়ো হঠাৎ আর একবার চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে, "ওরে হতভাগা কেষ্টা, তুই কি আমায় মেরে ফেলতে চাস? তবে দে, গলাটা টিপে একবারে শেষ করে দে। হা ভগবান! অন্ধ হয়েও যে কেন মানুষে বেঁচে থাকে!"

হারু এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। বুড়োর কাছে গিয়ে বলে, "কেষ্ট কে?"

"কেষ্ট? কেষ্টই আমার সব! আমার অন্ধের নাড়ি।" বুড়ো ভদ্রলোক হতাশভাবে বলে, "সে আমার পুরনো চাকর! কিন্তু তোমরা কে? তোমরা কি কেষ্টর—কিন্তু যেই হও, আগে আমায় এক গ্লাস জল দাও বাবা।"

হারু ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে জলের কুঁজো রয়েছে একটা। জল ঢেলে বুড়োর কাছে এসে হাতে ধরিয়ে দেয়।

জল খেয়ে বুড়ো একটা 'আঃ' শব্দ ক'রে বলে ওঠে, "তোমরা কে? বল না গো? চোখে দেখতে পাইনে, কেষ্টা কোথায় চলে গেল বলে গেল না, আমি কি করব। সে যে আমার ছেলে বলতে

ছেলে, নাতি বলতে নাতি। না বলে কয়ে কোথায় গেল!”

কেষ্টা যে কোথায় চলে গেছে এতক্ষণে আর বুঝতে বাকী নেই এদের। কারণ মিটমিটে আলো চোখে সইতে সইতে ঘরের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে একটা দেরাজ, একটা আলমারি ও কয়েকটা বাক্স। সব খোলা হাঁ হাঁ করছে, ভিতরে একটুকরো মাত্রও জিনিস নেই।

গদাই চাপা গলায় বলে, “দেখছিস? দেখছিস কাণ্ড? শুনলি তো কেষ্টা না কি এনার পুরনো-চাকর! হা ভগবান! আমরা তিন-পুরুষে চোর তাও বোধহয় এমনটা পারতাম না!”

বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বলে, “কি বলছ তোমরা চুপি চুপি?”

গদাই শান্তভাবে বলে, “কিছু না বাবু, বলছি কেষ্ট হঠাৎ দেশ থেকে চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেছে, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আপনার কাজ করতে।”

“আর ও কে? আর একজন? যার সঙ্গে কথা কইছ তুমি?” বৃদ্ধ সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলে।

গদাই তেমনি শান্তভাবে বলে, “ও আমার বন্ধু। ওর ইচ্ছে হয় এখানে থাকবে, ইচ্ছে হয় পুরনো কাজে ফিরে যাবে।”

বুড়ো ভদ্রলোক আন্দাজে হাতটা বাড়িয়ে গদাইয়ের গায়ে ঠেকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, “তুমি আর কেষ্টর মতন চলে যাবে না তো?”

“না বাবু! মরবার আগে নয়।”

হতভম্ব হারু হঠাৎ গদাইয়ের হাতটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের বাইরে এনে চাপা উত্তেজিতভাবে বলে, “এটা কি হল রে গদাই?”

চিরকাল রোখা গদাই শান্তভাবে বলে, “কিছু না! চুরি আর করবো না ঠিক করলাম।”

“কারণ?”

“কারণ? কারণ কি জানিস হেরো, চিরদিন চুরির আগের অবস্থাটা দেখেছি, চুরির পরের অবস্থাটা কখনোও দেখিনি। দেখে বুঝছি, কী নোঙরা কী কুচ্ছিৎ কাণ্ডই না করে আসি আমরা।”

“তা'হলে এবার থেকে সৎপথে?”

“দেখি! রাগ করিসনে ভাই।”

“রাগ আবার কী?” হারু স্থিরভাবে বলে, “আমিই কি আর চুরির দিকে যাচ্ছি নাকি? অন্ধ বুড়োটাকে খাওয়াতে-পরাতেও হবে তো? দু'জনে মিলে মোটটোট বয়ে যা' হোক ক'রে—”

চৈত্র ১৩৬৫

মুরারিবাবুর দেখা লোকটা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যায় তুলকালাম বৃষ্টি! সেই সময় আড্ডাটা জমেছিল ভালো। ইতিমধ্যে গোপালবাবুর কাজের লোক কানুহরি ছাতার আড়ালে মুড়ি আর তেলেভাজা এনেছিল। বৃষ্টিতে বেচারার একেবারে কাকভেজা অবস্থা। ভিজে কাপড় বদলে নিয়ে বাড়ির ভিতর থেকে সে এবার ট্রে-ভর্তি চা আনবে। ঠিক এই সময়ে মুরারিবাবু আর জিতেনবাবুর মধ্যে কী সূত্রে তর্কটা বেধে গেল অন্যেরা খেয়াল করেননি।

জিতনবাবু বললেন—বোগাস! আমি বলছি নেই।

মুরারিবাবু বললেন—আমি বলছি আছে।

—সায়েন্সকে তুমি অস্বীকার করতে পারো?

—রাখো তোমার সায়েন্স! আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর তুমি বলছ নেই!

—তুমি ভুল দেখেছ! সাইকোলজিতে হ্যালুসিনেশন বলে একটা কথা আছে জানো? দৃষ্টিবিভ্রম।

—রাখো তোমার সাইকোলজি!

গোপালবাবু গৃহকর্তা। বন্ধুদের মধ্যে কী নিয়ে তর্ক হচ্ছে তা না জানলে কেমন করে মিটিয়ে দেবেন? তাই তিনি বললেন, আহা! ব্যাপারটা কী?

জিতেনবাবু বাঁকা হেসে বললেন—ভূত! যে যুগে মানুষ চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, মঙ্গলগ্রহে স্পেসশিপ পাঠিয়েছে, সেই যুগে মুরারি বলছে কি না ....যতঃসব উদ্ভট কথাবার্তা!

মুরারিবাবুও আরও বাঁকা হেসে বললেন—তুমি তো কলকাতায় সারাটা জীবন কাটাচ্ছ! কখনও আমার মতো গ্রামেগঞ্জে থেকেছ? আমার মতো একলা রাত-বিরেতে নিরিবিলি জায়গায় কখনও ঘুরেছ?

নাড়ুবাবু টিপ্পনি কাটলেন।—ঠিক বলেছ ভায়া। কলকাতা একটা মহানগর। সবসময় আলো আর ভিড়ভাট্টা। এখানে ভূত আসবে কোন সাহসে?

কানুহরি চায়ের কাপপ্লেটভর্তি ট্রে রেখে গেল। চা খেতে খেতে তর্কটা ধামাচাপা পড়েছিল। কিন্তু নাড়ুবাবুই আবার সেটা খুঁচিয়ে দিলেন।—জিতেন বলছে ভূত নেই। আর মুরারি বলছে আছে। বেশ তো! মুরারিই বলুক, সে কোথায় ভূত দেখেছে।

গোপালবাবু সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ। বৃষ্টিটা বেশ জমে উঠেছে। মুরারি! তুমি গল্পটা বলো।

মুরারিবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—গল্প নয়। একেবারে সত্যিকার ঘটনা। বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছে।

নাড়ুবাবু বললেন—কী বলছ ভায়া? আজ অবধি তোমার মুখে একটা মিথ্যা কথা শুনিনি। তুমি বলো। শোনা যাক। তারপর তিনি জিতেনবাবুকে বললেন—জিতেন! তুমি কিন্তু স্পিকটি নট। চুপচাপ বসে থাকবে।

মুরারিবাবু চা শেষ করার পর বললেন—সে প্রায় বছর পনেরো-ষোলো আগের কথা। তখন আমি সরকারি চাকরি করি। নদিয়া জেলার বাবুগঞ্জে আমার অফিস। আমার কাজ ছিল ওই অঞ্চলের গ্রামে-গ্রামে ঘুরে সরকারি সাক্ষরতা প্রকল্পে কতটা কাজ হচ্ছে, তার হিসাব নেওয়া। বাবুগঞ্জ অফিসে

একটা মাত্র জিপগাড়ি ছিল। সেটা ব্যবহার করতেন আমার উর্ধ্বতন অফিসার। আমি কখনও সাইকেলে, কখনও বাসে, আবার কখনও ট্রেনে চেপে বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াত করতুম।

নাড়ুবাবু বললেন—আহা! ভূত দেখার ব্যাপারটা বলো।

মুরারিবাবু একটু চটে গিয়ে বললেন—আগে ব্যাকগ্রাউন্ড না বললে তো বুঝবে না।

—ঠিক আছে। ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝা গেল। এবার ভূতের ব্যাপারটা শোনা যাক।

মুরারিবাবু দরজার বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন—মে মাসের মাঝামাঝি হবে। হ্যাঁ—সেদিন ছিল বুদ্ধপূর্ণিমা। বাবুগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে ঝাঁপুইহাটি নামে একটা গ্রামে গিয়েছিলুম। স্টেশনটা মাঠের মধ্যে। সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় গ্রামে পৌঁছুলুম। তখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। মোটে চারটে স্টেশন দূরত্ব। ট্রেনের স্পিড কেমন তা বোঝো তাহলে। আসলে আগের বছর প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। রেললাইন তখনও ঠিকমতো সারানো হয়নি।

গোপালবাবু বলে উঠলেন—কী কাণ্ড! তোমার ভূত আসতে বড্ড দেরি হচ্ছে মুরারি!

নাড়ুবাবু টিপ্পনি কাটলেন—সেই ট্রেনের স্পিডের মতো!

মুরারিবাবু বললেন—ঝাঁপুইহাটির পঞ্চায়েত-কর্তার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করলুম। বিকেলে সাক্ষরতা প্রকল্পের কাজকর্ম খাতাকলমে দেখলুম। দু-একজনকে ডেকে ব্ল্যাকবোর্ডে নাম লিখতেও বললুম। কিন্তু বুঝতে পারলুম, খাতাকলমের সঙ্গে আসল কাজের মিল নেই। কী আর করা যাবে? মুখে উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে হলো। বাবুগঞ্জ ফেরার ট্রেন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। পঞ্চায়েত-কর্তা খাতির করে আমাকে তাঁর মোটর সাইকেলে চাপিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সাহস পেলুম না। রাস্তার যা অবস্থা।

নাড়ুবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—ভূত!

—এবার সেই ঘটনায় আসছি। স্টেশনে পৌঁছে খোঁজ নিলুম। ডাউন ট্রেন সময়মতো আসার গ্যারান্টি নেই। স্টেশনে কয়েকজন মাত্র যাত্রী অপেক্ষা করছিল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খোলা জায়গা বলে উত্তাল বাতাস বইছে। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে খালি বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালুম।

গোপালবাবু বললেন—তুমি সিগারেট খেতে নাকি? কী করে ছাড়লে বলো তো মুরারি?

নাড়ুবাবু গম্ভীর গলায় ফের বললেন—ভূত!

মুরারিবাবু বললেন—বসে আছি তো আছি। সাতটা দশ বেজে গেল। ট্রেনের পাত্তা নেই। এমন সময় একটা লোক এসে বলল, 'বেঞ্চিতে একটু বসতে পারি স্যার!' লোকটার চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছিল। পরনে খাটো ধুতি আর হাফশার্ট। পায়ে যেমন-তেমন একটা স্যান্ডেল। বললুম, 'নিশ্চয় বসতে পারো। বেঞ্চটা তো খালি আছে।' লোকটা বেঞ্চের শেষপ্রান্তে বসল। তারপর বলল, 'এখন যদি আমি একটা বিড়ি খাই, কিছু মনে করবেন না তো স্যার।'এ তো দেখছি বিনয়ের অবতার। বললুম, 'তুমি বিড়ি খাবে, তাতে আমার মনে করার কী আছে?' লোকটা পকেট থেকে দেশলাই বের করে আগুন জ্বেলে বিড়ি ধরাল। ওই একটুখানি আলোয় দেখলুম, লোকটার মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি আর বাঁ দিকের গাল থেকে গলা অবধি ক্ষতচিহ্ন। তার মুখটা দেখে কেন যেন একটু অস্বস্তি জাগল। তার গায়ের রঙও কুচকুচে কালো। কেউ নিশ্চয় লোকটার গাল ও গলায় চপারের কোপ মেরেছিল।

গোপালবাবু বললেন—তাহলে লোকটা খুনখারাপিতে মরে যাওয়ার পর ভূত হয়েছিল?

মুরারিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—আহা, পুরোটা বলতে দাও।

নাড়ুবাবু বললেন—হ্যাঁ বলো।

মুরারিবাবু বললেন—লোকটা বিড়ি টানতে-টানতে বলে, 'স্যারের যাওয়া হবে কোথা?' বিরক্ত

হয়ে বললুম, 'বাবুগঞ্জ।' লোকটা কেমন অদ্ভুত শব্দ করে হাসল। তারপর বলল, 'বাবুগঞ্জ'? এ লাইনে এই এক বিচ্ছিরি ব্যাপার। বাবুগঞ্জ থেকে আসবার ট্রেন পাওয়া যত সোজা, ফিরে যাওয়ার ট্রেন পাওয়া তত কঠিন। দেখুন না ট্রেন কখন আসে। এমন হতে পারে এ রাত্তিরে ট্রেন আর এলই না।' অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী!' সে আবার সেইরকম বিদকুটে হেসে বলল, 'এই যে আমাকে দেখছেন। রোজ ঠিক সন্ধেবেলা বাবুগঞ্জ যাব বলে স্টেশনে এসে বসে থাকি। ট্রেন আর আসে না। রেলের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে স্যার!' এতক্ষণে সন্দেহ হলো, লোকটা নিশ্চয় পাগল। তাই চুপচাপ বসে রইলুম। লোকটা বকবক করে যাচ্ছিল। ইচ্ছে হলো, তাকে ধমক দিয়ে উঠে যেতে বলি। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলুম না। বলা যায় না, কোনও গুণ্ডাবদমাশ হতে পারে। আমার হাতে একটা অ্যাটাচি কেস। টাকা আছে ভেবে হয়তো সে এটা কেড়ে নিয়ে পালানোর ফিকিরে এখানে এসেছে। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে বসা আমার উচিত হয়নি। এই ভেবে উঠে যাব ভাবছি, স্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল। অমনই লোকটা বলল, 'দেখছেন তো? বাবুগঞ্জের দিক থেকে ট্রেন আসছে। ওই দেখুন সিগন্যালবাতি নীল হলো।' লক্ষ্য করে দেখলুম, সত্যি তাই। লোকটা বলল, 'এইজন্যে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে স্যার। বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এ কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।' একটু পরে স্টেশনের কাছে ক'জন যাত্রীকে প্ল্যাটফর্মের সামনে যেতে দেখলুম। তারপর সত্যিই ডাউনের দিক থেকে ট্রেনের আলো দেখা গেল। তারপর ট্রেনটা হুইস্‌ল্ দিতে দিতে স্টেশনে ঢুকছিল। এই সময় দেখলুম, বেঞ্চ থেকে লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে। তারপরই ঘটে গেল ভয়ংকর ঘটনা। ট্রেনটা এসে আমার সামনে দিয়ে খানিকটা এগিয়ে থামবার আগেই লোকটা ইঞ্জিনের সামনে লাইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুরারিবাবু চুপ করলে নাড়ুবাবু বললেন—এ তো সুইসাইড কেস। তোমার ভূত কোথায়?

জিতেনবাবু এতক্ষণে সকৌতুকে বলে উঠলেন—সবে তো লোকটা মারা পড়ল। ভূত হতে একটু সময় লাগবে না?

মুরারিবাবু তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। তাঁকে এবার কেমন নিস্তেজ দেখাচ্ছিল। আবার একটা শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন—কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! অমন একটা ঘটনা ঘটে গেল। ড্রাইভারের তো চোখে পড়ার কথা। কিন্তু কোনও হইহল্লা শুনলুম না। ট্রেনটা হুইস্‌ল্ দিয়ে দিব্যি চলে গেল। তখন আমি আতঙ্কে উত্তেজনায় বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। লোকটার রক্তাক্ত, হাড়গোড়ভাঙা লাশ নিশ্চয় নিচে লাইনে পড়ে আছে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখতেও ভয় করছে। এমন সময়ে রেলের একচোখো লণ্ঠন হাতে একজন খালাসিকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলুম। সে ভেবেছিল আমি বিনা টিকিটের যাত্রী। আমার কাছে এসে সে টিকিট দাবি করতেই বললুম, 'আমি যাব বাবুগঞ্জ। আমার টিকিট আছে। কিন্তু এক্ষুণি একটা লোক ওইখানে ইঞ্জিনের সামনে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড করেছে।' সে অবাক হয়ে বলল, 'সে কী? কখন?' বললুম, 'গিয়ে দেখ! লাইনে তার লাশ পড়ে আছে।' খালাসিটা লণ্ঠন হাতে প্ল্যাটফর্মের নীচে লাইনে আলো ফেলে এদিক-ওদিক দেখার পর বলল, 'কোথায় লাশ? আপনি টিকিট কাটেননি। তাই আজেবাজে কথা বলে কেটে পড়ার তালে আছেন।' খাপ্পা হয়ে তাকে আমার টিকিট দেখালুম। তখন সে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি ভুল দেখেছেন স্যার।' মাথায় জেদ চেপে গেছে আমার। তাকে বললুম, 'লাশটা ইঞ্জিনের চাকার ধাক্কায় হয়তো দূরে ছিটকে গেছে। চলো। খুঁজে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

গোপালবাবু বললেন—লাশ দেখতে পেলে?

—নাঃ! অনেক খোঁজাখুঁজি করে লাশ তো দূরের কথা রেললাইনে রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলুম না। আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে আমার শরীর তখন অবশ। খালাসি বলল, 'ডাউন ট্রেন আসতে

আজ একটু দেরি হবে স্যার। আপের স্টেশনে মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এবার মালগাড়ি পাস হবে। তারপর ডাউন ট্রেন আসবে।' যাই হোক, সে স্টেশনের দিকে চলে যাওয়ার পর সেখানে দাঁড়াতে আর সাহস হলো না। স্টেশনের কাছাকাছি একটা বেঞ্চের উপর গাছের ছায়া পড়েছিল। সেই বেঞ্চে গিয়ে বসলুম। তারপর দেখলুম, বেঞ্চের অন্য প্রান্তে কেউ বসে আছে।

নাড়ুবাবু বল উঠলেন—সেই লোকটা নয় তো?

মুরারিবাবু বললেন—হ্যাঁঃ! সেই ব্যাটাচ্ছেলে! আমি যেই বসেছি, অমনই সে সেইরকম বিদকুটে হেসে বলল, 'খালাসির সঙ্গে রেললাইনে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন স্যার?' তখন আর ভয়-টয় নেই আমার। রাগে মাথায় আগুন ধরে গেছে। বললুম, 'তুমি দেখছি এক্কেবারে ম্যাজিশিয়ান। আমাকে ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়ল!' লোকটা বলল, 'না স্যার। ম্যাজিক জানলে তো কত টাকা রোজগার করে বড়লোক হয়ে যেতুম। আসলে কী জানেন স্যার? বাঁচতে আমার আর একটুও ইচ্ছে নেই।' তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'তোমার নাম কী? বাড়ি কোথায়?' লোকটা বলল, 'কিচ্ছু মনে নেই। সব ভুলে গেছি।' এবার মনে হলো, লোকটা সত্যিই পাগল। আর তাকে যে আপ ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছিলুম, সেটা নিশ্চয় আমার চোখের ভুল। প্রচণ্ড শব্দ করে ট্রেনটা আসছিল। এ সময় ট্রেনের দিকেই আমার মনোযোগ থাকা স্বাভাবিক। লোকটার কথা শুনে আর হঠাৎ উঠে যাওয়া দেখে ব্যাপারটা আমি কল্পনাই করেছিলুম।

জিতেনবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। —তা হলে কী দাঁড়াল? বলছিলুম না ভূতের ব্যাপারটা সাইকোলজিকাল। হ্যালুসিনেশন।

মুরারিবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।

নাড়ুবাবু বললেন—তাহলে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলো। বৃষ্টি থেমে গেছে মনে হচ্ছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

মুরারিবাবু বললেন—লোকটা আবার বকবক করতে থাকল। কান দিলুম না। একটু পরে দেখলুম, আপের সিগন্যাল নীল হলো। স্টেশনমাস্টার বেরিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একচোখো লণ্ঠনে নীল রঙের আলোটা নাড়তে থাকলেন। তারপর মালগাড়ির ইঞ্জিনের আলো দেখা গেল। আলোর দিকে তাকিয়ে আছি। তারপর ইঞ্জিনটা যেই কাছাকাছি এসেছে, অমনি বেঞ্চ থেকে লোকটা আগের মতো উঠে দৌড়ে গিয়ে রেললাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গোপালবাবু বললেন—তারপর? তারপর?

—নাঃ! আমার চোখের ভুল নয়। মালগাড়িটা ধীরে-সুস্থে স্টেশন পেরিয়ে গেল। আমি তার আগেই বেঞ্চ থেকে উঠে স্টেশনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। স্টেশনের বারান্দায় কয়েকজন যাত্রী বিরক্ত হয়ে স্টেশনমাস্টারকে ঘিরে ধরে ডাউন ট্রেনের কথা জিজ্ঞেস করছে আর রেল দফতরের মুণ্ডুপাত করছে।

নাড়ুবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন—এই তোমার ভূত?

মুরারিবাবু বললেন—না। শেষটুকু শোনো। তবে না বুঝবে?

—বেশ। বলো।

—বাবুগঞ্জ ফেরার ডাউন ট্রেন এল রাত প্রায় সাড়ে আটটায়। ট্রেনে ভিড় ছিল। তবে যে কম্পার্টমেন্টে উঠেছিলুম, একটা সিট পেয়ে গেলুম। ট্রেন ছাড়ল। একটা করে স্টেশন আসছে আর ভিড় একটু করে ফাঁকা হচ্ছে। বাবুগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছুনোর আগে হঠাৎ দৃষ্টি গেল আমার বাঁদিকে একটু তফাতে। বেঞ্চের কোণে হেলান দিয়ে বসে আছে সেই লোকটা! হ্যাঁ—সে-ই বটে। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। গায়ে ছাইরঙা হাফশার্ট। পরনে খাটো ধুতি। বাঁদিকের গাল গলা পর্যন্ত দাগড়া-দাগড়া ক্ষতচিহ্ন। সে আমার দিকে এবার তাকাল। হিংস্র দৃষ্টি। চোখ দুটো নিষ্পলক। আতঙ্কে আমার

শরীর তখন প্রায় অবশ। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম। একটু পরে বাবুগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ানো মাত্র আমার পিছনের দিকের দরজা দিয়ে নেমে গেলুম।

গোপালবাবু বললেন—হ্যাঁ। তাহলে লোকটাকে ভূতই বলতে হবে।

নাড়ুবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—ভূত। হাড্রেড পারসেন্ট ভূত!

জিতেনবাবু বাঁকা হেসে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—ওহে গোপাল! আমি একবার বাথরুমে যাব।

গোপালবাবুর বাড়িটা পুরনো আমলের। এই বসার ঘরের সংলগ্ন বাথরুম নেই। পিছনের দিকে এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় ফল-ফুলের গাছ আর ঝোপঝাড় আছে। বাউন্ডারি পাঁচিল ঘেঁষে একটা বাথরুম আছে। সেদিকের দরজা খুলে বেরুলেন জিতেনবাবু। গোপালবাবু বললেন—ওই সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দাও জিতেন।

জিতেনবাবু বললেন—আমার আলোর দরকার নেই। তবে বৃষ্টিতে জায়গাটা পিছল হয়ে আছে। বলে তিনি ঘুরে এসে সুইচ টিপে দিলেন। তারপরই তাঁর চিৎকার শোনা গেল।—কে রে? কে ওখানে? কানুহরি? অ্যাঁ! এ কী! এ আবার কে? ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক! গোপাল! গোপাল! গো-গো-গো-ও-ও!

সবাই সেই দরজা দিয়ে ছুটে গেলেন। জিতেনবাবু সিঁড়ির নিচে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি জলে-কাদায় নোংরা। ধরাধরি করে তাঁকে ঘরে এনে চোখেমুখে জল ছেটানোর পর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি অতিকষ্টে বললেন—হ্যালুসিনেশন। মানে—মুরারির দেখা অবিকল সেই লোকটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।.......

শারদীয়া ১৪১০

ভূত তাড়ানোর নতুন দাওয়াই

হিমানীশ গোস্বামী

ভালো ঠেকছে না সুরেশ, ভালো ঠেকছে না। বললেন সুবিন্দুবাবু তামাক টানতে টানতে আর সুরেশ মামার মাছ ধরা দেখতে দেখতে। সুরেশ মামা বললেন, তোমার আবার কী হল সুবিন্দু, তোমার তো সুখের সংসার। সকালে ঘুম থেকে উঠলেও চলে, না উঠলেও চলে—যত পার ঘুমতে পার, গড়াগড়ি দিতে পার, আটটার সময় চা চলে আসে, হাঁকডাক করতে হয় না। দুই ছেলে উপার্জন করছে, টাকা পাঠাচ্ছে—আর তুমি ইচ্ছে করলেই ছিপ নিয়ে, টোপ নিয়ে গঙ্গানন্দপুরের পুকুরে কি চন্দনা নদীর ঘাটে বসে যখন খুশি মাছ ধরতে পার, দুপুরে বাড়িতে না ফিরলে শম্ভু সাইকেলে করে বৌমাদের রান্না দারুণ সব খাবার পাঠিয়ে দেয়। আর আমাকে দেখ—বলে তিনি হুঁকোয় মুখ দিলেন।

সুরেশ মামা চন্দনা নদীতে মাছ ধরছিলেন। চোখ ফাতনার দিকে। কথাবার্তা বললে মাছ টোপ খায় না, সরে পড়ে মানুষের আওয়াজে। সেটা অবশ্য সুবিন্দুবাবুকে বলেন না। তিনি কেবল বলেন, ভালো আর এই বয়সে কার লাগে বলো তুমি। সকলেই পরের সুখ বেশি দেখতে পায়। তোমার সুখও কী কম হে! বলতে বলতেই তার মনে হল ফাতনাটা বোধহয় একটু নড়ল। তারপর ফাতনাটা টুপ করে জলে ডুবে গেল—আর সঙ্গে সঙ্গে দিলেন এক টান। উঠে এল কেবল ছিপখানাই, ছিপের সঙ্গে লাগানো সুতোর সঙ্গে টোপ নেই, বঁড়শি নেই, অবশ্য ফাতনাটুকু আছে। সুরেশ মামা বললেন, দেখেছ সুবিন্দু, কী বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে। আজ এই নিয়ে তিন তিন বার সুতো কেটে গেল ছিপ ধরে টানতেই। সুবিন্দুবাবু সুরেশ মামাকে বললেন, অনেক দিন জলে ভিজে ভিজে সুতো পচে গেছে। কুষ্টে থেকে ভালো সুতো আনাও, মোহিনী মিলের কালু চাটুয্যে তো ওখানেই কাজ করে। সপ্তাহে একদিন বাড়ি আসে, ওকে বলো, সবচেয়ে ভালো সুতো ও এনে দেবে। ও সুতোর ভালো-মন্দ সব জানে।

কী বলছ তুমি সুবিন্দু, সুতো যা আমি ব্যবহার করি, তার চেয়ে ভালো সুতো আর হয় না। এক টাকায় পঞ্চাশ গজ—তিন মাস আগে কলকাতা বন্দর থেকে নামানো হয়েছে। সুবিন্দুবাবু বললেন, আসলে কী হচ্ছে জানো, আমাদের এই কালকেপুর গ্রামে আর থাকা চলবে না, এখানকার পাট তুলে দিতে হবে। কয়েকদিন আগে আমি পদ্মা নদী নৌকোয় পার হবার সময় শুনলাম বকুল মাঝি বলছিল এবারে নাকি পদ্মায় ইলিশ তেমন মিলছে না। বোঝা যাচ্ছে নদীতে মাছ আছে কিন্তু জাল ফেললে দেখা যাচ্ছে কিচ্ছু না। হঠাৎ হঠাৎ দু'একটা মাছ জুটছে কারও ভাগ্যে। এটা তো হবার কথা নয়, সুরেশ। এখন বর্ষার সময়। গত বছরেও কত মাছ ছিল, এক পয়সায় একটা ছোট মাছ বিক্রি হত। এবারে মাছই নেই। এক একটা ছোট ইলিশ ওরা বিক্রি করছে—শুনলে অবাক হবে ভাই, চার চার আনায়। একটা দু'সেরি মাছ তো গোয়ালন্দে নিলাম হয়ে যাবার দাখিল। দুই জমিদারের মধ্যে দর-কষাকষি। শেষে দর উঠল একুশ টাকায়। যখন ডাক থামল তখন ভবানীপুরের জমিদার শিবশম্ভু চৌধুরীর খেয়াল হল তাঁর কাছে দুটো টাকাও নেই, ওদিকে কুড়ি টাকা দর হেঁকেছিলেন লাল মিঁয়া—তাঁর পকেটে মাত্র দেড় টাকা। শিবশম্ভু বিপদে পড়েছেন দেখে লালা মিঁয়া হাসতে লাগলেন—সে কী হাসি! তখন দুজনে মিলে জেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওই সাড়ে তিন টাকা দিয়ে মাছটিকে কেটেকুটে দু'ভাগে ভাগ করে এক একজন এক ভাগ নিয়ে বাড়ি গেলেন।

বল কী সুবিন্দু! এসব তো আমি জানতামই না—এটা জানতাম বাজারে ইলিশ উঠছে না। ঠিক আছে আমাদের গ্রামে কি মাছের অভাব? বর্ষাকালে রয়েছে বড় বড় কই, মাগুর, জিওল, সরপুঁটি, চুনোপুঁটি, বড় বড় কাংড়া, ঝাঁকে ঝাঁকে চিংড়ি, কালবাউস, চিতল..........

সুবিন্দুবাবু বললেন, চিতল মাছ? একটাও পাওয়া যায় না। চিতল না, ট্যাঁই না, বোয়াল না, ওই যে কী বলে তপস্বী মাছ না, পদ্মায় কোনো মাছই দিন দশ-বারো হল কোথায় উধাও হয়েছে। তার উপর বেলগাছের উপদ্রবও শুরু হয়েছে।

বেলগাছের উপদ্রব? বললেন সুরেশ মামা। সে আবার কী? তিনি জিগ্যেস করলেন বটে কিন্তু তিনি ব্যাপারটা নিজেও যে জানেন না তা নয়। বেলগাছেরা যে উপদ্রব করছে এটা তাঁরও অজানা নয়।

সুবিন্দু বাবু বললেন, এখানে ওসব কথা নয়। কে কোত্থেকে শুনে-টুনে ফেলবে, চলো তোমার বাড়িতেই। তোমার সাইকেলের পিছনে বসেই চলে যাব, চার মিনিটে পৌঁছে যাব। সেখানে একটু চা-ফা খেয়ে বেশ জমিয়ে সব বলা যাবে। তবে কি জানো, এ তো আর জমিয়ে গল্প বলার বিষয় নয়।

চায়ের সঙ্গে কুমড়োর পোড়ের ভাজা খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল। এই ঘোর বর্ষায় চায়ের সঙ্গে লুচি আর ইলিশ মাছের ভাজা ডিমই ছিল একরকম বিকেলের জলখাবার। সরষের তেল দিয়ে মুড়ি মেখে কড়াইতে একটু গরম করে সঙ্গে পেঁয়াজিও বেশ চলত মধ্যবিত্তদের বাড়িতে। সুবিন্দুবাবু বলেন, দশ-বারো দিন আগেকার কথা বলি শোনো। মন দিয়ে শোনো। জানো তো, আমাদের বাড়িতে একটা বড় বেলগাছ আছে? কথা নেই বার্তা নেই, একদিন সকালে উঠে দেখি এই বারবাড়ির ঠিক পেছনে একটা চার হাত বেলগাছ। তার আগের দিনও সেটা সেখানে যে ছিল না সেটা আমি হলফ করে বলতে পারি। এত তাড়াতাড়ি বেলের বীচি থেকে এতবড় গাছ রাতারাতি যে গজাতে পারে না সেটা বুঝেই আমার মনে একটা সন্দেহ হল। ভাবলাম কেউ আমাকে না জানিয়ে একটা বেলের চারা পুঁতেছে। একেবারে বাড়ির গায়ে লাগালে গাছটা বড় হলে জানলা দিয়ে আর আলো আসবে না, অতএব পরদিন ওটাকে সরাব বলে ঠিক করলাম। পরদিন সকালে বারবাড়িতে বসে আছি, দু-একজন বন্ধু এলেন—ওই রঘু, কানাই আর বীরেশ। ওঁদের সঙ্গে খানিক গল্পগাছা করার পর ওঁরা চলে গেলে আমি বেলগাছটিকে দেখে আরও অবাক হলাম। গাছটা আরও দু'হাত লম্বা হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে গাছটিকে উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম—কিন্তু সে কী সাংঘাতিক ব্যাপার! যতই টানি ততই আমি হাঁপিয়ে পড়ি। তখন দীপেনকে ডাকলাম। দীপেন তখন ছাত্র পড়াচ্ছিল—সে এল। বললাম, দীপু, এই গাছটাকে তুলে ফেলতে হবে। আমি একা পারছি না, তুই একটু সাহায্য কর দেখি। দীপু তো অবাক! বলল, এতবড় গাছ কবে লাগালে বাবা? আমি বললাম, আমি লাগাব এখানে বেলগাছ? আর লাগাই যদি আমি তাহলে এটাকে ওপড়াবই বা কেন? না রে, আমি লাগাইনি, আর সেটাই তো দুশ্চিন্তার কথা। তাছাড়া বেলগাছ ছোট্ট একটা বেলগাছ তাকে ওপড়ানো এত কঠিনই বা হয় কেমন করে? বুঝলে সুরেশ মামা, এসব গিয়ে ওনাদের কীর্তি।

ওনাদের কীর্তি! মানে?

মানে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। এই অঞ্চলের উপর ওনাদের নজর পড়েছে। পুকুরে, নদীতে সর্বত্র মাছ ভর্তি কিন্তু ধরতে যাও, পাবে না। এ অঞ্চলের যত মাছ সেসব ওনারা নিজেদের কবজায় রেখেছেন। মানুষেরা যাতে একটা মাছও ধরতে না পারে সে জন্য সব ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা।

সে না হয় হল। সুরেশ মামা বললেন, সেটা তো বোঝা গেল। বুঝেও শান্তি পাচ্ছি না রে

সুবিন্দু। কিন্তু বেলগাছের এই রকম হঠাৎ তেড়েফুড়ে মাটি থেকে গজিয়ে ওঠা, তারপর সেটাকে ওপড়ানোর চেষ্টা করেও তা করা সম্ভব না হওয়া, এসবের মানে কী?

মানে ভয়ানক। সুবিন্দুবাবু বললেন, এরকম ঘটনা একবার ঘটেছিল কুমিল্লের কাছে ময়নামতীতে। এ-সব বেহ্মদত্যিদের কারবার।

বলো কী সুবিন্দু! প্রায় আঁতকে উঠলেন সুরেশ মামা। তিনি বললেন, একটু তামাক ধরানো যাক। মাথাটায় কিছুই ঢুকছে না।

তামাক ধরানো হল। দুই বন্ধুর তামাক টানাটনি শুরু হল। দু-এক মিনিট পর সুবিন্দুবাবু বললেন, কুমিল্লের ময়নামতীর ঘটনা আমরা ছোটবেলায় শুনেছিলাম। ওই সময় ব্রহ্মদত্যিদের একদল সৎপথ ছেড়ে দিয়ে লেখাপড়ার ধার না ধেরে ইয়ার্কিবাজ হয়ে পড়ে। তার বাপ-পিতামহদের কথা না শুনে সাধারণ আর অশিক্ষিত ভূতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়—লোকেদের ভয় দেখায়, যা কি না ব্রহ্মদত্যিদের করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এইসব ছোটো ব্রহ্মদত্যিরা বলতে থাকে, ভূত মাত্রই ভুত। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা খ্রিস্ট কেউ নেই। সব ভুতেরই ভয় দেখানোর অধিকার রয়েছে। ভূতের শত্রু মানুষ আর মানুষের শত্রু ভূত। এটাই আমাদের আসল কথা। তাছাড়া সাধারণ ভূতদের নাকি সুরে কথা বলতেই হবে এমন বিশ্রী নিয়ম আমরা মানি না। তারাও ব্রহ্মদত্যিদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। তাদেরও নাকি সুরে কথা বলতে দেব না। ব্রহ্মদত্যিদের মতো তারাও পৈতে পরবে। তারাও ব্রহ্মদেশে যাবে বিনা বাধায়, বিনা ঝামেলায়।

মজার ব্যাপার হল, যারা বলে তারা প্রায় প্রত্যেকেই ব্রহ্মদৈত্যদের গাছের ভূত। একই গোত্র, কিন্তু তাদের ধারণা হয়েছে পৃথিবীতে কেবল জাত দিয়ে সব বিচার করা উচিত নয়—তারা কী করে, কী তাদের যোগ্যতা এটাই বিচার্য বিষয়। এই কারণে তারা এমন একটা কলোনি করতে চায় যেখানে বিনা বাধায়, প্রাচীন ব্রহ্মদৈত্যদের থেকে দূরে এসে তাদের আদর্শকে রূপ দেবে। উদ্দেশ্য তাদের এটাই। এজন্য তারা বাধ্য হয়েই মানুষদের অঞ্চলছাড়া করতে চায়। এর আর একটা কারণ হল সাধারণ ভূত বা ব্রহ্মদৈত্য ভূত কেউই কেবল তাদের জন্য মান্ধাতা আমলের নিয়ম বেলগাছেই থাকতে হবে কিংবা শিবকে পুজো করতে হব, রামকে ভয় পেয়ে চলতে হবে, কিংবা মানুষকে ভয় দেখানো যাবে না—এসব একেবারে তারা মানবে না। এই কারণেই তারা অন্য ফাঁকা জায়গা, জঙ্গল বা প্রান্তরে থাকতে চায় না। তাদের নিজেদের বাড়ি করার ক্ষমতা নেই, তাই তারা মানুষদের বসতি অঞ্চল দখল করতে চায়। প্রথমে বেলগাছের সমারোহ ঘটাবে—শয়ে শয়ে বেলগাছে গ্রাম ছেয়ে দেবে, তারপর মানুষদের পরমপ্রিয় মাছ নদী, খাল, বিল, পুকুর থেকে উধাও করে দেবে। তাতেও কাজ না হলে তারা অন্যরকম সব ব্যবস্থা এমন করবে যে মানুষেরা গ্রাম বা অঞ্চল ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। তখন তারা ওই সব ফেলে যাওয়া বাড়ি দখল করবে আর নিজেরা বিরাট ভাবে তাদের প্রিয় খাদ্য, বিশেষ করে সুঁটকি মাছ বানাবে।

তামাক খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সুরেশ মামার—এসব কথা শুনে কার আর ইচ্ছে করে তামাক খেতে। বললেন, এ তো অতি সব্বোনেশে কথা শোনালে সুবিন্দু—এখন আমাদের গতি কী হবে?

সুবিন্দুবাবু বললেন, হবে আর কী, দুর্গতি হবে। জানি না এর জন্য কোন ওঝাকে ডাকব। বলতে না বলতেই হঠাৎ একটা চটাস করে আওয়াজ হল, আর সুবিন্দুবাবু প্রায় বাঁ দিকে হেলে পড়ে যাচ্ছিলেন। উঃ! বড্ড লাগল সুরেশ হে, বড্ড লাগল। তা তুমি হঠাৎ আমাকে চড় মারলে কেন হে? আমি কী এমন বললাম যে তুমি আমাকে চড় মারলে, অ্যাঁ? সুরেশ মামা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখা গেল চটাস করে আর একটা আওয়াজ হল আর তিনিও একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। কোনোমতে উঠে বসে বললেন, এর বিহিত করতে হবে। এ হচ্ছে ভূতের

কীর্তি—ওঝাকে ডাকতেই হবে। উঃ উঃ উঃ! ফের আবার সুরেশ মামার পিঠের উপর বিরাট এক চড় এসে পড়ল। সুবিন্দুবাবু বললেন, রাম ! রাম! রাম! রাম! রাম! যাক, আর কিছু হল না এরপর। সুরেশ মামা বললেন, আগে রাম নাম করতে পারলে না সুবিন্দু, তাহলে বাঁচা যেত। দাঁড়াও একটা কাজ করি—বাড়িতে একটা ঘরে শিবের ছবিওলা একটা ক্যালেন্ডার আছে, সেটাকে নিয়ে আসি।

সুবিন্দুবাবু বললেন, ওসব এখন দরকার নেই। আমাকে গোটা কুড়ি টাকা দাও তো আমি তো আমি একবার ঢাকা ঘুরে আসি। ঢাকায়, বুঝলে ভায়া, একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে। টাকাটা এখনই দাও আর সময় নেই। এখান থেকে পরের ট্রেনে পোড়াদহ যাব, সেখান থেকে ঢাকার ট্রেন ধরব। সব কথা এসে বলব। এখন চুপচাপ থাকো।

কুড়িটি টাকা নিয়ে সুবিন্দুবাবু ওই অবস্থাতেই চলে গেলেন। এখান থেকে কালুখালি স্টেশনে যাবেন সাইকেলে করে, তারপর সাইকেলটা স্টেশন মাস্টারের কাছে জিম্মা করে যাবেন পোড়াদহ হয়ে ঢাকায়। তিন-দিনের মধ্যে ফিরে আসবেন। ঢাকায় এক নাকি আধুনিক ওঝা এসেছেন মাসখানেক হল। অসাধারণ এঁর ক্ষমতা। কয়েকদিন আগেই একটি পত্রিকায় ওঁর খবর বেরিয়েছিল। রমনা অঞ্চলে বেকার হোটেলে ছিল, নামকরা হোটেল। দিনে চার্জ ছিল বারো টাকা। ওঝার নাম আলফ্রেড চৌধুরী। লন্ডনে বাস। ওখানে ভূত তাড়ানোর নানা উপায় শিখেছেন। আদিতে ঢাকারই লোক। দশ বছর পর ফিরে এসেছেন—আর নানা রকম ভূত তাড়ানোর দাওয়াই দিচ্ছেন। ফি নামমাত্র। আসলে তাঁর কাজ নানা দেশের ভূত এবং তাদের জব্দ করার ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করে একটা বড় বই লেখা। এক প্রকাশক এ জন্য ওঁকে কয়েক হাজার টাকাও অগ্রিম দিয়েছেন।

সুবিন্দুবাবু কোনোক্রমে তো ঢাকায় পৌঁছিলেন—ওখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল। কালকেপুরের সুনীতি কুমার ঠাকুর ওখানে সরকারি চাকুরে—অন্য দুজনের সঙ্গে দুটো ঘর ভাড়া করে থাকেন। সুবিন্দুবাবু তাঁর কাছেই গেলেন। এর আগেও তিনি ওখানে গিয়ে থেকেছেন কাজকর্মে।

সুনীতি ঠাকুর বড় চাকরি করেন। মাইনে আশি-নব্বুই টাকা মাসে। এ ছাড়া উপরি আছে বেশ। বাড়িতে মাসে বেশ কিছু টাকা পাঠান। লোকটি বেশ ভালোমানুষ। সুবিন্দুবাবু তাঁকে কাকা বলে ডাকতেন। সুনীতি কাকা সুবিন্দুবাবুর কাছ থেকে সব কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ, চৌধুরী নাম করেছে বটে, শুনেছি লোকেরা উপকারও পাচ্ছে। দ্যাখো কী হয়। তা তুমি যা বললে ভাই, শুনে তো আমার গা শিউরে উঠছে। গ্রামসুদ্ধ লোক ভয়ে যে পালাবে, কিন্তু পালাবেই বা কোথায়? খাবেই বা কী? বড় দুশ্চিন্তায় তুমি ফেললে হে! চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

দু'জনে গিয়ে দেখলেন আলফ্রেড চৌধুরীর হোটেল ঘরের সামনে দশ-বারো জন বসে আছেন। প্রত্যেকে একটা স্লিপ পেয়েছেন—এক একজনের সঙ্গে কথা বলতে পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় নিচ্ছেন। সুনীতি ঠাকুরমশাই ঢাকায় থেকে থেকে অন্ধিসন্ধি সব জেনে গেছেন। হোটেল মালিক আফজল আলির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল। তিনি তাঁর নাম করতেই আলফ্রেড চৌধুরীর সহকারী একজন বেরুতেই ওঁদের ঢুকিয়ে দিলেন। ফি নিলেন পাঁচ টাকা। সকালে পাঁচ টাকা। বিকেলে ফি সাত টাকা।

আলফ্রেড চৌধুরীকে ওঝা বলে মনেই হয় না। বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। দাড়ি-গোঁফ কামানো। পরনে টাউজার, শার্ট, পায়ে মোজা আর ফিতে বাঁধা জুতো—কালো রঙের।

তিনি সব শুনে বললেন, ব্যাপার গুরুতর বটে, তবে তাঁর মাথায় একটা নতুন ধরনের আইডিয়া এসেছে। যদি সফল হন তাহলে বিশ্বে আলোড়ন হবেই। তবে দিন দশেক সময় লাগবে। খরচও আছে—একশো টাকার উপর খরচ। অনেক কিছু করতে-টরতে হবে কিনা।

যাগযজ্ঞ? প্রশ্ন করলেন সুনীতি ঠাকুর।

আরে না না। ও-সব করার অনেক ঝক্কি। একটু এদিক-ওদিক হলে সব ভেস্তে যায়। তা ছাড়া

আমি তো খৃস্টান—আমার করা যাগযজ্ঞে কিছু না কিছু ভুল হয়েই যাবে নিশ্চয়। না, আমাদের অন্যরকম শিক্ষা। পশ্চিমী দেশগুলোতে কারবার করতে হয—সেখানে মন্ত্র-তন্ত্র কেউ বোঝেও না বিশ্বাসও করে না। মন্ত্র তখনই সফল হয যখন তাতে লোকের বিশ্বাস থাকে। মন্ত্রেও যেরকম ওষুধেও সেরকম হয়। বিশ্বাস না থাকলে ওষুধেও অনেক সময় কাজ হয় না। যাই হোক বিষয়টা একটু চ্যালেঞ্জিং। একটা মতলব মাথায় এসেছে, যদি সফল হই তা হলে বিরাট একটা ব্যাপার ঘটে যাবে।

আলফ্রেড চৌধুরী কিছু টাকা অগ্রিম নিলেন আর বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরও অনেক কথা জিগ্যেস করলেন। কালকেপুরে কেমন করে যেতে হয় তাও জেনে নিলেন। তিনি বললেন, একদম ভয় পাবেন না। ভূতকে ভয় দেখাতে হলে বলবেন একটা কথা—সবাইকে চালান করে ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দেব। সব ভূতই ব্রহ্মদেশে যেতে ভয় পায় কেননা সে দেশে কড়া সব নিয়ম-কানুন। আর একটা কথা, এই রাম! রাম! এই রাম নামে এখনও কাজ হয় কিন্তু আস্তে আস্তে এর জোর কমে আসছে। আশ্চর্যের কথা, কয়েকটি ঘটনায় একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে যে, কোনো কোনো অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে রাম নাম শুনলে ভূতেরা হৈ-হল্লা করে ফুর্তিতে নাচতে থাকে। কেবল তাই না, এও দেখা গেছে ওই সব অঞ্চলে বরং রাবণ নাম শুনলে ভূতেরা ভয়ংকর বিচলিত হয়ে পড়ে এবং সরেও পড়ে। দেখা যাচ্ছে ভূতদের মধ্যেও নানারকম চরিত্র আছে। দেশি ভূত আছে, বিদেশি ভূত আছে—তাদের চরিত্রের গঠনও বিভিন্ন। ইংল্যান্ডের সাহেব ভূতেরা পুরো পোশাক পরে থাকে—ঠান্ডার দেশ বলে ভূতেরাও ঠান্ডায় ওই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে ওদের শরীর অদ্ভুত—ওদের মাথাটা ধড় থেকে আলাদা! মাথাগুলোকে ওরা হাতে করে রাখে। দিব্যি অভ্যেস করে ফেলেছে। আবার সব ভূতই যে শয়তান তা নয়। জার্মানিতে একরকম ভূত আছে তারা পল্‌টারজাইস্ট বলে পরিচিত। এরা উপকারী ভূত। তবে ফুর্তি হলে ওরা হাল্কা ধরনের ঢিল ছোঁড়ে। ঘরের ফার্নিচার নিঃশব্দে নাড়া-চাড়া করে—হয়তো ঘরের পিয়ানোটিকে নিয়ে বাগানে রেখে এল, বাগানের পরীর মূর্তিটাকে রান্নাঘরে এনে ফেলে রাখল। একেবারে নিঃশব্দে কাজ করে তারা। এসব কাজকর্ম লোকেরা সহ্য করে নিয়েছে। এসব জার্মানদের মতে ভূতেদের খেলা, কিছু করার নেই। যাই হোক, আর কিছু বলতে চাই না এখন, আপনারা চলে যান। দেখা যাক কী করা যায়।

সুবিন্দুবাবু আর সুনীতি ঠাকুর তো চলে এলেন। ঢাকায় আরও কিছু কাজ শেষ করে একটা নতুন সাইকেল কিনে তিনি ফিরে এলেন। কালকেপুরে ফিরে এসে দেখেন এই কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। চন্দনা নদীর ধারে ত্রিশ-চল্লিশটা নতুন বেলগাছ জন্মেছে। যাকে তাকে যখন তখন, দিন নেই রাত্রি নেই চটাস-পটাস করে চড় সহ্য করতে হচ্ছে। মাছ আর সেই অঞ্চলে নেই। জাল ফেললে সে জাল কেটে যাচ্ছে। রাত্রে কিংবা দিনেও দেখা যাচ্ছে কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিচ্ছে। না ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে লোকেদের অনেকেরই মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে পড়ছে। ব্রাহ্মণদের পৈতে পরার জো নেই, দেখা যাচ্ছে কাটা। রান্না মুখে দেওয়া মুশকিল—তাতে নুনে ভরা। সাদা ভাত পর্যন্ত খেলে প্রচণ্ড ঝাল লাগছে। কাঁঠালের পাকা রসালো কোয়া খেয়ে মনে হচ্ছে তেতো কুইনিন। এ-ভাবে আর থাকা যায় না, বলে বেশ কিছু মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলেও গেছে। সুবিন্দুবাবু লোকেদের বললেন, তোমরা ভাই একটু ধৈর্য ধরো। একটা বিহিত করার ব্যবস্থা করে এসেছি। যদি সফল হয় তাহলেই ভালো। না হলে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হবে তা ভাবাই যায় না।

এভাবে কয়েকদিন গেল। লোকেরা আর সহ্য করতে পারছে না। যে সব লোক নাস্তিক বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা পর্যন্ত কালীমন্দিরে গিয়ে হত্যে দিয়ে পড়লেন। তাঁদের ধারণা হল মা কালী

মহাদেবকে বললেই ভূতেদের এই সব অত্যাচার বন্ধ হবে। কিন্তু মা কালী মহাদেবের একেবারে গায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে শিব কি আর মা কালীর কথায় ভূতদের কিছু বলবেন? ঘোর নাস্তিকদের এমন কথাও মনে হল। তবে একটা ব্যাপার দেখা গেল, খাবারদাবারের উপর ভূতেদের ভেলকি কমে গেল। কয়েকজন মনে করলেন এর কারণ চাঁদের শুক্লপক্ষ চলছে। এই সময় ভূতেদের আলস্য বাড়ে, দিনরাত হাই তুলতে থাকে। কেবল ভূত নয় ব্রহ্মদৈত্যদেরও হয় সেই একই অবস্থা। অবশ্য এটা তাঁরা শুনেছেন মাত্র। কোনোদিন অভিজ্ঞতা তাঁদের হয়নি। অনেকে তাঁদের ভূতাভিজ্ঞতা না থাকলেও ভূতাভিজ্ঞ বন্ধু কিংবা ওঝাদের কাছ থেকেই সব শুনেছেন।

সে যাই হোক, দেখা গেল সত্যিই তাই। যত পূর্ণিমা এগিয়ে আসতে লাগল, ভূতদের উৎপাত কমতে কমতে একেবারে পূর্ণিমার দিন কিছুই হল না। এ-দিন কালকেপুরের লোকেরা ভারি ফুর্তি পেল—পুকুরে-খালে কত মাছ ধরল, রান্নাবান্নাও কত রকমের হল তার ঠিক নেই। কালকেপুরের গ্রামে একটা ফুর্তির মেজাজই এসে গেল। যারা বাইরে চলে গিয়েছিল তাদের প্রায় সবাই ফিরে এল। কয়েকজন অবশ্য আরও কিছুদিন দেখে তবে ফিরবে বলল। এই সময় একদিন আলফ্রেড চৌধুরী কালকেপুরের গ্রামে এসে হাজির হলেন। উঠলেন সুবিন্দুবাবুর বাড়িতে। সঙ্গে একটা বড় কুঁজো। সেটিকে খুব যত্ন করে বেঁধে রাখা হয়েছে দড়ি দিয়ে। তাছাড়া একটা বেতের বাক্সে সেটিকে রেখে তালাও দেওয়া আছে, দেখা গেল। ওঁর সঙ্গে আর একটা সুটকেস ছিল—জামা-কাপড় ইত্যাদির। আলফ্রেডের চোখে-মুখে হাসি, উত্তেজনা আবার একটু উদ্বেগও। বললেন, শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছি, তবে সে ওড়িশার গভীর জঙ্গলে। আশা করা যায় এখানেও সফল হতে পারব। সুবিন্দুবাবু আলফ্রেডের আদর-যত্ন নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কালকেপুরে এসে অভ্যর্থনার যাতে ত্রুটি না হয় সেজন্য তিনি ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। আলফ্রেড বললেন, কালকেপুরে চারদিন থাকতেই হবে অমাবস্যা পর্যন্ত। অমাবস্যাতেই সবচেয়ে বেশি কাজ হয়।

প্রথমদিন আলফ্রেড বিশ্রাম করলেন। দুপুরবেলাটা ঘুমোলেন নাক ডাকিয়ে। ওঁর জন্য নানারকম খাদ্যেরও আয়োজন করা হল। গ্রামে যা যা পাওয়া যায় সেসব থেকে সেরা জিনিস আনা হল। বিদেশির কাছে গ্রামের সম্মান যাতে কোনোরকমে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে জন্য মিষ্টিওয়ালারা তৈরি করলেন মিষ্টি—দই বানানো হল এমন চমৎকার যার নাম দিলখাসা দই। সে দই এমনই ঘন যে মাটির দই-এর পাত্র উপুড় করে জোরে নাড়লেও সে দই মাটিতে পড়ে না। দু'জন আবার কুষ্টিয়ায় গিয়ে পাঁউরুটি, কৌটোভর্তি মাখন, চিজ—টিনে ভরা ওট্স আর যে কত রকমের সব জিনিস আনলেন তার হিসেব দিতেও অনেক সময় লেগে যাবে। সবচেয়ে আশ্চর্য যে ব্যাপারটি সকলকে আশ্চর্য আর অভিভূত করল সেটা হল বরফ! সে কী বিরাট বিরাট বরফের চাঁই! এক একটা বরফের ওজনই কেনার সময় প্রায় এক মণ। বড় বড় বস্তার মধ্যে প্রচুর কাঠের গুঁড়ো দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে অনেক খরচ করে। গ্রামবাসীরা শিলাবৃষ্টির সময় শিলা আকাশ থেকে পড়তে দেখেছে—কিন্তু সে হল ছোটদের খেলার মার্বেল থেকে সামান্য বড়। আলফ্রেড হয়তো পান করবেন তাই আনা হয়েছে বোতলে পোরা বিলাতি জিন হুইস্কি ব্র্যান্ডি। আলফ্রেডকে হাওয়া করার জন্য আধ ডজন বড় বড় পাখাও আনা হয়েছে। কয়েকজনকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েচে আলফ্রেডকে গরম জল করে দেওয়ার জন্য, চা করার জন্য, বরফ দিয়ে পানীয় তৈরির জন্য, মাঝে মাঝে গোলাপজল বাড়ির চারিদিকে ছেটানোর জন্য। এই খাতিরের দুটো কারণ—এঁর নাম আলফ্রেড অর্থাৎ সাহেবি নাম, থাকেনও বিলেতে। দ্বিতীয় কারণ হল ইনি এসেছেন কালকেপুর গ্রামের লোকেদের ভূতেদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে। আলফ্রেডকে সকলেই বলত আলফ্রেড সাহেব। কিন্তু দেখা গেল এত সব ভালো ভালো জিনিস থাকা সত্ত্বেও আলফ্রেড সাহেবের প্রিয় খাদ্য হল গিয়ে পান্তা ভাত, প্রিয় পানীয় ঘোলের সরবত আর প্রিয় নেশা হল মশলা কম দেওয়া পান।

কয়েকদিন আলফ্রেড সাহেব গ্রামের জঙ্গলে মাঠে বাজারে ঘুরলেন। সঙ্গে অজস্র মানুষ। সাহেব কী করেন দেখার সে এক অদৃশ্য কৌতূহল। আলফ্রেড সাহেব সব দেখছেন, মাঝে মাঝে খাতা বার করে কী সব লিখছেন। আবার কখনও কখনও হাওয়া শুঁকছেন আর ভাবছেন। এদিকে গজিয়ে ওঠা বেলগাছগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। একটা ক্যামেরা দিয়ে মাঝে মাঝে ছবি তুলছেন। এসবের সঙ্গে ভূত তাড়ানোর যে কী সম্পর্ক কেউ বুঝতে পারছে না। তবে মনে হল আলফ্রেড সাহেবের প্রথমদিককার অমাবস্যার মতো গম্ভীর মুখটা যেন আস্তে আস্তে মেঘহীন পূর্ণিমার মতো স্নিগ্ধ হাসির রূপ পেতে লাগল।

আসল কাজটা করলেন অমাবস্যার ঠিক আগের রাত্রে। সেদিন তিনি তাঁর সুটকেস থেকে দুটো সম্পূর্ণ বায়ু নিরোধক ক্যান বার করলেন। একটা ঝোলায় সে দুটো ক্যান ভরে নিলেন, এই দেখে তাঁর অনুগামীরা সব বিস্মিত হল বলাই বাহুল্য। রাত্রে তাঁর সঙ্গী হলেন সুবিন্দুবাবু নিজে, সুরেশ মামা এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ছোটোদের এই সময় ঘুমনোরই কথা, তাই তারা ঘুমিয়েই রইল।

প্রথমে আলফ্রেড সাহেব গেলেন চন্দনা নদীর ধারে একটা জলার ধারের বাঁশবাগানে, সেখানে তিনি একটি ক্যান বার করে ছোট একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ক্যানটিকে ফুটো করলেন। সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটি কেমন যেন বাঘের কটু গন্ধে ভরে গেল। আলফ্রেড সাহেব বললেন, গুড! এবারে চলুন যাওয়া যাক অন্য বড় জঙ্গলটিতে। সেটা প্রায় আধমাইল দূর। আলফ্রেড সাহেবের কাছে একটা জোরালো টর্চ ছিল, তারই সাহায্যে আর মেঘহীন আকাশের ঝকঝকে তারার মৃদু আলোয় সকলে চললেন অন্য গভীর বনে। দ্বিতীয় ক্যানটিকে ফুটো করতেই ঠিক সেই আগের মতোই বাঘের গন্ধে জায়গাটি ভরে গেল। আলফ্রেড সাহেব বললেন, এবারে বাড়ি থেকে মাটির কুঁজোটা এনে শ্মশানের কাছে নিয়ে যেতে হবে। খুব সাবধানে আনতে হবে। কুঁজোর মুখটা মাটি দিয়ে বন্ধ করে গালা দিয়ে সিল-মোহর করা আছে—হঠাৎ যেন ধাক্কা লেগে খুলে কিংবা ভেঙে না যায়।

কুঁজো নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। আলফ্রেড চৌধুরী বললেন, কুঁজোটা আমি ভাঙব—ভাঙলে হয়তো একটা বিশ্রী আওয়াজ হবে, জন্তুর আওয়াজ। যদি হয় তাহলেই আমার সাধনা সার্থক হবে।

তখন শ্মশান নিস্তব্ধ। চন্দনা নদীর ধারের এই শ্মশান সম্পূর্ণ জনশূন্য। এই শ্মশানের ভার উদাসী বলে একজনের উপর। কোনও মৃতদেহ দাহ করতে আনলে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেন। বর্ষায় যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য শুকনো কাঠ জমিয়ে রাখেন বাড়িতে। পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে দান সংগ্রহ করেন—চাল, ডাল, গামছা, ধুতি। এছাড়া মৃতদেহ প্রতি এক টাকা-দেড় টাকা পান। আমি যখনকার কথা বলছি তখন অনেকের পক্ষেই এক-দেড় টাকা জোগাড় করা সম্ভব হত না, অনেক সময়েই ধার রেখে যেতেন শ্মশান-যাত্রীরা, পরে অবশ্য ধার শোধও পেয়ে যেতেন—তখনকার লোক ঠকানোর ব্যাপারটা খুব একটা বুঝত না।

কুঁজো আনা হল শ্মশানে। আলফ্রেড সাহেব বললেন, ভয় পাবেন না। এর মধ্যে আছে বাঘের ভূত। অনেক কষ্টে অনেক বছর ধরে পরিশ্রম আর গবেষণা করে সোঁদরবনের বাসিন্দা বি. এসসি. পাশ করা হরেকেষ্ট ওঝা এটা করতে সমর্থ হয়েছেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। এখন ব্যাপার হল এই যে, ভূতেরা মানুষকে ভয় পায় না, বরং উল্টে ভয় দেখায়। এইসব ভূতেদের শায়েস্তা করতে ওঝাদের অবদান সামান্য নয়, কিন্তু অসুবিধে হয় বিশেষ ধরনের ভূতের বেলায়। একই মন্ত্র হিন্দু ভূতদের ভয় দেখায় কিন্তু মামদো ভূতেরা সে মন্ত্র শুনে হাসাহাসি করে। খৃস্টান ভূতেরাও হিন্দু মন্ত্র, রাম নাম এ-সবের ধার ধারে না। তাদের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া ব্রহ্মদৈত্যরা সম্পূর্ণই আলাদা—ওঁদের স্বভাব ভালো, কারও সাতে-পাঁচে থাকেন না, মনে প্যাঁচ নেই। তাঁদের নিয়ে কোনোরকম গবেষণাই করা হয়নি। কিন্তু মানুষের ওষুধ যেমন এক একটা

অসুখে এক এক রকম, আবার দেখা যায় কোনো কোনো ওষুধ চার-পাঁচটা অসুখকে সারাতে পারে তেমনই সর্বভূত-নাশকারী কোনো মন্ত্র উদ্ভাবিত হয়নি এতকাল, তার কারণ ভূততাত্ত্বিকেরা এতদিন পুরনো পদ্ধতি নিয়েই গবেষণা চালিয়েছেন, কিন্তু এই যে বললাম হরেকেষ্ট ওঝা, উনি ভাবলেন সব মানুষ ভূতই বাঘ, ভালুক, সাপের ভয় পেতে পারে, কিন্তু বাঘ, ভালুক, সাপের ভূত তৈরি করা সহজ ছিল না। হতই না বলা চলে। অবশেষে হরেকেষ্ট ওঝা স্থির করলেন বাঘের ভূত বার করবেন, করে বন্দি করবেন, এবং দরকার মতো ব্যবহার করবেন। কঠোর সাধনা শুরু হল বাঘের ভূত তৈরি করার জন্য। তিনি শিকারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। শিকারিরা বাঘ মারতে সোঁদরবনে যান, বাঘ মারেন আর হা হা করে হাসতে হাসতে বাঘের চামড়া ছাড়িয়ে চলে আসেন। বাঘের ভূত ওখানেই আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। সাতদিন কি আটদিন পর সে ভূতের আর ভূতত্ত্ব থাকে না। আস্তে আস্তে বাঘের ভূত মাটির সঙ্গে মিশে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। হরেকেষ্ট ওঝা এটা বুঝতে পেরে বাঘ ঠিক যেখানে মারা পড়েছে তার কাছে গিয়ে কুঁজোর মধ্যে কিংবা হাঁড়ির মধ্যে হরিণের মাংস শুকিয়ে তাতে পুরে রাখল। বাঘের ভূতেরা ভয়ংকর ক্ষুধার্ত হয়ে যেমনই কুঁজো বা হাঁড়ির মধ্যে ঢোকে তখনই হাঁড়ি বা কুঁজোর মুখ সিল করে দেওয়া হয়। এভাবে কয়েকমাস পর্যন্ত বাঘের ভূতকে 'জীবিত' রাখা যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে কৌশলে হরিণের শুকনো মাংস কিংবা ভেড়া বা পাঁঠার নুন দেওয়া শুকনো মাংস সরবরাহ করে যেতে হয়। সেই রকমই একটি বাঘের ভূত হরেকেষ্ট ওঝা আমাকে উপহার দিয়েছেন। অবশ্য আমি উপহার হিসেবে গ্রহণ না করে ওঁকে পনেরোটা টাকা দিয়েছি। বলেছি সফল হলে আরও কিছু টাকা লন্ডন থেকে পাঠিয়ে দেব। এতে হরেকেষ্ট ওঝা ভারি খুশি হয়ে গোটা পাঁচেক শক্তপোক্ত কুঁজো কিনে ফেলেছেন আর স্থির করেছেন যখনই সম্ভব তখনই তিনি বাঘের ভূত কুঁজোয় পুরবেন। অবশ্য এটির মধ্যে একটা ঝামেলাও আছে—বাংলাদেশের কয়েক হাজার ওঝা তাহলে তাঁদের কেরামতি দেখাতে না পেরে পেশাচ্যুত হতে পারেন, সেটা ভেবে হরেকেষ্ট ওঝা বলেছেন, এই সব বাঘের ভূত ভরা কুঁজো ভাঙার কাজ কেবল ওঝাদের মারফৎই করানো হবে।

অনেক কথা হল—এবারের শেষ করার পালা।

হ্যাঁ, আলফ্রেড সাহেবের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কুঁজো ভেঙে বাঘের ভূত বার করবার দু'দিনের মধ্যে নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা বেলগাছগুলি নেতিয়ে পড়ল। শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গেল আরও কয়েকদিনের মধ্যে। কালকেপুর গ্রামে ভূতের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণ ভাবেই। যাঁরা গ্রামে আর ফিরতে পারবেন না ভেবেছিলেন তাঁরা সব ফিরে এলেন হাসতে হাসতে। ফের চন্দনা নদী, পদ্মা নদীতে মাছরা ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়তে লাগল। রাত্রে অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ সব রদ হল। তবে মাঝে মাঝে নাকি সুরে বাঘের ডাক শোনা যেতে লাগল কৃষ্ণপক্ষে। বাঘের ভূতের জন্য প্রায়ই লোকে পাঁঠা বা ভেড়ার মাংস শুকিয়ে নুন দিয়ে মাটির পাত্রে জঙ্গলে রেখে আসার পর সকালে দেখা যেত সেসব সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সবচেয়ে বড় সংবাদ এই যে, সুরেশ মামা পুকুরের ধারে বসে দিব্যি মাছ ধরতে পারছিলেন আর খাচ্ছিলেন। আর তামাক? শস্তা জাতের আজেবাজে তামাক নয়, অম্বুরি তামাক সেই কোন দূর দেশ থেকে আনিয়ে দেদার টানছিলেন। গ্রামের লোকের আলফ্রেড সাহেবকে বছরে একবার চিঠি লিখে স্মরণ করতেন আর দার্জিলিং-এর সেরা চা পাঠাতেন।

এসব কতদিনের কথা। এখন সে যুগও নেই, সে ভূতও নেই।

শারদীয়া ১৪১২

ভূতরা ভূতের গল্প লিখছে

মহাশ্বেতা দেবী

সেদিন বইয়ের দোকানে কিছুক্ষণও কাটাইনি, বেজায় সুসংবাদ পেয়ে গেলাম। কোনো ছোটরা আজকাল বাংলা গল্পের বই পড়ে না শুনতে শুনতে আমি রীতিমতো ক্লান্ত। কিন্তু বইয়ের দোকানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে তো আমি তাজ্জব। কে বলে পড়ে না? আমি তো দেখলাম হেমেন্দ্রকুমার রায় বলো, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলো, এমনকি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘ্যাঘ্‌ঘা ভূতের গল্প বলো, সাঁই সাঁই করে বিক্রি হচ্ছে।

দোকানী কিশোর বলল, অত অবাক হবার কি আছে?

—এই বই বিক্রি হচ্ছে? কাকে যে বই দিচ্ছিস, তাদেরও তো ভালো করে দেখতেই পেলাম না। আর বই নিচ্ছে, কড়কড়ে নোটে ফলছে আর চলে যাচ্ছে?

—যাবে না? ওদের তাড়া নেই?

—ওর কোনো স্কুলের ছেলেমেয়ে নয়?

—হ্যাঁ.....তা বটে........ওরা যে কি.........!

—সব বাচ্চা বাচ্চা!

—হুঁ! বাচ্চা! কোনোটার বয়স পঞ্চাশের নিচে নয়। যাক গে, এখন আলোচনা করা যাবে না। পরে বলব।

আমি বেজায় চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। ছোট্ট দোকান ছোট্টই আছে। আগে কিশোর ছিল একরত্তি, ওর বাবা জয়ন্ত দোকানটা করেছিল। দোকানটার নাম "মোমবাতি"। খুব শৌখিন নাম বলতে হবে। জয়ন্ত বলত, আমি বেচব ছোটদের বই। লোডশেডিং হলে ওরা মোমবাতি জ্বেলে বই পড়বে।

—ওদের চোখের সর্বনাশ হবে না?

—কিসসু হবে না। সে আপনি বুঝবেন না। নিজে তো পিদিম জ্বেলে, কুপি জ্বেলে, লণ্ঠন জ্বেলে পড়েছেন। কি ক্ষতিটা হয়েছে শুনি?

তাও তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়??

—তুই কি বাড়ির নিচেই দোকান রেখে দিবি?

—বেচব তো ভূতের বই। বড় দোকান দিয়ে কি করব?

—তোর পরে দোকান চালাবে কে?

—স—ব হয়ে যাবে।

জয়ন্ত ওরকমই ছিল। একবারই ওদের বাড়িতে আগুন লাগে। কাগজে পড়ে টাট্টুকে বললাম, ইউনিভার্সিটির পর একটু দেখে আসিস তো? দু'খানা ঘর জুড়ে বইয়ের দোকান।

সন্ধ্যেবেলা টাট্টু এসে অবাক খবর দিল। আশপাশে দু-পাঁচখানা দোকান পুড়েছে বটে, কিন্তু "মোমবাতি" স্টলে একটা বইও পোড়েনি।

টাট্টু বলল, ও মানুষ নয় ভূত। দেখে নিও দিদি।

তবে তাই হবে। আমার ভাইদের মধ্যে এই ভাইটি সেরা। যদি তিনটে কথায় জবাব দেওয়া হয়ে যায়, তাহলে চারটে শব্দ উচ্চারণ করবে না। ও জবাবটি দিয়ে মুচকি হাসল।

এ তো গেল জয়ন্তর আমলের কথা। কিশোরের আমলেও দেখছি ভূতের গল্পের এমন বিক্রি। ব্যাপারখানা কি?

কিশোর একদিন এক প্রস্তাব নিয়ে এল। জয়ন্ত পরত ধুতি আর শার্ট। কিশোর পরে জীন্‌স আর পাঞ্জাবি। কিন্তু বাবার মতই কাচের চশমা (অর্থাৎ প্লাস্টিক লেন্‌স নয়), বাপ চিবোত পান; ও চেবায় পানপরাগ। আর তো কিছু অন্যরকম দেখলাম না।

—কি প্রস্তাব কিশোর?

—আমাকে একটা ভূতের অম্‌নিবাস করে দিন।

—সে কি? এই বয়সে?

—জানেন না আমি কি বিপদে পড়েছি।

—টাকাপয়সার ব্যাপার?

—না না, টাকা তো রোজ......

—দেখলাম, বস্তা বোঝাই করে রাখিস মনে হলো।

কিশোর সে কথা শুনতেই পেল না। কেমন যেন নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে যেন নিজেকেই বলল, বর্ধমান যদি দু'শো কেনে, জলপাইগুড়ি তখনি কিনবে তিনশো। রাতে ঘুমোবার জো নেই, বারোটা থেকে আসবে দলে দলে।

—কি বলছো কিশোর? রাত বারোটা থেকে বই কিনতে আসে? কারা আসে? কেমন করে আসে? বই বেচে কে? এ কি? ঘামছ কেন? পাখা খুলে দিই?

—দিন।

—জল খাবে?

—খাব।

কলকাতায়, মাঘ মাসের শীতেও পাখার নিচে বসে ঢকঢকিয়ে জল খেল। বলল শুনুন! বয়স হলে কি হবে, আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি চুলোয় গেছে। সেদিন দেখলেন, টিমটিমে আলোয় পালে পালে খদ্দের এসে বই কিনছে, কিছুই বুঝলেন না কেন?

—কি বুঝব?

কিশোর হতাশ হয়ে বলল, ওরা কি মানুষ?

—তার মানে? বই কিনছে পড়বে বলে....

—হতভাগা বজ্জাত সব! ওরা মানুষ নয়।

—তবে?

—ভূত সবাই, ভূত!

আমি হেসে ফেললাম।

—হাসুন খুব হাসুন। ওরা সবাই ভূত। আমার বাবা আমার এই সর্বনাশটা করে গেল।

—বলছ কি?

—কোনোদিন জানিনি ওরা বই পড়ে। কিন্তু ভূতের গল্প হেভি বিক্রি হয়, সে সব বই মানুষের লেখা শুনে ওরা বেজায় অবাক। বলতে গেলে আমার বাবাই ওদের বই পড়াতে শেখাল।

কিশোর রীতিমতো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

—টাকা তো পাও।

—পাব না কেন? আদ্যিকেলে রুপোর টাকা, পুরনো নোট, সব পাই।

—সে সব কি.....?

—আর বলবেন না....

—অত মুষড়ে পড়লে হবে কেন? সমস্যাটার কথা বলো!

—ওরা চায় একটা দশ কিলো ওজনের অম্‌নিবাসস।

—ওই বাচ্চাগুলো?

—আহা! দশটা খণ্ড হবে, এককেটা এককে কিলো! কিন্তু ব্যাপারটা কি! আপনিই যে বইটা লিখছেন, তা জানলে ওরা আপনাকে জ্বালিয়ে মারবে। ভূতের ভয় আছে?

—তা আছে। যদিও তেমন দেখাশোনা হয়নি।

—না, সেটা অবিচার হবে। সাঁই সাঁই করে জানলা দিয়ে ঢুকবে আর বেরোবে, আর বলবে আমার নামটাও ঢুকিয়ে দাও না। হয়তো ভয় পেয়ে...

—বাড়ি তো আমার একরত্তি। সেখানে রাতদিন লোক আসছে তো আসছেই। তারা যদি দেখে.....না কিশোর, থাক!

—কি, লিখবেন না?

—এই বয়সে?

—কার কাছে যাই বলুন তো?

—শোনো! আজ আর হবে না। একদিন বসে গুছিয়ে সব বলো। দশটা খণ্ড! এত...

—খাটতে পারবেন না।

—না। আর বুড়ো বয়সে নতুন ক্ষ্যাপামি নাই বা করলাম!

—আমি কি করে বই জোগান দিই!

—ওই তো বেচছ।

কিশোর আমার কথা কানেই নিল না। যেন নিজেকেই বলতে থাকল, কোথায় এমন লেখক পাব?

—পাবে! পাবে! খরচ করে বিজ্ঞাপন দাও। "ভূতের গল্প লিখিয়ে চাই।" দেখবে, পেয়ে যাবে।

—তা কি হয় না কি?

—নিশ্চয় হবে।

—ওঃ! কত রকম বই অছে পড়্ না। শুধু ভূতের গল্প পড়লে চলবে?

—আচ্ছা! এত এত ভূত আসে কোথা থেকে? কলকাতায় এত ভূত আছে?

—পিলপিল করছে। আর কোথা থেকে না আসছে। বর্ধমান বলুন, বা বোলপুর, কুচবিহার বা ভুরসুট, সর্বত্তর থেকে আসছে আর আসছে।

—অন্ধকার না হলে আসতে পারে?

—ওরা অতি পাজি। ওরা সব পারে। ....বাবা যে কি করল!.... তাহলে বিজ্ঞাপন দেব?

—আরো ভালো হয় যদি লেখো, "না-মানুষরা লিখলে সবচেয়ে ভালো হয়।"

—তার মানে ওরা?

—নিশ্চয়।

—যাঃ, আপনি ঠাট্টা করলেন!

—তুমি জানো আমি ঠাট্টা করি না, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে লেখাই আমার কাগজে।

—তবে?

—এটা একটা ইউনিক ম্যাডভেন্‌চার হবে কিশোর! ভূতরা যে যার মতো লিখুক। ওরা কোন জাতের ভূত, কেমন করে ভূত হলো, থাকে কোথায়, করে কি, ভয় দেখাতে ভুলে যাচ্ছে কেন, স—ব লিখে ফেলুক।

—মন্দ নয়। মন্দ নয়।

—আরে! ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে। দুনিয়াতে বোম্ ফাটবে। ভূতেদের লেখা ভূতের গল্প। আমি তো দেখছি তোমাকে হাইকোর্ট অথবা ইনডিয়ান মিউজিয়াম, অথবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটাতে ওদের বসাতে হব। অবশ্য রাতে!

—জানেন, আমি তিনটেই কিনতে পারি?

—কেমন করে?

—সেই আদ্যি যুগের সোনার টাকা, রুপোর টাকা, পর্তুগীজদের দিনার আর রাজা কণিষ্কর ৫০০ গ্রামের সোনার টাকা, স—ব আছে?

—কোথায়?

—আমাদের ১৮৬২ সালে তৈরি বাড়ির পাতালঘরে। জালা জালা। নোট যে কত আছে!

—তাহলে আর কি, লেগে পড়ো।

—কিসে লিখবে?

—সে ওরা বুঝবে। একটা ওয়ার্ক কালচার জাগিয়ে তোলো।

—সম্পাদক?

—রাশভারী কোনো সম্পাদক ওরাই আনুক।

—ছাপার ব্যাপারটা?

—আরে ওরা রামমোহন রায়ের আমলের ছাপাখানা নিয়ে চলে আসবে। আর!

—কি?

—বিক্রি করবে ওরা , টাকা নেবে ওরা, তুমি রাতে ঘুমোবে। ভোররাতে টাকার বস্তা ঘরে তুলবে।

—আপনি সঙ্গে থাকবেন কিন্তু!

—দেখা যাক, কেমন এগোয়, তারপর!

আমি তো জানি কাজটা চলছে। ভূতরা ওয়ার্কশপ করে লিখছে। লেখা টুকছে ভূতরা। বসুমতী আর ভারতবর্ষ কাগজের বরবাদ যত ছাপাই মেশিন, সেগুলোতে ছাপছেন ভূতরা। বাইন্ডিংও ওঁদেরই কাজ।

সব হয়ে গেলে?

কিশোর ময়দান প্যান্ডেলে ঘিরে বইমেলা করবে।

কিশোরকে এখন হাসি হাসি দেখি।

বলল, ফাসক্লাস বই হচ্ছে।

উদ্বোধন হবে ভূত-চতুর্দশীর রাতে।

উদ্বোধন করবেন ড্র্যাকুলা।

তারপর?

কি হবে, ভাবতে থাকো।

শারদীয়া ১৪১০

খেলার সঙ্গী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পায়ের শব্দেই মানুষ চেনা যায়। বাবা ফিরছেন অফিস থেকে। অভির বাবা বেশ লম্বা-চওড়া মানুষ, তিনি কাজ করেন টেলিফোন অফিসে। অফিস থেকে ফেরেন অনেক দেরি করে। আবার বাড়িতে ফিরেও মেতে থাকেন কাজ নিয়ে।

তবে, বাবা প্রায় রোজই কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে ফেরেন। কোনোদিন গরম সিঙ্গাড়া, কোনোদিন আইসক্রিম, কোনোদিন সবেদা বা কমলালেবু।

বাবা বসবার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে বললেন, কচুরি-তরকারি এনেছি, খাবি নাকি?

অভি খেলা করছিল কমপিউটারে। সে বুঝে গেল এবার তাকে উঠতে হবে। কচুরি খাওয়ার জন্য বড়-জোর দশ-পনেরো মিনিট, তারপরই পড়তে বসা। বাবা তখন বসবেন কমপিউটারে।

মা গান করেন, বাড়িতেও অনেক ছেলেমেয়েকে গান শেখান। এখন দশ-বারোটি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা ক্লাস চলছে, সবাই মিলে একসঙ্গে গাইছে, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে....।"

বাবা বাড়ি ফিরলেই এই ক্লাস ছুটি হয়ে যায়।

এরপর খাওয়ার টেবিলে বসে জলখাবার খেতে খেতে খানিকটা গল্প হয়। তারপর বাবা বসে যান কমপিউটারে, মা ব্যস্ত হয়ে পড়েন সংসারের কাজে। রান্না করেন অবশ্য সুশীলা মাসি, তবু কতরকম কাজ থাকে, বিশেষ করে বারবার টেলিফোন।

অভি ক্লাস এইটে পড়ে, কিন্তু বাড়িতে তার জন্য কোনো মাস্টারমশাই আসে না। অঙ্কে সে খুবই ভালো, ইতিহাস-ভূগোলেও ভালো নম্বর পায়, শুধু ইংরিজিতে একটু কাঁচা।

মা মাঝে মাঝে এসে সাহায্য করেন অভিকে। মা যেমন ভাল গায়িকা, তেমনি ইংরিজিও জানেন খুব ভালো। একসময় একটা স্কুলে ইংরিজি পড়াতেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন, এখন নিজেরই তো বাড়িতে গানের স্কুল।

এত ছেলেমেয়েকে গান শেখান মা, কিন্তু নিজের ছেলেকে গান শেখাতে পারলেন না। কয়েকদিন গানের ক্লাসে অভিকে জোর করে বসিয়েছিলেন। তারপর একদিন হতাশভাবে বললেন, যাঃ, আমার ছেলেটার দ্বারা গান হবে না। গলায় একদম সুর নেই।

বাবাকে মা বলেছিলেন, গিটার কিংবা সেতারের মতন কোনো যন্ত্রসংগীত শেখালে হয় অভিকে। একজন ভালো মাস্টার দরকার।

সে ব্যবস্থা এখনও হয়নি। কিন্তু একটা যন্ত্র অভি খুব ভালো পারে। কমপিউটার।

প্রথম প্রথম বাবার কমপিউটারে হাত দিলেই মা এসে বকাবকি করতেন। যদি নষ্ট হয়ে যায়। বাবা কিন্তু আপত্তি করেননি। বাবা বলেছিলেন, কমপিউটার চট করে খারাপ হয় না। আর ছোটোরা বড়দের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শিখে যায়।

এখন অভি ইন্টারনেট খুলতে পারে। অচেনা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলাও যায়, অবশ্য লিখে লিখে। কী করে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা চলে আসতে পারে চোখের সামনে।

একবার কমপিউটারের সামনে বসলে অভির আর উঠতেই ইচ্ছে করে না।

কিন্তু বাবা বাড়িতে থাকলে অভি আর সুযোগ পায় না। তা ছাড়া ইস্কুলে যাওয়া, বিকেলে সাঁতার কাটা, হোম টাস্ক করা আছে। তবু যখনই সময় পায় বসে পড়ে।

একদিন ছুটির দুপুরে অভি কমপিউটারে দাবা খেলছে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো।

এই দাবা খেলায় তো উল্টোদিকে কোনো মানুষ থাকে না। কমপিউটার নিজেই খেলোয়াড়। অভি একটা চাল দিলে কমপিউটার মুহূর্তের মধ্যে উল্টো চাল দিয়ে দেয়। একটু ভুল চাল দিলে আর উপায় নেই। কমপিউটার ফেরৎ নিতে দেবে না।

অভি এ পর্যন্ত কমপিউটারকে একদিনও দাবা খেলায় হারাতে পারেনি। যদিও তার বন্ধুরা কেউ পারে না তার সঙ্গে। আজকাল অভির বয়েসী অনেক ছেলেও দাবা খেলার কমপিটিশানে বিদেশে যায়। দিব্যেন্দু বড়ুয়া আর সূর্যকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের কত নাম হয়েছে। অভিরও ইচ্ছা সে একদিন বিদেশে যাবে। এর মধ্যে সে গোর্কি সদনে দুটো প্রতিযোগিতাতেও জিতেছে।

সেই দুপুরে, কমপিউটারের সঙ্গে দু'বার হেরে যাবার পরে অভি যখন আর একবার খেলা শুরু করতে যাচ্ছে, হঠাৎ কমপিউটারে একটি ছেলের মুখ ভেসে উঠলো।

মুখখানা প্রথমে বেশ চেনা চেনা মনে হলো।

তারপরেই সে চমকে উঠলো, আরেঃ! এ-তার নিজেরই মুখ। আয়নায় যেমন দেখা যায়!

কিন্তু কমপিউটারে তো নিজের মুখ ফুটে উঠতে পারে না। এটা তো এমনি ছবি নয়, জ্যান্ত মুখ। মিটিমিটি হাসছে।

সে চেঁচিয়ে বললো, মা, শোনো, একবার দেখে যাও।

দুপুরে খাওয়ার পর মা'র অনেকক্ষণ খবরের কাগজ পড়া অভ্যেস। কাছেই বসেছিলেন তিনি। কাগজ পড়তে পড়তেই অন্যমনস্কভাবে বললেন, কী?

অভি উত্তেজিত ভাবে বললো, এখানে এসো। আমি নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছি।

মা কাগজ হাতে নিয়ে উঠে এসে অভির পাশে দাঁড়ালেন। কমপিউটারের পর্দা থেকে এর মধ্যেই সেই মুখটা মুছে গেছে, সেখানে এখন দুটো গাড়ির রেস চলছে।

অভি বলল, যাঃ, চলে গেল। সত্যিই আমার মুখটা ফুটে উঠেছিল। একেবারে স্পষ্ট।

মা অভির দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে বললেন, চল, একটু শুয়ে নিবি।

অভি বললো, তুমি বিশ্বাস করছো না? সত্যি দেখেছি।

মা বললেন, অনেকক্ষণ কমপিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ক্লান্ত হয়ে যায়। তাতে লোকে ভুলভাল দেখে। কমপিউটার কি আয়না যে নিজের মুখ দেখবি! এটা অসম্ভব! এক যদি ছবি হয়, কেউ ছবি পাঠিয়ে দেয়।

অভি বললো, না, ছবি নয়। নড়াচড়া করছিল।

এরমধ্যে টেলিফোন বেজে উঠলো। মা পাশের ঘরে যেতে যেতে বললেন, আর খেলতে হবে না। এবার বন্ধ করে শুতে চলে যা—।

মা চলে যেতেই আবার ফিরে এলো অভির মুখ।

অভি ভুরু কুঁচকোতেই সেই মুখটারও ভুরু কুঁচকে যায়। আভি জিভ ভ্যাঙালে সেও ভ্যাঙানো জিভ বার করে। অভি একটা চিমটি কাটলো নিজের গালে, সেও চিমটি কাটলো বটে, কিন্তু হাসতেও লাগলো। অভি তখন হাসছে না।

তার মানে আয়নার ছবির মতনও তো নয়।

তাহলে কি পৃথিবীতে কোথাও ঠিক তার মতন চেহারার একটা ছেলে আছে? তা হতেও পারে।

অভি জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি কে? তোমার নাম কী?

সেই ছেলেটি বলল, অভিরূপ মজুমদার। ডাক নাম অভি।

অভি বলল, যাঃ, ওটা তো আমারও নাম। তুমি আমার নাম চুরি করেছো?

সে বললো, না। তুমি আমার নাম চুরি করেছো।

অভি অবিশ্বাসের সুরে বললো, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

সে বললো, ক্লাস এইট।

অভি আবার জিজ্ঞেস করলো, কোথায় থাকো তুমি?

সে বললো, সে অনেক দূরে। সে জায়গাটার নাম দিকশূন্যপুর।

আবার অভি বেশ চমকে গেল। কমপিউটার তো কথা বলে না। মানে গলার আওয়াজে কোনো উত্তর আসে না। সব প্রশ্নের উত্তর লেখায় ফুটে ওঠে।

কিন্তু এখানে সে ঐ ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছে কী করে?

আর কিছু জিজ্ঞেস করা গেল না। মা এ ঘরে ফিরে আসতেই মিলিয়ে গেল মুখটা।

মা বললেন, এখানো বসে আছো? বললাম না, বন্ধ করো। চলো, আমার পাশে আধঘণ্টা শোবে।

এরপর দু'দিন আর কিছুই হলো না। দেখা গেল না সেই মুখ। অভি কমপিউটারের সঙ্গে দাবা খেলে যথারীতি হারতে লাগলো।

তৃতীয় দিন, বাবা অফিসের কাজে বাইরে গেছেন, মা গেছেন একটা গানের জলসায়, বাড়িতে অভি একা। সে পড়তে না বসে সন্ধেবেলা মনের আনন্দে খেলা করতে লাগলো কমপিউটারে।

হঠাৎ ফিরে এলো সেই মুখটি।

আজ সে নিজেই আগে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এখনো পড়তে বসোনি? বেশ মজা, তাই না?

অভি বেশ কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, সত্যি করে বলো তো, তুমি কে?

ছেলেটি বলো, বাঃ, সেদিন বললাম তো, আমার নাম অভিরূপ মজুমদার।

অভি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, না। তোমার চেহারাটা আমার মতো হতে পারে, কিন্তু নামটাও কি করে এক হবে?

ছেলেটি কিন্তু মাথা নাড়লো না। মুচকি হেসে বললো, এরকম হয়। অনেক কিছু হয়। এই বিজ্ঞানের যুগে কত কাণ্ডই না হচ্ছে।

অভি তবু অবিশ্বাসের সুরে বললো, তোমার বাবার নাম কী?

ছেলেটি বললো, প্রাণেশ মজুমদার। মায়ের নাম অরুণিমা। আমার মা খুব ভালো গান করেন। আমি অবশ্য গান গাইতে পারি না।

মিলে যাচ্ছে। সব কিছু মিলে যাচ্ছে। শুধু ছেলেটা থাকে অন্য জায়গায়। দিকশূন্যপুর না কী যেন নাম বলেছিল জায়গাটার।

অভি বললো, তুমি ঝাল খেতে পারো?

ছেলেটি বললো, একটু একটু, খুব বেশি না।

অভি বললো, তুমি কী খেতে ভালোবাসো? মাছ না মাংস?

ছেলেটি বললো, দুই-ই। তবে মাছের মধ্যে চিংড়ি মাছ আমার সবচেয়ে ফেভারিট।

অভি বললো, তুমি কখনো দার্জিলিং গেছ?

ছেলেটি বললো, হ্যাঁ।

অভি বললো, তুমি কী কী খেলতে ভালোবাসো?

ছেলেটি বললো, সাঁতার, শীতকালে টেবিল টেনিস, আর দাবা। দাবা খেলাই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তুমিও তো দাবা খেল। আমাকে হারাতে পারবে?

অভি বললো, তুমি কেমন খেল, তা তো আমি জানি না। তবে অনেকেই আমার কাছে হেরে যায়। গোর্কি সদনে একটা কমপিটিশনে আমি জুনিয়ার গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়েছি।

ছেলেটি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বললো, ইস, ভারি তো চ্যাম্পিয়ান! ভালো খেলোয়াড় কেউ ছিলই না। আমার সঙ্গে লড়ে দেখো না। আমি বলে বলে তোমায় হারাবো।

অভিও হেসে বললো, তাই নাকি! দেখা যাক তাহলে।

অমনি পর্দায় ভেসে উঠলো একটা দাবার ছক। তার একপাশে বাবু হয়ে বসে আছে ছেলেটি। সে বললো, তুমি সাদা নেবে, না কালো? যেটা ইচ্ছে। তুমিই প্রথম চাল দাও।

ঠিক সাত মিনিটের মধ্যে হেরে গেল অভি।

সে রেগে গিয়ে বললো, তুমি কমপিউটারের সাহায্য নিয়েছো। কমপিউটারের সঙ্গে কেউ পারে?

ছেলেটি বললো, মোটেই না। আমি নিজে খেলছি। ঠিক আছে, আর এক দান হোক। এবারে তুমি দুটো ভুল চাল ফেরৎ নিতে পারবে। কমপিউটার তো সে সুযোগ দেয় না!

পরের দানে অভি হেরে গেল ন' মিনিটে।

এরপর থেকে শুরু হয়ে গেল ওদের দুজনের মধ্যে এক টানা প্রতিযোগিতা। যখনই সুযোগ পায়, অভি ঐ ছেলেটির সঙ্গে দাবা খেলতে বসে। প্রত্যেকবার সে হারে।

যাত হারে, তত জেদ বেড়ে যায় অভির। ওকে একদিন না একদিন হারাতেই হবে।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ঘরে অন্য লোক ঢুকলেই ছেলেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক খেলা থেমে যায় মাঝপথে।

একেবারে নিরিবিলি সময় পাওয়াই মুস্কিল। মা আর বাবা দুজনেই বাড়িতে থাকবেন না, এমনও তো হয় খুব কম।

অভি ভোরবেলা উঠে কমপিউটার খুলতে লাগলো।

একটা সুবিধা এই, মা দেরি করে জাগেন। তারপরেও অনেকক্ষণ অন্য ঘরে বসে গানের গলা সাধেন।

বাবা ঘুম থেকে উঠে অভিকে কমপিউটারের সামনে দেখলেও বকাবকি করেন না। বাবা বাথরুমে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান, সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়েন। তারপর বসবার ঘরে এলেই অভি কমপিউটার ছেড়ে উঠে যায়।

এইরকম চললো মাসের পর মাস।

এখন আর অভির অন্য কোথাও বেড়াতে যেতেও ইচ্ছে করে না। ঐ ছেলেটাকে একবার না হারাতে পারলে তার মনে শান্তি হবে না।

এর মধ্যে গোর্কি সদনে আর একটা প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে অভি সবকটা রাউন্ডে জিতে এলো, অথচ এ ছেলেটাকে হারানো যাচ্ছে না কিছুতেই। প্রত্যেকবার জিতে গিয়ে ছেলেটা যখন হাসে, রাগে অভির গা জ্বলে যায়।

এর মধ্যে ছেলেটার সঙ্গে নানারকম গল্পও হয়। সব ব্যাপারেই দুজনের খুব মিল, শুধু দাবা খেলার ক্ষমতা ছাড়া।

এক রবিবার দুপুরে বড়মামা নিয়ে এলেন অনেকগুলো প্রকাণ্ড সাইজের গলদা চিংড়ি

সে চিংড়ির কি অপূর্ব স্বাদ। মাথায় হলদে রঙের ঘিলু। দাঁড়াগুলোও বড় বড়। দারুণ মালাইকারি রান্না করলেন মা নিজে। অভি দু'দুটো চিংড়ি খেয়ে ফেললো।

সন্ধেবেলা বড়মামাকে নিয়ে মা-বাবা টিভিতে কী একটা বাংলা সিনেমা দেখছেন পাশের ঘরে। অভি এসে খুলে ফেললো কমপিউটার।

ছেলেটির মুখ দেখা যেতেই অভি জিজ্ঞেস করলো, আজ দুপুরে কী খেয়েছো?

ছেলেটি হেসে বললো, তুমি বুঝি ভাবছো, আমার চেয়েও ভালো ভালো খাবার খেয়ে তুমি জিতবে? মোটেই না। আমিও আজ গলদা চিংড়ি খেয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো খাবার।

হঠাৎ অভির মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল।

সে বললো, তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে?

ছেলেটি বললো, কেন?

অভি বললো, কেন, মানে, তুমি এলে আমরা সামনাসামনি অনেক গল্প করবো। তুমি বই পড়তে ভালোবাসো? আমার অনেক বই আছে।

ছেলেটি বললো, কী করে যাবো? আমি তো কলকাতায় থাকি না। আমার বাড়ি অনেক দূরে, দিকশূন্যপুর। তুমিই বরং একদিন এসো আমার বাড়িতে। আমার কাছেও অনেক বই আছে।

অভি বললো, এসো একটু খেলি।

ছেলেটি বললো, এতবার হেরেও তোমার শিক্ষা হয়নি! বলেছি তো, আমার সঙ্গে তুমি পারবে না!

অভি বললো, তোমাকে যদি একবার না হারাতে পারি, তাহলে আমার নামই মিথ্যে। আমি খেলা ছেড়ে দেব। তুমি যদি আমাদের বাড়িতে আসতে পারতে, তা হলে মুখোমুখি বসে দাবার ছক পেতে খেলতাম।

সেই ছেলেটি বললো, তার মানে, তুমি আমাকে এখনো অবিশ্বাস করছো? তুমি ভাবছো, আমি কমপিউটারের সাহায্য নিয়ে তোমাকে চিটিং করছি? মোটেই না। আমি তিন সত্যি করে বলছি, পুরোটাই আমি নিজে নিজে খেলি! তোমার মতন আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই না। বারবার হেরে গিয়ে যদি তোমার রাগ হয় তো বলে দাও, আমি আর আসবো না। আমি আর খেলবো না।

অভি বললো, না, না, আমি খেলবো। একদিন না একদিন তোমাকে হারাবোই! এবার শুরু হোক!

সেবারেও হেরে গেল অভি।

বাবা কিংবা মা ব্যাপারটা কোনোদিনই জানতে পারলেন না। ওঁরা ঘরে এলেই যে ছেলেটি মুছে যায়।

এক এক সময় অভি খেলায় এমনই তন্ময় হয়ে থাকে যে বাবা কিংবা মা ঘরে এলেন কিনা সে টেরও পায় না। কিন্তু ছেলেটা ঠিক টের পায়। খেলার মাঝপথে কমপিউটারের পর্দা হঠাৎ সাদা হয়ে যায়, কিংবা অন্য ছবি ফুটে উঠলেই অভি ঘাড় ফিরিয়ে দেখে মা কিংবা বাবা দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকছেন।

একদিন এইরকম খেলার সময় তার মামাতো বোন রিনি এসে পড়েছিল। রিনি আর অভি প্রায় সমান সমান। ওরা থাকে দক্ষিণেশ্বরে, তাই বেশি দেখা হয় না। তবে মাঝে মাঝে আসে।

অভি তখন কমপিউটারে খেলা নিয়ে মেতে আছে, রিনি চুপিচুপি পেছন দিক থেকে এসে ওর চোখ টিপে ধরলো।

তারপর বললো, বলো তো আমি কে?

এ আর বলা শক্ত কী? গলার আওয়াজটাও চেনা, আঙুলের ছোঁয়াটাও চেনা।

তাই অভি বলল, রিনি! কখন এলি!

রিনি বললো, এই মাত্র! তুই কমপিউটারের সাদা স্ক্রিনের সামনে বসে কী করছিলি? ঘুমোচ্ছিলি নাকি?

তার মানে রিনিকে দেখেও সে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। অভি ছাড়া আর কারুর কাছেই সে দেখা দেবে না। এ তো বেশ মজার ব্যাপার।

চোখ থেকে রিনির আঙুল সরিয়ে নিয়ে সে দেখলো, সত্যিই কমপিউটারের পর্দাটা একেবারে সাদা।

রিনি হাসতে হাসতে বললো, অনেকে ঘুমোয়। আমার দাদাও কমপিউটারে বসে কাজ করতে করতে ঘুমে ঢুলে পড়ে।

অভি অবশ্য কোনোদিন ঘুমে ঢুলে পড়েনি।

আগে আগে রিনি এলে তার খুব ভালো লাগতো। দুজনে গল্প হতো কতরকম। রিনিদের বাড়িটা তো অভিদের মতন ফ্ল্যাটবাড়ি নয়। সেখানে সামনে অনেকখানি বাগান। অভি দক্ষিণেশ্বরে মামাবাড়ি গেলে সেই বাগানে ব্যাডমিন্টন খেলেছে।

আজ কিন্তু রিনির সঙ্গে গল্প তেমন জমছে না। অভি মনে মনে ভাবছে, আবার কখন ঐ ছেলেটার সঙ্গে খেলা হবে। ঐ অহংকারী ছেলেটাকে না হারিয়ে তার শান্তি নেই।

এর কয়েকদিন পরের এক বিকেলে আবার একটা দারুণ ব্যাপার হলো।

অভি ইস্কুল থেকে ফিরেই কমপিউটার নিয়ে বসেছে। আজ আর সাঁতারে যাবার কথা নেই। বাবা অফিস থেকে ফেরেননি, মা কোণের ঘরে গানের ক্লাস নিচ্ছেন।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। অভি একসময় জিজ্ঞেস করলো, শোনো, তোমাদের ঐ দিকশূন্যপুর জায়গাটা কেমন?

ছেলেটা বললো, ভারি সুন্দর। পাহাড় আছে, ঝর্ণা আছে, মেঘ আছে, কতরকম পাখি, আর সবুজ ধানের খেত।

অভি বললো, কত দূরে? দক্ষিণেশ্বরের থেকে দূরে? কিংবা ঝাড়গ্রাম?

ছেলেটি বললো, হ্যাঁ, তার চেয়েও দূরে।

অভি জানতে চাইলো, কী করে সেখানে যেতে হয়?

ছেলেটি তাকে ধমক দিয়ে বললো, খেলায় মন দাও, নইলে এক্ষুণি কিস্তি হয়ে যাবে কিন্তু।

অভি বললো, অত সোজা নয়!

এটা ঠিক, ছেলেটি প্রত্যেকবারই অভিকে হারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু আগের মতো অত সহজে সাত মিনিটে বা ন' মিনিটে পারে না। এক এক সময় তাকেও বেশ মাথা ঘামাতে হয়।

একটু পরে অভি আবার জিজ্ঞেস করলো, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ঘরে অন্য কেউ এলেই তুমি হাওয়া হয়ে যাও কেন?

ছেলেটি বললো, আমায় দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কমপিউটারে কারুর সঙ্গে কেউ কথা বলতে পারে? এটা আমি একটা বিশেষ কায়দা বার করেছি। এখনো তোমাকে ছাড়া আর কারুকে জানাইনি। এখন কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে চেঁচামেচি করবে। কী করে হলো, কেমন করে হলো, এই নিয়ে শোরগোল চলবে, ওসব কি ভালো লাগবে? একদিন সারা পৃথিবীকে একসঙ্গে এই আবিষ্কারের কথা জানাবো। তখন শুধু তুমি আমার পাশে থাকবে।

তারপর সে চেঁচিয়ে উঠল, এই, এই!

অভি বলে উঠলো—চেক! এবার?

সেই ছেলেটির রাজার ঠিক সামনে অভির মন্ত্রী আর একপাশে পজিশান নিয়ে আছে তার ঘোড়া। রাজার আর বাঁচার পথ নেই।

অভি বললো, কী, আর চাল দিতে পারবে?

ছেলেটি হতাশ ভাবে বললো, না।

অভি বললো, তাহলে তোমাকে হারিয়েছি? স্বীকার করছো?

ছেলেটি বললো, হ্যাঁ, স্বীকার করছি।

জয়ের আনন্দে অভির ইচ্ছে হলো লাফিয়ে উঠতে। ঘরের মধ্যে দু'হাত তুলে নাচতে।

কিন্তু নিজেকে সংযত করে সে জিজ্ঞেস করলো, আর এক দান খেলবে? আবার তোমাকে হারাবো!

ছেলেটি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই সিঁড়িতে শোনা গেল ভারি জুতোর শব্দ।

বাবা চেঁচিয়ে বললেন, অভি! অভি কোথায়?

অভির বুকটা কেঁপে উঠলো। খারাপ কিছু হয়েছে নাকি? বাবা তো কখনো সিঁড়ি দিয়ে ডাকতে ডাকতে ওঠেন না। গলার আওয়াজটাও কেমন যেন অস্বাভাবিক।

মা-ও বেরিয়ে এসেছেন গানের ঘর থেকে।

বাবা ওপরে এসে উত্তেজিতভাবে বললেন, আজ কী হয়েছে জানো? তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। একটু আগে আমার অফিসে কে ফোন করেছিলেন? স্বয়ং ক্রীড়ামন্ত্রী!

মা উৎকণ্ঠিতভাবে বললেন, কেন?

বাবা অভির দিকে তাকিয়ে বললেন, এদিকে আয়।

অভি এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমাদের অভি জার্মানি যাবে। ক্রীড়ামন্ত্রী ফোন করে বললেন, জুনিয়ার দাবা গ্রুপে আমাদের দেশের হয়ে খেলতে যাবে অভি, কমপিউটারে বারবার ওর নামই উঠেছে।

প্রথম খেলা হবে বার্লিনে, বাবা-মা দুজনেই যাবেন অভির সঙ্গে। মা তক্ষুণি টেলিফোনে এই ভালো খবরটা জানাতে লাগলেন আত্মীয়-বন্ধুদের।

অভি ভাবলো, সেও খবরটা দেবে তার খেলার সঙ্গীকে।

কমপিউটারের পর্দাটা সাদা হয়ে আছে। অভি অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু সেই ছেলেটিকে আর পাওয়া গেল না।

এরপর কয়েকদিন ধরে অভির জার্মানি যাবার সব ব্যবস্থা হতে লাগলো। পাসপোর্ট পেতে হবে, কিনতে হবে শীতের দেশের জামাকাপড়, সময় বেশি নেই।

এরই ফাঁকে ফাঁকে সে কমপিউটারে খুঁজতে লাগল ছেলেটিকে। কিন্তু আর কিছুতেই তাকে ধরা যাচ্ছে না। দাবার বোর্ড দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে সে নেই।

আর কি কোনোদিন দেখা হবে না তার সঙ্গে?

দিকশূন্যপুর কী করে যেতে হয়, সেটাও শেষ পর্যন্ত জানা হয়নি।

অভি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, আর একটু বড় হয়ে সে নিজেই ঠিক খুঁজে বার করবে দিকশূন্যপুর। সেখানে দেখা করবে ঠিক তার মতন চেহারার ছেলেটির সঙ্গে। এই বন্ধুটিকে সে চিরকালের মতন হারিয়ে যেতে দেবে না।

শারদীয়া ১৪১০

নওশেরজির গল্প

প্রফুল্ল রায়

বম্বে (এখনকার মুম্বাই) আমার খুবই প্রিয় শহর। কতবার যে সেখানে গেছি, নিজেরই খেয়াল নেই। প্রথম যাই উনিশ 'শ চুয়ান্নয়। এখন দু' হাজার ছয় চলছে। মাঝখানে বাহান্ন বছর কেটে গেছে।

প্রথমবার গিয়ে একটানা বেশ কয়েক বছর ছিলাম। সেই সময় দ'টি মৃত মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাদের একজন পর্তুগীজ, নাম মাইকেল গঞ্জালেস। অন্যজন পার্শী। গঞ্জালেসের কথা আগেই লিখেছি। এবারের গল্প দ্বিতীয় লোকটিকে নিয়ে।

বম্বে গিয়েছিলাম চাকরি-বাকরির খোঁজে। প্রথমবার গিয়ে গোড়ার দিকে পছন্দমতো কাজ পাচ্ছিলাম না। একটার পর একটা অফিস পালটাচ্ছিলাম। কোথাও পাঁচ-সাত মাসের বেশি থাকিনি। অফিস বদলের সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠিকানাও বাদলাচ্ছিল। কখনও থাকতাম সান্তাক্রুজে, কখনও গোরেগাঁওতে, কখনও বা কিংস সার্কেল স্টেশনের কাছে। সব জায়গাতেই সস্তার হোটেল।

পাঁচ-সাতটা অফিস ঘুরে শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট ওষুধের কোম্পানিতে মনের মতো চাকরি জুটল। এক গুজরাতি ফ্যামিলির পেয়িং গেস্ট হিসেবে আমি বান্দ্রার আম্বেদকর রোডে চলে এলাম। ওখান থেকে মেইন সিটি পনেরো-ষোল মাইল দূরে। সিটির জাভেরি-বাজারে পরিবারের কর্তা আন্নাভাই প্যাটেলের নানারকম ব্যবসা-ট্যাবস ছিল। তিনি এবং তাঁর বাড়ির সবাই খুব ভদ্র, সর্বক্ষণ তাঁদের মুখে হাসি। কাউকে কখনও চড়া গলায় কথা বলতে শুনিনি। বাঙালিদের সম্বন্ধে ওঁদের খুব উঁচু ধারণা। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র এবং নেতাজি সুভাষ।

ওখানে শুধু একটাই অসুবিধা। আন্নাভাইরা বিশুদ্ধ শাকাহারী। ওঁদের বাড়িতে মাছ-মাংসের প্রবেশ নিষেধ। তবে বম্বেতে প্রতিটি এলাকায় গণ্ডা গণ্ডা হোটেল-রেস্তোঁরা। ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে মুরগি, মটন চালিয়ে এলে ধরছে কে? আন্নাজভাইরা তো আর পেট চিরে দেখতে যাবেন না? মুখ বদলাবার জন্য মাঝে-মধ্যে হোটেল-টোটেলে যেতাম। দিনগুলি মোটামুটি ভালোই কাটচ্ছিল।

এবার আসল গল্পটা শুরু করা যাক।

সারাটা সপ্তাহ ওষুধ কোম্পানিতে প্রচণ্ড খাটতে হত। ওভার টাইম মিলিয়ে দিনে প্রায় দশ-এগারো ঘণ্টা। তাই ছুটির দিনে ঘরে আর মন বসত না। দুপুরের খাওযাটি সেরে বেরিয়ে পড়তাম। শহরের গা ঘেঁষে আরব সাগর। কোনও ছুটির দিনে তার পাড়ে বসে বসে সময় কাটিয়ে দিতাম, কোনও দিনে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে মোটর বোটে চলে যেতাম এলিফ্যান্টা কেভে বা শহরতলির ট্রেনে চড়ে শেষ স্টেশনে নেমে কোনও পাহাড়ি গ্রামে। এই বেড়ানোটা ছিল আমার কাছে টনিকের মতো। নতুন এনার্জি নিয়ে পরদিন ফের অফিসের ডিউটি শুরু হত।

মনে আছে, সেই ছুটির দিনটায় বেশিদূর যাইনি। আম্বেদকর রোডটা পুব থেকে বে বিশাল রাস্তাটায় গিয়ে পড়েছে সেটা এস. ভি. রোড অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ রোড। রাস্তাটা ডান ধারে মেইন সিটির মেরিন ড্রাইভ, বড়ী বন্দর, কালা ঘোড়ার দিকে দৌড় লাগিয়েছে। আর বাঁয়ে গেছে খার, সান্তাক্রুজ, আন্ধেরি-টান্ধেরি পার হয়ে ভিরারে।

আমি এস. ভি রোডে এসে ডাইনে ঘুরে হাঁটতে থাকি। মিনিট দশেক হাঁটলেই বিরাট ক্রিক বা খাড়ি। খানিক দূরে, ডাইনে আরব সাগর। সমুদ্র খাড়ি হয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে।

খাড়ির গায়ে ছোট-বড় অনেকগুলো টিলা। আমি একটা টিলার মাথায় উঠে বসে পড়লাম। আমার ডাইনে সমুদ্র। অনেকটা দূরে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটা পাহাড়ের মাথায় মাউন্ট মেরি চার্চের চুড়ো দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু বাংলো; ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে হাইরাইজ। বাঁ দিকে বেশ খানিকটা তফাতে এস.ভি. রোডের পর সাবার্বন ট্রেনের লাইন।

তখন সময়টা দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি থমকে আছে। বাহান্ন বছর আগে বম্বের শহরতলিতে লোকজন গাড়িটাড়ি আজকের তুলনায় অনেক কম। ছুটির দিনে রাস্তা সে সব আরও কমে যেত। লক্ষ করলাম এস. ভি. রোডে মাঝে মাঝে দু'চারটে প্রাইভেট কার, বাস কি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছে। ক্বচিৎ রেললাইনে দু-একটা লোকাল ট্রেন।

কাছেই খাড়ি যেখানে সমুদ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে, একসময় সেদিকে তাকাই। বেশ ক'টা মোটর বোট আর জেলেদের ট্রলার সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল থেকে অনেক উঁচুতে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে সি-গাল।

সেদিন বাতাসের তেমন জোর নেই। কেমন একটা গুমোট, থমথমে ভাব। আকাশের চতুর্দিক জুড়ে ছাড়া ছাড়া কালচে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। বর্ষার আর দেরি নেই। ছন্নছাড়া মেঘগুলো কয়েকদিনের মধ্যেই জমাটা বেঁধে অঝোরে বৃষ্টি ঝরাতে থাকবে। অবিরল, দিবারাত্রি বর্ষণ। বর্ষার দু'টো মাস বেড়ানো-টেড়ানো পুরোপুরি বন্ধ।

হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'অনুগ্রহ করে একটু শুনবেন?'

ইংরেজিতেই বলেছে। কিন্তু গলার স্বরটা চাপা, ঘষা ঘষা। কানে রীতিমতো অস্বাভাবিক ঠেকল।

চমকে ঘুরে তাকাতেই তাকে দেখতে পেলাম। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। শরীর ভারী ধরনের। সেকেলে পার্শীদের মতো ঢোলা ফুলপ্যান্ট, শার্টের ওপর গলাবন্ধ কোট, মাথায় দামি কাপড়ের প্যাঁচানো পাগড়ি। পুরনো ফোটোতে এ জাতীয় চেহারা দেখেছি। মনে হল বেশ শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত।

কিন্তু লোকটির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। কিরকম অস্বস্তি, ঠিক বোঝানো যায় না।

লোকটার চোখে পুরনো দিনের গোলাকার বাইফোকাল চশমা; সোনার ফ্রেম। তার চোখে নজর পড়তেই আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে যায়। লোকটার চোখ দুটো স্থির, আর ঘোলাটে। মণি দু'টো আবছা আবছা।

সে বোধহয় অন্যের মনের কথা পড়তে পারে। বলল, 'অনেক বছর কারও সঙ্গে কথা বলা হয়নি। তাই গলাটা ওইরকম হয়ে গেছে। বলতে বলতে ঠিক হয়ে যাবে। আর বাড়ি থেকে তো বেরুনো হয় না। তাই চোখের হাল এমনটা দাঁড়িয়েছে। তবে দেখতে অসুবিধা হয় না।'

লোকটা আচমকা কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, কে জানে। আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে প্রায় তিন-চার শো গজ দূরে, আম্বেদকর রোড আর এস. ভি. রোডের ক্রসিংয়ের মুখটায় একটা আদ্যিকালের ঘিঞ্জি বস্তি। টালির চালের লম্বা লম্বা ব্যারাক টাইপের অনেকগুলো 'চাওল' (এক ধরনের বাড়ি) গা জড়াজড়ি করে রয়েছে। সেখানে থাকে বেশ কিছু গরিব গোয়ান খ্রিস্টান, ইউ.পি'র মুসলমান আর ঘাটি (পাহাড়ি) অঞ্চলের মারাঠিরা। অমন একটা হাভাতেদের এলাকায় এই চেহারার, এই পোশাকের কেউ থাকতে পারে, ভাবাই যায় না।

আশেপাশে কোনও লোকালয় নেই। বস্তিটার ওধারে হিল রোড, লিঙ্কিং রোড, কার্টার রোডে চমৎকার চমৎকার সব বাড়ি রয়েছে। পয়সাওলা, অভিজাতদের পাড়া ওগুলো। লোকটা কি সেখান

থেকে এসেছে? কিন্তু ওধারে মানুষজন থাকতে খুঁজে খুঁজে আমার কাছে হাজির হবার কারণ কী হতে পারে? কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ি।

লোকটা এবার বলল, 'আমার নাম নওশেরজি কনট্রাক্টর।'

যা আঁচ করেছিলাম তাই। লোকটা পার্শীই। কনট্রাক্টর পদবি অন্য কোনও জাতের হয় না।

লোকটা নাম জানিয়েছে। ভদ্রতার খাতিরে নিজের নামটাও জানানো দরকার। বললাম, 'আমি বাসুদেব মল্লিক—'

লোকটা ভুল শুনেছে। বলল, 'মালিক? পাঞ্জাবি?'

ভুলটা শুধরে দিলাম।— 'না, মালিক নয়—মল্লিক। আমি বাঙালি।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, 'আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে?'

আস্তে ঘাড় কাত করল নওশেরজি।

'বলুন কী দরকার?'

'কষ্ট করে আমাদের বাড়ি আপনাকে যেতে হবে।'

'কোথায় আপনার বাড়ি?'

'কাছেই।' আমি যে টিলায় বসে ছিলাম তার পাশের টিলাটা দেখিয়ে লোকটা বলল, 'ওটার পেছন দিকে।'

টিলাটা খুঁটিয়ে লক্ষ করে বললাম, 'কোনও বাড়িটাড়ি তো দেখছি না।'

'টিলার মাথায় উঠলে দেখতে পাবেন। প্লিজ আসুন—'

লোকটা খুবই ভদ্র। তার সঙ্গে যাবার জন্য প্রায় কাকুতি-মিনতি করছে। আমি ধন্দে পড়ে যাই। জিগ্যেস করি, 'আপনার বাড়ি যেতে বলছেন কেন?'

'দু'দিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেছি। আপনাকে ওটা দেখাতে চাই।'

'ঘটনাটা কী?'

'আমাদের বাড়িতে গেলেই বুঝতে পারবেন।' বলতে বলতে হাতজোড় করল নওশেরজি। 'এই ব্যাপারে আপনার হেল্প চাই। আমার বিশ্বাস আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

কী ঘটেছে, খুলে কিছুই বলছে না লোকটা। আগে কখনও আমাদের দেখা হয়নি। তবু আমাকে তার মুশকিল আসান ঠাওরে বসে আছে। কৌতূহলও হচ্ছিল, সেই সঙ্গে খানিকটা ভয়ও। মিষ্টি মিষ্টি তোষামোদের কথা বলে লোকটা কি আমাকে কোনও ফ্যাসাদে ফেলতে চায়?

নওশেরজিকে এড়াবার জন্য শেষ একটা চেষ্টা করলাম। এস. ভি. রোড, আম্বেদকর রোড আর লিঙ্কিং রোডের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, 'ওখানে এত লোকজন থাকে। দু'দিন আগে আপনাদের বাড়িতে ঘটনাটা ঘটেছে, ওই সব জায়গা থেকে কাউকে ডেকে আনতে পারেননি?'

নওশেরজিকে খুব বিমর্ষ দেখাল। সে বলে, 'আমার পক্ষে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়। এই টিলা পর্যন্তই আমার দৌড়। তা ছাড়া, এই ক্রিকের দিকটায় কোনও লোক আসে না। হঠাৎ আপনাকে পেয়ে গেলাম। তাই—'

মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেন লোকটা টিলা ছাড়িয়ে দূরে যেতে পারে না, কে জানে।

কৌতূহলটা তীব্র হয়ে উঠেছিল। দেখাই যাক লোকটা আমাকে কোথায় নিয়ে যায় এবং কোন ঘটনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে উঠে পড়ি।—'চলুন—'

টিলা থেকে হাজার দেড়েক ফিট নীচে নেমে পাশের টিলায় উঠতে লাগলাম। নওশেরজি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

টিলাটা প্রায় ন্যাড়া। সামান্য ঝোপঝাড় এধারে-ওধারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওপরে উঠতে উঠতে নওশেরজি বলল, 'আমার সম্বন্ধে আপনার জানার খুব আগ্রহ, তাই না?'

ঠিক এইটাই ভাবছিলাম। উত্তর না দিয়ে সঙ্গীর দিকে একবার তাকাই।

নওশেরজি এবার বলে, 'আগে আমাদের বংশের কথা বলে নিই। বম্বে শহরে একসময় আমাদের বিরাট ফ্যামিলি বিজনেস ছিল। কিন্তু বাড়িতে লোকজন খুব কম। একে একে সব মারা যায়। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সে আমারও মৃত্যুও হয়। আমার এক গ্রেট গ্র্যান্ডসান বম্বের ব্যবসা বেচে দিয়ে লন্ডনে চলে গেছে। সে আর এখানে ফিরবে না।'

কী বলছে লোকটা? পঞ্চাশ বছর আগে মৃত একটা মানুষের সঙ্গে আমি কিনা তার আস্তানায় চলেছি! গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে থাকে। শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের মতো ঠান্ডা স্রোত ওঠানামা করে। পালিয়ে যে যাব তার উপায় নেই। লোকটা আমার নাকে বঁড়শি বিঁধিয়ে যেন টেনে নিয়ে চলেছে।

নওশেরজি এবারও আমার মনোভাবটা টের পেয়েছিল। বলল, 'মিস্টার মল্লিক, ভয় পাবেন না। কারও ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই।'

দু'বছর আগে জুহু থেকে আরও অনেকটা দূরে, সমুদ্রের ধারে মাইকেল গঞ্জালেসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ষাট-সত্তর বছর আগে তারও মৃত্যু হয়েছে। সেও একই কথা বলেছিল—কোনও ভয় নেই।

নওশেরজি ভরসা দিয়েছে ঠিকই, তবু আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আমরা টিলার মাথায় চলে এসেছিলাম। নওশেরজি নীচের দিকে আঙুল বাড়ায়।—'ওই যে আমাদের বাড়ি।'

টিলার এধারের ঢালে, খাড়ির কাছাকাছি, ধ্বংসস্তূপের মতো বিশাল বাড়িটা দেখতে পেলাম। একেবারে নিঝুম। টিলার আড়ালে থাকায় আগে এটা নজরে পড়েনি। মনে পড়ল, প্রায় এই ধরনেরই একটা বাড়িতে থাকত মাইকেল গঞ্জালেসও। বোম্বেতে আমার চেনাজানা অনেকেই বলেছে, আরব সাগরের ধারে বহুকালের পুরনো অনেক পোড়ো বাড়ি রয়েছে, সেখানে মানুষজন বাস করে না। তবে মাইকেল গঞ্জালেসদের মতো কেউ কেউ থাকে।

নওশেরজি বলল, 'টিলার এদিকটা বেশ খাড়াই। সাবধানে পা ফেলে ফেলে নামুন মিস্টার মল্লিক—'

এরকম একটা জায়গায় কেউ যে বাড়ি করতে পারে, চিন্তাই করা যায় না। আমি কী ভাবছি, নওশেরজি কিন্তু ঠিক ঠিক টের পেয়ে গেল। বলল, 'আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার মানে ঠাকুরদার বাবা ছিলেন অদ্ভুত ধরনের মানুষ। তিনি ভিড়টিড় একদম পছন্দ করতেন না। প্রায় দেড়শো বছর আগে এখানে কিছু মারাঠি ঘাটি আর জেলে ছাড়া লোকজন কেউ থাকত না। নিরিবিলিতে কাটাবার জন্য তিনি এই জায়গাটাই পছন্দ করেছিলেন।'

আমি উত্তর দিলাম না। নওশেরজির মধ্যে বোধহয় সম্মোহনী শক্তি আছে। সে আমাকে একরকম টানতে টানতে প্যালেসের মতো বাড়িটায় নিয়ে গেল।

মস্ত লোহার গেট জং দরে ভেঙে পড়ে আছে। বাউন্ডারি ওয়াল নেই বললেই হয়। ভেতরে পা দিলে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। একসময় বাগান-টাগান ছিল, এখন আগাছার জঙ্গল।

জঙ্গল পেরিয়ে নওশেরজি আমাকে নিয়ে মূল বাড়িতে ঢুকল। সামনের দিকে বিরাট দরজা ছিল। সেটা আর নেই, জানালা-টানালার হালও একই রকম। পাল্লা-টাল্লা নষ্ট হয়ে গেছে কবেই। চারদিকে শুধু বড় বড় ফোকর।

দরজার পরই একটা মস্ত হলঘর। সেটার চারধারে অনেকগুলো বেডরুম। দেওয়ালের

পলেস্তারা খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। শ্বেত পাথরের মেঝের বেশির ভাগটাই উধাও, বাকিটা ফেটে চৌচির । চারিদিকে মাকড়সার জাল। চামচিকে, বাদুড় আর আরশোলাদের আস্তানা। আমরা ঢুকতেই সেগুলো মহা বিরক্ত হয়ে ফরফর করে উড়তে লাগল। মেঝের কোণে কোণে অগুনতি গর্ত থেকে ইঁদুর আর গিরগিটির দঙ্গল বেরিয়ে এসে ছোটাছুটি শুরু করে দেয়।

হলঘরের একধার দিয়ে দোতলায় ওঠার ঘোরানো সিঁড়ি। রেলিং কবেই ভেঙে গেছে। এককালে সিঁড়িটা সাদা পাথরে বাঁধানো ছিল। সেটারও হাল হল-ঘরের মেঝের মতোই।

দোতলাটার নকশা হুবহু একতলার মতোই। ভাঙাচোরা মেঝে, দেওয়াল। সেইরকমই চামচিকে -টামচিকের ঘাঁটি। সেখানকার হলঘরে এসে নওশেরজি বলল, 'ওই দেখুন—সে সিলিংয়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

হৃৎপিণ্ডের ধড়ফড়ানি শতগুণ বেড়ে যায়। এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখিনি। সিলিং থেকে গলায় ধরির ফাঁস লাগানো একটা মৃতদেহ ঝুলছে। লোকটার বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। পরনে দামি প্যান্ট-শার্ট। জিভ অনেকটা বেরিয়ে এসেছে তার। গালের কষে জমাট বাঁধা শুকনো রক্ত। চোখ দুটো ঠিকরে পড়বে যেন। মৃত্যুর আগে লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তার চোখেমুখে সেই আতঙ্কের ছাপ।

আমার সারা শরীর থরথর কাঁপছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে দম আটকানো গলায় বললাম, 'নওশেরজি, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমাকে নীচে নিয়ে চলুন—'

'হ্যাঁ, চলুন।' একতলায় নামতে নামতে নওশেরজি বলল, 'মাত্র একবার দেখেই আপনি আঁতকে উঠেছেন। আমার অবস্থাটা ভাবুন, দু'দিন ধরে চোখের সামনে এই ডেডবডিটা দেখছি।'

আমি চুপ করে থাকি।

নীচে এসে নওশেরজি বাড়ির সামনের দিকের ঝোপঝাড়ের ভেতর আমাকে নিয়ে গেল।

ওখানে বসার জন্য একসময় পাথরের ক'টা বেঞ্চ বানানো হয়েছিল। ভেঙেচুরে ক্ষয়ে গেলেও সেখানে বসা যায়।

একটা বেঞ্চে আমাকে বসিয়ে কাছাকাছি বসে পড়ল নওশেরজি। বলল, 'ওই লোকটাকে দু'দিন আগে এখানে এনে গলা টিপে খুন করে ওইভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বংশের লোকজন সবাই রিলিজিয়াস মাইন্ডেড—ধর্মপ্রাণ। কেউ কখনও কোনও খারাপ কাজ করেনি, অন্যায় কিছু ভাবতেই পারত না। অথচ আমাদের বাড়িতে এরকম একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। মার্ডারারদের শাস্তি না হলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।'

আমি খানিকটা ধাতস্থ হয়েছিলাম। কোনও প্রশ্ন না করে নওশেরজির দিকে তাকাই।

লোকটা বলতে লাগল, 'ওই লোকটা মার্ডারড হয়ে যাবার পর দু'দিন ধরে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনাকে আগেই বলেছি বেশি দূরে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু এদিকে কেউ আসে না। আপনাকে পেয়ে তাই নিয়ে এলাম।'

'এবার বলুন কেন আমাকে নিয়ে এসেছেন?'

'ওই লোকটার মার্ডারারদের যাতে পানিশমেন্ট হয় তার ব্যবস্থা করতে। এইরকম একটা মারাত্মক ক্রাইম করে ওরা পার পেয়ে যাবে তা কিছুতেই হতে পারে না।'

একটা মানুষ পঞ্চাশ বছর আগে যে বেঁচে ছিল সে অন্যায় মেনে নিতে পারছে না। আর আমি জলজ্যান্ত একটা যুবক, সব দেখে-শুনেও চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এই ভাবনাটা আমাকে খোঁচা দিচ্ছিল। তার পাশাপাশি চলছিল ভয় আর দ্বিধা। এমন একটা মার্ডার কেসে নিজেকে জড়ানো কি ঠিক হবে? শেষ পর্যন্ত সব কিছু কাটিয়ে ঠিক করে ফেললাম, না, বদমাশগুলোকে ছাড়া হবে না।

জিগ্যেস করলাম, 'যে লোকটা খুন হয়েছে তার নাম-টাম জানেন?'

নওশেরজি বলল, 'যে খুনিগুলো ওকে নিয়ে এসেছিল তাদের কথা থেকে জানতে পেরেছি, ওর নাম ভরত কুলকার্নি। মারাঠি।'

'মার্ডারাররা ক'জন ছিল?'

'তিনজন।'

'ওদের নাম জানা গেছে?'

'নিজেদের যখন ডাকাডাকি করছিল তখন দু'জনের নাম শুনেছি। একজন হল ধামালু, আরেকজন হরীশ। থার্ড লোকটার নাম জানতে পারিনি। ওরা খার-এ পালি হিলের তলার দিকে একটা বস্তিতে থাকে। ধামালুরা মার্ডার করলেও আসল লোক কিন্তু অন্য। এদের কাজে লাগানো হয়েছে।

'আসল লোকটার নাম জানতে পেরেছেন?'

'না।'

খানিকক্ষণ ভেবে জিগ্যেস করি, 'মার্ডারারদের বয়েস, চেহারার ডেসক্রিপশন দিতে পারেন?'

নওশেরজি জানায়, খুনিদের বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। ধামালুর মাঝারি হাইট, শক্তপোক্ত চেহারা; গায়ের রং কালো, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কপালের ডান পাশে একটা আব আছে। হরীশ প্রায় ছ'ফিটের মতো লম্বা। হাতে-পায়ে মোটা মোটা হাড়, চৌকো মুখ, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, চোখের তারা বাদামি। তিন নম্বর লোকটা তুলনায় বেঁটে হলেও নিরেট চেহারা। তামাটে রং, ন্যাড়া মাথা, বাঁ গালে কাটা দাগ। গলায় কালো সুতোয় ক্রশ ঝুলছে। সে ক্রিশ্চান।

তিন হত্যাকারীর চেহারার বর্ণনা শেষ করে নওশেরজী বলল, 'সমস্ত জানালাম। আপনি পুলিশকে খবর দিন। আশা করি ক্রিমিনালগুলো ধরা পড়বে।'

লোকটা নিজের পরিচয় দেবার পর আমার বুকের ভেতরে যে ধড়ফড়ানি চলছিল, এখন আর সেটা নেই বললেই চলে। যদিও এখন আর বেঁচে নেই, তবু নওশেরজীকে আমার পছন্দই হয়েছে। সে ভালো মানুষ, নইলে অপরাধীদের সাজার জন্য এত ব্যাকুল হয়ে উঠত না। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম, কথা বলতে বলতে তার গলার সেই অস্বাভাবিক ঘষা ঘষা ভাবটা অনেকটাই কমে গেছে।

আমি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, আচমকা উঠে দাঁড়াল নওশেরজি। মুখচোখ দেখে মনে হল, তার কিছু একটা কষ্ট হচ্ছে। জিগ্যেস করি, 'কী হল, শরীর খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ—' কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রণায় নওশেরজির মুখটা বেঁকেচুরে যেতে লাগল। সে বলল, 'মিস্টার মল্লিক, আপনি চলে যান। প্লিজ আর বসে থাকবেন না। উঠুন উঠুন—' সে সমানে তাড়া দিতে লাগল।

একটা লোককে এই অবস্থায় ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা করছে না। মৃত্যুর পর মানুষের দুঃখকষ্টের অনুভূতি থাকে কিনা, আমার জানা নেই। বললাম, 'আমি কি আপনাকে কোনওভাবে হেল্প করতে পারি?'

'নো নো, নট অ্যাট অল। আর দেরি করবেন না মিস্টার মল্লিক। এই যে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ধরে রাখতে পারছি না।'

মাইকেল গঞ্জালেসও একই কথা বলেছিল। আমার আর কোনও প্রশ্ন করতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হল না। নওশেরজিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিলা বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম।

ওপর থেকে নওশেরজির গলা ভেসে এল, 'দয়া করে পেছন দিকে তাকাবেন না। সামনে চোখ রেখে সোজা চলে যান।'

অদম্য একটা কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। আরও খানিকটা নেমে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি, বারণ করা সত্ত্বেও ঘুরে তাকাই। দেখলাম, নওশেরজি ওদের বাড়ির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। তার হাত ঘাড় গলা বা শরীরের অন্য কোনো অংশ চোখে পড়ছে না। শুধু প্যান্ট-শার্টের ওপর একটা পাগড়ি এগিয়ে চলেছে। পুরো শরীরটাই ধড়মুন্ডুসুদ্ধ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেন সে আমাকে পেছন ফিরে তাকাতে নিষেধ করেছিল, এবার বোঝা গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লোকটার সঙ্গে কথা বলেছি, তাকে খুব ভালোও লেগেছে। তবু এমন একটা দৃশ্য দেখে পা থেকে মাথা অব্দি কেঁপে গেল।

আম্বেদকর রোডে নিজের আস্তানায় ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগলাম। নওশেরজিকে কথা দিয়েছি, খুনিদের যাতে চরম শাস্তি হয়। পুলিশকে না জানালে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু থানায় গেলে মার্ডারের মামলায় আমি জড়িয়ে যাব না তো? পঞ্চাশ বছর আগে মৃত একটি লোকের কথায় আমি খাড়ির ধারের পুরনো ভাঙা বাড়িতে গিয়েছিলাম, পুলিশ তা বিশ্বাস করবে? অনেক চিন্তা-টিন্তার পর ঠিক করলাম, না, ঝঞ্ঝাটের ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে থাকার মানে হয় না। বাঙালি যে ভীতু, কাপুরুষ নয়, কথা দিলে কথা রাখে, নওশেরজিকে তা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল, এই এলাকা অর্থাৎ বান্দ্রার পুলিশ অফিসারদের বিশেষ করে থানার ওসি'র সঙ্গে আমার বাড়িওয়ালা আন্নাভাই প্যাটেলের জানাশোনা আছে। শুনেছি ওসি মধুকর আপ্তে আন্নাভাইকে যথেষ্ট খ্যাতির-টাতির করেন। কেননা তাঁর ছোট ভাই মধুকরের ছেলেবেলার বন্ধু।

ছুটির দিন। তাই আন্নাভাই বাড়িতেই ছিলেন। তাঁকে আমার ঘরে ডেকে এনে সব বললাম। অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখ খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে রইল। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'আপনি ঠিক দেখেছেন বাবুজি? চোখের ভুল হয়নি তো?' তিনি আমাকে বাবুজি বলে ডাকতেন।

'একেবারেই না। আমার মনে হয়, এখনই থানায় খবর দেওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।'

ঘটনাটা খুব সম্ভব আন্নাভাইকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনিও নিজের চোখে দেখে সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করে নিতে চান।

আমরা বান্দ্রা থানায় চলে এলাম। ওসি মধুকর আপ্তে তাঁর কামরাতেই ছিলেন। আন্নাভাইকে দেখে তিনি যতটা খুশি ততটাই অবাক। যত্ন করে আমাদের বসিয়ে আন্নাভাইকে বললেন, 'কী ব্যাপার ভাইসাহেব, আপনি তো কখনও থানায় আসেন না। হঠাৎ কী মনে করে?'

আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নওশেরজি এবং তাঁর বাড়ির সেই ঝুলন্ত মৃতদেহটির কথা জানালেন আন্নাভাই।

মধুকর আপ্তের দৃষ্টি এবার আমার দিকে ঘুরে গেল। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। তারপর আন্নাভাই যেমন বলেছিলেন সেই ভঙ্গিতেই জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি খারাপ স্বপ্ন দেখে সেটা সত্যি বলে ভেবেছেন?'

বললাম, 'না স্যার। এই খানিকক্ষণ আগে আমি নওশেরজিকে আর তার বাড়িতে ডেডবডিটা দেখে এসেছি। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কী করে?' একটু থেমে যে লোকটা খুন হয়েছে তার নাম, যারা খুন করেছে তাদের চেহারার বর্ণনা, নাম এবং কোথায় তাদের পাওয়া যেতে পারে, জানিয়ে দিই। অর্থাৎ নওশেরজির কাছে যেমন যেমন শুনেছি তাই বললাম।

মধুকর আপ্তে বললেন, 'ভূত এবং মার্ডার মিলিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং কেস। চলুন, দেখেই আসা যাক।'

আন্নাভাই এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে জিপে করে খাড়ির কাছে চলে এলেন। জিপ থামিয়ে দিয়েছিলেন মধুকর। কেননা সামনেই টিলা। আমিই পথ দেখিয়ে টিলা বেয়ে বেয়ে সেই ভাঙা বাড়িটায় ওঁদের নিয়ে গেলাম।

ঝুলন্ত মৃতদেহটি দেখে মধুকর আপ্তে এবং আন্নাভাই স্তম্ভিত। মধুকর বললেন, 'এ আমি ভাবতেই পারি না। আপনার সেই নওশেরজিকে ডাকুন—'

আমি গলা উঁচুতে তুলে অনেক ডাকাডাকি করলাম কিন্তু নওশেরজির সাড়া পাওয়া গেল না।

মধুকর হেসে বললেন, 'পুলিশ দেখে বোধহয় আপনার বন্ধু ঘাবড়ে গেছে। তাই দেখা দিতে চাইছে না। সে যাক গে, এখন ফেরা যাক। ডেডবডি নামিয়ে পোস্ট মর্টেমের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে মার্ডারারগুলোকে ধরার জন্য ইনভেস্টিগেশনও শুরু করব।'

নীচে নেমে জিপে উঠে ফিরে যেতে যেতে মধুকর এবার আমাকে বললেন, 'যতদিন না কালপ্রিটগুলো ধরা পড়ছে, আপনি বম্বে ছেড়ে যাবেন না।'

ও সি কি আমাকে কোনওরকম সন্দেহ করছেন? ভয়ে আমার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যায়। সেটা লক্ষ করে একটা হাত আমার কাঁধে রেখে হেসে হেসে বললেন, 'কোনও ভয় নেই। এটা থানার রুটিন ব্যাপার। আপনি ডেডবডির খবর দিয়েছেন। কোর্টে কেস উঠলে আপনাকে সাক্ষী দেবার জন্যে ডাকা হবে। সেই কারণেই থাকতে বলা।'

আমি খুব একটা ভরসা পেলাম না। পুলিশের মনে কী আছে, কে জানে।

তিনটে দিন ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে কেটে গেল। তারপর মধুকর আপ্তে ফোন করে জানালেন, তিন অপরাধীই ধরা পড়েছে। তারা ভাড়াটে খুনি। যাকে মার্ডার করে ঝোলানো হয়েছিল সেই ভরত কুলকার্নির দুই আত্মীয় সম্পত্তির লোভে ওদের কাজে লাগিয়েছিল।

বিচারে তিনজনের দশ বছরের জেল হয়। ভরতের দুই আত্মীয়র অপরাধের মাত্রাটা অনেক বেশি। তাদের হয় যাবজ্জীবন কারাবাস।

বিচারের পর সেই ভাঙা বাড়িতে একবার গিয়েছিলাম। নওশেরজির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। অনেক, অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে সে বলেছে, 'আপনার জন্যেই মার্ডারারগুলোর সাজা হল।'

বললাম, 'আমার চেয়ে আপনার কৃতিত্ব একশো গুণ বেশী। আমাকে এ বাড়িতে যদি না নিয়ে আসতেন, খুনিদের নাম না বলতেন, ওদের ধরাই যেত না।' একটু থেমে জিগ্যেস করেছি, 'একটা ব্যাপারে আমার একটু ধন্দ আছে। সেদিন যখন পুলিশ অফিসারকে নিয়ে এ বাড়িতে আসি, আপনাকে কতবার ডেকেছি কিন্তু আপনি সাড়া দেননি। সামনেও আসেননি। কেন বলুন তো?'

নওশেরজি বলেছে, 'পুলিশকে আমার ভীষণ ভয়। তাই—'

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। বম্বে থেকে আমি কলকাতায় চলে এসেছি। শুনেছি সেই ভাঙা বাড়িটা আর নেই। সেখান দিয়ে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিরাট রাস্তা বার করেছে। চারপাশ উঁচু উঁচু বাড়িতে ছয়লাপ।

নওশেরজি কোথায়, কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, কে জানে। সেবার ভূত আর হত্যারহস্য নিয়ে বেশ একটা নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সারা জীবনে কখনও তা ভুলব না।

শারদীয়া ১৪১৩

এ কি?

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠিক রাত ন'টা। তিনটে ঘড়ি একসঙ্গে বাজছে। একটা দালানে, একটা দোতলায় ওঠার সিঁড়ির বাঁকে। আর একটা দোতলার হলঘরে। ঐতিহাসিক হলঘর। ভীষণ সাজানো। বড় বড় সোফা, সেন্টার টেবল, কর্নার টেবল, ডিভান। এক দেয়ালে মূল্যবান কিছু বই। একটা অর্গান। এই ঘরেই আছে বিখ্যাত সেই গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। ভারী গম্ভীর আওয়াজ। আমার দাদুর প্রাণের ধন। দাদুর ঘড়ির শখ বড়মামা পেয়েছেন। আর পেয়েছেন ডাক্তারি। দাদু খুব নামকরা বিলেত ফেরত ডাক্তার ছিলেন। বড়মামাও ডাক্তার তবে দাদুর মতো হতে পারেননি। ভীষণ খেয়ালী। যখন যা মাথায় ঢুকবে সঙ্গে সঙ্গে তা করতে হবে নাওয়া-খাওয়া ভুলে। মাসিমা খুব রাগ করেন। করলে কি হবে! বড়মামা নিজের মতো চলবেন। মেজমামা ভারী শান্তশিষ্ট, অধ্যাপক। লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। মাঝে মাঝে খুব দুঃখু করে আমাকে বলেন, 'তুই আমাদের একটাই ভাগনে, অসৎ সঙ্গে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিস!' অসৎ সঙ্গ মানে বড়মামা। আমি বড়মামার ডান হাত। বড়মামা সেটা ঘোষণা করে দিয়েছেন। আবার বলেছেন, 'এই দুনিয়ায় ও ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওকে আমি ভুবনবিখ্যাত ডাক্তার করব। রুগির ছায়া দেখে রোগ বলে দেবে।' এই কথা শুনে মেজমামা জোরে একটা শব্দ করেছিলেন 'হুম'। বড়মামা খুব রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, 'বুঝতেই পারছ! চতুর্দিকে আমাদের শত্রু। এই অবস্থায় তোমার নিজের ওপর নিজের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আমার সঙ্গে কো-অপারেট কর। প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ো না। অনেকেই স্নেহ-ভালোবাসা দেখাবে—সে সব মেকি। তুমি বুদ্ধিমান, বুঝতেই পারবে—হোয়াট ইজ হোয়াট।' মেজমামা ঢেঁকুর তোলার মতো একটা শব্দ করেছিলেন।

বড়মামা বলেছিলেন, 'বদহজম। এক চামচে সোডি বাইকার্ব। পরিশ্রম নেই, শুধু খাওয়া।'

মেজমামা খুক খুক করে কাশলেন।

মাসিমা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যকের ধন পড়ছিলেন। সামনে চায়ের কাপ। মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছিলেন। বইয়ের পাতা থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, 'তোরা কোনোদিন বড় হবি না, তাই না? চিরকাল শুম্ভ-নিশুম্ভই থেকে যাবি?'

মেজমামা বললেন, 'ওর একার ভাগনে? ও আমারও ভাগনে। আমি দেখেছি ওর লিটারেচারে টেস্ট আছে। আমি ওকে প্রফেসার করব। অক্সফোর্ডে পাঠাব। নামকরা অধ্যাপক হবে। লেখক হবে, দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র।'

বড়মামা তেড়েফুঁড়ে বলেছিলেন, 'হি ইজ মাই ভাগনে, ওনলি ভাগনে, ও এফ আর সি এস হবে, হবে, হবে। ওর কঙ্কালে ইন্টারেস্ট আছে। অ্যানাটমি আয়ত্ত করে ফেলেছে। সবচেয়ে টাফ সাবজেক্ট। ডাক্তারের জীবন সেবার জীবন। মানব কল্যাণের ব্রত ধারণ।'

মাসিমা বললেন, 'তোমরা থামবে? না আমি বেরিয়ে যাব? ভাগ্যিস! এ দুটো বিয়ে করেনি। বেশি দিন বাঁচত না। গলায় দড়ি দিত।'

মেজমামা হঠাৎ সুর পালটে বললেন, 'বড়দা! আমিও চাই ও ডাক্তার হোক, নোব্‌ল প্রফেশন।'

'তুই বলছিস?'

'হ্যাঁ, বলছি। মানবদরদী ডাক্তার। আমার ডেথ সার্টিফিকেট ও লিখবে। ও ডাক্তার না হওয়া পর্যন্ত আমি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখব। মৃত্যু উইল ওয়েট ফর হিম।'

বড়মামার মুখটা থমথমে হয়ে গেল। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'তুই আমার আগে চলে যাবি? আমার আগে?'

বড়মামা মাথা নিচু করে ঘরের বাইরে বারান্দায় চলে গেলেন।

মাসিমা বললেন, 'কাঁদালি তো! জানিস তো, ওর ভেতরটা কত নরম!'

মেজমামাও বারান্দায় উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দুজনে হাসতে হাসতে ঘরে ফিরে এলেন।

মাসিমা বললেন, 'আমি একটা সার্কাস খুলব।'

বড়মামর ঘড়িঘরে শ'পাঁচেক বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের ঘড়ি। অদ্ভুত সব দেখতে। সব কটাই চলছে। কোনোটার আওয়াজ টক্‌টক্, কোনোটার খচখচ। কোনোটার খড়খড়। মেজমামা বলেছেন, 'কালে এই ঘড়িঘর একটা বিস্ময়ের জায়গা হয়ে উঠবে।' মেজমামাও খুব উৎসাহী। আমাদের কাজে সাহায্যও করেন। সাবধানে মুছতে হয়, দম দিতে হয়। এক একটা ঘড়ির কারুকার্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মেজমামা বললেন, 'মানুষ কি-না পারে? মানুষই ভগবান, মানুষই শয়তান। বড় বড় যুদ্ধে এইরকম কত ঘড়ি, পিয়ানো, অর্গ্যান ভেঙে চুরমার করেছে। মিউজিয়াম, লাইব্রেরি শেষ করে দিয়েছে।'

মেজমামা ভীষণ ভাবুক। মাথায় কোনো ভাবনা এলে চলে যান দোতলার বারান্দার একেবারে পশ্চিম দিকে। ওখানে একটা গোল বেতের চেয়ার আছে। বসলে সারা শরীর ঢুকে যায়। বাইরে বড় বড় গাছ। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গা, গঙ্গার জলের চিকিমিকি। একটা গাছ আছে—সুন্দর গন্ধ ছড়ায়। মন্দির-মন্দির, আরতি-আরতি। বসে থাকেন স্থির হয়ে, ভাবনা নিয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে একটা স্ট্যাচু। ফর্সা ধবধবে। বড় বড় চুল। এই সময়টায় মেজমামাকে মনে হত একেবারে অন্য এক মানুষ—হিমালয়ের মুনি-ঋষি। চুপি চুপি এসে বসে থাকতুম তাঁর পায়ের কাছে। বড়মামা একদিন একটা কাণ্ড করলেন। মেজমামার পা স্পর্শ করে বলতে লাগলেন, 'তুই আমার ভগবান।'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে বড়মামাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলতে লাগলেন, 'তুমি আমার মহাদেব, শিবশম্ভু।' একসময় দেখা গেল দুজনেই মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

রাত নটা। মাসিমার কড়া হুকুম—এ একবার, সে একবার, এই নিয়ম চলবে না। 'ডিনার অ্যাট নাইন'।

বড়মামা বলেছিলেন, 'ঠিকই তো, ঠিকই তো। একটা নিয়ম অবশ্যই থাকা উচিত। সবাই মিলে গল্প করতে করতে খাবো। শিক্ষামূলক গল্প, জীবনের নানা অভিজ্ঞতার গল্প। তাছাড়া প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্লেটের দিকে নজর রাখব। কম-বেশি হচ্ছে কি-না, অবিচার। আমাকে ছোট মাছ, মেজোকে বড়। আমাকে হয়ত একটা আইটেম দেওয়াই হল না। এই তো সেদিন আমাকে আনারসের চাটনি দেওয়াই হল না।' মাসিমা বললেন, 'তার মানে? তোমাকে দুই দুই করা হয়?'

'হতেই পারে। মেজোকে একটু বেশি ভালোবাসো। পণ্ডিত মানুষ! ভালোই খেতে পারে। গল্প-কবিতা লেখে। আমি তো মজদুর!'

'এর মধ্যে আনারসের চাটনি কবে হল?'

'রবিবার। লাস্ট সানডে।'

'ওরে মুখপোড়া, ওটা আনারস নয় পেঁপে। পেঁপে তুই খাস না।'

বড়মামা মাসিমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, 'এ তুই কি বললি রে! মা চলে যাওয়ার পর এই কথাটা আমাকে কেউ বলে না রে। বলার মতো কেউ নেই। তোর মধ্যে মা এসেছেন।

মা এসেছেন।’

মাসিমা বললেন, ‘মা চলে যাওয়ার পর থেকে তোরা এমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছিস, আমি আর সামলাতে পারছি না। ভাবছি দিনকতকের জন্যে কোথাও চলে যাব।’

‘আমরাও যাব।’

‘তাহলে তো হয়েই গেল।’

‘তুই চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব, কে দেখবে আমাদের, বাপ-মা মরা দুটো অসহায় অনাথ। কি বল মেজ?’

‘আমাদের এই ভবিষ্যৎ আমি ভাবতেই পারছি না।’

‘কোনো অনাথাশ্রমে চলে যাবি?’

‘এই বয়সে নেবে না রে!’

ন’টা বেজে পনেরো মিনিট। বড়মামা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন। ‘লেট, লেট। উপায় ছিল না। যমে-মানুষে টানাটানি। মানুষের যত পয়সা বাড়ছে, ততই শরীর খারাপ হচ্ছে। সব এক একটা রোগের ডিপো। ওষুধ খেয়ে ক’দিন বাঁচা যাবে! আচ্ছা, তোমরা সবাই আসন গ্রহণ করো, অত্যন্ত জরুরি কিছু কথা আছে।’

মেজমামা বললেন, ‘আমরা তো আসনেই বসে আছি লাস্ট হাফ অ্যান আওয়ার।’

বড়মামা ভুরু কুঁচকে জলের গেলাসের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের মনেই এই সব কথা বলতে লাগলেন, ‘ক্রিস্ট্যাল, ক্রিস্ট্যাল, ফেথ, ফেথ, অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসী।’

কিছুক্ষণের নীরবতা। এরপর হাতে একটা চামচে তুলে নিয়ে বললেন, ‘ভাবছি, তোমাদের বলব কি বলব না! তোমরা অবিশ্বাসী, নাস্তিক। সন্দেহবাদী। পামর!’

মেজমামা বললেন, ‘যাঃ, হয়ে গেল। দু’দিন কি তিনদিন, যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনেছিল, আমি দেবতা, তুই দেবী, চোখে জল, নাক ফোঁস ফোঁস, আবার যে কে সেই। আরো এক ধাপ এগিয়ে, আজ বললে, পামর নতুন শব্দ। কোথা থেকে শিখে এল কে জানে? যাক গে, এখন ডিনার সার্ভ করতে বল, খেয়ে-দেয়ে দুর্গা বলে শুয়ে পড়ি।’

মাসিমা বললেন, ‘সত্যি বলছি, আমার আর ভালো লাগছে না, আমি বৃন্দাবনে চলে যাই।’

মেজমামা বললেন, ‘অসম্ভব মশা। ম্যালেরিয়া। তুই বরং কাবুলে যা। ওখানে কাবলি ছোলা দিয়ে সুন্দর ঘুগনি করে, আমার এইরকম ধারণা, তাছাড়া খেজুর, খুবানি, মেওয়া, বর বড় কাবলি কলা, বেদানা।’

বড়মামা এতক্ষণ যেন একটা ঘোরে ছিলেন। চটকা ভাঙল। বললেন, ‘হ্যাঁ, কি বলছিলুম?’

‘কি আর বলবে? আমাদের ঝাড়ছিলে?’

‘তোমাদের নয়। আমি আমাকে ঝাড়ছিলুম। আমি একটা বাঁদর।’

‘এটা তোমার অনেকদিনের দুর্বলতা, নিজেকে যা-তা বলা। কবে কোথায় কার কাছে শুনেছ, মহান ব্যক্তিরাই আত্ম-সমালোচনা করে। সেই ছেলেবেলায় পড়েছ, ‘আপনারে বড় বলে বড় সেই নয়, লোক যারে বড় বলে বড় সেই হয়’। এও একধনের অহংকার!’

সে তুই আমাকে যা বলতে চাস বল, আমি কিচ্ছু মনে করব না। কেন বাঁদর বলছি জানিস, আমি আজ একটা কলাবাগানে গিয়েছিলুম, যেখানে শুধু কলা। আমি এক-নাগাড়ে বারোটা কলা খেয়েছি। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।’

‘একসঙ্গে অত কলা খেলে কেন?’

‘আরে মর্তমান কলা। একটা কাঁদি গাড়ির ডিকির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কাল সকালে খাবি।

এখন কাজের কথা। খুব মন দিয়ে শোন। আমি গত একমাস ধরে রোজই এক স্বপ্ন দেখছি। একেবারে স্পষ্ট। স্বপ্নটা হল—এই বাড়িটা ছাড়াও আমাদের আর একটা বাড়ি আছে। সেটা আরো সুন্দর। এই স্বপ্নটা আমার বিশ্বাসে ঢুকে গেছে।'

মেজমামা বললেন, 'কি আশ্চর্য! আমিও তো ওই একই স্বপ্ন দেখছি। বাড়িটা একটু মিস্টিরিয়াস।'

'রাইট। বেশ একটু ছমছমে। একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে যেতে হয়। বড় রাস্তা থেকে বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায় না। বড় বড় ইউক্যালিপটাস, দেবদারু, অর্জুন গাছ দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে চার্চের মতো চূড়া। সদর দরজা বেশ বড়। দামি কাঠের। একসময় ঝকঝকে পালিশ ছিল। পেতলের পাটি লাগানো। হালকা সবুজ রঙ।'

'আর বলতে হবে না। সেম বাড়ি। ভেতরে ঢুকেছ?'

'ঢুকেছি বলেই তো বলছি। বাড়িটার ভেতরে অনেক রহস্য।'

'কি ভাবে ঢুকলে? সামনের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ!'

'পেছন দিক দিয়ে ঢুকলুম।'

'রাইট। বিরাট একটা নিম গাছ।'

'হ্যাঁ। নিম গাছ।'

'আরে বাবা, একই বাড়ি। তুমি বলো না। আমি তো রোজই যাচ্ছি। আজও হয় তো যাব।'

'আমার সঙ্গে তোর দেখা হচ্ছে না কেন?'

'ঠিক বলেছ। দুজনে একই সময় একই জায়গায় যাচ্ছি, দেখা হচ্ছে না কেন?'

মাসিমা বললেন, 'এদের দুটোরই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

মেজমামা বললেন, 'আজ তুমি একটা নীল রঙের জামা পরে যাবে; আর আমি লাল।'

বড়মামা বললেন, 'এই সেরেছে। আমার তো নীল রঙের জামা নেই, সব সাদা।'

'ঠিক আছে সাদাই পোরো।'

মাসিমার বেশ মজা লেগেছে মনে হয়। মাসিমা বললেন, 'তোমরা কটার সময় বেরোবে?'

বড়মামা বললেন, 'এই বারোটা নাগাদ। তবে ট্রেন লেট করলে, দু-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে।'

'কোন ট্রেন?'

'ড্রিম এক্সপ্রেস, সিলভার লাইন, বেড প্ল্যাটফর্ম।'

বড়মামা বললেন, 'নাও আই অ্যাম সিরিয়াস, অ্যাজ সিরিয়াস অ্যাজ এ গোট।'

মেজমামা বললেন, 'এই যে মাঝে মাঝে তুমি এক একটা ইংরিজি বলো, পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়।'

'কেন, গ্রামার তো ঠিকই আছে।'

'গোট বললে কেন? গোট কি সিরিয়াস?'

'কি জানি! মুখে এলো বলে দিলুম।'

'এবার থেকে মুখে এলে বলবে না, মন দিয়ে যাচাই করে নেবে।'

'ওকে, ওকে। এখন আমরা সিরিয়াসলি একটু বসব। আমার মনে হচ্ছে, বাড়িটা কোথাও আছে। বাবা দেশভ্রমণ করতেন সঙ্গী হতেন মাস্টারমশাই। একবার যেন মাকে এইরকম একটা বাড়ির কথা বলেছিলেন। সবটা শোনার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বিষয়-সম্পত্তি বোঝার বয়েস তখনো আমার হয়নি। এখনো হয়নি। আর বাবাও খুব চাপা স্বভাবের ছিলেন। কোথায় কি করছেন, না করছেন কারোকে বলতেন না। কেউই আর বেঁচে নেই। এখন এসো স্বপ্ন আমাদের

কি ক্লু দিচ্ছে দেখা যাক। বড় রাস্তাটা খুব উঁচু। কেন? নিশ্চয় ওটা বাঁধের রাস্তা। তুমি কি বল?'

'সে কি! পাহাড়ে ওঠার রাস্তা নয়; কারণ পাহাড়ের রাস্তা থেকে শাখা রাস্তা বেরোতে পারে না।'

'রাইট! এইবার বাঁধ মানে, হয় ডানদিকে, না হয় বাঁদিকে একটা নদী থাকবে। আমরা বাঁদিকের ঢালু রাস্তা দিয়ে নামি। তাহলে নদীটা আছে ডানদিকে।'

'ঠিক। এখন নদীটার নাম কি? কোথায় আছে? বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা!'

'ঘাটশিলা ছিল বাবার খুব প্রিয় জায়গা। নদীর নাম সুবর্ণরেখা। কি মনে হয়?'

'একদম।'

'তাহলে একটা এক্সপিডিশান করে দেখলে হয়। কিছু না হোক বেড়ানো তো হবে। আবহাওয়াটা সুন্দর যাচ্ছে। বর্ষা চলে গেছে। শরৎ। ঝলমলে রোদ।'

মাসিমা বললেন, 'আমিও যাব।'

'অবশ্যই! তুই তো আমাদের ঝগড়ার রেফারি। তুই তো আমাদের গুডলাক। আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছিস। আর এই শয়তানটাও যাবে।'

আমি কখনো শয়তান, কখনো ভগবান। শৈলী ওপাশে সব গোছগাছ করছিল, বললে, 'আমাকে তো যেতেই হবে। চা, কফি, পকোড়া—কে খাওয়াবে?'

মাসিমা বললেন, 'আমি গেলে তুইও যাবি।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে শঙ্করকে বলে দাও, ওর বড় গাড়িটা আমাদের চাই, আর ও চালাবে। কবে? কাল ভোরে পারবে?'

মাসিমা বললেন, 'আমাকে এখনই বললে এখনি।'

'এখন দেখতে হবে শঙ্কর গাড়িটা দিতে পারবে কি না?'

বড়মামা আমাকে বললেন, 'ভুতো বোম্বাই ফোন লাগা।'

ফোন বাজছে, 'শঙ্করকাকু! তুমি কোথায়?'

'তোমাদের বাড়ির গেটে।'

সে কি গো? কি করছ ওখানে?'

'ডাক্তারবাবুকে চাই। আমার বোনের পেট ব্যাথা করছে।'

বড়মামা বললেন, 'দেখেছিস, একেই বলে, মেঘ না চাইতেই জল।'

শঙ্করকাকু সবসময় ফিটফাট। দারুণ দেখতে। ব্যায়াম করা শরীর। পেঁয়াজি খেয়ে পেট ব্যাথা। বড়মামা একগাদা ওষুধ বের করে হাতে দিতে দিতে বললেন, 'কাল ভোরবেলা পারবে?'

'আমি পারব, নো প্রবলেম, একটাই সমস্যা, আমার বোনের পেঁয়াজি।'

'জানি, তোমার বোন তোমার প্রাণ। তা কালকের দিনটা দেখ। উদ্বেগ নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।'

'বড়দা, আমি আবার ভাবছি, যদি অনুমতি করেন ওকেও নিয়ে যাব। একটু বেড়িয়ে আসবে।'

'খুব ভালো। ওকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। বড় ভালো মেয়ে। ওষুধ খেয়ে কেমন রইল আমাকে জানাবে।'

বড়মামার ঘুম নেই। ছটফট, ছটফট। মেয়েটা কেমন রইল। দুটোর সময় শঙ্করকাকুর ফোন, 'ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।'

সকাল আটটা। শঙ্করকাকুর ঝকঝকে নতুন গাড়ি। আমরা একবারে সেট হয়ে গেছি। বড়মামা সামনের আসনে। গলায় ঝুলছে বাইনোকুলার। মাসিমা আর শৈলীদি প্রচুর খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়েছেন। ফ্লাস্কে চা। কাগজের গেলাস। প্লেট। ছোটো ছোটো তোয়ালে। শঙ্করকাকুর বোন উমা

মাসিমার পাশে। খাবারের গন্ধে ভেতরটা ভরে গেছে। আমি আর মেজমামা একেবারে পেছনে। মেজমামার একটু বেশি জায়গা লাগবে। আরাম করার জন্যে মাঝে মাঝে এদিকে-ওদিকে কাত হবেন। আর একটা কথা বলছি, বলাটা ঠিক হবে না হয়তো, তবু বলছি, সকলের পেছনে লাগার জন্যে পেছনে বসাই ভালো। উপযুক্ত স্থান।

উমার খুব আনন্দ। মুখ-চোখ ঝলমল করছে। বলছে, 'আমাকে কেউ কখনো বেড়াতে নিয়ে যায় না। এই প্রথম। আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বললেন, 'নাচটা এখন চেপে রাখ। পরে লাগবে।'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'জানি না রে।'

'সে আবার কি?'

'আমরা একটা অভিযানে যাচ্ছি।'

আমি উমার দিকে তেমন তাকাচ্ছি না। লজ্জা করছে। এই তিন-চারদিন আগে ওদের বাড়ির সামনে পা পিছলে ধপাস। ও বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। দৌড়ে এসে আমাকে হাত ধরে তুলল। ইটের টুকরোয় হাঁটুটা কেটে গিয়েছিল। বাইরের ঘরে চেয়ারে বসিয়ে ড্রেস করে ব্যান্ড-এড লাগিয়ে দিল। শুধু জিগ্যেস করেছিল, 'শুকনো ডাঙায় পড়লে কি করে?'

মেয়েদের সামনে পড়ে যাওয়াটা ভীষণ লজ্জার; কিন্তু উমা কি ভলো মেয়ে! হাসেনি। মুখ টিপেও না। বরং বলেছিল, চটিটা পাল্টাও। তলাটা ক্ষয়ে গেছে। উমা আবার এখন না বলে বসে, তোমার পা কেমন আছে? না, মাসিমার সঙ্গে গল্পে মত্ত। কত রকমের গল্প। দু'পাশের দৃশ্য গোগ্রাসে গিলছে। মেজমামা সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর কতদূরে সেই স্বপ্নের জায়গাটা!

রূপনারায়ণের ব্রিজটা পেরোতেই বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। জায়গাটার নাম মনে পড়েছে—গা, গা, প্রথম অক্ষর গা। গা দিয়ে কতকগুলি নাম বল না!'

'গান্ধার।'

'ধুস্, সে তো অনেক উঁচুতে। মহাভারতের গান্ধারীর বাপের বাড়ি।'

'তা হলে গাড্ডুলিয়া।'

'সে আবার কোথায়? আর একটু ভাব। আসছে, আসছে, এসে গেছে, গালুডি, গালুডি।'

শঙ্করকাকু গোঁৎ করে গাড়িটা বাঁদিকের একটা হোটেলে ধাবায় ঢুকিয়ে দিলেন, 'এইবার লাঞ্চ।'

বড়মামা বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তো প্রচুর খাবার-দাবার।'

'এই ধাবার মালিক আমার অনেকদিনের বন্ধু। এখানে টয়লেট আছে।'

উমা আমার পাশে এসে বসল। আমার হাঁটুর ওপর একটা হাত রেখে নিচু গলায় জিগ্যেস করল, 'কেমন আছে?'

'তুমি যে ব্যান্ড-এড লাগিয়ে দিয়েছিলে, সেটা লাগানোই আছে।'

'চটি বদলেছ?'

'ফেলে দিয়েছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে। বড়দের কথা শুনতে হয়।'

'কে বড়?'

'আমি, আবার কে?'

'আমার চেয়ে এক বছরের ছোট।'

'শোন, একটা হিসেব শোন। ছেলেদের একবছর, মেয়েদের দু'বছর। শুনিসনি, মেয়েদের বাড় কলাগাছের বাড়। ওই লম্বা সুন্দর গাছটা কি গাছ রে?'

'স্বর্ণচাঁপা।'

'চল না, ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি।'

ঘোরা আর হল না। খাবার এসে গেল।

সূর্যাস্তের একটু আগেই আমরা সেই স্বপ্নে দেখা জায়গাটায় এসে গেলুম। বড়মামা মেজমামাকে বললেন, 'তুই শুধু একবার মিলিয়ে নে। এই দেখ রাস্তাটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নামছে। বাঁদিকে একটা দোকান। সাইনবোর্ড। অস্পষ্ট হলেও পড়া যাচ্ছে। গালুডি।'

'বাড়িটা চিনবি কি করে?'

'কেন? মনের ছবি!'

'কতটা ঢুকতে হবে?'

'দাঁড়া। ঢালু রাস্তাটা সমতলে এলে আমাদের ডানদিকে যেতে হবে। বাড়িটা বাঁদিকে। সাদা ফুলে ভরা টগর গাছ। গন্ধরাজ।'

শঙ্করকাকু ধীর গতিতে চলেছিলেন। জোরে যাওয়ার উপায় নেই। ফালি রাস্তা। পাথর পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। শঙ্করকাকু বলছেন, 'বেশ মজা লাগছে।' বড়মামা বসে আছেন খাড়া হয়ে। এপাশে, ওপাশে কয়েকটা বাড়ি। লোক নেই। লতাপাতা ঝুলছে। বাঁদিকে প্রাচীন একটা পাঁচিল শুরু হল। রাস্তাটা একটু পরেই ছোটখাটো একটা জঙ্গলে ঢুকে যাবে।

বড়মামা বললেন, 'শঙ্কর! গাড়িটা তুমি একপাশে রাখ। মেজো আর ভ্যাবলা নেমে আয়। মনে হচ্ছে আমরা ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এপরেই জঙ্গল, বিরাট একটা তেঁতুল গাছ। মেয়েরা গাড়িতেই থাকো। আমরা একবার দেখে আসি।'

আপাতত আমার নাম ভ্যাবলা। উমা বললে, 'ওর এই সুন্দর নামটা তো জানতুম না।'

মাসিমা বললেন, 'আমিও না। ওর থেকে থেকে নাম পাল্টায়। দেবতাদের ব্যাপার।'

বড়মামা বললেন, 'মেজো! মিলিয়ে নে। ওই দেখ চার্চের মতো চুড়ো। মেহগনি কাঠের প্যানেল দরজা। চারধাপ পাথরের সিঁড়ি। ঢালাই গেট। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; অর্থাৎ কেউ আছেন।'

মেজমামা বললেন, 'খট্‌খটাব?'

'আস্তে। টুক্ টুক্ টুক্। জাস্ট তিনবার।'

দরজা খুলল। দাঁড়িয়ে আছেন মুনি-ঋষির মতো এক মানুষ। ধবধবে ফর্সা। সাদা চুল, সাদা দাড়ি। সাদা ধুতি, সাদা চাদর। ঘরের ভেতর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ঝকঝকে পরিষ্কার লাল মেঝে। মিষ্টি ধূপের গন্ধ। তিনি অদ্ভুত একটি কথা বললেন, 'যাক, তোমরা শেষ পর্যন্ত এলে!'

বড়মামা আমাকে বললেন, 'ওদের নিয়ে এস।'

বাড়ির বাইরে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা 'ব্রজধাম'। ছোট্ট একটা আশ্রম। ঠাকুরঘরে অপূর্ব সুন্দর রাধা-গোবিন্দের মূর্তি। কার্পেটের মতো মোটা একটা শতরঞ্চিতে আমরা বসেছি। বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। তিনিও বসেছেন।

বড়মামা বললেন, 'ব্যাপারটা কি বলুন তো! আমরা কিছুই জানি না।'

'শোনো ব্রজরঞ্জন তোমাদের পিতামহ। নামকরা চিকিৎসক। তাঁর পুত্র কুমুদরঞ্জন তোমাদের পিতা। ডাক্তার। আমি কুমুদের সতীর্থ। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম স্বদেশী আন্দোলনে। ধরতে পারলে অবধারিত ফাঁসি অথবা আন্দামান। আত্মগোপনের একটা জায়গা চাই। কুমুদ বললে, 'দাঁড়া, তোকে লোপাট করে দি।' খুঁজে খুঁজে এই জায়গাটা বের করলে। ঘন জঙ্গলের কিনারায়। ও বললে, অত্যাচারী, বিধর্মীদের চোখে ধুলো দিতে ধর্মের আড়ালে চলে যা। তখন চতুর্দিকে গোয়ান্দা ঘুরছে ছদ্মবেশে। ভাই ভাইকে ধরিয়ে দিচ্ছে, বাপ ছেলেকে। এখানে একটা আশ্রম তৈরি হল—ব্রজধাম।

ও এক বৈষ্ণব সাধককে নিয়ে এল। প্রকৃত সাধক। বলতে পার, সিদ্ধ মহাপুরুষ। আমার জীবনটা একেবারে বদলে দিলেন তিনি। অলৌকিক সব শক্তি এল। আমার অবাক হওয়ার পালা। সম্প্রতি আমার মনে হল তোমাদের কথা। আচ্ছা শোনো, ভয়ে পালিও না। ওই দেখ কয়েকটা চাবি, সবটা তোমরা এখনও ঘুরে দেখোনি। দেখবে। এ সবই তোমাদের। লোকে চিঠি পাঠায়, আমি তোমাদের স্বপ্ন পাঠিয়েছিলুম। এইবার আসল কথা আমি কিন্তু নেই। শরীরটা ফেলে দিয়েছি। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আমি তোমাদের চোখের সামনেই ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাবো। আর আসবো না। এটা রক্ষা কোরো। আমি আশীর্বাদ করে গেলুম।'

লণ্ঠনটা দপদপ করে নিভে গেল। পাতলা চাদরের মতো কালো অন্ধকার। একসঙ্গে অনেক শাঁখ বেজে উঠল। শৈলীদি মাসিমাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে গেল। উমা আমাকে প্রবল শক্তিতে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে। বড়মামা মৃদু মৃদু স্বরে হরি হরি বলছেন। মেজমামা ধর্ম, অলৌকিক মানেন না। তিনি স্তম্ভিত। ওদিকে গভীর জঙ্গলে পুরুষ হাতিদের চিৎকার। আর একটা কি জন্তু মানুষের মতো কাশছে। মনে হয় হায়না। শঙ্করকাকুকে দেখতে পাচ্ছি না। লণ্ঠনটা আপনি আবার জ্বলে উঠল। ওপরে সম্ভবত ছাতে পায়ের শব্দ। পেছনে কোথাও জল পড়ছে। শতরঞ্চির যে জায়গাটায় তিনি বসেছিলেন, সেখানে পড়ে আছে পাট পাট করা লম্বা একগুচ্ছ কাগজ, লাল দড়ি দিয়ে বাঁধা। দেখলেই বোঝা যায় দলিল। আমরা যেন একসঙ্গে দলা পাকিয়ে গেছি।

এরপরে এল ঠান্ডা কনকনে বাতাস। দরজায়, বন্ধ জানলায় ধাক্কা মারছে। দোতলার ঘরের মেঝেতে ধাতব একটা কিছু পড়ে গড়িয়ে গেল। শব্দটা রইল অনেকক্ষণ। জারী নেই, কেউ নেই। অথচ আরতি শুরু হল। শঙ্খ-ঘণ্টা। পঞ্চপ্রদীপ ছাড়াই পাঁচটি শিখা শূন্যে দুলতে লাগল ছন্দে ছন্দে। চামড় ছাড়াই দুধের মতো সাদা একটা ধোঁয়ার জটলা ঝাপটা মারতে লাগল বাতাস। শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ আকাশে-বাতাসে। সাদা একটা ফুল তুলোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। উমা আমার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছে। পিঠ ঢেকে গেছে ঘন কালো চুলে। ফুলটা ভাসতে ভাসতে এসে সাদা নরম পাখির পালকের মতো আটকে গেল উমার চুলে। হাত দিতে ভয় করছে। ফুল না তুলো! বিন্দু বিন্দু জল এসে পড়ল আমাদের গায়। অপূর্ব সুগন্ধ। শান্তির জল। আকাশে চাঁদ। বাইরের অন্ধকার ক্রমশ পাতলা হচ্ছে।

শারদীয়া ১৪২১

কৃপণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়েও ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন তা সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয় জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতো জোড়া এত ছেঁড়া আর তাপ্পি মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণছুঁচ আর খানিকটা সুতো যোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটোখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যত রকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা করে নেয়।

ছোটো ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি-লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে লাটাই হলো। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রক-এ উঠে ঝুল-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতো লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলেই বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হল কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সব সময়ে কি রসিকতা করতে হয়?

ভিতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদী বাড়িতে তিনি কখনো ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভাল করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেওয়ালগিরির......

ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া-তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামী জাপানী ছাতাখানার কি হলো?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, জাপানী ছাতা?

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ কটা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ্‌সপ্ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালী সুতোর কাজ-করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যে তারা যা করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারী লজ্জা পেলেন তিনি। এমন কি তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, যার দেড়শ জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না।

যেন তাঁর মনে কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ, আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন শ্যামবাবু। তা ভাল। বড়লোকদেরও কি আর মাঝে মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না! নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি-মারা জামা, পরনে হেঁটো ধুতি হয় কি করে!

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরকালানেরও কি শ্রী! দু'ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নিচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড় একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তবে শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু'ধারে সারি সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে.......

নাঃ, কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর সুদূর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেও তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানী, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোর বাঁধানো বড় বড় ফোটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হলো কি শ্যামবাবু? অ্যাঁ! এ বাড়ি কি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন! আসুন তাড়াতাড়ি।

সোনামহল্লা! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপোমহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পর্দা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকি পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওলা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানী, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝখানে একটা নিচু সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটি সোনায় বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত! এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটা খোপে আবার হীরে, মুক্তো, চুনী আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্যধারে রুপোর। প্রত্যেকটা ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুঁচি করে হীরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হলো আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড় হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ কি আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ হাঁ করে উঠল।

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খুব খারাপ ছিল। কিছুতেই ভাল হচ্ছিল না। কি করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ?

শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভাল হলো। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হীরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। লোকটা বলে কী?

কর্তাবাবু বললেন, এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকা-পয়সা হীরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উল্টোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে। অ্যাঁ! এ কি কাণ্ড! আমি যে মাৎ!

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেওয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুটি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন-বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল! ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝের পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেয়াল ভেঙে পড়েছে.......

কদম্ববাবু পড়ি কি মরি করে ধ্বংস স্তূপ পেরিয়ে কোনোরকমে বাইরে দরজায় পৌঁছলেন। দরজাটা অক্ষতই আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সত্যিই তো। টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কি? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি!

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন দামী একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্য কেনাকাটা করটা ভাল দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নীর জন্য শাড়ি আর ছেলেমেয়েদের জন্য জামাকাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল তাঁর।

গাছ, গরু, ভূত এবং ইলিশ মাছ

সমরেশ মজুমদার

বাড়িটা ছিল গাছ-গাছালি দিয়ে ঘেরা। আম, কাঁঠাল, লিচু, বাতাবি লেবু থেকে শুরু করে তাল, সুপুরি, নারকেল কি নেই! এদের ঘিরে রেখেছে পাঁচফুট উঁচু তারের বেড়া যেটা প্রায়ই হাতিরা এসে ভেঙে দিয়ে যায়। হাতিরা আসে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে, যখন কাঁঠাল পাকে। কাঁঠাল হাতিদের খুব প্রিয় ফল।

এই যে এতগুলো গাছ, পাশাপাশি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যে একটু বাতাস বইলে মনে হয় ওরা কথা বলছে। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে, হাসছে, এ ওর গায়ে একটু ঢলে পড়ছে। এই যেমন আজ, বাস থেকে নেমে মায়ের সঙ্গে দেখা করেই পিকু যখন ছুটে এসে দাঁড়াল কাঁঠাল আর লিচু গাছের সামনে অমনি বাতাস বইল। আর দুটো গাছই ডালপালা দুলিয়ে বলতে লাগল, 'কখন এলি? কখন এলি?'

পিকুর খুব ভাল লাগল, বলল, 'এই তো, এখনই! তোমরা সবাই কেমন আছ?'

'ভাল, খুব ভাল।' কাঁঠাল গাছের ডাল বলল, 'গেল বৈশাখের ঝড়ে আমাদের কারও হাত-পা ভাঙেনি।'

সুপুরি গাছটা দুলছিল বেশি, বলল, 'ক'দিন থাকবি তো পিকু?'

'একমাস। তিরিশ দিন থাকব। গরমের ছুটি।'

মায়ের গলা শোনা গেল, 'পিকু, জামা-প্যান্ট ছেড়ে নাও, খাবার দিচ্ছি।'

পিকু তাকাল ওদের দিকে, 'যাই।'

'যাই না! বল, আমি আসি।' ধমক দিল চালতা গাছটা।

অথচ বাতাস না বইলে ওরা এমন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেন ওদের ক্লাশের অঙ্কের মাস্টার, যার মুখে হাসি নেই।

জলখাবার গোগ্রাসে খাচ্ছিল পিকু, মা সামনে বসে, 'অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস কেন? গলায় আটকে যাবে যে! তুই যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস। বন্ধুদের সঙ্গে তো একমাস ধরেই দেখা হবে। হ্যাঁ বল, কিরকম পড়াশোনা হচ্ছে?'

'ভাল।' খেতে খেতে বলল পিকু।

'হোস্টেলের খাবার খুব খারাপ, এখনও?'

'এখন একটু ভাল।'

'আমরা গেল মাসে যা কিনে দিয়ে এসেছি, সব শেষ করে এসেছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'থ্রি থেকে ফোরে উঠলি, এখন কিন্তু পড়ার চাপ বাড়বে।'

'জানি, কণ্ঠীদাদু কোথায়?' খাওয়া শেষ, উঠে দাঁড়াল পিকু।

'গোয়ালঘরে গিয়েছে।'

'যাই' বলেই মাথা নাড়ল পিকু, 'আসি।' তারপর একলাফে বারান্দা থেকে উঠোনে। পেছনে, বাতাবি গাছটার পাশ দিয়ে তারের বেড়ার মধ্যে টিনের দরজা। যা দিয়ে বেরুলেই তাদের গোয়ালঘর। গোয়ালঘরের পেছনে জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর নদী। পিকু আবৃত্তি করল, 'আমাদের

ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।' হাম্বা ডাকটা ভেসে এল গোয়ালঘর থেকে। এটা নিশ্চয়ই কালী। গোয়ালঘরের দরজায় দাঁড়াল পিকু।

কণ্ঠীদাদু কালীর শরীর থেকে এঁটুলি বের করো কৌটায় রাখছে আর বলছে, 'আর কারও তো এত এঁটুলি হয় না, তোর কেন হয়? জঙ্গলে ঢুকে অত গাছের পাতা খাওয়ায় কি দরকার? দু'বেলা তো পেট ভরে ঘাস, খোল খাস। তবু নোলা যায় না কেন?'

কালী এবার দেখতে পেয়েছে পিকুকে। দেখেই গলা নামিয়ে ডাকল, 'এসেছ?'

কণ্ঠীদাদু ধমক দিল, 'এই কালী! খামোকা চেঁচাচ্ছিস। বুড়ি হলেই কি অত খিটখিটে হতে হবে!'

কালী মাথা নেড়ে দড়ির বাঁধন খুলতে চাইল। পিকু যখন ওর কাছে এগিয়ে যাচ্ছে না তখন সে কাছে যেতে চায়!

মুখ ঘুরিয়ে কণ্ঠীদাদু পিকুকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ও, তাই বলি। তুই এসেছিস! তোকে তো কালী প্রায় জন্মাতে দেখেছে তাই—। কাছে যা।'

পিকু কাছে যেতেই মুখ বাড়িয়ে গলার কাছে ওকে টেনে নিল কালী। পিকু ওর গলকম্বলে আদর করতে গরুটা ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে লাগল। পিকু স্পষ্ট শুনতে পেল, 'কেন চলে যাও, কেন দেখতে পাই না তোমাকে।'

অনেকক্ষণ আদর খেয়ে শান্ত হল কালী। পিকু জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেমন আছ, কণ্ঠীদাদু?'

'আমি ভাল নেই রে।'

কণ্ঠীদাদুর মুখে বয়সের যে ছাপ তা পিকু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছে। কণ্ঠীদাদু নাকি এ বাড়িতে বাবার জন্মের আগে থেকেই আছে। যেহেতু বাবা ওকে কাকা বলে ডাকে তাই পিকু দাদু বলে ডাকে।

গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কণ্ঠীদাদুর বয়স হওয়ার পর অল্পবয়সী কাজের লোক রেখেছে মা। কণ্ঠীদাদু শুধু গরুগুলোকে দ্যাখে আর রাতের বাসন মাজে। নতুন লোক রাত্রে নদীতে গিয়ে বাসন মাজতে ভয় পায়।

এখন বিকেল। আকাশটায় ঘন নীলের চাদর বিছানো। পিকু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি হয়েছে কণ্ঠীদাদু? কেন তুমি ভাল নেই?

'খোকাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে রে।'

'কে খোকা?' অবাক হল পিকু।

'তোর মনে নেই। পাশের বাড়িতে ভাড়ায় থাকত। ওদের ছোট ছেলেটা নারকোল গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল। সেই দুঃখে ওরা অন্য বাড়িতে চলে গেছে।'

এরকম ঘটনার কথা আবছা আবছা মনে পড়ল পিকুর। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওদের বাড়িতে খোকা বলে কেউ ছিল?'

'ওই যে মরেছে, তার নামই তো খোকা।' কণ্ঠীদাদু বলল।

'যে মরে গেছে সে তোমাকে কি করে জ্বালাবে?'

কণ্ঠীদাদু হাসল, কিছু বলল না।

এক বছর আগে বাজ পড়ে একটা চালতা গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। বাবা বলেছিল, 'ইস, গাছটা ফল সমেত মরে গেল।' সেই গাছ কেটে মাটি থেকে শেকড় উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বাইরে। আর কি কখনও গাছটা নতুন করে দাঁড়াতে পারে? তেমনি খোকা যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে সে কি করে কণ্ঠীদাদুকে জ্বালাতে আসবে?

কণ্ঠীদাদু জিজ্ঞাসা করল, 'নদী দেখেছিস?'

'কি করে দেখব? এই তো এলাম।'

'চল। হাতমুখ ধুয়ে আসি।'

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ। জঙ্গল বলতে কিছু বুনো ঝোপ, সজনে গাছের দঙ্গল। সেই পথ ধরে নদীর গায়ে চলে এল ওরা। কষ্ঠীদাদু সিমেন্টের স্ল্যাবের ওপর উবু হয়ে হাতমুখ ধুতে বসল। পিকু সরে গেল আরও ওপাশে। নদীটা বড়জোর একশ ফুট চওড়া। এখন জল কোমরের ওপর কোথাও নেই। বর্ষায় বেড়ে যায় অনেক। জলের ভেতর নিজের ছায়া দেখল পিকু। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা মাছ ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। পিকুকে দেখতে পেয়ে লাফাতে লাগল জলের ভেতর। পিকু মনে মনে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল। খুব ভাল। শুধু সেই বুড়ো লাল কাঁকড়াটা মরে গেছে।'

'যে কাঁকড়াটাকে আমি পাথরের পাশে থেকে তুলে হাতের ওপর রাখতাম?'

'হ্যাঁ, একদিন সকালে মরে গিয়ে ভেসে গেল।'

'পিকুবাবু।' কষ্ঠীদাদু ডাকল।

পিকু তাকাল। কষ্ঠীদাদু বলল, 'চল, সন্ধে হয়ে আসছে, আর থাকা ঠিক হবে না।'

'কেন?'

'বললাম তো তখন। ছোঁড়াটা বণ্ড জ্বালাচ্ছে।'

'কি ভাবে তা বলনি!'

হাত তুলে বড় কুলগাছটাকে দেখাল কষ্ঠীদাদু, 'আমি যখন রাত্রে খাওয়ার পর এখানে বাসন মাজতে আসি তখন ওই গাছে বসে বায়না করে।'

'ধ্যাৎ?'

'আমি কি তোকে মিথ্যা কথা বলছি?'

'যে মরে ছাই হয়ে গিয়েছে সে কি করে ওই গাছের ডালে এসে বসবে?'

'কেউ কেউ ছাই হয়ে গেলেও থেকে যায়। দিনের বেলায় তাদের দেখা যায় না। ওই যে কুলগাছে এত কাঁটা, ওরা টেরই পায় না।'

মজা লাগল পিকুর, 'তা কিভাবে তোমাকে জ্বালাচ্ছে? '

'বায়না ধরে। ও কষ্ঠীদাদু, একটা মাছ দেবে, কতদিন মাছ খাইনি। ও কষ্ঠীদাদু, আজ তোমরা ইলিশ মাছ খেলে? দাও না, একটা— ! এই সব বলত। ক'দিন হল খুব উল্টোপাল্টা বলছে।' কষ্ঠীদাদু মাথা নাড়ল।

'কি বলছে?'

'ওসব বড় ব্যাপার, তোমার শুনে কাজ নেই, চল।'

'খোকা কি খুব বড়? বল না।'

'তিনি বিয়ে করবেন। তিনদিন আগে রাত্রে এখানে বসে বাসন মাজছি, জলে শব্দ হল ঝপাং করে। ভাবলাম ভুল করে কোনো বড় মাছ হয়তো চলে এসেছে এই নদীতে। তারপর শুনি খোকার গলা, ও কষ্ঠীদাদু, আমার বিয়ে হচ্ছে গো।'

ভ্যাট! আমি পাত্তা দিলাম না। এ ছোকরা যখন বেঁচে ছিল তখনও খুব মিথ্যে কথা বলত। শুনে ছোকরা বলল, হ্যাঁ গো। যে আমাকে বিয়ে করতে চাইছে সে আসবে অনেক কনেযাত্রী নিয়ে, এদিকে আমার তো কেউ নেই। সারারাত একা একা কুলগাছ, আশশ্যাওড়া গাছে ঘুরে বেড়াই। তুমি বরকর্তা হবে?

ধমক দিয়েছি, বড়দের সঙ্গে ফাজলামি মারিস না খোকা!

কিন্তু কে শোনে কার কথা। রোজ এক ঘ্যানঘ্যানানি। অন্তত একটা বড় ইলিশ মাছ খাওয়াতে হবে কনেযাত্রীদের, তাই ওদের দাবি। নইলে বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেয়ে নিয়ে ওরা

ফেরত যাবে। এখন ইলিশ মাছ আমি পাই কোথায়? অনেক টাকা দাম।' উদাসী দেখাল কণ্ঠীদাদুকে!

'বিয়ে কবে?'

'কালকে। কাল তো পূর্ণিমা, শুনলাম কাল বিয়ের লগ্ন আছে। এদিকে ইলিশ না দিলে পাত্রী ফিরে যাবে আর খোকা লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কি যে করি।' চিন্তিত দেখাল কণ্ঠীদাদুকে।

সেই রাত থেকে মায়ের কাছে বায়না ধরল পিকু, কাল ইলিশ মাছ খাবে। এখানে হাটবার ছাড়া বাজার বসে না। সকালে বাবা লোক পাঠালেন পনেরো মাইল দূরের গঞ্জে। লোকটা ফিরে এল দুপুর পেরিয়ে যখন মায়ের রান্না হয়ে গেছে, পিকুর খাওয়াও। লোকটা বড় বড় ইলিশ পায়নি। অপেক্ষা করে করে না পেয়ে দুটো সাতশো গ্রামের ইলিশ নিয়ে এসেছে। মা বলল, 'ইস, ছোট ইলিশ কাঁটায় ভর্তি হয়। থাকগে, কাল রান্না করব।'

মা কাজের লোকটিকে বলল আঁশ ছাড়িয়ে মাছটাকে কেটেকুটে ফ্রিজে রেখে দিতে।

মা চলে গেলে পিকু লোকটিকে বলল, 'একটা মাছ মা যা বলেছে সেই রকম করে ফ্রিজে রাখবে, আর একটা মাছ গোটাই থাকবে।'

'কেন?'

'কোনটা খেতে ভালো লাগবে দেখতে চাই।'

তাই করল লোকটা। বিকেলে কণ্ঠীদাদুকে চিন্তামুক্ত করল পিকু। কণ্ঠীদাদু সব শুনে বলল, 'তোর মা তো খুব রেগে যাবে শুনলে।

'তা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। কাল রাত্রেও খোকা এসেছিল?'

'হুঁ। খুব আশা করে আছে রে।'

'বিয়ে কখন?'

'রাত বারোটা থেকে বারোটা পাঁচ পর্যন্ত বিয়ের লগ্ন।'

'তুমি বরকর্তা হচ্ছ?'

'না না। ওসবের মধ্যে আমি নেই। যদি মাছটা পাওয়া যায় তাহলে এগারোটা নাগাদ কাঁঠাল গাছের নীচে রেখে দিয়ে চলে আসব।'

'কাঁঠাল গাছ কেন?'

'ওমা! এদিকের সবচেয়ে ঝপড়া গাছ তো ওটাই। ওরই মাথায় বিয়ের ছাদনাতলা হবে। খোকা তো সেরকমই বলল।'

'তুমি বিয়ে দেখবে না?'

'দেখব। জানলার ফাঁক দিয়ে। এতদিন পরে খোকা এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে, শেষ দেখা দেখে নেব।' কণ্ঠীদাদু বলল।

'আমিও দেখব।'

'না না। এ বিয়ে ছোটদের দেখতে নেই। তাছাড়া তখন তো তুই ঘুমাবি।'

পিকু জানে মাকে বললে অনুমতি পাওয়া যাবে না। কণ্ঠীদাদুর ঘর রান্নাঘরের পাশেই। বাড়ির বাইরে তো যাচ্ছে না।

তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল সে। বাবা-মাও শুয়ে পড়ল সাড়ে দশটার সময়। একটু বাদেই বাবার নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল। পা টিপে টিপে খাট থেকে নেমে আস্তে দরজা খুলে সে বারান্দায় এসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ফ্রিজ খুলে গোটা ইলিশ মাছটা বের করে কণ্ঠীদাদুর দরজায় টোকা মেরে বলল, 'মাছ এনেছি।'

বুড়ো তো অবাক। বলল, 'আমি ভাবছিলাম মাছটা না পেলে দেব কি করে? যাই দিয়ে আসি।

প্রায় এগারোটা বেজে গেছে।' একটা কলাপাতায় মুড়ে মাছটাকে কণ্ঠীদাদু রেখে দিয়ে এল বড় কাঁঠাল গাছের তলায়। রেখে মুখ তুলে বলল, 'খোকা মাছ রেখে গেলাম।' ফিরে এসে কণ্ঠীদাদু বলল, 'ঘরে চল, বাইরে থাকিস না।' জানলার ওপাশে দাঁড়াল ওরা। জ্যোৎস্নায় চারধার ঝকমক করছে। ঠিক বারোটার সময় হঠাৎই কাঁঠাল গাছের মাথাটা আলোয় ভরে গেল। লাল নীল হলুদ আলো। নানান রকমের কথা। কেউ বলল, 'কই, বর কই? ইলিশ পেয়েছ? না পেলে—। পেয়েছি, নিন। এঃ! এ তো খোকা ইলিশ! কাঁটায় ভর্তি। নিজের নাম মিলিয়ে ইলিশ এনেছ? চলবে না।' তখনই একটি মেয়েলি গলা বলে উঠল, 'কাঁটা ভর্তি ইলিশ খেতে আমার খুব ভাল লাগে। বিশেষ করে মণ্ডুটা চিবোতে বড় সুখ। সারাজীবন ওর মুণ্ডু চিবোবো, এটা তার রিহার্সাল। চল, ওকে নিয়ে, বিয়ে করতে যাই।'

হুসহাস আলো ফিনিক দিয়ে গেল। তারপর হুস করে উড়ে গেল অন্য কোথাও।

'বেচারা খোকার বিয়ে হয়ে গেল।' কণ্ঠীদাদু বলল।

'বেচারা বললে কেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল পিকু।

'তুই বুঝবি না। বড়দের ব্যাপার। যা নিজের ঘরে শুতে যা।' কণ্ঠীদাদু বলল।

শারদীয়া ১৪১২

সানরাইজ লজ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অফিসের কাজে মেঘাতাবুরু এসেছিল অবনী। ভেবেছিল দিন থাকতে থাকতে কাজ চুকিয়ে ফিরে যাবে টাটানগর। কিন্তু হয়ে উঠল না। স্থানীয় লোহাখনির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে মিটিং যখন শেষ হল, সারাণ্ডা পাহাড়ে তখন সন্ধে নেমে গেছে।

জানুয়ারি মাস। পাহাড়ে প্রবল শীত। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাসস্ট্যান্ডে এসে অবনী যা শুনল, তাতে আরও হাড় হিম যাওয়ার জোগাড়। একটা প্রকাণ্ড ট্রেলার লরি নাকি উল্টে গেছে পাহাড় থেকে নামার রাস্তায়। ফলে বাস তো বটেই, সব ধরনের গাড়ি চলাচলই বন্ধ। অতএব কাল সকালের আগে মেঘাতুবুরু ছেড়ে বেরোনোর কোনও সুযোগই নেই।

অবনী মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। অফিসট্যুরে হরদমই এ শহর, ও শহর চরকি মেরে বেড়ায় সে, কিন্তু মেঘাতাবুরুতে এই তার প্রথম পদার্পণ। এখানকার কিচ্ছুটি সে চেনে না। সাতশো পাহাড়ের দেশ সারাণ্ডার এই ছোট্ট শহরটায় সকালে যখন এল, কী ভালো যে লাগছিল। ছবির মতো সুন্দর জায়গা, ছোট্ট ছোট্ট টিলার গায়ে-মাথায় ছড়ানো-ছেটানো বাড়ি, অদূরে ঘন জঙ্গলের আভাস.....। এখন, সন্ধের পর, প্রচণ্ড শীতে রাস্তাঘাট প্রায় জনহীন। গাঢ় কুয়াশা মেখে গোটা শহরটাই কেমন আবছা আবছা। এর মধ্যে কোথায় সে এখন রাত্রিবাসের ঠাঁই খুঁজবে?

গত্যন্তর না দেখে লোহাখনির অফিসার জগন্নাথ মিশ্রকে মোবাইলে একটা ফোন করল অবনী। জগন্নাথ বললেন,—কী হল অবনীবাবু? আপনি বুঝি যেতে পারেননি?

—না মিশ্রাজি, আটকে গেছি। অবনী অসহায় গলায় বলল, রাতে কোথায় থাকি বলুন তো!

—মুশকিলি বাত্। আমাদের কোম্পানির গেস্ট হাউসে আপনাকে রাখা যেত, লেকিন ও তো আভি বন্ধ আছে। সারাই চলছে।

—এখানে হোটেল-টোটেল পাব না?

—তেমন হোটেল তো......। এখানে তো অনেক কোম্পানির অফিস আছে, এখানে যারা কাজে-কর্মে আসে, সেই সব কোম্পানির গেস্ট হাউসেই ওঠে। তবে আপনাকে তো তারা সেখানে রাখবে না।

—তাহলে উপায়?

—একটা হোটেল আছে। জানি না আভি খুলা হ্যায়, ইয়া বন্ধ। বলে একটু থামলেন জগন্নাথ। ফের বললেন,—অবশ্য ওই হোটেলটার একটা বদনাম ভি আছে।

—কী বদনাম?

—কী সব ঘোস্ট ফোস্ট নাকি আছে।

—ধুস, আমার ওসব ভূত-টুতে ভয় নেই। কোথায় হোটেলটা?

—টাউনের একেবারে এণ্ডে। পাহাড়ের ধারে। সানরাইজ লজ।

ফোনেই হোটেলে যাওয়ার পথ বাতলে দিলেন জগন্নাথ মিশ্র। মোবাইল অফ করে অবনী যেন একটু স্বস্তি পেল। অবশ্য বিরক্তও হয়েছে মনে কনে। জগন্নাথ তাঁর নিজের বাড়িতেও তো এক রাত্তিরের জন্য থাকতে বলতে পারতেন তাকে। যাক গে যাক, অফিস ট্যুরে এসে এক প্রায় অচেনা লোকের বাড়ি সে উঠবেই বা কেন। তার চেয়ে বরং একটা রাত্তির নয় ভূতের ডেরাতেই কাটল।

ল্যাপটপের ঝোলাখানা পিঠে নিয়ে দুলকি চালে হাঁটা শুরু করল অবনী। জগন্নাথের নির্দেশিকা অনুযায়ী। বেশ কিছু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মিনিট কুড়ি পর অবশেষে পৌঁছেছে গন্তব্যে।

একটা পুরোনো সাহেবি আমলের বাড়ি। আবছা আলোয় বাইরের সাইনবোর্ডটা পড়া যাচ্ছে অল্প অল্প। কিন্তু ভেতরে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। সদর দরজাও বন্ধ। কেউ নেই নাকি? উঁহু, তাহলে তো বাইরে তালা ঝুলত।

অবনী গলা ওঠাল,—কোই হ্যায়?

সাড়াশব্দ নেই।

অবনী আরও জোরে চেঁচাল,—অন্দরমে হ্যায় কোই?

এবারেও উত্তর এল না। নির্জন পাহাড়ে অবনীর ডাকটাই যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল শুধু। অবনী কয়েক সেকেণ্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মরিয়া হয়ে শেষে ঠেলল দরজাটা। কী কাণ্ড, খুলে গেল যে!

সন্তর্পণে ভেতরে পা রাখতেই বুক ধড়াস। কাউন্টারের ওপারে টিমটিমে এক লম্ফ জ্বলছে, তার ওপারে এক ছায়ামূর্তি। আলোয়ানে গা-মাথা জড়ানো, আধো অন্ধকারে মুখখানা স্পষ্ট নয়।

ভাঙা ভাঙা জড়ানো স্বর বেজে উঠল—কেয়া চাইয়ে?

গলা শুনে অবনী নিশ্চিত হয়ে গেল, এ এক অশরীরী। গা ছমছম করে উঠলেও মুখমণ্ডলে ভয়ের ছাপ পড়তে দিল না। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,—রাতে থাকব।

—ইয়ে হোটেল আভি চালু নেহি হ্যায়।

—কিন্তু আমাকে যে আজ রাতটা থাকতেই হবে।

—ইধার রহনেকা ইন্তেজাম নেহি হ্যায়।

—আমার কিচ্ছু লাগবে না। শুধু একটা ঘর দিন। যেমন করে হোক, রাত্তিরটুকু রয়ে যাব।

ছায়ামূর্তি একটুক্ষণ নিশ্চুপ। তারপর কোথ্থেকে যেন একটা চাবি বের করে ঠং করে রাখল টেবিলে। এবার আর হিন্দি নয়, ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল,—সিধা বাঁয়ে চলে যান। তারপর ডাইনে। পহেলা রুমটা আপনার। বালিশ কম্বল মশারি সব আছে রুমে।

ভৌতিক সহৃদয়তায় অবনী রীতিমতো আপ্লুত। বিগলিত স্বরে বলল,—থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। তা চার্জ কত পড়বে?

—সে দেখা যাবে। আভি খানা-ওয়ানা কুছ লাগবে?

অবনী অবাক। তার ব্যাগে কেক বিস্কুট জল আছে বটে, ভেবেছিল তাতেই রাতটা চলে যাবে। কিন্তু এ তো একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব! হাসি হাসি মুখে জিগ্যেস করল,—খাবার পাওয়া যাবে?

—বেবস্থা করতে হবে। আপনি কী চান?

—কী জুটবে?

—রোটি-সবজি। চাইলে আণ্ডা, মুরগা ভি পেতে পারেন।

—এখন রাঁধবেন নাকি?

—ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। কী চান, জলদি জলদি বলুন। খানা দিয়ে আমি শোব। বহুৎ নিন্দ লাগছে।

—রুটি-চিকেনই চলুক তাহলে।

বলে চাবি তুলে অবনী রুমের দিকে এগোল। যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল একবার। ওমনি বুকটা ছ্যাঁৎ। কুপি জ্বলছে, কিন্তু কাউন্টার ফাঁকা। উবে গেছে ছায়ামূর্তি।

পলকের জন্য অবনীর মনে হল, ভূতের ডেরায় থাকাটা কি ঠিক হচ্ছে? পরক্ষণে অবশ্য ভয়টা

ঝেড়ে ফেলল। যদি উৎপাত না করে এইরকম সৌজন্য দেখায়, ভূতের সঙ্গে এক রাত সহাবস্থান মন্দ কী!

ছায়ামূর্তির কথামতো প্রথম ঘরটায় ঢুকল অবনী। ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে একাবর দেখে নিল ঘরখানা। ভুল বলেনি ছায়ামূর্তি, আছে সবই। তবে একটু এলোমেলো। একখানা মোমবাতিও গড়াগড়ি খাচ্ছে টেবিলে।

ব্যাগে দেশলাই মজুত, সুতরাং মোমবাতি জ্বেলে নিতে অসুবিধে হল না। পিঠের ঝোলা টেবিলে রেখে অবনী নিশ্চিন্ত মনে খাটে বসল। দেখল, সুইচবোর্ডও রয়েছে দেওয়ালে। ওমনি তড়াক করে গিয়ে ওঠাল-নামাল সুইচগুলো। নাহ্, বাল্ব-টিউব কিছুই জ্বলল না। আপন মনে হেসে ফেলল অবনী। ফটফটে বাতি জ্বললে ভূতবাবাজি কি টিকতে পারবে এই বাড়িতে?

আচমকা দরজায় ছায়া। অবনী চমকে তাকাল। নিখুঁত সাহেবি পোশাক পরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক দুয়ারে দৃশ্যমান। গমগমে গলায় ভদ্রলোক বললেন,—হ্যালো ইয়াং ম্যান! এক্ষুনি এলে বুঝি?

—হ্যাঁ। আপনি?

—আমি মেজর মুখার্জি। আই রান দিস লজ।

—তাহলে কাউন্টারে যে শুনলাম, লজ চালু নেই?

কথাটাকে যেন আমলই দিলেন না মেজর মুখার্জি। গ্রাম্ভারী স্বরে বললেন,—আমি পাশের ঘরেই থাকি।

—তাই বুঝি?....লজে কারেন্ট নেই কেন?

—শীতকালে আলো ছাড়াই লজটা বেশি উপভোগ করা যায়। আর আমার লজের লোকেশানটাও তো চমৎকার। ভোরবেলা জানলা দিয়েই এত সুন্দর সূর্যোদয় দেখতে পাবে....

—বাহ্। খুব ভালো।....বাড়িটা বেশ পুরোনো দেখছি। কত বয়স হল বাড়িটার?

—অলমোস্ট নাইনটি ইয়ারস্। তখন এখানে শুধু সাহেবরাই এসে উঠত। ওরাই পাহাড় কেটে লোহা বের করা শুরু করেছিল কিনা। ওদের কথা ভেবেই বৃটিশ স্টাইলে বানানো হয়েছিল এই লজ। খুব চলত তখন। লজ ফুল থাকত সারা বছর।

—তা এখন এমন মরা মরা দশা কেন?

—একটা ফ্যামিলি প্রবলেম হল। একটা অ্যাক্সিডেন্টও ঘটে গেল। তারপর থেকেই...

—কি অ্যাক্সিডেন্ট?

মেজর সাহেব জবাব দিলেন না। শুধু হাসলেন আলতো। বললেন,—তুমি রেস্ট নাও। আমি আসি।

দরজা থেকে সরে গেলেন মেজর সাহেব। দিনভরের ক্লান্তি এবারে ভর করছে শরীরে, অবনী শুয়ে পড়ল বিছানায়। শুয়ে শুয়েই মনে হচ্ছিল, লজটা তো ভারী অদ্ভুত। ভূত আর মালিক দিব্যি আছে পাশাপাশি। মালিক বলছে লজ বন্ধ নয়, অথচ অশরীরী কর্মচারী ভাগাতে চাইছে খদ্দেরদের, আবার তোওয়াজ করে সেই অশরীরী খাওয়ার অর্ডার নিচ্ছে—এ কেমন ধারার কাণ্ডকারখানা?

ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ লেগে গিয়েছিল অবনীর। হঠাৎই চটকা ভেঙেছে। চোখ খুলতেই টের পেল, কী যেন একটা চলে গেল দরজার সামনে দিয়ে! অবনী ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। তখনই নজর পড়েছে টেবিলে।

কাচের প্লেটে খাবার সাজানো। রুটি, আলুভাজা, আর কষা মুরগি। রীতিমতো ধোঁয়া উঠছে মাংস থেকে।

যেই দিক, খাদ্যবস্তুটি তো ভূতুড়ে নয়। দেখে যেন ক্ষিধে চাগিয়ে উঠছে। জলের বোতলটি

পাশে নিয়ে অবনী আহারে মন দিল। বেড়ে রেঁধেছে। ঝাল ঝাল। যেমনটা অবনী পছন্দ করে। শীতের রাতে ওই ঝালেতেই গরম হয়ে উঠছে শরীর।

ভোজন শেষ করে ঢকঢক খানিকটা জল খেল অবনী। লাগোয়া সাহেবি কেতার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ফের লম্বা হয়েছে শয্যায়। তৃপ্ত হয়েছে পাকস্থলী, এবার ঘুম নামছে চোখে। শান্তির ঘুম।

কম্বল মুড়ি দিয়ে অবনীর নিদ্রাটি বেশ গভীর হয়েছিল। হঠাৎই চিৎকার-চেঁচামিচিতে জেগে গেছে। কাছে কোথায় জোর ঝগড়া হচ্ছে যেন? পাশের ঘরেই কি......? মেজরের রুমে কারা এত চেল্লাচ্ছে রাতদুপুরে?

অবনী বেজার মুখে বিছানা ছাড়ল। পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসেছে। পাশের ঘরের দরজার সামনে থমকাল। পাল্লা দুটো ফাঁক হয়ে আছে সামান্য। ভেতরে উঁকি দিতেই....এ কী, একজন নয়, দুজন মেজর মুখার্জি বসে আছে মুখোমুখি! মধ্যেখানে একটা দাবার বোর্ড। দুজনেই তর্জনী উঁচিয়ে শাসাচ্ছে পরস্পরকে।

প্রথম মেজর বললেন,—আবার তুই চাল ফেরত নিলি? এবার আর আমি ছাড়ব না। তোর মন্ত্রীকে আমি খাবই।

দ্বিতীয় মেজর বললেন,—আরে, যা যা। তুই যে ঘোড়া এগিয়েও পিছিয়ে নিলি, তার বেলা?

—আমি মোটেই ওই চাল দিইনি। তোর মতো আমি চিটিংবাজ নই।

—তুই চিটিংবাজের বেহদ্দ। তোর চোট্টামি এবার ঘুচিয়ে দেব।

—খবরদার। মুখ সামলে। এবার কিন্তু আমি হাত চালাব।

—আমার বুঝি হাত নেই?

বলেই দ্বিতীয় মেজর সপাটে চড় কষাল প্রথম মেজরের গালে। ওমনি প্রথম মেজর ঝাঁপিয়ে পড়েছে দ্বিতীয়র ওপর। ব্যাস্, লেগে গেছে লড়াই। শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ। পাগলের মতো এ ওর গায়ে হাত চালাচ্ছে। কখনও এক নম্বর পেড়ে ফেলছে দু' নম্বরকে। কখনও দু' নম্বরের রোষে ধরাশায়ী প্রথম নম্বর। মারামারির ঠেলায় দুজনেরই জামাকাপড় ছিঁড়ে ফর্দাফাই, তবু কেউ কারোওকে ছাড়ছে না।

অবনী প্রমাদ গুনল। ঘরে ঢুকে দুজনকে থামাবে কি না ভাবছিল, তখনই আচমকা পরস্পরের কলার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দুজনে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। অবনীর দিকে দৃকপাত না করেই এ ওকে ধাক্কা মেরে সরাল। দুজনেরই কোমর থেকে হাতে এল রিভলভার। হিংস্র চোখে তাকাচ্ছে দুজনে দুজনের দিকে। তারপর একসঙ্গে গর্জে উঠল দুটো রিভলভার। গুলিবিদ্ধ দুটো দেহ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে লজের প্যাসেজ।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না অবনী। দৌড়ে নিজের রুমে ঢুকে গেছে। দরজা বন্ধ করে আতংকে কাঁপছে ঠকঠক। হাঁটুতে যেন আর জোর নেই। গোটা শরীর অবশ। কখন যে সে জ্ঞান হারাল, সে নিজেই জানে না।

চেতনা ফিরল দরজায় ধাক্কাধাক্কিতে। কে যেন ডাকছে,—উঠিয়ে, বাবু উঠিয়ে। সুবাহ্ হো গিয়া।

চোখ রগড়ে অবনী উঠে বসল। শ্লথ পায়ে গিয়ে ছিটকিনি খুলছিল, দুম করে রাতের দৃশ্যখানা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসেছে দু' পা।

ফের দরজায় করাঘাত,—কী হল বাবু? জাগুন।.....আপনি ঠিক আছেন তো?

গলাটা যেন চেনা চেনা? কাল রাতের সেই ভৌতিক কর্মচারীটির কণ্ঠস্বর না? দিন ফুটে গেছে, তবু সে....?

কম্পিত হাতে পাল্লা খুলল অবনী। ওমা, কোথায় ভূত? এ তো দিব্যি একটা আলোয়ান জড়ানো

বৃদ্ধ মানুষ। বেজায় রোগাসোগা। মুখখানাও সরু, লম্বাটে। তাই বুঝি কাল রাতের আধো আলোয় এমন অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল!

ঘড়ঘড়ে গলায় অবনী বলল,—আপনি জিন্দা আদমি?

—জরুর। কেন বাবু?

—না,....আমি ভেবেছিলাম.....।

অবনীর চোখ পড়েছে প্যাসেজের মেঝেতে। দুই ধরাশায়ী মেজর সাহেব তো নেইই, রক্তের চিহ্নটুকুও বেবাক উধাও।

ভয়ে ভয়ে অবনী বলল,—কাল রাত্রে....এখানে...

—দুই আদমি খুব মারপিট করছিলেন তো?

—হ্যাঁ।

—তারপর দুজন দুজনকে গোলি মেরে দিলেন?

—হ্যাঁ। ওঁদের বডিগুলি গেল কোথায়?

—বিশ সাল আগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাবু।

—মানে?

—ওঁরাই তো মালিক ছিলেন এই লজের । দুই যমজ ভাই। মিলিটারিতে কাম করতেন। একসঙ্গে নোকরি ছেড়ে এসে এখানে ব্যবসা শুরু করেন। আগের মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়ে। খুব ভাব ছিল দুই ভাইয়ে। আবার ঝগড়াও হত খুব। একদিন শতরঞ্চ্ খেলতে খেলতে দুজন দুজনকে গোলি মেরে দিলেন। তারপর থেকে লজ তো প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। আমি ছিলাম কেয়ার-টেকার। এখনও বাড়িটার দেখভাল আমিই করি। কভি কভি কেউ এসে আপনার মতো থাকার জিদ করলে আমি তার বন্দোবস্ত্ করে দিই।

—ও।

—আপনি ভয় পাবেন না বাবু। সাহেবরা কারোওর ক্ষতি করেন না। বহুৎ বড়িয়া দিলদার আদমি ছিলেন তো। শুধু নিজেরা দুজনে কাজিয়া করে......

আবার দুই মেজরের মারামারি দেখতে পাচ্ছিল অবনী। দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল দুই ভাই....হাতে উদ্যত রিভলভার.....থই থই রক্তের মাঝে দুটো দেহ পড়ে আছে......

নাহ্, মৃত্যু পর্যন্ত দৃশ্যটা ভুলবে না অবনী।

শারদীয়া ১৪২০

কবরের বিভীষিকা

অদ্রীশ বর্ধন

পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটা গাঁ। স্লেট পাথরের ছাউনি দেওয়া বেশ কয়েকটা কুঁড়ে ঘর।

অদূরে ঝরনার ধারা ঝরছে ঝিরঝির ধারায়। চারিদিকে পাহাড়ের বেষ্টন। গাছপালার সবুজ আভা। আকাশের নীলিমা। সব মিলিয়ে শান্তি, শান্তি, শুধু শান্তি।

এ-হেন গাঁয়েও এল অশান্তি। বাইরে থেকে নয়—গোরস্থান থেকে। লোমহর্ষক সেই কাহিনী যে শুনল, তারই দাঁতে দাঁত লাগল। কেউ কেউ গাঁ ছেড়ে চম্পট দেবে কিনা ভাবল। সন্ধ্যে হলেই আগল পড়ল দরজায় দরজায়।

অব্যাহত রইল কিন্তু নিশীথ রাতের আতঙ্ক। রাত যখন নিশুতি, অমাবস্যার নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় চরাচর আবৃত, ঠিক তখন বেরিয়ে আসত সে....যেন উঠে আসত নরক থেকে...সঙ্গে আনত মৃত্যুর পরোয়ানা.....

প্রতি অমাবস্যায় ঘটতে লাগল একই কাণ্ড। প্রতি অমাবস্যায় কৃমিকীটের মত বিসর্পিল ভঙ্গিমায় বেরিয়ে আসতে লাগল সেই শ্বেত বিভীষিকা। প্রতি অমাবস্যায় হাহাকার উঠতে লাগল এক একটি কুঁড়ে ঘরে....

গাঁয়ের নাম নাই বা বললাম। মহীশূরের এক পার্বত্য অঞ্চলে কাবেরী নদীর আশেপাশে এমনি গাঁ অনেক দেখা যায়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দৌলতে সেখানকার সব বাসিন্দাই যীশুর উপাসক। ছোট ছোট গাঁয়ের মধ্যেই ছোট গির্জা। প্রকৃতির আলয়ে যেন শান্তির ক্ষুদে নীড়।

যে গাঁয়ের কথা বলছি, সেখানেও ঘরে ঘরে ঝোলে যীশুর ছবি। দিনের বেলা পুরুষরা পাহাড়ের স্লেট পাথর কেটে বেচে আসে শহরের বাজারে। দিনের শেষে ঝরনার ধারে বসে শুরু হয় পুরুষদের আড্ডা। মেয়েদের ঘর-সংসারের কথা।

আব্রাহাম একাই আসর মাতিয়ে রাখত রোজ। হসিখুশী দুরন্ত স্বভাব তার। কথা কইতে কইতে গান গেয়ে ওঠা এবং গানের সুরে তাল দিয়ে নেচে ওঠা তার স্বভাব। আব্রাহাম না থাকলে তাই আসর জমে না।

সেদিন কিন্তু দলছাড়া হয়ে বসেছিল আব্রাহাম। উদাস চোখে চেয়েছিল দূর গোরস্থানের দিকে। মাত্র দু'দিন আগে ওর প্রাণপ্রিয় বন্ধু পিটার সমাহিত হয়েছে ওখানে।

পিটার-আব্রাহামের বন্ধুত্ব যারা দেখেছে, তারাই অবাক্ হয়েছে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলত—শ্যামদেশের যমজ নাকি রে? একটু-আধটু ছাড়াছাড়ি না হলে চলে কি? অষ্টপ্রহর গায়ে গা দিয়ে থাকিস কি করে?

পিটার-আব্রাহাম কর্ণপাত করত না ওসব কথায়। হরিহর আত্মার মতই দুটিতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত থাকত একসাথে। কাজকর্ম, বাজারহাট, হাসিঠাট্টা—সবই জুটি বেঁধে করা চাই।

সেই জুটি অকস্মাৎ গেল ভেঙে। পাহাড়ে পাথর কাটতে গিয়ে জায়গা নিয়ে বচসা হল মাইকেল আর গোমেশের সঙ্গে। রগচটা পিটার গাঁইতি তুলে তেড়ে গেল মাইকেলকে। জনাদশেক জোয়ান দৌড়ে এসে পিটারকে না ধরলে সেদিন নির্ঘাত খুন হয়ে যেত মাইকেল।

আব্রাহাম একা দাঁড়িয়েছিল পিটারের পক্ষে! মনের দিক থেকে সায় ছিল না, তবুও দাঁড়িয়েছিল। পিটার যে ওর প্রাণের চেয়েও প্রিয় বন্ধু।

দশজনের টিটকিরি থেকে আব্রাহামই পিটারকে আড়াল করে নিয়ে নেমে আসছিল পাকদণ্ডী বেয়ে। দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে।

পা পিছলে গেল পিটারের। পাকদণ্ডী যেখানে অকস্মাৎ ঢালু হয়ে অনেকটা নেমে গিয়েছে এবং খাদের ধার বরাবর গিয়ে ফের বাঁক নিয়েছে ডান দিকে—ঠিক সেইখানে যেন শুকনো ডাঙায় আছাড় খেল পিটার।

একেই বলে নিয়তি। নিয়তির মার বড় দুর্বার। কতদিন কতবার ঐ পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করেছে পিটার, কোনদিন কিছু হয়নি। হল সেইদিন! শেষের সেইদিন।

পা পিছলে সটান খাদের ধারে হড়কে নেমে গেল পিটার এবং সামলানোর আগেই ছিটকে গেল শূন্যে......

হাড়গোড় যেন গুঁড়িয়ে গিয়েছিল অত উঁচু থেকে পড়ার দরুন। প্রিয় বন্ধুর সেই অবস্থা কিছুতেই মন থেকে মুছতে পারছিল না আব্রাহাম। উন্মনা হয়ে বসেছিল অদূরে—টিলার ঝোপের মধ্যে।

সন্ধ্যে হল। আড্ডা ভাঙল। আব্রাহামের বিষাদমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে একে একে সবাই ফিরে গেল যে যে ঘরে।

একা বসে রইল আব্রাহাম। মনের মধ্যে কত স্মৃতি, কত ভাবনা, কত কান্না, কত হাসি ভীড় করে এল। কিন্তু কাঁদতে পারল না আব্রাহাম। পাথর হয়ে শুধু চেয়ে রইল দূর গোরস্থানের দিকে।

আরও রাত হল। আব্রাহাম আর বসে থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়াল আচ্ছন্নের মত। পায়ে পায়ে এগুলো গোরস্থানের দিকে। পিটার যে ঐখানে শুয়ে আছে শেষ শয্যায়। "পিটার...পিটার......আমি আসছি.....আমি আসছি......" আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে দৌড়োলো আব্রাহাম।

ঐ তো গোরস্থান। অমাবস্যার অন্ধকারে চোখ চলে না বেশী দূরে....কিন্তু ঐ তো দেখা যাচ্ছে পিটারের কবর। "পিটার....পিটার....আমি এসেছি.....আমি এসেছি....." এতক্ষণ পরে অবরুদ্ধ আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল আব্রাহাম।

ঝোপের আড়ালে বসে কতক্ষণ কেঁদেছিল আব্রাহাম, তা ও জানে না। কত দিনের কত কথা, কত মেলামেশার সুখস্মৃতি ভীড় করে এসেছিল বেদনার টনটনে বুকটার মধ্যে, সে হিসেবও নেই আব্রাহামের। ওর শুধু মনে আছে, রাত যখন আরো গভীর হয়েছে, যখন নিঝুম নিস্তব্ধ গোরস্থানে ঝিঁঝির কান্না ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না—ঠিক তখন পিটারের কবরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা বস্তু দেখেছিল সে।

যেন একটা সাদা কুয়াশা অথবা নীল আকাশ থেকে ধার করে আনা এক টুকরো সাদা মেঘ দুলছে কবরের ওপর। অমাবস্যার অন্ধকারে প্রথমে সাদা মেঘই মনে হয়েছিল। ভাল করে ঠাহর করবার পর বস্তুটার আসল চেহারা দেখে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল আব্রাহাম।

সাদা রঙের মস্ত একটা প্রাণী যেন উঠে আসছে মাটি ফুঁড়ে। প্রাণী বললে ভুল বলা হবে। কৃমিকীটকে যদি বহুগুণে বর্ধিত করা যায়—তবেই আঁচ করা যাবে রাত দুপুরের সেই শ্বেত বিভীষিকাকে। লম্বায় প্রায় হাত চারেক। সুপুরিগাছের মত মোটা দেহ। অবিকল কৃমিকীটের মত বা কেঁচোর মত বা সাদা রঙের শুঁয়োপোকার মত বুকে হেঁটে ধীর গতিতে কবর ঠেলে নেমে এল সেই অলৌকিক রহস্য।

হাঁ করে তাকিয়েছিল আব্রাহাম। এ কী অসম্ভব দৃশ্য দেখছে সে? কবরটা পিটারের —তাতে

সন্দেহ নেই। কিন্তু পিটারের কফিন থেকে পিটারের প্রেতমূর্তির পরিবর্তে এ কার শরীরী আতঙ্ক আবির্ভূত হচ্ছে মাটির ওপর? কি তার অভিপ্রায়? কেনই বা এহেন বিচিত্র কায়া?

নেহাত ডাকাবুকো বলেই হার্টফেল করেনি আব্রাহাম। মহা ডানপিটে বলেই গোঁ গোঁ করে চেঁচিয়ে উঠে চম্পট দেয়নি তল্লাট ছেড়ে। শুধু চেয়ে থেকেছে আড়ষ্ট দেহে। দেখেছে শ্বেত-কীটের নারকীয় গতি.....

কবর ছেড়ে নেমে এল নরক-কীট। ধীর গতিতে এঁকেবেঁকে মাটি ঘষড়ে এগুলো গোরস্থানের বাইরের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল আব্রাহাম। দেখল জমাট বাঁধা সাদা কুয়াশার মত মৃত্যুর জগৎ থেকে আবির্ভূত সেই কীটটা গোরস্থানের গেট পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল বাতাসে....

সম্বিৎ ফিরে পেল আব্রাহাম। কপালে হাত বুলিয়ে টের পেল কালঘাম ছুটেছে ঐ কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অসম্ভব উত্তাল হয়েছে হৃদপিণ্ড.....কলজে বুঝি ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে পাঁজরার খাঁচা ছেড়ে......

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল আব্রাহাম। টলতে টলতে ফিরে এল গাঁয়ে। মোহাচ্ছন্নের মত শুয়ে পড়ল শয্যায়।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল কান্নার রোলে। পাশের বাড়িতে কে যেন মারা গেছে।

পড়ি-কি-মরি করে ছুটল পরোপকারী আব্রাহাম। গিয়ে দেখল মাইকেল ওদের মায়া কাটিয়েছে। বিছানায় পড়ে ওর রক্তশূন্য দেহ।

রক্তশূন্য! এক পলকে দেখে রক্তশূন্যই বোঝা গিয়েছিল। যেন রাতারাতি মাইকেলের দেহের সমস্ত রক্ত পাম্প করে টেনে বার করে নেওয়া হয়েছে ধমনীগুলো থেকে। চেনা যাচ্ছিল না ভ্যাটভেটে সাদা নিঃস্প্রাণ দেহটা।

পলকহীন চোখে চেয়ে রইল আব্রাহাম। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পর-পর কয়েকটি দৃশ্য....পাহাড়ের ওপর মাইকেলের সঙ্গে পিটারের মারামারি....পিটারের অপঘাত মৃত্যু..শ্বেতকীট উঠে আসছে পিটারের কবর থেকে....

তারপরেই মাইকেলের মৃত্যু!

মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয়! কোথায় গেল শরীরের রক্ত? কে ঐ সাদা কীট? কেনই বা সে এল, গেলই বা কোথায়?

কাউকে কিছু বলতে পারল না আব্রাহাম। সারাদিন কাটল অস্থির চঞ্চলতার মধ্যে। অবশেষে এল রাত্রি। গুটিগুটি কবরখানায় হাজির হল আব্রাহাম। গত রাতের সেই ঝোপটির মধ্যে বসে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল কবরের দিকে।

কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা। রাত ভোর হল। কিন্তু কবর ফুঁড়ে আবির্ভূত হল না কৃমিকীটের মত সেই বিচিত্র প্রেতচ্ছায়ার.....

আরো অনেক রাত কবরখানায় কাটালো আব্রাহাম। দেখা পেল না পরলোক থেকে আসা সেই আগন্তুকের.....

এল আর একটি অমাবস্যা।

সে-রাতেও কবরখানায় হাজির রইল আব্রাহাম। ওর মন বলছিল, অমাবস্যার নিচ্ছিদ্র অমানিশার সাথে নিশ্চয় কোনো যোগসূত্র আছে শরীরী ঐ আতঙ্কের.....

তাই ওৎ পেতে বসে রইল ঝোপের মধ্যে। বসে থাকতে থাকতে চমকে উঠল এক সময়ে...

সে এসেছে।

কবরের মাথায় আবর দেখা দিয়েছে মেঘলা আভাস....আবার নড়ছে চেরাপুঞ্জী থেকে ধার করা একটু করা ঘনীভূত রহস্য......আবার দৃশ্যমান হচ্ছে নরক থেকে আবির্ভূত সাদা রঙের গা-ঘিনঘিনে সেই ভয়াল মৃত্যুকীট!

সে এল...বিসর্পিল ভঙ্গিমায় এগুলো.....গেটের বাইরে গিয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে...

পরের দিন সকালে কান্নার রোল উঠল গাঁয়ের আর একটি কুটিরে। গোমেজ মারা গেছে। সারা শরীরের সমস্ত রক্ত যেন উধাও হয়েছে রাতারাতি.....বিবর্ণ বিকৃত সেই মুখের দিকে তাকানো যায় না.....

গোমেজ মাইকেলের বন্ধু। যে দশজন পাহাড়ের ওপর মারপিটের সময়ে ধস্তাধস্তি করেছিল পিটারের সঙ্গে—গোমেজ তাদের একজন।

পরের অমাবস্যাতেও ঘটল একই কাণ্ড। কবরখানা থেকে নিষ্ক্রান্ত হল শ্বেত বিভীষিকা....আরেক জনের নিরক্ত নিষ্প্রাণ দেহ পাওয়া গেল পরের দিন সকালে....

সেই দশজনের আরেকজনকে মৃত্যুর ওপার থেকে এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল পিটার....!

আব্রাহাম আর সইতে পারল না।

কাউকে কিছু সে বলল না। সেইদিনই দুপুর রোদে গাঁইতি নিয়ে হানা দিল কবরখানায়। পিটারের কবর খুঁড়ে টেনে তুলল কফিন। ডালা ভেঙে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল গলিত, বিকৃত সে দেহটির দিকে। তার সঙ্গে পিটারের কোনো সাদৃশ্য নেই।

প্রস্তুত হয়েই এসেছিল আব্রাহাম। প্রেট্রল দিয়ে পুরো কফিনটা বেশ করে ভিজিয়ে আগুন জ্বেলে দিল নিষ্কম্প হাতে। ঘণ্টাকয়েক পরে ছাইয়ের স্তূপ ঢেলে দিয়ে এল ঝরনার জলে।

না। শ্বেত বিভীষিকা আর দেখা দেয়নি পরের অমাবস্যায়।

অগ্রহায়ণ ১৩৮০

বিলিতী ভূতচতুর্দশী

শ্রী সুধীন্দ্রনাথ রাহা

পঞ্চাশ একর হাতার মধ্যে বিশাল বাড়ি "হোয়াইট-গেটস্"। গোটা চার-পাঁচ চাকর-দাসীর কথা বাদ দিলে সে বাড়িতে সারা ক্লেবার্ণ একা। সন্তান কোনদিন হয়নি, স্বামী জিম ক্লেবার্ণ, এই অল্পদিন আগেই দেহরক্ষা করেছেন।

এ-বাড়িতে সারা একা বটে, কিন্তু তাই বলে আপনজন যে তাঁর কেউ কোথাও নেই, তা মোটেই নয়। ক্লেবার্ণদের এক গোষ্ঠী আছে বোস্টনে, নিউইয়র্কে হেপবার্গদেরও জমজমাট সংসার, ওটাই বাপের বাড়ি সারার। জিম মারা যেতে দুই জায়গা থেকেই জোর অনুরোধ এসেছিল, "সারা, তুমি সেই তেপান্তর মাঠে কদাচ একা থেকো না বাপু, চলে এস আমাদের কাছে। একটা ফ্ল্যাট দেখে দিচ্ছি, আরমসে থাকবে।"

তা সারা কর্ণপাতও করেন নি সে কথায়। বাপ-মা নেই, অছে ভাইয়েরা, তাদের বৌয়েরা, তাদের ডজন ডজন ছেলেমেয়েরা। এদিকেও শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, আছে ভাসুর-দেওরেরা, তাদের বৌয়েরা, তাদেরও ডজন ডজন—

রক্ষে কর! ঐ লোকারণ্যের ভিতর সারার দম আটকে আসবে তিন দিনের ভিতর। আজ ডিনার, কাল ব্রীজ পার্টি, পরশু পিকনিক। না গেলে মন-কষাকষি হবে, গেলে আরও বেশী। সবাই দাবি করবে— "ডু অ্যাট রোম আজ রোম ডাজ" যস্যার্থ ঃ— "যস্মিন দেশে যদাচার, কাছা খুলে নদীপার।" রক্ষে কর! পাক্কা চল্লিশ বৎসর এই হোয়াইট গেটস ভবনে স্বামীর সঙ্গে একা একা কাটিয়েছেন সারা। আজ স্বামী নেই বলেই সারা চল্লিশ বছরের বাঁধন ছুরির এক পোঁচে কেটে ফেলে ফ্ল্যাটের আশ্রয় নেবেন বোস্টনে বা নিউইয়র্কে? হাসির কথা! এমন প্রস্তাব যার করতে পারে, স্পষ্টতঃই সারা ক্লেবার্ণকে চেনে না তারা।

ভয়ানক শক্ত মানুষ সারা, এক নম্বর স্বাধীনচেতা। মিশুক বা সামাজিক লোক যাকে বলে, তা মোটেই নয়। জিম বেঁচে থাকতে তবু বা আত্মীয়-স্বজনদের কিছু-কিঞ্চিৎ যাতায়ত ছিল এখানে, ইদানীং তা একদম বন্ধ। তাঁদের শেষ পদার্পণ ঘটেছিল জিমের অন্ত্যেষ্টি-উপলক্ষে। তারপর আর না। সারা ডাকেন নি কাউকে। একমাত্র ইবার্ট-ভাইকে ছাড়া।

ইবার্ট-ভাই হচ্ছেন ইবার্ট স্নোডেন, জিমের মাসতুতো ভাই এবং সারার মামাতো। বয়সে সারার চাইতে বছর কুড়ি কম, কুনোমিতে সারার চাইতেও এক কাঠি উপরে। সারা তবু সাহস করে স্বামীর ঘরে ঢুকেছিলেন, ইবার্ট একটা বৌ ঘরে আনার মত সাহস এখনও সঞ্চয় করে উঠতে পারেন নি। "ওরে বাপ! বিয়ে করা তারই পোষায়, বেড়ালের মত যার নয়টা প্রাণ। আমার প্রাণ একটাই মাত্র, সেটা আমি জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎসর্গ করে বসে আছি। কাকে? বৌকে নয়, বইকে।"

সত্যিই, পড়াশুনা নিয়েই মশগুল হয়ে রয়েছেন ইবার্ট, জীবনে এই সবচেয়ে চটকদার চল্লিশটা বছর। যাতায়তের জায়গা হল নিউইয়র্কের লাইব্রেরীগুলো, আর ক্বচিৎ কদাচিৎ ক্লেবার্ণদের এই হোয়াইট গেটস্। এখানে তিনি আসেন শুধু এই সাহসে যে এ বাড়ির ছয় মাইলের ভিতরে কোথাও ভদ্র গৃহস্থের বসতি নেই। প্রজাপতির এমন সাধ্য নাই যে তাঁকে পাকড়াবার জন্য এখানে ফাঁদ পেতে রাখবেন।

আত্নীয়দের ভিতরে একমাত্র, ইবার্টকেই সহ্য করতে পারেন সারা, তাঁকেই হোয়াইট গেট্সে

ডেকে আনেন মাঝে মাঝে, ধরে রাখেন দুই-এক হপ্তার জন্য। মোটর বোঝাই করে বই নিয়ে আসেন ইবার্ট, সেগুলি পড়া শেষ না হচ্ছে যতদিন, থাকবার অসুবিধে নেই তাঁর।

এবার ইবার্ট এসে এক হপ্তা ছিলেন, চলে গেলেন সবে কাল। তা কালই চলে যাওয়াটা মন্দ হয় নি, আজ সকাল থেকেই আবহাওয়াটা পালটে গিয়েছে বিশ্রীরকম। কালও আকাশ ছিল নির্মল, আজ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন। দমকা হাওয়া হইছে, হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে। অসময়ে বরফ পড়বে, তারই লক্ষণ। বৃষ্টি তো মাঝে মাঝে ঝরছেই এক এক পশলা।

সারা সকালটা ঘরেই বসে রইলেন সারা। লাঞ্চ পর্যন্ত। যখন যে ঘরেই বসছেন, আসন তাঁর জানালার ধারে। বসে বসে দেখছেন—বৃষ্টির ধারাগুলো ত্যারছা-ভাবে নেমে আসছে আকাশ থেলে, ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে ঘোড়সওয়ারেরা যেমন নামে শক্র-সৈন্যকে আক্রমণ করার সময়। বেশ লাগে দেখতে। গায়ে-মাথায় ঠাণ্ডা লাগছে, তা সত্ত্বেও বসে বসে এই দৃশ্য দেখেন ঘন্টার পর ঘণ্টা। ইবার্ট থাকলে সেও হয়ত পাশে বসে দেখত এই বর্ষা। নীরবেই বসে বসে উপভোগ করত একে। কারণ সারা জানেন, ছন্দের নাচুনির নীচেই যে-নাচ কাব্যরসিক ইবার্টের পছন্দ, তা হল উদার প্রান্তরে আলোছায়ার পটভূমিতে বর্ষার নৃত্য।

বিকালের দিকে আকাশের মেঘ যদিও কাটল না, বৃষ্টিটা কিন্তু থেমে গেল। সারা উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। বেড়াতে বেরুবেন। ঘনঘটা করে তুষার ঝঞ্ঝা শুরু না হচ্ছে যতদিন, প্রাত্যহিক চার-পাঁচ মাইল হাঁটাহাঁটি কিছুতেই বন্ধ হওয়ার নয় সারার। প্রান্তরের বুক চিরে যে গাড়ির রাস্তা চলে গিয়েছে নরিংটন শহরে, বেরুবার সময় সেই রাস্তা ধরেই সারা সাধারণতঃ বেরিয়ে থাকেন, ফেরার সময় ফেরেন শেকার-এর বনভূমির ভিতর দিয়ে। রাস্তা থেকে ঠিক এক মাইল দূরত্ব বজায় রেখে ওরই সমান্তরালে বরাবর ছড়িয়ে পড়ে আছে শেকার বন, গাছে গাছে বাদামী পাতা, ঝোপে-ঝাড়ে হলদে ফুল আর ঝর্ণায় ঝর্ণায় গোধূলি-আলোয় ঝলমলানির দৌলতে এই হেমন্তে যাকে পরীর দেশ বলে ভুলে করে ভাবুক লোকেরা।

বনের সীমা পেরিয়ে খানিকটা মাঠ ভাঙ্গতে হল আবার, তারপরে সারা এসে ঢুকলেন হোয়াইট গেটস্-এর হাতার ভিতরে। গেট থেকে কাঁকর বিছানো চওড়া পথ অনেকগুলো বাঁক খেয়ে খেয়ে অবশেষে থেমেছে গিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে। একটা বাঁক ঘুরতেই সারা দেখলেন—তাঁর থেকে অল্প আগে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে এক অচেনা বুড়ী। চেহারা বা বেশবাস—কোন দিক দিয়ে সে বুড়ী নজরে পড়ার মত নয়। তবু যে সারার নজরে সে পড়ল, তার কারণ শুধু এই যে মাঠে বনে রাজপথে একটানা তিনঘণ্টা চক্কোর দেবার সময় একটিও মনুষ্যমূর্তি সারার চোখে পড়েনি, এমনই নির্জন পরিবেশ হোয়াইট গেটস্-এর।

"কোথায় যাবে গা তুমি?"—বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন সারা।

"ঐ যে হোথা—" আঙ্গুল তুলে সারার বাড়িই দেখিয়ে দিল বুড়ী। ওর কথার সুরটায় যেন বিদেশী টান একটু ধরা পড়ল সারার কানে। এ অঞ্চলের লোকের কথার মত নয় ঠিক।

"ওখানে কার কাছে যাবে? কী দরকার?"—আবারও জানতে চাইলেন সারা।

"এমনি, একটা মেয়ে কাজ করে ওখানে, তারই কাছে—" বলল বুড়ী; কী দরকার, তার কোন জবাব নেই।

সারাও আর ঘাঁটালেন না ওকে। কাজ তাঁর বাড়িতে গোটা তিনেক মেয়েই তো করে, তাদেরই কারও আপনজন হতে পারে বুড়ী। কাজ কী তাঁর সে খবরে?

সারা জোর পায়ে হেঁটে চলেছেন সিঁড়ির দিকে। বুড়ী পিছনে পড়ে আছে। হেঁটে চলেছেন, হঠাৎ কেমন করে যেন পা হড়কে পড়ে গেলেন সারা। পড়ে গিয়েই আর উঠতে পারেন না। গোড়ালি বুঝি ভেঙ্গেই গেল।

শক্তসমর্থ মানুষ সারা ক্লেবার্ণ এই ষাট বছর বয়সেও। গায়ের জোর, গলার জোর, দুই-ই বিলক্ষণ বজায় রেখেছেন এখনও। চেঁচামেচি করে বাড়ি থেকে এনে ফেললেন দাসদাসীদের। তারা জনা চারেক মিলে ওঁকে বাড়িতে এনে তুলল, চাকাওয়ালা চেয়ারে বসিয়ে। সেই চেয়ারে বসেই সারা টেলিফোন করলেন—নরিংটনে ডাক্তার সেল্‌গ্রোভের কাছে।

বহুকালের ডাক্তার। এ-বাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক। এসেই রসিকতা জুড়ে দিলেন— "বন্ধু ক্লেবার্ণও স্বর্গে গেলেন, আমিও নরকস্থ হলাম। দারিদ্র্যের মত নরক আর নেই, তা অবশ্য জানেন মিসেস ক্লেবার্ণ। ক্লেবার্ণের ছিল রক্তমাংসের দেহ, অসুখটা-বিসুখটা হত মাঝে মাঝে, দু'চার পয়সা জুটত আমার বরাতে। আপনার তো ভদ্রে লোহার শরীর। ভেবেছিলাম—এ বাড়ির ডলারের কী রং, তা আর চর্মচক্ষুতে দেখব না কোনদিন। তা ভগবান আছেন—বলি, হয়েছে কী? পা ভেঙেছেন?"

বেদম একচোট হেসে নিলেন ডাক্তার— "কারও অন্ন মেরে দেওয়া মহাপাপ, জানেন তা? সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত—"

পা পরীক্ষা করে বললেন— "কথা যদি দেন যে প্রাণান্তেও বিছানা থেকে উঠবেন না, তাহলে অমনি অমনি রেহাই দিয়ে যাই আজকের মত। আর তা যদি না দেন, এক্ষুণি গোড়ালিতে প্ল্যাস্টার করব—উপরে হাঁটু, নীচে বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত। কী বলেন?"

প্ল্যাস্টারে খুব ভয় সারার, কথা দিলেন যে নড়বেন না।

বললে কী হবে, ডাক্তার তবু অমনি অমনি রেহাই দিলেন না, প্ল্যাস্টার না করুন, ব্যাণ্ডেজ একটা বাঁধলেন। ওষুধ দিলেন, কিন্তু ভরসা দিলেন না। "এক্স-রে না করে কিছু বলা যাবে না। যে রকম ফুলে উঠেছে, পরশুর আগে আর করা যাবে না এক্স-রে। পরশু সকালে দশটায় আমি আসছি—"

উঠে যাবার মুখে তিনি কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন একবার— "বলেন তো একটা নার্স পাঠিয়ে দিই গিয়ে। সেবা করার দরকার কিছু হবে না এক্ষুণি, কিন্তু একটা লোক কাছে থাকলে কথায়বার্তায় সময় কাটত ভাল। ঘুম ভাল না হতে পারে হয়ত। সেই জন্যই বলছি নার্সের কথা—"

"নার্স কি হবে?"—কথাটা উড়িয়েই দিলেন সারা— "আমার ঝিয়েরা সব পুরোনো লোক, আমার শাশুড়ীর আমল থেকে এ-বাড়িতে আছে, কথাবার্তা ওরা কি কইতে পারবে না দরকার হলে?"

"তা পারবে"—বললেন ডাক্তার— "আপনার ভৃত্যভাগ্য ভাল।"

সারা এ বিষয়ে একমত ডাক্তারের সঙ্গে। তিনটি দাসী, অ্যাগনেস, মেরী, এসথার। এখানে ওদের চাকরির বয়স যথাক্রমে বাইশ, তেরো এবং এগারো বছর। এযুগে এমন ব্যাপার হোয়াইট গেটস্ ছাড়া অন্য কোন বাড়িতে কেউ দেখাতে পারবে না। কথায় কথায় এখন নোটিশ দিচ্ছে ঝি-চাকরেরা। চাকরি—যেন তারা নিজের প্রয়োজনে করে না, করে স্রেফ পরোপকারের জন্য মনিবদের উপরে দয়াপরবশ হয়ে। এ বাড়ির ভৃত্যেরা যে অন্যরকম, সারা সেজন্য তারিফ করেন নিজের ব্যক্তিত্বকে। মনে মনে ধারণা আছে তাঁর, মনিব তিনি ভাল। নিজে ভাল হলে জগৎ ভাল হয়, এ আর না জানে কে।

যা হোক, ডাক্তার তো গেলেন।

ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে পায়ে। শুয়ে শুয়েই ডিনার খেতে হল সারাকে। চেষ্টা করলে অবশ্য উঠে গিয়ে বসতে পারতেন ডিনার টেবিলে, কিন্তু তা গেলেন না। ডাক্তারকে যে কথা দিয়েছেন, বিছানা ছেড়ে উঠবেন না বলে!

রাত্রে যাতে মনিবনীর কোন কষ্ট না হয়, তার সব ব্যবস্থাই করছে অ্যাগনেস। হাতের নাগালে

টিপয়, তাতে লেমনেড। একটা ছোট টেবিল টেনে এনে টিপয়ের পাশে রেখেছে, তার উপরে খাবারের ট্রে একখানা, স্যাণ্ডউইচ বোঝাই সে ট্রে।

সারা বিস্মিত, বিরক্ত। "স্যাণ্ডউইচ কী হবে? আমি খাই না কি রাত্রে? কোনদিন খেয়েছি নাকি? আজ পা ভেঙেছে বলে কি পেটেও আগুন জ্বলেছে?"

"ন, তা নয়"—অ্যাগনেস দরদে গলে পড়ছে— "তবে বলা তো যায় না, যদিই পেয়ে যায় ক্ষিধে—"

"কক্ষনো পাবে ন"—অ্যাগনেসের আদিখ্যেতায় সারা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, রেগে যাচ্ছেন— "নিয়ে যাও, স্যাণ্ডউইচ—"

রাগ দেখে অ্যাগনেস ট্রেসুদ্ধ টেবিল সরিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু রেখেও সে দিল পাশের ঘরেই, শুয়ে শুয়েও তা টের পেলেন সারা। তবে ও নিয়ে আর চেঁচামেচিও করলেন না কিছু, পায়ের ব্যথার দরুন কথা কইতেই তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে না।

অ্যাগনেস চলে গেল রাত্রির মত। সারা ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

না, ঘুম হচ্ছে না। অন্ততঃ অন্যদিনের মত হচ্ছে না। রোজ এক ঘুমে রাত শেষ হয়ে যায় সারার, আর আজ দেখ না! মিনিটে মিনিটে ছুটে যাচ্ছে ঘুম। ব্যথার জন্যই যে শুধু, তাও তো নয়! কী যেন একটা অস্বস্তি। শুধু দেহে নয়, মনেও। কে যেন কোথায় ভারী একটা অন্যায় কাজ করছে কিছু, এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা। এক্ষুণি উঠে গিয়ে তাদের ধমকে দেওয়া দরকার। এমনি একটা অবচেতন ঝোঁক। ভারী অস্বস্তি। পায়ের ব্যথার কথা মনে থাকছে না এই অস্বস্তির দরুন এক এক সময়, আবার অন্য সময়ে ওরই দরুন ব্যথাটা হয়ে উঠেছে ডবল কষ্টদায়ক।

ঘড়ির সবগুলো বাজনা শুনে যাচ্ছেন সারা, একটার পরে একটা। টং টং টং। কোয়ার্টারের বাজনা, হাফ-আওয়ারের বাজনা, তিন কোয়ার্টারের বাজনা, সব শেষে বাজনা পুরো ঘণ্টার। বারোটা, একটা , দুটো—

পৌনে আটটা বাজল অবশেষে। সকাল হয়েছে, পর্দার ফাঁকে ফাঁকে বাইরের আলো এসে উঁকি দিচ্ছে লাজুক শিশুর মত। এইবার অ্যাগনেস আসবে। আটটা বাজলেই। রোজই আসে। আটটার অষ্টম টং যেই বেজে ওঠে ঘড়িতে, দরজাও খুলে যায় খুট করে পাশের ঘরে। ও-ঘরটা এই শয়নকক্ষেরই অংশ বলতে গেলে, ঐ ঘরের ভিতর দিয়েই এ ঘরে আনাগোনার পথ।

বাজছে আটটা। শেষ হয়ে গেল বাজনা। এইবার খুলছে দরজা খুট করে। কই, না তো! খুলছে তো না! ছোট্ট সে আওয়াজটুকু হচ্ছে না তো খুট করে। এ হল কী? অ্যাগনেসের কি ঘুম ভাঙে নি? কেন ভাঙবে না? এতকাল ভেঙে এল, আজই ভাঙবে না? যেদিন পা ভাঙল মনিবনীর, সেই দিনই? যেদিন অ্যাগনেসের প্রত্যাশায় ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, মিনিটের পরে মিনিট গুনছেন মনিবনী, সেই দিনই? তাজ্জব!

শুধু তাজ্জব? হাজারোবার তাজ্জব। এখনও অ্যাগনেসের দেখা নেই, সওয়া আটটা বেজে গেল এদিকে। ধৈর্য আর রইল না। খাটের ছত্রি থেকেই ঘণ্টার দড়ি ঝুলছে, হাত তুলে তাতে টান দিলেন সারা। অ্যাগনেসের ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠেছে এতক্ষণে, হতচ্ছাড়ীর ঘুম এবারে অর না ভেঙে যাবে কোথায়? ধড়মড়িয়ে উঠে এক্ষুণি ছুটে আসবে হন্তদন্ত হয়ে। অ্যায়সা বকুনি দিতে হবে একখানা—

কই? কেউ তো আসছে না হন্তদন্ত হয়ে? ঘণ্টাটা বেজেছে তো? কে বলবে তা? ও-মাথা পর্যন্ত তারটা ঠিক ঠিক বজায় আছে তো? না থাকবার কথা নয়, কিন্তু আজ যে সবই কেমন-কেমন হয়ে যাচ্ছে!

সাড়ে আটটা। কিছু একটা ঘটেছেই ওদিকে। অসুখ করল অ্যাগনেসের? করেও যদি থাকে,

অ্যাগনেসের পাশের ঘরেই থাকে মেরী। সেও কি ঘণ্টার বাজনা শুনতে পাবে না? নাঃ, গুরুতর কিছু ঘটেছে। এই এতক্ষণে প্রথম মনে হল সারার, ডাক্তারের কথা মত কাল যদি একটা নার্স নিতেন তিনি, ভালই হত তাতে। সে তো সারার কাছেই থাকত। অনায়সে তাকে নীচে পাঠানো যেত সেখানকার হাল-চাল দেখে আসবার জন্য।

হয় নি নার্স নেওয়া। তার ফলে, অ্যাগনেসকে যদি ডাকতে হয়, স্বয়ং সারাকেই নীচে নামতে হবে। ডাক্তারকে কথা দেওয়া আছে, প্রাণান্তেও সারা শয্যা ছেড়ে উঠবেন না। কিন্তু এ-ব্যাপার যে সারার একার প্রাণান্ত নয়! নীচের সবাইয়ের প্রাণ রাতারাতি অন্ত হয়ে গেল কি না, কে বলবে? তেপান্তরের মাঠের ভিতর এই একখানি বাড়ি হোয়াইট গেটস্, রাত্রিবেলা কোন খুনে ঘাতক এসে যদি পাঁচটা ঝি-চাকরের গাল কেটে রেখে গিয়ে থাকে?

কেন কাটবে?

এ প্রশ্ন মোটেই প্রশ্নই নয়। আজকাল গলা-কাটা একটা শখের ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। হামেশাই এমন উন্মাদের কাহিনী কাগজে পড়া যায়, যারা বিনা কারণে, বিনা স্বার্থে, বিনা উদ্দেশ্যে খুনের পরে খুন করে যায় স্রেফ সময় কাটাবার জন্য। তেমন উন্মাদ কাল রাতে কেউ হোয়াইট গেটস্-এ এসে পড়েই নি যে, কে তা জোর করে বলতে পারে?

খোঁজ নেওয়া একান্ত দরকার। বেল বাজিয়ে সাড়া পাওয়া যায়নি, এবারে টেলিফোন করে দেখা যাক। তাতেও যদি কাজ না হয়, অগত্যা নেমে যেতেই হবে, উপায় নেই।

টেলিফোনে রান্নাঘর পাওয়া যাবে, একটা লাইন আছে ওখানে। কোন রকমে ফোন ধরতে পারা দরকার এখন। তাহলেই বোধহয় রহস্যের কিনারা হয়।

বেল ঝুলছিল খাটের কোণে, শুয়ে শুয়েই তা হাতে পাওয়া গিয়েছিল। ফোন পেতে হলে কিন্তু পাশের ঘরে যেতে হবে। কষ্ট? তার আর করা যাচ্ছে কী? নিরুপায় যখন।

অতি কষ্টে উঠে, এক পায়ে ভর করে দেয়াল ধরে ধরে, প্রায় পাঁচ মিনিট কাল যমযন্ত্রণা ভোগ করে করে অবশেষে সারা টেলিফোনের কাছে পৌঁছুতে পারলেন। যোগাযোগ করতে চাইলেন রান্নাঘরের সঙ্গে। কা কস্য পরিবেদনা! সাড়া নেই। ফোনের দশাও বেল-এর মত।

ফোনটা ঠিক আছে তো? সারা ডায়াল করলেন এক্সচেঞ্জ। সাড়া নেই তবু। লাইন কাটা। খুনী ডাকাত যারা এসেছিল, ফোনের লাইন আগেভাগে কেটে দিয়েছে তারা। বেল-এর বেলায়ও অবশ্যই তাই। আটঘাট বেঁধে কাজ করছে ওরা। সোজা লোক নয়।

সারা এখন করেন কী? কী করেন তিনি? কেমন করে খবরটা নেন যে নীচের অবস্থা কী? যদি খুনোখুনিই হয়ে থাকে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গেই বা যোগাযোগ করেন কেমন করে? এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে দুধ, মাংস, রুটি, খবরেরকাগজ যোগান দেওয়ার জন্য শহর থেকে লোক আসে রোজ। হোয়াইট গেটস্-এ সে ব্যবস্থা নেই। রোজ সকালে খানসামা প্রাইস চলে যায় সাইকেলে চেপে, নরিংটন থেকে নিয়ে আসে সব জিনিস। আজ কেউ যাবে না, যদি প্রাইস খুন হয়ে থাকে।

উঠলেন আবার সারা। একটা লাঠি ঝুলছে দেয়ালে। তাঁর স্বর্গীয় স্বামীর লাঠি। পেড়ে নিলেন ওটা। ভর দিয়ে হাঁটা যাবে। দেরাজে রিভলভার আছে স্বামীর। সেটাও বার করলেন। খুলে দেখলেন টোটা আছে কি না। যত রকমের সম্ভব, তৈরী হয়ে নিলেন নীচে নামবার আগে।

এক একটা ধাপ নামছেন সিঁড়ির, পায়ের ভিতর তপ্ত শূল যেন কেউ বিঁধিয়ে দিচ্ছে। তবু—তবু নেমে চলেছেন সারা, এক হাত দেয়াল ধরেছে, আর এক হাত লাঠি। রিভলভার? সেটা কোমরে গোঁজা।

একতলার প্রথম ঘরই অ্যাগনেসের। ঘরে ঢুকলেন সারা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, লাশ পড়ে নেই,

ঘরে রক্তের ঢেউ খেলছে না, খুনোখুনি যে হয়েছে, এমন চিহ্ন কিছু নেই। অধিকন্তু, বিছানা দেখে একথা মনে হয় না যে তাতে রাত্রে কেউ শয়ন করেছিল।

পাশের ঘর মেরীর, সে ঘরেরও ঐ একই দশা।

রান্নাঘরটা অনেক দূরে। ভাঁড়ার ঘর, বারান্দা, চাকরদাসীদের আরও তিনখানা ঘর—সব পেরিয়ে। অতখানি হেঁটে যাওয়া কি সম্ভব হবে সারার পক্ষে? ভাঙ্গা পা নিয়ে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শক্তি আর সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টায় আছেন সারা, হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এল। অনেকের গলার মিলিত আওয়াজ। ব্যাপার কী? খুনীরা কি এখনও বাড়ির ভিতরই রয়ে গেছে? ডাকের মাথায় অন্য লোক নেই, কর্ত্রী ভাঙা পা নিয়ে উপরে পড়ে আছেন শয্যাগত, এই সাহসে খুনীগুলো কি দিনের বেলাতেও আড্ডা দিচ্ছে এখানে?

আড্ডা? নিশ্চয়? আওয়াজটা গানের। তাও আবার বিদেশী কোন ভাষার গান সেটা। কী অদ্ভুত সুর তার। কী বিটকেল গলাই বা গায়কদের। শুধু গায়কও নয়, আছে গায়িকাও। অভাবনীয়! দুর্বোধ্য!

ভয়ের চেয়ে এখন উত্তেজনা বেশী সারার মনে। পায়ের ব্যথার কথা আর তাঁর খেয়ালই আসছে না। দেয়াল ধরে ধরে তিনি এগিয়ে চললেন রান্নাঘরের দিকে। গানটার আওয়াজ সেখান থেকেই আসছে, মনে হয়।

সারা দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন রান্নাঘরের। ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে দরজা নিঃশব্দে ফাঁক করলেন একটু। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন।

ঘরময় নীল আলো জ্বলছে মিটিমিটি। একটা পচা গন্ধ ভক ভক করছে। কয়েকটা শূকর পড়ে আছে গলা কাটা। একটা গামলা রক্তে ভর্তি। তার চারদিকে গোল হয়ে বসে ও দাঁড়িয়ে মানুষ গোটাকতক আর ছায়ামূর্তি আরও গোটাকতক।

মানুষগুলিকে চিনলেন সারা—তাঁরই লোকজন সব! অ্যাগনেস, মেরী, প্রাইস প্রভৃতি। ছায়ামূর্তিদের ভিতরও একজনকে চিনলেন—সে কাল সন্ধ্যার সেই বুড়ী, যার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরেই পা ভেঙেছিল সারার। কাল তাকে জ্যান্ত মানুষ মনে হয়েছিল, আজ সহজেই বোঝা যাচ্ছে প্রেতিনী বলে। একদম স্বচ্ছ তাদের গায়ের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পিছনের দেয়াল পর্যন্ত।

ছায়া ও কায়া—সবাই মিলে গান গাইছে সেই ভূতুড়ে ভাষায়, আর গামলা থেকে বাটি বাটি রক্ত তুলে ঢেলে দিচ্ছে গলায়। তারপর গানের সঙ্গে শুরু হল নাচ—অশ্লীল, উদ্দাম, তাথৈ নৃত্য। কয়েক মুহূর্ত তা চোখে দেখার পরই সারার মনে হল—তাঁরও অন্তরতম অন্তরে একটা পিশাচী নড়েচড়ে জেগে উঠছে যেন। ভয় পেয়ে তিনি বুকের উপর ক্রশ আঁকতে গেলেন, হাতে যে রিভলভার রয়েছে, তা ভুলেলই গিয়েছিলেন তিনি। রিভলভারটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে বুলেট ছুটে বেরিয়ে বিদ্ধ করল সেই প্রেতিনী বুড়ীকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নারকীয় হুংকারে গমগম করে উঠল বাড়িটা, আর বুড়ী প্রেতিনী সমেত সবগুলো ছায়ামূর্তি চোখের পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

রইল অ্যাগনেসেরা পাঁচজন শুধু। তারা যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে ফ্যাল-ফ্যাল করে চাইছে চারিদিকে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না, সারাকে পর্যন্ত তারা চিনতে পারছে না যেন।

সারা কীভাবে যে উপরে উঠে এলেন, তা তাঁর হুঁশ ছিল না কিছু।

হুঁশ হল নিজের ঘরে ঢুকবার পর। তারপরই তিনি প্রার্থনায় বসলেন।

সারাদিন মেঝেতে বসে ভগবানকে ডাকলেন সারা, এই প্রেতসংস্পর্শ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

অবাক কাণ্ড, প্রার্থনা সেরে বিকাল নাগাদ তিনি উঠে দাঁড়ালেন যখন, ভাঙা পা জোড়া লেগে গিয়েছে তাঁর, তাতে আর লেশমাত্র ব্যথা নেই। ক্ষিদে বেশ হয়েছিল। ছোট টেবিলটার উপরে স্যাণ্ডউইচের ট্রে তখনও রয়েছে, সেই স্যাণ্ডউইচ দিয়েই জঠরজ্বালার নিবৃত্তি হল সারার। আগে থাকতে এই খাবার গুছিয়ে রেখে যাওয়াতেই প্রমাণ হল যে রাত্রে যা কিছু হয়েছে, তা অতর্কিতে হঠাৎ হয়নি, অ্যাগনেসেরা আগে থাকতে সবই জানত।

রাত্রি এল আবার নিঝুম নিস্তব্ধ পুরী। সারার খুবই ভয় করছে আবার। বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ভগবান স্মরণ করছেন— "রক্ষা কর! রক্ষা কর প্রভু!"

ভয় সত্ত্বেও শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সারা, ঘুম যখন ভাঙ্গল, অ্যাগনেস তখন ঢুকে পড়েছে ঘরে। ঘড়িতে ঐ আটটা বাজছে, বেজে শেষ হয়নি এখনও। ঠিক আটটাতেই তা ও আসে রোজ!

"সুপ্রভাত মাদাম"—মোলায়েম সুরে বলছে অ্যাগনেস— "পায়ের ব্যথা কি একটু কম মনে হয়? কাল যা বলে গেলেন ডাক্তার—নড়া-চড়া না করার কথা, আশা করি আপনাকে উঠতে হয়নি একবারও?'

"ডাক্তার কাল বলে গেলেন, না পরশু?"—মাদামের কথা তীক্ষ্ণ ও তিক্ত।

"পরশু? সে কী কথা মাদাম? ডাক্তার তো কাল সন্ধ্যায়—" অ্যাগনেস এমন ভাবে মনিবনীর পানে চাইছে, যেন সে পাগল ঠাউরেছে তাঁকে।

"কাল সন্ধ্যায়?"—ব্যঙ্গের সুরে কথা কইছেন সারা— "কাল সারাদিন কী কষ্টেই যে কেটেছে আমার"—হঠাৎ তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন, শুধু বললেন— "কাল কি পরশু, তা ডাক্তার এলে তাঁর কাছেই শুনতে পাবে—"

"ডাক্তার তো আসতে পারবেন না আজ"—মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল অ্যাগনেস— "একটু আগেই তিনি ফোন করেছিলেন—"

"ফোন? ফোন কি আবার চালু হয়েছে নাকি? কাল তো ফোনও ছিল না। বেলও বাজেনি—"

"আপনার, মানে অপরাধ যদি না নেন তো বলি—সবই আপনার ভুল মাদাম! ফোনও চালু, বেলও চালু, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন—আর কি!"

এবার একেবারে গুম হয়ে গেলেন সারা। উঠে বসলেন, উঠে দাঁড়ালেন।

"অ হা হা, উঠবেন না মাদাম, উঠবেন না দয়া করে। ডাক্তার যা বলে গিয়েছেন—"

"তা বটে, ডাক্তার যখন নিষেধ করেছেন, উঠবই না।"—একেবারে সুশীলা বালিকার মত দাসীর কথা শিরোধার্য করে বিছানায় আবার বসে পড়লেন সারা। "তুমি যাও, প্রাতরাশ নিয়ে এস এখানেই। ক্ষিধে পেয়েছে—"

"তা আনছি, কিন্তু উঠবেন না মাদাম, দোহাই আপনার—"

অ্যাগনেস বেরিয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সারা উঠে গিয়ে বসলেন ফোনের কাছে। সত্যিই তো ফোন চালু হয়েছে আবার! ডাক্তারকে ডাকা মাত্র সাড়া পাওয়া গেল।

"সুপ্রভাত, আপনি ফোন করেছিলেন নাকি?"—বললেন সারা।

"আমি? সে কী?" ডাক্তার আকাশ থেকে পড়লেন যেন— "বরং আপনার ওখান থেকেই আপনার দাসী ফোন করল এই বলে যে আপনি ভাল আছেন, আজ আর আমার আসার দরকার নেই—"

"ব-টে! দেখুন ডাক্তার, একটা দারুণ গোলমাল হয়েছে। আমি সাক্ষাতে বলব সব। আজ বা কাল আমি দেখা করছি আপনার ওখানে গিয়ে। ভাল কথা, আপনি বলুন তো, আমাকে আপনি দেখতে এসেছিলেন কাল সন্ধ্যায়? না, পরশু?"

"এ সব কী প্রশ্ন, এ্যাঁ?"—ডাক্তার ককিয়ে উঠলেন—"ভেঙেছে পা, তাতে মাথা গোলমাল হবে কেন? আমি পরশু গিয়েছিলাম। কাল নয়, পরশু।"

"ধন্যাবাদ"—বলে ফোন ছেড়ে দিলেন সারা। তারপর আবার ডায়াল করলেন—এবার নিউইয়র্কে ইবার্ট ভাইকে।

ইবার্টকে যা বললেন, তার ফলে ইবার্ট বিকাল নাগাদ সশরীরে এসে পড়লেম দুখানা ট্রাক আর একখানা গাড়ি নিয়ে। পাঁচটি চাকরদাসীর তো চক্ষুস্থির! তাদের তিন মাসের মাইনে আগাম দিয়ে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে।

খুব বেশী দরকারী জিনিসগুলো ট্রাকে চাপিয়ে দিয়ে সারা গাড়িতে উঠে বসলেন ইবার্টের পাশে। স্বামীর ভিটের মায়া তাঁকে কাটাতে হল প্রাণের মায়ায়। তিনি নিউইয়র্কে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েই বাস করবেন। হোয়াট গেটস্ বিক্রী হবে।

ইবার্ট ব্যাপারখানা শুনলেন ও বুঝলেন। সারাকে যা বললেন, তা হল এই—সেদিন তারিখ ছিল ১লা নভেম্বর, "অল্ সোলস্ ডে—" সব প্রেতাত্মা সেদিন পৃথিবীতে চলে আসে স্বর্গ বা নরক থেকে। স্বর্গ থেকে যারা আসে, তারা মানুষের ভালোর চেষ্টা করে নানাভাবে। আর নারকীরা করে পৃথিবীর মাটিতে নারকীয় মজলিস। সে মজলিসের নাম কোভেন। এই কোভেনে যোগ দেওয়ার জন্য তারা জ্যান্ত মানুষকেও প্রলুব্ধ করে বিভিন্ন উপায়ে। বলা বাহুল্য সে-প্রলোভনে যারা মজে, পরিণামে নরকবাসই ঘটে তাদের ভাগ্যে।

ঐ বুড়ীটা ছিল নরকের প্রেত। অ্যাগনেসদের সমুখে নরকের দরজা খুলে দেবার জন্যই তার আবির্ভাব ঘটেছিল হোয়াইট গেটস্-এ। আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছিলেন সারা ক্লেবার্ণ।

চৈত্র ১৩৭৯

কালীদহের পিশাচ

মঞ্জিল সেন

গরমের ছুটিতে অভীকের ছোট মামা এসে ওকে মামাবাড়ি নিয়ে গেল।

ওর মামাবাড়ি টাকি শহরের কাছে, ইছামতী নদী থেকে কিছুটা দূরে। অভীকের দাদু বেঁচে আছেন, দিদিমা নেই। দাদুর বয়স আশির ওপর, কিন্তু এখনও বুক টানটান করে হাঁটেন। কব্জিতে তা জোর তা অনেক তরুণকেই লজ্জা দেয়।

দাদুর বাবা ছিলেন পুব বাংলার ছোটখাটো এক জমিদার, এখন যার নাম বাংলাদেশ। তখন তো আর দেশ ভাগ হবার কথা কেউ কল্পনাও করেনি, কোপটাও পড়েনি বাঙালি আর পাঞ্জাবীদের ওপর।

দেশ ভাগ হবার পরেও দাদু পুব বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই যোগাযোগ রাখা আর সম্ভব হয়নি।

দাদুর বয়স তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ। কয়েকদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। একদিন রাত্রে তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছিল দুর্বৃত্তরা। সবাইকে কুপিয়ে মেরেছিল। শুধু দাদুই পালিয়ে বেঁচেছিলেন। এক প্রতিবেশী মুসলমান পরিবার তাঁকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল। বিপদের আশঙ্কা করে দাদুর বাবা কিছু ধন-রত্ন মাটির তলায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলি উদ্ধার করে সেই মুসলমান পরিবারের সাহায্যে এপার বাংলায় চলে এসেছিলেন দাদু।

ইছামতী নদীর অদূরে এই জায়গায় নতুন করে বাসা বেঁধেছিলেন। তখন ওখানে লোকজনের বসতি ছিল কম। জমির দরও ছিল জলের মতো। আরও পরে ওখানে মানুষজন আসতে শুরু করেছিল।

দাদু কঠিন পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দেশ ভাগ হবার আগেই তিনি এম. এ. পাশ করেছিলেন, ওখানে এক ইস্কুলে মাস্টারির চাকরিও পেয়েছিলেন। ইংরেজি পড়াতেন, পরে হেডমাস্টার হয়েছিলেন। সংসারী হবার পর তিনি পাকা বাড়ি করেন। যে সোনা-দানা তিনি নিয়ে এসেছিলেন তা সে সময় খুব কাজে লেগেছিল।

এই হল দাদুর ইতিহাস। অভীকের তিন মামা। বড় মামা উকিল, মেজো মামা ডাক্তার আর ছোটো মামা কলকাতার এক বড় ক্লাবে ফুটবল খেলে, এখনও চাকরি পায়নি। বড় মামা আর মেজো মামা বিয়ে করেছেন। বড়জনের দুই ছেলে-মেয়ে আর মেজো মামার এক মেয়ে। ওর মা হলো তিন মামার একমাত্র বোন, তাই মামাবাড়িতে অভীকের খুব আদর। ওর বয়স তেরো, ক্লাস এইট-এ পড়ে।

দাদু জমিতে আম, কাঁঠাল আর লিচু গাছ লাগিয়েছিলেন। এখন গরমকালে সব পাকতে শুরু করেছে। ঘন দুধের মধ্যে পাকা আম গুলে চিনি আর মুড়ি মিশিয়ে যে কি অমৃত ফলাহার হয় তা অভীক জানে আর সেই লোভেই প্রত্যেক বছর গরমের ছুটিতে কয়েকদিনের জন্য ওর মামাবাড়িতে আসা চাই-ই। তা ছাড়া দাদু পুকুর কাটিয়েছেন, তাতে রুই, কাৎলা, মৃগেল ছাড়াও অন্য মাছও আছে। মাছ ভাজ, মাছের ঝোল, ঝাল, টক, দুই মামী যে কত রকম রান্না করে তার ঠিক নেই।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা দাদুকে ঘিরে বসেছিল নাতি-নাতনিরা। সামনে একটা বড় রেকাবিতে গরম

গরম মাছের চপ, আরেকটা রেকাবিতে আম, ফালা ফালা করে কাটা। খেতে খেতে দাদুর সঙ্গে গল্প করছিল ওরা। অভীকই প্রথম বলল, 'দাদু, একটা ভূতের গল্প বল।'

'ভূতের গল্প।' দাদু টান টান হয়ে বসে বললেন, 'শুনবি? ভয় পাবি না তো!'

'না, না,' সবাই একসঙ্গে বলে উঠল।

'এটা কিন্তু গল্প নয়, সত্যি ঘটনা,' দাদু বললেন, 'আমার জীবনেই ঘটেছিল।'

সবাই দাদুর গা ঘেঁষে উদগ্রীব হয়ে বসল।

দাদু শুরু করলেন, 'তখন আমার বয়স সতেরো-আঠারো, বি. এ পড়ি। কলকাতায় হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। সেবার এক ছুটিতে দেশের বাড়ি যাব বলে রওনা দিয়েছি।

'গোয়ালন্দ থেকে আমাকে স্টিমার ধরতে হবে। গোয়ালন্দ হলো বড় স্টিমার ঘাট। ওখানের তরমুজ বিখ্যাত, এত বড় বড় যে একজনকে মাথায় করে নিয়ে যেতে হয়। অত বড় তরমুজ আর কোথাও দেখিনি। সেদিন স্টিমারে কি একটা যন্ত্র বিকল হয়েছিল তাই ছাড়তে অনেক দেরি হয়ে গেল। আমি নামব তারপাশায়, সেখান থেকে নৌকো করে যেতে হবে আমাদের গ্রামে। আমার বাবা ছিলেন জমিদার, তবে বড় জমিদার নয়, আশপাশের কয়েকটা গ্রাম নিয়ে ছিল তাঁর জমিদারি।

'দুপুরে আট আনা দিয়ে এক প্লেট ভাত আর মুর্গির মাংস খেলাম। সে মুর্গির মাংসের রান্নার স্বাদ আজও যেন আমার জিভে লেগে আছে।

'তারপাশা স্টিমার ঘাটে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাড়িতে আগে খবর দিইনি, দিলে বাবা নৌকা পাঠাতেন, আমাদের নিজেদের নৌকো ছিল।

'ওখানে যাত্রীদের নেবার জন্য সার সার নৌকো অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে যাত্রীদের নিয়ে প্রায় টানাটানি পড়ে গেল। যাহোক আমি এক বুড়ো মুসলমানের নৌকো ভাড়া করলাম, তার সঙ্গে ছিল তার জোয়ান নাতি।

'বুড়ো মাঝিকে আমার গন্তব্যস্থল বলতেই সে বলল, 'ছোট চৌধুরি কত্তার বাড়ি! আপনাগো বাড়ি আমি অনেকবার গেছি, আপনি বুঝি তেনার পোলা?'

'আমার বাবাকে ছোট চৌধুরী নামেই সবাই জানতো। ওখানে আরও জমিদার ছিলেন, কেউ বড় চৌধুরী, কেউ মেজো চৌধুরী, এভাবেই ছিল তাঁদের পরিচয়।

'আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই বুড়ো মাঝি বলল, 'আপনে বুঝি বাড়িতে খবর দেন নাই, আপনাগো মাঝি আজিজ মিঞা আমার সম্বন্ধী হয়।' তারপর একটু চিন্তা করে বলল, 'আইজ স্টিমার এত দেরি কইরা আইলো, রাত হইয়া যাইব।'

'তা হোক না', আমি বললাম, 'তুমি চিন্তা করো না, তোমাকে ভাড়ার ওপর বখশিস দেব।'

'সে কথা না দা ঠাউর', বুড়ো মাঝি বলল, 'ঠিক আছে, আপনি বসেন।' তাকে যেন কেমন চিন্তিত মনে হলো।

'আমাকে ওই স্টিমার ঘাট থেকে অনেকটা পথ যেতে হবে। পথ মানে কচুরিপানা ভর্তি খাল-বিল। বুড়ো মাঝি সামনে বসে দাঁড় দিয়ে কচুরিপানা সরাচ্ছিল আর তার নাতি একটা বড় লগি জলের তলায় মাটিতে চাপ দিয়ে তরতর করে নৌকো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

অসংখ্য খাল-বিল দিয়ে কেমন করে যে ওরা ঠিক পথ চিনে নৌকো নিয়ে যেত তা আমার কাছে একটা বিস্ময় ছিল। শহরের অলিগলি দিয়ে একজন ড্রাইভার যেমন পথ চিনে গাড়ি নিয়ে যায় ঠিক তেমন।

'ক্রমে অন্ধকার নেমে এল। আলো বলতে নৌকোর মধ্যে একা মাত্র হারিকেন লণ্ঠন। সে যে কি অন্ধকার তা বলে বোঝাতে পারব না। তার মধ্যেই বুড়ো মাঝি আর তার নাতি দিব্যি নৌকো চালাচ্ছিল। তবে একটা আশার কথা, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করছিল।

'প্রায় এক ঘণ্টা যাবার পর বুড়ো মাঝি হঠাৎ এক জায়গায় খালের পাড় ঘেঁষে নৌকো ভিড়ালো। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কি, এখানে নৌকো লাগালে কেন?'

'দা ঠাউর,' বুড়ো মাঝি বলল, 'আর দুইটা বাঁকের পরেই ডাকাইতে বিল। রহিম শেখের দলের ভয়ে রাইতে কেউ ওই জায়গা পার হয় না। আমারে কিছু করব না, আমি এই পথে নাও চালাইয়া বুড়ো হইয়া গেলাম, আমার হক্কলে চেনে, কিন্তু ডর্ আপনার লাইগ্যা। যদি আপনার কিছু হয় তবে আমি ছোট চৌধুরী কত্তার কাছে মুখ দেখাইতে পারুম না।'

'রহিম শেখের নাম আমিও শুনেছিলাম। দিনের বেলায় অনেক নৌকো চলাচল করে তাই রাত্তিরেই ও দলবল নিয়ে শিকারের খোঁজে বেরোয়। শুনেছি দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর এক মানুষ।

'বুড়ো মাঝি আর তার নাতি রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হলো। সব নৌকোয় তার ব্যবস্থা থাকে, বাড়ি গিয়ে কখন ওরা খাওয়া-দাওয়া করবে তার কোনো ঠিক নেই। যেমন আজ রাতটা এই খালের পাড়েই কাটাতে হবে।

'হাঁড়িতে চাল ছেড়ে বুড়োর নাতি মাছ কুটতে বসে গেল। বড় বড় পার্শে মাছ, আমিও ওদের সঙ্গে খাব।

'আমি ছইয়ের বাইরে বসে চাঁদের আলোয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলাম। অন্ধকার আর জ্যোছনা মিলে এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া আমাদের কাঁপিয়ে দিল। বুড়ো মাঝি কাজ থামিয়ে সামনের দিকে তাকিয়েছিল, সে একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠল। আমি তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাকালাম আর চমকে উঠলাম। আমাদের নৌকো থেকে কয়েক হাত দূরে একটা ছায়ামূর্তি, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঢ্যাঙা রোগা সেই মূর্তি বড় বড় পা ফেলে খালের এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। ঠিক বড় বড় পা ফেলে নয়, দু'বার পা বাড়িয়েই খাল পার হলো, যদিও খালটা চওড়ায় নেহাৎ কম নয় আর গভীরতায় এক মানুষ তো হবেই।

'ও পারে পৌঁছে মূর্তিটা এদিকে মুখ ফিরিয়ে লম্বা একটা হাত জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর একটা মাছ তুলে সেটা কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

'বুড়ো মাঝি কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'দা ঠাউর রাম নাম জপেন,' সে নিজেও আল্লা আল্লা বলে প্রার্থনা শুরু করে দিল। আমি রাম নাম জপতে লাগলাম।

ব্যাপারটা কি তা বুঝতে আমার দেরি হয়নি। একটা প্রেত রাতের অন্ধকারে মাছ খেতে বেরিয়েছে।

'আমি বোধহয় একটু জোরেই রাম নাম করেছিলাম, মূর্তিটা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম একটা বীভৎস মুখ। তারপরই সে মিলিয়ে গেল।

'বুড়ো মাঝি বলল, 'আঁদারে ঠাওর হয় নাই দা ঠাউর, এটা হইল গিয়া কালীদহ। এহানে একবার একটা জেলে নাও ডুইব্যা গেছিল, একজন মরছিল। তারেই মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাছ খাইতে আসে। এমন এক চাঁদনী রাতেই নাকি নাওটা ডুবছিল।'

'ওরা আবার রান্নায় মন দিল। ভাত হয়ে গেছিল, কড়াইতে তখন পার্শে মাছ তেলে ফুটছে, গন্ধ ছেড়েছে।

'হঠাৎ একটা কালো লম্বা হাত শূন্য থেকে এসে ফুটন্ত কড়াই থেকে একটা মাছ তুলে নিল। তাকিয়ে দেখলাম সেই ছায়ামূর্তি নৌকোর একেবারে পাশে খালপাড়ে দাঁড়িয়ে সেই মাছটা কচমচ করে খাচ্ছে। বুড়ো মাঝির নাতি অজ্ঞান হয়ে পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়ল, বুড়ো আল্লার নাম জপ করতে লাগল। আমার তখন তরুণ বয়স, মনে আর শরীরে শক্তির অভাব ছিল না। একটা চ্যালা কাঠ তুলে গনগনে আগুন ওই ছায়ামূর্তির দিকে বাড়িযে ধরে আমি বলে উঠলাম, 'জয় জয় রামচন্দ্র, জয় জয় রাম।'

'সেই মূর্তিটা রাম নাম শুনে যেন থমকে গেল, আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। যেন ছোট ছোট দুটো জ্বলন্ত অঙ্গার আমাকে ভস্ম করে ফেলবে। তারপরই অদৃশ্য হলো মূর্তি।

'বুড়ো মাঝি বলল, 'আর এক দণ্ডও এহানে থাকন চলব না দা ঠাউর, যা নসিবে আছে হইব।' সে নৌকো ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে তার নাতির জ্ঞান হয়েছে।

'কিন্তু নৌকো চলে না, কি ব্যাপার! তাকিয়ে দেখি পেছন দিকে একটা লম্বা কালো হাত নৌকোটাকে ধরে আছে, নৌকো এতটুকু নড়ছে না। বুড়ো মাঝি চেঁচিয়ে ওর নাতিকে বলল, 'কড়ার মাছগুলো ওরে দিয়া দে, নইলে নৌকা ছাড়ব না।' নাতি উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে হাতা দিয়ে একটা একটা করে মাছ তুলে ছুঁড়ে দিতে লাগল আর পিশাচটা সেগুলি লুফে গপগপ করে মুখে পুরতে লাগল। মাছ শেষ হবার পর সে নৌকোটা ছেড়ে দিল।

'আধঘণ্টা যাবার পর চাঁদের আলোয় চোখে পড়ল একটা ছিপ তীরগতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। বুড়ো মাঝি কপাল চাপড়ে বলল, 'হায় আল্লা, এবার ডাকাইতের পাল্লায় পইড়া গেলাম। আজ কি দেইখ্যা যাত্রা করেছিলাম কে জানে!'

'আমার বুকের ভেতরটাও ধড়াস করে উঠল। পিশাচের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে না পেতেই ডাকাতের হাতে, সত্যি বড় অশুভ দিনে যাত্রা করেছিলাম।

'ছিপটা আমাদের কাছে আসতেই কে একজন গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক দিয়ে বলল, 'কেডা যায়?'

'বুড়ো মাঝি গলা তুলে বলল, 'আমি ইমানুল হক সিরাজের বাপ।'

'সিরাজ এ সময় নামী ফুটবল খেলোয়াড় ছিল, ঢাকা একাদশে খেলতো, পরে কলকাতার বড় ক্লাবেও খেলেছে। মাত্র তিনদিনের জ্বরে মারা যায়। তখন তার বয়স তিরিশও পেরোয়নি। বুড়ো মাঝিই যে তার বাবা সেটা আমিও প্রথম জানলাম। পুব বাংলার মানুষের কাছে খুব প্রিয় ছিল সিরাজ।

'ছিপ থেকে এক মুহূর্ত কোনো সাড়াশব্দ এল না তারপরই গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হলো, 'নাওয়ে কারা যায়?'

'সোনাদীঘির ছোট চৌধুরীর বড় পোলা,' বুড়ো মাঝি জবাব দিল, 'অর কোনো ক্ষতি করিস না রহিম, আল্লার নামে তর কাছে দোয়া মাংগাতাছি। ছোট কত্তার কাছে তাইলে আর কোনোদিন আমি মুখ দেখাইতে পারুম না।'

'আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফটিকের কথা। ফটিক ছিল আমাদের একজন লাঠিয়াল। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, বাবরি চুল আর তার শরীরের মাংসপেশী যেন কিলবিল করত। লাঠি খেলায় এ তল্লাটে কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারত না। আমার বয়স তখন এগারো কি বারো। আমি ওর খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম, ফটিক দাদা বলে ডাকতাম। ফটিকও আমাকে খুব ভালবাসত, হাতে ধরে লাঠি খেলা শেখাত। তারপর একটা ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়ে ও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। লোকমুখে শোনা গিয়েছিল ও রহিমের দলে যোগ দিয়েছিল। আমি গলা তুলে বললাম, 'তোমাদের মধ্যে ফটিক সর্দার বলে কেউ আছে?'

'আবার মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর অন্য এক গলায় কেউ বলে উঠল, 'কেডা জিগায়?'

'আমি ছোট চৌধুরীর বড় ছেলে রমেন্দ্র নারায়ণ,' আমি বললাম, 'ছোটবেলায় ফটিক দাদা আমাকে লাঠি খেলা শেখাত।'

'ছিপটা আমাদের নৌকোর পাশে এসে ভিড়ল। একজন লাফ দিয়ে চলে এল নৌকোয়। এতদিন পরেও আমার চিনতে ভুল হলো না, আমি বলে উঠলাম, 'ফটিক দাদা।'

'ফটিক আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'দা ঠাউর কত বড় হইয়া গেছ তুমি। তুমি না কইলে

চিনতেই পারতাম না।' তারপর বুড়ো মাঝির দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কি আক্কেল নাই মিঞা, এতকাল নৌকা চালাইতেছ, জান না রাইতে এই পথে যাওনের কি বিপদ!'

'বুড়ো মাঝি তাকে বলল, স্টিমার আজ অনেক দেরি করে আসায় যত বিপত্তি। তারপর সেই মেছো ভূতের কথা বলল, যে কারণে বাধ্য হয়ে আমাদের নৌকো ছাড়তে হয়ছে।

'সব শুনে ফটিক বলল, 'খুব বাঁইচ্যা গেছ আজ। তা তোমাগো প্যাটে তো কিছু পড়ে নাই। আহা, দা ঠাউরের মুখ শুকাইয়া গ্যাছে, খুব কষ্ট হইতাছে।'

'আমি বাধা দিয়া বললাম, 'না ফটিক দাদা, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

'চুপ কর তুমি,' ফটিক আমাকে এক ধমকে থামিয়ে দিল, তারপর বলল, 'আমাগো খাওনের পাট চুইক্যা গ্যাছে অনেকক্ষণ। কিছুই তো নাই, থাকনের মধ্যে আছে চিড়া আর গুড়।'

'তাই দাও,' আমি বলে উঠলাম, আসলে আমার পেটের ভেতর চোঁ চোঁ করছিল। ফটিক ওই ছিপে গিয়ে চিড়ে আর গুড় নিয়ে এল। ক্ষিদের মুখে তাই অমৃত মনে হলো। শুধু তাই নয়, ফটিকরা আমাদের অনেকটা পথ এগিয়ে দিল যাতে আর কোনো বিপদ না হয়।

'ওরা বিদায় নেবার সময় আমি ওর হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিতে গেলাম। আমার কাছে ওই টাকাই ছিল। তবে সে আজ অনেক আগের কথা, তখন পঞ্চাশ টাকার দাম এখনকার প্রায় এক হাজার টাকা হবে। ফটিক কিন্তু কিছুতেই টাকা নিল না, উল্টে আমাকে এমন ধমক দিল যে আমি আর কথা বলতে পারলাম না।

'সে রাতের কথা আমি সারা জীবনেও ভুলব না।'

দাদু তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

নাতি-নাতনিদের কারও মুখে কথা নেই, তারা সবাই দাদুর গায়ে গা সিঁটিয়ে বসে আছে।

শারদীয়া ১৪০৮

ভূতুড়ে গুদাম তদন্ত

অজেয় রায়

বোলপুর শহর। ভবানী প্রেস। প্রেসের এক কোণে প্রেসের মালিক এবং সাপ্তাহিক ‘বঙ্গবার্তা’। সংবাদপত্রের সম্পাদকের পার্টিশন ঘেরা ছোট্ট কুঠুরি। এক বিকেলে রিপোর্টার দীপক রায় সম্পাদক শ্রীকুঞ্জবিহারী মাইতির কামরায় ঢুকে সম্পাদকের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, হঠাৎ তলব কেন?

টেবিলে ঝুঁকে শ্যামবর্ণ মধ্যবয়সী কুঞ্জবিহারী তখন একটা লেখা পড়ছিলেন। গোল গোল চোখে দীপককে একপ্রস্থ দেখে নিয়ে সম্পাদক গম্ভীর ভাবে বললেন, বীরভুমের ভূতুড়ে বাড়ি নিয়ে বঙ্গবার্তায় একটা সিরিজ লিখবে বলেছিলে, তার কী হল? অনেক দিন স্টোরি দাওনি যে ওই নিয়ে। জান, কত পাঠক ডিমান্ড করছে।

দীপক ব্যাজার মুখে বলে, ভূতুড়ে বাড়ির খোঁজে পেলে তো লিখব? তেমন কোনও বাড়ির খোঁজ পাইনি যে অনেক দিন।

ঝাঁটা গোঁফ নাচিয়ে মুচকি হেসে কুঞ্জবাবু বললেন, তুমি পাওনি, কিন্তু আমি পেয়েছি।

কোথায়?

এই বোলপুর শহরেই। শ্রীহরি রাইস মিল কোথায় জান?

জানি। দেখেছি বাইরে থেকে। বোলপুরের এক প্রান্তে। মিলটা তো অনেক দিন বন্ধ আছে।

হুম্। বছর চারেক। ওই বন্ধ ধানকলের একটা গুদোম ঘরে নাকি ভূতের আস্তানা হয়েছে।

গুদোম ঘর! কিন্তু গুদোম ঘর তো আর বাড়ি নয়।

কেন নয়? মাথায় টিনের চাল। পাকা দেয়াল, মেঝে। দরজা-জানলাও আছে। আমাদের গরিব দেশে কত লোক বর্তে যাবে এমন একটা আশ্রয় জুটলে। ওটাকে বাড়ি বললে কেউ আপত্তি করবে না।

মিলটা বন্ধ হল কেন? দীপক জানতে চায়, ভূতের ভয়ে?

না না। নাকি লোকসানে চলছিল, তাই বন্ধ করে দিয়েছে। শুনেছি ওই জমিতে বাড়ি বানাবে। কম নয়, প্রায় বিঘে তিনেক জায়গা। তবে জমির ভাগাভাগি নিয়ে শরিকদের মধ্যে গোলমাল চলছে, তাই জমি, মিলের বাড়িঘর তেমনি পড়ে আছে।

মিলের ঘরবাড়িতে থাকে না কেউ?

থাকে। দু-তিনজন পুরনো কর্মচারী এখনো থাকে। একজন দারোয়ান আছে। আর মস্ত গুদোম ঘরটায় মিলের গাদা জিনিসপত্র, যন্ত্রপাতি রাখা আছে।

ওই গুদোমেই বুঝি ভূত থাকে?

না। মিলের বাউন্ডারির আর এক ধারে একটা বড় ঘর আছে পাঁচিল ঘেঁষে। একসময় সেটাও গুদোম ছিল। এখন ফাঁকা। ওই গুদোমেই নাকি ভূতের আস্তানা।

এসব শুনলেন কোথায়?

মিলের ঘরে যারা থাকে, তাদেরই একজন বলেছে আমায়। মিলের বাসিন্দারা ভয়ে ওই ঘরটার ধারে-কাছে যায় না রাতে।

কী রকম উপদ্রব হচ্ছে ভুতের? প্রশ্ন দীপকের।

রাতে ওই ঘরের ভিতর থেকে নাকি সুরে কথা, হাসি এই সব শোনা যায়।

দীপক ভুরু কুঁচকে খানিক ভেবে বলে, আমার তো মনে হচ্ছে ভূত নয়, অন্য কিছু।

মানে?

মানে রাতে ওখানে কিছু বদলোক ঘাঁটি গাড়ে। কাগজের ভাষায় যাদের লেখে সমাজবিরোধী। ইংরিজিতে অ্যান্টিসোসাল। খোনা গলা শুনিয়ে তারাই মিলের লোকদের ভয় দেখিয়ে রেখেছে। যাতে নির্বিঘ্নে আড্ডা জমাতে পারে। কেউ কি ওই রকম সময়ে গিয়ে পরখ করে দেখেছে ভিতরে কারা? ভূত না মানুষ!

হ্যাঁ দেখেছে। মিলের দারোয়ান একবার মাসতিনেক আগে একজন সঙ্গী জুটিয়ে রাতে জানলা দিয়ে ওই ঘরের ভিতর টর্চ মেরেছিল। দেখে ঘর একদম ফাঁকা। অথচ তার একটু আগেই ওই ঘর থেকে কয়েকজনের গলা শোনা গেছে। হাসিও। গোটা রাতে ওই ঘর থেকে কাউকে বেরুতেও দেখেনি দারোয়ান। তারপর থেকে মিলের বাসিন্দাদের পুরো বিশ্বাস, ওই খালি গুদাম ঘরে নির্ঘাৎ ভূতেরা জোটে। তবে এখনো পর্যন্ত মিলে যারা থাকে তাদের কোনও ক্ষতি করেনি ভূত। মিলের লোকেরাও ওদের একদম ঘাঁটায় না।

এমন জোরালো প্রমাণ সত্ত্বেও দীপক অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। সম্পাদক রেগে বললেন, বেশ, নিজেই পরখ করে আসল সত্যটা লেখো না। নাকি ভয় করছে?

ভয়? দীপক গরম হয়ে বলে, আমি কি যাব না বলেছি? তবে কেসটা বোধহয় আপনার ভূতুড়ে বাড়ি সিরিজে ঢোকানো যাবে না।

বেশ যা দেখবে তাই লিখবে। তবে একটু সাবধানে যেও হে। সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীরা ভূতের চেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস। বাঁকা হেসে মন্তব্য করেন কুঞ্জবিহারী।

দীপক উঠে পড়ে বলে, যাব। শিগগিরি যাব। আপনি মিলের মালিক বা দারোয়ানকে বলে রাখবেন যে আমি মিলের ভিতর কয়েক দিন টহল দেব রাতে।

অলরাইট। সম্পাদক আশ্বাস দেন।

দীপক প্রথমে একদিন গিয়ে শ্রীহরি রাইস মিলের বাইরে দিয়ে চারপাশটা ঘুরে দেখল। পাঁচিল ঘেরা মিল এলাকা। তবে পাঁচিল তেমন উঁচু নয়। অনেক জায়গায় পাঁচিলের ইঁট খসে পড়েছে। নিচু হয়ে গেছে পাঁচিল। ইঁটের খাঁজে পা দিয়ে অনায়াসে পাঁচিল টপকে ভিতরে যাওয়া যায়। ধানকলের লম্বা আকাশছোঁয়া চিমনিটা কেমন বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে। ভিতরের ঘরবাড়িগুলো চোখে পড়ে বাইরে থেকে। ধানকলের এলাকার মধ্যে ধারে ধারে কয়েকটা মস্ত মস্ত ডালপালামেলা গাছ। ধানকলের পাঁচিল ঘেঁষে বাইরে চারদিকেই রাস্তা। রাস্তাগুলোর অপর পারে ছোট-বড় বাড়ির সারি। বহু লোক ও গাড়ি চলাচল করছে ওই সব রাস্তা দিয়ে। মাঝখানে বিশাল এলাকা জুড়ে এই নিস্তব্ধ দানকলটা। যে গুদামটার কথা বলেছিলেন কুঞ্জবিহারী সেটাও চোখে পড়ল রাস্তা থেকে। বিরাট এক আমগাছের পাশে মাঝারি সাইজের একটা টিনের চালের ঘর।

পরদিন দুপুরে দীপক শ্রীহরি রাইস মিলের ভিতরে ঢুকল গেট দিয়ে। মস্ত চওড়া লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলাই ছিল। দীপক সোজা হাজির হয় মিলের দারোয়ান গয়াপ্রসাদের কাছে। নিজের পরিচয় দিতে গয়াপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে দীপককে নিয়ে বসাল একটা ঘরে। বলল, হাঁ হাঁ, মালিক বলিয়েছেন আপনি আসবেন। দেখবেন ঘুরবেন। তা বাবুজি, রাতে ঘুরলে ওই ঘরের কাছে যাবেন না। গয়াপ্রসাদ আঙুল দেখায় দূরে সেই ভূতুড়ে গুদাম ঘরটাকে।

দীপক হেসে বলে, আরে ঘরটায় রাতে কী হয় দেখব বলেই তো আসছি।

হায় রাম! শুনেই দারোয়ানজীর চোখ ছানাবড়া।

ওই গুদাম ঘরে নাকি ভূত আসে? দীপক জিগ্যেস করে।

জরুর। জানায় দারোয়ানজী।

বেশ, সেটা আমি পরখ করে দেখব রাতে। আমি কী জন্যে আসছি এখানে তা এখানকার অন্য লোকদের বা আর কাউকে বলো না। বলবে, মালিক পাঠিয়েছেন কী সব দেখতে। ওরা ঘুমায় কখন?

তো রাত নটার ভেতর সব ঘুষে যায় আপনা-আপনা কামরায়। দিন ভর বাইরে অন্য কাম করে রোজগারের ধান্দায়। সন্ধ্যায় ফেরে।

গেট বন্ধ কর কটায়?

এই রাত আট-সাড়ে আটে।

ঠিক আছে, আমি রাত আটটার আগেই চলে আসব। তোমার ঘরে অপেক্ষা করব। অন্য সবাই শুয়ে পড়লে তখন বেরুব চক্কর দিতে। দেখি তোমাদের কেমন ভূত?

দারোয়ান হাত জোড় করে বলল, বাবুজী, এ কাম করবেন না। বহুত মুশকিল হোতে পারে।

তুমি ঘাবড়িও না দারোয়ানজী, আমি ভূত-পেরেত নিয়ে অনেক কারবার করেছি। আমি মন্তর জানি। ভূত আমার কিস্‌সু করতে পারবে না। ভরসা দেয় দীপক।

হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ে দারোয়ানজী।

দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে তখনই গোটা মিল একবার ঘুরে দেখে নেয় দীপক। তখন গরমকাল। মিল এলাকার মাঝামাঝি জায়গায় ঘাট বাঁধানো এক পুকুরে কয়েকজন স্নান করছিল। গয়াপ্রসাদ জানায় যে এরা বাইরের লোক। রোজ এই পুকুরে চান করতে আসে। কেউ আসে পাঁচিল ডিঙিয়ে, কেউ বা মেন গেট দিয়ে। একধারে মিলের ছাই জমে জমে বিরাট এক ঢিবি। মিলের ঘরবাড়ি, বড় গুদামের সামনেটা আর ধান শুকনোর জন্য প্রশস্ত সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর মোটামুটি পরিষ্কার রাখা হয়েছে। তবে বাকি অংশে ঘাস ও আগাছা জন্মেছে প্রচুর। দূরে পাঁচিলের গায়ে সেই পরিত্যক্ত ভূতুড়ে গুদাম ঘরটাও একবার ঢুকে দেখে নেয় দীপক।

গুদাম ঘরটায় দরজা আছে। টিনের পাল্লা ভেজানো। পাল্লাটা টানতেই ক্যাঁচ—যন্ত্রণাময় আওয়াজ করে পাল্লা খোলে আধাআধি। সেই ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে দীপক। তবে গয়াপ্রসাদ ঢোকে না ঘরে।

গুদামটা একদম খালি। নানা জায়গায় পাকা মেঝের চটা উঠে গেছে, দেয়ালের পলেস্তরা খসে পড়েছে। ঘরের ভিতর মেঝে থেকে হাত দুই ওপর দিয়ে দু'দিকের দেয়ালে সিমেন্টের চওড়া টানা তাক। দুটো লম্বাটে প্রায় ছাদ সমান উচুঁ সিমেন্টের চওড়া থাক থাক তাকও রয়েছে, যেন পাল্লাবিহীন আলমারি। এসব তাক একদা মাল রাখার জন্য তৈরি হয়েছিল বোঝা যায়। পুরু ধুলো জমেছে মেঝেতে ও তাকগুলোয়।

একটা ছোট জানলা আছে ঘরে। তার পাল্লা নেই। তবে মরচে পড়া মোটা মোটা লোহার শিকগুলো আজও অটুট। শিকের ফাঁক দিয়ে বেড়াল, পাখি ইত্যাদিরা ঘে ঢুকতে পারলেও বড়সড় মানুষ গলতে পারবে না।

দীপক নজর করে যে ঘরের এক কোণে মেঝেতে কয়েটা দগ্ধ মোমবাতির অবশিষ্ট পড়ে রয়েছে। ঘরের কাছে আমগাছটায় কচি আম ধরেছে প্রচুর। আধঘণ্টাটাক ঘুরে দেখে নিয়ে মিল থেকে বেরিয়ে যায় দীপক। ওই সময় দারোয়ানজী ছাড়া মিলের বাসিন্দারা আর কেউ ছিল না এলাকায়।

দীপক আবার ফেরে মিলে রাত আটটার কিছু আগে। সোজা গিয়ে ঢোকে দারোয়ানজীর কুঠুরিতে। তিনজন বয়স্ক ব্যক্তি ঘরগুলোর সামনে বারান্দায় বসে গল্পগুজব করছিল তখন। তারা কৌতূহলী চোখে দেখল দীপককে তবে কথা বলার চেষ্টা করে না। দীপক যে আসবে দারোয়ানজী তাদের সে খবর দিয়ে রেখেছে বোঝা যায়।

সৌভাগ্যের বিষয় মিল বন্ধ হলেও ওখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নষ্ট হয়নি। দারোয়ানজীর ঘরে এবং আর যে দুটি ঘরে লোকের বাস সেখানে ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলে। বড় গুদামটা অন্ধকার। তবে ঘরগুলোর সামনে চত্বরে লম্বা পোস্টের মাথায় একটা টিউব-লাইট জ্বলে সারারাত। মিল এলাকায় পাঁচিল অবধি সেই আলো আবছা হলেও পৌঁছয় খানিক। তবে বড় গাছগুলোর তলায় ছায়া ঢাকা অন্ধকার।

রাত নটা নাগাদ অন্য দুই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দীপক বাইরে বেরোয় ভূতুড়ে গুদাম তদন্তে।

দারোয়ান অল্প কিছুটা দীপকের সঙ্গে এসে থেমে যায়। রাম রাম। পিছনে গয়াপ্রসাদের প্রার্থনা কানে আসে দীপকের। সে পুকুরের পাশ দিয়ে ধীরে হেঁটে গিয়ে সেই গুদামটার থেকে হাত পঞ্চাশ দূরে একটা গাছের নীচে অন্ধকারে একটা আধভাঙা ছোট বেদির ওপর লুকিয়ে বসে। এখান থেকে গুদামটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেক চুপচাপ ঠায় বেদিতে বসে থাকে দীপক। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওই গুদামের বদনামের জন্য দায়ী কিছু সমাজবিরোধী। তারাই ওখানে গোপনে জমা হয় রাতে। খোনা গলায় কথা বলে ধানকলের লোকদের ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছে। নইলে ওই গুদাম ঘরে মোমবাতি জ্বালে কে? ভূতের কি আলোর দরকার হয়? সমাজবিরোধীগুলো ধানকল এলাকায় ঢোকে নিশ্চয় পাঁচিল টপকে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেলেও কোনও লোকের দেখা পেল না দীপক। কেউ গেল না ওই ভূতুড়ে গুদাম ঘরটার দিকে। দীপক বুঝল যে, আজ আর কেউ হয়তো আড্ডা জমাতে আসবে না ওই ঘরে। ঠিক আছে কয়েক রাত ওয়াচ করব ঘরটা। এখন কি ফিরে যাব? নাঃ, ঘরটায় একবার উঁকি মেরে দেখা যাক। যদি কেউ তার নজর এড়িয়ে ইতিমধ্যে ঢুকে থাকে।

সেই বিশাল নিস্তব্ধ এলাকায় একা কোনও সমাজবিরোধীর হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে যে বিপদে পড়বে জানে দীপক। তাই ভয় ভয় যে করছিল না, তা নয়। এদিক-সেদিক তাকাতে তাকাতে পা টিপে টিপে টর্চের আলো যথাসম্ভব কম জ্বেলে সে ঘরটার কাছে পৌঁছয়। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অস্ত্র বলতে একটা ছোট মোটা লোহার রড মাত্র সম্বল। কাঁধের ঝোলায় এনেছে রডটা। তবে গুণ্ডা-বদমাশ, সমাজবিরোধীরা সাধারণত কাপুরুষ হয়। দৈবাৎ এখানে দেখা হয়ে গেলে একখানা পুলিশি হুঙ্কার ছাড়লে ওরাই উল্টে পালাবে। ভূত নয় মানুষ বুঝলে মিলের দারোয়ান আর অন্য লোকেরাও এগিয়ে আসতে পারে তার সাহায্যে। তবে একটা-দুটো গুণ্ডার মোকাবিলা করার সামর্থ্য তার নিজেরই আছে।

গুদাম ঘরের পাশে গিয়ে দীপক কান পাতে। নাঃ কোনও শব্দ হচ্ছে না ঘরের ভিতরে। কোনও আলোও দেখা যাচ্ছে না ভিতরে। বিকেলে দীপক গুদামটার দরজার পাল্লা ফের টেনে বন্ধ করে দিয়েছিল যাবার সময়, এখন সাবধানে খানিক ফাঁক করে পাল্লা। কোনওরকমে গলে ঢুকে পড়ে ঘরে।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। শুধু খোলা জানলা দিয়ে সামান্য আলোর আভা দেখা যাচ্ছে ধানকলের টিউব লাইটের। দীপক টর্চ জ্বালার আগেই কেউ তার হাত থেকে এক হ্যাঁচকায় টর্চটা কেড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্য থেকে কারও বিকৃত খোনা গলায় ধমক শোনা গেল, অ্যাঁই, তুঁই কেঁ রেঁ? এঁত রাঁতে এঁ ঘঁরে কেঁন?

দীপক তৎক্ষণাৎ ভয়ে কাঠ। ওই কণ্ঠস্বর যে অমানুষিক তার বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই ঘোর অন্ধকারে তার টর্চ যে দেখতে পায়, কেড়ে নিতে পারে—তা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। দীপক বুঝতে পারে যে সে ভূতের খপ্পরেই পড়েছে। তার গা বেয়ে হিমশীতল ভয়ের স্রোত বয়ে যায়। বহু ভূতুড়ে

বাড়িতে সে রাত কাটিয়েছে। নেহাত সেই অভিজ্ঞতার জোরেই সে নিজেকে সামলে নেয় কোনও মতে। অন্য কেউ হলে হয়তো তখুনি জ্ঞান হারাত।

কিঁরে, জঁবাব দেঁ। ফের ধমক।

দীপক কাঁপা গলায় উত্তর দেয়, আজ্ঞে আমি একজন রিপোর্টার। মানে সাংবাদিক। এই ঘরটায় রাতে তেনারা আসেন শুনলাম। ভাবলাম আপনাদের একটা ইন্টারভিউ নিয়ে ছাপাব আমার কাগজে। এ ছাড়া আমার আর কোনও মতলব নেই।

কোঁন কাঁগচ? এ স্বরটা অন্য কারও।

আজ্ঞে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা। বোলপুর থেকে বেরোয়।

হুঁ। পঁড়েচি কাঁগচটা। তোঁর সাঁহস তোঁ খুঁব।

আজ্ঞে রিপোর্টারকে অনেক কঠিন কঠিন ইন্টারভিউ নিতে হয়। অনেক বিপদজনক জায়গায় গিয়ে খবর জোগাড় করতে হয়। নইলে এ লাইনে উন্নতি হয় না তাই এসেছি।

বঁটে বঁটে। মাঁইনে কেঁমন দেঁয়?

খুব কম। বাবার ব্যবসা দেখি, তার ফাঁকে ফাঁকে এই শখের রিপোর্টারি করি। আশায় আছি একদিন বড় কাগজে চান্স পাব।

খিক্‌খিক্ করে নাকি সুরে চাপা হাসির আওয়াজ হয়। তারপর প্রথম অশরীরীর কণ্ঠ শোনা যায়, বেঁড়ে কেঁস বঁটে নাঁড়ু। বেঁচে থাঁকতে কোঁনও বেঁটা রিঁপোর্টার আঁমার সাঁথে এঁকটা কঁথাই বঁলেনি। মঁরে যেঁতে এঁখন এঁয়েছে ইঁন্‌টারভু নিঁতে। মঁরে দঁর বেঁড়ে গেঁচে। কিঁ বঁলিস?

তাঁ যাঁ বঁলেচিস জঁগা, সায় দেয় ঈশ্বর নাড়ু, বেঁশ বেঁশ, বঁল হে কী জানতে চাঁও? বঁস বঁস।

ভরসা পেয়ে দীপক বেদিতে বসল দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তার চোখে তখন অন্ধকার অনেকটা সয়ে গেছে। সে দেখল যে, সেই অন্ধকার ঘরে তার মুখোমুখি বেদিতে পাশাপাশি বসে আছে যেন দুই মিশকালো মূর্তি। মানুষের মতনই যেন তাদের গড়ন। এর বেশি বোঝা যাচ্ছে না।

দীপক ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করে, আজ্ঞে, আপনার পরলোকে এসে আছেন কেমন? এ বিষয়ে জীবন্ত মানুষদের খুব কৌতূহল।

বেঁশ আঁচি। খাঁসা আঁচি। প্রেত নাড়ু বলে ওঠেন।—সঁংসারের দাঁয়-দাঁয়িত্ব নেই। বঁড় সাঁহেবের চোঁখ রাঁঙানি নেঁই। রোঁগ যাঁতনার বাঁলাই নেঁই। যেঁখানে খুঁশি ভেঁসে যেঁতে পাঁরি। বাঁস-টেঁরেনের ভিঁড় সঁইতে হঁয় নাঁ। আঁর কিঁ চাঁই?

যাঁ বঁলেচিস। অন্য অশরীরী সায় দেন।

দীপক দুম্ করে একটা প্রশ্ন করে, আচ্ছা আপনারা এমন নাকি সুরে খোনা গলায় কথা বলেন কেন? মরে অশরীরী হলে কি গলার দোষ হয়?

তাঁ এঁকটু হঁয় বঁটে। বললেন নাড়ু, তবে ইচ্ছে করলে আমরা মনুষ্য জীবনের স্বরে কথাও কইতে পারি। তোমার বুঝি কানে লাগছে? তাহলে তোমার মতনই কথা বলছি। তবে মুখ ফস্কে দু-চারটে খোনা স্বর বেরিয়ে যেতে পারে বাপু।

বলছেন, অশরীরী জগতে আপনারা ভালোই আছেন? পুরনো প্রশ্নটার সূত্র ধরে দীপক।

হ্যাঁ। তবে জগাটা যদ্দিন আসেনি এই লোকে তদ্দিন বেশ মনমরা ছিলেম। এই জগা মানে জগবন্ধু পাল আর আমি ছেলেবেলার বন্ধু। মনুষ্য জন্মে প্রায় প্রতিদিনই দুজনে খানিক গল্প না করলে মন খারাপ হয়ে যেত। তা আটষট্টি বছর বয়সে আমি আগে চলে এলেম পরলোকে। তখন ভারি একা লাগত। জগা এল বছর পাঁচেক বাদে। তাপ্পর আর কষ্ট নেই। তবে এখন আড্ডাটা আর দিনে হয় না। হয় রাতে।

দুজনে বুঝি এক পাড়ায় ছিলেন?

হুঁ, বোলপুরে এক পাড়ায়। একসঙ্গে পড়েছি ইস্কুলে-কলেজে।

কী করতেন মনুষ্য জন্মে?

আমি চাকরি। জগা ব্যবসা। তবে মনে রেখো, ছোটখটো ব্যবসা করত বটে কিন্তু শখের যাত্রাজগতের নটসূর্য এই জগা পালের নাম তখন বীরভূমের সবাই জানত। ওঃ, যেমন ছিল চেহারাখানা তেমনি গলার দাপট। ওর অট্টহাসিতে যাত্রা আসরে মায়ের কোলের কত শিশু যে আঁতকে কঁকিয়ে উঠেছে। তোমার বাপ-জ্যাঠাকে জিগ্যেস করো। জগা পালের অ্যাকটিং তারা ঠিক দেখেছে।

হুঁ হুঁ। ঈশ্বর জগবন্ধু একটু খুশির আওয়াজ ছেড়ে বলেন, তোমারই কি কম খ্যাতি ছিল নাড়ু? জান হে, নাড়ু দত্তর মতন দাপুটে ফুটবল রেফারি এ তল্লাটে আর দেখিনি। গোটা জেলায় কত ফাইনাল ম্যাচ খেলাতে যে ওর ডাক পড়ত। মারকুটে প্লেয়াররা সব ওকে বাঁশি হাতে মাঠে নামতে দেখলেই চুপসে যেত। বেয়াদপি করার সাহস পেত না। বেচাল দেখলেই লাল কার্ড।

দীপক জানায়, হাঁ, রেফারি নাড়ুগোপাল দত্তর খ্যাতি আমি শুনেছি। তা সে সব দিনের কথা বুঝি আপনাদের খুব মনে পড়ে?

ঈশ্বর জগা পাল ম্লান কণ্ঠে বললেন, তা পড়ে বটে। এখানেও একটা যাত্রাপার্টি করার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না।

আপনারা এই ঘরে আড্ডা দিচ্ছেন কতদিন? দীপক অন্য প্রসঙ্গে যায়।

এই মাস ছয়েক হবে।

কিন্তু এই ঘরটার ভূতুড়ে বদনাম তো বছরখানেকের বেশি।

তার আগে আমরা নই, কতগুলো বাজে লোক জুটত এই ঘরে রাতে। কতগুলো গুণ্ডা বদমাশ। তারাই আমাদের মতন গলা করে ভয় দেখাত, যাতে অন্য মানুষ ঘরটার কাছে না ঘেঁষে রাতে। আমরা তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। লোকগুলো এখনো রাতে ঢোকে মিলে মাঝে মাঝে। তবে দূরে বসে গুলতানি করে। এ ঘরের কাছে আসে না।

আপনারা আগে কোথায় আড্ডা দিতেন?

বোলপুরেই। একটা মস্ত পুরনো বাড়ির চিলেকোঠায়। বাড়ির একতলা-দোতলায় লোক বাস করত। তবে চোলেকোঠায় থাকত না কেউ। কিন্তু সেই বাড়ি ভাঙতে শুরু করল। নাকি নতুন হালফ্যাশানি ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবে সেখানে। মানুষ এখন আর পুরনো বাড়িঘর কিছু টিকতে দেবে না। ভারি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে খোঁজ করতে করতে এই গুদোম ঘরটার সন্ধান পেলাম।

একটা মতলব জাগে দীপকের মনে। সে জিগ্যেস করে, আচ্ছা, যে বদলোকগুলো আগে আসত এই ঘরে, চেনেন তাদের?

সব কটাকে চিনি না, দুটোকে চিনি। তেলকলের মালিক কেষ্ট দাসের বেটা বাপি, আর ভুবনডাঙার আদিনাথের ছোট ছেলে গজু। আদিনাথ এত ভালো লোক ছিলেন। ওঁর ছেলেটা একদম বখে গেছে। ইস্!

এই সময় হঠাৎ জানলার শিকের ফাঁক দিয়ে গলে একটা গাঢ় কালো ছায়া সুড়ুৎ করে ঘরে এসে ঢুকল।

ঈশ্বর নাড়ু ও জগবন্ধু অমনি উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলেন, আরে মোক্তোরদা! এত দেরি যে?

ছায়াটি যেন মানুষের মূর্তি ধারণ করে জগা-নাড়ুর পাশে বসে গম্ভীর স্বরে বলল, কোঁর্টটা এঁকবার ঘুঁরে এঁলাম ভাঁই। দৈনিক এঁকবার কোঁর্টে নাঁ গেঁলে মঁন কেঁমন কঁরে। আঁজ কোঁর্ট ফাঁকা হঁতে বঁড্ড দেঁরি হঁল। ভিঁড়ের সঁময় কোঁর্টে যেঁতে এঁখন আঁর মঁন চাঁয় নাঁ। এঁ কেঁ? ছায়ামূর্তি দীপককে দেখিয়ে বলে।

জগবন্ধু বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ঈশ্বর পরিমল দাস। মোক্তোরি করতেন। বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আমরাও ওঁর পরামর্শ খুব মানি। আর এ হচ্ছে সাপ্তাহিক বঙ্গবার্তা পত্রিকার রিপোর্টার। আমাদের একটা ইন্টারভু নিতে এসেছে। এর অসুবিধে হচ্ছে বলে আমরা মনুষ্য জন্মের স্বরেই কথা বলছি।

ও। গুরুগম্ভীর স্বরে একটা মাত্র ধ্বনি বেরোয় মোক্তোরদার কণ্ঠ থেকে। ব্যাস এরপর তিনি চুপ।

দীপক ফের পুরনো কথায় আসে, ওই বাজে লোকগুলো মিল এলাকায় কেন জোটে জানেন?

কেন আবার, নাড়ু উত্তপ্ত হন, এমন নিরালা নিশ্চিন্ত জায়গা পাবে কোথা? এখানে বসে বদ মতলব আঁটে। ডাকাতি ছিনতাই চুরির মতলব ভাঁজে। দুষ্কর্ম করে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে এখানে এসে লুকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ভূতের ভয়ে থানার সেপাইগুলো তো মিলের এই দিকে মোটে মাড়ায় না রাতে। আমরা দেখি সব। বুঝি সব। যাক্‌গে মানুষের ব্যাপার নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমাদের বিরক্ত না করলেই হল।

দীপক মনে ভাবে, আপনারা না মাথা ঘামান, আমি ঘামাই। থানায় এই সমাজবিরোধীগুলোর গোপন আড্ডার খবরটা দিতে হবে। তার কানে জগবন্ধুর পরের বাক্য দুটি যেতে চমকে যায়, এ ঘরটা আমাদের ছাড়তে হবে হে। এখানে আর পোষাচ্ছে না।

কেন? জানতে চায় দীপক।

এই ঘরের ঠিক পেছনে একটা বাড়িতে জেনারেটর বসিয়েছে। ওখানে একটা নার্সিংহোমে লোডশেডিং হলে বিদ্যুৎ দেবে বলে। রাতে প্রায়ই তো এখানে কারেন্ট থাকে না অনেকক্ষণ। তখন ওই জেনারেটরটা চালয়। ওঃ, কী বিকট শব্দ হয়। বেশি শব্দ আমরা সইতে পারি না। তাই নতুন কোনও আড্ডার জায়গর খোঁজ চলছে।

মোক্তোরদার গম্ভীর গলা শোনা যায় সহসা, ওহে ছোকরা, আমাদের এই ইন্টারভিউটা ছাপবে কবে?

যত তাড়াতাড়ি পারি। ধরুন মাসখানেকের মধ্যে।

হুম্‌। জগবন্ধু, নাড়ুগোপাল ভেবে দ্যাখো, একে আজ জ্যান্তো ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে? এখানে আমাদের আড্ডার কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কেন? জগবন্ধুর অবাক প্রশ্ন।

মোক্তোরদা বললেন, কাগজে এই খবর বেরুলেই গাদা গাদা লোক এসে জুটবে এখানে রাতে। একা নয়। দল বেঁধে আসবে মজা দেখতে। আলো ফেলবে ঘরটায়। হট্টগোল করবে।

তা বটে। জগা-নাড়ু ভারি চিন্তায় পড়েন।

দীপকের তো আতঙ্কে হাত-পা ঠান্ডা। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আপনাদের অনুমতি না পেলে আমি স্টোরিটা ছাপতে দেব না।

কিন্তু এখন চলে যাবার পর যদি ছোকরা কথা না রাখে? ছেপে দেয় এই ইন্টারভিউ? মোক্তোরদা ফ্যাকড়া তোলেন।

না না, তেমন কাজ আমি কক্ষনো করব না, বোঝায় দীপক প্রাণের দায়ে, আপনারা এ ঘর ছেড়ে গেলে তবেই ছাপব। কথা দিচ্ছি।

কথার খেলাপ হলে তোমায় কিন্তু ঠিক খুঁজে বের করে ঘাড় মটকাব। মনে রেখো। শাসালেন জগবন্ধু।

ভরসা দিতে আরও কিছু বলতে যাচ্ছে দীপক, এমন সময় এক ছায়ামূর্তি সুড়ুৎ করে জানলার শিক গলে ঘরে ঢুকল।

অমনি নাড়ুগোপাল ও জগবন্ধু বলে উঠলেন, আর হারান যে! ভাবছিলাম আজ আর তুই এলি না।

ছায়ামূর্তি হারান উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, পেঁয়েছি পেঁয়েছি।

কী পেয়েছিস? নাড়ুগোপাল, জগবন্ধু মায় স্বল্পবাক মোক্তোরদা অবধি উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন করেন।

খাঁসা এঁকটা আঁড্ডার জাঁয়গা। রাঁয়পুর গ্রাঁমে জঁমিদারদের বিঁশাল পোঁড়ো বাঁড়ি। বাঁড়ির আঁধখানা ভেঁঙে পঁড়েছে। কেঁউ বঁহুদিন ওঁঠেই নাঁ দোঁতলায়, পাঁছে হঠাৎ খঁসে পঁড়ে ভঁয়ে। এঁকতলায় এঁকঘর থাঁকত। তাঁরাও আঁজ চঁলে গেঁল ওই বাঁড়ি ছেঁড়ে। গাঁয়ে নঁতুন বাঁড়ি বাঁনিয়েছে, সেঁখানে থাঁকবে। দোঁতলায় এঁকটা ঘঁর পঁছন্দ কঁরে এঁয়েচি। ঘঁরটায় পুঁরু ধুঁলো জঁমা চেঁয়ার-টেবিল গাঁদা। পাঁলঙ্কও আঁছে। ছাঁদে কোঁণে কোঁণে মাঁকড়শার জাঁল। ফাঁসক্লাস। বাঁড়ির বিঁরাট এঁলাকা এঁকদম সুঁনসান। চাঁই কিঁ জঁগাদা যাঁত্রার পাঁর্টও শোঁনাতে পাঁরবে গঁলা ছেঁড়ে।

বাঃ অতি উত্তম। কাল থেকেই ওখানে বসা যাক। অভিমত মোক্তারদার।

বেশ তাই হবে। জগা-নাড়ু সায় দেন।

আমার এই স্টোরিটা তাহলে কি মাসখানেকের মধ্যে ছাপতে পারব? ভয়ে ভয়ে জানতে চায় দীপক।

বেশ তাই ছেপো। অনুমতি দিলেন মোক্তারদা।

এঁ আঁবার কেঁ? এতক্ষণে হারানের নজর পড়ে দীপককে।

এ হচ্ছে—নাড়ুগোপাল উত্তর দিতে শুরু করেই সহসা চুপ মেরে যান। অন্যরাও চুপ নিথর।

কী ব্যাপার ঘটল, বোঝে না দীপক। তবে অন্যদের দেখাদেখি সেও নীরব হয়ে থাকে।

মিনিট খানেক বাদে দীপকের কানে আসে মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ। কারা চাপা কণ্ঠে কথা বলতে বলতে আসছে এই দিকে। অশরীরীরা কিন্তু আগেই শুনেছে। কী তীক্ষ্ণ কান এদের।

দীপক জানলার কাছে সরে গিয়ে বাইরে নজর করে। মিলের টিউবলাইটের যে সামান্য আলোটুকু পৌঁছচ্ছে তাতে দেখে যে খোলা জায়গায় তিনটি লোক। ঘর থেকে হাত কুড়ি পঁচিশ তফাতে। একজন মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছে। লোক তিনটের গড়ন মোটামুটি বোঝা গেলেও মুখ দেখা যাচ্ছে না। লোকগুলো অর একটু কাছে আসে ধীরে ধীরে। চারদিক নিঝুম তাই ওদের কথাবার্তা কিছু কিছু শুনতে পায় দীপক।

ওই দ্যাখ্ গুদোমের দরজাটা অনেকখানি ফাঁক। কাল ভেজানো ছিল।

নাড়ুগোপাল ফিসফিসিয়ে বললেন, গজুর গলা।

তুই ঠিক দেখেছিস লোকটা ওই ঘরে ঢুকল? কর্কশ গলায় প্রশ্ন হয়।

হ্যাঁ। বলেছি তো আগে। পাঁচিল টপকে ঢুকেই দেখি একটা লোক এপাশ-ওপাশ তাকাতে তাকাতে গিয়ে ওই ঘরে ঢুকল। প্যান্ট-শার্ট পরা, লম্বা মতন।

মুখ দেখতে পাসনি?

না।

তারপর কতক্ষণ নজর রাখলি?

বলললাম তো প্রায় আধঘন্টা।

নজর সরসনি একবারও?

না। শুধু একবার কয়েক মিনিট পাঁচিলের গায়ে গিয়ে বাইরে দেখেছি তোরা কেউ আসছিস কিনা।

লোকটা আর বেরোয়নি?

দেখিনি বেরোতে।

বুঝলি কেষ্টা, ওকে ভূতে শেষ করেছে। এবার অন্য গলা।

বাপি। ফিসফিসিয়ে জানান নাড়ুগোপাল।

চিৎকার শুনেছিস কোনও? কর্কশ গলায় কেষ্টার প্রশ্ন।

কৈ না।

নাঃ, তবে ভূতের হাতে পড়েনি। হয়তো ভূত আর আসে না ঘরটায়।

ভালোই হল, বাপি খুশি, ফের আমরা ঘরটা দখল করব।

কিন্তু লোকটা কে? পুলিশের টিকটিকি নাকি? আমাদের ওয়াচ করতে লুকিয়েছে। নেতা টাইপ কেষ্টার মন্তব্য।

হতে পারে। জানায় গজু।

কেষ্টা বলল, ওর মুখটা দেখতেই হবে। চিনে রাখতে হবে লোকটাকে। দরকার বুঝলে আজই লোকটাকে খতম করে পুঁতে দেব ছাইগাদায়। অবিশ্যি যদি এখনো থাকে ঘরে।

মদ্‌নার গ্যাং-এর কেউ নয়তো? বাপির গলা, আমাদের ওয়াচ করতে পাঠিয়েছে। সুবিধে বুঝে অ্যাটাক করতে পারে।

হতে পারে, কেষ্টার গলা, দেখা যাক কেসটা কী? চ। হাতিয়ার রেডি রাখ। লোকগুলি ঘরের আরও কাছে অসে।

টর্চের আলো পড়ে দরজায়। তারপর ঘরের ভিতর কিছু জায়গায় পড়ে আলোর ছটা। কিন্তু পুরো ঘর আলোকিত হয় না। দীপক সিঁটিয়ে যায় দেয়াল তাকের পাশে। অশরীরীরা কিন্তু স্থির নির্বাক।

ঘরে ঢোক্। আদেশ দেয় কেষ্টা।

আমার ভয় করছে। বাপির গলা।

বেটা ডরপুক। দে আমায় টর্চ। কেষ্টা কর্কশ ধমক লাগায়।

ক্যাঁচ। দরজার পাল্লাটা আরও একটু খোলে। লম্বা-চওরা একটা লোক ভিতরে ঢোকে। কিন্তু সে টর্চ জ্বালার আগেই কোনও অশরীরী হাত লম্বা হয়ে এক ঝটকায় লোকটার হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নেয়। পরমুহূর্তে আর এক অশরীরীর সুদীর্ঘ বাহু খপ্ করে লোকটার ঘাড় ধরে ওকে তুলে ফ্যালে শূন্যে। মেঝে থেকে খানিক ওপরে ঝুলতে থাকে কেষ্টা। ওঁক্—একটা কাতর আর্তনাদ করেই কেষ্টা চুপ মেরে যায়।

ক্রুদ্ধ স্বরে হুংকার দেন জগবন্ধু, তোঁদের নাঁ বঁলেচি এঁই ঘঁরে ঢুঁকবি নাঁ। ফেঁর যঁদি আঁসিস ঘাঁড় মঁটকে দেঁব মঁনে রাঁখিস। যাঁঃ—

দড়াম্ করে ঝুলন্ত দেহটা ছিটকে গিয়ে আছড়ে পড়ে দরজার গায়ে।

নিথর হয়ে দরজার গোড়ায় পড়ে থাকে কেষ্টা।

টেঁসে গেল নাকি? ভাবে দীপক।

নাঃ মরেনি। খানিক বাদেই টলতে টলতে উঠে কেষ্টা প্রাণপণে দৌড় লাগায়।

ইঁ-য়া হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ—নটসূর্য জগা পালের ভৈরব কণ্ঠের অট্টহাসি কেষ্টাকে তাড়া করে পাঁচিল পার করে দেয়। ওর সঙ্গীরা আগেই উধাও হয়েছে।

জঁব্বর দিঁয়েচ জঁগাদা। হারান গদগদ।

দীপক তড়িঘড়ি বলে, আমি এবার যাই। লোকগুলো পালিয়েছে। এই সুযোগ। আমার মুখ দেখে ফেললে বিপদে পড়ব। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার নমস্কার নমস্কার নমস্কার।

ন-মঁ-স্কার। অশরীরী কণ্ঠগুলি একযোগে বিদায় জানায়। দীপকের ইচ্ছে, দারোয়ানজীর ঘরে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে খুব ভোরে ধানকল থেকে টুক্ করে বেরিয়ে পড়বে। রুমালে মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে দীপকের মাথায় একটা চিন্তা ঘোরে—এই অদ্ভুত স্টোরিটা কি ছাপবেন সম্পাদক? যদি বা ছাপেন পাঠক কি বিশ্বাস করবে?

শারদীয়া ১৪১৩

পাশের ঘরেই সে আছে

মানবেন্দ্র পাল

বেশ অনেক বছর আগের কথা। কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল, একজন খুনী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই কলকাতাতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশ তদন্ত করে এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিল খুনীটা উত্তর কলকাতার কোথাও কোনো বাড়িতে ছদ্মবেশে ডেরা গেড়ে আছে।

লোকটার ছবিও ছাপা হয়েছিল। কাগজে বলা হয়েছিল কেউ যদি লোকটির সন্ধান দিতে পারে তাহলে তাকে গভর্নমেন্ট থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

সে সময়ে এখনকার মতো এত খুন-খারাপি হতো না। তাই এইরকম একজন ভয়ঙ্কর খুনীকে পুলিশ ধরতে পারছে না, আর সে বহাল তবিয়তে এই কলকাতাতেই রয়েছে জেনে রীতিমতো ভয় গিয়েছিলাম। আর ভয় পেয়েছিলাম বলেই ব্যাপারটা আমার এখনও মনে আছে।

এরপর সেই খুনীটা ধরা পড়েছে কিনা সে খবর আর পাইনি। অন্তত কাগজে কিছু চোখে পড়েনি।

জানতে পেরেছিলাম অনেক বছর পরে। সেও খবরের কাগজ পড়েই।

ঘটনাটা এইরকম—

মানিকতলার ব্রিজের ওপারে একটা টু-রুমড ফ্ল্যাট কিনেছিলেন বিভাবতী সরকার। টাকাটা দিয়েছিল তাঁর বড়ো ছেলে। দিল্লিতে চাকরি করে। মাকে বলেছিল, তুমি তো কলকাতা ছেড়ে নড়বে না, টাকা দিচ্ছি একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনে নাও। রিটায়ার করে তো কলকাতাতেই তোমার কাছে গিয়ে আমাদের থাকতে হবে।

সেইমতো বিভাবতী ফ্ল্যাটটি কিনলেন। ফ্ল্যাটটি একটা পুরনো ভাঙা বাড়ি আর খানিকটা জলা জায়গার ওপর তৈরি। এক সময়ে এইসব অঞ্চলে বাড়ি-ঘর কমই ছিল। যে বাড়ি ভেঙে এই ফ্ল্যাট—সেটা ছিল কোনো এক বাঘা জমিদারের। জমিদারি কবে চলে গিয়েছিল, জমিদারের বংশধরেরাও কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু সাবেকি জমিদারি মেজাজটি ছিল পূর্বপুরুষদের মতোই। সে আমলের পুরনো বাড়ি জমিদারপুত্রদের পছন্দ হচ্ছিল না। তাই সেটাকে ফেলে রেখে দিয়েছিল। মাঝে-মধ্যে দু' এক ঘর ভাড়াটে আসত। আবার চলে যেত। সামান্য টাকার ভাড়া। তাই জমিদারপুত্রদের মন উঠত না। তারা ঠিক করল বাড়িটা বেচে দেবে। সে জন্য নতুন ভাড়াটেও আর বসাল না। কেননা ভাড়াটেসুদ্ধু বাড়ি কিনতে কেউ চাইবে না।

তারপর কত হাত-বদল হয়ে এখন সেই বাড়িটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা হাল ফ্যাশানের নতুন ফ্ল্যাট বাড়ি। কিন্তু পিছনের অংশে এখনও এখানে-সেখানে ডোবা, জলা, ঢোল-কলমি আর বনতুলসীর ঝোপ রয়ে গেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় না জায়গাটা শহর কলকাতার মধ্যে।

এইখানেই দুটো ঘর নিয়ে থাকেন বিভাবতী। একাই থাকেন পুজো-আচ্চা নিয়ে। খুব ভক্তিমতী। নিজেই রাঁধেন।

একটি কাজের মেয়ে আছে। সে সারা দিন তাঁকে সাহায্য করে। তার সঙ্গেই গল্প করে তাঁর সময় কাটে।

সবই ভাল তবু কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। বিভাবতী এমন কিছু প্রমাণ পেয়েছিলেন যাতে তিনি বুঝেছিলেন বাড়িটায় কিছু দোষ আছে। বিশেষ করে উত্তর দিকের ঘরটায়।

তাঁর অসাধারণ মনের জোর আর সাহস ছিল তাই তিনি রাতে একাই থাকতে পারতেন। না থেকেই বা উপায় কি? ছেলের এতগুলো টাকা খরচ করে ফ্ল্যাটটা কিনেছেন। এখন ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়? ছেলেকেই বা কী বলবেন? বাধ্য হয়ে তিনি মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন। কাউকে কিছু বলতেন না। এখানে তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন আছে। তারা মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত। কিন্তু কাউকে তিনি রাতে থাকতে বলতেন না। আত্মীয়রা তাঁকে খুব পছন্দ করত। এই বয়সে তিনি এখানে একা থাকেন এই নিয়ে তারা ভাবতও। কিন্তু বিভাবতী হেসে বলতেন তিনি ভালোই আছেন। তা ছাড়া ঠাকুর যা করবেন তাই হবে। অনর্থক ভেবে লাভ কি।

এতখানি ভগবানের ওপর বিশ্বাস দেখে আত্মীয়েরা আর কিছু বলত না। শুধু জানিয়ে যেত অসুখ-বিসুখ করলে তিনি যেন সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন।

তা তিনি বুদ্ধিমতীর মতো একটি কাজ করেছিলেন। টেলিফোন নিয়েছিলেন। আর সেটা রেখেছিলেন মাথার কাছে একটা টুলের ওপরে।

মনে মনে অবশ্য জানতেন অসুখ-বিসুখ ছাড়া আর যে ভয়টা নিঃশব্দে তিনি হজম করে যান, তার প্রতিকার টেলিফোন করে লোক ডেকে হবে না।

টেলিফোন নেবার কিছুদিন পরেই একটা ঘটনা ঘটল। মাঝে-মধ্যে তিনিই দু-একজনকে ফোন করেন। কিন্তু তাঁকে বড়ো একটা কেউ ফোন করে না।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাতে টেলিফোন বাজার শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। এত রাতে কে টেলিফোন করছে? নিশ্চয় রং নাম্বার। তিনি মশারির মধ্যে থেকে হাত বাড়াতে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন মশারির বাইরে থেকে একটা কালো লোমশ হাত রিসিভারটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, শুধুই একটা হাত।

তিনি চমকে উঠলেন। ভয় পেলেন। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন, কে তুমি? কি চাও?

উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু অস্পষ্ট একটা পায়ের আওয়াজ ঘরের বাইরে চলে গেল।

তিনি আর উঠলেন না। ভাগবানকে স্মরণ করে আবার শুয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে ভাবলেন, তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন?

তখনই চোখে পড়ল রিসিভারটা টুলের নিচে ঝুলছে।

বিনবিন করে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তারপরই তিনি নিজেকে শক্ত করে নিলেন। সংসারের সব কাজই রোজকার মতো করলেন। কাউকে রাতের ঘটনা বললেন না। বললেই রটে যাবে ফ্ল্যাটটা ভূতুড়ে। আর সে কথা ছেলের কানে গেলে তারা আর আসবে না।

একটা কথা ভেবে তাঁর ভয় হলো—এখানে এসে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারছিলেন উত্তরের ঐ ঘরটায় কিছু আছে। তবে এ ঘরে কোনোদিন আসেনি। নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু গতরাতের ঘটনায় তিনি বুঝতে পারলেন এ ঘরেও আসতে শুরু করেছে। তাহলে তিনি এখানে থাকবেন কি করে?

তারপরই তাঁর মনে হলো লোকটা কিন্তু তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। 'কে তুমি? কি চাই?' শান্ত ধীর গলয় প্রশ্ন করতেই সে রিসিভারটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিল। কেনই বা এসেছিল, কেনই বা চলে গিয়েছিল তার উত্তর খুঁজে পেলেন না। আরও একটা উত্তর তিনি পেলেন না—অত রাতে কে তাঁকে ফোন করেছিল? সত্যিই কি রং নাম্বার?

যাই হোক এদিনের পর থেকে আর সে ঘরে ঢোকেনি। কিন্তু গোল বাধাল একদিন কাজের মেয়েটা।

তিনি ঠিক করেছিলেন কাজের মেয়েটাকে রাতে তাঁর কাছে থাকতে বলবেন। তার জন্যে বেশি মাইনেও দেবেন। মেয়েটা রাজীও হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ আলোগুলো নিভে গেল। বিভাবতী বুঝলেন লোডশেডিং। এ তো রোজকার ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎই কাজের মেয়েটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল তাঁর কাছে। মুখ দিয়ে তার কথা বেরোচ্ছে না।

কি রে মালতী? কি হয়ছে?

মালতী অতি কষ্টে শুধু বললে, একটা লোক—

লোক! কোথায়?

মালতী আঙুল দিয়ে ওদিকের ঘরটা দেখিয়ে দিল। তারপর কোনোরকমে বলল, আজকে ঐ ঘরটায় ঝাঁট দিতে ঢুকেছিল। সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং। আর তখনি ও স্পষ্ট দেখল একটা লম্বা মতো লোক ঘরের মধ্যে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে....

বিভাবতীর বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল।

লোক বলতে মালতী যে কি বোঝাতে চাইছে তা বুঝতে তাঁর আর বাকি রইল না। কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বললেন, ও ঘরে লোক আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয় চোখের ভুল।

মালতী যতই বোঝাতে চায় চোখের ভুল নয়, বিভাবতী ততই বলেন, না চোখের ভুল। ও ঘরে লোক আসবে কোথা থেকে?

মালতী চুপ করে আছে দেখে তিনি আরও জোর দিয়ে বললেন, আমি এত দিন আছি। কই কোনো দিন তো কিছু দেখিনি।

মিথ্যে কথাই বলতে হয়েছিল বিভাবতীকে। কিছু না দেখলেও ঐ বন্ধ ঘরে মানুষের চলাফেরার শব্দ তিনি শুনেছিলেন এক-আধবার নয়, বার বার।

বাধ্য হয়েই এই মিথ্যেটুকু বলতে হয়েছিল। না বললে মালতী আর এ বাড়িতে কাজ করত না।

শেষ পর্যন্ত মালতী থাকল। তবে সন্ধ্যে হবার আগেই চলে যেত। তখন থেকে বিভাবতী সারা রাত একা মুখ বুজে। আর পাশের তালাবন্ধ ঘরটায় মূর্তিমান আতঙ্ক।

সেদিনও তাঁর নিস্তব্ধ ঘরটাকে সচকিত করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। তবে গভীর রাতে নয়, সন্ধ্যের একটু পরে।

চমকে উঠলেন বিভাবতী। কোনোরকমে তুলে নিলেন রিসিভারটা।

হ্যালো! দিল্লি থেকে? ও বৌমা!

খুশিতে তার স্বর আটকে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ, তা আছি একরকম—ভালোই আছি। আচ্ছা, তুমি কি আগে একদিন অনেক রাতে ফোন করেছিলে?

করনি?....তাহলে রং নাম্বার। হ্যাঁ, অনেক রাতে কেউ করেছিল.....কথা বলা হয়নি। কেটে গিয়েছিল।

তুমি আসবে পরশু দিন? খুব খুশি হলাম .....মাত্র এক রাতের জন্যে? তোমার বন্ধুর বিয়েতে?....থাকতে পারবে না দু'দিন?.....কি আর করা যাবে?....তাই এসো।

বিভাবতী দেবী রিসিভারটা রেখে দিলেন। তারপর মুখ তুলতেই তিনি চমকে উঠলেন। ঘরের বাইরে জানলার গরাদ ধরে লম্বা মতো কেউ যেন দাঁড়িয়ে।

কে? কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটা সরে গেল—যেন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। বিভাবতীর রক্ত হিম হয়ে গেল। ও কি শুনতে এসেছিল এ বাড়িতে নতুন কেউ আসছে কি না?

বিভাবতীর ছেলের বৌ অঞ্জনা দিল্লির একটা বিখ্যাত ইংরিজি কাগজের অফিসে কাজ করে। কলকাতায় তার এক বন্ধুর বিয়েতে আসছে। রাতটুকু শুধু শাশুড়ির কাছে থাকবে। পরের দিন সকালের ফ্লাইটেই দিল্লি ফিরে যাবে।

মাত্র একটি রাত বৌমা তাঁর কাছে থাকবে। বিভাবতী মনকে বোঝান—যেটুকু নিজের লোককে কাছে পাওয়া যায় ততটুকুই আনন্দ। তবু তাকে মনের মতো রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে পারবেন না এটাই দুঃখ। সে নেমতন্নবাড়ি আসছে কিনা।

সেই সঙ্গে তাঁর একটু ভয়ও করল। ঐ যাকে এ বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায়— বৌমাও তাকে দেখে ফেলবে না তো?

সেদিন দুপুরবেলাতেই অঞ্জনা হাসতে হাসতে এল। সারা দুপুর বিভাবতীর পাশে শুয়ে কত গল্পই না করল। বিকেলের দিকে বেরিয়ে গেল কিছু কেনাকাটা করতে। বলে গেল সন্ধ্যের আগেই ফিরবে।

ঠিক সন্ধ্যেবেলাতেই ফিরল অঞ্জনা। ফুটপাথ থেকে উঠে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপরেই ঢোকার দরজা। কলিংবেল টিপতে যাচ্ছিল, দরকার হলো না। মালতী দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। বৌদিকে দেখে একটু হাসল।

কাজ হয়ে গেল?

হ্যাঁ।

বাড়ি যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

অঞ্জনা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। এবার একটু প্যাসেজ। প্যাসেজটা অন্ধকার। অঞ্জনা এগিয়ে যাচ্ছিল; হঠাৎ মনে হল সে যেন এগোতে পারছে না ...কিসে যেন বাধা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন তাকে ঠেলে বের করে দিতে চাইছে। অঞ্জনা থতমত খেয়ে গেল। তখনই তার মনে হলো তার সামনে দু' হাত দূরে কেউ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে...চোর?

অঞ্জনা দিল্লিতে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করা মেয়ে, সংবাদ সংগ্রহের জন্যে তাকে নানা জায়গায় ছুটতে হয়। অত সহজে সে ভয় পায় না। ধমকের সুরে বলল, কে ওখানে?

পরক্ষণেই মনে হলো কেউ যেন পথ ছেড়ে সরে গেল।

পাছে মা ভয় পান তাই ব্যাপারটা নিয়ে অঞ্জনা বেশি হৈচৈ করল না। মায়ের ঘরে ঢুকে শুধু একটা কথাই বলল, প্যাসেজটায় আলোর ব্যবস্থা নেই?

বিভবতী অবাক হয়ে বললেন, আছে বৈকি। এই তো মালতী গেল আলো জ্বেলে।

কিন্তু—কিন্তু আমি তো দেখলাম অন্ধকার।

বিভাবতী বললেন, তাহলে হয়তো বাল্বটা কেটে গেছে।

আধঘণ্টার মধ্যে অঞ্জনা সাজসজ্জা করে বিয়েবাড়ি চলে গেল। রাত দশটায় যখন ফিরল তখন দেখল প্যাসেজে দিব্যি আলো জ্বলছে।

এবার তাড়াতাড়ি শোবার পালা। কাল সকালেই আবার প্লেন ধরতে হবে।

বিভাবতী তাঁর বিছানাতেই অঞ্জনার শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাত্র একটা রাত নিজের বৌমাকে কাছে নিয়ে শোবেন। অঞ্জনা কিন্তু শাশুড়ির সঙ্গে শুতে রাজী হলো না। বললে, ওদিকের ঘরটা তো খালি পড়ে রয়েছে। ওখানেই আমি শোব।

বিভাবতীর মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। তিনি অনেক করে বোঝালেন। বললেন, ওই ঘরটা ব্যবহার করা হয় না। পরিষ্কার করা নেই। কি দরকার? একটা রাত তো একটু কষ্ট করে না হয় আমার কাছে শুলেই।

অঞ্জনা ভাবল শাশুড়ি বোধ হয় ও ঘরে বিছানা পাতা, মশারি টাঙানোর হাঙ্গামার জন্যেই বলছেন। তাই বললে, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

বলে উত্তর দিকের ঘরে গিয়ে ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা পেতে নিলো।

নিরুপায় বিভাবতী কি আর করেন, শুধু বললেন, ভয়টয় পেলে আমায় ডেকো।

অঞ্জনা হেসে বলল, কিসের ভয়? ভূতের?

'ভূত' কথাটা হঠাৎই তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

কি আর করেন, বিভাবতী এক ফাঁকে তাঁর গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা অঞ্জনার বালিশের নিচে রেখে দিয়ে এলেন। মনে মনে প্রার্থনা করলেন, ঠাকুর, বৌমাকে রক্ষে করো।

খুব ক্লান্ত ছিল অঞ্জনা। তাই হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে শোয়ামাত্র ঘুম। তখনও সে জানত না কি ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে.....।

অনেক রাত্রে আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেল। অসহ্য গরমে তার নিঃশ্বাস যেন আটকে যাচ্ছে। মশারির মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখল পাখা চলছে না। লোডশেডিং? কলকাতায় এত লোডশেডিং হয়! কিন্তু তখনই বাইরের জানলা দিয়ে চোখ পড়তে দেখল রাস্তার আলোগুলো দিব্যি জ্বলছে।

তাহলে?

হঠাৎই তার মনে হলো ঘরের মধ্যে আরও কেউ রয়েছে। চমকে তাকাতেই দেখল তার বিছানা থেকে মাত্র হাত পাঁচেক দূরে লম্বা মতো একটা লোক কোমরে হাত দিয়ে তার দিকে ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইরকমই একটা আবছা চেহারা সে সন্ধ্যেবেলা দেখেছিল বাড়ি ঢোকার সময়ে। তখন মুখ দেখতে পায়নি।

ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল অঞ্জনা। কিন্তু পারল না। মনে হলো তার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে।

কি করবে ভাবছে, দেখল লোকটা এক পা এক পা করে তার দিকে এগিয়ে আসছে।......

চিৎকার করতে গেল, পারল না। মুখ থেকে শুধু একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে এল। ততক্ষণে মূর্তিটা একেবারে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা হাত দিয়ে মশারিটা তুলছে.......তারপরই কনকনে ঠাণ্ডা একটা হাত তার বাঁ হাতটা চেপে ধরে টানতে লাগল।

মাগো!

একটা শব্দই অঞ্জনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়, শাশুড়ির ডাকাডাকিতে। প্রথমে মনে হয়েছিল রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু নিজের হাতের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। হাত মুচড়ে ধরার দাগটা লাল হয়ে আছে। আর—আর মাথার দিকে মশারিটাও খানিকটা তখনও উঁচু হয়ে আছে।

অঞ্জনা বললে, আপনি এখানে একা আর থাকবেন না। আমার সঙ্গে চলুন।

বিভাবতী বললেন, হুট করে কি এখানকার পাট চুকিয়ে চলে যাওয়া যায়—?

তবে আমি এখন যাই। খুব তাড়াতাড়ি আপনার ছেলেকে নিয়ে আসছি। তারপর একসঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করা যাবে। এ ক'দিন একটু সাবধানে থাকবেন।

বিভাবতী একটু হাসলেন।

ব্যাপারটা অঞ্জনা সহজে ছেড়ে দেয় নি। এই বাড়িতে এক রাত্তির থাকার ভয়ংকর অভিজ্ঞতা কাগজে লিখল। কলকাতায় এসে পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে যে তথ্যটা বের করেছিল তা হচ্ছে—সেই দীর্ঘদেহী খুনীটা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল দলবল নিয়ে। সাহস করে কেউ পুলিশকে খবর দিতে পারেনি। কিন্তু জমিদারপুত্রদের একজন বাড়িটা খালি করার জন্য একদিন লেঠেল পাঠিয়ে তাকে খুন করে ঐখানেই পুঁতে রাখে। পুলিশ পরে এসে মাটি খুঁড়ে লাশের সন্ধান করে। আশ্চর্য! কিন্তু লাশ পাওয়া যায়নি।

আষাঢ় ১৪০৭

ভয়ঙ্কর সেই রাতে

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা ছিল। ঝিরঝিরে বাতাসের সঙ্গে টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছিল। কৃষ্ণনগর থেকে বেথুয়াডহরী যাবো বলে আগেই ঠিক ছিল। বিকেলের বাসে ঐ দিনই রওনা হলাম বেথুয়াডহরীতে। জানলার ধারেই জায়গা পেয়েছিলাম বলে, মেঘলা দিনের উড়ন্ত মেঘ দেখতে দেখতে বেশ আরামের সঙ্গেই চলেছি। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি তখনও পড়ছে। বিষণ্ণ বিকেল বিদায় নিয়ে সন্ধ্যে নেমে এল। আবছা অন্ধকারের মধ্যে যাত্রীবোঝাই বাস উড়ন্ত গতিতে চলেছে সোজা রাস্তা ধরে। আচমকা কোথা থেকে আছড়ে পড়লো ঝড় আর সেই সঙ্গে সিংহের গর্জনের মতো গুরুগম্ভীর মেঘের আওয়াজ, বিদ্যুতের ঝলকানি এবং মুষলধারে বৃষ্টি। হুড়মুড় করে সবাই জানলাগুলো বন্ধ করে দিল। আমিও আমার জানলা বন্ধ করে দিয়ে, ঝড়বৃষ্টি আর মেঘের ডাক শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম, বাস থেকে নামবার সময়ও যদি এইভাবে ঝড়বৃষ্টি হয় তাহলে অজানা, অচেনা জায়গায় গিয়ে মুশকিলে পড়ে যাবো।

বাসের চলার গতি ঝড়ের দাপটে কমাতে বাধ্য হয়েছে ড্রাইভার। বাসে বসে বুঝতে পারছি, যে কোনো সময়ই বাস আটকে যেতে পারে রাস্তায়, কারণ এই ঝড়ে দু-চারটে গাছ উপড়ে গিয়ে রাস্তা আটকেও দিতে পারে। কিন্তু চওড়া রাস্তা বলেই, দু-একটা গছ রাস্তায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও পাশ কাটিয়ে বাস বেশ মন্থর গতিতে চলতে লাগলো। যাত্রীদের মধ্যে কেউ ঘুমোচ্ছে, গান গাইছে আর আমার পাশের সিটে মায়ের বুক জড়িয়ে একটা হ্যাংলা মতো ছেলে সমানে কেঁদে চলেছে।

বেথুয়াডহরীর মোড়ে কে নামবেন, বলে কন্ডাকটার হাঁক দিল।

আমি ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে গেটের কাছে দাঁড়ালাম এবং একটু পরেই একমাত্র আমি একাই বাস থেকে নামলাম। বাস চলে যাবার পর অন্ধকারের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, জনমানবহীন জায়গায় একটা সজনে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একমাত্র জীবন্ত প্রাণী আমি। জায়গাটাতে যেন শ্মশানের নীরবতা। সজনে গাছের ফাঁক দিয়ে অঝোরে বৃষ্টির জল আমাকে সম্পূর্ণভাবে ভিজিয়ে দিল আর ভিজে জামা-কাপড় পরে কাঁপতে শুরু করলাম। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে রিকশা স্ট্যান্ড পেরিয়ে আমাকে মাস্টারমশাই শচীন দত্তর বাড়িতে পৌঁছতে হবে। চিঠি দিয়ে আমার আসবার কথা আগে জানিয়েও দিয়েছিলাম। বাসটা যেদিকে এগিয়ে গেল, সেই দিকেই আমি এগিয়ে চললাম।

বিদ্যুতের চমক ছিটকে পড়েই পর পর দুটো বাজ পড়লো কাছাকাছি। কাঁপুনিটা আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সাহস সঞ্চয় করে ব্রিফকেসটা মাথায় চাপিয়ে এক হাঁটু জলের মধ্যে কোনোরকমে এগিয়ে চললাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আমারই চলার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা পেঁচার কর্কশ শব্দে সমস্ত পরিবেশটাকে কেমন যেন থমথমে করে দিল। আমার মনে হতে লাগলো আমার সঙ্গে আরও কেউ যেন হেঁটে চলেছে আমারই পাশাপাশি। আমি এগিয়ে চললাম।

বিদ্যুতের ঝিলিক চমকে উঠলো আবার। সেই ক্ষণস্থায়ী আলোর মধ্যে আমি দেখলাম অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আমারই অপেক্ষায়। সমস্ত দেহটা ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং আমি সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম যে, আমার জীবনটা শেষ হয়ে আসছে। আমি আমার

প্রিয়জনদের কাছে আর হয়তো ফিরে যেতে পারবো না। কাঁপুনিটা সেই মুহূর্তে অসম্ভবভাবে বেড়ে গেল আর আমার বেশ মনে আছে আমি তখন ছোট ছেলের মতো মা বলে ডেকে উঠে ভয়ে কুঁকড়ে এক হাঁটু জলের মধ্যে পড়ে গেলাম। সেই স্বরটা আজ আর আমার মনে নেই কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যে শুনতে পেলাম কে যন বলে উঠলো, ভয় নেই, আমি আপনার পাশেই আছি।

তাড়াতাড়ি মনে সাহস এনে উঠে পড়ে বললাম, কে কথা বললেন, আমার কাছে আসুন, আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

কোথাও এতটুকুও কোনো শব্দ নেই, আমি সেই নির্জন প্রান্তরে একা এবং অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে শুধু আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক আওয়াজ শুনতে পেলাম। ফস্ করে ঠিক আওয়াজ হয়ে, রংমশালের মতো আলো ছড়িয়ে একটু দূরে বিদ্যুতের তার মনে হলো ছিটকে পড়লো। আবার আমি দেখলাম সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন আমারই অপেক্ষায়।

রাত কত জানি না। মাথার ওপর দিয়ে আবার একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সেই মুহূর্তে আবার শুনতে পেলাম, ভয় নেই, সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না।

দৈববাণীর মতো কথাগুলো কানে পৌঁছতেই, আমি যেন ফিরে পেলাম অসীম সাহস আর শক্তি। সেই মুহূর্তে সমস্ত ভয়, জড়তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগলাম ক্ষিপ্রগতিতে। প্রতিটি মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছিলাম যে, আমার সামনে, পেছনে বা পাশে থেকে কে যেন অনুসরণ করে চলেছে। আমি চলেছি নির্ভয়ে, কিন্তু আবার আমাকে থামতে হলো সেই দৈববাণীর আদেশে।

দাঁড়ান আর এক পা-ও এগোবেন না। সামনেই আছে একটা খাল, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকে ঘুরেই একটা সাঁকো পাবেন, সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে ওপারে চলে যান। আমিও যাচ্ছি।

দম দেওয়া পুতুলের মতো আমি বাঁদিকে ঘুরেই হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বাঁশের ওপর হাত পড়তেই বুঝলাম সাঁকো এবং কোনোরকমে সন্তর্পণে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলে গেলাম ওপারে। একটা চাপা গর্জন কোথা থেকে ভেসে এল এবং গর্জনটা একটু পরেই কান্নায় পরিণত হলো। আমি আবার ভয় পেয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে কাঁপতে শুরু করলাম।

এবারে ধমকের সুরে আদেশ হলো, এখুনি সামনের দিকে চলে যান, নইলে আমার সাধ্য নেই যে, আপনাকে বাঁচাবো। নিমেষে ছুটে চললাম সামনের দিকে এবং কিছুদূর গিয়ে কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে, ক্লান্ত দেহ নিয়ে সেইখানেই বসে পড়লাম। বৃষ্টি আর ঝড়ের দাপট আর নেই। কাঁপুনিটা আরও বেড়েছে। সমস্ত শরীরটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। বসে পড়েছি বলেই হয়তো উঠতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু যেতে তো আমাকে হবেই। সমস্ত ক্লান্তি আর যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। জানি না আরও কত পথ আমায় হাঁটতে হবে। কিভাবেই বা যাবো। বিদ্যুতের সেই ঝলকানি আলোও নেই যে, খুঁজে পাবো সেই ছায়ামূর্তি বন্ধুকে।

আমার খুব কাছ থেকেই স্পষ্ট শুনলাম, ভয় নেই আমি কাছেই আছি। এই মাঠ পার করে দিয়েই আমি ফিরবো। আমারও ফেরার সময় হয়ে এসেছে। সামনের দিকে আরও কিছুটা গেলেই শহরের রাস্তা। এই পথ দিয়ে কেউ আসে না আর এলে ফিরে যায় না। কাকুকে বলবেন, শানু সেদিন কোনো দোষ করেনি, শানু ভালো আছে।

কিভাবে শহরের রাস্তায় সেদিন পৌঁছেছিলাম আজ আর মনে নেই। মাস্টারমশাই অর্থাৎ শচীন দত্ত মহাশয়ের মুখে শুনেছিলাম, একজন দোকানদার আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আমার মুখে মাস্টারমশাইয়ের নাম শুনে পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর বাড়িতে।

মাস্টারমশাই আমার মুখে সমস্ত কিছু শুনে বলেছিলেন, সেই বাসের কন্ডাক্টার ভুল করে যে

জায়গাটায় নামিয়ে দিয়েছিল সেটা বাজার থেকে অনেক দূরে এবং ওদিকে লোকবসতি নেই। আসলে ওই জায়গার চারপাশে ভাগাড় এবং স্থানীয় শ্মশান। পরাণ মণ্ডলের খাল এখানকার সবাই চেনে এবং এই নামটা শুনে সকলেই আঁতকে ওঠে। জীবিত অবস্থায় কেউ ওই খাল পেরিয়ে আসতে পারেনি। আপনার ভাগ্য ভালো বলেই বেঁচে গেলেন।

আমি বললাম, সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি তাই হয়তো আমাকে খালে নামতে নিষেধ করে একটা বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে বলেছিল।

মাস্টারমশাই বললেন, সেই ছায়ামূর্তিকে আপনি দেখেছিলেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ। মাঠ পেরিয়ে শহরের রাস্তায় পৌঁছবার আগে সে বলেছিল, কাকুকে বলবেন, শানু সেদিন কোনো দোষ করেনি, শানু ভালো আছে।

মাস্টারমশাই চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠে বললেন, শানু এই কথা বলেছে? বলেই আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি শানুকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যাবার সময় ও বলেছিল, কাকু আমি কোনো দোষ করিনি, ওরা মিথ্যা করে লাগিয়েছে।

আমি অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন বোবা হয়ে গেলাম।

মাস্টারমশাই বললেন, শানু আমার দাদার ছেলে। ও যখন খুবই ছোট্ট তখন আমার দাদা মারা যান। সেই থেকে শানুকে আমি ছেলের মতো করে মানুষ করেছি। সঙ্গদোষে ও মাঝখানে খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। একদিন ওরই অন্তরঙ্গ দুজন বন্ধু এসে আমার কাছে বেশ কিছু অভিযোগ করে। আমি আর কোনো কিছু বিবেচনা না করে প্রকাশ্য রাস্তায় দু-চার ঘা চড়-থাপ্পড় মেড়ে বলেছিলাম, আর বাড়ি ঢুকবি না। শানু আমার কথা শুনেছিল, শানু আর বাড়ি ঢোকেনি। দু-দিন কোনো খোঁজ না পেয়ে পাগলের মতো চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে করতে ওকে যখন পেলাম, তখন ওর শরীরের অনেকটা অংশই শকুনে খেয়ে গেছে। একটা গাছের ডালের ফাঁকে ওর দেহটা এমনভাবে আটকে ছিল যে, মনে হয়েছিল কেউ যেন জোর করে ওকে আটকে রেখেছে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে উল্লেখ ছিল শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু। বিশ্বাস হয় না তবুও ঘটনা শোনা যায়। অবিশ্বাস করারও উপায় নেই কারণ আমি জ্বলন্ত প্রমাণ। কাকুর কাছে যাবো এই সংবাদ শানু হয়তো জেনেছিল তার অশরীরী আত্মা নিয়ে এবং আমার যে মৃত্যু ঘটতে পারে সেটাও সে জানতো। কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় সে মনেপ্রাণে তার কাকুকে এতই ভালোবাসতো যে কাকুর অতিথিকে সে বাঁচিয়েছে। শানুর মৃত্যুটা আজও ওখানকার লোকেরা মনে করে অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়।

শারদীয়া ১৪০০

অতনু গাঙ্গুলীর বিপদ

মনোজ সেন

অতনু গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যাদবপুরে, আমার মেজকাকার বাড়িতে। মেজকা রিটায়ার করে ফরিদাবাদের ফ্যাক্টরি-কোয়ার্টার্স ছেড়ে এসে ওখানে বাড়ি করেছিলেন। আমি একদিন কলেজ সেরে ওঁর বাড়িতে গেছি, দেখি মেজকাকী শোবার ঘরে খাটের ওপর বসে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। বান্ধবীটি মেজকাকীর সমবয়সীই হবেন, ভীষণ ফর্সা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুল সবই প্রায় সাদা, পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি আর লালরঙের ব্লাউজ। গল্প চলেছে আর সেই সঙ্গে মেজকাকী অনবরত পান সেজে যাচ্ছে আর তার বান্ধবী খচখচ করে জাঁতি দিয়ে প্রবল বেগে সুপুরি কেটে যাচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখে বেরিয়ে এলুম। মেজকা পেছনের বাগানে মালিকে একটার পর একটা ভুলভাল ইন্সট্রাকশন দিচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে চলে গেলুম।

একটু বাদেই দেখি মেজকাকী বাগানে আসছে, সঙ্গে একটা ছোকরা সাহেব। সে ছ'ফুটের ওপর লম্বা, বিশাল স্বাস্থ্যবান শরীর, চোখ দুটো নীল তবে মাথার চুল কালো। মহা বিপদ! আমি আবার সাহেব-সুবো দেখলে বেজায় ভয় পাই। একে তো ইংরিজি বলতে হয় তার ওপরে ওরা যে কী বলে সেটা ভালো ধরতেই পারি না। তার ওপর দেখি মেজকাকী ঐ সাহেবটাকে নিয়ে আমার দিকেই আসছে।

মেজকাকী বলল, 'শোন ভেনো, এই হলো অতনু। ও এসছে ওর মাকে নিয়ে যেতে। তা নিয়ে যাব বললেই তো আর হয় না। ছত্রিশ নম্বরের মহাদেববাবুর বাজার করতে গিয়ে মেছুনীদের সঙ্গে হাতাহাতির গল্পটা সবে জমে উঠেছে, বুঝলি? তার ওপরে এখনও আমার পঞ্চাশটা পান সাজা বাকি। এ সময় তো আর ওর মাকে যেতে দেওয়া যেতে পারে না—না কি বলিস?' তারপর অতনু নামক সাহেবটির দিকে ফিরে বলল, 'এ হলো ভেনো, মানে ভানু। আমার ভাসুরপো। একেবারে তোর সমবয়সী। যোগেশচন্দ্র কলেজে পড়ে, তোরই মতো পলিটিকাল সায়েন্স। তোরা একটু গল্প কর। আমি আর আধঘন্টার মধ্যেই তোর মাকে ছেড়ে দেব।'

অতনু সহাস্যে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'ঠিক আছে, মাসিমা। আপনার কোনো চিন্তা নেই। তবে মহাদেবমেসোর ব্যাপারটা চুকে গেলেই কিন্তু মাকে ছেড়ে দেবেন। যা পান সেজেছেন! তাতে গোটা দশেক কম পড়লে কিছু অসুবিধা হবে না। বাকিটা না হয় আমি কাল এসে সেজে দিয়ে যাব।'

সেই হলো আমার অতনুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত। প্রথমে আপনি দিয়ে শুরু, এখন তুই। অতনুর বাবা গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলী মেজকার প্রতিবেশী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়বার জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানে অতনুর মাকে বিয়ে করেন। ভদ্রমহিলা জার্মান-আমেরিকান, নাম উরসুলা। বিয়ের আগে কেমন ছিলেন, জানি না। এখন তো একেবারে বাঙালী হয়ে গেছেন। পুজো-আচ্চা করেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত অর পটলের দোলমা যা রাঁধেন তা একোবরে অসাধারণ।

অতনুও কিছু কম যায় না। তার পৈতে তো আছেই, বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠানগুলোর অনেকগুলো সে নিজেই করে। অনেক পুজোর মন্ত্র তার কণ্ঠস্থ। আর কখন কী করতে হবে, না করতে হবে,

সে সম্পর্কেও তার জ্ঞান কিছু কম নয়। সে ইংরিজি বলে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে অথচ তার সংস্কৃত উচ্চারণে কোনো ত্রুটি নেই। তার চেহারায়, চালচলনে বা স্বভাবে এই বৈপরীত্যের জন্য তাকে অনেক সময় অনেক অদ্ভূত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে সব অভিজ্ঞতার একটা এখানে বলছি।

সেবার কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে সরস্বতী পুজোর ছুটিতে অতনু গিয়েছিল মেমারির কাছে কাঁঠালপুকুর বলে একটা গ্রামে। কাঁঠালপুকুর একটা বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা, অনেকগুলো পাকা বাড়ি, পরিষ্কার রাস্তা, খোলামেলা গ্রাম। একপাশে একটা ছোট নদী আছে, তার নাম সঙ্কটা। খুব চওড়া তা নয়, তবে টলটলে জল, বেশ স্রোতও আছে। এই সঙ্কটার ধারে গ্রামের জমিদার চাটুজ্জেদের বসতবাড়ি। এই বাড়ির ছেলে শ্রীমন্ত অতনুর সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। সে-ই নিমন্ত্রণ করেছিল তার কয়েকজন বন্ধুকে তাদের বাড়ি পুজো দেখবার জন্য।

চাটুজ্জে বাড়ি যে খুব একটা বিশাল ইমারত তা নয়, তবে বেশ বড়ই বলা চলে। একতলা-দোতলা মিলিয়ে কুড়ি-বাইশটা ঘর, মাঝখানে ঠাকুরদালান, তার একপাশে অতিথিশালা। সামনে-পেছন বাগান, গোশালা, গ্যারেজ, রান্নাঘর ইত্যাদি। পাঁচিল ঘেরা জমিটা বিঘে তিনেক তো হবেই। জমিদারি চলে যাবার পরেও চাটুজ্জেদের যে অর্থাভাবে পড়তে হয়নি, সেটা বেশ বোঝা যায়।

পুজোর আগের দিন বিকেলবেলায় অতনুরা যখন ওখানে পৌঁছল, তখন বাড়িতে অনেক লোক। বাচ্চাকাচ্চাদের হুল্লোড়, মেয়েদের উচ্চকিত হাসি, বড়োদের ব্যস্তসমস্ত গতিবিধি বাড়িটাকে সরগরম করে রেখেছে।

ঠাকুরদালানের পুজোমণ্ডপের একপাশে একট প্রকাণ্ড ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় শ্রীমন্তের ঠাকুরদাদা শ্রীশচন্দ্র পুজোর কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলেন। তিনি নাতির বন্ধুদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন বটে কিন্তু অতনুকে দেখে তাঁর ভুরু দুটো একটু কোঁচকাল। সবার সঙ্গে অতনু যখন তাঁকে প্রণাম করতে গেল, উনি তাড়াতাড়ি কোঁচা দিয়ে পা দুটো ঢেকে দিলেন। তাঁর একমুখ পাকাদাড়ি তাঁর অস্বস্তিটা গোপন করতে পারল না।

শ্রীশচন্দ্র নাতিকে বললেন, ‘তোমার বন্ধুদের মালপত্র এখানেই রাখতে বলো। কানাই আর শিবু ওগুলো যার যার ঘরে পৌঁছে দেবে। এখন তুমি বন্ধুদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখিয়ে দাও। ছ'টার সময় আসবে। তখন চা দেওয়া হবে।’

সেই রকমই করা হলো। শ্রীমন্ত বন্ধুদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ যেতে না -যেতেই একটি লোক ছুটতে ছুটতে এসে শ্রীমন্তকে বলল, ‘তোমাকে বড়োকর্তা ডাকতেছেন গো। তাড়াতাড়ি এসো। তোমার বন্ধুরা এখানেই একটু থাক। বড়োকর্তা বললেন, সময় বেশি লাগবে না।’

শ্রীমন্ত চলে গেল। অতনু বন্ধুদের বলল, ‘বড়োকর্তা ভেবেছেন, আমি খ্রিস্টান সাহেব। খুব সম্ভব আমাকে পুজোবাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। আমাকে এখানে আনার জন্য শ্রীমন্ত বকুনি খাবে।’

শ্রীমন্ত যখন ফিরে এল, দেখা গেল যে অতনুর অনুমানই ঠিক। ম্লান হেসে শ্রীমন্ত হলল, ‘ঠাকুরদাদার সঙ্গে একচোট ঝগড়া করে এলুম। একটা ম্লেচ্ছ সাহেবকে আনার জন্য বকতে গিয়েছিলেন আমাকে। আমি বললুম, ম্লেচ্ছ হবে কেন? অতনু গাঙ্গুলী ব্রাহ্মণ সন্তান।

ঠাকুরদাদা বললেন, আমাদের দেশের লোকের কখনো নীল চোখ হয়?

আমি বললুম, হবে না কেন? কেলোকিষ্টি রামচন্দ্রেরই তো নীল চোখ ছিল। সেটাই তো একটা মিসিং নীলপদ্মের জায়গায় দিতে গিয়েছিলেন। আর এ তো ভীষণ ফর্সা। আমার কথায় ঠাকুরদাদা খুব যে একটা আশ্বস্ত হয়েছেন, তা মনে হলো না। আসলে অতনুর দুরন্ত সাহেব-সাহেব ফিচারগুলো মেনে নিতে পারছেন না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে তোর জন্যে অতিথিশালায়

একটা ঘর ঠিক করতে। সেটা সিঙ্গল সিটেড ঘর। তোরা বাকি সকলে অন্য ঘরে থাকবি। সবাই তোকে ওয়াচ করবে, তারপরে ঠিক করা হবে যে তোকে পুজোমণ্ডপে ঢুকতে দেওয়া হবে কি হবে না।'

অতনু সন্দিগ্ধ হয়ে বলল, 'সবাই ওয়াচ করবে মানে? কে সবাই?'

শ্রীমন্ত কথাটা যেন এড়িয়ে গেল। বলল, 'সবাই মানে আমাদের সবাই। ভয় নেই, তোর কোনো অসুবিধা হবে না।' বলে অন্য কথা পেড়ে বন্ধুদের গ্রাম দেখাতে শুরু করল।

অতনুর ঘরটা অতিথিশালার একধারে। যেকোনো হস্টেলের সিঙ্গল সিটেড ঘরের থেকে সামান্য ছোটই হবে। বড়জোর দশ ফুট বাই পাঁচ ফুট। ঘরের দু'পাশে দুটো জানলা, শীতের জন্য তাদের খড়খড়ি পাল্লাগুলো বন্ধ রয়েছে। ঘরের ভেতরে একটা সিঙ্গল তক্তপোশ আর একটা আলনা। তক্তপোশের একপাশে ওর ব্যাগটা রাখা ছিল।

সারা বিকেল মাঠে-ঘাটে ঘুরে, সন্ধ্যেবেলা অতিথিশালার পাশের মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলে আর রাত্রে গুরুভোজনের পর অতনু খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শ্রীমন্ত যখন ওকে ওর ঘরে নিয়ে এল, তখন শোবার জন্য ওর সমস্ত শরীর উদগ্রীব হয়ে ছিল।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেল অতনু। সমস্ত ঘরটা অসম্ভব গুমোট, নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অথচ, শ্রীমন্তকে বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হলো। এটা অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। ছোট্ট ঘর, সব দরজা-জানলা বন্ধ, তার ভেতরটা গুমোট হতেই পারে। অতনু তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিল। দেখা গেল বাইরে একটা অদ্ভুত কুয়াশা। মনে হচ্ছিল সেটা যেন নড়ছে, চড়ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। আকাশে চতুর্থীর নখের মতো সরু একফালি চাঁদটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। অতনু ভাবল কুয়াশাটা ঘরের ভেতরে চলে আসবে। তা কিন্তু এল না। জানলার বাইরেই একটা অস্বচ্ছ পর্দার মতো দুলতে লাগল।

শ্রীমন্ত বলল, 'জানলাটা খুলে রাখবি? ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে কিন্তু।'

অতনু বলল, 'সন্ধ্যা করে নিই। তারপরে বন্ধ করব।' বলে ব্যাগ থেকে একটা ধুতি বের করল।

'তুই এখন সন্ধ্যা করবি? রাত হয়ে গেছে, শুয়ে পড়। জানিস না বিদেশে নিয়মো নাস্তি?'

'তা হয় না। আজ পর্যন্ত কখনও সন্ধ্যা বাদ যায়নি। রাত হয়েছে তো কি? সন্ধ্যেবেলা করতে না পারলে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে নিলেই হলো। আমেরিকায় যখন যাই তখনও বাদ দিই না।' বলে খোলা জানালাটার দিকে চোখে পড়তে অতনু দেখল কুয়াশার ভেতরে নড়াচড়ার গতিটা যেন বেড়ে গেছে।

সন্ধ্যা করার পর প্রাণায়াম করে আচমন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের গুমোটটা যেন অনেকটাই কেটে গেল। ঠাণ্ডাটাও একটু বাড়ল। তখন, জানালাটা বন্ধ করে দেওয়াই স্থির করল অতনু।

পরদিন সকালে অতনু যখন বন্ধুদের সঙ্গে পুজোমণ্ডপে গেল, তাকে কেউ বাধা দিল না। তবে প্রণাম করার সময় যেন অভ্যাসবশতই কোঁচা দিয়ে পা ঢেকে রাখলেন শ্রীশচন্দ্র। ঠিকই বলেছে শ্রীমন্ত। অতনুর প্রবল সাহেব-সাহেব আকৃতিটাকে উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

ওরা যখন মণ্ডপে ঢোকে তখন তার এককোণে একটা উত্তেজিত আলোচনা চলছিল। দেখা গেল উত্তেজনাটা ক্রমশ বাড়ছে। একটু বাদে শ্রীমন্ত দৌড়ে এসে অতনুকে বলল, 'একবার আমার সঙ্গে আয় তো।' বলে ওকে টানতে টানতে শ্রীশচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেল।

শ্রীশচন্দ্র দারুভূত জগন্নাথের মতো ইজিচেয়ারের ওপর স্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখ দুটো রক্তবর্ণ, মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছে। দেখে মনে হচ্ছিল উনি এক্ষুণি একটা বোমার মতো ফেটে পড়বেন।

শ্রীমন্ত বলল, 'ঠাকুর্দা, আমাদের আজকের বিপদ থেকে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো সে এই অতনু।'

শ্রীশ রক্তচক্ষু করে নাতির দিকে তাকালেন। কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগে তাঁর পাশে দাঁড়ানো একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি একথা বলছ কেন? এই ছেলেটি পুজো করতে পারবে?' শ্রীমন্ত বলল, 'নিশ্চয়ই পারবে মেজকাকা। ও বড়ো বড়ো পুজো করে, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ করে, আর সরস্বতী পুজো করতে পারবে না? কি রে অতনু, পারবি না?'

অতনু ঘাড় নেড়ে বলল, 'পারব।'

শ্রীমন্তর মেজকাকা বললেন, 'মন্ত্রের বই লাগবে?'

'লাগবে না। আমার সরস্বতী পুজোর সব মন্ত্রই মুখস্থ আছে।'

হঠাৎ শ্রীশচন্দ্রের মুখের কঠিন রেখাগুলো একটু কোমল হয়ে এল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দ্যাখো অতনু, আমি মহাবিপদে পড়েছি। আমার সম্মান ধুলোয় মিশে যেতে বসেছে। আমাদের পুরোহিত কাঁঠালপুকুর হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত দীননাথ ভট্চায্যি। তিনি আজ সকাল থেকে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ির কাজকর্ম দেখশুনো করে তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ। সে আবার আজ সকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেছে ডাক্তারবদ্যির সন্ধানে। এঁরা ছাড়া আর একজন পুরোহিত আছেন, কিন্তু ফন্টে হারামজাদা তাঁকে আসতে দেবে না। ও জানে, এইবার পুজো না হলে আমার নাকটা মাটিতে ঘষে দেওয়া যাবে।'

অতনু জনান্তিকে শ্রীমন্তকে জিজ্ঞেস করল, 'ফন্টে কে?'

শ্রীমন্ত ফিসফিস করে বলল, 'ঠাকুরদার খুড়তুতো ভাই-এর ছেলে। শরিক—শত্রুপক্ষ!'

শ্রীশচন্দ্র এদিকে বলে চলেছেন, 'দ্যাখো যদি তুমি উদ্ধার করতে পারো। আমাদের এখানে আর যে সব পুরোহিত আছে তারা একবর্ণ সংস্কৃত জানে না, ঠংঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে, একগাদা বিড়বিড় করে অংবংচং বকে, তুমি নাও মা ফুলের ভার, আমাকে দাও মা বিদ্যের ভার বলে পুজো শেষ করে। আমি তাদের এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিতে পারি না। হয়তো তুমি পারবে। শুনলুম, তোমার সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রোচ্চারণ অত্যন্ত সুন্দর। দ্যাখো, চেষ্টা করে।'

অতনু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মন্ত্রের প্রশংসা করলে কে আপনার কাছে? শ্রীমন্তর যা সংস্কৃতে জ্ঞান। ও তো কিছুই জানে না।'

শ্রীশচন্দ্র এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। শ্রীমন্তকে বললেন, 'মন্টু, একে সরকার মশাই-এর কাছে নিয়ে যাও। ওকে জোড়ের ধুতি-চাদর দিতে বলো।'

অতনু বিনীতভাবে বলল, 'সেই সঙ্গে একজোড়া খড়ম।'

লম্বা-চওড়া অতনু যখন গরদের ধুতি-চাদর পরে খড়ম খটখটিয়ে পুজোমণ্ডপে এসে ঢুকল, হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে উপস্থিত সকলের কলরব বন্ধ হয়ে গেল। সবাই হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। আর সে যখন ভরাট উদাত্ত গলায় মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করল, তখন ঠাকুরদালানের ছাদে পায়রাদের ডানার ঝটপট শব্দ ছাড়া আর টুঁ শব্দটি নেই। শ্রীশচন্দ্র পর্যন্ত তাঁর ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। বেলা যত বাড়তে লাগল, ভিড়ও তত বাড়তে লাগল। জানা গেল, শরিকদের পুজোমণ্ডপ নাকি ফাঁকা হয়ে গেছে। সবাই চলে এসেছে এ তরফে, তার ফলে ও তরফ রেগে আগুন হয়ে আছে। অঞ্জলি দেবার সময় তো রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

সব যখন শেষ হলো, বন্ধুরা অতনুকে প্রায় কাঁধে তুলে অতিথিশালায় নিয়ে গেল। শ্রীশচন্দ্র পর্যন্ত এই ছেলেমানুষি দেখে বিরক্ত তো হলেনই না, বরং একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসতে লাগলেন। তার আগে অবশ্য তিনি সবাইকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন।

সন্ধ্যের মুখে একটা বাচ্চা ছেলে এসে অতনুর হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিটা শ্রীমন্তের লেখা। সেটা এই রকম।

অতনু, পালা! আমাদের ওনারা তোকে বেজায় পছন্দ করে ফেলেছেন। বাবা বললেন, আমার সেজ জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তার দশ বছর বয়েস, কলকাতায় গোখেল স্কুলে পড়ে। সেজ জ্যাঠামশাই বা জ্যেঠিমার এ ব্যাপারে করণীয় কিছুই নেই কারণ ওঁদের আদেশ অমান্য করার কারুর ক্ষমতা নেই। তোর মতামতেরও কোনো প্রয়োজন নেই। ওঁদের জীবদ্দশায় ভালো ছেলে ধরে নিয়ে এসে এ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ঘাড়ে ধরে বিয়ে দেবার অনেক ঘটনাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে ওঁরা এক্সপার্ট। থানাপুলিশ করে কোনো লাভ হবে না কারণ এ তল্লাটে আইন, কানুন, পুলিশ, মিলিটারি সবই শ্রীশচন্দ্র চাটুজ্জে। আর তিনি ওঁদের আদেশ অমান্য করবেন না—শত হলেও ওঁরা তাঁর পূর্বপুরুষ।

অতএব এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়। তোর ব্যাগটা এখানেই থাক, শুধু কিছু টাকা সঙ্গে নিবি। জমিদারি যাবার আগে যাদের আমরা পাইক বলতুম তাদের এখন দরওয়ান বলি। তারা লাঠি-সড়কি নিয়ে রেডি হচ্ছে। তোর ঘর ঘিরে ফেলবার আগেই বেরিয়ে পড়। এক্ষুণি। তোর ব্যাগ আমি পরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তুই যেন সাঁঝের ঝোঁকে বেড়াচ্ছিস এইরকম ভাব করে এদিক-ওদিক ঘুরবি। সঙ্কটার উল্টোদিকে পুবদিকে দেউড়ির দিকটা ফাঁকা। ওদিকে বাগান। ওখানে একটু ঘুরে সুযোগ বুঝে দেউড়ি পেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের আমবাগানের মধ্যে যদি ঢুকে পড়তে পারিস তা হলে দরওয়ানেরা তোর পেছনে যাবে না কারণ ওই বাগানটা ফন্টে কাকার। দাঁড়াবি না কিন্তু। নাক বরাবর দৌড়বি। তাহলে স্টেশন পৌঁছে যাবি। এখন পর পর কয়েকটা ট্রেন আছে। সামনে যেটা পাবি সেটাতেই উঠে পড়বি। টিকিট-ফিকিটের কথা পরে ভাবিস। বড় রাস্তা ঘুরে আমাদের লোকের স্টেশনে যেতে যে সময় লাগবে তার আগেই তোকে কেটে পড়তে হবে।

চিঠি পড়ে তো অতনুর মাথার চুল খাড়া! তার বন্ধুদেরও তথৈবচ। সবাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল। যেন কিছুই হয়নি, এরকম একটা ভাব করে বেড়াতে বেড়াতে ওরা পুবদিকের বাগানে চলে গেল। সত্যিই ওদিকে লোকজন কম। কয়েকটা চাদর মুড়ি দেওয়া রোগাপটকা মালি ঘোরাঘুরি করছিল। সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে ফুলগাছগুলো দেখতে লাগল। অতনু ইচ্ছে করে দেউড়ির দিকে পেছন ফিরে রইল। যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

পবিত্র ফিসফিস করে বলল, 'দেউড়িতে মাত্র একটা হোঁৎকামতো গুঁপো দরওয়ান আছে। তুই যখন পালাবি, ওকে আমরা সামলাব।'

অজয় বলল, 'ঐ গাছটার নিচে দ্যাখ, কী রকম অদ্ভুত একটা ধোঁওয়ার পিণ্ড জমাট বেঁধে রয়েছে। শীতকালে বাতাস ভারী হয়ে যায় বলে এ রকম হয় কিন্তু এ ধোঁওয়াটা যেন কেমন। দেখলে ভয় করে।'

অতনুর বুকটা ধড়াস করে উঠল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল একটু দূরে একটা তেঁতুলগাছের নিচে মাটি থেকে ইঞ্চি ছয়েক ওপরে ভাসমান গত রাত্রের দেখা নিরলম্ব কুয়াশাটা। কালকের মতোই সেটা নড়ছে-চড়ছে, ঘোঁট পাকাচ্ছে। কখনও সরু হয়ে লম্বা হয়ে যাচ্ছে আবার কখনও মোটা হয়ে বেঁটে হয়ে যাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে অতনু আর দাঁড়াল না। 'আমি যাচ্ছি, তোরা এ দিকটা সামলা!' বলে হঠাৎ ফুলের বেড-টেড মাড়িয়ে, একগাদা ফ্লক্স আর প্যানসি চেপ্টে দিয়ে, গোটা চারেক গাঁদা গাছ ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল দেউড়ির দিকে। দরওয়ানটা একটা টুলে বসে গোঁফে তা দিচ্ছিল। সে

ব্যাপারটা বুঝে খচমচ করে উঠে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতে অতনু সাঁ করে তার সামনে দিয়ে ছুটে দেউড়ি পার হয়ে, রাস্তা পেরিয়ে আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দরওয়ানটা 'পালাল! পালাল!' বলে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল ঠিকই কিন্তু সত্যিই আমবাগানের ভেতরে ঢুকল না। রাস্তার ওপরে লাফাতে লাগল।

বেশ কিছুটা দৌড়ে একটু দম নেবার জন্য দাঁড়াল অতনু। দম নেবে কি? পেছন ফিরে যে দৃশ্য দেখল তাতে তো ওর একেবারে আক্কেল গুড়ুম!

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় অতনু দেখল সাদাটে কুয়াশাটা বাতাসে ভেসে ভেসে একটা হিংস্র ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো তার দিকে তেড়ে আসছে। তার এপাশ-ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে যেন অতনুর গলা টিপে ধরার জন্য সরু লিকলিকে কতগুলো শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ বেরুচ্ছে আবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এমনকি সেই কুয়াশার ভেতর থেকে বহুদূর থেকে ভেসে আসা একটা ক্ষীণ কিন্তু ক্রুদ্ধ কোলাহলও যেন শোনা যাচ্ছে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না অতনু। বিরাট একটা লাফ মেরে 'গেছি রে!' বলে একটা আর্তনাদ করে আবার প্রচণ্ড জোরে ছুট লাগাল। তখন যদি স্টপ ওয়াচ নিয়ে ওর স্পীড মাপা যেত তো বোধহয় দেখা যেতে যে অনেক অলিম্পিক রেকর্ডই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

স্টেশনটা খুব দূরে নয়। অতনু যখন পৌঁছল তখন একটা ট্রেন সদ্য রওনা হয়েছে। ও লাফ দিয়ে একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পরে হাঁপাতে হাঁপাতে একটা নস্যিরঙের র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া লোকের পাশে বসে পড়ল। জানলা দিয়ে দেখল প্ল্যাটফর্মের ধার একটা গাছের নিচে কুয়াশাটা জমাট বেঁধে যেন নিষ্ফল রাগে ফুঁসছে।

নস্যিরঙের র‍্যাপার বলল, 'আর কেয়া দেখতা হায় সাহেব! এখানকার আদমি লোগকো পলিউশনকে লিয়ে কোনো চিন্তাই নেহি হায়। কাঁচা কয়লা দেকে উনুন জ্বালায়গা আর ঐসা মাফিক ধোঁওয়ায় সকলের স্বাস্থ্যকা বারোটা বাজায়গা। দেখিয়ে না, উনুনওয়ালা কতক্ষণ চলা গিয়া তার ঠিক নেহি হায় অথচ ঐ ধোঁয়টা ওইখানমে এখনও ঘোঁট পাকাতা হায়।'

গল্প শেষ করে অতনু বলল, 'জানিস ভেনো, শ্রীমন্তকে অনেক চাপাচাপি করলুম ঐ কুয়াশার মতো জিনিসটা কি বা কেমন করে ওর সেই 'ওঁদের' সঙ্গে ওর ঠাকুরদাদার যোগাযোগ হয় সে কথা বলবার জন্য। কিছুতেই বলল না। আমি ওসব জানি না বলে এড়িয়ে গেল।'

কার্ত্তিক ১৪০৯

গভীর রাতের ফিটন গাড়ি

মুরারিমোহন বিট

আসানসোল থেকে বারটার ট্রেনে আমার নন্দনপুর রওনা হওয়ার কথা ছিল। স্টেশনটার নাম ঠিক মনে নেই। তবে 'নন্দনপুর' ধরনেরই কিছু একটা নাম হবে। গল্পে তাই নন্দনপুর নামই দিলাম। আসানসোল থেকে নন্দনপুর সাড়ে চার ঘণ্টার পথ। আমার কলেজ-ফ্রেণ্ড সুজয় সেই হিসাবমত সাড়ে চারটের মধ্যেই নন্দনপুর স্টেশনে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, এই রকম ব্যবস্থা ঠিক হয়ে ছিল। নন্দনপুর থেকে সুজয় আমাকে নিয়ে যাবে তাদের গ্রাম বীরশীলায়। নন্দনপুর বা বীরশীলা সবই আমার অজানা জায়গা।

অজ পাড়াগাঁ বীরশীলা গ্রামের ছেলে সুজয়। আসানসোলে মামাবাড়িতে থেকেই সে পড়াশোনা করে। মাঝে-মধ্যে গাঁয়ে যায়।

গরমের ছুটিতে সুজয় এখন গাঁয়ের বাড়িতে গেছে। যাবার আগে সে আমাকে বারবার অনুরোধ করেছিল, এই একমাস ছুটির মধ্যে অন্ততঃ দু-একটা দিনের জন্যেও আমি যেন তাদের গাঁ দেখে আসি। আমিও রাজী হয়ে গিয়েছিলাম, এবং তেইশে জ্যৈষ্ঠ বেলা বারটার ট্রেনে রওনা হওয়ার কথা পাকাপাকিভাবে স্থির করা হয়েছিল।

নন্দনপোর স্টেশন থেকে বীরশীলা অনেকটা পথ। সাইকেল রিকশা করে গেলে আধ ঘণ্টা লাগে। অবশ্য পিচঢালা রাস্তা হলে আধ ঘণ্টা লাগত না—মেঠো পথ বলেই অত সময় লাগে।

ট্রেনের সময় ছাড়া স্টেশনে রিকশা থাকে না—তাও দু-তিন খানার বেশী নয়। কারণ এখানে প্যাসেঞ্জার যা নামে, সংখ্যায় তা নিত্যান্ত নগণ্য। আবার যে ক'জন বা নামে, তাদের মধ্যে রিকশায় যাওয়ার লোক থাকে আরও কম। বেশীর ভাগ লোক হেঁটেই যাওয়া-আসা করে।

এখানে রাত সাড়ে আটটায় যে ট্রেনখানা আসে, সেই ট্রেন পর্যন্ত রিকশা পাওয়া যায় স্টেশনে। সাড়ে আটটার পর দশটায় শেষ ট্রেন আসে। সে ট্রেনে নন্দনপুরের প্যাসেঞ্জার কদাচিৎ থাকে। কোন কারণে যারা সাড়ে আটটার ট্রেনে আসে বটে, কিন্তু অত রাতে তাদের বীরশীলা বা অন্য গ্রামে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এসব কথা সুজয়ের মুখ থেকেই আমার শোনা।

স্টেশন থেকে বাঁদিকে মাত্র মাইলখানেক দূরে নন্দনপুর গ্রাম, আর ডানদিকে সোজা চওড়া কাঁচা রাস্তায় প্রথমে চৌদ্বার গ্রাম, তারপর বীরশীলা, আরও দূরে বিক্রমপুর। স্টেশন থেকে অন্ধলোকও হেঁটে বীরশীলায় পৌঁছতে পারে। আর বীরশীলায় পৌঁছে বাঁড়ুজ্যের পাড়ার হরিমোহন সান্যালের কথা জিজ্ঞাসা করলে ছেলে-বুড়ো সকলেই তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দেবে। নিতান্ত্য ছোট গ্রাম বীরশীলা। ওখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনে জানে। বিশেষ করে ডাক্তার হিসাবে হরিমোহন সান্যালকে শুধু বীরশীলা কেন, আশপাশের আরও পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক চেনে। ঐ হরিমোহনবাবুরই মধ্যম পুত্র সুজয় সান্যাল।

আমার বরাত মন্দ। স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয় যাওয়ায় ট্রেনখানা ধরতে পারলাম না। টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে যাব, এমন সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। মেজাজ গেল বিগড়ে। সুজয়ের কথা ভেবে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। সে বেচারী অত দূর থেকে স্টেশনে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করে ফিরে যাবে, এটা ভাবতেই বড় খারাপ লাগছে।

বারটার পর দুটোয় ট্রেন। দুটোর ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ নন্দনপুর পৌঁছবে। ঐ ট্রেনে গেলেও কোন অসুবিধা নেই। গাঁয়ে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেলেও হরিমোহন সান্যালের মত নামকরা লোকের বাড়ি খুঁজে পেতে কোন ঝামেলা হবে না।

অতএব স্টেশনেই সময় কাটিয়ে বেলা দুটোর ট্রেনেই রওনা হয়ে পড়লাম।

কিন্তু আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছি—অর্ধেক পথ গিয়ে গাড়িটা একটা স্টেশনে সে-ই যে দাঁড়াল, আর তার চলার নাম নেই। জানা গেল সামনের স্টেশনে একটা মালগাড়ি লাইনচ্যুত হয়েছে মাত্র আধঘণ্টা আগে। সেই মালগাড়িকে না সরানো পর্যন্ত আমাদের এ গাড়ি নড়বে না।

সুদীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা পর গাড়ি ছাড়ল। আমার মনে তখন শোচনীয় অবস্থা। বুঝলাম, ট্রেন থেকে নেমে সারারাত নন্দনপুর স্টেশনেই আমাকে কাটাতে হবে—তাছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রাত সওয়া এগারোটায় নন্দনপুর পৌঁছলাম। আরও তিনজন নামল। চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অত বড় লম্বা প্ল্যাটফর্মটায় মাত্র দুটো কেরোসিনের আলো লম্বা পোস্টের মাথায় জ্বলছে মিটমিট করে। সে আলো এতই মিটমিটে যে, পোস্টের কাছাকাছি জায়গাটাও আলোকিত করতে পারছে না।

প্ল্যাটফর্মে নেমে এদিক-ওদিক চাইছিলাম, তারই মধ্যে অপর প্যাসেঞ্জার তিনজন অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেল, তার হদিস পাই নি। আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম, নিজেকে বড় অসহায় মনে হতে লাগল। অগত্যা আমি টিকিট ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। খোলা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক চোখ বুঁজে চেয়ারে বসে আছেন, আর তাঁর পিছন দিকে নীল জামা-পরা একটি কুলি মেঝেতে শুয়ে রয়েছে।

আমি ডাকলাম,—স্যার, শুনছেন?

স্টেশনমাস্টার চোখ মেলে তাকালেন। বললেন,—কি চাই? টিকিট?

বললাম—আজ্ঞে না, আমি এই ট্রেনে আসানসোল থেকে এলাম, বীরশীলা যাব। অনেক দূরের রাস্তা। তাছাড়া এখানে আমি একেবারে নতুন......এর আগে এ অঞ্চলে কোনদিন আসিনি.....পথঘাট কিছুই জানি না.....কাজেই এত রাতে যাওয়া আমার পক্ষে উচিত হবে না। আপনি যদি আজ রাতের মত আপনার এখানে আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দেন....

—বেশ তো, পাশের ওয়েটিংরুমে থাকুন, দরজা খুলে দিচ্ছি। আলোও একটা দিতে পারব।

টিকিটঘর সংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর রয়েছে, সেটাই বিশ্রামঘর। স্টেশনমাস্টার লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে এসে ওয়েটিং রুমের তালা খুলে দিলেন। বললেন—দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। অন্ধকারে অসুবিধা হতে পারে আপনার, আলোটা অল্প জ্বেলে রাখতে পারেন। মালগাড়িটা ডিরেল্ড হয়ে যাওয়াতে আপনার মত অনেককেই অনেক দুর্ভোগ আজ পোয়াতে হবে।

মাস্টারমশাই চলে গেলেন, আমিও দরজায় খিল এঁটে দিলাম। ঘরের মধ্যে বেশ চওড়া মত দুটো বেঞ্চি পাতা। তারই একটাতে পা ছড়িয়ে সটান শুয়ে পড়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। একে নতুন জায়গা, তার ওপর এই রকম পরিস্থিতি, চোখে কি ঘুম আসতে চায়?

তবু তাকিয়ে থেকে ভাবতে ভাবতেই এ সময় দু' চোখে তন্দ্রার ঘোর নেমে এল। আর ঠিক সেই সময় বন্ধ দরজার কপাটে শুনতে পেলাম ঠক্-ঠক্-ঠক্-ঠক্ শব্দ।

তন্দ্রা ছুটে গেল। স্টেশনমাস্টারই দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে মনে করে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম একজন রোগা আধবুড়ো লোক গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে আমর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। লোকটি শুধাল, আপনি কোথায় যাবেন?

বললাম—বীরশীলা যাব।

লোকটি বলল—আসুন না, আমার গাড়ি আছে।

বললাম—না, এত রাতে যাব না। যাঁদের বাড়ি যাব, তাঁরা এখন অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। এত রাতে তাঁদের জাগিয়ে বিরক্ত করে লাভ নেই।

লোকটি বলল—কি এমন রাত হয়েছে.....রাত ন'টাও বাজে নি এখন। পোনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেব আপনাকে। আসুন—

বললাম—কি বলছ হে? খুব কম হলেও রাত বারটা হবে এখন।

এই বলে হাতের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালাম। তাকিয়েই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঘড়িতে ন'টা বাজতে তখনও দশ মিনিট দেরি রয়েছে।

ব্যাপারটা কি হল আমার মাথায় ঢুকছে না। আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে আমি যখন নন্দনপুর পৌঁছাই, তখন ঘড়িতে দেখেছিলাম এগারোটা বেজে পনের মিনিট হয়ে গেছে। সেই হিসাবমত এখন বারটা বাজার কথা।

আমি আবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, ঠিক দশ মিনিট দেরি রয়েছে ন'টা বাজতে। তাহলে আগে যা দেখেছি, সেটা চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। ইস্, এতক্ষণ অযথাই আমি ওয়েটিং রুমে বসে আছি। ট্রেন থেকে নেমে যদি স্টেশনের বাইরে যেতাম, তাহলে গাড়িও পেয়ে যেতাম, এবং সুজয়দের বাড়িও এতক্ষণে পৌঁছে যেতাম! এমন চোখের ভুল তো আমার কখনো হয় নি! একেই গ্রহের ফের!

—বাবু!

লোকটির ডাকে আমি যেন সম্বিত ফিরে পেলাম।

—বাবু, যাবেন নাকি? আমি এবার গাঁয়ে ফিরে যাব। আপনাকে নিয়েই যাই। এর পর আপনি আর গাড়ি পাবেন না।

বললাম—বেশ চল। বীরশীলায় বাঁড়ুজ্জে পাড়ার হরিমোহন সান্যালের বাড়ি যাব।

লোকটি আর কথা না বলে এগিয়ে চলল। আমি ওর পিছনে পিছনে স্টেশনের বাইরে এলাম। ভীষণ অন্ধকার—কিচ্ছু নজরে পড়ে না। তবু ভাল করে তাকাতে আবছাভাবে নজরে পড়ল, রাস্তার ওপর একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িটা প্রায় অন্ধকারে মিশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নিঃঝুম রাত—কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। রাত ন'টা বাজে নি, অথচ রাতের এমন চেহারা! এখন রাত ন'টা না রাত বারটা? ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। রাত ন'টাই হোক আর বারটাই হোক, এমন থমথমে রাতে এমন জমাট অন্ধকারের মধ্যে আমর যেতে মন চাইছে না।

বললাম,—নাঃ, আজ আর যাব না, কাল সকালেই যাব।

শুনে লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। লোকটার একেবারে কাছেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখতে পেলাম তার চোখের তারা দুটো। অস্বাভাবিক রকমের স্থির সে-চোখের দৃষ্টি। মনে হল তার চোখ দুটো পাথরের চোখ। এ কেমন চোখ, এ কেমন চাহনি? আমার বড়ই অস্বস্তি মনে হতে লাগল।

লোকটা বলল,—কেন শুধু শুধু সারারাত এখানে কষ্ট করে পড়ে রইবেন?

আমরা ততক্ষণে গাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। দেখলাম ওটা একটা ফিটন গাড়ি। ঘোড়াটাও খুব তেজী। কিন্তু ঘোড়াটা এমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওটাকে জ্যান্ত বলেই মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে একটা মড়া ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। ঘোড়াটা নড়েচড়ে গাড়িটা টানবে বলে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।

লোকটা বলল,—এইটা আমার গাড়ি, উঠে পড়ুন। দশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে পৌঁছে দেব বীরশীলায়। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি বিক্রমপুর চলে যাব।

কেমন যেন একটা অজানা ভয় নিয়ে আমি ফিটনে উঠে বসলাম। বুকটা ভয়ে ভারী হয়ে রইল। ফিটন চলতে শুরু করল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! গাড়ির চাকার আওয়াজ বা ঘোড়ার খুরের শব্দ কিছুই আমার কানে আসছে না। এ আবার কী কাণ্ড! কোন আওয়াজ পাচ্ছি না কেন? আমি কি বধির হয়ে গেছি? না, তা হবো কেন? তাহলে চালকের সঙ্গে এতক্ষণ যে কথা হচ্ছিল আমার, সে-সব কথা তো শুনতে পাচ্ছিলাম বেশ। তবে? আমার মনের ভয় আরো বাড়ল।

এরপর যে কাণ্ড ঘটল, তা আরও অস্বাভাবিক। ফিটন এত জোড়ে ছুটতে লাগল যে, তা ভাবা যায় না। একটা ঘোড়া কি এত বড় একটা গাড়ি নিয়ে এত জোরে ছুটতে পারে? কখ্‌খনো না! হাওয়ার চেয়েও জোরে গাড়ি ছুটছে। এত জোরে ছুটছে যে, কাছের গাছপালাগুলো একেবারে নজরেই পড়ছে না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, এভাবে গাড়ি চললে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। ভয়ে আমার হাত পা দেহ যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম—গাড়ি থামাও!

এর পর কি হয়েছিল, তা আমার জানা নেই। কারণ চিৎকার করে উঠেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখেছিলাম, আমি শুয়ে আছি সুজয়দের ঘরে। আমার চোখের সামনের দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি ছিল, তাতে দেখেছি তখন বেলা আটটা বাজতে দশ মিনিট দেরি। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সর্বনাশ, এতক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম!

আমার কাছে তখন সুজয়, সুজয়ের বাবা হরিমোহনবাবু, সুজয়ের মা এবং আরও কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ ছিলেন। তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে গত রাতের সমস্ত কথা আমি জানালাম। এবং আমি নিজেও জানলাম যে, আজ ভোরে আমাকে মাঠের মাঝে রাস্তা থেকে তুলে আনা হয়েছে। চৌদ্দার গ্রাম ছেড়ে বীরশীলার কাছাকাছিই আমাকে পাওয়া গিয়েছিল। খুব ভোরে একজন চাষীর নজরে আমি পড়ে যাওয়ায় সে বীরশীলায় গিয়ে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। ফলে বীরশীলা থেকে অনেকেই আমাকে দেখতে যায়....সুজয়ও ছিল তাদের সঙ্গে। সে-ই আমাকে নিয়ে আসে তাদের বাড়িতে।

গত রাতের ঘটনা আমার মুখ থেকে শুনে হরিমোহনবাবু সন্দেহজনকভাবে মাথা দোলাতে থাকেন। তারপর বলেন,—আমার মনে হচ্ছে এ সেই বিক্রমপুরের জমিদারের ব্যাপার। কাল কত তারিখ ছিল? ২৩শে জ্যৈষ্ঠ.....হ্যাঁ, সেই তারিখ! এই তারিখেই আরও তিনবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে শুনেছি!

সুজয় বলল,—২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখেই বিক্রমপুরের জমিদারমশায়ের ছেলের অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল, না বাবা?

আমি প্রশ্ন করলাম—কি ব্যাপার জ্যাঠামশাই?

হরিমোহনবাবু বলতে লাগলেন,—প্রায় বছর কুড়ি আগেকার কথা। আমাদের গ্রামের তিন মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুর গ্রাম আছে। সে সময় ঐ গ্রামের জমিদার ছিলেন রায়বাহাদুর নীহারেন্দু চৌধুরী। তাঁর বয়স তখন পঁয়ষট্টি বছর। স্ত্রী বনলতা অনেকদিন আগেই দেহরক্ষা করেছেন। একমাত্র পুত্র সঞ্জীব চৌধুরীর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। এই পিতাপুত্র ছাড়া ঐ বাড়িতে থাকত, নীহারেন্দুবাবুর ছোট ভাই শিবশঙ্কর এবং তাঁর স্ত্রী ও পাঁচ ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া থাকত নীহারেন্দুবাবুর এক বিধবা বোন, এক ভাগনে আর কয়েকজন দাস-দাসী, রাঁধুনী বামুন ইত্যাদি।

বিয়ে-থা করার দিকে সঞ্জীবের কোন ঝোঁক ছিল না। বরং বিয়ে করবে না বলেই সে মনে মনে স্থির করে রেখেছিল। নীহারেন্দুবাবু মাঝে মাঝে ছেলেকে বিয়ে করার কথা বলতেন বটে, কিন্তু তেমন জোর দিতেন না। কিন্তু তাঁর বয়স যখন পঁয়ষট্টি হল, যখন তিনি বুঝলেন যে, তিনি

আর বেশীদিন বাঁচবেন না, তখন ছেলেকে বিয়ে করার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কারণ একমাত্র ছেলে সঞ্জীব—সে যদি বিয়ে না করে তাহলে সংসারটা নষ্ট হয়ে যাবে। সঞ্জীবের মৃত্যুর পর এই সংসারে আর কেউ থাকবে না।

যাই হোক, বাপের বারবার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সঞ্জীব বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল, এবং বিয়ে ঠিক হয় কাঞ্চনগড় গ্রামের জমিদার-কন্যার সঙ্গে।

সঞ্জীবের বিয়ে হয়েছিল ২২শে জ্যৈষ্ঠ। ২৩ তারিখে বৌকে নিয়ে সে কাঞ্চনগড় থেকে বৈকালের ট্রেনে রওনা হয়েছিল। ট্রেনে নন্দনপুর এক ঘণ্টার পথ। ভেবেছিল সাড়ে ছ'টার মধ্যে নন্দনপুর পৌঁছে আলো-বাজনা করে জাঁকজমক সহকারে সে বিক্রমপুর যাত্রা করবে।

হরিমোহনবাবু বলে চলেছেন,—কিন্তু তোমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, সঞ্জীবের ভাগ্যেও সেদিন তাই ঘটেছিল। পথিমধ্যে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় নন্দনপুর তারা এসে পৌঁছাল রাত এগারোটায়। স্টেশনে আলো-বাজনা এবং তাদের নিজস্ব ফিটন গাড়িটা সুসজ্জিত অবস্থায় তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

যাই হোক বর-বৌ ফিটনে উঠে যাত্রা শুরু করল। রাত নিশুতি হয়ে গেলেও, বাজনা-আলোর বাহার দেখার লোক কেউ জেগে না থাকলেও যথারীতি বাজনা বাজিয়ে আলো সাজিয়ে ফিটন ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগল।

বীরশীলা গাঁয়ের প্রায় কাছাকাছি এসে, যেখানে তোমাকে পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানে এসে হঠাৎ ফিটনের ঘোড়াটা ক্ষেপে গেল। কেন ক্ষেপে গেল, কি কারণ ঘটেছিল, তা আর জানা যায় নি। তবে ঘোড়াটা ক্ষেপে দু'চারটে লাফ দিয়েই রাস্তা ছেড়ে নেমে ডানদিকে ছুট দিল। অনেকের ধারণা হয়ত ঘোড়ার পায়ে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছিল, যার জন্য এই দুর্ঘটনা। কোচোয়ান কিছুতেই সামলাতে পারল না ঘোড়াটাকে। রাস্তার ধারেই ছিল গভীর এক খাল। সেই খালের জলে তলিয়ে গেল বর-বধূ আর কোচোয়ান সমেত পুরো গাড়িখানা। সেদিনটা ছিল ২৩শে জ্যৈষ্ঠ।

রায়বাহাদুর নীহারেন্দু চৌধুরীর ছিল হার্টের অসুখ। পুত্রের ঐরূপ শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

এর পর বাড়ির অন্যান্য লোকেরা পর পর কয়েকদিন যাবৎ রাত্রে নানা রকম ভয়ের দৃশ্য দেখে ঐ বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। বাড়িটা এখন বন-জঙ্গলে ঘেরা পোড়ো বাড়ি। এই হল বিক্রমপুর জমিদারবাড়ির ইতিহাস।

আমার দিকে চেয়েই হরিমোহনবাবু বলে চলেছেন,—তোমার যেমন গতকাল অবস্থা হয়েছিল, ঐ রকম অবস্থা ইতিপূর্বে আরও তিনজনের হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে পাওয়া গিয়েছিল ঐ খালের জলে মৃত অবস্থায়, অর একজনকে পাওয়া গিয়েছিল রাস্তার পাশে খালের ধারে অজ্ঞান অবস্থায়। সেই লোকটির জ্ঞান ফিরলে তার মুখ থেকে তুমি যা বললে সেই কথাই শোনা গিয়েছিল।

শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, আমি এক প্রেতাত্মার কবলে পড়েছিলাম। আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, গত বিশ বছর ধরে ঐ নির্দিষ্ট তারিখের নির্দিষ্ট সময়ে সেই ফিটন চালকের প্রেতাত্মা তার অলৌকিক ফিটন গাড়িটি নিয়ে স্টেশনে অপেক্ষা করে। সেই সময় যদি কোন ব্যাক্তিকে সে তার আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে যায়, তাহলে তাকে ঐ নির্দিষ্ট খালের জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করে। হরিমোহনবাবুর মুখে যেটুকু শুনলাম, তাতে বুঝলাম ইতিমধ্যে সে দুজনকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে, আর আমাকে নিয়ে দুজন ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ পেয়ে গেছে।

আমি বরাবরই সাহসী প্রকৃতির এবং ভূত-প্রেতের প্রতি আমার চরম অবিশ্বাস ছিল। ভূতের প্রসঙ্গ বরাবরই আমি তাচ্ছিল্য সহকারে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছি। এবং বার দুয়েক ভূতের রহস্য ভেদ করার জন্য আমি নিশুতি রাতে অভিযানও চালিয়েছিলাম। একবার এক পোড়ো বাড়িতে,

আর একবার এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিরাট এক বেলগাছের তলায়। ঐ দু'বারই সারারাত জেগে থাকাই আমার সার হয়েছিল, ভূতের নাম-গন্ধও পাই নি।

কিন্তু গতকাল যা ঘটে গেল আমার জীবনে সেটা কি? ভূতকে অবিশ্বাস আর করি কি করে? তবে প্রথম থেকেই যদি আমি বুঝতে পারতাম যে ভূতের হাতে পড়েছি, তাহলে অত ঘাবড়ে না গিয়ে নিজেকে আপ্রাণ সচেতন রাখার চেষ্টা করতাম এবং ঐ ফিটন চালকের প্রেতাত্মার সঙ্গে মোলাকাত করার চেষ্টা করতাম। সেজন্য আমার বড় আপসোস হতে লাগল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলাম,—আচ্ছা জ্যাঠামশাই, বিক্রমপুরের সেই জমিদারবাড়ি এখনো আছে?

হরিমোহবাবু বললেন,—আছে বৈকি! বিশাল মজবুত বাড়ি। কোথাও ভেঙেচুরে যায় নি। তবে কাঠের দরজা-জানালাগুলোর কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে—উই-এ খেয়েছে। এই তো মাত্র দিন দশেক আগেও বাড়িটার সামনে দিয়ে গেছি। অত বড় বাড়ি....দেখলে মায়া হয়...কেমন মড়ার মত অসাড় হয়ে পড়ে আছে!

জিজ্ঞাসা করলাম,—এখনো কি ও বাড়িতে ভূতের কোন উপদ্রব আছে? শুনেছেন কিছু জ্যাঠামশাই?

—হ্যাঁ, সেই রকমই তো শোনা যায়। লোকে ভূতুড়ে বাড়িই বলে ওটাকে। রাত বেশী হলে ও-বাড়ির ধারে-কাছে কেউ যায় না। এমন কথাও শুনেছি, কেউ কেউ নাকি গভীর নিশুতি রাতে ঐ বাড়ির ছাদে দুজন ছায়ামূর্তিকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। একটি মূর্তি নাকি পুরুষের আর একটি নারীর।

শুনলাম মনোযোগ দিয়ে এবং তখুনি মনঃস্থির করে ফেললাম, আগামীকাল রাত্রেই ঐ বাড়িতে যেতে হবে, দেখতে হবে ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ। আমার মন বলতে লাগল, ঐ বাড়িতে ভূতের দর্শন হয়ত পেয়ে যেতে পারি।

পরদিন সুজয়কে আমার মনের কথা জানালাম। ঐ ভূতুড়ে জমিদারবাড়িতে রাত কাটাতে সে আমাকে বারবার নিষেধ করল। কিন্তু আমার অটল মনোভাবের কাছে তাকে হার স্বীকার করতেই হল। সুজয়কে বললাম,—আজ রাতেই আমি যেতে চাই; কাল সকালে ফিরব। তোমার মা-বাবাকে আসল কথা না জানিয়ে অন্য কিছু একটা বলে আমাকে বেরুতে হবে। কি বললে ভাল হয়, সেটা তুমিই ভেবে দেখ।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিয়েছি একটা পাঁচ সেলের টর্চ। সোজা পথ বিক্রমপুর। সাড়ে আটটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। বাড়িটাকে খুঁজে বের করবার যেরূপ পথনির্দেশ আমি সুজয়ের কাছে পেয়েছিলাম, তাতে পথের কোন লোককে জিজ্ঞাসা না করেই বাড়িটার কাছে পৌঁছতে আমার কোনরূপ অসুবিধা হল না। বাড়িটা গাঁয়ের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত।

টর্চের আলোয় বাড়িটা দেখলাম। হরিমোহনবাবুর কথা সত্য। বিরাট বাড়ি। যেমনি বড় বাড়ি, সম্মুখে তেমনি বিরাট কম্পাউণ্ড। সমস্ত কম্পাউণ্ডটা ঝোপ-জঙ্গলে প্রায় আচ্ছন্ন।

দেখলাম বাড়িটার বাইরের রঙ একেবারে কাল হয়ে গেছে এবং চুন-বালি খসে পড়েছে অনেক জায়গা থেকে। এছাড়া বাড়িটার আর তেমন বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে রাতের অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না।

রাত-বিরেতে পোড়ো বাড়িতে ঢোকা বা শ্মশানঘাটে রাত কাটান এ সবের মধ্যে অলৌকিক ভয়-ডর আমার মনে কিছু স্থান পায় না। তবে সাপ-খোপের ভয় যে হয় না, তা নয়। যাই হোক

টর্চের আলোয় ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে দু'হাতে ঝোপ-জঙ্গল সরিয়ে আমি কম্পাউণ্ড অতিক্রম করে উঁচু বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সেটা মোটা উঁচু গোল থামওলা বারান্দা। বারান্দার পর ঘরে ঢোকার বিরাট দরজা। কপাট খোলাই ছিল। টর্চের আলোয় দেখলাম, হল ঘরের মত বিশাল ঘর। ঢুকে গেলাম ভিতরে। ধুলো বালি শুকনো পাতা ইঁট পাটকেলে মেঝেটা খুবই নোংরা। ভালভাবে চারদিক দেখে দেখে এগিয়ে চললাম অন্দরের দিকে।

হল ঘরের পর আবার ঘর। সে ঘরের পর অন্দরমহলের বিরাট টানা চওড়া বারান্দা। বারান্দার দু'পাশেই ঘর। কোন ঘরের দরজা খোলা, কোনটার দরজা বন্ধ। খোলা ঘরগুলোর মধ্যে আলো ফেলে ফেলে দেখে চলেছি—ঘরগুলো তেমন নোংরা নয়। শুধু ধুলো যা জমেছে, আর দেওয়ালের চুন-বালি যা খসে পড়েছে। আর আছে মাকড়সার জাল। এছাড়া আর তেমন কিছু নোংরা জিনিস নেই। মনে মনে স্থির করলাম, এরই মধ্যে যে-কোন একটা ঘরে রাতটা কাটিয়ে দেব।

আরও এগিয়ে বারান্দা ডানদিকে ঘুরেছে। আমিও ঘুরলাম। সামনে দেখি বারান্দার শেষে বিরাট দরজাওলা আর একখানা ঘর। এ ঘরের দরজাও খোলা। ঘরখানার মধ্যে গেলাম। দেখলাম সবচেয়ে পরিষ্কার এই ঘরখানা। অন্যান্য ঘরের মত এ ঘরেও কিছু নেই—একেবারে ফাঁকা। এদিক-ওদিক ঘুরতে আর ইচ্ছা হল না—দরজার গোড়াতেই বসে পড়লাম। আমার হাতে রিস্টওয়াচে তখন ন'টা বাজতে মিনিট দশেক বাকী।

বসে থাকতে থাকতে কখন যে দরজার কপাটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারি নি। এক সমকয় আমার চোখের পাতা দুটো যেন আপনা থেকেই খুলে গেল। টর্চের আলো জ্বেলে প্রথমেই দেখলাম ঘড়িটা। সাড়ে বারোটা।

তারপরই ঘরের ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দুরন্ত ভয়ে আমার সারা শরীর যেন হিম হয়ে গেল। আমি স্প্রীং-এর মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

দেখলাম, ঘরের মেঝের ওপর পাশাপাশি দুটো সুন্দর কারুকার্য করা মেহগনী কাঠের চেয়ারে অপরূপ সাজে সজ্জিত বর আর বধূ বসে রয়েছে। তাদের অপলক দৃষ্টি আমারই দিকে নিবদ্ধ। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাজগোজ দেখে মনে হচ্ছে, এইমাত্র তারা প্রসাধন করে সেজেগুজে এসে বসেছে। গলার ফুলের মালা দুটি পর্যন্ত একেবারে তাজা। কিন্তু তাদের সর্বশরীর পাথরের মত নিথর—চোখের দৃষ্টিও নিথর! নিথর হলেও সে দৃষ্টি কী তীক্ষ্ণ, কী কঠিন, কী অন্তর্ভেদী! আমিও ঐ রক্ত-জল করা অপার্থিব চাহনিতে সম্মোহিত হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, এ দৃশ্য সহ্য করা আমার পক্ষে আর বেশীক্ষণ সম্ভব হবে না। দেহের সমস্ত স্নায়ু অসাড় হয়ে আসছে। আমি মনের মধ্যে আপ্রাণ সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। আচমকা চিৎকার করে উঠলাম।—কে আপনারা?

আমার চিৎকার আমার কানেই ফিরে এল—ঐ অপার্থিব মূর্তি দুটির কাছ থেকে কোন উত্তরই পেলাম না। এর পরই দেখলাম আরও বীভৎস দৃশ্য! বর-বধূর মূর্তি দুটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে তাদের পরিবর্তে দুটি আস্ত নর-কঙ্কালকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখলাম।

আর এক মুহূর্ত নয়—প্রবল মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে আমি এক ছুটে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

সারা বিক্রমপুর তখন নিদ্রায় অচেতন।

কার্তিক ১৩৮৪

পুরনো দিনের মাছি

অনীশ দেব

খাওয়া-দাওয়া হই-হুল্লোড় সব মিলিয়ে আসর যখন একেবারে জমজমাট, ঠিক তখনই তাতা এসে শাড়ির আঁচলে ছোট্ট টান মেরে আমাকে একপাশে ডাকল। আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকাতেই ও চাপা গলায় বলল, 'দিদি, রুমুকা আসতে পারবে না। পিসিমণি বলল, ক'দিন ধরেই যেন কী হয়েছে—ঘর ছেড়ে একদম বেরোচ্ছে না। সবসময় জানলা-দরজা বন্ধ করে বসে আছে।'

তাতার কথায় বেশ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকা আসবেন না!

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দারুণ রেজাল্ট করেছি আমি। সেই উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়া হইচই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা সব এসেছে। অথচ রুমুকা আসবেন না!

রুমুকা আমাদের আপন কাকা নন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি। বাবার কীরকম যেন ভাই হন। ওঁদের বাড়িটা আমাদের খুব কাছেই—মাত্র তিন-চার মিনিটের পথ। একটা পুকুর পেরিয়ে যেতে হয়।

ছোটবেলায় যখন খেলাধুলো করতাম, তখন রুমুকাই ছিলেন আমদের কোচ। কবাডি খেলা হোক কিংবা ব্যাডমিন্টন, রুমুকা কখনই পিছিয়ে পড়তেন না। তাছাড়া দেশ-বিদেশের কতরকম খেলার কত যে খবর রাখতেন! আমার বা তাতার জন্মদিন নিয়ে মা বা বাপির তেমন উৎসাহ না থাকলেও রুমুকা কোথা থেকে এসে একেবারে হইহই কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। কখ্খনও আমাদের জন্মদিন ভুলে যাননি।

আমার ডাকনাম ঝিনি। কিন্তু রুমুকা সবসময় আমাকে ঝুনঝুনি বলে ডাকেন। বলেন, 'ঝুনঝুনির মধ্যে একটা তালের ব্যাপার আছে।' আমার আর তাতার স্কুলের পড়াশোনায় রুমুকা ছিলেন বিনিমাইনের গৃহশিক্ষক। যখন-তখন এসে পড়াতে শুরু করে দিতেন। কিন্তু ওঁর কাছে পড়তে কখনও আমাদের খারাপ লাগত না। বাপি সবসময় মাকে বলতেন, 'রমণীরঞ্জন যতদিন আছে তদ্দিন ওদের লেখাপড়া নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই।'

এই হলো রুমুকা—অথবা রমণীরঞ্জন সিনহা। লম্বা ফরসা চেহারা। টানটান শক্তপোক্ত শরীর। কপাল স্বাভাবিকের চেয়ে খানিকটা বেশি চওড়া। সাদা-কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি। গত দশ-বারো বছর ধরে আমি আর তাতা মানুষটাকে এই একই রকম দেখেছি।

রুমুকা বিয়ে করে নি। অল্পবয়েসে বিধবা হওয়া দিদিকে নিয়ে থাকেন। দিদির কোনো ছেলেমেয়ে নেই। ছোট দোতলা বাড়িতে ওঁরা দুজন, আর একজন কাজের লোক—সীতাদি।

রুমুকা ঠিক নিয়ম করে চাকরি করেননি। সবার কাছে যা শুনি তাতে এর মধ্যেই উনি গোটা বারো চাকরি পালটেছেন। একদিন এই বারবার চাকরি পালটানোর কথা জিগ্যেস করায় হেসে আমার বিনুনিতে আলতো টান মেরে বললেন, 'ঝুনঝুনি, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। আমার লাইফটা হলো যাকে বলে "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"।'

তবে এইবার চাকরি ছাড়ার পর রুমুকা ঠিক করেছেন, স্টেশনের কাছাকাছি একটা দোকান দেবেন। মাস দুয়েক ধরে তারই খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন।

দিন দশেক আগে যেদিন আমি উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের কথা বলতে গিয়েছিলাম, সেদিনও রুমুকা পড়ার বই-টই ছুঁড়ে ফেলে একেবারে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠেছেন বাচ্চাছেলের মতো। বলেছেন, 'এটা নিয়ে দারুণভাবে সেলিব্রেট করতে হবে, বুঝলি? সেদিন আমি তোদের গান গেয়ে শোনাব।'

অথচ আজ রুমুকা এলেন না! তাতাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু ও ফিরে এসে যা বলল তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। রুমুকার কী হয়েছে যে সবসময় জানলা-বন্ধ করে বসে আছেন? রুমুকা কি কোনো কারণে ভয় পেয়েছেন? যে মানুষটার জীবন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির', সে ভয় পেয়েছে! ঠিক করলাম আজ রাতেই রুমুকার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির পালা যখন শেষ হলো তখন রাত দশটা বেজে গেছে। মাকে আর বাপিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তাতাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম রুমুকার বাড়ির দিকে। বাপি সঙ্গে আসতে চাইছিলেন, কিন্তু আমি বারণ করলাম। একে তো তাতা যথেষ্ট বড়, ক্লাস টেনে পড়ে, ও সঙ্গে থাকছে—তা ছাড়া, এই তো কাছেই বাড়ি। দরকার হলে সীতাদি আমাদের এগিয়ে দেবে।

মা টিফিন কেরিয়ারে খাবার-দাবার সাজিয়ে দিলেন। আর পিসিমণির জন্য আলাদা বাক্সে মিষ্টি দিলেন। পিসিমণি খুব সাত্ত্বিক মানুষ। পুজো-আর্চা, গঙ্গাজল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

এখন বর্ষার সময়। যখন-তখন বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আমরা ছাতা নিয়ে বেরোইনি। মাত্র তো দশ-পনেরো মিনিটের ব্যাপার। তা ছাড়া টিফিন কেরিয়ার, টর্চ, ছাতা এসব একসঙ্গে সামাল দেওয়া ভারি মুশকিল।

কাদা প্যাচপেচে একটা জায়গা সাবধানে ডিঙিয়ে আমি তাতাকে জিগ্যেস করলম, 'তাতা, তুই রুমুকাকে আসার জন্যে বলেছিলি?'

তাতা বলল, 'না। আমি বাড়তে ঢুকতেই পিসিমণি ওই খবর দিল। তারপর বলল, তুই ওপরে গিয়ে একবার ডেকে দ্যাখ। তখন আমি দোতলার ছাদের ঘরে গেছি। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ। শুধু ভেতর থেকে একটা হুসহুস শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হলো, রুমুকারই গলার আওয়াজ। তখন আমি রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুসহুস শব্দটা থেমে গেল। বেশ ভয় পাওয়া গলায় রুমুকা চেঁচিয়ে উঠল, কে? কে? গলাটা কেমন যেন পিকিউলিয়ার শোনাল। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কোনোরকমে বললাম, আমি তাতা। আমাদের বাড়ি যাবে না? অমনি সব চুপচাপ হয়ে গেল। কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না আর। আমি আরও দু'তিন বার রুমুকার নাম ধরে ডাকলাম। কিন্তু সেই নো রিপ্লাই। তখন আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

তাতার কথা শুনে, আমার অবাক হওয়ার ব্যাপারটা আরও বাড়ছিল। মাথা ঠিকমতো কাজ করছিল না।

আমরা পুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। পুকুরটা জলে জলে টইটম্বুর। অন্ধকারে জল ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। দু'এক জায়গায় আলোর টুকরো ঠিকরে পড়েছে। ব্যাঙদের বর্ষা-অধিবেশন এখানে আরও জোরদার। জোলো বাতাসে পুকুরপাড়ের দুটো মাঝারি গাছে এপাশ-ওপাশ দুলছে। একটু দূরেই রুমুকাদের বাড়ি। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাড়ির কোথাও কোনো আলো চোখে পড়ছে না। এর মধ্যেই ওঁরা সবাই শুয়ে পড়লেন নাকি?

মনের মধ্যে একটা শিরশিরে অস্বস্তি নিয়ে রুমুকাদের বাড়ি পৌঁছলাম। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কা দেবার পর সীতাদি দরজা খুলল। আমাদের দেখেই চোখ গোল গোল করে বলল, 'তোমরা এত রাতে!'

আমি বললাম, 'পিসিমণি কোথায়? রুমুকা কোথায়?'

'দিদিমণি পুজো করছে—ঠাকুরকে শোয়াচ্ছে। আর দাদাবাবু ওপরে—বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।'

আমি আর তাতা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মিষ্টির বাক্সটা সীতাদির হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা পিসিমণিকে দিও। বোলো আমরা এসেছি, রুমুকার ঘরে গল্প করছি।'

আর সময় নষ্ট না করে আমরা দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোলাম।

সিঁড়িতে একটা বাল্ব জ্বলছে। তার আলোটা কেমন ঘোলাটে। সিঁড়ির অর্ধেক উঠলেই বাড়ির পিছন দিকের অগোছালো বাগানটা দেখা যায়। তবে এখন, অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু বাতাসে গাছের পাতার অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

দোতলার অর্ধেকটা ছাদ। আর বাকিটা রুমুকার ঘর। অন্ধকার ছাদে আরও গাঢ় একতাল অন্ধকারের মতো ঘরটা একপাশে দাঁড়িয়ে। ঘরে আলো জ্বলছে কিনা বোঝার উপায় নেই, কারণ দরজা-জানলা সব বন্ধ। ঘরের দরজার কাছে গিয়ে আমি 'রুমুকা রুমুকা' বলে ডাকলাম। ধাক্কাও দিলাম কয়েকবার। ঘরের ভেতরে বই-টই জাতীয় কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। তাতা পিছন থেকে আমার হাত ধরে টান মারল। চাপা গলায় বলল, 'চল চল—'

আমি ওর কথা গ্রাহ্য না করে আবার ডাকলাম।

কোনো সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করেও যখন সাড়া পেলাম না, তখন চেঁচিয়ে বললাম, 'রুমুকা, আমি আর তাতা তোমার জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি। আমার পরীক্ষার রেজাল্টে তুমি খুশি হওনি? তাই নেমন্তন্নে গেলে না!'

কোনো জবাব এল না ভেতর থেকে। তাতা আবার আমার হাত ধরে টান মারল। কিন্তু আমার কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে বললাম, 'তুমি দরজা না খুললে আমরা দু'জন সারারাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকব, বৃষ্টিতে ভিজব।'

এমন সময় মেঘ ডেকে উঠল। বিদ্যুতের রেখা ঝলসে গেল আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আর প্রায় একই সঙ্গে খটাস করে খুলে গেল রুমুকার ঘরের দরজা। দরজায় দাঁড়িয়ে 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' মানুষটা। কিন্তু আলোছায়ার মাঝেও স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ওঁর মাথাটা বেশ ঝুঁকে পড়েছে। যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সেই মানুষটার মুখে-চোখে কী যে দেখলাম—আমার চোখে জল এসে গেল পলকে—'রুমুকা!'

রুমুকা আমার হাত ধরে পরম স্নেহে মাথায় হাত বোলালেন, বললেন, 'ভিজিসনি তো? আয়, আয়, ভেতরে আয়। আয়, তাতা—'

রুমুকার ঘরে ঢুকতেই চট করে দরজা বন্ধ করে দিলেন রুমুকা। তারপর বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বিছানায় গিয়ে বসলেন। মাথাটা কিন্তু সামান্য ঝুঁকেই রইল।

রুমুকার ঘরে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হলো বই। দেওয়ালের তাকে, বিছানায়, মেঝেতে এলোমেলোভাবে রাখা অসংখ্য বই। ওঁর অভ্যাস হলো পেনসিল দিয়ে বইয়ের পাতায় পাতায় অসংখ্য মন্তব্য লেখা। উনি বলেন, 'খুঁটিয়ে কোনো বই পড়তে হলে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সময় মনের ভাব, মতামত, মন্তব্য এসব লিখে রাখা দরকার। তাহলে বইটা মনে দাগ কেটে যায়। তা ছাড়া পরে বইটা আবার পড়ার সময় ওই মন্তব্যগুলো খুব সাহায্য করে।' রুমুকার এই অভ্যাসটা আমি খনিকটা রপ্ত করে ফেলেছি। দেখেছি, তাতে সত্যিই পড়াশোনার সুবিধে হয়।

রুমুকার বিছানা নীল রঙের একটা বেডকভারে ঢাকা। তার ওপরে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে চারটে বই, একটা হলুদ রঙের পেনসিল, আর একটা সাদা ইরেজার। এছাড়া আরও একটা অদ্ভুত জিনিস পড়ে আছে বিছানায়—একটা ছোট লাঠি।

ঘরের ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা একটা মাঝারি টেবিলের ওপরে আমি টিফিন কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলাম। চোখের জল মুছে রুমুকাকে দেখলাম ভালো করে।

রুমুকার সারা শরীরে কেমন এক অবসন্ন ভাব। ফরসা রঙ কিছুটা মলিন মনে হলো। কপালে আর চোখের নিচে ভাঁজও যেন অনেক বেশি। পরনের গেঞ্জি আর পাজামা অন্যদিনের মতো ধোপদুরস্ত নয়।

রুমুকা আমার দিকে তাকালেন। ওঁর উজ্জ্বল চোখে কেমন এক ভয়ার্ত আকুল ভাব। আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। তাতা কখন যেন আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে। বুঝলাম, ও ভয় পেয়েছে। এই রুমুকাকে ও চিনতে পারছে না। আমার কাছেও এই মানুষটা অচেনা।

রুমুকা বললেন, 'বোস—তোরা বোস—'

ঘরে একটা টুল, একটা বেতের মোড়া, আর একটা চেয়ার রয়েছে। আমি বিছানায় রুমুকার প্রায় মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। তাতা মোড়াটা আমার কাছটিতে টেনে নিয়ে এসে বসল।

রুমুকা হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'ঝুনঝুনি, তোর রেজাল্টের খাওয়া-দাওয়া হইচই কেমন হলো?'

আমি বিছানায় রাখা লাঠিটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'পড়াশোনা করতে তোমার আজকাল লাঠি লাগছে নাকি?'

রুমকা কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'না রে, লাঠিটা নিয়েছি......' হঠাৎই চুপ করে গেলেন।

আমার রাগ হলো। অভিযোগের সুরে বললাম, 'তুমি তো আমাদের সেই ছোটবেলা থেকে সত্যি কথা বলতে শিখিয়েছে। আর তুমি নিজেই সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ! ঠিক করে বলো তো তোমার কী হয়েছে? ঘর ছেড়ে বেরোচ্ছ না, দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে আছ—কী ব্যাপার বলো তো?'

রুমকা জেদীর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলেন।

আমি তাতার দিকে ফিরে বললাম, 'তাতা, ঘরের জানলা-দরজাগুলো খুলে দে তো—'

ইলেকট্রিক শক-খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন রুমুকা। ওঁর চোখ-মুখে পলকে নেমে এসেছে গাঢ় আতঙ্কের ছায়া। ভয়ার্ত গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'খুলিস না! খুলিস না! খুললেই ওগুলো ভেতরে ঢুকে পড়বে।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'ওগুলো? ওগুলো মানে?'

'মাছি! মাছি!' প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন রুমুকা। তারপর ধপাস করে বসে পড়লেন বিছানায়। ডান হাতের শক্ত মুঠোয় তুলে নিলেন খাটো লাঠিটা। ঘরের চারপাশে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন একবার।

বিছানায় লাঠিটা রাখার মানে এবার বুঝতে পারলাম আমি। কিন্তু লাঠি দিয়ে মাছি তাড়াতে এত মরিয়া কেন রুমুকা?

আমি ওঁকে সাহস যোগানোর জন্য বললাম, 'মাছিতে এত ভয় পাচ্ছ কেন? মাছি কি তোমাকে খেয়ে ফেলবে!'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন রুমুকা। তারপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুই বুঝবি না, ঝুনঝুনি। এ সাধারণ মাছি নয়....'

'মউমাছি?' আমি পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম।

রুমুকা হাসলেন না। আমার দিকে ভয়ের চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'মউমাছি নয়। পুরনো দিনের মাছি।'

'পুরনো দিনের মাছি! তার মানে?'

হাতের লাঠিটা বিছানায় রেখে বিষণ্ণ হাসলেন রুমুকা। অস্পষ্ট স্বরে বললেন, 'বললে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না....'

'আমি করব। তুমি বলো। সব তোমাকে বলতেই হবে। কেন তুমি ক'দিন ধরে এমনই করছ। কী হয়েছে তোমার?

আমার জেদ রুমুকা জানেন। তাই এমনভাবে উনি বিছানায় গুছিয়ে বসলেন যে, আমি বুঝতে পারলাম, সবকিছু খুলে বলার জন্য উনি মনে মনে নিজেকে তৈরি করছেন। রুমুকার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, ওঁর ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণার একটা তোলপাড় চলছে। আমার ভীষন মায়া হচ্ছিল।

আচমকা বাজ পড়ার শব্দে আমাদের কানে যেন তালা লেগে গেল। মেঘের গুড়গুড় শব্দ মিলিয়ে যেতেই বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেলাম। ঘরের পাখাটা ফুলস্পিডেই ঘুরছে, কিন্তু জানলা-দরজা সব বন্ধ থাকায় কেমন একটা গুমোট ভাব।

রুমুকা খুব সিরিয়াস মুখ করে বললেন, 'তোদের সব বলছি, কিন্তু আর কাউকে এ-কথা বলিস না। তাহলে আমাকে সবাই পাগল ভাববে।

আমি ঘাড় নেড়ে কথা দিলাম। তাতা বলল, 'কাউকে বলব না। মরে গেলেও বলব না।'

'শোন তাহলে...' বেশ কয়েকবার ঘরের এপাশ-ওপাশ দেখলেন রুমুকা। তারপর হাতে হাত ঘষে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করে থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'আমার বই পড়ার নেশার কথা তো তোরা জানিস। এও জানিস যে, বাই পড়ার সময় আমি বইয়ের মার্জিনে পেনসিল দিয়ে নোট লিখি। একজন ফ্রেঞ্চ ম্যাথামেটিশিয়ান পিয়ের দ্য ফার্মা-র এরকম নোট লেখার অভ্যেস ছিল। ১৬২১ সালে তিনি আর এক ম্যাথামেটিশিয়ান ডায়োফ্যান্টাসের লেখা "অ্যারিথমেটিকা" নামের একটি বই কিনেছিলেন। সেই বইয়ের মার্জিনে তিনি এমন একটি মন্তব্য লিখে গিয়েছিলেন যা থেকে "ফার্মাজ্ লাস্ট থিয়োরেম" নামে একটি উপপাদ্যের জন্ম হয়। এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করতে অঙ্কবিদদের ৩২৭ বছর লেগে গিয়েছিলে।'

কথা বলতে বলতে রুমুকা নিজের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে পাচ্ছেন বলে আমার মনে হলো। তা না হলে উনি মাছির কথা থেকে ম্যাথামেটিশিয়ানের কথায় যেতেন না।

ঘরের টিউব লাইটের আলো একপাশ থেকে রুমুকার কপালে এসে পড়েছে। চকচকে সেই জায়গায় একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

'ফার্মার কথা থাক, আমার কথা বলি—' রুমুকা আবার বলতে শুরু করলেন, 'বইয়ের মার্জিনে নোট লেখার জন্যে আমি একসঙ্গে এক ডজন করে পেনসিল কিনে রাখি। সেগুলো শেষ হয়ে হয়ে যখন একটা পেনসিলে এসে ঠেকে তখন আমি কলকাতা থেকে আবার নতুন এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে আসি। ঝুনঝুনি তো জানিস, কোহিনূর পেনসিল আমার বরাবরই বেশি পছন্দ। কলকাতায় গিয়ে কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পটুয়াটোলার একটা পাইকিরি খাতা-পেনসিলের দোকান থেকে আমি সবসময় কোহিনুর পেনসিল কিনি। শুধু পেনসিল কেন, কাগজ, ইরেজার এসবও আমি ওই দোকান থেকেই কিনি।

'ঠিক সাত দিন আগে আমি কয়েকটা কাজে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আগের পেনসিলগুলো শেষ হয়ে গিয়ে একটায় এসে ঠেকেছিল। তাই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এসে ঠিক করলাম এক ডজন পেনসিল কিনে নিয়ে যাব।

'সেদিনটা ছিল মেঘলা। দুপুর দুটো নাগাদ আমি পটুয়াটোলার সেই দোকানটায় গেলাম। আর তারপর থেকেই যতসব অদ্ভুত ব্যাপার শুরু হলো—'

রুমুকা থামলেন। কপালে হাত বোলালেন—বোধহয় ঘাম মুছলেন। চোখের চশমাটা অকারণেই বারকয়েক নাড়াচাড়া করলেন।

তাতা কৌতূহলের গলায় জিগ্যেস করল, 'কী শুরু হলো?'

রুমুকা কয়েকবার ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করলেন, 'দোকানটার নাম গ্লোব কনসার্ন। মাঝারি মাপের একটা রঙচঙে সাইনবোর্ডে শৌখিন হরফে নাম লেখা। দোকানটার সুনাম যথেষ্টই আছে, কারণ গলির মধ্যে হলেও সেখানে সবসময় খদ্দেরের ভিড় লেগেই থাকে।

'কিন্তু সেদিন দোকানটার কাছাকাছি গিয়েই আমি খানিকটা তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'দুপুরের মেঘলা আকাশ থেকে অদ্ভুত এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই অপার্থিব আলোয় দেখলাম, দোকানটার সামনের পিচের রাস্তাটা একেবারে পালটে গেছে। কোথায় সেই খানাখন্দে ভরা ময়লা পিচের পথ! তার বদলে মসৃণ পরিচ্ছন্ন এক শানবাঁধানো চত্বর চোখে পড়ল আমার। চত্বরটা গলির তুলনায় মাপে অনেক বড়। আমি অবাক হয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগলাম।

'ঠিক তখনও আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি খেয়াল করলাম।

'দোকানটা এমন এলাকায় যেখানে শব্দের ঝালাপালা সর্বদা লেগেই আছে। ট্রামের ঘরঘর, বাস-গাড়ির শব্দ, রিকশ, সাইকেল ভ্যান, বইয়ের স্টল, মুটে, পথচারী—কী নেই সেখানে ! কিন্তু সেদিন ওই শানবাঁধানো চত্বরে পা দেওয়ামাত্রই চারপাশের হরেকরকম শব্দ পলকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সব চুপচাপ। যেন ভুল করে কোনো উপাসনা -মন্দির আমি পা দিয়ে ফেলেছি।

'একটু দূরে আমি দোকানটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে গ্লোব কনসার্নের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল না, তার বদলে রঙচটা লম্বা একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলাম। তার অক্ষরগুলোর এমনই দুর্দশা যে ভালো করে কিছু পড়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া সবকিছু কেমন ঝাপসা লাগছিল আমার চোখে। দোকানটার দু'পাশে নকশা-কাটা দুটো থাম। তাদের গায়ে খোদাই করে কী সব যেন লেখা। তবে ডান দিকের থামে একেবারে শেষ লাইনে ১৯০৬ সংখ্যাটা লেখা ছিল এটা মনে আছে।

'আমি খানিকটা ইতস্ততভাবে পা ফেলে দোকানে গিয়ে ঢুকলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, যে-দোকানটা খাতা-পেনসিল-কাগজ এসবে একদম ঠাসা থাকে সেটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। আর দোকানটাকেও বেশ অন্যরকম লাগছে।

'সামনে পালিশ করা কাঠের লম্বা কাউন্টার। কাউন্টারের ওপাশে কেউ নেই। দোকানের মালকিকে আমি চিনি—মানে, মুখ চিনি। বেঁটে মতো, মাথায় টাক, ধুতি-পাঞ্জাবি পরেন, পান খাওয়ার অভ্যেস আছে। তাঁকে কোথাও দেখলাম না। আর যে-তিনজন সেল্‌সম্যানকে দোকানে বরাবর দেখেছি, তাদেরও পাত্তা নেই। দোকানের ভেতরে যে-সব র‍্যাক দাঁড় করানো রয়েছে সেগুলো সব খালি।

'দোকানের পিছন দিকের দেওয়ালে একটা বড় পেন্ডুলাম ঘড়ি চোখে পড়ল আমার। একটা প্যাঁচানো তারের সঙ্গে ধাতুর পিণ্ডটা ঝুলছে। আর ঘড়িটার সব কলকব্জা একটা কাচের গ্লোবের মধ্যে বসানো। ফলে বাইরে থেকেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া কাজকর্ম সবকিছু দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটা দেখেই বেশ পুরনো মনে হচ্ছিল। পরে বইপত্র পড়ে জেনেছি, ওই ঘড়ি কম করেও দেড়শো বছরের পুরনো। এগুলোকে বলা হতো "ফোর হানড্রেড ডে ক্লক"। কারণ, একবার দম দিলে এই ঘড়ি চারশো দিন চলত। সেসময়ে এই ঘড়িগুলো ইওরোপ আর আমেরিকায় খুব পপুলার ছিল। এত পুরনো পেন্ডুলাম ঘড়ি এই দোকানে কোথা থেকে এল কে জানে! তা ছাড়া দোকানেও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! বেশ কিছুক্ষণ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেটে গেল। তারপর আমি দু'তিনবার "কেউ আছেন?" বলে হাঁক মারলাম। ওই নিস্তব্ধ পরিবেশে আমার কথাগুলো কেমন

এক অদ্ভুত ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলল। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না, আর কাউকে দেখতেও পেলাম না। আমি এপাশ-ওপাশ নজর চালিয়ে দোকানদারকে খুঁজছি, হঠাৎই দেখি ঢ্যাঙা মতন একজন মানুষ কাউন্টারের ওপাশে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এই মানুষটা কোথা থেকে আচমকা এসে উদয় হলো তা বলতে পারব না, তবে একে আমি আগে কোনোদিন দেখিনি।

'লোকটি বেশ লম্বা আর রোগা। গাল দুটো বসে গিয়ে দুটো গর্ত তৈরি হয়ে গেছে। তার কপালে অনেক ভাঁজ। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। দু'চোখে সুর্মাজাতীয় কিছু লাগানো। আর তার জন্যে চোখ দুটোকে চেরা গর্ত বলে মনে হচ্ছে। বয়েস সত্তর-টত্তর হবে। পরনে ঘিয়ে-রঙা সাটিনের ফুলহাতা জামা। তাতে বুকের বাঁ দিক ঘেঁষে বোতামের সারি নেমে গেছে। আর চওড়া পাড় শান্তিপুরী ধুতি বেশ যত্ন করে কোঁচানো।

'লোকটির গোটা মুখ আর হাত বেশ ফ্যাকাসে—যেন হোয়াইট ওয়াশ করা। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। সে বিড়বিড় করে কী যেন বলল আমাকে, কিন্তু আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। শুধু দেখলাম, আর জিভ আর মুখের ভেতরটা ঠোঁটের মতোই টকটকে লাল—যেন এইমাত্র এক বোতল আলতা গিলে এসেছে।

'লোকটিকে ঘিরে অদ্ভুত এক আবছা কুয়াশা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। আর বর্ষার গুমোটের মধ্যেও আমার একটু শীত-শীত করছিল। আমি হতভম্ব চোখে মানুষটাকে দেখছিলাম।

'লোকটি যেন হাওয়ায় ভেসে আমার কাছে এগিয়ে এল। আমাদের দুজনের মাঝে শুধু ওই কাঠের কাউন্টার। লোকটির ঠোঁট নড়ে উঠল আবার। বোধহয় জিগ্যেস করল, কী চাই। আমি ইতস্তত করে এক ডজন কোহিনুর এইচ. বি. পেনসিলের কথা বললাম। এমন সময় দু' তিনজনের কান্নার শব্দ আমার কানে এল। কয়েকজন মহিলা দোকানের আড়ালে কোথাও বসে বুক চাপড়ে মড়াকান্না কাঁদছে। সে-কান্না ভারি অদ্ভুত। কারণ কান্নার এক-একটা টান প্রায় দু'তিন মিনিট করে চলছে—তার মাঝে দম নেবার জন্যে কেউ একটুও থামছে না।

'কান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের শব্দও হালকাভাবে কানে এল। আর সেই সঙ্গে অগুরুর মতো গন্ধও যেন টের পেলাম। বৃদ্ধ দোকানদার পেনসিল নিয়ে আসার জন্যে দোকানের পিছন দিকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তখনই দোকানের ভেতর দিকে মেঝেতে কালো কাপড়ে ঢাকা একটা খাঁচা আমার নজরে পড়ল।'

রুমুকা দম নেবার জন্য একটু থামতেই আমি চাপা গলায় জিগ্যেস করলাম, 'কীসের খাঁচা, রুমুকা?'

রুমুকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জানি না, তবে তার ভেতরে কিছু একটা ছিল। কারণ, সেটা নড়ছিল, খাঁচার ফাঁকফোকর দিয়ে বোধহয় মাথা বাড়াচ্ছিল। ফলে কালো কাপড়টা বারবার এদিক-ওদিক উঁচু হয়ে উঠছিল। খাঁচার ভেতর থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু, আগেই তো বলেছি, প্রত্যেকটা শব্দ কেমন ফাঁপা—আর তার অদ্ভুত এক প্রতিধ্বনিময় রেশ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'একটু পরেই দোকানদার কাউন্টারের কাছে এসে উদয় হলো। তার মুখ আরও বিবর্ণ, আরও ফ্যাকাসে লাগছে। ভাবলেশহীন মুখ দেখে বোঝা যায় কান্না-টান্নার শব্দ সে মোটেই শুনতে পাচ্ছে না। অথবা, শুনতে পেলেও আমল দিচ্ছে না।

'লক্ষ্য করলাম, তাকে ঘিরে এখনও সেই রহস্যময় কুয়াশা। আর সেই সঙ্গে একটা নতুন জিনিসও চোখে পড়ল। চার-পাঁচটা ডুমো ডুমো নীল মাছি তার মাথার কাছে ভনভন করছে, কখনও মুখে-চোখে বসে পড়ছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, লোকটা মোটেই মাছিগুলোকে তাড়াচ্ছে না। ওগুলো মুখের ওপরে বসে আছে তো বসেই আছে।

'লোকটা এক ডজন পেনসিল নির্বিকারভাবে এগিয়ে দিল আমার দিকে। আমি টাকা দিতেই ঠোঁট বেঁকিয়ে সামান্য হাসল। তারপর এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল, বলল, এ টাকা চলবে না। এমনই নিয়ে যান।

'না, লোকটার কথা আমি শুনতে পাইনি, তবে ওর ঠোঁট নাড়া দেখেছি। আর তাই থেকেই হয়তো কথাগুলো আন্দাজ করে নিয়েছি। তা যাই হোক, পেনসিলগুলো মুঠো করে হাতে নেওয়ামাত্রই আমি একটা ধাক্কা খেলাম ঃ নীল রঙের পেনসিলগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা। তাছাড়া কোহিনূর পেনসিল নীল রঙের হয় বলেও কখনও শুনিনি।

'আমি হঠাৎই ভয় পেয়ে গেলাম। দোকান ছেড়ে রওনা হয়ে গেলাম চটপট। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শানবাঁধানো চত্বরটা পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তায় পা দিতেই আমার ঘোর কেটে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই রোজকার চেনাজানা শব্দের ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার দু'কানে। ভালো করে চেয়ে দেখি আমি বহুদিনকার চেনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।'

কথার মাঝে একটু ফাঁক পেয়েই তাতা জিগ্যেস করল, 'পিছন দিকে তাকিয়ে দোকানটাকে দেখতে পেলে না?'

রুমুকা বিমূঢ়ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'হাঁ, দেখতে পেয়েছি। সবকিছু আগের মতোই। কোথাও কোনো শান-বাঁধানো চত্বর নেই। পুরনো দোকান, লম্বা সাইনবোর্ড, নকশা-কাটা থাম—কিছুই চোখে পড়ল না আমার। যেন গোটা ব্যাপারটাই আমার মনের ভুল।'

রুমুকা শেষ দিকের কথাগুলো বিড়বিড় করে বলছিলেন। কান পেতে বেশ কষ্ট করে শুনতে হচ্ছিল। আমি রুমুকার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলাম, 'ঠিক ধরেছ তুমি। গোটা ব্যাপারটাই তোমার মনের ভুল।'

রুমুকা মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না রে, মনের ভুল নয়, এর অন্তত দুটো প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে—'

'কী প্রমাণ?' একরোখা গলায় জিগ্যেস করলাম আমি।

'পেনসিলগুলো তোরা একবার দ্যাখ, তাহলেই খানিকটা বুঝতে পারবি।'

এই কথা বলে রুমুকা দেওয়ালের তাকে রাখা দু'থাক বইয়ের ফাঁক থেকে কয়েকটা নীল রঙের পেনসিল বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

পেনসিলগুলো নতুন, এখনও কাটা হয়নি।

রুমুকা বললে, 'কোম্পানির নামটা পড়ে দ্যাখ—'

আমি আর তাতা ঝুঁকে পড়ে নামটা পড়লাম। এফ. এন. গুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানি। এই কোম্পানির পেনসিলের কথা কখনও আমরা শুনিনি।

রুমুকা বললেন, 'ব্রিটিশ আমলে, আমাদের ছোটবেলায়, এই পেনসিল চালু ছিল। এফ. এন. গুপ্তদের কারখানা ছিল নর্থ ক্যালকাটায়—সিঁথিতে। এই পেনসিল কমপক্ষে চল্লিশ বছর হলো বাজার থেকে উঠে গেছে। এখন কোনো দোকানে এই পেনসিল পাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কী?'

রুমুকা কোনো উত্তর না দিয়ে কয়েকটা করে পেনসিল আমার আর তাতার হাতে দিলেন। ওগুলো ধরামাত্রই আমরা চমকে উঠে একটা ভয়ের শব্দ করে ফেললাম, ওগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দিলাম বিছানায়।

পেনসিলগুলো যেন বরফ দিয়ে তৈরি।

রুমুকা বিড়বিড় করে বললেন, 'এটাই বলতে চাইছিলাম। সেইদিন থেকেই এই পেনসিলগুলো এরকম কনকনে ঠাণ্ডা—এটাই একটা প্রমাণ যে, ব্যাপারটা আমার মনের ভুল নয়।'

বুককাঁপানো শব্দে মেঘ ডেকে উঠল বাইরে। বৃষ্টির শব্দ কয়েক গুণ বেড়ে গেল যেন। রুমুকার টেবিল-ঘড়িতে রাত প্রায় পৌনে এগারোটা। আমরা বাড়ি ফিরব কী করে কে জানে! মা-বাপি নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। কিন্তু রুমুকার দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কোনো কথা ভাবতে পারছিলাম না।

তাতা ফস করে জিগ্যেস করে বসল, 'আর একটা প্রমাণ কোনটা?'

রুমুকা নড়েচড়ে বসলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে নামিয়ে রাখলেন বিছানায়। আঙুল দিয়ে বেশ কয়েকবার চোখ ঘষলেন, নাকের গোড়াটা ম্যাসাজ করলেন। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের সিলিং-এর দিকে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তাতার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'ওই মাছিগুলো। ওগুলোই দ্বিতীয় প্রমাণ যে, সেদিন আমি ভুল দেখিনি।'

আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, 'রুমুকা, তুমি নিশ্চয়ই সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ভেবেছ? তুমি যদি ভুল না দেখে থাকো, তাহলে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটার কী মানে হতে পারে? একটা কিছু মানে তো নিশ্চয়ই থাকবে।'

রুমুকা মাথা নাড়লেন একমত হয়ে। চশমাটা চোখে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে একটু অন্যরকমভাবে বসলেন। তারপর বললেন, 'সেদিনের ব্যাপারটা নিয়ে আমি বোধহয় কম করেও কয়েক হাজার বার ভেবেছি রে, ঝুনঝুনি। তাতে যে-মানেটা বারবার বেরিয়ে আসতে চাইছে সেটা খুব ভালো নয়। শুনলে তোদের মন খারাপ হয়ে যাবে....'

আমি জেদী গলায় বললাম, 'হোক মন খারাপ, তোমাকে বলতেই হবে। তুমি একা একা এরকম কষ্ট পাচ্ছ, আমার একটুও ভালো লাগছে না।'

'তাহলে শোন। আমার যা মনে হয়েছে বলছি।' রুমুকা ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মহাবিশ্বে যে-সময়ের স্রোত, তারই কোথাও একটা গরমিল হয়ে গিয়েছিল সেদিনের সেই মেঘলা দুপুরে। এ-ধরনের ব্যাপারকে অনেকে টাইম-স্লিপ বলেন। এই টাই-স্লিপের জন্যেই হয়তো সেদিন হঠাৎ করে আমি ১৯০৬ সালে স্থাপিত হয়েছে এমন একটা দোকানঘর দেখে ফেলেছিলাম। দোকানটার সবকিছুই অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছরের পুরনো—এমনি ওই দোকানদার,পেনসিল, খাঁচা, মাছি সবই পুরনো আমলের। সুতরাং বলতে পারিস কোনো এক ঘটনাচক্রে এখনকার সময়ের সঙ্গে পুরনো সময়ের একটা যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল—'

'তাহলে কি বলতে চাও পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ওই দোকানটার জায়গায় ওইরকম একটা ভূতুড়ে দোকান ছিল?'

'আমি প্রথমটায় তাই ভেবেছিলাম। তাই ও-পাড়ায় গিয়ে খোঁজখবরও করেছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। শুধু এটা জেনেছি, এখনকার দোকানটা আঠেরো বছরের পুরনো। তার আগে ওখানে একটা চীনে লন্ড্রি ছিল।'

'আচ্ছা, রুমুকা, মাছিগুলো ওরকমভাবে উড়ছিল কেন? এমনিতে তো মরা মানুষের মুখে ওরকম মাছি বসে—'

রুমুকা ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন, বললেন, 'সেটাই তো ভারি অদ্ভুত। আমার যা মনে হয়েছে সেটা ভালো নয়—তবু তোরা যখন জোর করছিস তখন বলি। আমার ধারণা, ও দোকানদার ভদ্রলোক—ঠিক ইয়ে—মানে, জীবিত মানুষ ছিলেন না—হয়তো সদ্য মারা গেছেন। দোকানের ভেতর থেকে সেইজন্যেই হয়তো কান্নাকাটি আর খোল-করতালের শব্দ ভেসে আসছিল। সেই সঙ্গে অগুরুর গন্ধ, কুয়াশা আর মাছি...সব মিলিয়ে আমার মন বলছে, লোকটা সাধারণ মানুষ ছিল না—অন্য কিছু ছিল। তার ঠোঁট আর মুখের ভেতরটা টকটকে লাল ছিল কেন আমি বলতে পারব

না। আর কালো কাপড়ে ঢাকা ওই খাঁচায় কী ছিল তাও আমি আন্দাজ করতে পারিনি। কিন্তু যতই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি ততই আমার ভয় করতে থাকে।

'সময়ের বিশাল একটা ফারাক ডিঙিয়ে আমার কিছুক্ষণের জন্যে যোগাযোগ হয়েছিল পুরনো সময়ের সঙ্গে। সেখান থেকে, কেমন করে জানি না, পেনসিলগুলো আর মাছিগুলো চলে এসেছে আমার কাছে। এই দুটো প্রমাণ সবসময় আমাকে ওই মেঘলা দুপুরটার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া তোরা তো জানিস, ক'মাস ধরে আমি একটা দোকান খোলার কথা ভাবছি। দোকান খোলার পর আমি থাকব কাউন্টারের ওপাশে, দোকানের ভেতরে। তখন টাইম-স্লিপের দুর্ঘটনায় কোনো আগামী দিনের খদ্দের হয়তো এসে দাঁড়াবে আমার দোকানে—এক ডজন পেনসিল চাইবে। তখন....' হঠাৎ থেমে গিয়ে মাথার চুলের গোছা চেপে ধরলেন রুমুকা, অদ্ভুত গলায় বললেন, 'জানিস, যখন আমি এইসব কথা ভাবি তখন যেন পাগল-পাগল লাগে। মনে হয়, মনে হয়....'

আমি ঝুঁকে পড়ে রুমুকাজর হাত চেপে ধরলাম। টের পেলাম, ওঁর হাত ঘামছে। আমি বললাম, 'তুমি এসব আজগুবি চিন্তা ভুলে যাও। তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার কিচ্ছু হবে না।'

রুমুকা অবসন্ন গলায় বললেন, 'ভুলতে হয়তো পারতাম। কিন্তু পারছি না শুধু ওই মাছিগুলোর জন্যে। ওরা সুযোগ পেলেই আমার কাছে চলে আসে। আমি হাজার চেষ্টা করেও ওদের তাড়াতে পারি না। ওরা কিছুতেই আমাকে রেহাই দেবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। শুধু ভাবলাম, রুমুকার কোথাও ভুল হচ্ছে না তো! মাছিগুলো হয়তো সাধারণ মাছি, পরনো দিনের মাছি নয়।

'ঝুনঝুনি, তুই কী ভাবছিস আমি জানি। সেইজন্যেই তো বললাম, কাউকে এ-গল্প বলিস না। তাহলে সবাই আমাকে পাগল ভাববে, আর এই সত্যি ঘটনাকেও ভাববে গল্প।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুমুকা বললেন, 'যাকগে, অনেক রাত হয়ে গেছে। তোরা এবার বাড়ি যা। সীতাকে বল, তোদের এগিয়ে দেবে। কিন্তু ছাতা-টাতা আনিসনি, একেবারে যে ভিজে যাবি! নিচে দিদির কাছ থেকে বরং একটা ছাতা নিয়ে যা। আমি তোদের টিফিন কেরিয়ারের খাবারগুলো একটু চেখে দেখি—'

আমি আর তাতা উঠে দাঁড়ালাম। মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেছে। রুমুকা আমাদের সঙ্গে ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে এলেন।

তাতা দরজা খুলতেই বৃষ্টির ফোঁটা মেশানো জোলো হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল আঁকাবাঁকা রেখায়। আর একই সঙ্গে রুমুকা একটা ভয়ের চিৎকার করে উঠলেন।

আমি আর তাতা ঘুরে তাকালাম রুমুকার দিকে। উনি তখন পাগলের মতো দু' হাত নেড়ে 'হুস হুস' শব্দ করে কী যেন তাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

একটু ভালো করে নজর করতেই টিউব লাইটের আলোয় চকচকে নীল মাছিগুলোকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। চারটে কি পাঁচটা ডুমো ডুমো মাছি। রুমুকার মাথা ঘিরে উড়ছে। শত তাড়া খেয়েও ওরা যাচ্ছে না, যেন রুমুকার গল্প শেষ হওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' মানুষটার মুখ সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মাছিগুলোর ছোঁয়া থেকে বাঁচতে ঘরে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন প্রাণভয়ে।

আমি ছুটে এগিয়ে গেলাম রুমুকার কাছে। হাত নেড়ে তাড়াতে চাইলাম মাছিগুলোকে। আর বারবার চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম, 'ভয় পেয়ো না, রুমুকা। একটুও ভয় পেয়ো না। এগুলো তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না। দ্যাখো না, এক্ষুণি তাড়িয়ে দিচ্ছি।'

মাছিগুলো তাড়াতে গিয়ে আমি হাঁফিয়ে পড়ছিলাম, কিন্তু তখনও ভয় পাইনি। মাছিগুলো সাধারণ মাছির তুলনায় একটু বড় এই যা—তার বেশি কিছু নয়।

কিন্তু হঠাৎ হাত নাড়তে গিয়ে দুটো মাছি আমার হাতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল। শরীরের ভেতরে একটা বরফের স্রোত বয়ে গেল। বুঝলাম, রুমুকা একটুও ভুল বলেননি। এগুলো সত্যিই পুরনো দিনের মাছি।

আমি আর সইতে পারলাম না। চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। বিকট শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। তাতা ডুকরে উঠে ছুটে এসে জাপটে ধরল আমাকে। শাড়িতে মুখ গুঁজে 'দিদি! দিদি! ' বলে ডাকতে লাগল। রুমুকা 'কী হলো, ঝুনঝুনি?' বলে কাছে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন।

ভেজা চোখের ঝাপসা নজরে ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনটে মাছি ওঁর মুখের ওপরে বসে পড়েছে। রুমুকাকে ঠিক সেই দোকানদার লোকটার মতো লাগছে।

কী করব জানি না। কেমন করে রুমুকাকে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আমরা বাঁচাব!

আমি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। খোলা দরজা দিয়ে মেঘের ডাক আর ঠাণ্ডা বাতাস অবাধে ঢুকে পড়ছিল ঘরে। তবে সেই বাতাস মোটেই মাছিগুলোর মতো ঠাণ্ডা নয়।

একটু আগেই তো আমি স্পষ্ট টের পেয়েছি, মাছিগুলি বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা।

শারদীয়া ১৪০২

ভুতুড়ে মোজা

প্রীতি পালচৌধুরী

বড়দিনের ছুটি। পায়েলদের বাড়িতে পায়েল, রুবাই, রিমি, প্রিয়াঙ্কা, মৌ, টুবাই, বুবাই, মানু—সবাই একসঙ্গে মেতে উঠেছে। ওরা সবাই মিলে বড়দিনে খুব মজা করবে। কিন্তু ওদের সবার মনেই কত প্রশ্ন বড়দিনকে ঘিরে। খ্রিস্টমাস ট্রি-টা কী সুন্দর, সান্তাক্লজ কত ভাল। ছোটদের কত উপহার দেয়। সাদা দাড়ি, লাল আলখাল্লা, লম্বা টুপি, টুপির ওপর থেকে ঝোলা একটা বল—দেখলে মনে হয় যেন এইমাত্র নেমে এসেছে পরীদের রাজ্য থেকে। প্রিয়াঙ্কা আর বুবাই ওদের মধ্যে বড়, তাই অন্যদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলে, তোরা তো কিছুই জানিস না, শোন বলি। বুদ্ধদেবের জন্মের পাঁচশো বছর পর জন্মেছিলেন যীশু। তাঁর জন্মসময় ধরে ইংরেজী বছরের হিসেব করা হয়। যীশু তো মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য জন্মেছিলেন, তাই সেই দিনটা বড় আনন্দের দিন। সেই হিসেবেই দিনটাকে বলা হয় বড়দিন। যদিও সেদিন দিন ছোট, রাত বড়।

প্রিয়ঙ্কার কথায় পায়েল আর মৌ হেসে বাঁচে না। বলে, এ তো সবাই জানে। বুবাই হাসি-হাসি মুখে বলে, বল তো কলকাতায় কোন সাহেব প্রথম বড়দিন পালন করেছিলেন, কত দিন আগে? জানি, পারবি না। তিনি হচ্ছেন এই শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক। তিনিই তিনশো বছর আগে প্রথম বড়দিন পালন করেন এখানে। বুবাই ওর জ্ঞানের বড়াই করে বলে, সত্যিই তোরা কিচ্ছু জানিস না। আমার কাছ থেকে শিখে নে।

পায়েল ছোট হলেও কথায় কাউকে ছাড়ে না। সে বলে, ইস! আজ যদি আমার সাহেবদাদু আসতো, তাহলে তোমরা সবাই বোকা হয়ে যেতে। জান, সাহেবদাদু কত কী জানে! এমন সব মজার মজার গল্প বলে যে কী বলব! তোমরা তো কেউ তাকে দেখনি। বলা যায় না, হয়তো এখনই এসে পড়তে পারে।

রিমি পায়েলের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, সাহেবদাদু কি সত্যি সত্যি সাহেব নাকি রে?

হঠাৎ দরজার কাছ থেকে কে যেন ভরাট গলায় বলে ওঠে, কিহে, তোমরা সব কী করছো এখানে বসে? ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সবাই। একি! সত্যিই পায়েলের সাহেবদাদু এসেছেন! মাথায় টুপি, মুখে পাইপ, পরনে চমৎকার কোট-প্যান্ট। মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র এলেন বিদেশ থেকে। পায়েল ছুটে গিয়ে সাহেবদাদুকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি এসে গেছ! কী মজাই না লাগছে! জান, এইমাত্র তোমার কথাই বলছিলাম। পায়েল গর্বের দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে বলে, সাহেবদাদু, ওদের চেন তো? ওরা সবাই আমার বন্ধু। জান সাহেবদাদু, ওদের তোমার কথাই বলছিলাম। বলছিলাম যে তুমি এসে পড়লেই সব গোল মিটে যাবে।

সাহেবদাদু ঝকঝকে হাসি হেসে ওঠেন। বলেন, তা গোলটা বাধল কী নিয়ে? তোমাদের আলোচনার বিষয়টা কী?

প্রিয়াঙ্কা আর বুবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, আমরা বড়দিনের কথা বলছিলাম। আচ্ছা সাহেবদাদু, বড়দিনে খ্রিস্টমাস ট্রি সাজানো হয় কেন?

জান না বুঝি? শোন তাহলে।

ব্যাপারটা হলো, খ্রিস্টমাস ট্রি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যেমন জার্মানির এক উপাখ্যানে

সেন্ট উইনফ্রিডকে খ্রিস্টমাস ট্রি-কেন্দ্রীক উৎসবের প্রবর্তক বলা হয়। উইনফ্রিড একদিন কুড়ুল দিয়ে একটা ওক গাছ কেটে ফেলেন। এই গাছটাকে আগে লোকেরা পুজো করত। কুড়ুল দিয়ে গাছটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে শেকড়সুদ্ধ গাছটাকে উপড়ে ফেলল। বিকট শব্দ করে গাছটা মাটিতে পড়ে গেল আর টুকরো টুকরো হয়ে গেল তার কাণ্ডটা। এবার দেখা গেল ঐ ওক গাছের পিছনে রয়েছে একটা অক্ষত ফার গাছ। আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। উইনফ্রিড এই দৃশ্য দেখে ভীষণ খুশি হয়ে সবাইকে বললেন, একে শিশু যীশু গাছ বলা হবে। সবাই নিজের নিজের বাড়িতে এই গাছ লাগাও আর এর ডালপালায় সাজিয়ে দাও নানান উপহার। তাঁর কথামতো গাছ লাগিয়ে তার ডালপালায় ঝোলানো হলো কিশমিশ, বাদাম, নানারকম মিষ্টি, খেলনা, আরও কত কি। ওইসবই হলো বড়দিনের উপহার।

পায়েলের চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। মনে মনে ভাবে, আমরাও বড়দিনে উপহার পাব তো? সাহেবদাদু যেন মনের কথাও টের পান। পায়েলের দিকে তাকিয়ে বলেন, চাইলেই পেয়ে যাবে। সান্তাক্লজ বড় ভাল। ছোটরা চাইলে কক্ষণো না বলে না, দু'হাত ভরে দেয়। তোমরা এক কাজ কর। খ্রিস্টমাস ট্রি-টা সুন্দর করে সাজিয়ে ফেল। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে সবাই পেয়ে যাবে মনের মতো উপহার। এই বলে সাহেবদাদু নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন, আজ ওঠা যাক। প্রচুর কাজ রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম।

সাহেবদাদু চলে যেতে পায়েলের বন্ধুরাও সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল। একা একা পায়েলের মন খারাপ হয়ে যায়। সাহেবদাদু যাও বা এল, তাও আবার চলেও গেল। এমন কক্ষণো করে না। অন্তত একটা দিন থেকে যায়। আজ কী হলো কে জানে! পায়েল মায়ের কাছে গিয়ে বলে, জান মা, সাহেবদাদু এসেছিল। একটু গল্প করেই চলে গেল। থাকল না কেন? থাকলে কত মজা হতো।

পায়েলের মা জয়তী দেবী অবাক হয়ে তাকান মেয়ের দিকে। বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, কখন এলেন সাহেবদাদু! তুমি আজকাল বড্ড বাজে কথা বল। উনি এলেন আর আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন!

পায়েল জোর গলায় বলে, ছাদে বসে আমাদের সঙ্গে কত কথা বলল, আর তুমি বলছো আসেনি! ঠিক আছে, প্রিয়াঙ্কা, রুবাই এদের জিজ্ঞেস কর। সাহেবদাদুর হাতে একদম সময় ছিল না, তাই চলে গেল। বলল, অনেক কাজ আছে।

জয়তী দেবী ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না, তবু বললেন, হয়তো খুব তাড়া ছিল।

রাতে বিছানায় শুয়ে পায়েলের ঘুম আসে না। শো-কেসের ওপর সাজানো পুতুল সান্তাক্লজের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কী ভাবে। লাল আলখাল্লা পরা সান্তাক্লজ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে, সবার হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর ছবিও চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। এই সবকিছুর সঙ্গে পায়েলের মনে পড়ে যায় জনি আঙ্কেলকে। কী ভালই না বাসত ওকে! বড়দিনে কত উপহার দিত! জনি আঙ্কেলকে কতদিন দেখেনি পায়েল। শুনেছে আঙ্কেল নাকি বিদেশে চলে গেছে। জনি আঙ্কেল ওকে খ্রিস্টমাসে এ পর্যন্ত যত উপহার দিয়েছে, সেগুলো সবই শো-কেসে সাজানো আছে। গত বছর ওকে একটা চোখ-পিটপিট করা পুতুল আর চকোলেট দিয়েছিল। এবার আর পায়েল কোনো উপহার পাবে না। কে দেবে? সাহেবদাদু যদিও বা ছিল, তাও চলে গেল।

জনি আঙ্কেলের কথা মনে হতেই পায়েলের চোখ দুটো ভিজে ওঠে। কী ভালই না ছিল জনি আঙ্কেল! চার্চে গেলে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কত লজেন্স-চকোলেট দিত, গল্প বলতো। ভাবতে ভাবতে পায়েল ঘুমপুরীর কোলে ঢলে পড়ে।

ঘুমের মধ্যেই পায়েল দেখতে পায় জনি আঙ্কেল এসেছে। ওর ঘরে হাঁটাচলা করছে। তবে

জনি আঙ্কেল আর আগের মতো নেই। খুব বয়স্ক লাগছে। দাড়িগুলো সব ধবধবে সাদা। গায়ে আলখাল্লা, মাথায় টুপি। গোঁফ-দাড়ি-চুল আর টুপিতে মুখখানা প্রায় গোটাটাই ঢাকা পায়েলের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, হ্যালো পায়েল, হাউ আর ইউ? মনটা ভাল নেই মনে হচ্ছে। কেন বল তো? ও, বুঝেছি। বড়দিনের উপহার পাবে না বলে? আরে না, না, পাবে, পাবে। তোমার সব বন্ধুদের জন্যও পাবে। তুমি ওদের সবাইকে নিজের হাতে দেবে সেই সব উপহার। কী, এবার খুশি তো? একটু হাসো। তোমার মিষ্টি হাসিটা কতদিন দেখিনি।

পায়েল ঘুমের মধ্যে উত্তর দেয়, তুমি কবে এলে জনি আঙ্কেল? আমার কাছে একটু বস না। তুমি কত বদলে গেছ জনি আঙ্কেল!

জনি আঙ্কেল ফিকফিক করে হেসে বলে, কেন কয়েক ঘণ্টা আগেই তো তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মনে পড়ছে না? কত গল্প করলাম তোমাদের সঙ্গে!

পায়েলের দু' চোখের ঘুম আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে থাকে। ও স্পষ্ট দেখতে পায় জনি আঙ্কেলের মুখটা সাহেবদাদুর মতো হয়ে গেল। পায়েল চমকে উঠে দেখে শো-কেসের ওপর থেকে পুতুল সান্তাক্লজ হেঁটে হেঁটে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। যত কাছে আসছে, চেহারাটা তার তত বড় হচ্ছে। তত উজ্জ্বল হচ্ছে মূর্তি। ঘরটা যেন আলোয় আলোয় ছেয়ে গেছে। পায়েল বিছানায় উঠে বসতে গিয়েও পারে না। চারিদিকে এত আলো কেন? 'জনি আঙ্কেল', 'জনি আঙ্কেল' বলে পায়েল ডাকতে থাকে, কিন্তু ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দই বের হয় না। শুধু একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ হতে থাকে। পায়েল চোখ কচলে নিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এও কি সম্ভব! সান্তাক্লজ নিজে এসেছে ওদের বাড়িতে! একি! জনি আঙ্কেল কোথায় গেল? সান্তাক্লজ একেবারে খাটের কাছে এলে পায়েল চিৎকার করে বলে ওঠে, ও! তুমি জনি আঙ্কেল? তোমাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। জান, তোমাকে ঠিক সান্তাক্লজের মতো দেখাচ্ছে। একটু আগে দেখাচ্ছিল সাহেবদাদুর মতন। তোমাকে কত রকম দেখাচ্ছে জনি আঙ্কেল!

জনি আঙ্কেল হাসে। তার লম্বা হাতটা তুলে বলে, ইস! খ্রিস্টমাস ট্রি-টার কী অবস্থা! এত ঝুল! পরিষ্কার পর্যন্ত করেনি! এই বলে বিশাল লম্বা হাতে শো-কেসের ওপর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নেয় খ্রিস্টমাস ট্রি-টা। ফুঁ দিয়ে এক নিমেষে সব ঝুল-টুল ঝেড়ে আবার রেখে দেয় শো-কেসের ওপর। পায়েলের দু' চোখ তখন ছানাবড়া। মানুষের হাত এত বড় হয় নাকি! আর পায়ে কি রণপা? তা নাহলে এত লম্বাই বা হয় কি করে! ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে পায়েলের।

জনি আঙ্কেল মস্ত মস্ত দাঁতগুলো বের করে হেসে বলে, তোমার মনের কথা আমি জানি। খ্রিস্টমাস ট্রি-তে তোমার বন্ধুদের উপহার সাজিয়ে দিতে হবে, এই তো? দাঁড়াও, দাঁড়াও, সব সাজিয়ে দিচ্ছি। আগেকার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খাটের গায়ে মোজা ঝুলিয়ে রাখতো সান্তাক্লজের জন্যে। তারপর ঘুমিয়ে পড়তো। ওরা ঘুমোলেই ওদের বাবা-মায়েরা সেই সব মোজা ভরে দিত খেলনা আর উপহারে। সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা ভাবত সত্যিই বুঝি সান্তাক্লজ রাতে এসে ওদের জন্যে উপহারগুলো রেখে গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা কিন্তু খুব পাকা। তারা কোনোকিছুই চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তুমি অন্তত বিশ্বাস কর, সান্তাক্লজ নিজের হাতে তোমাদের উপহারগুলো খ্রিস্টমাস ট্রি-তে সাজিয়ে দিচ্ছে।

পায়েল দেখে গাছটা সবুজ আলোয় জ্বলজ্বল করছে। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ কত রঙ-বেরঙের প্যাকেট ঝুলছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। অনেক কষ্টে পায়েল বলে ফেলে, কার কোন উপহার জনি আঙ্কেল? আমি কিন্তু লাল প্যাকেটটা নেব।

জনি আঙ্কেল তার রূপালী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, তোমরা সবাই যে যার মনের মতোই

উপহার পাবে। সবার নাম লেখা আছে প্যাকেটে। তুমি যে প্যাকেটটা পছন্দ করেছ, ওটাতে তোমারই নাম লেখা আছে।

পায়েল এই কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারে না। বিছানা থেকে নামতে যায়, পারে না। মনে হয়, ও যেন ঘুমের দোলনায় শুয়ে আছে। উঠতে গেলেই দোল খেয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ছে। শুয়ে শুয়েই পায়েল বলে, তুমি এরই মধ্যে এত সব উপহার আনলে কি করে জনি আঙ্কেল? এত রাতে তো দোকানপাট সব বন্ধ, আর জানলেই বা কি করে কার কি পছন্দ!

হো হো হো! জানি, জানি, মাই সুইট পায়েল, খুব জানি তোমার কি পছন্দ। শোন, তোমার প্যাকেটে আছে চকোলেট, হেয়ার-ক্লিপ আর একটা মিষ্টি পারফিউম। প্রিয়াঙ্কার জন্যও তাই রয়েছে। তবে ও বড় বলে ওকে একটা মেরুন কালারের লিপস্টিকও দিয়েছি। ছেলেদের জন্যে রয়েছে একটা করে ছোট্ট ক্যালকুলেটার, স্টিকার আর চকোলেট। ছোট্ট রিমির জন্য রয়েছে একটা পুঁচকে হাত-পা-নাড়া পুতুল। পুতুলটা দুটো ইংরাজী কথাও বলতে পারে, গুড মর্নিং আর গুড নাইট। কী, কেমন হয়েছে উপহার?

পায়েল দুই হাতে তালি দিয়ে বলে, ঠিক, ঠিক। এক্কেবারে ঠিক। কিন্তু সত্যি করে বল না আঙ্কেল, তুমি কি করে জানলে সবার মনের কথা?

জনি আঙ্কেল জবাবে শুধু হেসে হেসে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে থাকে, জানি, জানি।

দেখতে দেখতে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। পায়েলের চোখ থেকেও ফিকে হয় ঘুম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সুয্যিমামা আকাশে আবীর রঙ ছড়াতে শুরু করেছে। পায়েলের সব কথা একে একে মনে পড়ে যায়। তখন ওর চোখ বারবার ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, কোথায় জনি আঙ্কেল? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! গেল কোথায়! কত কথা বলেছে ওরা! তাহলে কি জনি আঙ্কেল চলে গেছে? পায়েল তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামে।

শো-কেসের ওপর পুতুল সান্তাক্লজ একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খ্রিস্টমাস ট্রি-টাও তেমনি আছে। তবে দেখতে খুব চকচকে লাগছে। পায়েলের মনে প্রশ্ন জাগে, অমন সুন্দর সুন্দর উপহারগুলো গেল কোথায়? তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল? না, না, পায়েলের মন কিছুতেই মানতে চায় না। ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করে খুঁজতে থাকে উপহারগুলো। ভেবেছিল বন্ধুদের দারুণ সারপ্রাইজ দেবে। ওমা! ওটা কী? পায়েল চিৎকার করে ওঠে। ওর খাটের ধরে বিশাল একটা মোজা ঝুলছে। বোঝাই যাচ্ছে অনেক কিছু আছে ওর মধ্যে। আনন্দে-খুশিতে হৈচৈ করে বাড়ি মাথায় তোলে পায়েল। জয়তী দেবী মেয়ের চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন। বলেন, কী হলো কি? সাত সকালে এত হট্টগোল কেন?

পায়েল মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলে, ঐ দেখ মা, জনি আঙ্কেল সান্তাক্লজ সেজে আমাদের জন্য এই মোজায় ভরে কত উপহার রেখে গেছে।

জয়তী দেবী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মোজাটার দিকে। কী বিশাল মোজা! কোনো মানুষের পায়ে এমন মোজা হতে পারে! দত্যি-দানোরও এত বড় মোজার দরকার হয় না। জয়তী দেবী মেয়ের দিকে ফিরে বলেন, এসব তোমার বন্ধুদেরই কাজ।

পায়েল হাসিতে গড়াগড়ি খেয়ে বলে, না মা, এর মধ্যে জনি আঙ্কেল আমাদের সবার জন্য উপহার রেখে গেছে। জান, কাল রাত্তিরে জনি আঙ্কেল সান্তাক্লজ সেজে এসেছিল। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছিল! প্রত্যেকের নাম করে উপহার দিয়েছে। দাঁড়াও, আমারটা আগে তুলে নিচ্ছি। দেখবে আমার নাম লেখা আছে। পায়েল ওর লাল প্যাকেটটা তুলে নিয়ে খুলে দেখে, জনি আঙ্কেল যা বলেছিল ঠিক সেই উপহারই রয়েছে।

ততক্ষণে প্রিয়াঙ্কা, বুবাই, টুবাই, মৌ, মানু সবাই এসে হাজির হয়েছে। ওরা যে যার নিজের

নাম লেখা প্যাকেট তুলে নেয়। প্যাকেট খুলে খুশিতে উপচে পড়ে ওরা। সকলের মুখে এক কথা, আরে! ঠিক এটাই তো চেয়েছিলাম সান্তাক্লজের কাছে! পেয়েও গেলাম। সান্তাক্লজ সবার মনের কথা টের পায়।

পায়েল বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বলে, এগুলো সান্তাক্লজ দেয়নি, জনি আঙ্কেল দিয়েছে। জনি আঙ্কেল কাল রাতে আমার সঙ্গে কত কথা বলল, তোদের কথাও বলল।

প্রিয়াঙ্কা, বুবাই, টুবাই, মৌ অবাক হয়ে বলে, ওমা! আমরাও তো দেখেছি জনি আঙ্কেলকে, সান্তাক্লজ সেজে এসেছিল।

রুবাই, মানু ও রিমির দিকে তাকিয়ে পায়েল বলে, তোরা? তোরাও দেখেছিস?

রুবাইরাও হৈহৈ করে ওঠে, হ্যাঁ, আমরাও দেখেছি। আমাদেরও বলেছে, পায়েলের বাড়িতে উপহার রেখে যাচ্ছি, তোমাদের পছন্দ হবেই।

রিমি ওর ছোট্ট মাথাটা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, জনি আঙ্কেল আমাকে কত আদার করল, বলল, আমার জন্যে একটা চোখ-পিটপিট-করা পুতুল আছে। এই দেখ, আমার প্যাকেটে ঠিক সেই রকম একটা পুতুল। জান, জনি আঙ্কেল আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে।

পায়েল রিমির দিকে একটু গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে বলে, মোটেই না, জনি আঙ্কেল সবচেয়ে বেশি ভালবাসে আমাকে। তা না হলে আমার ঘরে সব উপহার রেখে যায়? আমি জানি জনি আঙ্কেল সবচেয়ে...

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে ঢোকে পল। চোখ দুটো জলে ভরা। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, তোমরা জান জনি আঙ্কেলকে আনা হয়েছে? তোমাদের সবাইকে বলতে এলাম। তোমরা তো জনি আঙ্কেলকে খুব ভালবাসতে আর আঙ্কেলও তোমাদের খুব ভালবাসত!

জয়তী দেবী পলের দিকে তাকিয়ে বলেন, কি হয়েছে জনির?

পল চোখের জল মুছে বলে, জনি আঙ্কেল বিদেশে পরশু মারা গেছে। আজ ডেড বডি এখানে আনা হয়েছে।

পায়েল আর ওর বন্ধুরা সব আঁতকে উঠে বলে, তা কি করে হবে? জনি আঙ্কেল তো কালই আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করেছে, কথা বলেছে, এই উপহারগুলোও দিয়েছে। তাহলে...

পল অবাক হয়ে বলে, জনি আঙ্কেল কি করে আসবে! এসব তোমাদের মনের ভুল।

পায়েল কান্নায় ভেঙে পড়ে। জয়তী দেবী পায়েলকে আদর করতে করতে বলেন, জনি আঙ্কেল তোমাদের সবাইকে এত ভালবাসত তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এ তো ভালই হয়েছে, জনি আঙ্কেল সঙ্গে তোমরা কথা বলতে পারলে।

মায়ের কথায় পায়েলের মনে হয়, সত্যি সত্যিই কি জনি আঙ্কেল এসেছিল, নাকি...

পৌষ ১৪০২

চেনাশোনা ভূত

রবিদাস সাহারায়

হাবুল নন্দী এক্সপেরিমেন্ট মাস্টার। সে বেড়ালের বাচ্চাকে কুকুরের ডাক এবং কুকুরের বাচ্চাকে বেড়ালের ডাক শেখাবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণা করে আসছে। তার যুক্তিও খুব জোরালো। মানবশিশুরা ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে থাকে সেই ভাষাই তারা শিখে নেয়। তারা তো আর মাতৃভাষা শিখে জন্মায় না। যে ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে তারা থাকে সে ভাষাই হয় তাদের কথ্য ভাষা। কাজেই জন্মের পরই যদি কুকুরের বাচ্চা বেড়ালের বাচ্চার সঙ্গে থাকে তবে বেড়ালের ডাকই সে ডাকতে শিখবে। বেড়ালের বাচ্চা কুকুরের সঙ্গে থাকলে শিখবে কুকুরের ডাক।

দুঃখের বিষয়, এই গবেষণায় সে সফল হতে পারেনি। কারণ দেখা গেছে কুকুরছানা আর বিড়ালছানা তাদের বিপরীত ভাষা শেখবার আগেই আশ্চর্যজনক ভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

শাগরেদ গদাইকে হাবুল বলল, তুই একটা হোপলেস। কোনো রহস্যের সমাধানই তোকে দিয়ে হয় না। তাই এমন একখানা এক্সপিরিমেন্টও বানচাল হয়ে গেল।

গদাই বলল, হাবুলদা, কুকুর-বেড়াল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটা একটা তোতাপাখি নিয়ে মাথা ঘামালে এতদিনে মানুষের মতো কথা বলতে শিখে যেত। আমাদেরও বাণিজ্য হয়ে যেত কিছু।

—কি রকম?

—তোতাপাখির কথা শুনিয়ে লোককে অবাক করে দেওয়া যেত। পয়সা আদায় হতো লোকের কাছ থেকে। কথা-বলা পুতুল দিয়ে লোকে টাকা রোজগার করছে না?

—দূর, ওসব তো পুরনো হয়ে গেছে। নতুন কিছু চাই।

—নতুন কিছু? হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা গ্র্যাণ্ড আইডিয়া এসেছে।

—কি আইডিয়া?

—ফটিক নাকি সেদিন কলকাতা গিয়ে মাসি সরকারের ম্যাজিক দেখে এসেছিল।

—মাসি সরকার! বলিস কিরে!

—হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা নাম।

—মাসি সরকার নয়, পিসি সরকার।

—ঐ মাসি-পিসি একই হলো। তিনি নাকি অদ্ভুত ম্যাজিক দেখান। ভূতের সঙ্গে কথা বলেন। ফটিক সেই ম্যাজিক দেখে এসে তার বন্ধু গালটুকে বলেছে। গালটু বলেছে, তার এক মামাও নাকি ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

—তাই নাকি? তা হলে আমরাও ভূত নিয়েই গবেষণা করব। গালটুর মামাকে খুঁজে বের কর।

ফটিককে ধরে গালটুর মারফত আলাপ হয়ে গেল তার মামার সঙ্গে। নিজের মামা নয়, পাতানো মামা। অদ্ভুত চেহারা। বয়স কত কে জানে? তোবড়ানো গাল, কপালে একটা আব। নাম তুবড়িলাল। সে নাকি ভূতের ওঝা।

হাবুল তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি সত্যি ভূতের সঙ্গে কথা বলেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, সত্যি বৈকি। বিপাকে পড়লে ভূত বাবাজী নিজেই বলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি। আমি তখন বলি, তুই সাতটা গ্রাম পেরিয়ে চলে যা। ভূত তাতেই রাজী হয়। আমি তখন তাকে ছেড়ে দেই।

গদাই জিজ্ঞেস করল, আপনি; তাহলে ভূত ধরতেও জানেন?

তুবড়িলাল জবাব দিল, হ্যাঁ, তাও জানি। ভূত ধরার একটা যন্ত্রও আমার কাছে আছে।

হাবুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বলেন কি?

—হ্যাঁ। তবে সবসময় ঐ যন্ত্রটা ব্যবহার করি না। খুব দরকার বুঝলে ভূতকে ধরে ঐ যন্ত্রে পুরে রাখি। তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি কেমন ভূত। ভাল ভূত হলে ছেড়ে দেই। তাকে দিয়ে অনেক কাজকর্ম করাই। সে খুব অনুগত হয়ে যায়। আর খারাপ ভূত হলে এমন দূরে চালান করে দিয়ে আসি যাতে ভূত বাবাজী আর ঐ এলাকায় ফিরে আসতে না পারে।

গদাই বলল, কিন্তু ভূতকে কি আর ওভাবে তাড়ানো যায়? ওরা নাকি হাওয়ায় উড়ে চলে আসতে পারে?

তুবড়িলাল বলল, যাতে না আসতে পারে তার কৌশলও জানি। ভূতকে ছাড়ার পর এমন মন্ত্র আওড়াবো যে ওর ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এত সব কথা শোনার পর হাবুলের বিশ্বাস হলো লোকটা খুবই গুণী। তাই সে বলল, আমাকে ঐ রকম একটা যন্ত্র যোগাড় করে দেবেন?

তুবড়িলাল বলল, আমার যন্ত্রটাই বেচে দেবো। আমি ছেড়ে দিচ্ছি ভূত তাড়ানোর কাজ। অনেক ভূত তাড়িয়েছি। কত ভূতকে দিয়ে কত কাজও করিয়েছি। আর ভাল্লাগে না।

গদাই জিজ্ঞেস করল, কি রকম কাজ করিয়েছেন ভূতকে দিয়ে?

তুবড়িলাল জবাব দিল, সে ওদের মেজাজ বুঝে করিয়ে নিতে হয়। কোনো পরিশ্রমের কাজ করার সময় ওরা সাহায্য করলে খুব সহজেই তা করা যায়। অথচ তুমি বুঝতেও পারবে না তোমার সঙ্গে ভূত কাজ করছে।

তুবড়িলালের কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল হাবুলের মন। সে ভাবল, যে ভাবেই হোক যন্ত্রটাকে হাতাতে হবে। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। তাই সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কত টাকা হলে বেচবেন?

তুবড়িলাল উল্টে প্রশ্ন করল, তুমি কত টাকা দিতে পারবে?

হাবুল ভেবে দেখল তার কাছে বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি নেই। এত কম টাকায় দিতে রাজী হবে কি তুবড়িলাল? অবশেষে গদাই রফা করল ত্রিশ টাকায়। হাবুলের পঁচিশ আর গদাই বাড়ির লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে পাঁচ টাকার মতো দিতে পারবে। আশ্চর্য, তাতেই রাজী হয়ে গেল তুবড়িলাল।

পুরনো দিনের একটা কাঠের মহাজনী বাক্সকে রঙ করে তৈরি করা হয়েছে ভূত ধরার যন্ত্র। সেটাই তুবড়িলাল এনে হাজির করল। ত্রিশ টাকা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিয়ে শিখিয়ে দিল ভূত ধরার মন্ত্র।

তুবড়িলাল নিয়মকানুনও শিখিয়ে দিল হাবুলকে। কোনো জায়গায় ভূত আছে জানতে পারলে বাক্সের মুখ খুলে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কতগুলো ছেঁড়া কাগজের টুকরো রেখে দিতে হবে ভিতরে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে। কোন লোকটা মরে ভূত হয়েছে তা জানতে পারলে তো কথাই নেই। সেই লোকটার মূর্তি মনে মনে কল্পনা করতে হবে। তারপর মন্ত্র পড়তে হবে চোখ বুজে। কিছুক্ষণ পর পর চোখ খুলে দেখতে হবে বাক্সের ভেতর ছেঁড়া কাগজ নড়ছে কিনা। একটু নড়লেই বুঝতে হবে ভূত এসেছে। তখন চট করে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর দড়ি দিয়ে

বাঁধতে হবে বাক্সটাকে। ব্যাস ভূত ধরা হয়ে গেল। এবার ভূতটাকে যেখানে চালান করতে চাও সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

কৌতূহলী হয়ে হাবুল ও গদাই জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তুবড়িলাল বলল, এবার একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিই। সেই মন্ত্রটা বলেই খুলে দেবে বাক্সের মুখ। তবে এসব কাজ রাতের বেলাই করবে। কারণ দিনের বেলা তেনারা বের হন না।

—ভূত যদি আমাদের তাড়া করে?

—সেই মন্ত্রও শিখিয়ে দিচ্ছি। ভূতকে পথ ভুলিয়ে দেবার জন্য ভুলভুলজিয়া মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের।

গদাই কাগজ ও ডটপেন নিয়ে তৈরি হলো মন্ত্রগুলো লিখে রাখার জন্য। অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল তুবড়িলাল। বলল, না না, লিখে রাখলে মন্ত্রের গুণ থাকবে না।

হাবুল আর গদাইকে তাই মেনে নিতে হলো। বারকয়েক দুজনে আউড়ে নিতেই মন্ত্রগুলো প্রায় শেখা হয়ে গেল। সহজ মন্ত্র। তবে ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটাই একটু বিদঘুটে। সহজে মনে রাখা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু উপায় কি? লিখে রাখা যখন যাবে না।

হাবুল জিজ্ঞেস করল, ভূতের সঙ্গে যদি কথাবার্তা বলতে চাই তা হলে কি করতে হবে?

তুবড়িলাল বলল, সব ভূত কিন্তু কথা বলতে চায় না। তবে সেটা তাদের মেজাজের ওপর নির্ভর করে।

ভূত ধরার বাক্সটা পেয়ে হাবুল খুব খুশি। যে বাইরের ঘরটাতে সে থাকে তার দরজায় একটি ছোট পিচবোর্ডের ওপর লিখে দিল—ভূতবিশারদ এইচ নন্দী।

বাড়িতে হাবুল আর তার বড়মামা লালুচাঁদ ছাড়া পুরুষ মানুষ কেউ নেই। মামা যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ততক্ষণ ছোট সাইনবোর্ডটা দরজায় থাকে না। মামা বেরিয়ে গেলেই ওটা ঝুলতে থাকে সগৌরবে। মামীমা চোখে কম দেখেন। কাজেই ধরা পড়ার ভয় কম।

ভূত-ধরা যন্ত্র কেনার পর হাবুলের প্রধান চিন্তা হলো ওটাকে কাজে লাগাতে হবে। ভূত নিয়ে নানারকম গবেষণাও শুরু করে দিল। গদাইকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল কোথায় কোন বাড়িতে ভূত আছে। সেই ভূতের পরিচয়ও তারা জানবার চেষ্টা করল।

ভূতের উপদ্রব আছে খবর পেলেই হাবুল অর গদাই সেখানে ছুটে যায় কিন্তু হাতে-নাতে প্রমাণ কিছু পায় না। তারা ভাবে, ভূত ধরার যন্ত্রের খবর পেয়েই কি ভূতগুলি সব পালিয়ে যাচ্ছে?

দিনরাত শুধু চিন্তা, ভূত চাই, ভূত ধরতে হবে। ভূত ধরে যদি তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তা হলে তো সোনায় সোহাগা। তবে সব ভূতের ভাষা তো এক নয়। সেই ভাষা বুঝবারও একটা কায়দা বের করতে হবে। তবেই কেল্লা ফতে। ভাগ্যিস সে কুকুর-বেড়াল নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিল। তাই তার সামনে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ খুলে গেল। হাবুল ও গদাই হন্যে হয়ে ভূতের খোঁজে ঘুরতে থাকে অন্ধকার অলিগলিতে আর খানাখন্দে।

এদিকে হাবুলের বড়মামা লালুচাঁদের কাছে খবর এল—কচুবেড়িয়ায় তাঁর ভাই কালুচাঁদের খুব অসুখ। ভাইকে দেখবার জন্য লালুচাঁদ সেদিনই কচুবেড়িয়া চলে গেলেন।

এবারে বাড়িতে পুরোপুরি স্বাধীন হাবুল। সে জোরকদমে ভূত নিয়ে গবেষণা করতে পারবে। হঠাৎ সে একটা ভূতের গল্পের বইও পেয়ে গেল। তাতে অনেক রকম ভূতের নাম ও তাদের বিবরণ আছে। মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হল।

ক'দিন ধরে গদাই আসছে না। তার জ্বর। তাই একাই গবেষণা করতে থাকে হাবুল। যন্ত্রটা কাছে এনে ভূত ধরার মন্ত্র আওড়ায় সে। রাত্রিবেলা খোলা বারান্দায় ওটা রেখে দিয়ে মন্ত্র বলতে থাকে। যদি উড়ুক্কু কোনো ভূত ধরা পড়ে।

কেটে গেল প্রায় সাত দিন। একদিন মামী বললেন, হ্যাঁরে, তোর মামার দেখি ফিরে আসার নাম নেই। কোনো খবরাখবরও পাঠায় না। কি ব্যাপার!

হাবুল বলে, কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। ছোটমামার অসুখটা হয়তো খুব বেড়ে গেছে, তাই বড়মামাও আসতে পারছে না।

মামী বললেন, এদিকে যে রাত্রিবেলা আমার খুব ভয় করে।

—কিসের ভয়?

—ভূতের মতন কি যেন ঘুরে বেড়ায় ঘরে আর বারান্দায়।

হাবুল বলল, তুমি ভুল দেখেছ মামী। চোখে তো ভালো দেখতে পাও না।

মামী বললেন, আগে তো কোনোদিন এরকম দেখিনি। এখন দেখছি কেন?

—কবে থেকে দেখছ?

—তিন-চার দিন ধরে দেখছি।

হাবুল মনে মনে ভাবল, ভূত ধরার বাক্সটা বারান্দায় রাখার পরই হয়তো এই অবস্থা হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো ভূত ধরা পড়বে এবার।

আরও দু'দিন কেটে গেল। মামীমা প্রথম দিন কিছু বললেন না। পরের দিন আবার বললেন, কাল রাত্রে আমি ঘুমের ঘোরে শুনতে পেয়েছি কে যেন আমায় বৌদি বৌদি বলে ডাকছে। মনে হলো যেন তোর ছোটমামার গলা।

চমকে উঠল হাবুল। জিজ্ঞেস করল, তুমি ঠিক শুনেছো মামী?

—হ্যাঁ। ঠিক শুনেছি। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো কে যেন পাশের ঘরে ঘোরাঘুরি করছে। ভূত না চোর কে জানে? কয়েক মাস অগে তো তোর ছোটমামা কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল তোর বড়মামার কাছে। কেউ হয়তো তার খবর পেয়েছে।

মামী যেন ভয়ে কুঁকড়ে যেতে লাগলেন। আর হাবুলের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। সে বলে উঠল, ইউরেকা! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা খটকাও লেগে গেল তার। কচুবেড়িয়ার ছোটমামা মারা যায়নি তো?

সেদিন রাত্রেই যন্ত্রটা পরখ করতে লেগে গেল হাবুল। কিছু ছেঁড়া টুকরো কাগজ বাক্সের মধ্যে ভরে দূরে দাঁড়িয়ে ভূত ধরার মন্ত্রটা আওড়াতে লাগল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বাক্সের ভেতর কাগজগুলি যেন নড়ছে। হাবুল বুঝতে পারল ভূত ঠিক যন্ত্রের ভেতর ঢুকে পড়েছে। অমনি সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাক্সের মুখটা বন্ধ করে দিল।

ব্যাস, বন্দী হয়েছে ভূত বাবাজী। অর মামদোবাজি করতে পারবে না। এবার দড়ি দিয়ে বাক্সটা ভালভাবে বেঁধে ঘরের ভেতরে চৌকির তলায় লুকিয়ে রাখল। ভূতটা কোনো কথা বলে কিনা তা শোনবার জন্য বাক্সটার খুব কাছে গিয়ে কান পেতে রইল। কিন্তু কোনো কথা শুনতে পেল না। মনে মনে ঠিক করল পরদিন সন্ধ্যাবেলা ভূতটাকে অনেক দূরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। মামীমাকে বড্ড জ্বালিয়েছে ভূতটা। আর জ্বালাতে পারবে না।

সকাল হবার পর সারাটা দিন খুব উত্তেজনার মধ্যে কাটাতে লাগল হাবুল। গদাই একবারও এল না। নিশ্চয় ওর জ্বরটা খুব বেড়েছে। হাবুল ভাবল, যাক, একপক্ষে ভালই হলো। ভূত ধরার ও দূরে ছেড়ে দিয়ে আসার বাহাদুরিটা সে একাই পাবে। জীবনে একটা বিরাট সুযোগ এসেছে তার।

একটু বেলা হতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল হাবুলের। সে মামীকে জিজ্ঞেস করল, মামী, কাল রাত্রে ভূতটা তোমাকে জ্বালায়নি তো?

মামী বললেন, না।

হাতলি দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাবুল, কেল্লা ফতে!

মামী হাবুলের এই অদ্ভুত আচরণের কোনো কারণ বুঝতে পারলেন না। বললেন, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না বাপু। তোর মামা ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো স্বস্তি নেই।

সেদিনও বড়মামা ফিরলেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই বাক্সবন্দী ভূতটা নিয়ে হাবুল রওনা হলো। মামীকে বলে গেল, মামী, আমি একটা বিশেষ কাজে এক জায়গায় যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

মামী আঁতকে উঠে বললেন, সে কি, একা আমার ভয় করবে যে।

—ভয়ের কিচ্ছু নেই মামী। ভূত-তাড়ানো মন্ত্র আমি শিখে নিয়েছি। সেই মন্ত্র তুমিও আওড়াতে পারো। তা হলে ভূত তোমার ধারেকাছেও আসবে না।

—মন্ত্রটা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যা।

হাবুল বলল, ভূতের কোনো আভাস পেলেই বলবে, ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

মামী একটু শান্ত হলেন। হাবুলও বাক্সটা একটা ঝোলায় পুরে বেরিয়ে গেল।

পথের পর পথ হাঁটতে লাগল হাবুল। তবুও মনের মতো একটা জায়গা পেল না। ভাবল, আরও একটু দূরে নিয়ে গেলে ভাল হয়।

তুবড়িলাল বলেছিল ভূতের একটা মোটামুটি চেহারা মনে মনে কল্পনা করে নিলে কাজের খুব সুবিধা হবে। কিন্তু কোন ভূতের চেহারা সে মনে মনে কল্পনা করবে? যে ভূতটাকে সে ধরেছে সে কোন মরে যাওয়া মানুষের ভূত তাও সে জানে না। আন্দাজে কি কল্পনা করবে সে?

হাবুল পথ চলছে আর চিন্তা করছে। জানাশোনা ভূত আর কে আছে? মামীমা বলেছিলেন, ছোটমামার মতো একটা লোককে নাকি তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। সেই অসুস্থ ছোটমামা পটল তোলেনি তো? ছোটমামার তো বড়মামার বাড়িতেই আসবার কথা ছিল তার রেখে যাওয়া টাকাগুলি নিয়ে যাবার জন্য।

হাবুল পথ চলছে আর নানা আজগুবি কথা ভাবছে। যদি ছোটমামা মরে গিয়ে থাকে তবে ভূত হয়ে গেছে নিশ্চয়। টাকার মায়া নাকি ভূতেরাও ভুলতে পারে না। এসে এখানেও উৎপাত করবে। ভূতের কথা ভাবতে ভাবতে ছোটমামার মুখটাই শুধু হাবুলের চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

কতটা পথ হেঁটেছে তা নিজেই জানে না হাবুল। কোন পথ দিয়ে কিভাবে এসেছে তাও ভুলে গেছে। অচেনা জায়গা। তাকে ভূতেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। অন্ধকারে একটু দূরেই ঝাপসা দেখতে পেল একটা জঙ্গল। তার সামনেই একটা জলা জায়গা, তাতে জল নেই বলেই মনে হয়। ঐ জলাটা পেরিয়ে গেলেই জঙ্গলটা। ওখানে ভূতটাকে ছেড়ে দিলে ভূতবাবাজী আর ফিরে যেতে পারবে না। ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা তো পড়তেই হবে।

এদিকে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। আর দেরি করলে চলবে না। তা হলে নিজেও বাড়ি ফিরতে পারবে না হাবুল।

জলাটা খুব চওড়া নয়। জলও তাতে নেই বলে মনে হচ্ছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই কাদায় হাবুলের পা আটকে গেল। পা টেনে তুলতে গিয়ে বাক্সসুদ্ধ ঝোলাটা পড়ে গেল হাত থেকে। কোনোরকমে সেটা তুলে নিয়ে হাবুল আবার চলতে লাগল জঙ্গলের দিকে।

কয়েক পা যেতেই কিন্তু আবার পড়ে গেল সে। একেবারে হুমড়ি খেয়ে। মনে হলো কোনো ভূতই বুঝি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পড়ল আবার কাদার মধ্যেই। এবার যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন সে এক কাদামাখা কদাকার ভূত।

এবার ভয়ানক ভয় হতে লাগল হাবুলের। ভূতের ভয় তার ঘাড়ে চাপল। সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ভূত আমাদর পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে ভয়টা আমার কি?

কোনোরকমে জলাটা পেরিয়ে ওপরে উঠল হাবুল। জঙ্গলটা এখন একেবারে কাছে। ভাবল, অন্ধকারে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে কাজ নেই। এখানেই একটা গাছতলায় ছেড়ে দিই ভূতটাকে।

ছাড়ার সময় মন্ত্রটা তো পড়তে হবে। চারদিকে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। তবু মনে সাহস এনে একটু জোর গলাতেই মন্ত্র আওড়াতে লাগল—

হিং টিং রিং রিং ভুতভুতুর ছানা,
ছেলে ভূত, মেয়ে ভূত দূর হয়ে যা না।
মেছো ভুত, গেছো ভূত,
মামদো ভূত, হামদো ভূত,
ব্রহ্মদত্যি, শাঁকচুন্নি সব হয়ে যা কানা।
হিং টিং ছট
পালা চটপট।

বলেই হাবুল বাক্সের মুখটা খুলে দিল। তার মনে হলো যেন কি একটা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল বাক্সের ভেতর থেকে।

ভূতটা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গেল। এবার যে মন্ত্রটা আওড়ালে ভূত আর ফিরে যেতে পারবে না, সেই ভুলভুলাইয়া মন্ত্রটা বলতে হবে—

ভূত ভূত ভূতং ভূতং
যাবি আর কুতং কুতং—

তারপর? তারপর আর কিছুই মনে নেই হাবুলের। জলে কাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে সবকিছু তার গুলিয়ে গেছে।

মাথা ঘুরে যেতে লাগল হাবুলের। কান দুটো দিয়ে যেন গরম বাতাস বের হতে লাগল। হায়! হায়! গদাই থাকলে সেই মন্ত্রটা জেনে নিতে পারত এই সময়ে। তার কোনো উপায় নেই। এখন সেই ভূতটাই যে তার ঘাড়ে এসে চাপবে!

ভয়ে কাঁপতে লাগল বুক। তার মনে হতে লাগল ভূত এবার তার সামনেই এসে দাঁড়াবে। কেমন সেই ভূতের চেহারা হবে কে জানে? ছোটমামা মরে গিয়ে যদি ভূত হয়ে আসে!

ভাবতে ভাবতেই তার কাছে এসে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। আবছা অন্ধকারেও হাবুল বুঝতে পারল তার চেহারাটা ঠিক ছোটমামার মতো। ভয়ে ভয়ে সে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল।

ছোটমামা কথা বলল, কিরে হাবুল, তুই এখানে কেন?

হাবুল সত্যি কথা গোপন করে জবাব দিল, মা-মা, ছো-ছোটমামা গো, আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম।

—এখানে এত দূরে কেউ বেড়াতে আসে নাকি সন্ধ্যার পর?

—এই......এই.....বিশেষ একটা কাজ....

—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন ফিরবি কিভাবে?

হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে হাবুলের। কোনোমতে একটু সাহস যুগিয়ে বলল, ছোটমামা, তুমি এখানে এলে কেন?

কালুচাঁদ বলল, অমি তো তোদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। তোকেএখানে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, মামা। প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা হলো হাবুলের।

—আয়, আমার সঙ্গে চল।

হাবুল বাক্সটা হাতে নিয়ে বলল, চলো মামা।

আগে আগে চলল কালুচাঁদ, পেছনে পেছনে হাবুল। হাজার প্রশ্ন মনে জাগলেও কোনো কিছু সে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেল না। শান্তশিষ্ট ছেলের মতো চলতে লাগল।

অনেক পথ। হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে আসে। রাতের কালো আঁধার যেন আরও জমকালো হয়ে উঠেছে।

এবার বাড়ির অনেকটা কাছে এসে পড়েছে তারা। ছোটমামা না থাকলে আজ যে কি দশা হতো হাবুলের!

দূর থেকে দেখা যায় বাড়িটা। ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও জেগে আছেন বড়মামী।

ছোটমামা বলল, হাবুল, ঐ তো বাড়ির কাছেই এসে গেছিস। তুই যা। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। বলে পাশের একটি ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে আর দেখা গেল না তাকে।

হাবুলের যেন কি হয়েছে। সে কোনো কথাই ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারল না ছোটমামাকে। নীরবে বাড়ির দিকে চলল।

বাড়িতে এসেই দেখল বড়মামা কচুবেড়িয়া থেকে ফিরে এসেছেন। এত রাতেও হাবুল বাড়ি নেই দেখে মামা-মামী দুজনেই চিন্তা করছেন খুব। হাবুলকে দেখে তাঁরা আঁতকে উঠলেন। প্রায় চিৎকার করে বললেন, এ কিরে, তোর এই ভুতের মতো চেহারা হলো কেমন করে? কোথায় গিয়েছিলি? এত রাতে ফিরলিই বা কার সঙ্গে?

হাবুল বলল, ছোটমামার সঙ্গে ফিরলাম। ভাগ্যিস দেখা হলো!

চমকে উঠে বললেন বড়মামা, কি বলছিস? কালুর সঙ্গে ফিরলি? তাকে পেলি কোথায়? সে তো মারা গেছে গত শনিবার বারবেলায়। সেজন্যই তো আমার ফিরতে দেরি হলো।

হাবুলের সব গুলিয়ে যাচ্ছে....ছোটমামা......শনিবারের বারবেলায়......তাহলে জলার ধারে......ও কে .....ভূত......বাক্স..........হিং টিং রিং রিং.....তার মানে.......তার মানে..........

বড়মামার দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল হাবুল।

আষাঢ় ১৪০০

নীচে কাকে দেখলাম!

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ পাহাড়ি ঘোষ নিয়ে যাচ্ছে বেড়াতে, আমাকে সপরিবারে। ওদের হাজারিবাগের বাড়িতে। রামসাগরের পাড়ে। ওখানেই ওদের ৭০-৮০ বছরের পুরোনো বাড়ি। সঙ্গে ফুলের বাগান। মস্ত মাঠ। খোলা আকাশ। অজস্র গাছপালা। তার মধ্যে আতাগাছই বেশি। তখন আবার আতার সিজন চলছিল। সব কটা গাছে আতা গিজগিজ করছে। অধিকাংশই পাকা। অল্প কিছু এখনও পাকেনি। বাকি গাছেরা ইউক্যালিপটাস, জাম, জারুল, আম, পেয়ারা আরো কত কী। আমরা প্রথম পৌঁছলাম 'হাজারিবাগ রোড' স্টেশনে। এই স্টেশনটা ছুঁয়ে বেশি চলে মালগাড়ি। স্টেশন থেকে বেরিয়েই রাস্তা। দু'পাশে কাঁচা বাজার বসেছে। মূলত সব্জির বাজার। কিছু ফলমূল। মাছ-মাংস চোখেই পড়ল না। পাহাড়ির মিসেস, টুকুন বলল, এইখানটায় এখন আমাদের রোজই আসতে হবে। বাজার করতে।

আর কোথায় যাব? প্রশ্ন করলাম।

টুকুন বলল, ব্যস, এখানে আর কিছুই দেখার নেই, করারও নেই।

সে কী! বেড়ানো মানে বাজার করা?

হ্যাঁ। পাহাড়ি বলল, এখানে আর একটা জিনিস পাবে। জিলিপি। রাস্তাটা বাঁক নিতেই দেখলাম সত্যিই পথের দু'ধারে বেশ কটা জিলিপির দোকান।

অদ্ভুত জায়গা। শুধু ধু ধু করছে প্রকৃতি। পথের দু'ধারে সারি সারি পাকা বাড়ি। বাড়ির ওপারে ঘন গাছ। বাড়িগুলোর মালিক ছিল একদা সব বাঙালিরাই। এখন সেগুলো হস্তান্তর হয়েছে। লোকাল মানুষরা কিনে নিয়েছে।

সব শুনে-টুনে খুশিই হলাম। আসলে আমরা তো এসেছি প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নিতে। কোনো কাজ করব না। খাব আর ঘুমোব।

হাজারিবাগ সেইরকমই একটা জায়গা। মানুষ সেখানে যায় নির্ভেজাল বিশ্রাম নিতে আর ঘুমোতে। বিশ্রাম নিতে নিতে একঘেয়ে হয়ে গেলে তখন প্ল্যান করে বাড়ি ফেরার কথা।

আমরা এবার কীসে যাব? পাহাড়িকে প্রশ্ন করতেই বলল, কেন হেঁটে। এখান থেকে আমাদের বাড়ি একদমই কাছে। হাঁটা পথে পনেরো মিনিট।

সারা বছর পাহাড়িদের বাড়িটা দেখাশোনা করে বিহারি মালি। বাড়ির সঙ্গে জোড়া আউট হাউসে থাকে। কাঁচা বাড়ি। ওখানেই ওদের সংসার। ছেলে-বৌ-বাচ্চা নিয়ে থাকে রামু। খুবই বিশ্বাসী। বাড়িটার দেখাশোনা, বাগান করা, ফুল ফোটানো সবই রামুর দায়িত্ব। আর সেই দায়িত্বটা রামু যে কত দারুণ ভাবে পালন করে সেটা এক নজরেই বোঝা যায় বাগানটার দিকে তাকিয়ে। কত যে ফুল ফুটেছে, কত রকমের যে রঙ, কী মধুর তাদের গন্ধ সে আর বলে শেষ করা যাবে না। চোখ জোড়ানো ফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই যেন মন চাইছে না। টুকুন মাঝেমাঝেই তাড়া দিচ্ছে। ভেতরে এসো। ও সবই তো থাকবে। কেউ পালাবে না। কিন্তু তাই বললে কী হয়! এমন দৃশ্য মনে পড়ে না, কোথায় কবে দেখেছি।

সন্ধে নামতেই দৃশ্যটা আবার পাল্টে গেল। যাও দু-একটা গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছিল, একটু

সন্ধে হতেই তা একদমই কমে গেল। যাকে বলে 'পিন ড্রপ সাইলেন্স'। জানি না, আরো রাত বাড়লে পরিবেশটা কেমন হবে। একটু একটু করে খোঁজ নিতে লাগলাম। এখানে কারোর অসুখ করলে কী করে তারা? কিছুই না। ভগবান ভরসা করে অপেক্ষা করে। এখানে না আছে হাসপাতাল, না ওষুধের দোকান, না কোনো ল্যাবরেটারি, না ভালো ডাক্তার। ওই মাঝে মাঝে বরাকর, ধানবাদ থেকে ডাক্তার আসেন। তাঁরাই দেখে-শুনে দেন। প্রয়োজন পড়লে নিয়ে চলে যান। চিকিৎসা করে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এইভাবেই চলে এখানে চিকিৎসা-ব্যবস্থা। কোনো বাড়াবাড়ি হলে অবশ্য গাড়ি পাওয়া যায়। ভাড়ায়। তারা গাড়ি ভাড়া করে সোজা রওনা দেয় বরাকরে, ধানবাদে। কাছেই। দেড়-দু'ঘণ্টায় পৌঁছে যায়।

চুরি-ডাকাতি হয় না?

পাহাড়ি বলল, হয় কালেভদ্রে।

আর জন্তু-জানোয়ার বেরোয় না?

বেরোয় তো। শেয়াল, দু-একবার বাঘও নাকি এসেছিল। চিতাবাঘ।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তার মানে রাত্রে এখানে বাইরে না বেরোনোই ভালো?

হ্যাঁ, কারই বা দরকার পড়ছে বেরোনোর। সকালবেলায় বাজার-দোকান সেরে নাও। দুপুরে মাঠে নেমে ক্রিকেট পেটাও। সন্ধে হলেই ঘরে ঢুকে পড়ো। জমিয়ে আড্ডা মারো। গল্প করো। আর লম্বা লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দ্যাখো।

তবে লাইট আছে। ইলেকট্রিক। চাইলে বই পড়তে পার যত খুশি। তবে রাত্তিরটায় বেশ গা ছমছম করে।

জানতে চাইলাম, ভূত-টুত নেই তো?

টুকুন বলল, আছে তো। এখানকার বাড়িগুলোর মালিকরা সব বছরের পর বছর বাড়িগুলোকে ফেলে রাখে খালি। কেউই আসে না, খোঁজ নেয় না। এমন সুযোগে ভূতেরা তো চাইবেই অমন শুনশান বাড়িগুলোতে আস্তানা গাড়তে।

ঝেড়ে কাশো তো! আমার আবার ভূতে ভীষণ ভয়। কেউ কেউ আছে ভূতে মোটে বিশ্বাসই করে না। আমি সেই দলে নই। ভূতে আমার খুবই বিশ্বাস।

টুকুন বলল, ভূতে যখন বিশ্বাস, তখন তারা তোমায় নিশ্চয়ই একবার দেখা দেবে।

সে কী! তার মানে তোমাদের এই বাড়িটাতেও ভূত আছে?

থাকতেই পারে। আমরা তো এবার এলাম চার বছর বাদে।

চার বছর! শুনে অবাক হলাম। ক্রমেই রাত বাড়ছে। মনে মনে রাম রাম করতে করতে রামুকে ডেকে পাঠালাম। রামু প্রায় দৌড়েই এসে পড়ল।

জানতে চাইলাম, ভূত আছে? চোর-ডাকাত আসতে পারে?

রামু বলল, না। ডাকু কাঁহাসে আয়েগা। ডাকু লোগোকা ইধার রহেনা বহুত মুস্কিল হ্যায়। আজকাল টুরিস্ট লোক আতাই নেহি। ওন্‌লোগগো পেটই নেহি ভরেগা। ওন্‌লোগ সব হাজিরবাগ সে ভাগ গিয়া।

বটে। নিশ্চিন্ত হলাম। ডাকাতরা সব হাজারিবাগ থেকে ভেগেছে। এখানে ওদের তেমন খদ্দের হয় না তাই। এখানে টুরিস্ট আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। আর ভূত?

রামু বলল, ভূত লোগোগা ভি ওহি হাল। কভি কভি শুনতা ভূত কা বারে।

শোনা যায়? ভূতেদের কথা?

রামু বলল, কখনও কখনও। পাহাড়ি কাছেই বসে শুনছিল। বলল, এই দিকটায় ওরা বড় আসে না। ওরা থাকে এই রামসাগরেই। রাস্তার ধারে যে জঙ্গলটা দেখলে, সেটার ওপারে।

এদিকে আসে না কেন?

পাহাড়ি বলল, এদিকটা বড় ঘিঞ্জি। ঘরবাড়ি, মানুষজন একটু বেশি। ওই দিকটা ভয়ানক রকম ফাঁকা।

রাত্রে ভয়ে ভয়ে শুতে গেলাম। একবার মনে হল আসার আগে খোঁজ নিয়েই আসা উচিত ছিল।

পরের দিন ভোর হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাজারে প্রচুর সব্জি আমদানি হয়েছে। সবই দারুণ ফ্রেশ। আর দামেও সস্তা।

টুকুন প্রাণভরে বাজার করল। ওর যেমন স্বভাব। লোককে খাওয়াতে আর আদর-যত্ন করতে টুকুনের কোনো জুড়ি নেই। পাহাড়ি দেখলাম উল্টো দিকে চলে গেল। ওদিকে কী আছে? টুকুন বলল, এখানে ওই একটাই মাংসের দোকান। পাহাড়ি সেখানে পৌঁছে পাঁচ কেজি মাংস কিনে ফেলল।

পাঁচ কেজি! কে খাবে অত?

টুকুন বলল, কেন আমরা সবাই।

কে রাঁধবে?

টুকুন বলল, আমি।

সে কী! আমরা আড্ডা মারব আর তুমি রেঁধে মরবে?

টুকুন বলল, অভ্যেস আছে। এর চেয়েও বড় বড় দল আসে আমাদের এই বাড়িতে। তাদেরও আমি একলাই সামলেছি।

কথার ফাঁকে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল বিশ্বনাথ। আমাদের পুরোনো বন্ধু। সে তো আমাদের দেখে মনে হল প্রাণে বাঁচল।

কবে এলেন? বিশ্বনাথের প্রশ্ন।

গতকাল।

ক'দিন থাকবেন?

চারদিন!

যাক, বাঁচলুম।

কেন? বাঁচলে কেন?

আমরা এসেছি গত পরশু। দু'দিনেই বোর হয়ে গেছি। ভাবছিলাম। আজই পালাব। গাড়ি নিয়ে এসেছি তো। তাই যাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই।

বিশ্বনাথের পাশে এসে দাঁড়াল রূপা, আর ওদের একমাত্র কন্যা সন্তান, টোটোন।

রূপা বলল, দাদার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নাও। মোবাইলে কথা বললেও ভালো লাগবে। সময় কাটবে।

তোমরা উঠেছ কোথায়? জানতে চাইলাম।

রূপা বলল, এই তো সামনে জঙ্গলটা দেখছেন, ওর ওপারে। আমার দাদুর বাড়ি। বাড়িটা দারুণ। দোতলা। সবুজ রঙের। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। অমন বাড়ি এখানে একটাই পাবেন। চলুন। ঘুরে অসবেন।

বললাম, এখন না। টুকুন রাগ করবে। এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি।

রূপা বলল, চলুন। আমাদের বাড়ি গিয়েই ব্রেকফাস্ট করবেন। আমাদের ফ্রিজ আছে। কলকাতা

থেকে প্রচুর চিকেন স্যাণ্ডুইচ এনেছি। ফ্রিজে রাখা আছে। দারুণ জমবে।

বিশ্বনাথের ছেলে হাত ধরে টানাটানি শুরু করল। আমি বললাম, এখন কোনোমতেই যাব না। বিশ্বনাথ বলল, তাহলে মোবাইল নম্বরটা বলুন। খোঁজখবর নেওয়া যাবে। পারলে চলেই আসব না হয়।

সেই ভালো। মোবাইল নম্বরটা জানিয়ে দিলাম। ওরা চলে গেল।

পাহাড়ি বলল, কে ওরা? বললাম ওদের পরিচয়। বিশ্বনাথ ফিল্ম-ডিরেক্টর। ইতিমধ্যে ১০-১২টা ছবি করেছে। দু-একটা প্রাইজও পেয়েছে। টুকুন বলল, মোবাইলটা না দিলেই পারতে।

ঠিকই। আমারও তেমন মন চাইছিল না। কিন্তু না বলতে পারলাম না। আবার তো দেখা হবে কলকাতায় ফিরে।

ঠিকই। তবে বলা যায় না, এখানে কখন কার কাকে দরকার পড়ে।

কী বলছিল?

বললাম, ওদের বাড়ি যেতে বলছিল।

কোথায় থাকে এখানে? বললাম। টুকুন বলল, বুঝেছি। ও বাড়িটা আমরা চিনি। ভুলেও যাবে না ওদিকে।

কেন? অবাক হলাম।

টুকুন বলল, ওদিকের বাড়িগুলোয় বড্ড ভূতের উপদ্রব।

সে কী!

হ্যাঁ। আমরা তো ওদিকে মোটে যাই-ই না। এখানে সবাই জানে। রামসাগরের ওই দিকটায় ভূতের ডেরা।

বললাম, কথাটা ওদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

টুকুন বলল, ঠিকই। তবে না জানানোই ভালো। ভয় পেলে আমরা তো ওদের পাহারা দিতে যাব না। তাছাড়া ভূতের জন্যে কোনো পাহারা-টাহারা কাজও করে না। ওটা একটা অদ্ভুত সাবজেক্ট। তুমি কখনও পড়েছিলে নাকি ভূতের খপ্পরে? টুকুন জানতে চাইল।

আমি বললাম, ও আলোচনাটা যত কম করা যায় ততই ভালো। রাত্রে মনে পড়লে ঘুম আসবে না।

পাহাড়ি বলল, থাক থাক। আমিও একবার পড়েছিলাম ভূতের খপ্পরে।

এই বাড়িতেই? জানতে চাইলাম।

পাহাড়ি বলল, হ্যাঁ। তবে তোমাকে সেটা বলা হবে না। আমাদের বাড়ি ফিরতে আরো তিনদিন বাকি।

টুকুন বলল, ডাক্তার হয়ে এত ভীতু কেন?

বললাম, ডাক্তার তো কী। ভূত ডাক্তার-ফাক্তার মানে না।

টুকুন বলল, তোমাকে ধরলে পেত্নিতে ধরবে।

কেন?

তুমি যে ই. এন. টি-স্পেশালিস্ট। পেত্নিদের গলাটা হয় খনা খনা। অমন গলা সারাতে আসতেই পারে তারা কোনো ই. এন. টি-স্পেশালিস্টের কাছে।

হাসলাম। কিন্তু মনে মনে একটু ভড়কেও গেলাম। রামসাগরের এদিক-ওদিক তার মানে তেনারা আছেন।

হঠাৎ বিকালে ফোনটা বেজে উঠল। কার ফোন? আরে এ তো বিশ্বনাথ। কী হল? বিশ্বনাথ বলল, দাদা দারুণ বিপদ!

কী হল?

বাজার থেকে ফিরেই ছেলেটার জ্বর হল।

কার টোটোনের?

হ্যাঁ।

ঠিকই, ওর চোখ দুটো কেমন ছলছল করছিল। নাক টানছিল। সর্দি-সর্দি ভাব।

হ্যাঁ, এরকম ওর ক'দিন ধরেই চলছে।

বললাম, একটা প্যারাসিটামল খাইয়ে দাও।

বিশ্বনাথ বলল, দিয়েছি।

ঠিক আছে।

রূপা বলল, দাদা একবার দেখে যাবেন?

কী আর দেখব! ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। সঙ্গে তো কিছুই নেই। একটা স্টেথোস্কোপও না।

তোমার বন্ধুর কাছে? ও তো শুনলাম বিখ্যাত নিউরোলজিসস্ট।

ঠিকই। তবে ডাক্তারি করতে তো আমরা আসিনি এখানে। কোনো আয়োজনই নেই।

ওষুধ আর কিছু খাওয়াব? বিশ্বনাথের প্রশ্ন।

খাওয়ানো যায়। কিন্তু এখানে তো কোনো ওষুধের দোকানই নেই।

তাহলে?

তাহলে আর কী? অপেক্ষা করো।

বিশ্বনাথ ফোনটা ছেড়ে দিল। কিন্তু ঘন্টাখানেক বাদেই সেটা আবার বেজে উঠল।

কী হল?

দাদা, টোটনের নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

সে কী!

হ্যাঁ। ভয় পাচ্ছি।

কীসের ভয়?

ছেলেটার ডেঙ্গি হল না তো?

কেন, ডেঙ্গি হবে কেন?

কলকাতায়, আমাদের পাড়ায়, ভীষণ ডেঙ্গি হচ্ছে। আমার মনে হয়, ওর তখনই সংক্রমণ হয়ে গেস্‌ল। এখানে এসে জ্বরটা শুরু হল।

হতে পারে।

দাদা, একবার আসুন। প্লিজ!

যেতে হবে? কিন্তু ওদিকটা আমি চিনি না। তার চেয়ে তুমি ওকে নিয়ে এসো। সঙ্গে তো গাড়ি আছে।

কিন্তু ওকে নেওয়া যাবে না। ওর নাক থেকে বেশ রক্ত পড়ছে।

কী করি। পাহাড়ি বলল, ওদের ফিরে যেতে বলো। এখানে কোনো সুবিধে নেই। হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, ডাক্তার, কিছুই পাবে না। আর আমরা তো এসেছি খালি হাতে। তাহলে?

বললাম, বিশ্বনাথ ভীষণভাবে অনুরোধ করছে।

তা তো করবেই। একমাত্র সন্তান ওদের। তাছাড়া তুমি হলে ই. এন. টি-স্পেশালিস্ট। আর ছেলেটা ভুগছে নাসা রক্তপাতে।

কিন্তু এখানে তো এসেছি খালি হাতে।

টুকুন বলল, ওদের বলো, তোমায় এসে নিয়ে যেতে। ওদিকটায় একলা যেও না। তা ছাড়া

এখন রাত হয়ে গেছে। ভীষণ অন্ধকার। ওদিকের জঙ্গলে বুনো শিয়াল থাকে।

বুনো শিয়াল! মানে নেকড়ের বংশধর?

বলতে পার। তোমায় পেলে ছিঁড়ে খাবে। অবশ্য সারাদিন কোনো শিকার যদি না জুটে থাকে।

ওরা কি কামড়ায়? জানতে চাইলাম।

অবশ্যই। কামড়ায় এবং মাংসাশী। আর তোমার মতো একটা নাদুস-নুদুস খদ্দের পেলে ছাড়বে ভাবছ!

পাহাড়ি বলল, শেয়াল না ধরলেও ভূতে ধরতে পারে।

সে কী!

হ্যাঁ। তোমার না যাওয়াই ভালো। ওদের বলো ছেলে ভালো থাকতে থাকতে বরাকর চলে যেতে। ওখানের স্পেশালিস্ট, নার্সিংহোম সবই পাবে। ওদের বলো, এখানে ব্লাড টেস্টেরও কোনো সুবিধে নেই। কোনো ব্লাড ব্যাঙ্কও নেই।

চিন্তায় পড়লাম। বিশ্বনাথ আমার বড্ড জানাশোনা।

এমন সময় রামু এসে বলল, চলিয়ে বাবু। হামনে যায়েগা।

তুই যাবি! পাহাড়ি বলল, তোর তো চোখে ছানি। কিছুই তো দেখিস না। রাস্তা চিনে যাবি কী করে তাহলে?

রামু বলল, ও কোঠিটা আমি চিনি। দত্তবাবুর কোঠি।

আর দেরি না করে রামুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ি বলল, বেস্ট লাক। ছেলেটা সামলালে বলবে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যেতে।

টুকুন বলল, তখনই বলেছিলাম, মোবাইল নাম্বারটা দিও না। হল তো!

রামনাম জপতে জপতে রামুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পৌঁছেও গেলাম। রামুর হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। বনের ভেতর দিয়ে পথ। দু-কিলোমিটার যেতে হবে। মাঝে মাঝে পেঁচার ডাকে পিলে চমকে দিচ্ছে। বাদুড়ের ডানা ঝাপটানো। সাপের ব্যাঙ গেলার শব্দ। উহ্! অসহ্য। দু-কিলোমিটার পথ পেরুতে একঘণ্টা লেগে গেল। তার মধ্যে বিশ্বনাথের দু'বার ফোন এল। দাদা প্লিজ। তাড়াতাড়ি। ছেলেটা সিঙ্ক করছে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। রক্ত বেরুনো বেড়েই চলেছে। দাদা, পা চালান।

বিশ্বনাথের কথায় পা চালাতে গিয়ে দু'বার পড়ে গেলাম। মুহুর্মুহু হোঁচট খাচ্ছি। আর এগুচ্ছি। রামু বলছে, সামালকে। ধীরে। অন্ধকারে গাছগুলোকে ঠিক ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

রামু হঠাৎ বলল, ওই তো দত্তবাবুদের বাড়ি। বাবু, পৌঁছে গেছি।

বাঁচলাম। কিন্তু একী। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি গেটে টোটন দাঁড়িয়ে। কিন্তু বিশ্বনাথ যে বলল ওর জ্বর। নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। ভীষণ রকম। তাহলে?

টোটনকে বললাম, এ কী তুমি? বাবা কই?

টোটোন বলল, বাবা ওপরে। ঘরে।

কিন্তু তোমার জ্বর, নাক দিয়ে রক্ত পড়া?

দুশ্, আমি তো ভালোই আছি। বাবাটা যে কী। ভীষণ ভীতু। বড্ড বাড়িয়ে বলে।

দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় গেলাম। কিন্তু এ কী? বিশ্বনাথ আর রূপা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। টোটনের বুকে মাথা রেখে কাঁদছে। চিৎকার করে।

তাহলে? নীচে আমি কাকে দেখলাম?

আষাঢ় ১৪২২

ভৌতিক চড়

শ্রীনিতাই সেনগুপ্ত

বাড়িতে একটা হৈচৈ পড়ে গেল—

আর পড়বেই বা না কেন? এই বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে আজকের এই প্রগতির যুগে এমন একটা যাচ্ছেতাই বিদঘুটে কাণ্ড ঘটে গেল, তাও আবার রাজধানী দিল্লী শহরের বুকে! কাল শেষরাতে নাকি টুবলুকে ভূতে চড় মেরেছে। আর সে যে-সে চড় নয়—বিরাশী সিক্কা ওজনের একখানা জাঁদরেল টাইপের চড়। টুবলুর কচি গালটা সেই থেকে লাল হয়ে আছে আর জ্বালাও করছে খুব—আবার তার উপর অল্প অল্প জ্বর।

ভূতের চড় খেল টুবলু আর মাঝখান থেকে আমাকে চড়াও করল ওর মা—"কেন আমি টুবলুকে বারান্দায় শুতে বলেছি, ঘরে শুলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? ননীর শরীর তো আর নয় যে গলে যাবে!" শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিল ও—"দিনটা ভাল নয়—শনিবার তার উপর অমাবস্যা—মেয়েটার ভালমন্দ যদি একটা কিছু হয়।" টুবলুর মার কান্নার সুর বেজে চলে ডোয়ার্কিনের হারমোনিয়ামের মত—একবার খাদে আর তার পরমুহূর্তেই একেবারে সপ্তমে।

"ওসব ভূতটুত কিছু নয়।"—ওকে বোঝাই আমি—"সব মনের ভুল—আর তা'ছাড়া এমন খোলামেলা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে গবর্নমেণ্ট কোয়ার্টারে ভূত আসবে কোত্থেকে? এতো আর অজ পাড়াগাঁ নয়।"

"থামো দিকিনি—আর বক্তৃতা করতে হবে না। দু'কলম ইংরেজী পড়ে মনে কোরো না খুব পণ্ডিত হয়েছো! চৌদ্দ বছর গাঁয়ে ছিলাম—ভূতের নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা। ভূতের আবার শহর আর অজ পাড়াগাঁ কি? ওদের দৃষ্টি যার উপর একবার পড়ে তার পেছনেই লেগে থাকে। কি কুক্ষণেই যে দেশ ছেড়েছিলাম! শেষকালে বিদেশে-বিভুঁইয়ে এসে মেয়েটাকে ভূতের হাতে তুলে দিতে হল!" টুবলুর মার চোখ-মুখ ছল ছল করে ওঠে আবার। বলে— "আর চুপ করে বসে থেকো না—ওঝাটোঝা যা হয় কিছু একটা ডাকো।"

"ওঝা!"—আকাশ থেকে পড়ি আমি!—"ওঝা এখানে কোথায় পাবো? আর তা'ছাড়া ওটা ভূত কিছুতেই হতে পারে না।"—ওকে আর একবার বোঝাতে চেষ্টা করি আমি।

"বেশ তো"!—টুবলুর মা গলা ছাড়ে আবার।—"ভূত যদি নাই হবে তা' হলে টুবলু চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেল না কেন? মানুষের তো আর পাখা নেই যে উড়ে যাবে!"

কথাটা সত্যি! অকাট্য যুক্তি! খণ্ডানো গেল না—আর খণ্ডাতে না পেরেই রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল ওর সঙ্গে আমার। শেষ পর্যন্ত রফা হল ওঝা যদি নাই মেলে তাহ'লে টুবলুর মঙ্গলের জন্যে আর ভূত বেটার বিনাশের জন্যে বাড়িতে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হবে।

দিল্লীতে ওঝা পাওয়া মুশকিল। যদিও একজন বাঙালী ওঝা আছে আমার জানাশুনো—কিন্তু বাঙালী ওঝা আর পাঞ্জাবী ভূতে মিলে ব্যাপারটা হয়তো আরো সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে তাই ওপথ আর মাড়ালাম না। সোজা গিয়ে উঠলাম খলুদার বাড়িতে। খলুদা ওস্তাদ খোল-বাজিয়ে—অল্ দিল্লী কীর্তন সংঘের সেক্রেটারি। দশটা-পাঁচটা অফিস করেন আর সন্ধ্যের পর থেকে বাড়ি বাড়ি কীর্তনের বায়না গেয়ে বেড়ান। খলুদাকে বেশ খোলসা করেই বললাম সব কিছু। খলুদা বেশ আশা দিলেন আর আমিও খানিকটা আশ্বস্ত হলাম।

বললেন—"ওসব ওঝা-টোঝায় কিছু হবে না ভায়া—দেখবে এমন নিমাই সন্ন্যাস পালা ধরবো যে ভূতের বাবা পালাতে পথ পাবে না।"

"পালালেই বাঁচি"—গুনে গুনে পঞ্চাশ টাকা খলুদার হাতে গুঁজে দিয়ে পাকা কথা নিয়ে এলাম একেবারে।

খলুদা কথা রাখলেন, তাঁর একশ আট জন শাকরেদ আর গোটা পাঁচেক খোল নিয়ে এসে যেদিন তিনি পালা কীর্তন গাইলেন সেদিন ভূত না পালালেও আমি যে নিজে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম একথা খুবই সত্যি।

পরদিন পাড়ার লোকেরা সবাই বললেন, "হ্যাঁ—কীর্তন হয়েছে বটে কাল—খাসা কীর্তন! এমন কীর্তন অনেকদিন শুনিনি। কী দরদই না ঢেলে দিয়েছিল গানের সুরে!" ঐ দরদের খবরটাই পেয়েছি, কিন্তু ঐ দরদের ঠেলায় কেউ দরজা-জানলা বন্ধ করে রেখেছিল কিনা, সে খবরটা অবশ্যি আর পাইনি।

সব শুনে টুবলুর মা খুব খুশী। আর। আমিও খুশি না হয়ে পারলাম না—ভূত বেটা নিশ্চয়ই খুব জব্দ হয়েছে। এহেন কীর্তনে জব্দ না হয়ে যায় না! টুবলুর জ্বরটাও আজ আর নেই—কাজেই আমি নিশ্চিন্ত এবং বেশ পুরোপুরি ভাবেই নিশ্চিন্ত।

টুবলুকে ভূতে চড় মারবার পর থেকে ও শোয় ঘরে আর আমি বারান্দায়। সেদিন বোধহয় ভূতের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ এমনি করে ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না হঠাৎ কে যেন ঠাস্ করে আমার গালে একখানা চড় বসিয়ে দিল। আর আমিও সঙ্গে সঙ্গেই ঠেসে ধরলাম তাকে দু'হাত দিয়ে—"কীর্তন তোমার কিছু করতে পারেনি, কিন্তু বাছাধন আমি তোমার কীর্তি না ফাঁস করে ছাড়ছি না।"

আমি নাছোড়বান্দা—আজ হাতেনাতে ধরেছি ভূত বেটাকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে চোখ খুলতে পারলাম না—মনে হল কে যেন ময়দার আঠা লেপে দিয়েছে চোখের পাতায়। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করছে—চোখ খুললেই কি দেখবো কে জানে! কঙ্কাল! না ব্রহ্মদৈত্য! না শাঁকচুন্নী! রাম নাম করতে লাগলাম—আর সেই ছেলেবেলার ছড়া ঃ

"ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি,
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে
ভয়টা আমার কি!"

ব্যাস, দু'তিনবার আউড়ে "মা দুর্গা মা।" বলে দিলাম চোখের পাতা খুলে! একি! এ যে দেখছি সব ফাঁকা! ভূতটা ফাঁকি দিল নাকি শেষ পর্যন্ত! ইস—একদম বোকা বানিয়ে দিল আমাকে!

হঠাৎ নজর পড়ল আমার হাতের উপর—আমার দু'হাতে মুঠোর ভেতরে শক্ত করে ধরা সেদিনকার হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর বাণ্ডিলটা যেটা খানিকক্ষণ আগে পেপারওলা ছুড়ে দিয়েছে নীচ থেকে দোতালায়।

শুধু আজই নয় রোজই শেষরাতে ও পেপারটা বাণ্ডিল করে ছুড়ে দেয় নীচে থেকে উপরে। তবে কি এটাই ছুটে এসে পড়েছিল আমার মুখে ওপর! কিন্তু কই এর আগে তো কোনদিন....

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম আমি। তখনকার মনের অবস্থা আমি খুলে বলতে পাচ্ছি না। তবে এটুকু বলতে পারি সত্যিকারের ভূত দেখলেও বোধহয় আমার মনের অবস্থা এত খারাপ হতো না। এরই জন্যে পঞ্চাশটা টাকা গচ্চা দিতে হল আমাকে! একেবারে শুধু শুধু আর একরকম সেধে সেধেই টাকাগুলো দিলাম খলুদাকে! কি যে রাগ হ'ল আমার—সেই মুহূর্তে খলুদাকে পেলে হয়তো ওর মাথার খুলিই আমি ফাটিয়ে ফেলতাম, কিন্তু পেলাম না এই দুঃখ! চুপ করেই গেলাম। তবে ভূতের আসল ব্যাপারটা চাপলাম না। ফাঁস করে দিলাম সেদিনই।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

রক্তের দাগ

পরেশ ভট্টাচার্য

যে ট্রেন ধলভূমগড়ে পৌঁছনোর কথা রাত আটটায়, পৌঁছল রাত প্রায় বারোটায়। খড়্গপুর থেকে নির্দিষ্ট সময়েই ছেড়েছিল ট্রেন, কিন্তু ঝাড়গ্রাম স্টেশনের মুখে সিগন্যাল না পেয়ে ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল ট্রেন।

ধলভূমগর স্টেশনে যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল, তখন বারোটা বাজতে সাত মিনিট বাকি।

এ এলাকা জঙ্গল এলাকা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্যে প্রায় এক বছর এ লাইনে রাতে ট্রেন চলাচল করত না। এখন করছে।

স্টেশনে নামলাম। শুনশান প্ল্যাটফর্ম। জনাচারেক যাত্রী নামল। কাউকে দেখলাম না। ইত-উতি তাকাই। কোথাও কেউ নেই। এমনকি চায়ের দোকানও বন্ধ।

কী করব ভাবছি। ভাবছি, এত রাতে নাই-বা রবিদার বাড়ি গেলাম। রাতটা স্টেশনে কাটিয়ে দিয়ে ভোরবেলা বেরিয়ে যাব। পরক্ষণে মনে হল রবিদার বাড়ি তো বেশি দূর নয়। সেবারে এসেছিলাম, রিকশায় মিনিট পাঁচেক লেগেছিল। বাইরে যদি রিকশা পাই ভালো, না পেলে পায়ে হেঁটেই চলে যাব। হেঁটে গেলে পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগবে বড়ো জোর। সঙ্গে তো লটবহর কিছু নেই, শুধু কাঁধে একটি কাপড়ের ঝোলা। ভাবলাম, চলেই যাই, বারোটা বাজল, সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাব। গরমকালে এটা কোনো ব্যাপারই নয়।

স্টেশনের বাইরে এলাম। কোথাও কেউ নেই। বাইরে পথের দু'ধারে সারিসারি দোকান। কিন্তু বন্ধ। রিকশা-টিকশা কিছুই নেই।

পা বাড়াতে গিয়েও ভাবছি, যাব কি যাব না। শেষ পর্যন্ত পা বাড়ালাম। যদিও রাস্তায় আলো জ্বলছে, তবু ব্যাগ থেকে টর্চটা বার করে হাতে নিলাম।

মিনিট চার-পাঁচ হেঁটে পথের বাঁকে এসে দেখি, একটু তফাতে একটি দোকান খোলা। চায়ের দোকান।

দোকানের কাছে এলাম। দেখলাম, নিবন্ত আঁচে এখনো চায়ের কেটলিতে জল ফুটছে। দোকানদার পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন, 'ভাই চা হবে কিনা' বলতে ফিরে তাকালেন। ফ্যাকাশে চেহারার মানুষ। মধ্যবয়সি। মাথায় চকচকে টাক। কিন্তু গোঁফের বাহার আছে। থুতনি প্রায় নেই। নাকটা বাজপাখির মতো। গলাটা অসম্ভব রকমের লম্বা। মাথা সামনের দিকে নুয়ে পড়া। বড়ো বড়ো দুটি চোখ, যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

চা খাবেন? লোকটি কিছুটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, চা খান তো বানাই। লিকার না দুধ?

যা খুশি। কিছু খাবার-দাবার আছে?

বিস্কুট আর বাজারে লাড্ডু আছে। বসুন আপনি। আগে চা বানাই।

জলের কেটলি উনুন থেকে নামিয়ে ছোট ডেকচিতে দুধ চাপিয়ে দিয়ে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, অনেকটা দুধ আছে, কী আর করব, আপনার জন্যে আদা-মরিচ-তেজপাতা দিয়ে দুধের চা বানিয়ে দিচ্ছি। খেলে আপনার মনে থাকবে।

বলছেন?

লোকটি বেশ যত্ন করে চা তৈরি করলেন। বড়ো কাচের গ্লাস ভর্তি চা। চায়ের গ্লাসটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। হাত বাড়িয়ে চা নিলাম। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়েই বললাম, চমৎকার চা। কলকাতার বড়োবাজারের শর্মার চা হেরে যাবে। আবার যদি কখনো ধলভুমগড় আসি—

কথা বলতে বিষম লাগল। চা ছিটকে প্যান্টে, জামায়। নিজের কাছেই নিজে অপ্রস্তুত হলাম। সামলে নিয়ে বললাম, আপনার নাম কী?

নকুড় মাহাতো। আপনার?

অপূর্ব হালদার।

আপনি যাবেন কোথায়?

ধলভূমগড়।

সে তো বুঝতে পারছি। ধলভূমগড়ে কোথায়?

রাজবাড়ির কাছাকাছি।

কোন পাড়ায়, কার বাড়ি?

রাসমঞ্চের কাছে, রবি সামন্তর বাড়ি যাব।

মানে ঠিকাদারবাবুর বাড়ি। আমরা, মানে এখানকার লোক তাঁকে ঠিকাদারবাবু বলি। উনি কি আপনার আত্মীয়?

তা বলতে পারেন।

এই রাতে সে বাড়িতে কি না গেলে নয়! এখন আপনি যাবেনই বা কী করে? না পাবেন রিকশা না পাবেন কোনো কিছু। এখন রাত সাড়ে বারোটা বাজতে চলল, তাই বলছি নাই-বা গেলেন। তারপর এখন কি আর আগের জঙ্গলমহল আছে?

তা ঠিক। কিন্তু—

কিন্তু আবার কী। গরমকাল, আর তিন, সাড়ে তিনঘণ্টা বাদে তো রাত শেষ হয়ে যাবে। ভোরের পাখিরা ডাকবে। সেই বনের পাখির ডাক শুনতে শুনতে চলে যাবেন ফুরফুরে হাওয়ায়।

নকুড় মাহাতো বেশ কাব্যরস মিশিয়ে কথা বলতে পারেন তো? দেখে তো উল্টোটাই মনে হয়। যাই হোক চায়ের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, চমৎকার চা পান করলাম। দুধের চা। খিদে-তেষ্টা দুই মিটল। বলুন কত দাম।

দাম! নকুড় মাহাতো যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, দাম কিসের! আমার দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছে সাড়ে এগারোটায়।

বুঝতে পারছি না। এখন পৌনে একটা বাজতে চলল, আপনার খোলা দোকানেই তো বসে আছি।

আরে অপূর্ব ভাই এখন এটা তো আমার ঘর। সবে শোবার তোড়জোড় করছি, আপনি এলেন। নয়তো দোকানে জল ছিটিয়ে বন্ধ করেছি দেড়-দু'ঘণ্টা আগে। এবারে বুঝেছেন তো!

দামটা নিলে পারতেন।

না, পারতাম না। নকুড়বাবু হঠাৎ যেন একটু ক্ষেপে গেলেন। বললেন, কী পারতাম কী পারতাম না, তা কি আমি বুঝি না!

আর কথা না বাড়িয়ে ঝোলা কাঁধে উঠে দাঁড়াই। আমি কিছু বলার আগে নকুড়বাবু বললেন, যাবেনই যখন, তখন আমার কয়েকটা কথা শুনে যান।

বলুন।

বসুন, বলছি। নকুড় টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, আপনাকে এখন পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। একটা অনুরোধ, পিছন দিকে যদি কোনো রিকশা আসে, আর রিকশাওয়ালা যদি আপনাকে ডাকে,

হ্যাঁ, আরো একটা কথা সে রিকশায় যদি কোনো একজন সওয়ারি থাকে, আপনি সে রিকশায় উঠবেন না। কোনো মতে উঠবেন না।

কেন!

সব কিছুর উত্তর হয় না অপূর্ববাবু। আমার কথাটা মনে রাখবেন।

আর কিছু?

রাস্তা চলবেন সামনের দিকে চোখ রেখে, কোনো কারণে পিছন দিকে ফিরে তাকাবেন না। যান, আর দেরি করবেন না, আশা করি ভালোয় ভালোয় পৌঁছে যাবেন। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, অন্যভাবে নেবেন না, আপনি ভূত-টুতের ভয় করেন না তো?

এবারে না হেসে পারলাম না। বললাম, জানেন নকুড়বাবু, ভূত আর ভগবান দুয়ের কোনোটাতেই আমার বিশ্বাস নেই। তবে কেউ যদি বিশ্বাস করে, সে করুক। যাক, আমি চলি। ইচ্ছে রইল কাল ফেরার পথে আপনার দোকানে চা খেয়ে যাব।

নকুড় কোনো কথা বললেন না। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। ঘড়িতে সময় দেখলাম। রাত একটা বেজে বিশ মিনিট।

পায়ে পায়ে চলছি। টর্চ হাতে। তবে জ্বালতে হচ্ছে না। রাস্তায় আলো আছে। পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

আগে একবার এসেছিলাম। বছর বারো আগে। তখন রাস্তায় পিচ ছিল না। এখন পিচ পড়েছে। রাস্তা আগের চেয়ে কিছুটা চওড়াও। রাস্তার দু'ধারে এত বাড়িঘরও ছিল না।

পথের দু'ধারে গাছপালার মধ্যে বেশ ছিমছাম সব বাড়ি। কিছু দোকান-পসারও। কিন্তু এখন সবই বন্ধ। তবে এক একটা বাড়ির বাইরে আলো জ্বলছে। কিন্তু কোনো বাড়ির জানালা-দরজা খোলা নেই। হয়তো বা সন্ত্রাসবাদীর হামলার ভয়ে। কিংবা টহলদারি সেনা বা পুলিশের। এসব এলাকায় সেনা পুলিশের যৌথবাহিনী টহল দেয়। যদিও এখনো পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি।

সময়ের সঙ্গে অনেক বদলে গেছে ধলভূমগড়। এখন একটাই চিন্তা, রবিদার বাড়ি চিনতে পারব তো!

দুটি থাম আছে রবিদার বাড়ির সামনে। একটি থামের গায়ে পাথরে লেখা 'সামন্তবাড়ি, ধলভূমগড়'।

আরো খানিক পথ এসেছি। জীর্ণ মন্দির চোখে পড়ল। সেবারে যখন এখানে আসি, দিন তিনেক ছিলাম, তার মধ্যে একদিন রবিদার সঙ্গে এই শিবমন্দিরে এসেছিলাম। এই মন্দিরের শিব নাকি অভিমানী। এখানে কোনো বাড়িতে কেউ এলে, যদি গৃহকর্তা বা অন্য কেউ তাকে মন্দিরে না নিয়ে আসে, শিব নাকি দুঃখ পান। এই লোকশ্রুতি সবাই বিশ্বাস করে।

মন্দির পেরোতেই কানে এল রিকশার টুংটাং। বুঝতে পারি রিকশা এদিকেই আসছে।

রিকশা দাঁড়িয়ে পড়ল পিছনে।

কোথায় যাবেন বাবু, আমি রাজবাড়ির দিকে যাচ্ছি। যাবেন তো উঠে পড়ুন।

এই মুহূর্তে মনে পড়ল নকুড় মাহাতোর কথা। 'রিকশাওয়লা যদি আপনাকে ডাকে, তাহলে সে রিকশায় আপনি উঠবেন না।'

রাজবাড়ির দিকে যাবেন তো, উঠে পড়ুন।

রিকশাচালকের কণ্ঠস্বর কেমন ভাঙা ভাঙা। দেখলাম, লিকলিকে রোগা চেহারা রিকশাচালকের। রিকশাটা খালি নয়, একজন সওয়ারিও আছে।

এবারে আরোহী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যাবেন কোথায়?

রাসমঞ্চের কাছে সামন্তবাড়ি।

বুঝেছি। আপনি উঠে পড়ুন, আমি ওই দিকেই যাচ্ছি।

নকুড় মাহাতোর কথা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। বুঝতে পারছি না, কী করব।

আরে উঠে পড়ুন তো। আপনি ভাগ্যবান এই রাতে রিকশা পেলেন।

উঠে পড়লাম রিকশায়। তাকালাম পাশে বসা মানুষটির দিকে। এ কি! কী দেখছি! এ তো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল। বুকটা কেঁপে উঠল। তাকাই রিকশাচালকের দিকে। একটি কঙ্কাল রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জীবনে কখনো ভূত-টুত বিশ্বাস করিনি। এখনো করি না। ভাবছি, এটা বোধহয় মনের ভুল।

আবার ফিরে তাকাই, সওয়ারির দিকে। না আলো, না অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি কঙ্কালটা যেন হাসছে।

লাফিয়ে পড়ব ঠিক করলাম, কিন্তু পারলাম না। কঙ্কালটা তার বাঁহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল, আমরা জ্যান্ত মানুষের মনের ভাষা পড়তে পারি।

তার মানে!

তুমি সহজে কথার মানে বোঝো না? এই নাটা, শুনছিস?

রিকশাচালকের নাম নাটা।

নাটা হি হি করে হাসতে আরম্ভ করল। কী বিশ্রী হাসি!

পাশের কঙ্কালটি ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, জানো তোমার মতো আমিও একদিন মাঝরাতে নাটার রিকশায় উঠেছিলাম, সেদিন তোমার মতো আমিও মানুষ ছিলাম। আমিও ভূত-পেত্নি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন—

কথা শেষ করে সওয়ারি ভূতও হাসতে আরম্ভ করল।

সাহসে বুক বেঁধে বললাম, তোমরা কী করতে চাও বলো তো?

বুঝতে পারছ না? আমরা এ দেশে ভূতের রাজ্য কায়েম করতে চাই। কিলিয়ে যেমন কাঁঠাল পাকায়, তেমনি আমরা কিলিয়ে ভূত বানাই।

মেজাজ বিগড়ে গেল। কঙ্কাল যেমন আমাকে জাপটে ধরে আছে, আমিও দু'হাত দিয়ে কঙ্কালের মাথাটা ধরতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। কোথায় কঙ্কাল। কেউ নেই।

রিকশাটা তখন উড়ে চলার মতো ছুটছে। রিকশাওয়ালার নামটা জেনে গেছি। বললাম, নাটা ভাই, একটু আস্তে চালাও না।

নাটার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই।

রিকশা আরো বেগে ছুটতে আরম্ভ করল।

আমার মন থেকে সাহস এখনো উবে যায়নি। আমার বিচার-বুদ্ধিও লোপ পায়নি। ভাবছি, সত্যিই কি আমি রিকশায় চেপে চলেছি, না কি এ একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন?

হাওয়ার গতিতে রিকশা ছুটছে। কঙ্কালদেহী নাটা এক-একবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। যা হবার হবে, এই ভেবে সজোরে জোড়া পায়ের লাথি মারলাম কঙ্কালের কোমরে। রিকশাটা পাক খেয়ে পড়ল রাস্তার ধারে কাঁচা নর্দমার পাশে। ছিটকে পড়লাম আমি। আর এই মুহূর্তে লোডশেডিং। অন্ধকার নেমে এল।

উপুড় হয়ে পড়েছি। দু'হাতে, কনুই-এ চোট লেগেছে। পাশেই ময়লা ফেলার ভ্যাট ওর ওপর পড়লে আর রক্ষে ছিল না।

ডান হাতের কনুই-এর কাছটা জ্বালা করছে। বাঁহাত দিলাম কনুই-এর কাছে। বুঝতে পারি রক্ত ঝরছে।

উঠে দাঁড়াতে যাব, কিন্তু ঘাড়ের ওপর কারো হিমশীতল হাতের চাপ। আমার সর্বাঙ্গে শিরশিরানি। মনে হচ্ছে সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে আসছে। মাথা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। দু'চোখে

যেন অন্ধকার নেমে আসছে। ভাবছি—এখনো ভাবতে পারছি বলেই ভাবছি, সত্যিই বোধহয় ভূতের পাল্লায় পড়েছি আমি। আমিও হয়তো ভূত হয়ে যাব।

কেমন যেন ঘোরের মধ্যে আছি আমি। শুনতে পাচ্ছি কারা যেন বিশ্রী সুরে হাসছে। এবারে আবার নতুন উপসর্গ—কারা যেন আমার গায়ে বরফের মতো ঠান্ডা হাত দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছে। এক অস্বস্তিকর অবস্থা। মনে হচ্ছে আমি যেন নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন।

এই অবস্থার মধ্যে শুনতে পেলাম, সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ। তারপরই কানে এলো কোনো পাখির তারস্বর চিৎকার। তারপর শুনতে পেলাম পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কোনো সাইকেল আসছে। ঘণ্টার আওয়াজ ক্রমশ কাছে আসছে।

কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, ওরে মামু আসছে।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল।

কে যেন বলে উঠল, কি, বেঁচে আছেন তাহলে!

কথা বলতে পারছি না। অথচ বলতে চাইছি।

আবার সেই কণ্ঠস্বর, আপনার তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

বলতে চাইছি, 'আপনি কে', কিন্তু বলতে পারছি না।

জানতে চাইছেন আমি কে, আবার সেই কণ্ঠস্বর আমি নকুড় মাহাতো।

আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কথা বলতে চাইছি, অথচ বলতে পারছি না, জেগে অথচ দেখতে পাচ্ছি না, এ আমার কী হল? আমি বেঁচে আছি তো?

আবার কণ্ঠস্বর, চিনতে পারলেন না, আমি নকুড়, আপনার জন্যে দুধ দিয়ে চা বানিয়েছিলাম। যাক, আমি এখন যাচ্ছি, সূর্য ওঠার সময় হল। দিনের আলোয় আমরা থাকতে পারি না।

এরপরেই মনে হল, কেউ একজন ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সাইকেল ছুটিয়ে দ্রুত চলে গেল।

আবার চেতনার বিন্দুতে ফিরে এলাম। আমি শুয়ে আছি রাস্তার ধারে। ঘাসের ওপর। বুঝতে পারছি রাত শেষ হয়ে আসছে। গাছে গাছে পাখপাখালি ডাকছে। তবে রাস্তার আলোগুলো এখনো জ্বলছে।

উঠে দাঁড়াই। কনুই-এর কাছটায় একটু ব্যথা। দেখলাম, সামান্য ক্ষত। একটু রক্ত ঝরেছে। এখন শুকিয়ে গেছে।

কিছু মানুষের কথা শুনতে পেলাম। কারা যেন আসছে। দেখলাম, ক'জন লোক চলেছে। হয়তো ট্রেন ধরবে। লোকগুলো চলে গেল।

বাঁদিকে চোখ পড়ল। থামওয়ালা বাড়ি। একটি থামের গায়ে পাথরে লেখা 'সামন্তবাড়ি'। লেখাটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আর বাড়িটা কেন যেন পোড়োবাড়ির চেহারা নিয়েছে।

বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। বারান্দায় ধুলোময়লা জমে আছে। বন্ধ দরজার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে কথা ভেসে এল, কে?

নাম বলতেই ভিতর থেকে কেউ বলল, হয়তো রবিদাই হবে, দরজা তোর জন্যেই খোলা আছে। আমি জানতাম, আমার চিঠি পেয়ে তুই নিশ্চয়ই আসবি। ভলোই হয়েছে, আয়।

দরজার কপাট ভেজানো ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। ভিতরে পা রাখতেই ভ্যাপসা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল।

কী হল, আয়।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, রবিদা আমি বেঁচে আছি। এই দ্যাখো আমার কনুই-এ রক্তের দাগ।

শারদীয়া ১৪১৯

ডিসেকশান্ রুমে

ড. গৌরী দে

ডিসেকশান করবার জন্যে মড়ার ওপর থেকে ঢাকাটা সরাতেই মেডিকেল স্টুডেন্ট মিলন একটু চমকে গেল। কুচকুচে কালো একটা বডি, বোধ হয় সাঁওতাল। হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু ভাববার বিষয় হল লাশটার বুড়ো আঙুলটা গভীর করে কাটা। মিলনের প্রথমে মনে হয়েছিল হতে পারে লোকটার বোধহয় জন্ম থেকেই আঙুলটা নেই। এরকম তো কত দেখেছে ও, কারো ছ'টা আঙুল, কারো সাতটা, কারো পাঁচটা, কিন্তু এটা সেরকম ব্যাপার নয়। দেখে মনে হচ্ছে কেউ কেটে দিয়েছে বা কোনোভাবে কাটা পড়েছে। যাকগে এসব নিয়ে ভাবার সময় ওর নেই। ছুরিটা হাতে তুলে নিল মিলন। ইতিমধ্যে ওর ক্লাসের বন্ধুরা শুভ্র, রজত, সৌমেন এসে গেছে। টেবিল ঘিরে ওরা দাঁড়িয়েছে। আজ ওদের ডিসেকশানের বিষয়বস্তু হল পোস্টিরিয়ার পোরশান অফ আর্ম (Posterior portion of arm) অর্থাৎ হাতের একটা বিশেষ অংশ কাটা হবে।

মেডিকেল কলেজ থেকে হাঁটাপথেই মিলনের ফ্ল্যাট। বাবা-মা-ঠাকুমাকে দেশের বাড়িতে রেখে ও আর ওর দিদি জয়া কলকাতায় পড়াশোনার সুবিধের জন্যে এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে। জয়া মিলনের চেয়ে বছর চারেকের বড়, কিন্তু মিলন মায়ের পরেই দিদিকে স্থান দিয়েছে। জয়াও ভাইকে খুব ভালোবাসে, ওর দেখাশোনা করে। কয়েক মাসের মধ্যেই ওকে ফিলোজফির ওপর থিসিস জমা দিতে হবে।

ঘরে ঢুকল মিলন। জয়া একবার ভায়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আজ খুব খাটুনি হয়েছে মনে হচ্ছে।

মিলন চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে বলে, উফ্, খুব। আসলে ডিসেকশান করার ছিল তো।

জয়া বলে ওঠে, মানুষের শরীর নিয়ে কাঁটাছেঁড়া কী করে যে করিস, আমার তো ভাবতেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

হাসল মিলন, সেইজন্যই তো আমি মানুষের শরীর নিয়ে পড়ছি, আর তুই মানুষের মন নিয়ে।

শোবার সময় অনেক কথা হয় ভাই-বোনে। হঠাৎ জয়া বলে বসে, আচ্ছা তুই কি মনে করিস মানুষের শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর পর সবকিছু শেষ হয়ে যায়?

ডেফিনেটলি, বলল মিলন।

নারে, সূক্ষ্ম আত্মা অর্থাৎ মনটা মরে না। জয়া খুব গম্ভীর হয়ে কথাগুলো বলল।

প্রতিবাদের সুরে মিলন বলে ওঠে, শোন দিদি, আমি ওসব বিশ্বাস করি না। কী করে করব বল, ডাক্তারিতে তো মনটাকে ডিসেকশান করা যায় না। তাই ওটার আলাদা কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। ওটা হল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা অংশ। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে ওঠে আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হার্ট, ব্রেন, দেহ সব পুড়ে শেষ হয়ে যায়। তাহলে মন বস্তুটি কি আকাশে ঘুরে বেড়ায়? হাসল মিলন।

গভীর রাত। ঘড়িতে প্রায় রাত দুটো বাজে, অন্ধকার ঘরে দুজনেই ঘুমে অচেতন, হঠাৎ মিলনের ঘুমটা কিসের একটা অস্বস্তিতে ভেঙে গেল। ঘরের মধ্যে একটা কালো ছায়া তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে ওঠে মিলন, কে, কে ওখানে?

জয়ার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বলে, কী রে কী হল? চেঁচাচ্ছিস কেন?

মিলন দিদির দিকে তাকিয়ে বলল, ঐ........দেখ......ঐ দেখ।

জয়া চারদিকে দেখে নিয়ে বলল, কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তুই বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিস। বন্ধ ঘরের মধ্যে কে আসবে।

মিলনা ছায়াটা দেখাবে বলে আঙুল তুলল, কিন্তু কোথায় কী? সত্যিই তো ঘর তো ভেতর থেকে বন্ধ। তবে? নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হল মিলন। একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন ঠিক রাত দুটোয় আবার সেই অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল মিলনের। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো মানুষাকৃতি। এবার আর মিলন চেঁচাল না। কালো ছায়াকে উদ্দেশ্য করে মিলন এবার বলল, তুমি কে? কী চাও? বন্ধ ঘরে ঢুকলে কী করে?

ছায়ামূর্তি হাসল, বলল, ডাক্তারবাবু, আমার শরীর নেই, তবে আত্মা আছে। আমাদের কাছে কোনো বাধাই বাধা নয়। আমরা হাওয়ার মতো যখন ইচ্ছে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি।

মিলন বিরক্ত হয়ে বলল, আবার সেই এক গল্প......

ছায়ামূর্তি বলল, আপনার হাতের কাছে তো টর্চ আছে, একবার আমার ওপর ফেলুন না।

মিলন বলল, কেন? কী হবে?

ছায়ামূর্তি বলল, দেখুন না, সন্দেহ কাটবে।

মিলন টর্চের আলো ফেলল, ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল না। আর যেই নেভাল আবার দেখতে পেল। মিলন একটু অবাক হল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না। বলল, বলো এবার তুমি কেন এসেছ।

ছায়ামূর্তি বলল, আজ আপনি আমার দেহটা নিয়ে কাটাছেঁড়া করেছেন—

একটা ধাক্কা খেয়ে মিলন বলে, তুমি........তুমি.......

হ্যাঁ! ডাক্তারবাবু, ছায়ামূর্তি বলল, এ দেহটায় দেখেছেন বুড়ো আঙুলটা কাটা। আমি তাঁতি, তাঁত বুনে খাই—বুড়ো আঙুল না থাকলে মাকু ঘোরাতে পারব না, তাই ঐ আঙুলটা কেটে নিয়েছে। আসলে তাঁত বোনায় আমার খুব নামডাক হয়েছিল তো তাতেই জামাল হোসেন হিংসেয় জ্বলছিল।

কিন্তু আমি এসব শুনে কী করব? মিলন বেশ বিরক্ত হয়েই বলে ওঠে।

দয়া করে আমার কথাটা একটু শুনুন ডাক্তারবাবু, নয়তো আমার আত্মা উদ্ধার হবে না। হিন্দুর সৎকার না হলে নরকবাস হয়। আমি জানি কাটাছেঁড়ার পর আপনারা ওটার সৎকার করবেন কিন্তু তার আগে আপনাকে আমার কাটা আঙুল জুড়ে দিতে হবে। অঙ্গহানি হয়ে মরলে আমার আত্মা ঘুরে বেড়াবে, শান্তি পাবে না।

কিন্তু আমি কী করব? আমায় এসব বলার মানে কী?

মিলনের কথা শুনে ছায়াশরীর বলল, একটাই অনুরোধ আমার আঙুলটা জুড়ে দিন।

এ্যাঁ। বলছ কী? তোমার কাটা আঙুল আমি জুড়বো? কোথায় পাব? তাছাড়া এসব কাজ বেআইনি। তুমি যাও, শুধু শুধু আমায় বিরক্ত কোর না।

ছায়ামূর্তি বলল, কাটা আঙুল আমি আপনাকে এনে দেব। আপনি দয়া করে ওটা সেলাই করে দেবেন। আর আইনি কি বেআইনি আমি জানি না। আমি শুধু আপনাকে জানি। প্রতিশোধ না নিলে আমি শান্তি পাব না।

মিলন বলল, আমি যদি এটা না করি তো কী করবে তুমি?

ছায়ামূর্তি বলল, এটা আপনাকে করতেই হবে ডাক্তারবাবু। নয়তো এখন আমি শুধু রাতে আসছি, এরপর দিনরাত আপনার সঙ্গে থেকে আপনাকে বিরক্ত করব, সব কাজ পণ্ড করে দেব। জীবনটা তখন দুর্বিষহ মনে হবে।

মিলন অবাক হয়ে বলল, বাঃ, ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চাইছ। তুমি বোধহয় জান না আমি ভয় কাকে বলে জানি না।

না ডাক্তারবাবু, ওভাবে বলাটা আমার উচিত হয়নি। আপনি দয়া করুন। আমাকে মুক্তি দিন।

একটু ভেবে মিলন বলল, মর্গে একজন ইনচার্জ থাকে। আর থাকে কালু ডোম। ঐ সব করে, কিন্তু এ কাজটা করতে গেলে ইনচার্জকে লুকিয়ে কালু ডোমকে ঘুষ দিতে হবে। যা আমি ভয়ানক অপছন্দ করি।

দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ভগবান আপনার ভালো করবেন।

কিন্তু ঐ কাজের জন্যে তো একটা আঙুল চাই।

এসে যাবে। আপনি পরশুদিন লাশকাটা টেবিলে ওটা পেয়ে যাবেন।

মিলন আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাইছিল কিন্তু দেখল ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পরদিন সন্ধেবেলা জালাল নিজের মনে খড় কেটে চলেছে। সঙ্গে লোকটাকে পাঠিয়েছে খড় কিনতে। হঠাৎ দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নন্দ তাঁতি। চমকে উঠল জালাল। এ কী করে হয়, সে তো ক'দিন আগেই মরে গেছে। আর মেরেছে তো তার ভাড়াকরা গুন্ডারা। তাহলে! জালালের গলা শুকিয়ে গেল। বলল, কে.....কে ওখানে!

ছায়ামূর্তি উত্তর দিল, তোর যম, বদলা নিতে এসেছি।

কিসের বদলা! জালালের গলা কেঁপে উঠল।

ভুলে গেলি এত তাড়াতাড়ি? তাহলে তোকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি শোন। বউ-এর টিউমার অপারেশনের জন্যে তোর কাছে দশ হাজার টাকা ধার চেয়েছিলুম। কথা ছিল এক মাসের মধ্যে শোধ করব। কিন্তু যখন শোধ দিতে এলুম তুই খাতা দেখিয়ে বললি আমি নাকি তোর কাছ থেকে দশ লাখ টাকা ধার নিয়েছি। আর তা না দিলে তুই আমার জমিজমা, তাঁত মেশিন দখল করে নিবি। আমি বলেছিলুম, মিথ্যে কথা বলবি না, তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে নেব। তুই বললি, তাই নাকি! তবে দেখ, তোর আমি কী করি।

এই বলে তুই সেদিন রাত্তিরে আমাকে গুন্ডা দিয়ে ঘর থেকে টেনে বার করে আমার বুড়ো আঙুলটা কেটে দিলি, যাতে আমি তাঁত বুনতে না পারি। ঐ অবস্থায় আমি ছুটে যাচ্ছিলুম থানায়, তোর গুন্ডারা আমাকে রাস্তাতেই.....মরবার সময় দেখলুম তোর মুখে শয়তানের হাসি। তাই তখন কিছু করতে না পারলেও আজ করব। আমি আজ তোর ঐ আঙুলসুদ্ধু ডান হাতটাই কেটে নেব।

ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল জালাল। ওর পেছনে তাড়া করে চলল নন্দ তাঁতি। ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেল জালাল আর তখুনি নন্দ তার অশরীরী শক্তি দিয়ে ওকে মেরে ফেলল। তারপর ওর আঙুলটা কেটে নিয়ে গেল মর্গে।

যা সে কোনদিন বিশ্বাস করেনি সেই ভূতের জন্যে মিলন গিয়ে চুপিচুপি কালু ডোমের সঙ্গে দেখা করল। সন্ধের পর থেকে মদে চুর হয়ে থাকে কালু, তাই কলেজের ফাঁকেই গেল। ওর হাতে ৫০০ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। লোভে কেমন করে উঠল কালুর চোখ। বলল, কী করতে হবে বাবু।

মিলন সব বলল। বলল ওর ঐ মড়াটার ওপর একটা কাজ আছে। রাত এগারোটার সময় ও একবার যাবে, কালু যেন সব ব্যবস্থা করে দেয়।

সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মিলন দেখল নন্দ তাঁতির দেহটা ফরম্যালিন দিয়ে রাখা আছে ছাত্রদের ডিসেকশানের জন্যে। কিন্তু আঙুল কই? নন্দ তো বলেছিল আঙুল এনে দেবে। না হলে তো তার টাকাটাই গেল। তাছাড়া এসব কাজে রিস্ক তো কম নয়। আফশোস হল মিলনের—এ তার কী হল! একটা ভূতের জন্যে সে এতবড় বোকামো করল। তাকে বিশ্বাস করল!

চমকে উঠল মিলন, তার সামনেই টপ করে কে যেন একটা সদ্য কাটা আঙুল এনে রাখল। তাকিয়ে দেখল ছায়ামূর্তি।

চটপট সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে গেল মিলন। দিদিকে বলে গিয়েছিল রাত হবে, ডিউটি পড়েছে। দিদি খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়েও পড়েছে। টেবিলে খাবার ঢাকা ছিল, মিলন খাবারটা খেয়ে শুয়ে পড়ল। উত্তেজনায় তার শরীরটা তখনও কাঁপছিল। ঘুম আসছিল না। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় কে যেন ডাকছে, ডাক্তারবাবু—

মিলন তাকিয়ে দেখল ছায়ামূর্তি। বিরক্ত হল। বলল, তুমি আবার কেন? তোমার কাজ তো হয়ে গেছে, এবার আমাকে দয়া করে মুক্তি দাও।

ছায়ামূর্তি নম্রকণ্ঠে বলল, আমি শুধু একবার আপনাকে প্রণাম করে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে চিরকালের মতো চলে যেতে এসেছি। আপনি ভালো থাকুন ডাক্তারবাবু, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

মিলনের ঘুম এল না আর। তার জীবনে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। সত্যিই কি তাহলে মৃত্যুর পরও মানুষের অস্তিত্ব থাকে? দিদির কথাই ঠিক? অবিশ্বাস করবে কী করে। এ তো সবটাই তার নিজের কানে শোনা, নিজের চোখে দেখা—নিজের হাতে করা। মিলনের মনে হল, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না।

শারদীয়া ১৪২১

রক্তলোলুপ

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রেডিয়াম ডায়ালের টাইমপিস জ্বল জ্বল করছিল অন্ধকার ঘরে। রাত সোয়া দুটো।

আচমকা ঘুম ভাঙলো কারণটা বুঝতে একটু দেরি হয়। কারণ বোঝার চেষ্টাও আমি করছিলাম না। আমার অবাক লাগল মাঝরাতে এভাবে ঘুমটা ভাঙল কেন! সারাদিন আমি প্রচুর পরিশ্রম করি, দুপুরে বিশ্রাম একটু হয়, কিন্তু সেটা খুঁটিয়ে দুটো খবরের কাগজ পড়ার জন্য—ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে পড়ি, চোখ যে লাগে না কোনোদিন এমন নয়, কিন্তু তাকে ঘুম বলে না। ঘুমোই আমি এই রাত দশটা সাড়ে-দশটা থেকে ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত, এর মধ্যে কোনোদিনই আমায় উঠতে হয় না। এত বড়ো বাগান-বাড়িতে মানুষ বলতে আমি একা, পুষ্যিই রয়েছে অষ্টগণ্ডা—ঝগড়া-ঝাঁটি রাত্তিরে যে তারা করে না এমন নয়, কিন্তু সে জন্যে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত আমার কখনো হয়নি। আজ তাহলে এমন কী হল যে এই মাঝরাতে আচমকা আমায় উঠে বসতে হল!

বেডসুইচ আছে, সেটা টিপে আলো জ্বাললাম। কলকাতা থেকে দূরে এই বাদকুল্লায় ভোল্টেজ সাধারণত কমই থাকে। বিকেল বিকেল টিউব লাইট জ্বেলে না রাখলে পরে জ্বলে না। আমার শোবার ঘরে একশো ওয়াটের আলো চল্লিশ ওয়াটের মতো জ্বলে। এখন কিন্তু সে আলো ঝকঝক করছে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি।

না, সব ঠিকঠাক আছে, ঠিক যেমনটি থাকার কথা। শোবার ঘরে জিনিসপত্রের বাহুল্য নেই, যা আছে সব গোছগাছ। জানলা যেমন খোলা থাকে তেমনি আছে, দরজা বন্ধ। ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণী বলতে জিমি, আমার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান কুকুর। সে মাথা তুলে নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক-ঠাকই আছে, কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। তাহলে? আমার ঘুম ভাঙাল কে? অকারণেই ভাঙল? অসম্ভব, এমন তো কোনোদিন হয়নি! বাইরে বেরিয়ে একটু দেখব? দেখতেই পারি, ভয়-ডর বলতে কিছু নেই আমার, ছোটবেলা থেকেই। বলতে কী, আমাদের বাদকুল্লার এই দেড়বিঘে জমির বিশাল বাগানবাড়ি দেখাশোনার ভার আমি নিজেই হাতে তুলে নিয়েছি। গ্রাজুয়েশেনের পর বাবাকে বলেছিলাম, 'চাকরি-বাকরি আমার ভালো লাগে না। বাদকুল্লার ওই জমি নিয়ে পড়ে থাকতে চাই আমি।'

অবাক হয়েছিলেন বাবা, আমার দুই ছোট ভাইও। কারণ পড়াশুনো করতে আমি বরাবরই ভালোবাসি, তবে সেটা বাঁধাধরা পড়াশুনো নয়। এখানেও তাই করছি। নানারকম সবজি লাগাই, কলার ক্ষেত আছে, আম-কাঁঠাল গাছ আছে—সারাদিন দেখাশোনা করি। আশপাশে যারা থাকে তার সব খেটে খাওয়া মজুর কিম্বা শাক-সবজি বিক্রেতা। কেউ কেউ আমার কাছ থেকেও কিনে নিয়ে যায়। একটা মাছওয়ালাকে বলা আছে, দু-একদিন অন্তর মাছ দিয়ে যায়। সন্ধেবেলা সব ভোঁ ভাঁ, তখন আমি পড়াশুনা করি। নিজের পছন্দমতো লাইব্রেরি তৈরি করেছি একটা। বেশি পাওয়ারের টেবিল ল্যাম্প, অসুবিধা হয় না পড়তে। ভায়েদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, আমি বিয়ে করব না জানিয়ে দিয়েছি। তারা আসত মাঝে মাঝে। বাবাও আসত, এখন বিশেষ নড়াচড়া করতে পারে না।

আসার মধ্যে নিয়মিত বছরে বার দুই-তিন আসে ছোটকাকা। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো শখ, বাইরে কোথাও গেলেই সেখান থেকে দুর্লভ একটা কিছু নিয়ে আসে আমার জন্যে। আমার লাইব্রেরি-ঘরে ছোটকাকার গিফটগুলোই সাজানো আছে যত্ন করে। এর মধ্যে লেটেস্ট সংগ্রহ হচ্ছে একটি বারো বাই আট পাথরের মূর্তি, মিশর বেড়াতে গিয়ে নিয়ে এসেছে ছোটকাকা। মূর্তিটি এক ভীষণদর্শন শেয়ালের। ওখানে ফারাওদের সময় শেয়ালকেও নাকি দেবতা হিসাবে পুজো করা হত। সেরকমই এক শেয়ালদেবতা। দেবতাকে পুজো করতেন যে পুরোহিত তাঁর নাম নাকি ছিল ফারামিশ। একটি কবচে তাঁর নাম খোদাই করা আছে হাইরোগ্লিফিকস লিপিতে। সেটাও দিয়েছে সঙ্গে। সবে আজই সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে গেছে ছোটকাকা।

উঠলাম একবার। জিমিকে বলতে হয় না, ছায়ার মতো আমার অুসরণ করবে। দোতলায় আমার লাইব্রেরি ছাড়া কয়েকটা মাত্র ঘর বানানো আছে, মূলত অতিথিদের জন্যই। দোতলার ভেতর বারান্দায় কিছু বেড়াল শোয়। ওসের জন্যে চট পাতা আছে, কিন্তু ঘরে ওদের নিয়ে শোবার পক্ষপাতী আমি নই।

আলো জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলাম। রান্নাঘর পেরিয়ে ছোট ছোট কুঠরি—সেও আমার পুষ্যিদের জন্যেই। একটায় থাকে খরগোশ, পরেরটায় একটা ছাগল। কে যেন দিয়ে গিয়েছিল, এখন ওটাকে নিয়ে আমার অনেকটা সময় কাটে। একেবারে শেষে আমার পোলট্রি। দুজন বাঁধা খদ্দের আছে, বাজারে বিক্রি করে।

কিন্তু আজ এই মুহূর্তে পোলট্রির দিকে চেয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উটল আমার!

একি! দরজা খোলা কেন? সামনে দুটো-একটা ব্রয়লার মুরগি যেন পড়ে আছে বলেও মনে হচ্ছে!

আলো কম ছিল বলে বুঝতে পারছিলাম না, কাছে গিয়ে গোটা ব্যাপারটা স্পষ্ট হল আমার কাছে।

বীভৎস একটা নারকীয় কাণ্ড ঘটে গেছে এখানে। রক্তবন্যা বইছে এখন ভেতরে।

ঢুকেছিল কেউ খাঁচার মধ্যে। যে কটা মুরগি এখনও বেঁচে আছে তারা পেছনের দেয়ালে সিঁটিয়ে আছে। বাকি সব রক্তাক্ত দেহে লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেয়। তাদেরই কয়েকটা আমি বাইরে পড়ে থাকতে দেখেছি।

কেউ ঢুকেছিল নিঃসন্দেহে খাঁচা ভেঙে, এবং যে ঢুকেছিল সে মানুষ নয়। মানুষ হলে সে মুরগি চুরি করে পালাত, এভাবে মুরগি নিধন যজ্ঞে উন্মত্ত হয়ে উঠত না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সে কোন জন্তু! জিমি অনেক সময়ই বাইরে ছাড়া থাকে, সুতরাং রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর এখানে ঢুকবে না। অন্য কোনো জন্তুর উৎপাত আমি দেখিনি কখনো এখানে, নয়-নয় করে ষোল-সতেরো বছর তো হয়ে গেল। তার চেয়েও অবাক কাণ্ড, আমার ঘুম ভেঙেছে বটে—সেটা কী কারণে আমি জানি না, কিন্তু কাজটা হয়েছে প্রায় নিঃশব্দে। এতটাই নিঃশব্দে যে জিমি পর্যন্ত কিছু টের পায়নি। মুরগিগুলোর ঝটাপটি বা চিৎকারেই সম্ভবত আমার ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু জিমির কানে তা গেল না কেন! না কি মুরগির চিৎকারটা স্বাভাবিক ভেবেই ও কিছু সাড়াশব্দ দেয়নি!

জায়গাটা পরিষ্কার করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। সকালে দুটো কাজের লোক আসে, বাগানে আমার সঙ্গে হাতে হাতে কাজ করে। খায়ও এখানেই তারা। সন্ধেবেলা রাঁধুনির সঙ্গেই খেয়ে-দেয়ে চলে যায়। রেখে দিলে হত তাদের জন্যে, আমার ভালো লাগল না।

মনটা খুঁত খুঁত করছিল। এমন অঘটন কখনো ঘটেনি এখানে। ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, কী মনে করে একবার লাইব্রেরি-ঘরে এলাম। এসে এই দ্বিতীয়বারের জন্য চমকে উঠলাম আমি। ঠিক দেখছি তো, নাকি আমার চোখের ভুল!

ছোটকাকার শেয়ালদেবতার মূর্তি কাচের শো-কেসে যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু তার ছুঁচলো মুখে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—

না, পাথরের দাগ নয়, শুকিয়ে জমাট হওয়া কালচে রঙও নয়, একেবারে টাটকা তাজা রক্ত লেগে রয়েছে সেখানে। কোনো সন্দেহ নেই।

দুই

এখন শেয়ালদেবতার মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। সকালের রোদ এসে পড়েছে মূর্তিটার ওপর। রাতে মূর্তির মুখে যে রক্ত লেগে থাকতে আমি দেখেছি, তার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। রক্তের কালচে দাগও নেই তার মুখে।

গোটা ব্যাপারটা মস্ত বড়ো একটা ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং যেটা হয়ে গেল সেটাকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কারণ সেটা সত্যি হলে বলতে হবে এই কাচের বাক্সে বসা পাথরের মূর্তি সজীব হয়ে উঠেছিল, সেটা কাচ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল, আকারে বিরাট বড়ো হয়ে রক্তলোলুপ সেই পশুটা তার পিপাসা চরিতার্থ করে ফিরে এসেছিল কাচের ডালায়। মুখে তখন তার রক্তের দাগ ছিল, এখন সেটাও মিলিয়ে গিয়েছে কোনো অলৌকিক উপায়ে।

'কতকগুলো কথা তোকে আমি বলব যেটা শুনতে তোর নিজেরও হাস্যকর লাগবে, আমারও তাই লেগেছিল'—ছোটকাকার কথাগুলো আমার মনে পড়ছিল, জিনিসটা আমার হাতে তুলে দেবার আগে যখন বলেছিল, 'তবু তোকে বলছি কেন? না, সেটার ওপরই নির্ভর করছে এটা তুই রাখবি না আমাকে ফিরিয়ে দিবি।'

'ফিরিয়ে দেব? তুমি ভালোবেসে একটা রেয়ার জিনিস উপহার দিচ্ছ—আমি ফিরিয়ে দেব তোমায়! আজ পর্যন্ত কখনো হয়েছে এরকম?'

'হয়তো এবারও হবে না, কিন্তু কথাগুলো তোকে না বললে আমি অপরাধী থেকে যাব।'

'তাহলে বলো।'

'খুব নির্ভরযোগ্য একটা ডিলারের কাছ থেকে এই কিউরিওটা আমি পেয়েছি। তাঁর কাছে এই মূর্তি সম্বন্ধে যে তথ্য রয়েছে সেটাই বলছি তোকে। তিন হাজার বছর আগেকার এক ফারাওয়ের পিরামিড থেকে এটা উদ্ধার করা। তিনি শেয়ালদেবতার পুজো করতেন।'

'ফারাওয়ের নাম কী?'

'বলতে পারেননি তিনি, তবে মন্দিরের পূজারী যিনি ছিলেন, তাঁর নাম বলেছেন, ফারামিশ।'

'এটাই কি সেই শেয়ালদেবতা?'

'না না। সে মূর্তি কবে হারিয়ে গিয়েছে কেউ জানে না। মন্দিরের গায়ে এরকম মূর্তি অনেক ছিল, এটা তারই একটা। এই সঙ্গে আর একটা জিনিসও ডিলার আমাকে দিয়েছেন'—বলে ছোটকাকা যেটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সেটা এখন একেবারে ডানদিকে ছোট একটা কাচের প্লেটে রাখা আছে। প্রায় এক টাকার কয়েনের মতো সাদা স্বচ্ছ এক খণ্ড পাথর, দু'পাশে সরু, পেটটা মোটা। ছোটকাকা বলেছিল, 'এটা নাকি ফারামিশের মন্ত্রঃপূত কবচ।

'কী হয় এই কবচ দিয়ে?'

'সেটা আমি জিগ্যেস করিনি, তবে এই শেয়ালদেবতার মূর্তি সম্বন্ধে অনেক আজগুবি কথা বলেছিলেন তিনি।'

'যেমন?'

'এই মূর্তি নাকি মাঝে মাঝে জ্যান্ত হয়ে ওঠে—অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে ওঠে সে তখন, যা খুশি তাই নাকি করতে পারে।'

'তুমি বিশ্বাস করো সে কথা?'

'করি না, কিন্তু তোকে বলে দেওয়াটা তো আমার কর্তব্য। এরকম কোনো লক্ষণ দেখলে'—কথার মাঝখানেই আমি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম ছোটকাকাকে, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'কিছু না হলে তো মিটেই গেল, কিন্তু হলে তুই সঙ্গে সঙ্গে এটা কোনো বড়ো পুকুর-টুকুরে ফেলে দিয়ে আসবি।'

তার মানে, এই মূর্তি এখন আমার ফেলে দিয়ে আসা উচিত কোথাও। ফেলে আমি দিতেই পারি, কিন্তু ফেলে দেওয়া মানেই এটা স্বীকার করে নেওয়া যে, ছোটকাকার কথাগুলো আমি সত্যি বলে ধরে নিয়েছি। পোলট্রি ফার্মে যে একটা দক্ষযজ্ঞ হয়েছে এব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা অন্য যে কোনো কারণেও হতে পারে। প্রথম প্রথম এখানে শেয়ালের সম্মিলিত চিৎকার শোনা যেত। এখন অবশ্য বিশেষ শুনতে-টুনতে পাই না। বেশ কয়েক বছর আগে একটা ছোটখাট হেঁড়োল দেখা গিয়েছিল পোড়া শিবতলার ওদিকে। সেরকমই একটা কিছু হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল আমার এখানে, এটা একেবারে অসম্ভব নয়। ভয় পেয়ে গিয়ে আমি পাথরের মূর্তির মুখে রক্তের দাগ দেখে ফেলেছি, এ আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুতরাং এখনই এই মূর্তি ফেলে দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়।

সারাদিন মোটামুটি সাবধানেই ছিলাম। অবশ্য সকাল থেকে যে পরিমাণ পরিশ্রম আমাকে করতে হয় তাতে অন্য কথা মনে পড়াও মুশকিল। তিন-তিনজন জোয়ান মানুষ কাজ করে বাড়িতে, তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে হয় আমাকে। দুপুর দুটোর পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কাগজ হাতে নিয়ে আমার একটু অবসর। তার আগে লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখে এসেছি আমার শেয়ালদেবতাকে। যেমন ছিলেন তেমনি আছেন, পাথরের মূর্তির যেমনটি থাকার কথা।

সংস্কার মানুষকে কেমন দুর্বল করে দেয় দেখলাম। সন্ধেবেলায় কাজের লোকজন খেয়ে-দেয়ে চলে যাবার পর আমি জমিয়ে বসে পড়ি কয়েক ঘণ্টা লাইব্রেরিতে। আজ বারেবারেই চোখ চলে যাচ্ছে কাচের বাক্সটার দিকে, মনই বসছে না পড়ায়। অথচ বিকেলেই পাড়ার দু-চারজন লোক এসেছিল, আসে অবশ্য মাঝে মাঝে, চায়ের লোভ ধরিয়ে দিয়েছি আমি—ওই চায়ের লোভেই আসে। তারাও বলল, পুব-পাড়াতে নাকি কার গোয়ালঘর থেকে বাছুর টেনে নিয়ে গেছে একটা হেঁড়োল। জিমি এই সময় বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে, নীচেও যায় কখনো। সবচেয়ে বড়ো কথা এসব নিয়ে কখনই কিছু ভাবতে হয় না আমাকে, আমার মাথাতেই আসে না কিছু। মনকে শক্ত করেই শুয়ে পড়লাম খাওয়া-দাওয়ার পর। কবেকার একটা পাথরের মূর্তি আমার রাতের ঘুম নষ্ট করবে এটা কোনো কাজের কথা নয়।

ঘুম কিন্তু আজও ভেঙে গেল, এবং সেটা কানের কাছে জিমির তীব্র চিৎকারে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম, আর তারপরেই জিমির চিৎকারের কারণটা বুঝতে পারলাম আমি। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দিলাম।

ভাবা যায় না! বীভৎস!

চিৎকার করার শক্তিও চলে গিয়েছে ধাড়ি বেড়াল দুটোর। রক্তস্রোতের মধ্যে কাতরাচ্ছে আর বাচ্চাগুলোর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহ ছড়িয়ে আছে এধার-ওধার—ঠিক মনে হচ্ছে দাঁত আর নখে তাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছে কেউ।

আশ্চর্য! এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল আর জিমি সেটা আটকাতে পারল না! বুঝতে পেরেছে একেবারে শেষ মুহূর্তে, আর তখনই চিৎকার করেছে সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু বাইরের

বারান্দায় কেউ এল, বেড়ালগুলো তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পরিত্রাহি চিৎকার করল, জিমি সেটা টের পেল না!

আমি যেটা ভাবছি সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এই ঘর দিয়েই গিয়েছে ওই অভিশপ্ত মূর্তিটা! জিমির চোখ তো অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে! সে-ও টের পাবে না ওর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা!

দ্রুত ফিরে এলাম লাইব্রেরি-ঘরে। ভালো করে দেখলাম কাচের বাক্সর দিকে।

শেয়ালদেবতার মূর্তি বাক্সর ভেতরেই আছে। কিন্তু আজকে আর আমার চোখে ঘুম নেই, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাজা রক্ত লেগে রয়েছে তার মুখে। হ্যাঁ, টাটকা তাজা রক্ত, কোনো ভুল নেই।

তিন

ঘর অন্ধকার নয় আজ, হালকা নীল আলো জ্বলছে ঘরে। রাতে পনেরো ওয়াটের বেডল্যাম্পেই বেশ আলো হয় কলকাতায়, এখানে তা টিম টিম করে, কিন্তু আবছাভাবে সমস্ত ঘরখানাই দেখা যায়। সেটাই আমি চেয়েছিলাম, কারণ জিমি ঘুমিয়ে পড়েছে বটে, আমি আজ ঘুমোব না—আমাকে আজ জেগে পাহারা দিতে হবে। সারাদিন যে পরিশ্রম হয়, তারপরে এটা প্রায় অসম্ভব, আমি জানতাম। সেইজন্যে কাজকর্ম যথাসম্ভব হালকা করেই করেছি, তার ওপর খবরের কাগজ না পড়ে দুপুরে বেশ খানিকক্ষণ ঘুমোবারও চেষ্টা করেছি। হয়নি, কারণ অভ্যেস না থাকলে দুপুরে ঘুম আসে না।

অথচ সকালেও কিন্তু এই মতলবটা ছিল না মাথায়। পোলট্রির ক্ষতিটা আমি স্বীকার করে নিয়েছিলাম, সেটা ব্যবসায়িক ক্ষতি, কিন্তু আমার প্রিয় এতগুলো নিরীহ জীবের হত্যা চোখের সামনে দেখা—আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। মাটিতে সব কটাকে ভালো করে পুঁতে দেওয়ার সময়ই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, পাথরের মূর্তিটা আমায় বিসর্জন দিতে হবে, এক্ষুণি, আর দেরি না করে। ওটা একটা থলিতে যখন ভরে ফেলেছিলাম, গায়ে-মাথায় তখনও মাটি লেগে আছে আমার। গেট দিয়ে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

কী বলব আমি ছোটকাকাকে! মূর্তিটা ফেলেই দিয়ে এলাম ছোটকাকা, ঠিকই বলেছিলে তুমি, ওটা অভিশপ্ত এক সর্বনাশা দেবতার! তুমি বিশ্বাস করোনি বলেই আমায় উপহার দেবে বলে নিয়ে এসেছিলে, ভেবেছিলে তোমার সাহসী ভাইপো অন্ধ সংস্কারে ভয় পাওয়ার ছেলে নয়। কিন্তু তুমি জানতে না সংস্কারের হাত থেকে তোমার ডাকাবুকো ভাইপোরও রেহাই নেই। পারেনি সে মূর্তিটাকে সাহস করে কাছে রাখতে। ভয় এমন এক সংক্রামক ব্যাধি যে পর পর দুটি কাকতালীয় ঘটনা ঘটে যেতেই রণে ভঙ্গ দিয়েছে সে। শিরদাঁড়া নরম হয়ে গেছে তার, ফেলে দিয়ে এসেছে সে ঈজিপ্টের এক দুর্লভ সংগ্রহ।

না। এ আমি হতে দেব না। অসম্ভব!

স্বীকার করছি পোলট্রিতে একটা নৃশংস কান্ড ঘটে গেছে। প্রিয় বেড়ালগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে মারা হয়েছে। কিন্তু আমি চোখে দেখিনি কে এ কাজ করেছে। আমি অনুমান করছি ওই বারো বাই আট পাথরের মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে, তার চেহারা বেড়ে যাচ্ছে যেমন খুশি, তারপর সে পাশবিক লালসায় উন্মত্তের মতো খুনগুলো করে চলেছে। কেন এ কথা ভাবছি? কারণ একটা আষাঢ়ে গল্প ছোটকাকা আমাকে বলেছে আর এমনই সাহসী আমি যে, আমার বুকের মধ্যে সেই অন্ধ বিশ্বাসটা একেবারে গভীরভাবে বাস বেঁধে ফেলেছে।

ছি ছি ছি। আজকের দিনের ছেলে হয়ে এই সব ভোজবাজি আর ব্ল্যাক ম্যাজিকে বিশ্বাস করি

আমি! মিশরের একটা প্রাচীন পাথরের মূর্তি হচ্ছে অপদেবতা? রাত-বিরেতে এই এখানে বসে সে তার কীর্তিকলাপ দেখাতে শুরু করেছে!

না, মূর্তিটা আমি ফেলব না—গেট থেকেই ফিরে এসেছিলাম আমি। ঠিক আছে, সত্যি হোক মিথ্যে হোক, নিজে চোখে আমাকে দেখতে হবে ব্যাপারটা। এমনও তো হতে পারে সবটাই আমার অলীক কল্পনা! ছোটকাকা যদি ফিরে এসে বলে, তুই সত্যি দেখেছিস শেয়ালদেবতাকে? গল্পটা তো আমি বানিয়ে বলেছিলাম রে। তখন?

সিদ্ধান্ত আমার তখনই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল, আর তার পরীক্ষা শুরু হয়েছে এখন। রাতবিরেতে কখনো কখনো বেরুতে হয় আমাকে এধার-ওধার, তাই জোরালো একটা টর্চ আছে আমার। আজ মাথার কাছে সেই টর্চটা রেখেছি। কিন্তু সেটা সবচেয়ে দরকার ছিল সেটা হচ্ছে ঘুম তাড়াবার কোনো একটা উপায়। আজ সারাদিন পরিশ্রম খুবই কম হয়েছে, তবু চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। অথচ টাইমপিসে দেখতে পাচ্ছি রাত এখন সবে সোয়া এগারোটা।

আমার এই শোবার ঘর আর লাইব্রেরি পাশাপাশি। দুটো ঘরের মধ্যে বন্ধ দরজাটা আজ খোলা। লাইব্রেরির ছোট আলোটাও এখন জ্বলছে। ফলে ইচ্ছে করলে মাথা তুলে লাইব্রেরি-ঘরটাকেও যখন খুশি দেখে নিতে পারি আমি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ঘুম, এটাকে তাড়াই কী করে!

একটা সহজ উপায় ছিল, জোরালো টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একটা বই নিয়ে বসে পড়া। বই পড়তে বসলে আমার ঘুম পায় না, যদি সে বই সত্যিই টেনে রাখবার মতো হয়। এরকম না-পড়া বই আমার অনেক আছে। প্রত্যেক মাসেই আমি নির্বাচিত কিছু বই ডাকে আনিয়ে নিই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ঘর আলো করে সারারাত বই পড়লে আমি যেটা আশঙ্কা করছি সেটা হবে তো! তার চেয়ে আবোল-তাবোল পুরোনো কথা ভেবে নিজেকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করাই ভালো।

সেটাই করেছিলাম। সেভাবেই কখন যে চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এসেছে বুঝতেই পারিনি। ঘুমটা ভেঙে গেল একেবারে হঠাৎই। আর কী কারণে জানি না, নজর গিয়ে পড়ল লাইব্রেরি-ঘরের দিকেই।

না, সব কিছু যেমন ছিল তেমনি আছে। আমার ঘরও যেমন নিঃশব্দ, জিমি ছায়ার মতো মিশে আছে আধো-অন্ধকারে, লাইব্রেরিও তেমনি শুনশান।

ঠিক তেমনি শুনশান কি!

আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। খুব সন্তর্পণে একটা কিছু মেঝেতে টেনে নিয়ে গেলে যেমন হালকা শব্দ হয়, ঠিক সেরকমই যেন একটা ঘষটে চলার মতো শব্দ। যেন কোনো বেড়াল বা কুকুররে ছানা পা ঘষে ঘষে চলেছে, কিন্তু ঘষটানি শব্দটা ধাতব।

মুহূর্তে টর্চের দিকে হাত চলে গিয়েছিল আমার। সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলাম।

কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। কোনো মানুষের যদি অপকীর্তি হয় এটা, তাকে বুঝতে দেওয়া চলবে না আমি জেগে আছি। ঘরে যেটুকু আলো আছে, দেখবার পক্ষে যথেষ্ট। ভালো করে চেয়ে থাকলে আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ এ ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, যদিও সে ঢুকেছে কেমন করে আমি জানি না, বাইরে থেকে আসবার মতো কোনো দরজাই খোলা নেই।

কড়া নজর রেখেছিলাম, এবং তাতে কাজ হল।

কিন্তু এ কি দেখছি আমি! এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে! নাকি সত্যিই জেগে উঠিনি আমি? এখনও ঘুম ভাঙেনি আমার!

গায়ে একটা চিমটি কাটলাম।

না, জেগে আছি কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জেগে জেগে এমন জিনিস কেমন করে দেখছি আমি!

কাচের বাক্স থেকে কেমন করে শেয়ালদেবতার মূর্তি বেরিয়েছে আমি জানি না, কেমন করে সেটা মেঝেয় নেমেছে তাও আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু সেটা নেমেছ এটা ঠিক। সজীবতার কোনো লক্ষণ তার মধ্যে অবশ্য নেই—সেই পাথরের মূর্তি, একেবারে অবিকল যেমনটি কাচের বাক্সে থাকে। তবে সজীব বলতে হবে এই জন্যে যে, দম দেওয়া পুতুলের মতো পা ঘষটে ঘষটে সেটা এগুচ্ছে শোবার ঘরের দিকে। পা ঘষটানির এই ধাতব শব্দটাই আমার ঘুম ভাঙিয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই, কিন্তু অবাক হবার কারণ তো আছে! একটা কবেকার পাথরের মূর্তি—দিব্যি ওপর থেকে নীচে নামল, কাচের বাক্স থেকে বেরিয়ে এল, এখন স্পষ্ট দেখছি টুকটুক করে এগিয়ে চলেছে আমার চোখের সামনে, কেমন করে সম্ভব এটা! যেমন করেই হোক, ব্যাপারটা ঘটছে এবং আমার কাজ হচ্ছে এখন নিঃশব্দে গোটা জিনিসটা লক্ষ করে যাওয়া, এটা আমি বুঝতে পারছিলাম। সেটাই আমি করতে লাগলাম।

অতি শ্লথ গতি, কিন্তু শেয়ালদেবতার সেই মূর্তি এগোচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। এখন সেটা এসে পড়েছে আমার ঘরে, আমার আরো কাছাকাছি। তাকে আমি এখন আরো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

বুকের মধ্যেটা শিরশির করছিল। আমার দিকেই এগুচ্ছে নাকি মূর্তিটা! না, আমার খাটের কাছে না থেমে সেটা আস্তে আস্তে এগুতে লাগল বাইরের দরজার দিকে। অর্থাৎ আজকেও সে বাইরে বেরুবে এবং অন্য কোনো শিকার সে বেছে নেবে। ছাগল আছে, খরগোশ আছে, কাকে তার আজ পছন্দ আমি জানি না। কিন্তু আমাকে দেখতে হবে বন্ধ দরজা সে খোলে কী করে।

আর একটা ব্যাপারে আমার খুব অবাক লাগছিল। ঘরে একটা টিকটিকি ঘুরলেও জিমি টের পেয়ে যায়। চিৎকার করা ওর স্বভাব নয়, কিন্তু মুখ তুলে অতি সামান্য জিনিস ও লক্ষ করে, আমি দেখেছি। অথচ এরকম একটা ব্যাপার—যত নিঃশব্দেই হোক, ওপর থেকে মূর্তিটা নীচে নেমেছে, ঘষটে ঘষটে এগিয়ে এসেছে ঘরে, অথচ জিমি পড়ে আছে মুখ নিচু করে, ব্যাপারটা সে টেরই পেল না, এটা কী করে সম্ভব!

কথাটা ভাবছিলাম বলেই বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল হতেই নজরে পড়ল, মূর্তিটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পরক্ষণেই কী যে একটা হয়ে গেল, ভালো বুঝতে পারলাম না আমি। যেমন করে দেয়াল থেকে ছাদে ওঠে টিকটিকি লাফিয়ে, যেন খানিকটা তেমনি করেই দরজার গায়ে সেঁটে গেল সেটা, প্রায় নিঃশব্দে। তারপরই—

হ্যাঁ, তারপরই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে।

মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েছি আমি। কী করব না করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পরক্ষণেই লাফিয়ে নেমেছি খাট থেকে। দ্রুত হাতে খুলে ফেলেছি দরজা। এখন জিমিও ত্বরিৎপায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে।

দরজা খোলা। সামনেটা অন্ধকার। কোথাও কোনো চিহ্ন নেই মূর্তিটার! নীচের গাছতলায় শুধু যেন একবার শুকনো পাতা মাড়াবার মৃদু মচমচ শব্দ শোনা গেল।

হাতে টর্চটা নিতে ভুলিনি। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে আলো ফেলেছি আমি। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে আমার। হান্টিং টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম বিরাট লোমশ একটা শরীর।

ফ্যাকাশে লোমের পুষ্ট পুচ্ছদেশ দেখে শেয়ালজাতীয় জীব বলেই মনে হয়। কিন্তু আকারে প্রায় ভল্লুকের মতো; এবং যেভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়েছে তাতে আরো অনেক বেশি হিংস্র জন্তু বলেই মনে হয়।

এরপরই কয়েকটা ব্যাপার দ্রুত ঘটে গেল আমাকে হতবুদ্ধি করে। জিমি চোখের পলকে ছুটে

গেছে সেই জন্তু লক্ষ করে। জন্তুটার দু' চোখে যেন দপ করে দুটো আগুনের গোলা জ্বলে উঠেছে। সেকেন্ড কয়েক পরেই জিমির আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠেছে বাড়ি।

কী সর্বনাশ! এবার কি তবে জিমির পালা!

মুহূর্তে নিজেকে ঠিক করে নিলাম আমি। লাইব্রেরি-ঘরেই রাখা থাকে একটা ধারালো ভোজালি। এটাও ছোটকাকার দেওয়া, তিব্বত থেকে এনে দিয়েছিল। কাজে আমার লাগে না, কিন্তু আজ কাজে লেগে যাবে মনে হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি টেনে নিলাম ওটা। চোখ পড়ে গেল কাচের বাক্সর ওপর। শূন্য, ভেতরে এখন কিছু নেই। শেষ মুহূর্তে কেন যে ফারামিশের কবচটা পকেটে ভরে নিলাম তাও জানি না। আর এক সেকেন্ড সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। টর্চটা ফোকাস করলাম ঠিক যেখানে জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আমি বুঝতে পারছিলাম। জন্তুটা তখন সবে দু-এক পা এগিয়েছে। মাটিতে পড়ে আছে জিমির রক্তাক্ত নিথর মৃতদেহ।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল আমার। তীব্র এক আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে গলা চিরে। সেই শব্দেই বোধহয় ফিরে তাকিয়েছে জন্তুটা। দেখতে পেয়েছে আমাকে। কালবিলম্ব না করে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে আমার দিকে, এখন আর শ্লথ গতিতে নয়, হিংস্র শ্বাপদের মতোই দ্রুত গতিতে। এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে একেবারে বিমূঢ় করে লাফিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে।

বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল আমার।

বীভৎস হিংস্রতার প্রতিমূর্তি যেন। কয়েক লাফে এগিয়ে এসেছে, নিশ্বাস পড়ছে হাপরের মতো। মুখ দিয়ে লালা আর রক্ত একই সঙ্গে ঝরছে। চোখ দুটো দুই অগ্নিগোলক—তাদের তপ্ত আভার আঁচ লাগছে আমার মুখে। যে-কোনো মুহূর্তে ওই উদ্যত জিহ্বা আর দু'পাশের দুটি ধারালো দাঁত ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। ছিন্নভিন্ন করে দেবে আমাকে।

চোখের সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু, বেঁচে আছি হয়তো কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, তবু কী আশ্চর্য, আমার মাথা কাজ করছিল। চোখের সামনে আমার বিশ্বস্ত অ্যালসেশিয়ানটার যে মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝতে পারছিলাম কোনোরকম প্রতিরোধই আমি গড়ে তুলতে পারব না। জিমির ধারালো দাঁত যাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আমার হাতের ভোজালি আমি তার দিকে তুলে ধরবার সুযোগ পর্যন্ত পাব না। অর্থাৎ নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করতে হবে আমাকে বহু শতাব্দীর রক্তলোলুপ এই প্রেতাত্মার কাছে। পাথরের আবরণ থেকে সে জেগে ওঠে তার এই রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করবার জন্যই এবং এই পিপাসা না মিটিয়ে সে তৃপ্ত হবে না।

হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল আমার। কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল আমার মাথায়।

একটা জিনিস আছে আমার সঙ্গে। এই বীভৎস দানবকে যে আমায় দিয়েছিল, আর একটা জিনিসও সে দিয়েছে আমায়। এবং সেটা আছে এখন আমার কাছেই। যেন যান্ত্রিকভাবেই হাত ঢুকে গেল আমার পকেটে, আমি বার করে এনেছি ফারামিশের সেই মন্ত্রঃপূত কবচ, এবং তারপরই—

অজ্ঞান হয়ে যাইনি, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

ওই তীব্র চিৎকার পৃথিবীর কেউ কখনো শুনেছে কিনা আমি জানি না। তীক্ষ্ণ, কাঁপা-কাঁপা, সমস্ত রক্ত হিম করে দেওয়ার মতো চিৎকার।

নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করতে করতে আমি দেখতে পেয়েছি এক অবিশ্বাস্য এবং অদ্ভুত দৃশ্য।

অত বড়ো জন্তুটা দেখতে দেখতে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছে। চোখের পলকে ফিরে এসেছে তার সাবেক চেহারা—সেই পাথরের বারো বাই আট মূর্তি। কিন্তু সেই মূর্তিতেও সে স্থির থাকতে পারেনি। পরক্ষণেই সে মূর্তি বিকট শব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে আমার সামনে।

একটা মানুষের পক্ষে একসঙ্গে এত কিছু সহ্য করা এবং এমন দ্রুত ক্রমান্বয়ে, বোধহয় সম্ভব নয়। আমার চেতনা লোপ পেয়ে যাচ্ছিল। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল তার মধ্যেই আমি দেখতে পেয়েছি আমার ফটক পেরিয়ে দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে শুরু করেছে এদিকে। স্বাভাবিক, ওই বীভৎস চিৎকার শুনে কেউ স্থির থাকতে পারে না বাড়িতে।

এর পরের কাহিনি আর বেশি বলার দরকার নেই। আমি নিজেও কোনো ব্যাখ্যা পাইনি এর। ছোটকাকাকে জানিয়েছিলাম, এসেছিল ছোটকাকা। দুটি কাজ করে গেছে। ফারামিশের কবচ নিয়ে গেছে কোথাও ফেলে দেবে বলে, আর সুন্দর একটা অ্যালসেশিয়ানের বাচ্চা উপহার দিয়ে গেছে আমাকে।

শারদীয়া ১৪১৮

জঙ্গল কুঠির জাদুঘর

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে ন্যাশানাল হাইওয়ের দু'পাশে গভীর জঙ্গল। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে। তবু এমন জায়গাতেই হঠাৎ গাড়িটা বিকল হল। স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে অভিষেক গিয়ার রডটা ধরে বারকয়েক টানাটানি করে হতাশ কণ্ঠে বলল, নাঃ, মনে হচ্ছে এ গাড়ি আর নড়বে না। গিয়ার বসে গেছে।

সে কী রে, অভিষেক! পাশ থেকে সন্দীপ বলল, আজ রাতের মধ্যে কলকাতা অফিসে না ফিরতে পারলে ইলেকশান বুলেটিনটা কালকের কাগজে বেরুবে কী করে?

কোনো উপায় নেই, বন্ধু। মনে হচ্ছে রাতটা আমাদের এখানেই কাটাতে হবে।

এই জঙ্গলে! সন্দীপের কণ্ঠস্বরে এবারে খানিকটা ভয়ই ফুটে উঠল।

সন্দীপের ভয় পাওয়াটা অবশ্য মোটেই দোষের বলা যাবে না। ওরা দুজনেই শহরের ছেলে। পেশায় 'দৈনিক হরকরা' পত্রিকার তরুণ সাংবাদিক। ওরা গিয়েছিল বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে ওদের পত্রিকার তরফে অ্যাসেমব্লি বাই-ইলেকশানের এক সরাসরি প্রতিবেদন লিখে আনতে। ফেরার পথে এই বিপত্তি।

আশপাশে তো কোনো জনপ্রাণী আছে বলে মনে হচ্ছে না। গত এক ঘণ্টার মধ্যে এ রাস্তায় কোনো গাড়ির দেখাও মেলেনি। এ অবস্থায় এই অজানা জঙ্গলে গাড়িতে বসে রাত কাটানোটাও মোটেই নিরাপদ নয়।

ক্যা.....ক্যা...ক্যা......!

জঙ্গলের স্তব্ধতা ভেঙে কর্কশ শব্দ তুলে এক রাতজাগা পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল।

আর ঠিক এই সময়ে সন্দীপের নজর পড়ল একটু দূরে গাছগাছালির ফাঁকে একটা ছোট্ট বাড়ির আভাস।

সন্দীপের কথায় অভিষেকও সেদিকে তাকাল। ইতিমধ্যে সূর্য ডুবেছে বটে কিন্তু আকাশে উঠে পড়েছে প্রতিপদের প্রায় গোটা চাঁদটা। ছড়িয়ে পড়েছে সাদা জ্যোৎস্না। সেই আলোতেই চোখে পড়ল একটা বাড়িই বটে। কিন্তু এই ঘোর জঙ্গলে বাড়ি বানিয়ে বাস করবে কে?

দু'বন্ধু দুজনের দিকে তাকিয়ে বোধহয় একই কথা ভাবে। তারপর অভিষেক বলে, চল সন্দীপ, বাড়ি যখন আছে মানুষও নিশ্চয়ই থাকবে। অন্তত আজ রাতের মতো ছাদের আশ্রয় তো একটা পাওয়া যাবে।

কি......কিন্তু যদি ভূতুড়ে বাড়ি হয়?

সন্দীপের কথা শেষ হবার আগেই হো হো করে হেসে উঠল অভিষেক, তারপর বলল, পেশায় সাংবাদিক হয়েও তোর এই ভূতের ভয়ের কথা শুনলে আমাদের 'হরকরা' সম্পাদক সত্যদা নিশ্চয়ই খুশি হবেন না.....

বলতে বলতে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায় অভিষেক। অগত্যা সন্দীপও নামে।

জঙ্গলের মধ্যে পুরনো একতলা একটা কুঠিবাড়ি। তবে ঠিক পোড়ো বাড়ি মনে হল না। জায়গাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ। কোথাও একটা ঝিঁঝিঁও ডাকছে না। এর মধ্যে দুই বন্ধুর শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে চলার খস খস শব্দ যেন এক রহস্যময়তা সৃষ্টি করল।

সন্দীপ বলল, মনে হচ্ছে এ কুটিতে কোনো মানুষ থাকে না। দেখছিস না বাড়ির সব দরজা-জানলাগুলো বন্ধ!

বলার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ব্যাপার! বন্ধ কাচের জানালার ওপারে একটা ঘরের মধ্যে দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। যেন সন্দীপের কথা শুনেই কেউ ঘরের আলো জ্বালিয়ে ওদের অভ্যর্থনা জানাল।

সন্দীপ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, অভিষেক, আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না। চল, আমরা বরং একটা রাত গাড়ির ভেতরে বসেই কাটাই। গাড়ি তো ভেতর থেকে লক্ করা থাকবে.....

তুই পাগল হয়েছিস সন্দীপ? নিশাচর হিংস্র জানোয়ার থেকে শুরু করে নিশাচর দুষ্কৃতী কী না থাকতে পারে রাতের জঙ্গলে! গাড়ির লক্ আমাদের বাঁচাতে পারবে? চল, ছেলেমানুষি করিসনি।

এবার প্রায় জোর করেই সন্দীপকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে অভিষেক।

জংধরা তারকাঁটা ঘেরা একটা জংলা বাগান পেরিয়ে কুঠিবাড়ির মূল দরজার সামনে এসেই ওরা থমকে দাঁড়াল।

দরজা খোলা। আর খোলা দরজার সামনে একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন নিয়ে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ।

অদ্ভুত তার আকৃতি। মাথা জোড়া টাক। চিবুক থেকে বুক পর্যন্ত ঝোলা সাদা দাড়ি, গোঁফ। অনেকটা সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল-এর ছড়া 'কাঠ-বুড়ো'র ছবির মুখটার মতো। কিন্তু এর পরনে চোস্ত পায়জামা আর বেনিয়ান। লম্বা রোগা কুঁজো একটা লোক। চোখের দৃষ্টি কী উজ্জ্বল!

আপনাদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি। কেমন যেন রহস্যময় ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, লোকটা, জানতাম, আপনারা আসবেন।

জানতেন......মানে........! অভিষেকের মতো সাহসী ছেলের কণ্ঠটাও এবার কেমন যেন কেঁপে গেল।

হ্যাঁ। এটা আমার কুঠি। আমার কাজের জন্যে এমন একটা জায়গাই দরকার ছিল।

আপনি.....মানে......আর কাজের কথা কী যেন বললেন......

আমি জয়রাম পতি। আমি বলি কি এই খোলা জঙ্গলে আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়। বলতে বলতে হাতের হ্যারিকেনটা তুলে বলল, ভেতরে আসুন।

সন্দীপ ইতস্তত করলেও অভিষেক আর কথা বাড়াল না, সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ লোকটার পেছনে হেঁটে চলল।

একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। ঘরের পাল্লা ভেজানো ছিল। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। বুড়ো জয়রাম পতির পিছু পিছু ঘরের মধ্যে পা দিল ওরা।

এই আলোকিত ঘরটাই বোধহয় ওরা বাইরে থেকে দেখেছিল।

কিন্তু ভাঙা-জীর্ণ এক কুঠিবাড়ির মধ্যে এমন সুন্দর ঘর থাকতে পারে ভাবা যায় না। দেওয়াল জোড়া নানারকম ছবি, ল্যান্ডস্কেপ। ইজেলস্ট্যান্ড। আঁকার সরঞ্জাম। ঘরের মাঝখানে একটা শুধু তক্তপোশ।

মনে হচ্ছে এটা একটা স্টুডিও। এসব ছবি কার আঁকা? দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে অভিষেক জিগ্যেস করল।

এটাই তো আমার কাজ, তুলি দিয়ে জীবন্ত ছবি আঁকা।

জয়রাম পতি এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করল, দুই বন্ধু একসঙ্গে চমকে তার দিকে তাকাল। মনে হল, কথাটা বলার সময় জয়রাম পতির দু'চোখের দৃষ্টিটা এক পলকের জন্যে কেমন বদলে গেছে। এটা কি নেহাত দেখার ভুল?

অভিষেক অবশ্য মন থেকে এসব অনুভূতি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। শিল্পীরা অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা খামখেয়ালি পাগলাটে হয়, একজন সাংবাদিক হিসেবে অভিষেক তা জানে। তাছাড়া অভিষেক আর্টের সমঝদার। নিজেও ছবি আঁকে। তাই বেশ আগ্রহ নিয়েই ঘুরে ঘুরে চার দেওয়ালের ছবিগুলো দেখছিল। বেশির ভাগই প্রকৃতির নানা রূপ। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত থেকে শুরু করে সুনামির ভয়ঙ্কর ধ্বংসের চিত্র কিছুই বাকি নেই। এমনকি ভয়াবহ কালবৈশাখীর এক চিত্ররূপ দেখে বুকটা কেঁপে ওঠে। এসব দেখে মনে হয় এসব কোনোটাই ছবি নয়, বাস্তবের হুবহু প্রতিরূপ। এসব এ বুড়োর যদি সত্যিই আঁকা হয় স্বীকার করতেই হবে, এ এক অসাধারণ শিল্পী। কিন্তু এমন মানুষ এই ঘোর জঙ্গলে.......দেখতে দেখতে একটা ছবির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল অভিষেক। সব কটা চিত্র থেকে এটি আলাদা। এক অসাধারণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যপট। একটা বাগান। কত বিচিত্র ফুলের গাছ। আর সেই সব ফুলের রঙে রঙ মিলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বর্ণময় প্রজাপতিরা....

দারুণ! ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলে, কিন্তু এই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অন্তত একজন মানুষ না থাকলে ছবিটাই যেন অসম্পূর্ণ থাকে...

বলতে বলতে জয়রাম পতির দিকে তাকিয়েই থমকে গেল অভিষেক। জয়রাম পতির দু'চোখের দৃষ্টিতে কী এক অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছে। চোখাচোখি হতে আগের মতোই ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, ঠিক বলেছেন। আসলে ওখানে যাবার মতো মানানসই মানুষ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এ আবার কী কথা! লোকটা বড় শিল্পী হতে পারে কিন্তু ওর চেহারা, চালচলন, চোখের দৃষ্টি কোনোটাই স্বাভাবিক নয়!

মরুক গে যাক! তাতে দু'বন্ধুর কী এসে যায়। অভিষেক একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, আজকের রাতটা বরং আপনার এই স্টুডিও ঘরেই অতিথি হয়ে কাটিয়ে দিই। আগামীকাল ঘর ছেড়ে যাবার আগে আপনার গোটাকয়েক পেন্টিং-এর ছবি তুলে নিয়ে যাব। গভীর জঙ্গলে এমন আশ্চর্য আর্ট গ্যালারির খবর দেশের মানুষ জানলে একটা হৈচৈ পড়ে যাবে...

বলতে বলতে ঘুরে তাকিয়েই অবাক হল অভিষেক। জয়রাম পতি তার কথার মধ্যেই কখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

আশ্চর্য পাগল লোক যা হোক! বলে ঘুরতেই এবার সন্দীপের মুখোমুখি। সন্দীপ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে জয়রাম পতির গমনপথের দিকে। ওর দৃষ্টিতে ভয়ের ছায়া। এতক্ষণ সন্দীপ একটা কথাও বলেনি। এবার ফিসফিস করে বলে, আমার কী মনে হচ্ছে জানিস অভিষেক, এই কুঠির ঘরে এমন কিছু রহস্য লুকোনো আছে, যা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না।

রহস্য এখানে যাই থাকুক, রাতের জঙ্গলে মাথার ওপর এমন একটা ছাদের আশ্রয় জুটেছে এতেই আমি খুশি। সারাদিন যা ধকল গেছে, নিদ্রাদেবীর আরাধনা ছাড়া এখন আর কোনো দিকে আমার মন যাবে না।

বলতে বলতেই ধপ্ করে সেই তক্তপোশের ওপর শুয়ে পড়ল অভিষেক।

সত্যিই দুই বন্ধু সারাদিনের পরিশ্রমে খুবই ক্লান্ত ছিল, তাই শোবার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে ঘুম নামতে দেরি হয়নি।

সন্দীপ ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে—

সে আর অভিষেক ঘুরে বেড়াচ্ছে সুন্দর এক বাগানের মধ্যে। এখানে ভোরের স্নিগ্ধ আলো আর সুশীতল বাতাস শরীর জুড়িয়ে দেয়। বাগানে কত বিচিত্র ফুলের গাছ। কত না রঙবাহার। আর সেই সব ফুলের রঙে রঙ মিলিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে বর্ণময় প্রজাপতির ঝাঁক। একটা লাল পলাশ গাছের ডালে বসে মধুর স্বরে ডাকছে একটা কোকিল। এত সুন্দর সাজানো বাগান সত্যিই জীবনে কোনোদিন দেখেনি সন্দীপ....যেন ছবির মতো....কথাটা ভাবতেই মনে পড়ল—আরে, এই বাগানের ছবিটাই তো ও দেখেছে কুঠিঘরের দেওয়ালে। সেটা এভাবে সত্যি হয়ে গেল কী করে! তবে যে জয়রাম পতি বলল ওই বাগানের ছবি তার আঁকা—এক কাল্পনিক ল্যান্ডস্কেপ মাত্র.....

হঠাৎ যেন ফুৎকারে সব আলো কে নিভিয়ে দিল! থেমে গেল কোকিলের কুহুস্বর।

সন্দীপের ঘুমটা ভেঙে গেল।

এ কোথায় পড়ে আছে সে? চতুর্দিকে শুধু কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া। ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে ধোঁয়ার রঙ। এটাই কি সেই কুঠিঘর?

সন্দীপের মাথার মধ্যেটা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে.....সব কিছু কেমন যেন গোলমাল লাগছে...এটাও কি স্বপ্ন?...না, নিজের হাতে চিমটি কাটে সন্দীপ....অভিষেক! অভিষেকই বা কোথায়? গাঢ় ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে কিছুই নজর পড়ছে না। সন্দীপ হাঁক দিল, অভিষেক....কোথায় তুই? ওর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত ভাবে প্রতধ্বনিত হল। কিন্তু অভিষেকের সাড়া পাওয়া গেল না। না, কোথাও নেই অভিষেক....

হিঃ...হিঃ....হিঃ....হিঃ

একটা অদ্ভুত খিল খিল হাসির শব্দে ফিরে তাকিয়েই শিউরে উঠল সন্দীপ।

ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে জয়রাম পতি। কিন্তু ওভাবে ও হাসছে কেন? হাসতে হাসতে বীভৎস হয়ে উঠেছে ওর মুখের ভঙ্গি! চোখের দৃষ্টিতে কী নিষ্ঠুর কৌতুকের ঝলক! সবচেয়ে আশ্চর্য—ওর হাতে ওটা কী? এক মস্ত তুলির মতো—নাকি কোনো জাদুদণ্ড!

জয়রাম পতির সেই অদ্ভুত তুলির মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—নীল...গাঢ় সবুজ...হলুদ!

না, আর এক সেকেণ্ড এখানে থাকা যাবে না। এটা একটা জাদুকাঠি! সন্দীপের মন বলল—আর ওই বুড়ো লোকটা, ও কি সত্যিই শিল্পী, নাকি কোনো জাদুকর.....

মাথার মধ্যেকার ঝিমঝিমিনিটা বাড়ছে। এখান থেকে এক্ষুনি বেরুতে হবে, দেরি হলে আর পারবে না সন্দীপ।

শরীরের সব শক্তি জড়ো করে ঘর থেকে বাইরে লাফ মারল সন্দীপ!

এসব কী বলছ, সন্দীপ? তোমার কোনো কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'দৈনিক হরকরা'র সম্পাদক সত্য মজুমদারের কথায় সন্দীপ একই ভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, বিশ্বাস করুন সত্যদা, আমি একটুও মিথ্যে বলছি না।

কিন্তু পুলিশ তোমাকেই সন্দেহ করবে। বলেব নিশ্চয়ই রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তুমি.....

বেশ, আপনি নিজে একবার চলুন আমার সঙ্গে। জায়গাটা আমি ঠিক খুঁজে বার করব। সন্দীপ একবার ঢোক গিলে বলল, সকালে বেরুলে দুপুরের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব।

এবার সন্দীপের দিকে কয়েক সেকেন্ড স্থির চোখে তাকিয়ে সত্য মজুমদার বললেন, হ্যাঁ, যেতে

আমায় হবেই। অন্তত অভিষেকের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার রহস্যটা উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমার রেহাই নেই।

ঠিক হল পরদিন সকালেই একটা গাড়ি নিয়ে সত্য মজুমদার সন্দীপের সঙ্গে সেই জঙ্গল কুঠির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

তখনও কি তারা ভাবতে পেরেছিল কী ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে?

যখন ওরা দুজনে সেই জায়গাটার কাছাকাছি এসে হাজির হল, সূর্যটা সবে পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে।

কিন্তু সূর্যের সবটুকু আলো ঘন জঙ্গলের গাছগাছালি ভেদ করে মাটিতে এসে পৌঁছোয় না। এখানে সর্বদাই ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশ।

সত্যদা, ওই তো, ন্যাশানাল হাইওয়ের ধারেতে আমাদের সেই গাড়িটা। তার মানে আমরা ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছি।

সত্য মজুমদারের এখন গাড়ির দিকে নজর দেবার সময় নেই, বললেন জঙ্গল কুঠি কোনদিকে?

আসুন, মনে হচ্ছে এই পথে।

এটাই কি সেই জঙ্গল কুঠি? হ্যাঁ, তাইতো। একটুকু-ও ভুল করছে না সন্দীপ। কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে জরাজীর্ণ এক পোড়ো বাড়ি! সে রাতে তো এতটা ভাঙাচোরা মনে হয়নি। তবে কি দিনের আলোতে এর আসল রূপ ধরা পড়েছে?

কই হে, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

সত্যদার কণ্ঠস্বরে অন্যমনস্কতা ভাঙল সন্দীপের। বলল, হ্যাঁ, চলুন সত্যদা।

একটা ভাঙা লোহার গেট পেরিয়ে জংলা বাগান, তারপর ওই বাড়ির আসল গেট। সে গেট খোলা। দরজা ভাঙা।

কেউ কি ভেতরে আছেন? আছেন কেউ?

সত্য মজুমদারের কণ্ঠস্বর ভেতর থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এল, কিন্তু কোনো মানুষেরই সাড়া মিলল না। তাহলে কোথায় গেল সেই জয়রাম পতি! সে রাতে তো সন্দীপের সাড়া পেয়ে সে নিজে এসেছিল ওদের অভ্যর্থনা করতে। কথাটা ভাবতেই এই দিনমানেও বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল সন্দীপের।

অনেক ডাকার পরও কেউ যখন বেরিয়ে এল না, সত্য মজুমদার নিজেই সন্দীপকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে পা দিলেন।

কিন্তু এ ঘরে সত্যিই কি মানুষ বাস করতে পারে? চারদিকে ধুলো ময়লা আগাছার স্তূপ। সন্দীপ দেখল সত্যদার ভ্রু জোড়া ক্রমেই বিরক্তিতে কুঞ্চিত হচ্ছে।

এ পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় সেই স্টুডিও ঘর হে? আর শিল্পীই বা কোথায়? মনে হল হরকরা সম্পাদকের কণ্ঠ থেকে এবার ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে।

এদিকে আসুন, সত্যদা।

সত্য মজুমদারকে নিয়ে সন্দীপ এবার কয়েক পা হেঁটে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো।

হ্যাঁ, এই তো সেই ঘর। সে রাতেও এমন ভাবেই ভেজানো ছিল।

আস্তে করে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সন্দীপ। পেছনে সত্য মজুমদার।

কিন্তু ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল সন্দীপ। সে কি ভুল করল? এটা তো একটা ভাঙা পোড়ো ঘর ছাড়া কিছু নয়। চারদিকে জঞ্জালের স্তূপ। তক্তপোশ একটা রয়েছে তবে তার এক পায়া ভাঙা। বিছানার কোনো বালাই নেই। অথচ.....

সন্দীপ, এবার তোমার গল্পটা ছেড়ে আসল সত্যিটা বলবে? সত্য মজুমদার সন্দীপের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর কণ্ঠে দুরন্ত ক্রোধ, বলো, অভিষেক কোথায়? মনে রেখো, পুলিশ তোমায় ছাড়বে না।

সন্দীপ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যদাকে সে কী করে বিশ্বাস করাবে...

চুপ করে থেকো না। সত্যিটা তোমায় বলতেই হবে....।

সত্য মজুমদারের কথাটা শেষ হল না, কোথা থেকে হঠাৎ একটা ঝোড়ো বাতাস এসে ঘরে ঢুকল। হাওয়ার ঘূর্ণিতে উড়ে গেল ঘরের ধুলোর স্তর। আর তখনই চোখে পড়ল ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটা ল্যান্ডস্কেপ।

আরে! এটাই তো সেই ছবি! সেদিন সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে এই ছবিটাই দেওয়ালে দেখে প্রশংসা করেছিল চিত্ররসিক অভিষেক, তারপর সে রাতে স্বপ্নের মধ্যে ছবির ওই বাগানটাই দেখেছিল সন্দীপ।

কিন্তু একি! সেদিন এই বাগানের ছবিতে কোনো মানুষ ছিল না। আজ এল কোথা থেকে! একজন দাঁড়িয়ে আছে ছবির লাল শিমুল গাছটার নীচে......!

অভিষেক! অভিষেকই তো! তারই ছবি! একটুও ভুল নেই!

সন্দীপ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চিৎকার করে উঠল।—সত্যদা!

কী...কী হয়েছে....বলো....বলো আমায়?

সন্দীপ কিছু না বলে ছবির দিকে আঙুল তুলে দেখায়।

সত্য মজুমদার ধীরে ধীরে সেই বাঁধানো ল্যান্ডস্কেপ দু'হাতে তুলে ধরেন, তারপর বিড়বিড় করে বলেন, অভিষেক....হ্যাঁ, অভিষেক! এখানে তার ছবি কে আঁকল। এমন জীবন্ত.....

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ছায়া ঘনিয়ে এল। সন্দীপ বাইরের দিকে তাকাল। সারা আকাশটা যেন কালো মেঘে ঢেকে গেছে। মেঘ—না, ধোঁয়া...কুল কুল করে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ঘরের মধ্যে....ধোঁয়ার রঙ বদলাচ্ছে—নীল....সবুজ....হলুদ....এত ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে?

হঠাৎ কি রাত নেমে এল...রূপ পাল্টাচ্ছে জঙ্গল কুঠির—জেগে উঠছে জয়রাম পতির জাদু স্টুডিও! সন্দীপ জানে এরপর কী ঘটবে!

শেষবারের মতো প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল সন্দীপ, সত্যদা, পালান—পালিয়ে চলুন....

কিন্তু সত্য মজুমদারের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কোথায় তিনি!

ধোঁয়া আরও গাঢ় হচ্ছে। চতুর্দিকে ধোঁয়ার ঘূর্ণি! শরীরটা ক্রমেই হালকা বোধ করছে সন্দীপ। না, তার মধ্যে আর কোনো ভয়ের অনুভূতি নেই। দেখতে দেখতে শরীরটা তার লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেতে—একতাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই!

বৈশাখ ১৪১৫

বিদেহীর প্রতিশোধ

রণেন বসু

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা, অন্তত বছর কুড়ি-পঁচিশ। সে সময় এমন এক ঘটনা ঘটেছিল, বিশ্বাস করা যায় না, অথচ না করেও উপায় নেই, কারণ ঘটনার সাক্ষী আমি নিজে। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, সব কিছু বিজ্ঞানের বিচারেই বিচার করি। কিন্তু সেই ঘটনার কাছে বিজ্ঞান অর্থহীন, অসহায়। সেই ঘটনা বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যাখ্যা হয় না।

সবে বি. এস-সি পাস করে পুলিসের চাকরিতে ঢুকেছি। পুলিসের কাজ আমার খুবই পছন্দ, তাই ভালভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলাম ব্যারাকপুরের লাটবাগানের পুলিস ট্রেনিং কলেজে।

ট্রেনিং-এর পরে প্রথম নিয়োগ পেয়েছিলাম দীঘা থানার ছোট দারোগাবাবু রূপে।

তখনকার দীঘা এখনকার মত ছিল না। সমুদ্রের তীরে বেলাভূমি। কিছু কিছু জেলেদের ঘর। আর একটু দূরে দূরে গ্রাম। সরকার সবে সেটাকে পর্যটন কেন্দ্ররূপে গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন। সরকারী কাজও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে থানার সৃষ্টি এবং আমিই তার প্রথম ছোট দারোগাবাবু।

আগেই লিখেছি, পুলিসের কাজ করা ছিল আমার স্বপ্ন, তাই বেশ আনন্দেই ছিলাম। মাঝে মাঝে রতে জীপ নিয়ে দীঘা, রামনগর বা পানিপারুল পর্যন্ত জেলা সড়ক বরাবর টহল দিতে হত। আর সেটা আমার কাছে বেশ আনন্দজনকই ছিল।

সেদিন ছিল বোধহয় অমাবস্যা, তার সাথে যোগ দিয়েছে শনিবার। তার সাথে আবার আকাশে ঘনঘোর মেঘ। যে কোন সময় আবার ভয়ঙ্কর বৃষ্টিও হতে পারে। সময়ও বর্ষাকাল। সন্ধ্যায় এক পশলা বৃষ্টি হয়েও গেছে। নিশুতি রাতে আমরা টহল দিয়ে ফিরছি রামনগর থেকে দীঘার পথে।

জীপের সামনের সীটে বসে বড়বাবু বা বড় দারোগাবাবু, আমি ও ড্রাইভার। আমি মাঝখানে। বড়বাবুর মুখে মোটা জ্বলন্ত চুরুট। তাঁর চোখের দৃষ্টি স্থির। জীপের পেছনের সীটে সশস্ত্র কনস্টেবল চার-পাঁচজন।

রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো।

বৃষ্টিভেজা কালো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে জীপের তীব্র আলো ছুরির মত চাপ চাপ অন্ধকারকে চিরে এগিয়ে চলছে।

আমরা সবাই চুপচাপ। বড়বাবু একমনে গলগল করে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন।

মাঝে মাঝে গাছপালায় ঢাকা গ্রামের মধ্যে এসে পড়ছি, দু-একটা কুকুর হয়তো হঠাৎ ডেকে উঠছে, কখনও বা আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলছি। ড্রাইভার একটা নির্দিষ্ট গতিতে জীপটা চালিয়ে চলেছে।

সামনেই একটা গ্রাম, একটু পরেই তার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীপটা যাবে। হঠাৎ দেখলাম বেশ দূরে একটা লোক দু'হাত তুলে রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের আলোয় জীপটি এগোবার সাথে সাথে লোকটিও ক্রমশ আমাদের চোখের সামনে বড় হয়ে পরিষ্কার ফুটে উঠতে লাগলো। বেশ বুঝতে পারছিলাম, লোকটি জীপটা দাঁড় করাতে চায়। তবুও ড্রাইভার হর্ন দিয়ে

লোকটিকে সরে যেতে ইশারা করে। কিন্তু লোকটা সরে যাবার কোন লক্ষণই দেখালো না। বাধ্য হয়ে ড্রাইভার লোকটির সামনে জোরে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করালো।

বড়বাবু প্রচণ্ড ধমকাতে গেলেন কিন্তু তার আগেই লোকটি হাত-পা নেড়ে পাগলের মত চেঁচাতে লাগলো—"খুন—খুন দারোগাবাবু—খুন—খুন। শীগগির চলুন, তা না হলে ওরা পালিয়ে যাবে।" লোকটির গলার স্বরটা কেমন ফ্যাঁসফেঁসে বলে আমার মনে হল। আর মনে হল লোকটি কথা বলছে যেন কত দূর থেকে। লোকটির কথা যেন ওর মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। অন্য কোথাও থেকে শুনছি, যদিও ওর মুখ নড়ছে।

বড়বাবু হাত তুলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ওকে চুপ করতে ইশারা করে জানতে চাইলেন, "কোথায়, কে খুন হয়েছে, কারা করেছে?"

আমি কিন্তু লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার অবাক লাগলো ওর চোখ দুটোকে দেখে, ওর চোখ দুটো কেমন যেন স্থির, শীতল ও পাথুরে বলে মনে হল।

লোকটি বড়বাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বললে, "আসুন বাবু, তাড়াতাড়ি আসুন, এখনও ওরা ঘরের মধ্যেই আছে।" বলে লোকটি রাস্তা থেকে নেমে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

ড্রাইভারকে গাড়িতে রেখে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বড়বাবু লোকটির পিছু পিছু রাস্তায় নেমে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমিও ওনার পাশে পাশে এগোচ্ছি।

বড়বাবু আমার কানের কাছে মুখটা এগিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "লোকটা মিস্টিরিয়াস, একটু সাবধানে চল।" বড়বাবুর কথা শুনে একটু চমকে উঠলাম। আমার মনের কথাই বড়বাবু বললেন। তাই হাতটা কোমরের রিভলবারের ওপর রাখলাম, পিছন ফিরে কনেস্টবলদের রাইফেলগুলো প্রস্তুত রাখতে বললাম। ওরা আদেশ পালন করে আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগলো। এরই মধ্যে বড়বাবু লোকটির নাম জেনে নিল, ওর নাম মদন।

লোকটি আমাদের আগে আগে ঝোপঝাড় ডিঙ্গিয়ে, বাঁশের ঝাড়ের তলা দিয়ে অবলীলাক্রমে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ওকে অনুসরণ করতে আমাদের বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, মেঠো পথটা বেশ কাদা।

"তুমি দেখছি আমাদের খুন করবার তালে আছ।" বড়বাবু বেশ বিরক্ত কণ্ঠে বললেন।

"কি যে বলেন বাবু"—বলেই সে বললে, "এই তো এসে গেছি।" বলে সামনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, "এই কলার ঝোপটার মধ্যে লাশ পোঁতা আছে। ওরা একটু আগে পুঁতে রেখে গেছে।"

"ওরা কারা?" বড়বাবু বেশ আগ্রহে জানতে চাইলেন।

"আজ্ঞে ওরা চারজন আছে।"

"নামগুলো বল না।" বেশ বিরক্তের সঙ্গে বললেন বড়বাবু।

"এই—এই গাছটার তলায়," বলে একটা হেলানো কলাগাছ দেখালো। টর্চের আলোয় দেখলাম, গাছের গোড়াটা বেশ একটু উঁচু। বোঝা যায়, একটু আগেই মাটি ফেলা হয়েছে। মাটি বেশ আলগা। ভিজে মাটিতে এখনও বেশ কয়েকটা তাজা পায়ের ছাপ রয়েছে। দু'এক জায়গায় কিছু নুনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ঢিবিটার ওপর একটা কলাগাছ, যা একটু আগে লাগানো হয়েছে। ফলে একটু বৃষ্টিতেই হেলে পড়েছে।

"বাবু, লাশটা বার করে দিই"—বলেই লোকটা উবু হয়ে বসে হাত দিয়ে মাটি সরাতে গেল।

"কর কি, কর কি, মাটি খুঁড়ো না, মাটি খুঁড়ো না। কাল দিনের বেলায় সবার সামনে মাটি খুঁড়ে লাশ বার করা হবে।" বড়বাবুর বাধায় লোকটা হাত গুটিয়ে উঠে পড়ে।

"তুমি খুনীদের নাম বল।" বড়বাবু মদনের দিকে চেয়ে বললেন।

মদন খুনীদের নাম না বলে বললে, "চলুন তাড়াতাড়ি, চলুন, ওরা এখনও পালায় নি, এখনও ওদের ধরতে পারবেন।" মদন হঠাৎ চঞ্চল হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বোঝা গেল, খুনীদের পালিয়ে যাবার ভয়ে ও অস্থির হয়ে পড়েছে।

"সুরেশ, মোহিত, তোমরা দু'জনে এখানে থাক।" বড়বাবু দু'জন কনস্টেবলের উদ্দেশ্যে বললেন।

"না না, ওদের থাকতে হবে না, আমি আছি, লাশ কেউ নিতে পারবে না। আপনারা সবাই আসুন।" বলে মদন এগিয়ে চলল।

বড়বাবুর ইশারায় আমরাও ওর পিছন পিছন চললাম। মদন আগে আগে চলেছে। এবার আর জঙ্গলের পথ নয়, বেশ পরিষ্কার গ্রামের পথ। চুপচাপ নিঝুম গ্রাম, এক নাগাড়ে ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে। কয়েকটা বাড়ির উঠোনে কয়েকটা কুকুর একটু ডেকেই চুপ করে গেল। মনে হল, ওরা মদনকে দেখে ভয় পেয়েছে।

আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। জলে ভেজা পথ, আমাদের চলার কোন আওয়াজ নেই। এক সময় একটা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েই মদন আমাদের দাঁড়াবার ইঙ্গিত করলো। তার পর ইশারায় আঙ্গুল দিয়ে সামনের একটা বড় ঘর দেখিয়ে দিতেই বড়বাবুর ইঙ্গিতেই কনস্টেবলরা ঘরটার চারদিকে ঘিরে ফেলে। বড়বাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, হাতে ধরা তাঁর রিভলবার। আমার হাতেও একটা। মদন আমাদের পাশে পাশে।

বড়বাবু বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ঘরে কে আছ দরজা খোল।"

বোঝা গেল ঘরের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

বড়বাবু আবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "পালাবার চেষ্টা করো না, ঘরটার চারপাশে পুলিস দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।"

ভিতর থেকে কোন জবাব পাওয়া গেল না। আমরা রিভলবার বাগিয়ে ধরে বন্ধ দরজায় জোরে লাথি মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে আলগা খিল ভেঙ্গে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। ভিতরের লোকগুলি তাদের অস্ত্র নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই আমাদের সামনে মদনকে দেখে চমকে উঠলো। ওদের হাত থেকে অস্ত্রগুলো হঠাৎ পড়ে যেতেই বড়বাবু চেঁচিয়ে আদেশ দিলেন, "হাত ওপরে তোল। পালাবার চেষ্টা করো না, বাড়িটার চারিদিকেই পুলিস।"

আমার মনে হল, বড়বাবুর কোন কথাটি ওরা শুনছে না। আমাদের সঙ্গে মদনকে দেখে ওরা বিস্মিত। চোখগুলো বড় বড় করে ওরা মদনকে দেখছে। আস্তে আস্তে ওদের মুখগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বড়বাবুর আদেশে ওদের সবার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দেওয়া হল।

মদনের দিকে চেয়ে বড়বাবু বললেন, "চল, এবার লাশটা বার করা যাক।"

"চলুন হুজুর," বলে মদন আমাদের আগে আগে চলতে লাগলো। একটু পরেই খুনী চারজনকে নিয়ে আমরা সেই কলাগাছের ঝোপটার পাশে এসে পড়লাম।

"মদন, মাটি খোঁড়ার জন্য একজন লোক আর সাক্ষীর জন্য গ্রামের প্রধানকে ডেকে আনতে হবে।"

"এখুনি ডেকে আনছি ওদের।" বলেই মদন অন্ধকারে যেন প্রায় মিলিয়ে গেল। তার যাবার পথের দিকে বোবার মত চেয়ে রইল সেই চারজন খুনী।

একটু বাদেই কোদাল কাঁধে এসে দাঁড়ায় একজন। বলে, "মদন আমাকে পাঠিয়ে দিল।"

"তা ও গেল কোথায়?" বড়বাবু জানতে চান।

"আজ্ঞে ও গ্রাম প্রধান জগবন্ধুবাবুর বাড়িতে গেছে, এখনই আসবে।" মাটি কাটার লোকটি বলে।

"লোকটি আবার না পালায়, ওকে এ কেসে বিশেষ দরকার।" বড়বাবু স্বগতোক্তি করেন।

মাটি কাটা লোকটি ঝপাঝপ মাটি কাটতে থাকে। বড়বাবু ধমক দিয়ে বললেন, "এই, আস্তে আস্তে কোদাল চালাও। ওখানে একটা লাশ পোঁতা আছে, ওটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

লোকটা চমকে উঠে মাটি কাটা বন্ধ করে বলে, "লাশ! মানে মরা মানুষ?" তারপর ভয় পেয়ে বললে, "বাবু, আমাকে ছেড়ে দেন, এই সকালে আর মড়া ছুঁতে পারবো না।"

বড়বাবু কড়া এক ধমক দিয়ে বললেন, "যা করছো কর, তা নইলে এদের সঙ্গে তোমাকেও চালান করে দেবো।"

ধমক খেয়ে লোকটি ব্যাজার মুখে মাটি কাটতে লাগলো। এদিকে পূর্ব আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হঠাৎ মাটি কাটার লোকটা গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

ঠিক এই সময় হন্তদন্ত হয়ে গ্রাম প্রধান জগবন্ধুবাবু এসে পড়ে বললেন, "নমস্কার দারোগাবাবু, কে খুন হল? মদন বললে, কে একজন খুন হয়েছে, আপনি—এ কি! এ কি! বলে জগবন্ধুবাবু নিজের চোখ দুটো কচলিয়ে নিলেন। তার পর গর্ত থেকে বার করা লাশটা ভাল করে দেখে বললেন, "এ তো মদনেরই দেহ! তবে—তবে—একটু আগে মদন যে আমায় ডেকে আনলো। অথচ ওর দেহ এখানে!" বলতে বলতে তিনি সেই কাদা মাটিতেই বসে পড়লেন।

হঠাৎ খুনী চারজন হাউমাউ করে বড়বাবুর পা জড়িয়ে ধরে বললে, "বড়বাবু, মদনের হাত থেকে আমদের বাঁচান। আমরা অপরাধ স্বীকার করছি, তা না হলে আমরা মদনের আত্মার হাতেই মরবো। আমাদের জেলে দিন, আমাদের বাঁচান।"

সে রাতের স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারি নি। ভূত আছে কি নেই, সে তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। তবে বিদেহী আত্মা যে আছে, সে বিশ্বাস আমার হয়েছে সেদিনের সেই ঘটনার পরে।

আশ্বিন ১৩৯০

বাবুল

সুকুমার ভট্টাচার্য

টেলিফোনের বোতাম কটা টেপার পরে পরেই, অপর প্রান্ত থেকে ডাঃ ব্যানার্জির গলা পেলেন ডাঃ সুদীপ্তা মণ্ডল। বললেন, 'ব্যানার্জিদা, আমি সুদীপ্তা বলছি। ভালো কোনো ড্রাইভারের সন্ধান আছে? আমার গাড়িটা ড্রাইভ করার জন্যে! আমার যে মহাপুরুষটি ছিলেন, তাকে দুর করে দিয়েছি।'

'কারণ?' গম্ভীর প্রশ্ন ডাঃ ব্যানার্জির।

'সে অনেক কথা। সেসব এখন বলতে চাই না। শুধু একটা ঘটনাই বলব, একদিন রাত্রে চেম্বার থেকে বাড়ি ফিরব বলে গাড়িতে এসে উঠেছি, দেখি মহাপুরুষ দারু পান করে বসে মেজাজে ফিল্মি গানা গাইছেন। তারপরই—'

কথার মাঝেই ডাঃ ব্যানার্জি বাধা দিয়ে বললেন, 'বেশ করেছ। রাইট ডিসিশন। যাই হোক, একজনের কথা আমার উপস্থিত মনে পড়ছে। সে মানুষ এখনো ফ্রি আছে কিনা জানি না। আর গাড়ি চালাবে কিনা তাও জানি না, তবে ফুললি ডিপেনডেবল। তোমার এই ব্যানার্জিদার থেকেও বিশ্বস্ত এবং নির্ভরশীল।'

'তাহলে তো ভালোই হয়।' প্রায় উচ্ছ্বসিত ডাঃ সুদীপ্তা মণ্ডল উত্তর দেন।

'তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। মানুষটি সম্বন্ধে।' একটু দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন ডাঃ ব্যানার্জি।

'কথা! কী কথা?'

'না থাক! আমার কিছু না বলাই ভালো। তবে যদি তাকে পাঠাতে পারি,—আই মিন যদি সে যায়, সময় মতো হয়তো সে নিজেই কোনোদিন মুখ খুলবে। সহানুভূতির সঙ্গে যদি মানুষটিকে ট্যাকল করতে পারো, তাহলে তুমি খুবই বেনিফিটেড হবে।'

'তা-তাহলে তাকে আপনি নিজের কাছে রাখেননি কেন?'

'কী করে রাখব! তুমি কি মনে করো, ইচ্ছে করলেই কেউ কাউকে নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে? আমার কাছে একসময় সে ছিল। আমার মেজাজ তাকে আমার কাছে থাকতে দেয়নি। তুমি ডাক্তার হলে হবে কি, মায়ের জাত তো। তোমাদের চারিত্রিক গুণপনা আমাদের নেই। দেখো যদি রাখতে পারো। অ্যাভেলেবল হলে, দু-একদিনের মধ্যেই তোমার চেম্বারে পাঠিয়ে দেব।'

চার-পাঁচ দিন পর, রাত্রের শেষ রুগীটিকে দেখে ডাঃ সুদীপ্তা মণ্ডল চেম্বার থেকে বেরোতে যাবেন, এমন সময় একটি মানুষ এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। একটু চড়া গলায় বললে, 'আমি জানকিরাম ঘোষ। জাতে গোয়ালা। পেশা, গাড়ি চালানো। মানে ড্রাইভার। অবশ্য জানা-চেনা মানুষ কখনো-সখনো বলে ছেলে-মারা জানকী। ডাঃ বুদ্ধদেব ব্যানার্জি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার নাকি একজন ড্রাইভারের দরকার?

পরনে একটা খাকি রঙের রঙচটা ফুল প্যান্ট। গায়ে একটা মেরুন রঙের হাতকাটা গেঞ্জি। মাথার চুল সাদা-পাকায় মেশানো। রোগা একহারা চেহারা। চোখ দুটো কোটরাগত। তাতে মার-খাওয়া মার্জারের দৃষ্টি। সুদীপ্তা দেবী তার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখের পলক ফেলতে

পারলেন না। মানুষটির কথা বলার ধরনও কেমন যেন অদ্ভুত। কেউ যে এমন করে নিজের পরিচয় দিতে পারে, সেটা তাঁর ধারণার বাইরে।

আবার নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন!'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জানকী জবাব দিল, 'না। সেটা সমীচীন হবে না। বরং আপনার কাছে সেটা নিন্দনীয় এবং গর্হিত কর্ম বলে বিবেচিত হবে। আমি দাঁড়িয়েই থাকি। আপনার যা বলবার বলুন।'

মনে মনে আবার হোঁচট খেলেন সুদীপ্তা দেবী। বাপরে! মুখের ভাষার কী বিচিত্র মহিমা! সোজা কথা সোজা ভাবে বলতে পারে না নাকি? ততক্ষণে জানকী বলতে শুরু করেছে, 'কিছু মনে করবেন না, মাঝে মাঝে আমার মুখ দিয়ে কেতাবী ভাষা বেরিয়ে পড়ে। কারণ ছোটবেলা থেকে গ্রামে-গঞ্জে একটানা যাত্রা করে কাটিয়েছি। পরে পেটের দায়ে ড্রাইভারি শিখেছি বটে, কিন্তু কথার মধ্যে কিছু কিছু নাটুকে ডায়ালগ ঢুকে পড়ে। নিন বলুন, শুনি আপনার বক্তব্য।'

ডাক্তার মহিলা। সাইকোলজির অনেকটাই আয়ত্তে। কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেন মানুষটির মানসিকতা। তাছাড়া সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে যখন ডাঃ ব্যানার্জি আছেন, তখন আশঙ্কার কিছু নেই। তাই একেবারে কাজের কথায় চলে গেলেন। বললেন, 'আমি ডাক্তার মানুষ। সময়-অসময়ে এদিক-ওদিক ডাক পড়ে। যেতে হয়। কখনো-সখনো একটু রাত্তিরেও। আমার একজন সৎ মানবদরদী ড্রাইভার দরকার। সেই কারণেই ডাঃ ব্যানার্জিকে বলেছিলাম—'

'থাক। আমি সবই জানি। ব্যানার্জি সাহেব আমাকে সবই বলেছেন। আপনার গাড়ি আমি চালাব। কিন্তু একটা প্রশ্ন, ড্রাইভারকে মানবদরদী হতে হবে, কথাটা যদি একটু প্রাঞ্জল করে বলেন। তাহলে আমার বুঝতে সুবিধে হয়।'

আশ্বস্ত করলেন সুদীপ্তা দেবী, 'আপনার অসুবিধে হবার কিছু নেই। হয়তো আমার বলায় ভুল হয়েছে। ধরুন, রোগী মরো মরো, কল এসেছে, আমায় তক্ষুনি বেরোতে হবে। কিন্তু ড্রাইভার হিসেবে আপনি এ ডাকের গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, যেতে পারব না। আমার এখন টিফিনের সময়। কিংবা রাত্তির হয়ে গেছে, এত রাতে কোথাও গেলে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। এরকম সাত-পাঁচ ভেবে কথাটা বলেছি।'

'না-না-না, ওসব চিন্তা করবেন না। আমি জানি, মানুষ খুব বিপদে না পড়লে, ডাক্তারকে কেউ অমনভাবে ডাকে না। অমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বেরোবে না।'

'বেশ, তাহলে কাল থেকে কাজে লেগে যান।'

'কাল থেকে কেন? বাইরে দেখলাম আপনার গাড়ি দণ্ডায়মান, এখন কে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে? তেমন কেউই আছে কি?'

'না। আমি নিজেই ড্রাইভ করব।'

'থাক। আজ আমিই আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। তাছাড়া আমি কেমন ড্রাইভ করি, তারও তো একটা ট্রায়াল নেওয়া দরকার আপনার।'

'বেশ। তাহলে চলুন।' উঠে পড়লেন সুদীপ্তা মণ্ডল।

তার পরদিন থেকে ডাঃ মিসেস মণ্ডলের গাড়ি ড্রাইভ করে জানকীরাম। সুদীপ্তা দেবীও একজন মাঝবয়সী ড্রাইভার পেয়ে সুখী, আর জানকীরামও তার মহিলা ডাক্তার এমপ্লয়ারকে নিয়ে সুখী। যখন কোথাও যাওয়ার নেই, তখন গাড়ির দেখভাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে জানকীরাম। সবই মহিলার চোখে পড়ে। তিনি মনে মনে তারিফ করেন মানুষটির। ধীরে ধীরে দুজনের মধ্যে একটা নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যখন জানকীবাবুকে ডাক দেন, 'জানকীবাবু—'

জানকীরাম সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়ায়, 'বলুন দিদিভাই। বান্দা হাজির।'

ধমকে ওঠেন সুদীপ্তা, 'ছিঃ! আপনাকে কতবার বলেছি না, দিদি ডাকতে হয় ডাকুন, মেনে নিচ্ছি। কিন্তু ওই সব বান্দা-টান্দা আবার কী? বলতে গেলে আপনি আমার দাদার বয়েসি—'

কথা শুনে কুঁচকে যায় জানকীরাম। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'গোস্তাকি মাপ কিয়া যায় দিদিমণি। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।'

বলার ভঙ্গি দেখে সুদীপ্তা দেবী হো-হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'ঠিক আছে। আমি তাহলে প্রীত হব।'

এবার হাসির পালা জানকীরামের। বলল, 'ভালো। এতদিনে উত্তম সন্ধি স্থাপিত হল দুজনের মধ্যে। তবে বান্দার অনভিপ্রেত ত্রুটি যদি আবার প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে আত্মগুণে ক্ষমা করে নেবেন।'

হতাশ সুদীপ্তা দেবী। এ মানুষকে নিয়ে কি করা যায়? তিনি এটা বেশ ভালো বোঝেন, নানা মানুষের নানা স্বভাব। দোষত্রুটি মেনে নিয়েই মানুষের সঙ্গে সমাজে চলতে হয়। জগৎটাই এমনি।

দিন যায়, মাস যায়। গতানুগতিক ভাবে জীবন চলে। একদিন বন্ডেল রোডের কবরখানা পেরিয়ে কসবা রাজবাড়ির দিকে কলে গেছিলেন ডাঃ সুদীপ্তা মণ্ডল। বৈশাখ মাস। সকাল থেকে অসহ্য গুমোটে মানুষের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। রোগী দেখে ফেরার পথে অকস্মাৎ ঝড় উঠল। প্রচণ্ড ঝড়। গাছগাছালি ভেঙে পড়ার দশা। জানকীরাম গাড়ি নিয়ে হিমশিম। সন্ধের অনেক আগেই চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। পরে পরেই নামল মুষলধারায় বৃষ্টি! সুদীপ্তা দেবী মনে মনে উদ্বিগ্ন। বলেন, 'জানকীবাবু, গাড়ি থামিয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে পড়লে হয় না? গাছগুলোর যা অবস্থা, ভেঙে না পড়ে।'

চুপ জানকীরাম। সবেগে ড্রাইভ করে চলেছে।

'জানকীবাবু, এ ছাড়া আর কি কোনো পথ নেই? গাছগুলোর অবস্থা দেখে খুব ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই। সামনে বিপদ যদি কিছু থাকত, তাহলে সেটা সবার আগে সে আমায় জানিয়ে দিত।' বলে গাড়ির গতি আরো বাড়িয়ে দিল জানকীরাম।

'কে? কে জানিয়ে দিত?'

সে কথার উত্তর দেবে কী, সামনে একটা রেলওয়ে লেভেল ক্রশিং ছিল। তার গেটটাকে ধীরে ধীরে নেমে আসতে দেখল। এখনি রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। বিরক্ত হয়ে জানকীরাম বলল, 'এই এক আপদ! একবার নামলে সহজে আর উঠতে চায় না। এখন থাকো ঝড়জলের মধ্যে আটকে। যত্তো সব!'

'তাই নাকি?' সুদীপ্তা দেবীর উক্তি!

'তা ছাড়া কী! এখন বসে বসে দেখুন না রেল কোম্পানির খেলাটা।' বলে নিস্পৃহভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল জানকীরাম।

সুদীপ্তা দেবীও আর কী করেন। বাইরের অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মাতামাতি দেখতে লাগলেন মুখ বুজে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই সুদীপ্তা বললেন, 'জানকীবাবু, তখন আপনি বললেন, যত যাই হোক, সামনে কোনো বিপদ নেই। সে তাহলে আপনাকে জানিয়ে দেত। কে সে? যে এই ঝড়-জলের মধ্যে আপনাকে এলার্ট করত?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা স্পষ্ট অস্বস্তি ফুটে উঠল জানকীরামের মুখে। পিছু ফিরে মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সে কথা নাই বা জানতে চাইলেন!'

'কেন, খুবই কি কিছু আপত্তিকর? বলতে কারোর কি কোনো বারণ আছে?'

'না না।'

'তাহলে?'

'নেহাতই শুনতে চান, এই ছেলেমারা পুত্রহন্তা জানকীরাম ঘোষের কথা? যদিও শুনতে আপনার খারাপ লাগবে, বলতে আমার আরো খারাপ লাগবে।'

'তাহলে থাক। আপনার যদি কষ্ট হয়—'

'আমার কষ্টের কথা ছাড়ুন। সহানুভূতির সঙ্গে যখন শুনতে চেয়েছেন, আজ কে আর অন্যের কথা শুনতে চায়! সবাই শুধু শোনাতেই চায়।'

বলে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল জানকীরাম। পরে স্বগতোক্তির মতো করে বললে, 'শুনিয়ে রাখাই ভালো। দুজনে তো প্রায় একসঙ্গেই থাকি। আপনাকে নিয়ে যখন-তখন পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াই। কখন কী ঘটে কিছু বলা যায় না। যেমন ডাঃ ব্যানার্জিকে আগেভাগে কিছু জানাইনি বলে আমাদের সম্পর্কটাই কেমন খারাপ হয়ে গেল। যাক গে, যা হয়, হয়তো তা ভালোর জন্যেই হয়।'

বলে বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে রইল জানকীরাম। তারপর বলে চলল, 'আপনি জানেন, এক মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে আমার সংসার। কিন্তু একসময় তা ছিল না। আমার একটা ছেলেও ছিল। মেয়ের ওপরে। কিন্তু অনবধানতাবশত সেই ছেলের মৃত্যু হয় আমারই হাতে।'

চমকে উঠলেন সুদীপ্তা দেবী। বললেন, 'সেকি!'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই পড়শীরা কেউ কেউ পেছনে বলে, ছেলে-মারা জানকী।'

'ও, এতদিনে বুঝলাম।'

একটু চুপ করে রইল জানকী। তারপর বলল, 'দেখুন, আমার এই ড্রাইভারি আমার স্ত্রী পছন্দ করেন না। এই তো কলকাতার অবস্থা, কোথায় কী অঘটন ঘটে, সেই ভয়ে সর্বদাই শংকিত। মায়ের মুখে শুনে শুনে, আমার বারো বছরের ছেলেটাও আমার এই ড্রাইভারি করাটা পছন্দ করত না। কিন্তু আপনিই বলুন তো, আমি কি জানি? পেট চালাতে আমি জীবনে কী শিখেছি? গ্রামের ছেলে। গ্রামেই মানুষ। ছোটবেলা থেকে সঙ্গদোষে যাত্রাদলে যাত্রা করেই ঘুরে বেড়িয়েছি। লেখাপড়া তো শিখিনি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে আমার খুবই নামডাক। কিন্তু বিয়ে-থা করার পর, সংসারে কিছু টাকাকড়ি দেয়ার দরকার হয়ে পড়ল। তখন গ্রামের এক দাদার মতো মানুষ কলকাতায় এনে, এক মিনিবাসের হেলপারিতে লাগিয়ে দিল। সেই কাজ করতে করতে ড্রাইভারি শিখে, নিজেই মিনিবাস চালাতে শুরু করি।

একদিন রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, ছেলে অত রাত পর্যন্ত জেগে বসে। খেতে বসে ছেলে কথায় কথায় বলে, বাবা, তুমি গাড়ি চালানো ছেড়ে দাও। ড্রাইভারি না করে অন্য কিছু কর।

আমি বলি, কেন রে? ড্রাইভারি করা কি খারাপ? জানিস, কতো লোক ড্রাইভারি করে সংসার চালায়?

ছেলে বলে, চালাক! কলকাতার যা অবস্থা, প্রতিদিন দুর্ঘটনা লেগেই আছে। লোকের মুখে তো শুনি। আমি ভয় পাই, আমার মা-ও ভয় পায়। তুমি জান না, শনিবার শনিবার মা খায় না। বারের উপোস করে। সে জন্যে বলছি ও কাজ আর নাই বা করলে?

মাথা নিচু করে চুপ করে থাকি। রুটি আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। বলি, বাবা, করে খাবার মতো জীবনে যে আর কোনো কাজই শিখিনি। রোজগার করে খাওয়ার সব পথই আমার বন্ধ। কী করব, কী করে তোমাদের খাওয়া-পরা জোটাব? আমি এক চক্ষুষ্মান অন্ধ!

না না। তুমি মোটেই অন্ধ নও। অন্য কিছু করো। আমি বলছি, তুমি অনেক কিছুই পারবে।

আমি মনে মনে হাসি। কোনো জবাব দিই না।

দিন চলে। এসব নিয়ে আর কোনো কথা হয়নি কোনোদিন।

হঠাৎ কী দুর্মতি হল একদিন। ছেলেটা আমার হাত ধরে বেরিয়ে পরল সাত-সক্কালে। বললে,

আমি আজ তোমার সঙ্গে যাব। আমি কাজে বেরোচ্ছি। সভয়ে বললাম, সেকি! আমার সঙ্গে কোথায় যাবি বাবা! সারাদিন আমি কোথায় থাকব না থাকব তার ঠিক কী?

তা হোক। আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। তোমার সঙ্গে আমি থাকলে তোমার কোনো বিপদই হবে না।

স্বীকার করি। বলি, সে তো ঠিকই। কিন্তু আমার সঙ্গে থাকা কি কম কষ্টের? কোথায় খাবে, কোথায় বিশ্রাম নেবে, সারাদিন টংটং করে ঘোরা, তোমার শরীর খারাপ হবে যে! তুমি ঘরে যাও। মার কাছে।

জবাব দিল, না। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

বলে আমার আগে আগে হাঁটতে লাগল। গলি থেকে একটু দূরে, রাজপথে রাত্তিরের মতো গ্যারেজ করে রেখেছিলাম মিনিবাসটাকে, সটান গিয়ে সেটার ওপর চেপে বসল।

আমি তখন মেটিয়াবুরুজ-হাওড়ার একটা মিনিবাস চালাতাম। দুটো ট্রিপ শেষ করে, শেষ ট্রিপ করার জন্যে যখন হাওড়া থেকে যাচ্ছি রেড রোডের ওপর দিয়ে, তখন পেছনের চাকা থেকে একটা দুম করে আওয়াজ। কী হল? গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখি, পেছনের একটা চাকা পাংচার হয়ে গেছে।

এদিকে গাড়ি ভর্তি প্যাসেঞ্জার। মাথার ওপর গনগনে মাঝ দুপুরের সুয্যি। টিকিটের পয়সা ফেরত নিয়ে কিছু যাত্রী নেমে গেল। যারা রয়ে গেল, তারা বাপান্ত করতে লাগল। বাজে রদ্দিমার্কা গাড়ি নিয়ে রুট চালাচ্ছে। যত্তো সব জোচ্চোর!

কিন্তু আমি কী করি! এমনি একটা জায়গা, যেখানে ধারে কাছে কোনো গ্যারেজ নেই। বাধ্য হয়ে হেলপারকে নিয়ে আমাকেই নেমে পড়তে চাকা মেরামতির কাজে।

আমার দেখাদেখি আমার ছেলেও লেগে গেল কাজে। কিছুই পারে না, বাপকে সাহায্য করতে গিয়ে কাজ বাড়ায়। আর নানা কথা বলে। ওদিকে প্যাসেঞ্জারের মুখ দিয়ে ক্রমাগত গালিগালাজ শুনতে পাচ্ছি। এমনিতেই গরমের দিন, তার ওপর মাথা গরম। ঘেমে জামা-প্যান্ট ভিজে গেছে। আমি আর হেলপার প্রাণের দায়ে কাজ করে চলেছি।

যাই হোক, একসময় হাতের কাজটা শেষ হতেই, গাড়ির নীচ থেকে আমি আর হেলপার বেরিয়ে এলাম দ্রুত। আমি গিয়ে বসলাম চালকের আসনে। বসে আড়চোখে তাকে পা-দানিতে দেখে নিয়েই সবেগে স্টার্ট নিলাম গাড়িটায়। আমি এমনই অন্ধ আর বে-খেয়ালি, ছেলেটা যে ওঠেনি, তখনো মিনিবাসের নীচে শুয়ে, খেয়াল করিনি। গাড়ির চাকায় রাস্তার বামপার পেরিয়ে যাবার মতো অবস্থার পরে পরেই হেলপার চিৎকার করে উঠল, জান্‌কিদা, গাড়ি থামাও। ছেলেটা কোথায়? দেখছি না কেন?

সপাং করে সজোরে একটা চাবুক পড়ল মগজের ওপর। মুহূর্তে গাড়ি থেকে নেমে দেখি, ছেলে আমার পিষ্ট হয়ে গেছে। ছেলে আমার নেই। একটা অতি বীভৎস মাংসপিন্ড। তার শেষ আবেদন রেখে চিরকালের জন্যে নীরব হয়ে গেছে।

এরপর আমি কি প্রায় পাগল হয়ে যাই। বহুদিন আর কোনো গাড়ির স্টিয়ারিং ধরিনি। কিন্তু ডাক্তার দিদি, আমার দেহ থেকে প্রাণ তো বেরিয়ে যায়নি। অতএব পেট, পেট বড় বালাই। সংসার নানা দাবি নিয়ে সব সময়ই তার রাক্ষুসে মুখ হাঁ করেই রেখেছে। তার চাহিদা মেটাতে স্ত্রী-কন্যার কথা ভেবে আবার স্টিয়ারিং ধরেছি। অ্যাকসিলিটারে পা রাখছি। তবে হ্যাঁ, আর বাস-মিনিবাস নয়। কেউ কখনো ডাক দিলে, তার কাজ করে দিতাম। সে যা দিত, তাই নিয়ে গিয়ে তুলে দিতাম মেয়ের মায়ের হাতে। মাঝে কিছুদিন একটানা ডাঃ ব্যানার্জির গাড়ি চালিয়েছি। কিন্তু সেখানেও থাকতে পারলাম না। বদনাম নিয়ে চলে এসে বাড়িতেই বসেছিলাম। আর সেই ব্যানার্জিই আবার আমাকে ডেকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'এ কী বলছেন? আপনার বদনাম! ডাক্তার ব্যানার্জির কাছে? হতেই পারে না। কোনো বদনামই আপনার নেই। অন্তত ব্যানার্জিদার কাছে। থাকলে তিনি কখনই আপনাকে আমার কাছে পাঠাতেন না।'

'আপনি জানেন না ডাক্তার দিদি।'

'জানবার দরকার নেই। তবে এটুকু বুঝি, আপনাদের এমন একটা কিছু ঘটেছে, যেটার জন্যে আপনারা কেউই দায়ী নন। আর সেটা এমন কিছু মারাত্মকও নয়। আচ্ছা, ঠিক কথা বলুন তো, ব্যানার্জিদার কাজ আপনি ছেড়ে দিলেন কেন? নাকি তিনিই আপনাকে জবাব দিয়েছেন?'

'জবাব দেবেন তিনি! না। তিনি আমায় ছাড়েননি। কিন্তু আমার জন্যে তাঁর যে সুনামের ক্ষতি হয়েছে, সে কথা ভেবেই আমি তাঁর কাজ ছেড়ে চলে আসি।'

সুদীপ্তা দেবীর চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল। বললেন, ক্ষতি করেছেন! আপনি? আবার আর কারো নয়, ডঃ ব্যানার্জির? কী ক্ষতি করেছেন?'

'এ কথার জবাব এখন আর দেওয়া যাবে না। ওই দেখুন লেভেল ক্রশিং উঠে যাচ্ছে। জায়গাটা যত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো।'

বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল জানকীরাম।

বন্ডেল গেটের রাস্তা ধরে গাড়ি গড়িয়ে চলে। পিচঢালা ভিজে পথ। গাড়ির বাইরে উদ্দাম প্রকৃতি। উইন্ড স্ক্রিনের ওপর ওয়াইপার স্টিকের ডান দিক-বাঁ দিক যাতায়াত। ঝড়ের দামালিপনা কমলেও বৃষ্টি চলছে সবিক্রমে। জানকীরামের গাড়ি ছুটছে দ্রুতগতিতে। হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়ির গতি একটু একটু করে কমিয়ে আনতে আনতে একেবারে থেমে দাঁড়াল জানকী। পেছন থেকে সুদীপ্তা দেবী জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার, একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!'

জানকী পিছন ফিরে তাকাল সুদীপ্তার দিকে। ভীতসন্ত্রস্ত চোখে।

অবাক হয়ে সুদীপ্তা জিগ্যেস করলেন, 'কী হল? আপনি অমন করছেন কেন?'

'না। সে আবার এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার মাঝে।'

'কে? কে এসে দাঁড়িয়েছে?'

'সেই যে, আমার বাবুল। ওই দেখুন জলে ভিজে গেলেও, দু'দিকে দু'হাত ছড়িয়ে রাস্তার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে। তার মানে, আমায় বারণ করছে এগোতে। তার মানে নিশ্চয় সামনে কোনো বিপদ আছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে আলো-আঁধার ভরা রাস্তার দিকে তাকালেন সুদীপ্তা দেবী। অবক গলায় জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু কোথায়? কেউ তো সামনে নেই!'

'সেকি! আপনি দেখতে পাচ্ছেন না! ওই তো হাত নেড়ে নেড়ে আমায় গাড়ি ব্যাক করার ইশারা করছে।'

বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হলেও, সে কথা শুনে ডাক্তার দিদির গা শিরশির করে উঠল। তবু বললেন, 'কই?'

এই সময় পেছন দিক থেকে একটা গাড়ি এসে ঘন ঘন পথ ছাড়ার জন্যে হর্ন দিতে লাগল। তার মানে জানকীকে মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। নতুন করে স্টার্ট নিয়ে সাইড দিতেই, পেছনের গাড়িটা হুশ করে বেরিয়ে গেল। বলতে গেলে চোখের পলকে।

পেছন থেকে সুদীপ্তা আবার জিগ্যেস করলেন, 'জানকীবাবু, সেই ইয়ে মানে তাকে কি এখনও দেখতে পাচ্ছেন? পথ আটকে দাঁড়িয়ে?'

ধরা গলায় জানকীরামের উত্তর পেলেন সুদীপ্তা, 'হ্যাঁ। সে এখনো পথ আটকে দাঁড়িয়ে।'

'কিন্তু, আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।'

'ডাঃ ব্যানার্জিও সেদিন কাউকে দেখতে পাননি। সেদিনও বাবুল আমার পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। একটি মরণাপন্ন রোগীকে তিনি দেখতে যাচ্ছিলেন। আমাকে রীতিমতো হুকুম করেছিলেন, গাড়ি চালাতে। আমি চালাইনি। পরে বাবুল সরে দাঁড়াতে, পড়ি কি মরি গাড়ি হাঁকিয়ে যখন রোগীর বাড়ি পৌঁছই, তখন সে মানুষ আর নেই। এতে ডাঃ ব্যানার্জির সুনাম হানি হয়। তিনি যথেষ্ট বিরক্ত হন আমার ওপর। একটু বকাবকিও করেন।'

'কই, এমন কথা তো তিনি কোনোদিন বলেননি।'

'কোনোদিনই বলবেন না। বড় মাপের মানুষ কি সব কথা সকলকে বলেন?'

'ও।' মাথা নিচু করলেন সুদীপ্তা।

পরে পরেই জানকী বলল, 'চলুন। এবার যাওয়া যাক। বাবুল সামনে থেকে সরে গেছে। দু'পাশের রাস্তার দিকে নজর রাখুন। সামনে নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে। চোখে পড়লেও পড়তে পারে।'

সত্যিই তাই। কিছুটা এগিয়ে যাবার পর চোখে পড়ল। পেছনের যে গাড়িটা তাদের পিছু রেখে সবেগে এগিয়ে গেছিল, সেটাই বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ওপর, একটা গর্তের মধ্যে উল্টে পড়ে আছে। কলকাতা কর্পোরেশন জলের পাইপ বদলাবার জন্যে বিরাট নালা কেটে রেখেছিল, তার ভেতরেই গিয়ে পড়েছে গাড়িটা।

ফাল্গুন ১৪১২

নাইট ল্যাম্পের আলোয়

নির্মলেন্দু গৌতম

বলতে গেলে শেষ মুহূর্তে টেলিফোন এল পশুপতিবাবুর। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় হটাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর পাটা সম্ভবত ভেঙে গেছে। বড় ভাইপো তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই কোনোভাবেই তিনি আর আসতে পারছেন না। কাউকে যে পাঠাবেন তার পরিবর্তে, সেটাও আর এই মুহূর্তে সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

না, আর কিছু করার নেই। অসহায়ভাবে মনে মনে কথাটা ভাবলেন ভুবনবাবু। বেরোবার সময় উল্টোদিকের বাড়ির প্রকাশবাবুকে অনুরোধ করে যেতে হবে বাড়িটা দেখবার জন্য। অনুরোধ করলে অনুরোধটা নিশ্চয়ই রাখবেন প্রকাশবাবু।

হাওড়া স্টেশন থেকে সাতটায় ট্রেন। পাঁচটা বাজতে এখন মিনিট তিনেক বাকি।

একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়াটা ভালো। মনে মনে ভাবলেন ভুবনবাবু। মোড়ের কাছে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে হাওড়ায় পৌঁছতে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। হাওড়া ব্রিজে জ্যাম থাকলে আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগবে স্টেশনে পৌঁছোতে। একটু আগে আগে বেরিয়ে পড়লে আর শেষ মুহূর্তে ছুটোছুটি করতে হবে না।

বাড়ির সবাই রেডি হয়েই ছিল। কাজেই ভুবনবাবু বলতেই সবাই জিনিসপত্র সব তুলে নিয়ে বাইরে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল।

ভুবনবাবু পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করে দরজায় চাবি দিলেন। তালাটা টেনে একবার দেখে নিলেন ঠিকঠাক লেগেছে কিন।

একটা ট্যাক্সি চাই এবার।

বড় ছেলে সুমন ট্যাক্সি ডেকে আনবার জন্য চলে গেল বড় রাস্তার দিকে।

প্রকাশবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। দরজায় তালা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই প্রকাশবাবু বারান্দা থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন ভুবনবাবুর সামনে।

প্রকাশবাবু কিছু বলার আগেই ভুবনবাবু বললেন, 'আপনাকে একটা অনুরোধ করব।'

খানিকটা অবাক হয়ে প্রকাশবাবু বললেন, 'কী অনুরোধ বলুন।'

'আমার এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের ছেলের পৈতেয় দিন সাতেকের জন্য আমরা শিলিগুড়িতে যাচ্ছি। সাতদিন পশুপতিবাবুর এসে এ বাড়িতে থাকবার কথা ছিল। কিন্তু থাকতে পারছেন না তিনি। পা ভেঙে খানিক আগে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। সেজন্যেই আপনাকে একটু দেখতে হবে বাড়িটাকে।' বলতে বলতে দু'হাত জোড় করলেন ভুবনবাবু।

'একি! এর মধ্যে আপনার হাত জোড় করবার কি আছে? বলেছেন দেখব।' হেসে বললেন প্রকাশবাবু।

খুশি হলেন ভুবনবাবু। নিশ্চিন্তও হলেন। বললেন, 'আপনাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি, কোনো দরকার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমায় একটা টেলিফোন করে দেবেন।'

বলে পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে ভাইয়ের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা তার একটা পাতায় লিখে পাতাটা ছিঁড়ে দিলেন প্রকাশবাবুকে।

টেলিফোন নম্বরটা একবার দেখে নিয়ে প্রকাশবাবু বললেন, 'ঠিক আছে।'

ভুবনবাবু বললেন, 'আপনার টেলিফোন নম্বরটা আমার কাছেই আছে। আমিও আপনাকে টেলিফোন করব রাতের দিকে।'

'সেই ভালো, রাত নটার পর আমি বাড়িতেই থাকব, অসুবিধে হবে না আমায় পেতে।' প্রকাশবাবু বললেন।

সুমন ট্যাক্সি নিয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভুবনবাবু।

বাড়ির সামনেই ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিল ড্রাইভার।

জিনিসপত্র ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে প্রকাশবাবুর দিকে ফিরলেন ভুবনবাবু। দু'হাত জোড় করে বললেন, 'তাহলে চলি।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'আসুন।'

আর কথা বাড়ালেন না ভুবনবাবু। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে একবার দেখলেন। তারপর এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে ট্যাক্সির দরজাটা খুলে উঠে পড়লেন ট্যাক্সিতে।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল ট্যাক্সিটা।

শিলিগুড়িতে পৌঁছে রাতে একবার প্রকাশবাবুকে টেলিফোন করার কথা মনে মনে ভেবেছিলেন ভুবনবাবু। কিন্তু তারপর কেন জানি আর টেলিফোনটা করা হয়নি।

আজ ঠিক নটার সময় ডায়াল করলেন প্রকাশবাবুর নম্বরে।

টেলিফোনটা প্রকাশবাবুই ধরলেন। ধরেই বুঝি খানিকটা উত্তেজিতভাবে বললেন, 'এক্ষুনি আমি আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম।'

চমকে উঠে ভুবনবাবু বললেন, 'কিছু খবর আছে নাকি?'

'আছে।' বলে দু' মুহূর্ত বুঝি মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পুরো ব্যাপারটা ভুবনবাবুকে বলে ফেললেন প্রকাশবাবু।

ভোরের দিকে ভুবনবাবুর বাড়ির সামনে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার শুনে কী ঘটেছে দেখতে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল পাড়ার সবাই। এসেই দেখতে পেয়েছিল, প্রায় দলা পাকিয়ে পড়ে থাকা একটা লোককে। ভুবনবাবুর দরজার সামনে সে পড়েছিল। কিছুতেই উঠতে পারছিল না লোকটি। কেউ যেন তার হাত-পা ভেঙে ছুঁড়ে দিয়েছে তাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, ভয়ঙ্কর কিছু একটা দেখেছে সে।

অনেক চেষ্টা করে লোকটির কাছ থেকে জানা গেছে, সে ভুবনবাবুর ঘরের তালা ভেঙে ঢুকবার জন্য পা বাড়াতেই ভেতর থেকে কে যেন একজন বেরিয়ে এসেছিল। ঘুরে ছুটে পালাবার আগেই সে তাকে তুলে নিয়েছিল দু'হাতে। তারপর দু'হাতে তাকে ঘোরাতে ঘোরাতেই শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। প্রায় একতলার সমান উঠে গিয়েছিল সে। নীচে আছড়ে পড়ে তার হাত-পা সব ভেঙে গেছে। ঘরে থেকে যে বেরিয়ে এসেছিল, তাকে সে ঠিক মতো দেখতে পায়নি। শুধু বুঝেছে, দারুণ শক্তি তার। তার হাত থেকে পালানো অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ডেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে লোকটিকে। ভুবনবাবুর দরজার ভাঙা তালার জায়গায় নতুন একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছেন প্রকাশবাবু নিজেই।

পুরো ব্যাপারটা শুনেই কীরকম যেন অসহায় হয়ে গেলেন ভুবনবাবু। কোনোরকমে প্রশ্ন করলেন, 'সেই লোকটির কি আর খোঁজ-টোজ পাওয়া গেছে?'

'না, সেই লোকটির আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।' প্রকাশবাবু বললেন।

ভুবনবাবু এবার একটুখানি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু লোকটি যে-ই হোক, আমার ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে কী করে? ঘরের চাবি তো আমার কাছে। পশুপতিবাবু এলে পশুপতিবাবুকে চাবিটা দিয়ে আসতাম। না, ব্যাপারটে স্পষ্ট হচ্ছে না আমার কাছে।'

'মনে হয়, আপনার ঘরের তালা যে লোকটি ভেঙেছে, সে লোকটি বোধহয় ভয়েই দেখতে ভুল করেছে।' প্রকাশবাবু বললেন।

ভুবনবাবু বললেন, 'তা হতে পারে। ভয়েই ভুল দেখতে পারে লোকটি। যাকগে বাড়ির সবাইকে এখানে রেখে কাল আমি রওনা দিচ্ছি। এরকম একটা খবর পাবার পর আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।'

'না না, আপনি পৈতের নেমন্তন্ন খেয়েই আসুন। এদিকটা আমরা দেখছি।' প্রকাশবাবু বললেন।

'কখনোই তা হয় না। আমি আসছি।' বলে আর প্রকাশবাবুকে কিছু বলতে দিলেন না ভুবনবাবু। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন। অসহায়ভাবে নিঃশ্বাস নিলেন একটা।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না ভুবনবাবু। আচ্ছা, তাঁর চেনা কেউ কি লোকটিকে দরজার তালাটা ভাঙতে দেখে ওরকম একটা কাণ্ড করে গেছে? কিন্তু তাহলে সে চলে যাবে কেন? তাছাড়া যেভাবে সে লোকটিকে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে ধরে ঘুরিয়েছে, তাতে তাকে রীতিমতো বারবেল-ডাম্বেল ভাঁজা দশাসই চেহারার একজন বলেই মনে হয়। অমনি দশাসই চেহারার কারো সঙ্গে পরিচয় নেই ভুবনবাবুর।

যদ্দূর মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়। কিছু একটা রহস্য থাকতেই হবে ব্যাপারটার পেছনে। এখানে বসে ভেবে কিছুতেই সেই রহস্যের কিনারা করতে পারবেন না ভুবনবাবু। ফিরে গিয়েও যে রহস্যটার সমাধান করতে পারবেন, সেটাও ঠিক নয়। তবু তাঁর যাওয়াটা একান্তভাবেই উচিত।

বাড়ির সবাইকে রেখে কাল কলকাতায় ফিরে যাবেন শুনলেই ভুবনবাবুকে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করবে। কী ঘটেছে তা বললেই সবাই তাঁর সঙ্গে ফিরে যেতে চাইবে কলকাতায়। কিন্তু পৈতে বাড়ির এই আনন্দ ছেড়ে সবাই ফিরে যাক সেটা কিছুতেই চান না ভুবনবাবু। তাঁকে শুধু ফিরে যাবার জন্য কিছু একটা গল্প বানাতে হবে।

মনে মনে সেই গল্প এবার বানাতে শুরু করলেন।

শেষ পর্যন্ত গুছিয়ে অফিসের একটা গল্প বানিয়ে দার্জিলিং মেলে কলকাতায় ফিরলেন ভুবনবাবু।

জ্যাঠতুতো ভাই রেলের চেনাজানা একজনকে ধরে কোনরকমে একটা রিজার্ভেশন টিকিট জোগাড় করেছিল। নাহলে কষ্ট করে জেনারেল কম্পার্টমেন্টেই ফেরার জন্য উঠতে হত ভুবনবাবুকে।

হাওড়ায় নেমেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা প্রকাশবাবুর দরজায় এসে নামলেন ভুবনবাবু।

ট্যাক্সির শব্দ শুনেই প্রকাশবাবু বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভুবনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দার্জিলিং মেলে এলেন?'

'দার্জিলিং মেলেই এলাম।' ভুবনবাবু ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন।

ট্যাক্সিটা চলে যেতেই প্রকাশবাবু বললেন, 'পৈতের নেমন্তন্নটা খেয়ে এলেই পারতেন কিন্তু।'

'আসলে, খবরটা শোনার পর আর না এসে থাকতে পারছিলাম না।' খানিকটা অসহায়ভাবেই বললেন ভুবনবাবু।

'নিন, ভেতরে চলুন।'

বলে ভুবনবাবুকে নিয়ে ভেতরে এলেন প্রকাশবাবু। মুখোমুখি দুটো সোফায় বসলেন।

'এবার বলুন, সেদিন ঠিক কী হয়েছিল?' প্রকাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করলেন ভুবনবাবু।

যা যা ঘটেছিল, পুরোটাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাজিয়ে বলে ফেললেন প্রকাশবাবু।

শুনে একটু সময় চুপ করে থেকে ভুবনবাবু প্রকাশবাবুর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'লোকটা যা বলেছে তা যদি বিশ্বাস করি, তাহলে ব্যাপারটাকে অলৌকিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।' প্রকাশবাবু বললেন।

ভুবনবাবু বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

পশুপতিবাবুকে বোধহয় ব্যাপারটা একবার জানানো উচিত। সেই সঙ্গে পায়ের খবরটাও একবার নেওয়া উচিত। হঠাৎ মনে হল ভুবনবাবুর। মনে হতেই প্রকাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি একটা টেলিফোন করব।'

প্রকাশবাবু বললেন, 'করুন।'

উঠে টেলিফোনের কাছে এলেন ভুবনবাবু। ডায়াল করলেন পশুপতিবাবুর নম্বরে।

বারকয়েক রিং হবার পর পশুপতিবাবুই তুললেন টেলিফোনটা। বললেন, 'পশুপতি চাটুজ্যে বলছি। আপনি কে বলছেন?'

'আমি ভুবন সান্যাল বলছি। আগে আমায় বলুন আপনার পায়ের খবর কী? 'ভুবন সান্যাল বললেন।

পশুপতিবাবু বললেন, 'পায়ে প্লাস্টার হয়েছে। ঘরবন্দি। কিন্তু টেলিফোন করছেন কোথা থেকে?'

'কলকাতা থেকেই আপনাকে টেলিফোন করছি।' ভুবনবাবু বললেন।

ভুবনবাবুর কথাটা শুনেই বুঝি লাফিয়ে উঠলেন পশুপতিবাবু। অবাক হওয়া গলায় বললেন, 'সে কি, শিলিগুড়িতে যাননি?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যে আমায় একাই ফিরে আসতে হয়েছে।' ভুবনবাবু বললেন।

তেমনি অবাক হওয়া গলায় পশুপতিবাবু বললেন, 'কী ঘটনা ঘটেছে বলুন তো?'

দ্রুত একটুখানি গুছিয়ে নিলেন ভুবনবাবু। তারপর প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে ফেললেন পশুপতিবাবুকে।

শুনে একটু সময় চুপ করে থাকলেন পশুপতিবাবু। তারপর বললেন, 'আপনাকে এখুনি একবার আমার এখানে আসতে অনুরোধ করছি।'

'হঠাৎ?' ব্যাপারটা ধরতে না পেরে প্রশ্ন করলেন ভুবনবাবু।

পশুপতিবাবু বললেন, 'কেন অনুরোধ করেছি, এলেই সেটা বুঝবেন।'

'টেলিফোনে বলা যায় না?' এবার প্রশ্ন করলেন ভুবনবাবু।

পশুপতিবাবু বললেন, 'না, টেলিফোনে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।' বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখলেন ভুবনবাবু। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখুনি আমায় একবার পশুপতিবাবুর বাড়িতে যেতে হবে।'

'কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবেন। আমার এখানেই আপনার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে?' প্রকাশবাবু বললেন।

ভুবনবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়িই ফিরব।'

বলে আর দাঁড়ালেন না ভুবনবাবু। বেরিয়ে পড়লেন পশুপতিবাবুর বাড়িতে যাবার জন্য।

ভুবনবাবুর কাছে ফের পুরোটা শুনলেন পশুপতিবাবু। জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর আস্তে আস্তে যে গল্পটা বললেন ভুবনবাবুকে, সে গল্পটা শুনে কাঁটা দিয়ে উঠল ভুবনবাবুর সারা শরীর।

অনুপম ছিল পশুপতিবাবুর ছেলেবেলার একমাত্র বন্ধু।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই পাড়ার ব্যায়ামাগারে ভর্তি হয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করেছিল অনুপম। এমনিতেই বড়সড় চেহারা ছিল অনুপমের। ব্যায়াম করে আরো বুঝি বড়সড় হয়ে উঠেছিল চেহারাটা। অনুপমের বড়সড় চেহারার জন্যেই সবাই সমীহ করে চলত তাকে। ভয়ও পেত।

অনুপম বলত, 'আমি থাকতে তোর কখনো কিছু ভাবতে হবে না। জেনে রাখ, সব সময় আমি তোর সঙ্গে আছি। তুই যেটা পারবি না, আমায় শুধু সেটা বলবি।'

বছর দশেক আগে হটাৎ এক বৃষ্টির রাতে বাড়িতে ফেরার পথে মোটর সাইকেল অ্যাকসিডেন্টে সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল অনুপম।

আজও সেই রাতটার কথা ভোলেননি পশুপতিবাবু।

ভুবনবাবুর বাড়িতে যাবার জন্য বেরিয়ে পা ভাঙতেই মনে মনে সেই অনুপমকেই ভেবেছিলেন পশুপতিবাবু। অনুপম থাকলে ঠিক বলত, 'কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোকে। আমি গিয়ে রাতে থাকব তোর ভুবনবাবুর বাড়িতে।'

পশুপতিবাবুর স্থির বিশ্বাস, ঘরের তালা ভেঙেছিল যে লোকটি, সেই লোকটিকে অমনিভাবেই ছুঁড়ে দিয়েছিল অনুপম।

ভুবনবাবু কিছু বুঝি আর ভাবতে পারছেন না পশুপতিবাবুর কথাটা শুনে।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ঠিক তাই। নাহলে লোকটিকে অমনিভাবে ছুঁড়ে ফেলে সে কখনো চলে যেত না।'

ছোট করে শুধু হাসলেন পশুপতিবাবু।

অনুপমকে নিয়ে আর কিছুক্ষণ গল্প করে ভুবনবাবু উঠে পড়লেন।

রাতের খাওয়া সেরে দরজায় লাগানো নতুন তালার চাবিটা প্রকাশবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন ভুবনবাবু। রাতে নিজের বাড়িতেই থাকবেন।

যদিও খেতে বসে তাঁর বাইরের ঘরটাতে থাকবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন প্রকাশবাবু, কিন্তু ভুবনবাবু রাজি হননি। আসলে, কেন জানি মনে হয়েছিল, বাড়ির সামনেই অন্য বাড়িতে শুয়ে ঘুমটা ঠিকঠাক আসবে না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আর প্রকাশবাবুর সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করলেন না ভুবনবাবু।

সাড়ে দশটা বাজতে বাজতেই উঠে পড়লেন। তারপর চাবিটা হাতে করে সোজা এসে দাঁড়ালেন বাড়ির তালাবন্ধ দরজার সামনে। চাবি ঘুরিয়ে দরজাটা খুললেন।

ভেতরে ঢুকতে গিয়েই হঠাৎ মনে পড়ল অনুপমের কথা। কেন জানি ঘরের ভেতর অনুপমকে স্পষ্ট অনুভব করলেন ভুবনবাবু। কাঁটা দিয়ে উঠল তাঁর সারা শরীর। বড় করে একটা শ্বাস নিলেন নিজের অজান্তেই।

অন্ধকারের ভেতরই কোনোরকমে দ্রুত পা ফেলে সুইচবোর্ডের কাছে এসে একটা সুইচ টিপলেন ভুবনবাবু। আলো জ্বলল না। বুকের ভেতরটা লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তে পরের সুইচটা টিপলেন। আলো জ্বলে উঠল।

সুইচবোর্ডের দিকে তাকালেন ভুবনবাবু। প্রথমে প্লাগের সুইচটা টিপে ছিলেন বলে আলোটা জ্বলেনি। বুঝতে পারলেন।

কপালে কি ঘাম জমেছে? জমেছে।

কপালটা মুছলেন ভুবনবাবু। দেখলেন ঘরের ভেতরটাকে। ভারী নির্জন লাগছে।

ভুবনবাবু এক্ষুনি শুয়ে পড়বেন। অকারণে জেগে থাকবার কোনো কারণ নেই।

কথাটা ভেবেই নিজের ঘরে এলেন ভুবনবাবু। বিছানাটা একবার দেখে নিয়ে বড় আলোটা নিবিয়ে নাইট ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সহজে আজ ঘুম আসবে না। বুঝতে পেরেও চোখ বুজলেন ঘুমোবার জন্য।

সঙ্গে সঙ্গে ভুবনবাবুর মনে হল, পাশে এসে কেউ বুঝি দাঁড়াল। তারপর ঝুঁকে পড়ল তাঁর ওপর।

নিশ্চয়ই অনুপম। না, তাছাড়া কেউ হতেই পারে না। কি জানি, কিছু হয়তো বলতে চায় অনুপম। ভুবনবাবুর কাছ থেকে কিছু শুনতেও চাইতে পারে। সে জন্যেই ঝুঁকে পড়েছে ভুবনবাবুর ওপর।

চেষ্টা করেও কিছুতেই বুঝি চোখ খুলতে পারছেন না ভুবনবাবু। নাড়াতে পারছেন না শরীরটাকে।

উত্তেজনায় দারুণভাবে এবার হাঁপাতে থাকলেন ভুবনবাবু। দু'হাতে মুঠো করে ধরলেন বিছানার চাদর। উত্তেজিত নিঃশ্বাসে ওঠানামা করতে থাকল বুকটা।

ভুবনবাবুর দিকে যে ঝুঁকে আছে, যাকে অনুপম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না ভুবনবাবু, সে বুঝি হঠাৎ একটা শব্দহীন ঠাণ্ডা হাওয়ার তরঙ্গ হয়ে গেল। ভুবনবাবুর চারদিক ঘিরে একটু একটু করে ঘরের ভেতরে অস্থিরভাবে ছড়িয়ে পড়ল সেই শব্দহীন ঠান্ডা হাওয়ার তরঙ্গ।

কী মনে হল, দু'হাত জোড় করে ভয়ে ভয়ে ভাঙা গলায় কোনোরকমে ভুবনবাবু বললেন, 'আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনি পশুপতিবাবুর বন্ধু সেই অনুপম। পশুপতিবাবুর জন্য আপনি সব করতে পারেন, তা-ও বুঝে ফেলেছি। লোকটিকে যে আপনিই ছুঁড়ে ফলে দিয়েছিলেন সেদিন রাতে, সেটাও আমি বুঝে ফেলেছি, পশুপতিবাবুর কাছে আপনার গল্প শুনে। আপনাকে যে আমি কি বলব, ভেবে উঠতে পারছি না।'

ভুবনবাবুর কথটা শেষ হবার আগেই শব্দহীন ঠান্ডা হাওয়ার সেই তরঙ্গ মিলিয়ে গেল ঘরের ভেতর থেকে। শিথিল হয়ে গেল ভুবনবাবুর সারা শরীর। ভুবনবাবু স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, আর কোনো কারণে নয়, তাঁর কাছ থেকে এ কথাগুলোই শুনতে এসেছিল অনুপম। কথাগুলো শোনার পর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেনি।

বড় করে একটা শ্বাস নিলেন ভুবনবাবু।

নাইট ল্যাম্পের মৃদু আলোয় আর চারদিকের নির্জনতায় এবার একটু একটু কর ঘুম নামতে থাকল ভুবনবাবুর দু'চোখে।

কার্তিক ১৪১৩

পহেলগাঁওয়ের ঘোড়সওয়ার

পরেশ দত্ত

গোটা পুব আর পশ্চিম দিগন্ত আড়াল করে রয়েছে আকাশজোড়া পাহাড়ের ঢেউ। মাঝের সমতল উপত্যকায় তুষার গলা জল বুকে নিয়ে খরবেগে বহে চলেছে ফেনোচ্ছল স্বচ্ছতোয়া লিডার নদী।

প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে গেল পহেলগাঁওকে। জম্মু থেকে ট্যুরিস্ট বাসে পহেলগাঁওয়ে এসেছি। উঠেছি একটা হোটেলে। দু'দিন থেকে শ্রীনগরে যাব। কিছু হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, হলিডে-হোম ও কাশ্মীরী শালের দোকান ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট শহর পহেলগাঁও। লোকবসতি খুবই কম। পথেও লোকজন বেশি নয়। তবে বড় ট্রাক ও মিলিটারি কনভয়ের চলাচল খুব বেশি। দিনে, এমন কি গভীর রাতেও।

পহেলগাঁও থেকেই চন্দনবাড়ি হয়ে অমরনাথ যাবার পথ। তুষার তীর্থ অমরনাথ মস্তবড় তীর্থস্থান। যাত্রী নিয়ে যাবার সময় ঘোড়ার মালিকরাও পাহাড়ি পথে হাঁকে, 'অমরনাথ জী কি জয়।'

শ্রাবণ মাস, আর ক'দিন পরেই শ্রাবণী পূর্ণিমা। লিডার নদীর ধারে ধারে অমরনাথ যাত্রীদের ক্যাম্প পড়েছে। পহেলগাঁও এখন ট্যুরিস্ট আর তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে মুখর।

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে লিডার নদীর ধারের পাহাড়ী রাস্তায় একটা দৃশ্য রোজই দেখতুম। একটা লালচে আরবী ঘোড়া রাস্তার ওপর দিয়ে টগবগিয়ে ছুটে যেত। ঘোড়ার সওয়ারী বছর বারো বয়সের একটা কাশ্মীরী ছেলে। পরনে সাদা চোগা, লাল জাম্পার। লাগাম ধরে টান হয়ে বসে থাকত বিশাল আরবী ঘোড়াটার পিঠে। অতবড় ঘোড়াটার পিঠে অতটুকু ছেলে! রাস্তার সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। চেয়ে থাকত ঘোড়ার পিঠে তার স্বচ্ছন্দ সাবলীল বসার ভঙ্গির দিকে। ছেলেটিকে দেখে মনে পড়ে যেত রবীন্দ্রনাথের সেই বীরপুরুষ কবিতার কথা।

কিশোরটি যেন 'বীরপুরুষ' কবিতার নায়ক। ওর অদৃশ্য মাকে নিয়ে অনেক দূরে কোথাও যাচ্ছে। মা তার চলেছে পাল্কিতে চড়ে। আর ওই ছেলেটি যাচ্ছে রাঙা ঘোড়ার পরে টগবগিয়ে মায়ের পাশে পাশে। সে অবশ্য দূরে কোথাও যেত না, লিডার নদীর ধারে ধারে আধমাইল রাস্তায় বরাবর চক্কর দিত। বাপ যেমন ছোট ছেলেকে পিঠে বসিয়ে ঘোড়া ঘোড়া খেলে, অত বড় তেজী ঘোড়াটাও তার ছোট্ট সওয়ারীকে নিয়ে খুশি মনে টগবগিয়ে ছুটত।

দু'দিনেই পহেলগাঁওয়ের সব কিছু মোটামুটি দেখা হয়ে গেল। ছোট শিকার গড়, বড় শিকার গড়ের পাহাড় দেখার পর চন্দনবাড়ি পর্যন্ত ঘুরে এলুম। শ্রীনগরে যাবার আগের দিন হোটেলের ম্যানেজার গোলাম জালাল জিজ্ঞেস করলেন, পহেলগাঁও কেমন দেখলেন বাবুজী?

উত্তর দিলুম, ভালো, খুব ভালো।

গোলাম জালাল হেসে বললেন, কাশ্মীরের আসল রূপ যদি দেখতে চান, শীতকালে আসবেন বাবুজী।

আঁতকে উঠে বললুম, শীতকালে তো শুনেছি গোটা কাশ্মীর জম্মু থেকে শ্রীনগর এক কোমর বরফের তলায় ডুবে থাকে। প্রায়ই ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।

গোলাম জালাল বললেন, তা যায়, তবে রাস্তা থেকে বরফ পরিষ্কার করার জন্য হাজার

লোক লেগে থাকে। তখন কাশ্মীরে এলে দেখবেন আশ্চর্য দৃশ্য। সামনের-পেছনের পাহাড় সব সফেদ বরফে ঢেকে যাবে। যেদিকে তাকাবেন, দেখবেন শুধু বরফ আর বরফ। বেশির ভাগ দিন সূর্য ওঠে না, চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু একবার সূর্য উঠলে কয়েক মিনিটের জন্য চারদিক ঝলমল করে ওঠে। রাতে চাঁদ উঠলে মনে হবে দুনিয়াটা সাদা পরীদের রাজ্য হয়ে গেছে। শীতের কাশ্মীর না দেখলে আসল কাশ্মীর দেখা হবে না আপনার।

হেসে বললুম, ইচ্ছে রইল জালাল সাহেব। সুযোগ পেলেই চলে আসব।

পরের দিন সকালেই শ্রীনগরের বাস ধরব। খাবার পর রাত দশটা নাগাদ হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকার আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের তরঙ্গ, পাইন-ফারের অরণ্য। বিছানায় শুতে যাবার আগে সামনের পথে ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলাম। দোতলার বারান্দা থেকে দেখলুম আর কেউ নয়, সেই কাশ্মীরী ছেলেটি জ্যোৎস্না রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবলুম, উঃ, কী ডানপিটে ছেলে রে বাবা, এত রাত্রে এই শীতে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে।

হোটেলের ম্যানেজারকে জিগ্যেস করলুম, কার ছেলে ম্যানেজার সাহেব?

গোলাম জালাল উঁকি দিয়ে দেখে বললেন, ও তো মোসুম খান, মহম্মদ রফিক খানের ছেলে। ওদের দশটা ঘোড়া। ওর বাবা ট্যুরিস্ট নিয়ে চন্দনবাড়ি যায়, অমরনাথ যায়। বড় হয়ে মোসুমও ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাবে।

পরের দিনই পহেলগাঁও ছেড়ে চলে গেলুম। দিন দশেক পর কাশ্মীর থেকে কলকাতায় ফিরে এলুম। কিন্তু ভুলতে পারলুম না আরবী ঘোড়ার পিঠে চড়া কাশ্মীরী কিশোর মোসুমের কথা। রাত্রে চোখ বুজলেই যেন দেখতে পেতুম সাদা চোগা আর লাল জাম্পার পরা রাজপুত্তুরের মতো সুন্দর একটি ছেলে লিডার নদীর ধারে রাঙা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

বছর তিনেক পর শীতের কাশ্মীর দেখতে মার্চের গোড়ায় পহেলগাঁওয়ে এসেছি। এবার একা আসিনি, সঙ্গে এসেছে বন্ধু অলক আর সুজয়। জম্মু থেকে শ্রীনগর আসার পথে যে অপরূপ দৃশ্য দেখেছি তা কোনোদিন ভোলার নয়। দু'দিকের ছোট-বড় পাহাড়ের মাথা থেকে অনেক নিচের খাদ পর্যন্ত শুভ্র তুষারের সুবিস্তৃত শয্যা। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত এক বিশাল, বিস্ময়কর শুভ্র সমারোহ। বাস রাস্তার দুদিকে জমে রয়েছে হাঁটু থেকে কোমর সমান বরফ, আকাশ-ছোঁয়া পত্রশূন্য পাইন-ফারের ডালে ডালে, এমন কি টেলিগ্রাফ ইলেকট্রিকের তারেও ঝুলছে শুভ্র তুষার। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ, বাসের মধ্যেও কনকনে ঠাণ্ডা। জুতো-মোজা পরা পা দুটো মনে হয়েছে যেন বরফের সমুদ্রে ডোবানো। বড় বড় বুলডোজার আর রোড রোলার নিয়ে পি. ডব্লু. ডির শত শত কর্মী রাস্তার বরফ সরাতে ব্যস্ত।

পহেলগাঁওয়ে আগের সেই হোটেলেই উঠেছি। তবে ম্যানেজার গোলাম জালালকে দেখতে পাইনি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি তিনি এখন শ্রীনগরে। আর একজনকে দেখতে পাইনি, সেই কিশোর ঘোড়সওয়ার মোসুম খানকে। কে জানে এখন সে হয়তো ঘোড়া নিয়ে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে।

শীতের পহেলগাঁও সত্যিই অপরূপ। লিডার নদীর দু'দিকের সবুজ পাহাড় এখন রূপালী বরফে ঢাকা। শীতে সারা দিনরাতই আকাশ মেঘে ঢাকা, সূর্যের মুখ দেখা যায় না। তাই দিনে রাত্রে ঠাণ্ডা প্রায় একই। সব সময়েই ঘরে বুখারী জ্বলে। সকাল নটা-দশটার আগে পথে লোকজন দেখা যায় না। ওদিকে সন্ধ্যার আগেই পথ জনশূন্য। নিতান্ত দরকার ছাড়া বড় একটা কেউ পথে বেড়োয় না।

বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার আগেই হোটেলে ফিরে এসেছি। আগামীকালই বাসে শ্রীনগর ফিরে যাব। শ্রীনগর থেকে প্লেনে দিল্লী চলে যাব।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পুবের তুষার ঢাকা পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠল। রূপোর পাহাড়ের মতো ঝলমল করে উঠল আশপাশের পাহাড়।

আমরা তিনজন আর দুজন আমেরিকান ছাড়া হোটেলে আর কোনো ট্যুরিস্ট নেই। দোতলা হোটেল প্রায় ফাঁকা। সন্ধ্যার পর থমথমে। পূর্ণিমার আকাশের নিচে নেমে এলো নিস্তব্ধ রাত। কোনোদিকে এতটুকু সাড়া নেই, শব্দ নেই, বাতাস পর্যন্ত থেমে গেছে। যেন এক অপরূপ অবিশ্বাস্য রহস্যময় জগৎ।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও জানলার কাচের শার্সির ধারে জেগে বসে তুষার-মগ্ন কাশ্মীর উপত্যকার চাঁদনী রাতের দৃশ্য দেখেছি। তারপর এক সময় বিছানায় ঢুকেছি। বুখারী জ্বলায় ঘরের ভেতরটা বেশ গরম। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ একসময় যেন শুনলুম রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। পুবদিক থেকে যেন একটা ঘোড়া ছুটে আসছে নিশুতি রাতের বুক কাঁপিয়ে। চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল, মনে হলো যেন সেই মোসুম খানের আরবী ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এ শব্দ আমার চেনা। শব্দটা এগিয়ে আসছে। কাছে—আরও কাছে। ছুটে গেলুম জানলার কাচের শার্সির ধারে। আর ঠিক তখনই হোটেলের সামনের রাস্তায় দেখলুম মোসুম খান টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। পলকের মধ্যে তার ুরন্ত ঘোড়া পথের আড়ালে হারিয়ে গেল। আমি হতবাক, উঃ, কী দূরন্ত বেপরোয়া ছেলে! এই শীতের রাতে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছে। ওকে বারণ করার কি কেউ নেই? ভাবতে ভাবতে ফের বিছানায় শুতে গেলুম। কিন্তু তখনই দূর থেকে ঘোরার খুরের শব্দ শোনা গেল। মোসুম আবার ফিরে আসছে। ফের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাপিয়ে কানে এলো ভারি ট্রাকের শব্দ। শব্দটা মোসুমের ঘোড়ার দিক থেকেই আসছে। দেখলুম ঘোড়ার পেছনে গর্জন করে ছুটে আসছে একটা ভারি ট্রাক।

হোটেলের সামনে এসে ভয়ঙ্কর শব্দে ব্রেক কষল ট্রাকটা কিন্তু তার আগেই ট্রাকের ধাক্কায় ঘোড়া সমেত মোসুম ছিটকে পড়েছে খাদে। ঘোড়ার চিৎকারের সঙ্গে শোনা গেল মোসুমের আর্তকণ্ঠ।

তখনই ডেকে তুললুম আমাদের বন্ধুদের, এই—এই—ওঠ, হোটেলের সামনের রাস্তায় একটা সংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। গরম বিছানা ছেড়ে বন্ধুরা কেউ উঠতে চায় না। সুজয় বলে, ধ্যাৎ, এত রাতে আবার অ্যাক্সিডেন্ট হবে কি করে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলুম, আরে আমি নিজের চোখে দেখেছি, একটা ট্রাক মোসুম আর তার ঘোড়াকে ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দিয়েছে। আমি নিজের কানে শুনেছি ওদের চিৎকার।

নতুন ম্যানেজার মহব্বৎ খাঁকে ডেকে অ্যাক্সিডেন্টের কথা বললুম। পূর্ণিমার আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে মহব্বৎ খাঁ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন, শুতে যান বাবুজী, কুছ নহী হুয়া।

বললুম, কী বলছেন খাঁ সাহেব, এইমাত্র মোসুম আর তার ঘোড়াকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিয়ে ট্রাকটা পালিয়ে গেল।

ম্লান ক্লিষ্ট হাসলেন মহব্বৎ খাঁ, ও আপনাদের চোখের ভুল বাবুজী। দু'সন আগে মোসুম আর তার ঘোড়া ট্রাকের ধাক্কায় খাদে পড়ে মারা গেছে আমারই হোটেলের সামনে। পূর্ণিমার রাতে হোটেলের অনেকেই এমন দেখে।

নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে ভাবলুম, সত্যিই তো, আমারই চোখের ভুল। নইলে মোসুম তিন বছরে অনেক বড় হয়ে যেত।

ফাল্গুন ১৩৯২

রাজা সাহেবের গাড়ি

অজিত পূততুণ্ড

অহিন আর তুহিন দুই ভাই। আপন ভাই নয়, জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো। অহিন তুহিনের চেয়ে দু'মাসের বড়, সেই হিসেবে অহিন তুহিনের দাদা। ওরা দুজনে হরিহর আত্মা। একই সঙ্গে লেখাপড়া করে দুজনে। ওরা এই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস.-সি পাস করেছে।

দুই ভাই-এর শখ, মোটর গাড়ি চালিয়ে প্রথমে ভারত ভ্রমণ করবে এবং তারপরে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা মাঝে-মধ্যে ঠাকুর্দার পুরনো অস্টিনখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অবিশ্যি তাদের দুজনেরই গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আছে।

বি. এস.-সি পাস করার পর ঠাকুর্দার গাড়িখানা নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়েছে তারা। তাদের এই গাড়িখানা ঠিক যেন পোষ মানা পশুর মতো। চলতে ফিরতে কোনোরকম গোলমাল করে না। অহিনরাও যেমন তার শরীরের অবস্থা বোঝে, সে-ও যেন তেমনি অহিনদের অবস্থা বুঝতে পারে।

একবার তো ওরা একদল ডাকাতের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল পুরনো এই অস্টিন গাড়িটার জন্যে। রাত তখন অনেক। প্রায় একটা। ওরা ফিরছিল বসিরহাটের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। দিব্যি ছুটছিল গাড়িটা। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ ক্যাঁচ-কোঁচ করে থেমে গেল। ওরা লক্ষ্য করল, গাড়িতে তেল নেই। এদিকে জায়গাটা জনমানবশূন্য। পেট্রোল পাম্প তো দূরের কথা। ওরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। ঠিক সেই সময় ওরা লক্ষ্য করল, তিন মুস্কো চেহারার ডাকাত একটা মোটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে তেড়ে আসছে। তিনজনের হাতেই ছোরা।

ডাকাতদের দেখে ওরা কিছু না ভেবেই গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়িটাও যেন অবস্থাটা বুঝে নিয়েই লাগল চোঁ-চোঁ দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে পাঁচ মাইলের মাথায় এক পেট্রল পাম্পের সামনে এসে হাঁফাতে লাগল। পেট্রল নিয়েও গাড়িটাকে সেদিন অনেকক্ষণ জিরেন দিয়েছিল ওরা।

সব শুনে অহিন-তুহিনের ঠাকুর্দা বলেছিলেন, এ রকমটা তো হবেই। গাড়িটা যার কাছে থেকে পেয়েছিলাম, তিনি যে সাধক মানুষ ছিলেন। রীতিমতন সিদ্ধ পুরুষ।

তা সেই সাধকের অস্টিনটাই ওদের রীতিমতন ঝামেলায় ফেলেছিল দেওঘর আর ত্রিকূট পাহাড়ের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।

তখন অনেক রাত। প্রায় একটা। বসিরহাটের সময়টা যা ছিল ঠিক তা-ই। জায়গাটা একেবারে নির্জন। দূরে বা কাছে কোথাও কোনো লোকের চিহ্ন নেই। এদিকে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়িটার ইঞ্জিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেতেই তুহিন স্টিয়ারিং হুইল-এ হাত রেখে বলল, অহিনদা, ব্যাপার গোলমাল। বসিরহাটের সেই এক টাইম। বারোটা পঞ্চাশ। ইঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। কোনো ঝামেলা হবে না তো?

অহিন গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, মনে থেকে কুসংস্কার ঝেড়ে ফ্যাল তো। তন্ত্রের বই-টই পড়াই তোর কাল হয়েছে দেখছি। বলে সে গাড়ির বনেট খুলে কল-কব্জার এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করতে লাগল। তারপর এক সময় হতাশার সুরে বলল, তুহিন, জটিল কেস। মনে হচ্ছে, বড়সড় গোলমাল। আমাদের বিদ্যেয় কুলোবে না। মেকানিক চাই।

তুহিন আতঙ্কিত হয়ে বলল, তাহলে কী হবে? কাছেপিঠে কোনো লোকজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে নাকি?

অহিন গাড়ির সিটের ওপর বসে গা-মাথা মুছতে মুছতে বলল, এখন একমাত্র ভরসা ঠাকুর্দার সেই তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। যার কাছ থেকে ঠাকুর্দা এই গাড়িটা পেয়েছিলেন। আঙুলে একটা টুস্‌কি দিয়ে বলল, তিনি কে তা অবশ্যি আমাদের জানা নেই।

তুহিন সামান্য অসন্তোষের সুরে বলল, ব্যাপারটা ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিও না। যা-ই বলো, বসিরহাটের ঘটনা কিন্তু পুরোপুরি অলৌকিক। তেল ছাড়াই গাড়ি চলল, এটা তুমি কি করে ব্যাখ্যা করবে? তেল ছাড়া মোটর গাড়ি, আর প্রাণহীন ঘোড়া তো একই কথা।

অহিন হাল্কা সুরে বলল, তাহলে এক কাজ কর। তুই বরং মনে মনে সেই সিদ্ধ পুরুষকে স্মরণ করে আমাদের উদ্ধারের কথা বল। অন্ততঃ বল কাছেপিঠে কোথাও যেন রাত্তিরের মতো একটা আশ্রয় পেয়ে যেতে পারি।

তুহিন ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সত্যি, এই মুহূর্তে যদি এখানে একটা ভালো বাড়ির খোঁজ পাওয়া যেত। আঃ কী মজাই না হতো! সত্যি কথা বলতে কি, আমি মনে মনে একটা সুন্দর বাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

তুহিনের কথা শেষ হতে না হতেই ওরা লক্ষ্য করল, ওই বৃষ্টির মধ্যে নির্জন পথ ধরে কেউ যেন টর্চ জ্বেলে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

লোকটির দিকে তাকিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অহিন বলল, যাক, অন্তত একটা লোকের দেখা পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই স্থানীয় কেউ। এর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

অহিনদের আলোচনার মধ্যেই লোকটি গাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। গাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানলায় মুখ বাড়াল।

অহিনরা এবার টর্চের আলোয় স্পষ্ট করে লোকটিকে দেখল। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হলো, কোনো ধনীর বাড়ির দারোয়ান। তার মাথায় পাগড়ি। খাকি প্যান্ট-শার্ট। কোমরে তকমাওয়ালা চামড়ার বেল্ট। ইয়া বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ।

লোকটি বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, স্যার, আপনারা বাঙালী তো?

অহিন কৌতূহলী হয়ে বলল, হ্যাঁ, আমরা বাঙালী। কিন্তু আপনি কে? কোত্থেকে আসছেন?

লোকটি বিনীতভাবে উত্তর দিল, আজ্ঞে রাজা সাহেব আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

রাজা সাহেব? কিন্তু তিনি আমাদের চিনলেন কি করে? তুহিন চোখ সূক্ষ্ম করে প্রশ্ন করল।

লোকটি একই ভঙ্গিতে উত্তর দিল, উনি দোতলার জানালা থেকে দেখেছেন, আপনাদের গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে।

অহিন আর তুহিন প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, দোতলা থেকে? এখানে দোতলা বাড়ি কোথায়? দু'পাশে তো মাঠ আর জঙ্গল দেখছি।

লোকটি গোঁফের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত মুচকি হেসে বলল, ওই তো বাড়ি। ওই যে—বলে রাস্তার ধারে একটা গাছের দিকে দেখাল সে।

অহিনরা প্রথমটা কিছু ঠাহর করতে পারল না। তারা বলতে যাচ্ছিল, কই কিছু দেখছি না তো।

ঠিক তখনই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। সেই বিদ্যুতের আলোয় ওরা লক্ষ্য করলে, অদূরে রাস্তার ধারে একটা সুন্দর বাড়ি।

অহিন তুহিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, অবাক কাণ্ড তো। এত কাছে এমন একটা বাড়ি, অথচ এতক্ষণ আমাদের নজরে আসেনি।

লোকটি এবার সামান্য অধৈর্যের সঙ্গে বলল, এবার চলুন স্যার। রাজা সাহেব আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গাড়ির জন্য ভাববেন না। এখানে আপনাদের গাড়ির কেউ কোনো ক্ষতি করবে না।

অহিন বলল, কিন্তু এই বৃষ্টিতে একটা ছাতায় তিনজনে যাব কি করে?

লোকটি গোঁফের ফাঁকে আবার সেই অদ্ভুত হাসি হাসল। তারপর বলল, কিছু ভাববেন না স্যার, আমার সঙ্গে আরো দুখানা ছাতা আছে। আপনাদের জন্যেই এনেছি। বলে বাঁ বগলের তলায় চেপে ধরা আরো দুখানা ছাতা দেখাল।

তুহিন বলল, এই রাজা সাহেব কিন্তু সত্যি অদ্ভুত মানুষ। গাড়িতে যে দুজন মানুষ আছে তাও লক্ষ্য করেছেন।

লোকটি গম্ভীর ভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, হ্যাঁ, স্যার, রাজা সাহেব খুবই অদ্ভুত মানুষ। আপনারা কথা বললেই তা বুঝতে পারবেন। তাহলে বেরিয়ে আসুন স্যার। এই ধরুন ছাতা।

অহিন আর তুহিন এবার বাইরে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে নিল ওদের তিন ব্যাটারির বড় টর্চটা।

সামান্য এগোতেই বাড়িটা পেয়ে গেল। বিদ্যুতের আলোয় বাড়িটাকে যত ভালো মনে হয়েছিল, টর্চের আলোয় দেখল, বাড়িটা তার চেয়েও অনেক ভালো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, কেউ যেন রঙ-তুলি দিয়ে বাড়িটাকে কাগজের ওপর এঁকে রেখেছে। কল্পলোকের বাড়ি যেন।

তুহিন অবাক হয়ে বলল, আমি একটু আগে এই রকম একটা বাড়ির কথাই ভাবছিলাম। আমার মনের ভেতরে এই রকম একটা বাড়ির ছবিই ছিল।

বাড়ির দরজা খোলাই ছিল। ওরা একটা হলঘরে এসে দাঁড়াল। ইংরেজ আমলের দামী আসবাবপত্রে ঘরটা সাজানো। তবে কোনো কিছুই পুরনো বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন সদ্য কেনা। ঝাড়লণ্ঠন থেকে শুরু করে কাজ করা টেবিল-সোফা সব।

দারোয়ান গোছের লোকটি সোফার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা বসুন স্যার। রাজা সাহেব এক্ষুণি এসে যাবেন।

দারোয়ানের কথা শেষ হতে না হতেই রাজা সাহেবের আবির্ভাব ঘটল। আসলে উনি আগেই ভেতরের দিককার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

রাজা সাহেবকে চিনিয়ে দেবার প্রয়োজন হলো না। গৌরবর্ণের দীর্ঘদেহী মানুষটি যে রাজা সাহেবই হবেন এটা ওরা ধরেই নিল।

রাজা সাহেবের পোশাক কিন্তু রাজা বাহাদুরের মতন নয়। পরনে লাল রঙের সিল্কের লুঙি আর গায়ে লাল রঙের সিল্কের আলখাল্লা। দাড়িগোঁফ কামানো। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি হবে না।

রাজা সাহেব মৃদু হেসে শান্ত অথচ গমগমে গলায় বললেন, আমার নাম হরিপ্রতাপ সিং। লোকে আমাকে ধলভূমগড়ের রাজা বলে জানে। তোমাদের গাড়িটা খারাপ হলো দেখে দারোয়ানকে পাঠিয়েছিলাম। তোমরা অখুশি হওনি তো?

অহিন আর তুহিন প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, অখুশি হব? আপনি বলছেন কি? সত্যি কথা বলতে, আমরা অভিভূত হয়েছি। এত রাত্তিরে এ-ভাবে—

রাজা সাহেব হেসে বললেন, দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। তোমরা বোসো। তোমাদের কিন্তু তুমিই বলছি, কিছু মনে করলে না তো?

অহিনরা একসঙ্গে বলে উঠল, ছি-ছি, কিছু মনে করবো কেন? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

রাজা সাহেব একটা সোফায় বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বসল। আর ঠিক তখনই ঝাড়লণ্ঠনের সব ক'টা আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। মনে হলো, গোটা ঘর যেন আনন্দে হেসে উঠল।

রাজা সাহেব বললেন, তাহলে তোমরা একটু চা খেয়ে নাও। শরীরটা চাঙা হয়ে উঠবে।

অহিনরা বলতে যাচ্ছিল, চায়ের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কথা বলার আগেই ওরা দেখল, রূপোর ট্রের ওপর দুটো সুদর্শন কাপে চা এনে হাজির করেছে সেই দারোয়ান। লোকটি কখন গেল আর কখন চা আনল ওরা তা খেয়ালই করেনি। চায়ের গন্ধে চারদিক ভুরভুর করছে।

অগত্যা অহিন আর তুহিন চায়ে চুমুক দিল। সত্যি অপূর্ব চা।

রাজা সাহেব একটা দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে বললেন, লোকটিকে চিনতে পারো?

অহিনরা দেখল দেওয়ালে একটা বিরাট তৈলচিত্র। তাদের ঠাকুর্দার ছবি। ছবির মানুষটির বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি হবে না। দাড়ি কামানো কিন্তু সুন্দর একজোড়া গোঁফ।

অহিনরা একসঙ্গে বলে উঠল, উনি তো আমাদের ঠাকুর্দা। কিন্তু এখানে ওঁর ছবি এলো কি করে?

রাজা সাহেব বললেন, তোমাদের ঠাকুর্দা অর্থাৎ সাধন আর আমি একসঙ্গে আইন পড়তাম যে! সাধন আইনটাই জীবিকা হিসেবে বেছে নিল। আর আমি—

—আপনাকে দেখে তো এত বয়েস বলে মনে হয় না—বলল তুহিন।

—তা ঠিক। তবে ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে আমার মধ্যেও বয়সের ছাপ পড়েছে। তোমরা আমাকে অল্পবয়েসী বলে মনে করছ, তাই বয়েসটা কম দেখছ।

রাজা সাহেবের কথা শেষ হওয়ার পর ওরা ভালো করে রাজা সাহেবকে লক্ষ্য করল। অবাক হয়ে দেখল, সত্যিই তা-ই। রাজা সাহেবের চুলগুলো প্রায় সবই সাদা। মুখে বয়েসের অসংখ্য রেখা। দেখলেই বোঝা যায়, আশির ওপরে বয়েস। অথচ এতক্ষণ এসব ওদের নজরে পড়েনি।

রাজা সাহেব ওদের চোখ-মুখের অবস্থা দেখে সামান্য হাসলেন কেবল।

ততক্ষণে ওদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। চা খাওয়া শেষ করে অহিনরা তাকিয়েছিল রাজা সাহেবের দিকে।

রাজা সাহেব অন্যদিকে তাকিয়ে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললেন, সাধনের সঙ্গে আমার কেমন বন্ধুত্ব ছিল শুনবে?

রাজা সাহেব কথাটা বলতেই অহিনদের সামনে দৃশ্যপট হঠাৎ বদলে গেল। সিনেমার পর্দায় যেমন মুহূর্তে দৃশ্যপট বদলে যায়, ঠিক তেমনি দ্রুতভাবে সব কিছু বদলে গেল।

অহিনরা দেখল, সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সাজানো একটা সুন্দর ঘর। ঘরের মধ্যে কালো রঙের স্যুট পরে দাঁড়িয়ে আছেন ওদের ঠাকুর্দা সাধন সরকার। তাঁর বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। সামনে রাজা সাহেব দাঁড়িয়ে। তাঁর বয়েসও চল্লিশের কোঠায়। রাজা সাহেবের পরনে লাল লুঙি এবং লাল আলখাল্লা। ওঁদের পেছনে দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। তাতে মাস দেখা যাচ্ছে সেপ্টেম্বর আর সাল উনিশ শো পঞ্চাশ।

রাজা সাহেব ঠাকুর্দাকে বলছেন, না ভাই, মন আর সংসারে থাকতে চাইছে না। মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে আর পারব না। আমার ছোট ভাই রইল, তোমরা রইলে, কারো কোনো অসুবিধা হবে না। তবে কি জানো, নতুন অস্টিন গাড়িটার ওপর আমার খুব মায়া আছে। ওটা আমি তোমাকেই দিয়ে যাচ্ছি। দানপত্র লিখে রেখেছি। গাড়িটাকে ভাই যত্নে রেখো। ওই যে তোমাদের গাড়ি। রাজা সাহেব আঙুল তুলে জানলার বাইরে দেখালেন।

অহিনদের সামনে দৃশ্যপট আবার বদলে গেল। ওরা দেখল, একটা বিশাল বাড়ির লনে ওদের সেই অস্টিন গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। তবে একেবারে নতুন। রোদ্দুর লেগে ঝকঝক করছে।

তুহিন স্থান-কাল ভুলে চিৎকার করে উঠল, অহিনদা, ওই যে আমাদের গাড়ি।

অহিন গম্ভীর ভাবে বলল, তাই তো দেখছি।

অহিনের কথার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট আবার বদলে গেল। ওরা দেখল, সামনের সোফায় একই ভাবে বসে আছেন রাজা সাহেব। তাঁকে দেখে ওদের আবার মনে হলো, রাজা সাহেবের বয়েস চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি নয়।

রাজা সাহেব মুচকি হেসে বললেন, শুনলে তো, তোমাদের ঠাকুর্দা এই গাড়িটা কি ভাবে পেয়েছিলেন?

অহিন ধাঁ করে বলল, শুনলাম কোথায়? দেখলাম বলুন। আচ্ছা, আপনি কি প্রোজেক্টর চালিয়ে আমাদের সিনেমা দেখালেন?

রাজা সাহেব প্রাণভরে কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, তোমাদের মাথায় কেবল বিজ্ঞান ঘোরে, তাই না? কিন্তু বিজ্ঞান জানে না, এমন অনেক জিনিসও আছে তা কি জানো?

একটু থেমে বললেন, সিনেমা নয়। এটা তোমরা তোমাদের মনের চোখ দিয়ে দেখেছ। আসলে কান দিয়ে যা শুনেছ, মন তা-ই ছবির আকারে দেখেছে। সে যাক। আসল কথা বলি। বুঝলে, এই অস্টিন গাড়িটার ওপর এখনো খুব মায়া আছে। মাঝে মাঝেই ওটাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করে। তোমাদেরও তাই বলি, ওকে খুব যত্নে রেখো। আমি বলছি, তোমরা এই গাড়ি নিয়ে নিশ্চয় পৃথিবী ভ্রমণে বেরোতে পারবে। শরীর-মন সুস্থ রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাও।

রাজা সাহেবের কথা শেষ হতেই বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটের ঘণ্টা বাজল।

রাজা সাহেব বললেন, দারোয়ান বলো দারোয়ান, বন্ধু বলো বন্ধু, ওই যুধিষ্ঠিরই আমার সব। ও সব করতে পারে। তোমাদের গাড়িটা ও-ই সারিয়ে রেখেছে। তোমরা এবার যাও। কথাটা বলেই রাজা সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, প্রয়োজনে একশো মাইল বেগে গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। কথাটা বলেই বাড়ির ভেতর পা বাড়ালেন।

অহিনরাও উঠে পড়ল।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশও পরিষ্কার ঝকঝকে। ওরা খুশি মনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

ফিরে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দেখল, সত্যি গাড়িটা সারানো হয়েছে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই তুহিন বলে উঠল, ওই যাঃ, রাজা সাহেবের টেবিলের ওপর টর্চটা রয়ে গেছে।

অতএব গাড়ি রেখে আবার ছুটল ওরা। কিন্তু কোথায় কি? সব ভোঁ-ভাঁ। অত বড় বাড়িটার কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। যেন ডানা মেলে উড়েই গেছে সেটা।

তুহিন এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—ব্যাপারটা ভূতুড়ে নয়তো? আমরা হয়তো ভূতের পাল্লায় পড়েছি।

অহিন প্রায় ধমকের সুরে বলল, ধ্যেৎ, তা কখনো হয়? তাহলে ছাতাও তো মিথ্যে হবে। আর ছাতা মিথ্যে হলে আমাদের জামা-প্যাণ্ট নিশ্চয় ভিজে থাকত। তাছাড়া চায়ের স্বাদ এখনো জিবে লেগে আছে। তা নয়। আমরা নিশ্চয় জায়গা ভুল করছি।

জায়গার ভুলেই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, ওরা কিন্তু রাজা সাহেবের বাড়িটা আর খুঁজে পেল না। বাড়িটা না পেলেও টর্চটা অবিশ্যি পেল। ফিরে এসে দেখল, টর্চটা গাড়ির সিটের ওপর পড়ে আছে।

তুহিন ফিসফিস করে বলল, অহিনদা, রাজা সাহেব নির্ঘাত ভূত।

অহিন গম্ভীরভাবে বলল, ঠাকুর্দাকে বলে ব্যাপারটা বুঝতে হবে।

বাড়ি ফিরে ওরা ঠাকুর্দাকে সব বলল। ঠাকুর্দা সব শুনে গুম হয়ে বললেন, হুঁ।

একটু থেমে আবার বললেন, অত বড় মানুষ, অথচ গাড়ির মায়া এখনো ছাড়তে পারেনি। বেচারার মরেও শান্তি নেই।

অহিন-তুহিন বলে উঠল, রাজা সাহেব মারা গেছেন?

ঠাকুর্দা ধীরে ধীরে বললেন, হ্যাঁ, দেওঘরে। উনিশ শো একান্ন সালে। প্রথমে হরিপ্রতাপ এবং তার সাত দিন পর যুধিষ্ঠির।

ঠাকুর্দার কথা শুনে অহিন-তুহিনের সারা শরীর শিউরে উঠল। ওরা সভয়ে বলে উঠল, তার মানে আমরা সারারাত ভূতের সঙ্গে ছিলাম? ভূত আমাদের চা খাইয়েছে? অবাক কাণ্ড।

ঠাকুর্দা এ-কথার উত্তর না দিয়েই গম্ভীর মুখে বললেন, এখন থেকে হরিপ্রতাপের অস্টিনটা গ্যারেজেই থাকবে কেউ ওতে চড়তে পারবে না।

চৈত্র ১৩৯১

হারায়নি

জগবন্ধু হালদার

হিমঢাকা চটি। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে এক তুষারাবৃত স্থানের নাম।

এখানে কোনো গ্রাম বা জনবসতি নেই। পাহাড়ে ঘেরা এটা একটা তুষারধবল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। ওখানে একটি মাত্র বাড়ি বরফের মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে—সরকারী বাড়ি। পাথর গেঁথে তৈরি। এবড়ো খেবড়ো দেওয়াল। কখনো কখনো সরকারী লোক এলে কয়েকদিন এখানে থেকে যায়।

তারাও এটাকে হিমঢাকা চটি বলে। সরকারী নথিপত্রেও এটার নাম দেওয়া হয়েছে হিমঢাকা চটি।

কথিত আছে, অতীতে এখানে একটা সরোবর ছিল। সেই সরোবরকেই তীর্থ মানা হতো। তখন তীর্থযাত্রী আসত। তাই একটা চটিও ছিল এখানে। পরে কোনো এক সময়ে গোটা অঞ্চলটা চিরদিনের জন্য তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। তারপর সে জলাশয়ের কোনো চিহ্ন নেই। সেই থেকে এ পথে কোনো তীর্থযাত্রী আসে না। সেদিনের সেই চটিও এখন হারিয়ে গেছে। এখনকার হিমঢাকা চটি বলতে ঐ সরকারী রেস্ট হাউস। এটা তৈরি হয়েছে আঠারো বছর আগে।

চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হওয়ার পর এটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই বাড়ির একটা অংশ মিলিটারী চৌকিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সব সময়ের জন্য দু'জন সশস্ত্র জোয়ান এখানে মোতায়েন থাকে। বাকি অংশটা থাকে রাজবাহাদুর নামে এক কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের বনবাদাড়ে টহল দিতে দিতে সেদিন রমেশ সামন্ত হাজির হলো এই রেস্ট হাউসে। রমেশবাবু বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন উদ্ভিদবিশারদ এবং গবেষক। তার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হিমালয়ের গায়ে নতুন নতুন উদ্ভিদের সন্ধান করা। হিমালয়ে তো শুধুই পাথর নয়, সেখানে এক বিশাল উদ্ভিদকুল অবস্থান করছে। দীর্ঘদিন ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে রমেশ সামন্ত যখন হিমঢাকা চটিতে এসে হাজির হলো তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। পরিচয়পত্র দেখে কেয়ারটেকার রাজবাহাদুর রমেশকে রেস্ট হাউসে আশ্রয় দিল।

রমেশ দেখল রেস্ট হাউসের ঘরগুলো পার্বত্য গুহার মতো রহস্যময়। এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়াল। মেঘে ঢাকা তুষারভূমিতে অবস্থিত বলে ঘরের ভেতরটাও যেন স্যাঁতসেঁতে। দেওয়ালে পাথরের জোড়গুলোর কোথাও কোথাও শেওলার সবুজ রেখা পড়েছে। ঘরের মধ্যে রাজবাহাদুর একটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার দুর্বল আলো ঘরের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করতে পারছে না। আলো, অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা তিনে মিলে ঘরের ভেতরটা আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

রাজবাহাদুর একটা লোটা হাতে এসে শুধাল, বাবু, ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে এসেছেন—ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দেবো?

তার আগে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পারবে রাজবাহাদুর?

এই তো এনেছি বাবু।—বলে রাজবাহাদুর ঘটিটা বাড়িয়ে দিল।

এ যে লোটা? ঘটিতে করে চা?

কাপ বা কাঁচের গেলাসে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বাবু। লোটাতে চা অনেকক্ষণ গরম থাকে। এ দেশের ঠাণ্ডা তো দেখছেন।

রমেশ হেসে বলল, আচ্ছা আচ্ছা। দাও। একটু পরে চায়ের ঘটিতে চুমুক দিতে দিতে রমেশ বলে, আচ্ছা রাজবাহাদুর, এখানে রান্না করে কে?

আমিই বাবু।

আর কাউকে তো দেখছি নে। কোনো চৌকিদার নেই?

আমিই চৌকিদার।

সে কি? তুমি কেয়ারটেকার, রাঁধুনী ঠাকুর আবার চৌকিদার?

আমিই সব বাবু। ওদিকের ঘরের ঐ মিলিটারী লোক দুটো ছাড়া আমার সঙ্গে এখানে আর কেউ নেই। যাকগে, আপনি আরাম করুন, আমি রান্নার কাজটা সেরে ফেলি।

রাজবাহাদুরের ব্যবস্থায় রমেশের আহার সারা হলো। তারপর রাজবাহাদুর ঘরের ফায়ার প্লেসে কয়েকখানা মোটা কাঠ ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। আগুনের ছোট ছোট শিখাগুলি সাপের জিবের মত লক-লক করতে লাগল।

হঠাৎ রমেশের দৃষ্টি পড়ল ঘরের এবড়ো-খেবড়ো পাথরের দেওয়ালের ওপর। ফায়ার প্লেসের আগুনের আলোয় কালো পাথুরে দেওয়াল রক্তমাখা মেটের মতো দেখাচ্ছে। আগুনের শিখাগুলি যেমন কাঁপছে, তার আভায় লাল দেওয়ালটাও যেন তেমনি কাঁপছে। কোনো এক বন্য জন্তুকে কাটলে তার ফিনকি দেওয়া রক্ত যেমন গুহার দেওয়ালে ছিটকে ছিটিয়ে লেগে যায় তেমনি এক রক্তমাখা গুহার দেওয়াল মনে হচ্ছে রমেশের সামনে। মনে হচ্ছে সে নিজেই যেন আদিম মানুষ হয়ে গেছে।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল।

কে?—হঠাৎ রমেশ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময় ও আতঙ্কে তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ঘরে জানলা বলতে কিছু নেই। কিন্তু বারান্দার দিকের দেওয়ালের মাঝখানে এক ফুট করে চওড়া কয়েকটা ফুটো আছে। তারই একটা ফুটো দিয়ে একটা মানুষের মুখ ঘরের ভেতর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হনুমানটুপিতে সারা মুখ-মাথা ঢাকা। ফায়ার প্লেসের আগুনের লাল আলো পড়ে তার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। বিকট দেখাচ্ছে মুখটা। তার চেয়েও বিকট অথচ ভারি তার কণ্ঠস্বর ঃ তুমি কে? জগৎ কী?

তুমি কে?—এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুধু রমেশ কেন, অনেকের পক্ষেই কঠিন। কারণ তার সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন জড়িয়ে দিয়েছে ঐ আগন্তুক ঃ জগৎ কী?

প্রশ্ন করেই হনুমানটুপিতে ঢাকা মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। জবাব পাওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করল না।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না রমেশ। এখানে রাজবাহাদুর আর ঐ ফৌজী লোক দুটি ছাড়া আর কেউ থাকে না। আশপাশে কোনো গ্রাম লোকালয়ও নেই। তবে ঐ রহস্যজনক মুখটা কার? রমেশ একজন বিজ্ঞানী হয়েও ঘাবড়ে গেল মনে মনে। বেশ ভয় ভয় করতে লাগল তার। এত দিন পর কি তাকে সত্যিই ভূত বিশ্বাস করতে হবে?

রমেশ খাটিয়া বিছানা টেনে ফায়ার প্লেসের কাছে নিয়ে এল। কাঠগুলো ঠেলে ঠেলে আগুন বাড়িয়ে দিল। তারপর শুয়ে শুয়ে সেই বড় ঘুলঘুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। কিন্তু না—সেই মুখটা আর দেখা গেল না।

তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল রমেশ সামন্ত।

ভোর রাতেই ঘুম ভেঙে গেল রমেশের। কারণ কে ঐ লোকটা—সে প্রশ্ন তার মনে থেকেই গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে, কেউ একজন ঘরের বাইরের বারান্দায় শুয়েছিল এবং এক সময় দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে মুখ এনে রমেশের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। ভোরে ঘুম ভাঙতেই রমেশ ঝটপট বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখে কেউ নেই।

রমেশ আর শুতে গেল না। কম্বল মুড়ি দিয়দে বেরিয়ে পড়ল প্রাতঃভ্রমণে।

বাইরে বরফ বিছানো প্রান্তরের ওপর দিয়ে চতুর্দিকে ঘন কুয়াশার মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঠবে কিনা তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু ভোরের রূপোলী আলোয় মোটামুটি সবই দেখা যাচ্ছে। রমেশ উদ্ভিদবেত্তা। যে উদ্দেশ্যে সে এসেছে সেটা হলো নতুন নতুন উদ্ভিদের সন্ধান করা। কিন্তু না। এই কুহেলিকাচ্ছন্ন তুষারভূমির কোথাও কোথাও কয়েকটি পরিচিত বৃক্ষ ছাড়া কোনো অপরিচিত নতুন উদ্ভিদ তার চোখে পড়ল না। শীতের প্রকোপে একসময় তার চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। সে ফিরে চলল রেস্ট হাউসের দিকে।

মনে তার সেই হনুমানটুপি মুখটা ভাসছেই। তবু সারাদিন রমেশ সে সম্বন্ধে রাজবাহাদুরকে কিছু শুধাল না। বরং অপেক্ষা করল যদি আজ আবার রেস্ট হাউসে সেই মুখটা দেখা দেয়।

হলোও তাই। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আওয়াজ ঃ তুমি কে? জগৎ কী?

রমেশ চমকে উঠে দেখে ঘুলঘুলির ফাঁকে সেই মুখ।

বলতে পারলে না?—হনুমানটুপি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, থেলিজ বলেছে তুমি এবং সকল জীবের সৃষ্টি ও লয় হচ্ছে জল থেকে। জলই সব কিছুর আধার। এ কথা ঠিক?

এতটা বলেই সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে রমেশ সামন্ত ভয়ে কাঁপছে। লোকটার মুখ থেকে শোনা এবারের কথায় রমেশ আরো অবাক হলো। থেলিজ ছিলেন এক গ্রীক দার্শনিক। প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর নাম কেবল বইয়েই পাওয়া যায়, এ যুগের লোকের মুখে মুখে ঘোরে না। রমেশ বুঝতে পারল না, প্রায় হারিয়ে যাওয়া থেলিজের নাম কেন ঐ লোকটা টেনে আনল? ও কী বলতে চায়? কেন বলতে চায়? আসলে ও মানুষ, না প্রেতাত্মা? এই জনশূন্য তুষার প্রদেশে হঠাৎ একটা অপরিচিত মানুষের আবির্ভাব হলো কী করে? ও থাকেই বা কোথায়? এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ঘরের বাইরে ও একা ঘুরে বেড়ায় কী ভাবে? কোনো রক্তমাংসের মানুষ তো তা পারে না। তবে কি ও মানুষ নয়? অনুভূতিহীন অশরীরী, যাকে শীত ও উত্তাপ স্পর্শ করতে পারে না?

আর ভূতই যদি হয়—ও কি কোনো দার্শনিক ভূত?

রমেশ জীবনে কখনো ভূত দেখেনি। আজ যদি বা একটা দেখল—একেবারে দার্শনিক ভূত!

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে রমেশ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ভোর রাতে আবার সেই কণ্ঠস্বর ঃ জবাব দিলে না যে?

ঝট করে ঘুম ভেঙে গেল রমেশের। ধড়ফড় করে উঠে দেখে দেওয়ালের ফুটোয় সেই মুখ। সে মুখে সেই একই প্রশ্ন ঃ তুমি কে? জগৎ কী?

এ সব কিছুর উত্তর জল।—রমেশ এবার সাহস করে জবাব দিল।

ধেৎ।—হনুমানটুপি পরা লোকটা তাচ্ছিল্যভাবে উড়িয়ে দিল রমেশের কথা।

রমেশ বলল, তুমিই তো বলেছ দার্শনিক থেলিজ নাকি বলেছেন এ কথা?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার নয়। দার্শনিক থেলিজের কথা। কিন্তু অ্যানাক্সিমিনিজের কী কথা?

অ্যানাক্সিমিনিজ কে?—রমেশ শুধাল।

সে আর একজন দার্শনিক। অ্যানাক্সিমিনিজ বলেছে সমস্ত দৃশ্যমান জগতের মূল আধার বায়ু। বায়ু বিরল হলে তাপ, তাপ থেকে আগুন এবং ক্রমে সূর্য-তারকা হয়। আবার বায়ু ঘন হলে

হয় পৃথিবী এবং ক্রমে জীব ও উদ্ভিদ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। অতএব বায়ুই সব কিছুর আধার। তাই বলে কি সেটাও সত্যি? কিছু বলতে পারি—আমারও কিছু বলার থাকে।

বলতে বলতে মুখটা দেওয়ালের বড় ছিদ্রপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রমেশ ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মোটা কম্বলটা তুলে নিয়ে গায়ে-মাথায় মুড়ে নিল। তারপর ঘরের দরজা খুলে যেন নিশির ডাকে বেরিয়ে পড়ল রেস্ট হাউসের বাইরে।

কিন্তু কই? সে কোথায় গেল?

রেস্ট হাউসকে পেছনে ফেলে রমেশ দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বরফজমা মাঠের মধ্যে দিয়ে। তার মনে হলো তাড়াতাড়ি হাঁটলে নিশ্চয় ধরতে পারবে তাকে। এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে রমেশকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও সে আত্মগোপন করতে পারবে না। রমেশ এবার ছুটতে আরম্ভ করল।

ছুটতে ছুটতে কতদূর এসে পড়েছে সে নিজেও জানে না। রমেশের চোখে পড়ল দূরে বরফ ঢাকা একটা হিমশৈল দাঁড়িয়ে। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে একটার পর একটা কুয়াশার মেঘকুণ্ডলী নেমে এসে বরফের মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তাদের সঙ্গে এগিয়ে আসছে একটা লোক।

রমেশ থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, সেই হনুমানটুপি পরা মানুষটাই। ওর পরনে ফুলপ্যান্ট, পায়ে জুতো মোজা অ্যাংক্লেট, গায়ে কোট, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, চোখে চশমাও।

চোখে-মুখে তুষারকণা ছিটিয়ে দিয়ে কয়েকটা মেঘকুণ্ডলী ঝড়ের মত এসে রমেশের ওপর দিয়ে চলে যেতেই দেখে সেই লোকটা একেবারে তার সামনে এসে হাজির।

কে তুমি? জগৎটা কী?—সেই প্রশ্ন।

রমেশ এবার ভীষণ রেগে গেল। একরকম ধমক দিয়েই বলল, বারবার দেখা করছ আর তুমি আমাকে চেন না? এবার তুমি বল কী জন্য বারবার আসছ?

এখন তো এই দুর্যোগের মধ্যে তুমিই রেস্ট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ? তুমি বল কী জন্য এসেছ?

রমেশ বলল, আমি তোমার সন্ধানেই এসেছি। জানতে চাই তোমার ঐ একই অদ্ভুত প্রশ্নের অর্থ কী?

লোকটা হেসে উঠল এবং বলল, এ প্রশ্নের অর্থ ও উত্তর পাচ্ছে না বলেই তো দার্শনিকরা আজো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি শুধু তোমার মত কী সেটাই জানতে চেয়েছিলাম, যদি আমার মতের সঙ্গে মেলে।—লোকটা এবার উদগ্রীব হয়ে উঠল। আকুল অনুনয়ে বলল, বলবে, বলবে? তোমার মতটা বলবে? তোমারটা যদি আমার মতের সঙ্গে মিলে যায়, আমি নিশ্চিন্ত হবো। ওসব থেলিজ-অ্যানাক্সিমিনিজের কথা আমার মনে ধরে না।

তোমার মতটা কী শুনি?—রমেশ শুধাল।

জলও না বাতাসও না। বরফ। বুঝলে? বরফ। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে অটুট রাখার ক্ষমতা রাখে বরফ। বরফের তলায় আশ্রয় পেলে মরেও কোনো জীবের দেহ পচে না, নষ্ট হয় না। এই বরফের তলায় কোথাও না কোথাও তারা আছে।

লোকটার কথা যত শুনছে ততই রমেশের বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে। ওর কথাগুলো ঐ কুয়াশার মত রহস্যের ঘন জাল বিস্তার করে রমেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। রমেশের মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ঃ আছে?

হ্যাঁ, আছে। তারা হারায়নি। আমি তোদের পাবোই। হারায়নি—হারায়নি—

বলতে বলতে লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল। দূরে ঐ হিমশৈলের পাদদেশে কুয়াশা কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে গেল।

রেস্ট হাউসে ফিরে এসে রমেশ রাজবাহাদুরের মুখ থেকে সব জানতে পারল।

রাজবাহাদুর বলল, আরে ও তো আমাদের বোস সাহেব। আপনাকেও দেখা দিয়েছে তাহলে? দার্শনিক কাকে বলে জানি না বাবু, তবে বোস সাহেব এঞ্জিনিয়ার ছিল। এই রেস্ট হাউসের বাড়িটা সেই তৈরি করেছে। একদিন স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে বরফের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ওখানে যে বরফের পাহাড়টা আছে তার ওপর থেকে বরফের ধস নেমে তার স্ত্রী কন্যাকে চাপা দিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছুদিন বোস সাহেব ঐ বরফের মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। তারপর একদিন কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। সে আজ আঠার বছর আগেকার কথা। মনে হয় বোস সাহেবও কোথাও বরফের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। এখন যে মাঝে-মধ্যে দেখা দেয় সে তার প্রেতাত্মা।

তোমার গল্প শেষ?—রমেশ শুধায়। বোস সাহেবের গল্পটা এত ছোট্ট করে শেষ হওয়াটা যেন তার পছন্দ নয়।

রাজবাহাদুর বলল, গল্প নয় বাবু—সব সত্যি।

রাজবাহাদুর!

কিছু বলছেন বাবু?

সবই যখন সত্যি, বোস সাহেবের ঐ কথাটাও সত্যি।

কোন কথাটা?

হারায়নি—তারা হারায়নি। কিছু হারায় না।

ভাদ্র ১৩৯২

আতঙ্ক

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডকারণ্যের গভীর বনে পরাশরবাবুর পাঁচটা বছর কেটে গেল। কোথায় পশ্চিমবঙ্গের সেই ছোট্ট গ্রাম উলুখড়, আর কোথায় মধ্যপ্রদেশের দণ্ডকারণ্য। প্রথম প্রথম বাড়ির জন্য খুবই মন কেমন করতো। ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়তো। ঘুমের মধ্যে কতদিন তিনি পিন্টু আর টিঙ্কুকে স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু কি করবেন! ভারত সরকারের বনবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী তিনি। দায়-দায়িত্বও তো কম নয়। তাই শুধু চাকরির জন্যই তাঁকে পড়ে থাকতে হয় এখানে।

বছরে মাত্র একবারই দেশে আসেন পরাশরবাবু। দুর্গাপূজার সময়। আসার সময় পিন্টু আর টিঙ্কুদের জন্য নতুন নতুন জামাপ্যান্ট নিয়ে আসেন। স্ত্রী বিমলার জন্যেও আনেন খানকয়েক দামি দামি শাড়ি। প্রায় পনেরো-কুড়ি দিন দেশের বাড়িতে থাকেন। সময়টা বেশ আনন্দের মধ্যেই কেটে যায়। ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই আবার তাঁকে চলে আসতে হয় দণ্ডকারণ্যে।

সারাদিন কাজের শেষে ক্লান্ত শরীরে যখন তিনি নিজের বাংলোয় ফেরেন তখন আর যেন তাঁর কিছু ভালো লাগে না। দৈনিক খবরের কাগজটা এই সময়ে একটু পড়েন। তাতেও ঠিক মন বসে না, কারণ তাঁর দেশের কথা বড্ড বেশি করে মনে পড়ে যায়।

সেদিনও পরাশরবাবু কাজ থেকে ফিরে খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছেন। রান্নাঘরে কৈলাশ তখন রান্না করছে। কৈলাশ একাধারে তাঁর রাঁধুনী, ভৃত্য এবং দেহরক্ষীও। বয়সে পরাশরবাবুর চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। তাই অনেক সময় সে তাঁর অভিভাবকেরও কাজ করে। পরাশরবাবুকে সে খুবই ভালোবাসে।

খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়লেন পরাশরবাবু। একটা জায়গায় এসেই তাঁর চোখ আটকে গেল।

"পশ্চিমবঙ্গে মহামারী!
গ্রামকে গ্রাম উজাড়!"

সে কি! এমন অবস্থা! তবে উলুখড় গ্রামের কি হলো কে জানে! ওখানেই তো রয়েছে তাঁর স্ত্রী বিমলা, ছেলে-মেয়ে।

খবরের কাগজখানা টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখলেন পরাশরবাবু। চোখ থেকে চশমাটা খুলে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবতে লাগলেন।

একটু পরেই তিনি কৈলাশকে ডাকলেন।

কৈলাশ গামছায় হাত মুছতে মুছতে পরাশরবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো।

পরাশরবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে কৈলাশের মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, আজ রাতেই জিনিসপত্তরগুলো সব গুছিয়ে রাখো। কাল ভোরের ট্রেনেই দেশে যাব। আর তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

কৈলাশ কাঁধের উপর গামছাটা ফেলে আমতা আমতা করে বলে, বাবু! আমিও যাব?

পরাশরবাবু জবাব দেন, হ্যাঁ।

পরদিনে খুব ভোরেই পরাশরবাবু কৈলাশকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। পথেই কেটে গেল প্রায় দু'দিনের মতো সময়।

দু'দিনের দিন প্রায় সন্ধ্যার সময় উলুখড় গ্রামে এসে তাঁরা পৌঁছলেন। চালতেপোতা রেল স্টেশনে নেমে প্রায় মাইল খানেক হাঁটা পথ। কাঁচা রাস্তা। তারপর উলুখড় গ্রাম।

তখন চারদিকে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। ফাল্গুন মাস। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে।

গ্রামে ঢুকতেই পরাশরবাবুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্ক। কিন্তু এমনটি হলো কেন? নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন পরাশরবাবু। কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছেন তিনি। তাঁর পিছনে পিছনে কৈলাশও হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে।

কৈলাশ এই গ্রামে এর আগে কোনোদিন আসে নি। এই প্রথম সে এই গ্রামে আসছে।

একটু এগোতেই পরাশরবাবুর নজর পড়লো গোবর্ধনের মাঠের কাছে সাঁতরাদের কনকচাঁপা গাছের নিচেকার সরু রাস্তাটা দিয়ে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। পরাশরবাবু একটু জোরে পা চালালেন লোকটাকে চেনার জন্যে।

বাসুদা যাচ্ছে না? হ্যাঁ ঠিক, বাসুদাই তো বটে। এবারে আর তাঁর চিনতে ভুল হয় নি। তিনি তক্ষুণি চেঁচিয়ে ডাকলেন, বাসুদ! ও বাসুদা!

বাসুদা থমকে দাঁড়িয়ে একবার ফিরে তাকালো তাঁর দিকে। কিন্তু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করলো না সে। যেমন যাচ্ছিলো তেমনি চলতে লাগলো।

পরাশরবাবু অবাক হলেন। বাসুদা তাঁকে দেখেও দাঁড়ালো না কেন? ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হলো।

বাব!—পিছন থেকে কৈলাশ ডাকে, আর কতদূর বাবু?

আর প্রায় এসে গেছি—পরাশরবাবু জবাব দিলেন, সামনেই ঝুমড়ি বাগান। তারপর আর দুটো বাঁক পেরোলেই আমার বাড়ি।

কৈলাশ বলে, ইস্টিশান থেকে তাও তো কম দূর নয় বাবু!

পরাশরবাবু আর কোনো কথা বললেন না। একটু তাড়াতাড়িই হেঁটে চললেন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারটা আরো একটু গাঢ় হয়েছে। আর একটু এগোতেই তিনি দেখলেন খ্যান্ত পিসিকে। ধবধবে সাদা একখানা কাপড় পরে খ্যান্ত পিসি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পথের উপর।

খ্যান্ত পিসির আসল নাম ক্ষান্তমণি। সেই ক্ষান্তমণিই গ্রামের ছোট-বড় সকলেরই খ্যান্ত পিসি হয়ে আছে।

সে যাই হোক, এই সন্ধ্যাবেলা খ্যান্ত পিসি পথের উপর এমন করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কি খবর পিসি?—কাছে এসে পরাশরবাবু ডাকলেন, কেমন আছো?

খ্যান্ত পিসি কোনো জবাব দিল না। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলো।

তোমার আবার কী হলো? কথা বলছো না যে পিসি?

খ্যান্ত পিসি তবুও নিরুত্তর।

পরাশরবাবু আবার বললেন, আমাকে চিনতে পারছো না? আমি পরাশর।

খ্যান্ত পিসি এবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে হঠাৎ আবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

পরাশরবাবুর মনের চাপা আতঙ্কটা যেন আরো বেড়ে গেল। তিনি চলতে চলতে মুখ ফিরিয়ে কৈলাশের দিকে একবার তাকালেন। কৈলাশের চোখে-মুখেও কেমন যেন বিস্ময়ের ছায়া। সে বলে, বাবু! তাড়াতাড়ি পা চালান।

কেন রে কৈলাশ?

আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে।

সন্দেহ?—পরাশরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের সন্দেহ?

সে কথা এখন বলব না বাবু। পরে বলব।

আবার দু'জনেই পথ চলতে লাগলেন।

সারা গ্রামখানা কেমন যেন নিঃঝুম হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় এখন তো ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলবে। শাঁখ বাজবে। কিন্তু কই গ্রামের কোনো ঘরেই তো আলো দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাশরবাবু বাড়ি এসে পৌঁছলেন। উঠোনে পা দিয়েই একটু থমকে দাঁড়ালেন।

কি হলো বাবু?—কৈলাশ বললো, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?

পরাশরবাবু সে কথার কোনো জবাব দিলেন না। তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন, তাঁর বাড়িটা এমন নিঃঝুম কেন? আলো নেই! সব ঘরই অন্ধকার! মনে হচ্ছে এ বাড়িতে কেউ নেই। তবে কি মহামারীর আশঙ্কায় বিমলা পিন্টু আর টিঙ্কুকে নিয়ে বাপের বাড়ি ভাণ্ডারকোলায় চলে গেছে? না কি যা আশঙ্কা করে তিনি বাড়ি ছুটে এসেছেন তাই হলো? মহামারীর কবলে তবে কি ওরা সবাই........

আর ভাবতে পারেন না পরাশরবাবু। তিনি যেন অতি কষ্টে উঠোন পেরিয়ে এগোতে লাগলেন। কে যেন তাঁর পা দুটো চেপে ধরছে।

অন্ধকারের মধ্যেও পরাশরবাবু দেখতে পেলেন ঘরের দরজা-জানালাগুলো সবই খোলা। তাহলে তো ওরা ঘরেই আছে। কিন্তু আলো নেই কেন? তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন যে, ঘরের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করে কারা যেন কথা বলছে, চলাফেরা করছে।

পরাশরবাবু কৈলাশকে বললেন, সুটকেসটা খুলে ওর ভিতর থেকে টর্চটা বার করো তো!

কৈলাশ সুটকেস খুলতে যাবে ঠিক তখনই অন্ধকার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে কে যেন বেরিয়ে এলো।

পরাশরবাবু চমকে উঠলেন। বললেন, কে?

আমি বিমলা।

বিমলা?—পরাশরবাবু যেন অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কেন? ঘরেই ছিলাম।

এখনো ঘর অন্ধকার কেন? সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো নি?

না।

কেন?

বিমলা সে কথার জবাব দিল না। শুধু ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, টিঙ্কু! ঘরের আলোগুলো জ্বেলে দে তো রে।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর মতো সব ঘরেই একসঙ্গে হ্যারিকেনের আলো জ্বলে উঠলো।

এইভাবে আলো জ্বলে ওঠায় পরাশরবাবু আর একবার চমকে উঠলেন।

কী হলো?—বিমলা বুঝতে পেরে বলে, চমকে উঠলে যে!

আমতা আমতা করে পরাশরবাবু বললেন, কই? না তো!

বিমলা আর কিছু বললো না। পরাশরবাবু এবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পিন্টু-টিঙ্কু ওরা সব ভালো আছে তো?

হ্যাঁ, খুব ভালো আছে।

ওরা কোথায়?

ঘরেই আছে।

পরাশর ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কিন্তু এখনো যে ওরা ছুটে আসছে না? আমি এলেই তো ওরা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে!

বিমলা বলে, কতক্ষণ আর বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে? ঘরে এসো।

কৈলাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বিমলা বলে, এ আবার কে?

এই তো কৈলাশ—পরাশরবাবু বললেন, যার কথা তোমায় চিঠিতে লিখেছিলাম।

সবাই এবার ঘরে ঢুকলো।

কিন্তু এ কি! পরাশরবাবু ও কৈলাশ দু'জনেই যেন বেশ কিছুটা অবাক হলেন। ঘরের জিনিসপত্রগুলো এমন অগোছালো কেন? যেন সব ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে। ঘরের প্রায় মাঝখানে একটা গামলায় খানিকটা জল রয়েছে। জলটা অনেকদিন থেকেই একভাবে রয়েছে বলে মনে হলো। কারণ তাতে বেশ কিছু মশা ডিম পেড়েছে। আলনার কাপড়চোপড়গুলোও সব এলোমেলো।

ওঁরা দু'জনেই হাত-মুখ ধুতে কলতলার দিকে গেলেন। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে ঢুকতেই পরাশরবাবু পিন্টু আর টিঙ্কুকে দেখলেন। ওদের দেখে হাসতে হাসতে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে!

পিন্টু বললো, ঘরেই তো ছিলাম বাবা!

পরাশরবাবু টিঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোদের জন্যে এবার আর কিছুই আনতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি চলে আসতে হলো তো!

কিছু না আনার জন্যে ভাই-বোন কেউ কোনও অভিযোগ করলো না।

একটা জিনিস কিন্তু পরাশরবাবু লক্ষ্য করলেন যে, পিন্টু, টিঙ্কু ওরা কেউ তাঁর কাছে আসছে না। আগের মতো গলা জড়িয়ে ধরছে না। ওরা যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে।

পরাশরবাবু ও কৈলাশ দু'জনেই আবার ঘরে গিয়ে বসলেন। ঘরের মেঝে থেকে আরম্ভ করে চেয়ার খাট সব কিছুতেই ধুলো জমে আছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে পরাশরবাবু নিজেই খাটের উপরটা ঝাড়তে ঝাড়তে বিমলাকে বললেন, ইস! কী ধুলোটাই পড়েছে। এ সবগুলো একটু পরিষ্কার করতে পারো না?

না—বিমলা জবাব দেয়, ওসব অভ্যেস আর নেই।

অভ্যেস আর নেই? তার মানে?

মানে আবার কি?—বিমলার গলার আওয়াজটা বেশ ঝাঁঝালো, সব কথার আবার মানে আছে নাকি?

পরাশরবাবু আর কথা বাড়ালেন না। কৈলাশ এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিল। পরাশরবাবু ঘরের একপাশে পাতা ছোট চৌকিটার উপর তাকে বসতে বললেন। কৈলাশ বসলো।

পরাশরবাবু এবার বিমলাকে বললেন, নিজে যদি সময় না পাও তাহলে পুঁটির মাকেও তো ঘরদোর পরিষ্কার করে দিতে বলতে পারো।

কার কথা বলছো?—বিমলা বলে, পুঁটির মা? হায় রে, সে কি আর আছে?

পুঁটির মা নেই? কাজ ছেড়ে দিয়েছে?

উঁহুঁ—বিমলা বললো, মহামারী কাউকেই রেহাই দিল না আর পুঁটির মাকেই ছেড়ে দেবে?

সে কি!—পরাশরবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, পুঁটির মা মরে গেছে?

হ্যাঁ।

বিমলা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। ওঁরা দুজনে বড় ঘরেই বসে রইলেন। কারো মুখে কোনো

কথা নেই। একটা সিগারেট ধরালেন পরাশরবাবু। ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে খাবার জন্যে ডাক দিল বিমলা।

পরাশরবাবু এ ঘর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, বিমলা! এক্ষুণি ভাত দিয়েছো? আর একটু পরে খেলে হতো না?

না না—রান্নাঘর থেকে বিমলার গলার আওয়াজ এলো, এক্ষুণি খেয়ে নিতে হবে।

কৈলাশ প্রায় ফিস্ ফিস্ করে পরাশরবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে খেতে চলুন বাবু! এখন অর মা ঠাকরুণের অবাধ্য হবেন না।

অগত্যা পরাশরবাবু রান্নাঘরের দিকে গেলেন। কৈলাশও গেল। রান্নাঘরে দু'জনেরই খাবার জায়গা করা হয়েছে।

রান্নাঘরে ঢুকেই পরাশরবাবুর বুকের ভিতরটা আবারও যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। লক্ষ্য করলেন রান্নাঘরটাও নোংরা হয়ে আছে। উনুনেও কোনো আগুনের চিহ্ন নেই। কতদিন যেন এ ঘরেও কেউ ঢোকে নি।

পরাশরবাবু তাঁর নির্দিষ্ট আসনে খেতে বসলেন। কৈলাশও খেতে বসলো।

কিন্তু একি! এত সব রান্না? গরম গরম মাংস, মাছের ঝোল, মাছের কালিয়া, ছোলার ডাল, কপির ডালনা, চাটনি আর পায়েস। এ যে একেবারে রাজসিক ব্যাপার।

খেতে খেতে পরাশরবাবু বিমলাকে বললেন, এতসব রান্না করলে কখন? উনুন তো জ্বালো নি। অথচ সবই গরম গরম। কি ব্যাপার বিমলা?

কি আবার ব্যাপার?—বিমলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, খেয়ে নাও তো আগে।

পরাশরবাবু ঘরের এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর বললেন, পিন্টু আর টিঙ্কুকে খেতে দিলে না?

বিমলা জবাব দেয়, ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মাংসের হাড় চিবুতে চিবুতে পরাশরবাবু বিমলাকে বললেন, গ্রামের সব খবর কী?

গ্রামে আবার কেউ আছে নাকি?

কোথায় গেছে?

কোথায় আবার যাবে?—বিমলা বললো, কেউ কেউ পালিয়েছে। তবে বেশির ভাগ মানুষই মরে গেছে।

হঠাৎ পরাশরবাবুর গা ছম্ ছম্ করে উঠলো। একটু পরে তিনি বললেন, আচ্ছা বিমলা! এই মহামারীর সময় তুমিই বা বাচ্চা দুটোকে নিয়ে উলুখড়ে পড়ে রইলে কেন? এখানে থাকার কি দরকার ছিল? ভাণ্ডারকোলায় চলে যেতে পারতে।

আমিও তো ভেবেছিলাম ভাণ্ডারকোলায় চলে যাবো—বিমলা বিমর্ষভাবে বলে, কিন্তু সময় আর পেলাম কোথায়? এক রাতেই তো........

কথা শেষ করলো না সে। ইচ্ছে করেই থেমে গেল।

থামলে যে?—পরাশরবাবু এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বললেন, এক রাতেই কী?

কিছু না। ওসব কথা পরে হবে। এখন খেয়ে নাও তো!

কৈলাশ কিন্তু একটা কথাও বলছে না। সে আপন মনেই খেয়ে চলেছে।

পরাশরবাবুও আবার খেতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ।

একটু পরেই পরাশরবাবু বললেন, বিমলা! আমাদের কলতলার লেবুগাছে এবার লেবু হয় নি?

হ্যাঁ, অনেক আছে—বিমলা বললো, তুমি ভাতের সঙ্গে লেবু খাবে?

তা একটা পেলে ভালো হতো।

আচ্ছা এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।

গাছ থেকে?

হ্যাঁ।

না না—পরাশরবাবু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললেন, এত রাতে এই অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে আর লেবু তুলে আনতে হবে না।

অন্ধকারে যাবো কেন?—বিমলা বলে, এখানে বসেই এনে দেব।

কথাটা বলেই বিমলা যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

ও কি!

পরাশরবাবু দেখলেন বিমলার ডান হাতখানা লম্বা হতে হতে একেবারে কলতলার লেবুগাছটা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

অস্ফুটস্বরে পরাশরবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ওকি! বিমলা!

পরাশরবাবু চমকে উঠলেন। চমকে উঠলো কৈলাশও।

বিমলার মুখে মৃদু হাসি। বললো, এই নাও লেবু! দেখলে তো কেমন করে এখানে বসেই গাছের লেবু ছিঁড়ে নিয়ে এলাম?

ওদের কারো মুখেই কোনো কথা নেই। রান্নাঘর থেকে লেবু গাছটার দূরত্ব প্রায় ষোল হাত হবে। কোনো মানুষের হাত কি অতটা লম্বা হতে পারে? অথচ বিমলা সহজেই অতখানি হাত লম্বা করে গাছ থেকে লেবু তুলে আনলো।

পরাশরবাবু আর কৈলাশ দু'জনেই হতবাক। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! ওদের গলা দিয়ে আর ভাত নামছে না।

বিমলা বঁটি দয়ে লেবুটা কেটে ওদের দু'জনেরই পাতে দিল।

হঠাৎ পরাশরবাবু খাওয়া বন্ধ করলেন। কৈলাশও হাত গুটিয়ে বসে রইলো।

কী হলো?—বিমলা বললো, খাচ্ছো না যে?

পরাশরবাবু বললেন, আর খাবো না। পেট ভরে গেছে।

বিমলা একটু হাসলো। বললো, পেট ভরে গেছে? ভয় পাও নি তো?

ভয় পাবো? কাকে?

বিমলা হাসতে হাসতে বলে, কেন? আমাকে!

পরাশরবাবু কৃত্রিম হাসি হেসে বললেন, কি যে বলো! তোমাকে আবার ভয় পাবো কেন?

পরাশরবাবু এক ঢোক জল খেয়ে উঠে পড়লেন। কলতলায় আঁচাতে চলে গেলেন। কৈলাশও পিছন পিছন চললো। এইটুকুই যা অবসর। কলতলায় সুযোগ বুঝে মনিবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললো, বাবু! গিন্নিমার লেবু আনার ব্যাপারটা দেখলেন তো?

তা তো দেখলাম—পরাশরবাবুও চাপা গলায় বললেন, কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে কৈলাশ।

ভয় পাবেন না বাবু। এ সময় ভয় পাওয়া খুবই খারাপ।

পরাশরবাবু আবার বললেন, কিন্তু মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কৈলাশ।

আর বুঝবার কিছু নেই বাবু—কৈলাশ বলে, আজ রাতে এখানে থাকলে আর আপনার রক্ষে নেই। ওরা কেউ আপনার বৌ-ছেলে-মেয়ে নয় বাবু। ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে।

সে কি?

হ্যাঁ বাবু—কৈলাশ আরো বলে, আপনি হয়ত জানেন না যে, আমি ভূতের ওঝার মন্তর-টন্তর কিছু কিছু জানি। আমার জন্যে কিছু ভাবনা নেই। আপনি আর এখন ঘরে যাবেন না। এই খালি গায়েই সোজা ইস্টিশানে চলে যান বাবু। পরে আমি আপনার জামা জুতো সুটকেস নিয়ে যাচ্ছি।

পরাশরবাবু চাপা গলায় বললেন, পরে তুমিই বা যাবে কেমন করে কৈলাশ?

আমি খুব যেতে পারব বাবু—কৈলাশ ফিস্ ফিস্ করে বললো, আমি মন্তর দিয়ে উনাদের বেঁধে রেখে যাবো। আপনি আর দেরি করবেন না বাবু। এক্ষুণি চলে যান। পিছন ফিরে আর তাকাবেন না।

পরাশরবাবু অগত্যা নিজের কাপড়ের খুঁটে ভিজে হাত মুছে নিয়ে হন্তদন্ত ভাবে রেল স্টেশনের দিকে ছুটলেন।

আর কৈলাশ ঘরে ঢুকেই বিড় বিড় করে কী সব মন্ত্র আওড়াতে লাগলো। বিমলা, পিন্টু, টিঙ্কু ওরা যে যেখানে ছিল সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কৈলাশকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিমলা কেমন যেন রেগে গিয়ে বললো, তোর বাবু কোথায় রে?

বাবু চলে গেছেন।

কোথায়?

ইস্টিশানে।

বিমলা এবার এক জায়গায় দাঁড়িয়েই রাগে যেন ফুঁসতে লাগলো। ওদিকে পরাশরবাবুর গেঞ্জি, জামা কাঁধে ফেলে দু'হাতে জুতো জোড়া আর সুটকেস নিয়ে কৈলাশ ক্রুদ্ধা বিমলাকে বললো, মা ঠাকরুণ, নমস্কার। বাবু চলে গেছেন, এবার আমিও চললাম।

কথাটা বলেই কৈলাশ হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উঠোনে নামতেই তার কানে এলো যে, বিমলা বলছে, তোর বাবু আজ খুব বাঁচা বেঁচে গেল রে। ভেবেছিলাম আজ রাতেই ওর ঘাড়টা মট্‌কে..............

কথার শেষটুকু আর কৈলাশের কানে পৌঁছলো না। তখন সে অনেক দূরে চলে এসেছে।

ওদিকে হন্তদন্ত হয়ে পরাশরবাবু স্টেশনে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছেই ধপ করে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। তাঁর সারা গা কাঁপছে। কোনো কথা বলতে পারছেন না। এমনটি যে ঘটতে পারে, এ তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল।

রাত ন'টার পর এ লাইন কোনো গাড়িই নেই। তাই স্টেশন মাস্টারমশাই তখন তাঁর কোয়ার্টারে যাবার উদ্যোগ করছিলেন। তিনি পরাশরবাবুকে খুব ভালো করেই চেনেন। চেনেন তাঁর পরিবারের সবাইকে। এখানে থাকতে খুবই বন্ধুত্ব ছিল ওঁদের দু'জনের মধ্যে। মাস্টারমশাই বেড়াতে বেড়াতে কতদিন তাঁর বাড়িতেও এসেছেন।

এখন অসময়ে পরাশরবাবুকে খালি গায়ে স্টেশনে আসতে দেখে মাস্টারমশাই অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, কী হলো পরাশরবাবু? এখন কোথায় যাবেন? ট্রেন কোথায়?

পরাশরবাবু ইশারায় মাস্টারমশাইকে চুপ করতে বললেন। একটু পরে সুস্থ হয়ে তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে মাস্টারমশাই পরাশরবাবুকে বললেন, উলুখড়ে গিয়েছিলেন কার কাছে? ওখানে কেউ বেঁচে নেই। যারা ছিল তারাও পালিয়েছে। আপনার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও তো ওখানে কেউ নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

পরাশরবাবু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়? কোথায় তারা?

মাস্টারমশাই বললেন, ভাণ্ডারকোলায়।

ভাণ্ডারকোলায়?

হ্যাঁ—মাস্টারমশাই জবাব দিলেন, প্রায় দিন পনেরো আগে তারা ভাণ্ডারকোলায় চলে গেছে।

আপনি ঠিক বলছেন মাস্টারমশাই?

হ্যাঁ পরাশরবাবু, ঠিকই বলছি। যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখাও করে গেছেন।

হ্যাঁ পরাশরবাবু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ মাস্টারমশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে বললেন, অথচ একটু আগে আমার স্ত্রীই তো নিজের হাতে মাছ, মাংস রান্না করে আমাদের খাওয়ালো। সে তবে কে?

মাস্টারমশাই মৃদু হেসে বললেন, সে যেই হোক, আপনার স্ত্রী নয় পরাশরবাবু।

পরাশরবাবু আবার কিছুক্ষণ বিহ্বলের মতো চুপ করে বসে রইলেন।

মাস্টারমশাই বললেন, আর কি ভাবছেন পরাশরবাবু? এবার চলুন।

কোথায়?

মাস্টারমশাই হাসতে হাসতে বললেন, আজ আর তো কোনো ট্রেন নেই। রাতটুকু আমার কোয়ার্টারে থেকে কাল ভোরের ট্রেনে ভাণ্ডারকোলায় চলে যাবেন।

মাস্টারমশায়ের পরামর্শে পরাশরবাবু সম্মত হলেন।

একটু পরেই জামা, জুতো আর সুটকেস নিয়ে কৈলাশ এসে হাজির হলো।

অগ্রহায়ণ ১৩৯২

সদ্য ভূতের আদ্য নিশি

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

ধাক্কাটার জোর ছিল খুব। মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এক ধাক্কায় সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে একেবারে স্থির। ভেতরে ভেতরে সব ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাবার ছটফটানি। তাও একটুখানি। সেটা থামতেই বেরিয়ে পড়লাম। চমৎকার হালকা লাগছে নিজেকে। অসম্ভব চটপটে। মাথাধরা সেরে গেছে। ঘাড়ের ব্যথা নেই। কোমরে খচখচ করছে না। বুকে অম্বলের জ্বলুনি নেই। সব ব্যথা, অসুবিধে একসঙ্গে মিলিয়ে গেছে। বুঝলাম এখন আমি সত্যিকারের মুক্তিলাভ করেছি।

ট্রেনটা চলে যেতে লোকজন দৌড়ে আসছে। অমনি আমি সুড়ুত করে কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে। দু'মিনিট আগেও আমার পক্ষে এই লগবগে গাছে উঠে পড়া সম্ভব ছিল না। নিজেরই মজা লাগল। পা ঝুলিয়ে বসে দেখি একথোকা ফুলের ওপরেই বসে পড়েছি। ফুলগুলো আবার হাওয়ায় দুলছে। ব্যাপারটা ঠিক কি হল বোঝবার জন্যে আমি ওপাশ থেকে আসা আর একটা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ট্রেন চলে গেল আমার ওপর দিয়ে। আমি যেমন ছিলাম তেমনই রইলাম। অর্থাৎ আর আমার হবার কিছু নেই। স্ফূর্তিতে লাফিয়ে উঠে ওভারহেড তারে ঝুলে ঝুলে দোল খেতে লাগলাম। একটা ট্রেন আসতেই ঝাঁপ দিয়ে তার কাউ ক্যাচারের ওপর বসে পড়লাম। ট্রেন ছুটছে। আমি দিব্যি বসে রয়েছি। ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে হাওয়া হয়েই। এতো মজা আগে কখনো পাইনি। দূরে দেখি এক বুড়ি গোবর কুড়োচ্ছে লাইনের গা ঘেঁষে। গাড়ির থেকেও জোরে ধেয়ে গিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া দিয়ে বুড়িকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম। নইলে ধাক্কা খেত।

একটু একটু কষ্ট টের পাচ্ছি এবার। একেবারে অন্যরকম কষ্ট। কেউ যেন আমাকে শুষে নিচ্ছে। আমি ক্ষইতে শুরু করেছি। সর্বনাশ! এই খেলা আর নয়! আবার উড়ে এসে কৃষ্ণচূড়ার ডালে। এখান থেকে বেশ ভাল দেখা যায়। গুছিয়ে বসতে না বসতেই একটা কুচকুচে কালো কাক পাশে এসে কা কা করে চ্যাঁচাতে লাগল। ভারি বিদঘুটে ব্যবহার তো! আমি জায়গা বদল করে ঝাঁকড়া একটা পাকুড় গাছে চলে এলাম। ঘন ছায়ার মধ্যে বসে বেশ আরাম লাগল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর বুঝলাম দিনের আলো আর তাপ আমার সহ্য হবে না। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে হবে। আমি কি নিশাচর হয়ে গেলাম? তা কেন? আমি এখন ভূত। ভূত হওয়ার সুবিধেগুলো কিংবা মজাগুলো আমাকে শিখে নিতে হবে। কিন্তু কে শেখাবে? নিজে নিজে শিখতে গিয়ে কোথায় কী বিপদে পড়ি তার ঠিক আছে।

বিশাল গাছটার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে দেখে নিচ্ছি। কতরকম জীবজন্তু থাকতে পারে। কীটপতঙ্গ! একবার আম পাড়তে উঠে ডালে জড়ানো সাপ দেখেছিলাম। নারকেল গাছে কাঁদির খোলের মধ্যে তেঁতুলে বিছের সংসার। কী সাংঘাতিক! ভাবতে ভাবতে নিজেরই মনে হেসে ফেললাম। ভূতের আবার কাকে ভয়? তাকে কামড় দেবে কোথায়?

ঠাণ্ডায় আরামে ঘুম এসে যাচ্ছিল। এসব বকেয়া ঘুম মনে হয়। নইলে ভূতেরা ঘুমোয় বলে কখনো শুনিনি। তাদের কাজ করতে হয় না। দৌড়ঝাঁপের বালাই নেই। আর বোধহয় খাবারও

দরকার নেই। সেই কখন দুপুরে টিফিন খেয়েছি, সন্ধে পেরিয়ে রাত হয়ে গেল এখনও ক্ষিদে পেল না। তাহলে ভালোই হল। চারবেলা খাওয়ার পাট চুকে গেল।

হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ নিজের খেয়ালেই ছিলাম। ছি ছি! বাবা-মা-বোন সবাই ভাবছে নিশ্চয়ই। বাড়ি ফেরার সময় অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আগামী রবিবার বোনকে দেখতে আসবে। শ'পাঁচেক টাকা নিয়ে ফিরছিলাম সেই জন্যে। সেটা তো মাকে দেওয়া হল না!

তড়িঘড়ি করে নেমে এলাম। লাইন থেকে বডি সরিয়ে ফেলেছে। আশেপাশে কোথাও কিচ্ছু নেই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে খুচরো চোখে পড়ল। টাকা, মান্থলি টিকিট, আই কার্ড সমেত আমার দেহটা চালান হয়ে গেছে। অসহায় হয়ে ভাবছিলাম কী করি। পাশেই যেন কেউ ফিসফিস করে কিছু বলল। প্রথমে খেয়াল করিনি। খুবই দুর্ভাবনায় রয়েছি। আরেকবার ফিসফিসানি শুনে পাশে তাকালাম। কেউ নেই! অন্ধকার রেললাইনের ধারে আমি একলা। একটু দূরে প্লাটফর্মের আলো দেখা যাচ্ছে। পুরনো অভ্যাস মতো আমার ভয় ভয় করতে লাগল। গেঞ্জির তলায় পৈতে ছুঁতে গিয়ে হাতে কিছুই ঠেকল না। এমন কি নিজের হাত-পা-শরীর কিছুই দেখতে পেলাম না। আর তখনই শুনতে পেলাম—

তুমি এখন অশরীরী। আমিও। তুমি আমাকে এখন দেখতে পাবে না। এই অবস্থায় ছ'মাস কাটালে তবেই পারবে। তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তো?

বললম, পাচ্ছি। তুমি আমায় দেখছ কী করে, আমার তো দেহ-ই নেই।

অশরীরী বলল, তুমি এখনও তোমার নিজের রূপেই আছ। আমি সেটাই দেখছি। আর শোনো, তোমায় কিচ্ছু বলতে হবে না। আমি তোমার ভাবনাও শুনতে পাচ্ছি।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, তাহলে তো তুমি সবই জান। আমি কী করব বুঝতে পারছি না।

তোমার দেহ এখন স্টেশনের শেষে জি আর পি থানায় নিয়ে রেখেছে। ওখান থেকে মর্গে নিয়ে যাবে কাটাছেঁড়া করতে। যাকে বলে পোস্ট মর্টেম। ইতিমধ্যে তোমার ঠিকানায় খবর চলে গেছে। মুদ্দাফরাস্‌গুলো ভালো হলে বডি ফেরত দেবার সময় তোমার জিনিসপত্র, টাকাপয়সা বাড়ির লোক পেয়ে যাবে। নইলে শুধুই উদোম দেহ।

একটু চমকে উঠলাম। পুরনো সংস্কার। বাড়ির জন্যে আবার ভাবনা হচ্ছে। বললাম, তোমাকে ভলো বলে মনে হচ্ছে। বল তো আমি এখন কী করি, কোথায় যাই!

অশরীরী বলল, যদি খুব ইচ্ছে করে একবার বাড়ি যেতে পার। যাবার পথে থানা ঘুরে যেও। বাড়িতে খবরটা পৌঁছেছে কিনা জানবার চেষ্টা করো।

তুমি আমার সঙ্গে চল না।

তার উপায় নেই। তুমি নিজেই সে কথা বুঝতে পারবে। রাত থাকতে থাকতে ফিরে এসো।

কেন? ফিরে আসব কেন?

সহ্য করতে পারবে না। তাছাড়া রাতই হল আমাদের ঘোরাফেরার সময়।

আমাদের সময়! আমরা কারা? কায়াহীন ভূতেরা? তাহলে আমার বাবা-মা-বোন? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে।

অশরীরী বলল, তোমার অত ভাবার দরকার নেই। থানা হয়ে চট করে বাড়িটা ঘুরে এসো। ফিরে এলে আবার কথা হবে।

তোমাকে কোথায় পাব?

আমি তোমায় ঠিক খুঁজে নেবো। তুমি কিন্তু বাড়িতে আটকে থেকো না।

কথাটা মাথায় ঢোকার আগেই আমি সাঁত করে স্টেশনের শেষে। ছেঁড়া চট জড়ানো বাঁশে

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটা শরীর খোলা প্লাটফর্মে পড়ে আছে। ভেতরে একজন ফোন করে আমাদের পুলিশ থানায় কথা বলছে। তার সামনে টেবিলে আমার হাতঘড়ি, টিকিট, আই কার্ড, কিছু খুচরো, টুকরো কাগজ এই সব। টাকাগুলো চোখে পড়ল না। নির্ঘাৎ হাপিস করে দিয়েছে। কাগজ-কার্ড উল্টেপাল্টে দেখে সে আমার নাম-ঠিকানা বলছে। ওপারে বোধহয় ফোন নম্বর জিগ্যেস করল। উত্তর গেল, না ফোন নেই মনে হচ্ছে। আপনারা মেসেঞ্জার পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি খবরটা দিয়ে দিন।

থানা থেকে আমাদের বাড়ি কাছেই। পুলিশ যাবার আগেই আমি যেতে চাই। কী আশ্চর্য! পরের মুহূর্তেই আমার বাড়ি। যেন ভূতের রাজা দিল বর। তাহলে আমিও তার বর পেয়ে গেলাম! ওসব এখন ভাবার সময় নেই।

যেমন রোজ ফিরি সেই ভাবেই সদর দরজা ঠেলে ঢুকতে গেলাম। ভেজানো দরজা ঠেলে খুলতে পারলাম না। বিশাল ভারী। অগত্যা খোলা জানলা দিয়ে চলে এলাম সোজা ঘরের ভেতর। বাবা বিছানায় বসে টিউব লাইটের আলোয় কাগজ পড়ছে। আলোটা আজ খুব জোরালো মনে হলো। লো ভোল্টেজের জন্যে অন্যদিন এইসময় মিনমিন করে।

কাছে এগিয়ে গেলাম। হাওয়া লেগে কাগজটা নড়ে গেল। সেটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বাবা একবার আমার দিকে তাকাল। চশমাটা ঠেলে তুলে নিয়ে আবার কাগজ পড়তে লাগল। আমাকে দেখতেই পেল না।

আমি বললাম, বাবা শুনছো? আমি ট্রেনে ধাক্কা খেয়েছি।

বাবা শুনতেও পেল না। কিন্তু কেমন অবাক হয়ে ঘরের চারপাশটা দেখতে লাগল।

পাশের ঘরে গেলাম। এখানে মা আর বোন থাকে। মা নেই। মনে হয় রান্নাঘরে। বোন একা একা বসে টিভি দেখছে। পোর্টেবল সাদা-কালো টিভি। বাংলা সিরিয়াল চলছে 'এক আকাশের নীচে'। আমিও কাজ থেকে ফিরে এটা রোজ দেখি বোনের সঙ্গে। ছবিতে এখন তার গভীর মনোযোগ। আমি পাশে বসে ওর চুল টেনে দিলাম। ঘুরে তাকালও না। রোজ যেমন বাড়ি ফিরে গল্প করি তেমন বলতে চাইলাম। মনে পড়ল আমি এখন বিদেহী। আমার গলাতেও কোনো আওয়াজ নেই।

খুব চিন্তিত মনে রান্নাঘরে গেলাম। মা রুটি সেঁকছিল। আমি ভেতরে ঢুকতে স্টোভের নীলচে আলো দুলে গিয়ে লাল হয়ে গেল। মা জাল নামিয়ে নিয়ে দরজার দিকে তাকাল। আমি মায়ের গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। আলোর শিখা আবার একবার নেচে উঠে স্থির হয়ে গেল। মা রুটিটা উল্টে নিয়ে ফোলাতে লাগল। মা নিশ্চয়ই আমার জন্যে-ও রুটি বানাচ্ছে। মা তো আর জানে না। খুব ইচ্ছে হল মাকে জড়িয়ে ধরি। এক ঝলক বাতাসের মতো মাকে ঘিরে বসে রইলাম। আমার অস্তিত্ব মা টের পাচ্ছে না। একবার শিউরে উঠল যেন। আমার স্পর্শের বাতাস কি মা বোঝেনি? কেবল উদ্বিগ্ন চোখে থেকে থেকে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি মা আমার বাড়ি ফেরার শব্দ শোনবার জন্যে উৎকর্ণ। সেই আমি এই আমি নই। মায়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, মা, আমি তোমার পাশে গায়ে গা দিয়ে বসে আছি। তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ না। আর কোনোদিন দেখতেও পাবে না। রবিবার বোনকে দেখতে আসছে, ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। লাইন পেরোতে গিয়ে থ্রু ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। বোনের বিয়ের জন্যে আমি আর কিছু করে দিতে পারব না। এই অপদার্থ ছেলেকে তুমি ক্ষমা করে দিও, মা।

মায়ের দু'পায়ে প্রণামের পরশ বুলিয়ে খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে বাবার কাছে এলাম। অশক্ত রোগজীর্ণ বাবাকেও প্রণাম করলাম। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। নিজের ঘরে বসে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। আমার এখনকার কান্নায় চোখের জল বেরোয় না। নিজের প্রিয় জিনিসপত্র, বইখাতার ওপর কায়াহীনের অস্থির হাওয়া বুলিয়ে বুলিয়ে টেপ রেকর্ডারের কাছে এসে থমকে গেলাম। এতে

বোনের গাওয়া গান আছে। বাবার গলা আছে। মায়ের পাঁচালি পড়া আছে। আমার আবৃত্তি আছে। নজরুল, রবীন্দ্র, জীবনানন্দ, শক্তি, জয় গোস্বামী আর আমার নিজের।

এক্ষুনি খবরটা চলে আসবে। তারপর যে কী শুরু হবে!

আর সইতে পারা যাচ্ছে না। হাওয়ার দোলাতে এত কষ্টের বোঝা আঁটাতে পারছি না। উষ্ণতা উবে যাচ্ছে ভেতর থেকে। হিমশীতল কুয়াশার মতো ঘন হয়ে পড়ছি একটু একটু করে। বোনের মাথায় আশীর্বাদের ছোঁয়া বুলিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। বোন জানলাটা বন্ধ করে দিল। আমার ছোঁয়াতে তার শীত ধরে গেছে হয়তো।

ঠিক তখনই দরজায় পুলিশ। আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পথের দূরত্ব বলে এখন কিছু নেই আমার । এই এখানে, ওই ওখানে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সেখানে। অকুস্থলে পৌঁছতেই পণ্ডিতের গলা—

কী, পারলে না তো! এখন আমাদের সব কিছু সহ্য করার শক্তি আর নেই। বুঝেছ!

আমি কথা বলতে পারছি না। আগের আমি আর এই আমির কত তফাৎ! আগের প্রতিটি সেকেণ্ডের ঘটনা এখনও এই আমির মধ্যে ভরপুর। অথচ এই আমি এখন কাদের? আমার কাজ কী? এই আমার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে?

প্রথম প্রথম এমন হবে। শুনতে পাচ্ছ তো? চল ওই গাছটায় গিয়ে বসি।

আমার মন খারাপ, না শরীর খারাপ? কোনটা?

হাওয়া কাটা হা হা হাসিতে গাছটা দুলতে লাগল কিছুক্ষণ। পাখ-পাখালিরা ডানা ঝাপটাতে লাগল। তার সঙ্গে বিকট ডাকাডাকি। আমি আস্তে আস্তে নিজের ভূতাবস্থায় ফিরে এলাম। হাসি থামতে আবার সব চুপচাপ।

বললাম, ও কেমন হাসি? আওয়াজ নেই। দমকা ঝড়ের মতন।

এবার হালকা হাসি। তাতেও একবার আমার দোলা লাগল।

সে বলল, ওসব ছাড়। তুমি এখন ওদিককার নও। ওদের সঙ্গে তোমার কোনোভাবেই আর মিল হবে না। তুমি আলাদা। তারা আলাদা। এখন বিশ্রাম নাও। আমি যাই একটু চক্কর দিয়ে আসি।

হুস্ করে একটা বাতাস বয়ে গেল। আমি গাছের পাতায় এলিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকারে অবিরাম ঝিঁঝিঁর ডাক। পাখিদের নড়েচড়ে বসার শব্দ। কিছুক্ষণ পরে পাশে অন্য একটা গলা পেলাম, তুমি আজ নতুন এয়েছ না?

তড়বড় করে উঠে বসে কাউকে চোখে পড়ল না। ছ'মাস না গেলে দেখতে পাব না। আন্দাজেই বললাম, হ্যাঁ, এই আজ বিকেলেই।

জানি। দেখেছি।

দেখেছ? সত্যি বলছ দেখেছ? কী দেখেছ?

সব। তুমি লাইন ডিঙোচ্ছিলে। ছিটকে পড়ে গেলে!

দেখলে অথচ বাঁচালে না কেন?—রাগে আমার গা গরম হয়ে গেল।

বাঁচাব কী করে? বাঁচানো যায় নাকি? তুমি কিছু জান না।

জানি না, জানতে চাই-ও না। যাও যত সব ভূতুড়ে কাণ্ড!

আহা রাগ করছ কেন? তুমি আজ আসবে সেও তো আমরা জানতাম। নাহলে দেখ পণ্ডিত ওখানে ছিল কেন।

পণ্ডিত! সে আবার কে?

সে কি গো! এই তো এতক্ষণ যার সঙ্গে ছিলে।

তাই বলো। ওর নাম তাহলে পণ্ডিত?

তা জানি না। সবাই ওঁকে পণ্ডিত বলে। আমাদের এই এলাকার সবাই ওনাকে মেনে চলি। নতুন কেউ এলে উনিই দেখভাল করেন।

পণ্ডিত আর কী করেন?

ওনার কাজের শেষ আছে নাকি! কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখগে এখন। যেখানে যত অপঘাত, পণ্ডিত সবখানে। বলতে পার আমরা সবাই ওঁর হাত ধরে এখানে আসি।

বুঝেছি, পণ্ডিত হল তোমাদের মোড়ল।

ধ্যেৎ! কোথায় মোড়ল আর কোথায় পণ্ডিত! তুমি সেই নেতাজী আর পেঁয়াজির মতো বলছ দেখছি।

ভূত হলে কী হয় জিনিসটি বেশ রসিক। ঘুম তো আর এখন জরুরি নয়। এর সঙ্গে গল্প করেই কিছু জেনে নেওয়া যেতে পারে।

বললাম, আচ্ছা এই ভূত হয়ে তুমি কেমন আছ? মানে, তোমাকে কী করতে-টরতে হয় এই আর কি?

করব আবার কী! যা মনে হয় তাই করি। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াই। বেঁচে থাকতে বেশি কোথাও যেতে পারিনি। এখন আশ মিটিয়ে ঘুরি। কিন্তু মুশকিল কী জানো, কিচ্ছু মনে থাকে না। হয়তো একই জায়গায় বারবার চলে গেলাম।

তাতে অসুবিধে কী? তোমার তো খরচা বলে কিচ্ছু নেই। হুসহাস করে চলে যেতে পার। থাকা-খাওয়ারও কোনো ঝামেলা নেই। নির্ঝঞ্ঝাট উড়ে বেড়াও।

তুমিও পারবে। আর চার-ছ'মাস যাক। তখন সবকিছু সড়গড় হয়ে যাবে। এক্কেবারে যথা ইচ্ছা তথা যাও।

এখন পারব না?

এই রে! পণ্ডিতকে জিগ্যেস করে নিও। আমি যতদূর জানি ছ'মাস পর্যন্ত তোমার আগের কথা সব মনে থাকবে। ততদিন তুমি বেশিদূরে যেতেই পারবে না।

আর ছ'মাস হয়ে গেলে?

তখন আস্তে আস্তে ভুলতে শুরু করবে। তখনই তুমি সত্যিকারের এই দলে মিশতে পারবে।

আমার কোনো অসুবিধে নেই। আমি এখনই সবাইকার সঙ্গে মিশতে পারি।

অসুবিধে আছে। তুমি আমাদের কাউকে দেখতে পাবে না এখন। তার মানে কাউকে চিনবেও না। না চিনলে মিশবে কী করে?

ঠিক বলেছ। এখানে তোমার মতো আরো কেউ আছে?

অনেক আছে। ডাকব নাকি?

ডাকতে পার। আচ্ছা থাক, পরে হবে। আমার এখন মন ভালো নেই।

থাক তবে। আর ক'দিন যাক। তোমার এখন ওপারের সঙ্গে টানাহ্যাঁচড়া চলছে।

ঠিকই ধরেছ। আচ্ছা বলো তো আমার পকেটের টাকাগুলো কোথায় গেল!

নিয্যস ওদের ভোগে।

ইয়ারকি? কত খাটুনির রোজগার। নিয়ে নিলেই হল!

প্রমাণ তো কিছু নেই। ফাঁকা পেলে সবাই নিজের করে নেয়। আমারও যেত। নেহাৎ খানিক জ্ঞান ছিল তাতেই চেনা একজনকে বলতে পেরেছিলুম। সে বের করে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

এই যে বললে কিছু মনে থাকে না! এটা কী করে বলতে পারলে?

মাঝে মাঝে দু-একটা মনে পড়ে যায়। তা তুমি এক কাজ কর। রাতটা থানার কাছাকাছি থাক। যদি উদ্ধার করতে পার।

কী করে উদ্ধার করবো? আমার তো হাত-ই নেই। কোনো জিনিসটাই ধরতে পারব না।

আহা, তার জন্যে আর ভাবনা কী? বরঞ্চ সুবিধে। ভাগ-বাঁটোয়ারা তো এইবার হবে। সারাদিনের জমা। সে সময় ঝড় তুলে উড়িয়ে নিয়ে এসো। এনে কোনো গাঙায় ফেলো। তারপর একটা উপায় করা যাবে।

ঝামেলা তো সেই রয়েই গেল! গাঙাতেই পড়ে পড়ে পচবে নোটগুলো।

তা কেন? পণ্ডিত পারে। সে মাঝে-মধ্যে মানুষের বেশ নিয়ে লোকসমাজে ঘোরাঘুরি করে। তুমি বললে ও তোমার বাড়িতে দিয়ে আসতে পারে। অবিশ্যি পণ্ডিত কী করবে পণ্ডিতই জানে।

মতলবটা পছন্দ হল। এই ভূতটা বেশ চালাক আছে। পরে কী হবে কে জানে! উপস্থিত একটা চেষ্টা করা যাক। বললাম, চল দুজনেই যাই।

চালাক ভূত বলল, তাহলে একটু দাঁড়াও। বৌকে বলে আসি।

অবাক চোখে ওকে দেখতে চাইলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। সবই অদৃশ্য। সে নিজে থেকেই বলল, আমার বৌ। আমি চলে আসার মাস তিনেকের মধ্যে সেও এখানে। এখন দুজনে আবার একসঙ্গে রয়েছি।

ব্যাপারটা জমলো ভালোই। এত ভয় লোকগুলো জীবনে পায়নি।

দরজা ভেজিয়ে ভাগাভাগি হচ্ছিল। চারটে ভাগ হয়ে যেতে গার্ডার দিয়ে বাণ্ডিল বানাল। টেবিলের ওপর চারটে নোটের বাণ্ডিল । এবার যার যার পকেটে ঢুকে যাবে। আর দেরি নয়। আমাদের দুজনের জোর মিলিয়ে ঘরে হঠাৎ ঘূর্ণি তৈরি হল। দরজা-জানলা ফটাফট খুলে হাট। টাকার বাণ্ডিলগুলো হাওয়ায় উড়তে উড়তে টেবিল থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। লোক চারটে পড়িমরি করে ছুটে আসছিল। চালাক বলল, তুমি টাকা সামলাও, আমি ওগুলোকে দেখছি।

ঘূর্ণিটা দু'ভাগ হয়ে গেল। একভাগ সামনে, অন্যভাগ ঘুরে গিয়ে ঘরের দিকে। লোকগুলো ওলটপালট খেতে খেতে ঘরের মধ্যে জড়াজড়ি হয়ে পড়ে রইল। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ হয়ে গেল ঝপাঝপ। ভেতরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় তারা ঠকঠক করে কাঁপছে। ওরই মধ্যে একজন লাফিয়ে উঠে পিস্তল বার করতে যাচ্ছিল। উঠে বসতে না বসতেই টেবিলটা সাঁ করে ঠিকরে এসে তার কপালে। তক্ষুনি অজ্ঞান।

এই সবের পর আমি টাকার বাণ্ডিলগুলো উড়িয়ে উড়িয়ে পুরনো একটা তারের জয়েন্ট বাক্সের ভেতর একে একে এনে ফেললাম। ভেতরে একটা সাপ শুয়েছিল কুণ্ডলি পাকিয়ে। সেটা হকচকিয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়তেই বাণ্ডিল কটা বেশ গভীরে ঢুকে গেল। চট করে কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। এর ওপর সাপটা আবার নিশ্চয়ই ফিরে এসে শোবে! নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। জায়গাটা ভাল করে চিনে রেখে চালাককে ফিরিয়ে আনতে গেলাম। দুজনে মিলে আবার কিছুক্ষণ মজা করে হুটোপাটি সেরে ফের গাছের অন্ধকারে।

একটা মেয়েলি স্বর শুনলাম, এখনও দেখছি তোমার হুজ্জোতি করার শখ মেটেনি।

চালাক বলল, বউ, আমাকে বলছে।

আমি চুপ করে জিরোচ্ছিলাম। বললাম, বুঝেছি।

আবার মেয়েলি গলা, আপনি কিছু মনে নেবেননি। এই লোকটার খুব মাথা গরমের ধাত ছিল। যখন-তখন চেল্লাত আর হৈহুজ্জোতি জুড়ে দিত। বেকার! এপারে এসেও দেখছি বদলায়নি।

চালাক ভূতের বউ কথা বলে বেশ মজার। ভূতের বউ মানে তো পেত্নী। এদের দেখতে কেমন কে জানে! পেত্নী বলল, এই ক'দিন আগে ভাসুরকে কড়কে দিয়ে এসেছে। তার আগে ঠাকুরপোকে

পচা ডোবায় নাকানি-চোবানি খাইয়ে দিয়ে এলো। আমাকে জ্বালাচ্ছিল বলে। আখেরে লাভ কিছুই হল না।

চালাক বলল, ক্ষতি-ও কিছু হয়নি। একলা বিধবা পেয়ে তোমার ওপর জুলুম চালাচ্ছে দেখলে কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়! নেহাৎ তুমি নিজেই চলে এলে! নইলে—

নইলে কী? ওদের তুমি চেন না? জীবন থাকতেই পারলে না!

ভূত-পেত্নীর ঝগড়া লেগে যাবে নাকি? আমি রসিকতা করলাম, স্বভাব যায় না মলে।

ওদের কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবু কথাবার্তায় দিব্যি অংশ নিচ্ছি। সমবেত হাসি গাছটাকে আবার দুলিয়ে দিল।

বৌটি বলল, ইনি ভালো।

চালাক বলল, সেই জন্যেই তো নতুন বন্ধুর জন্যে একটু লড়ে দিয়ে এলাম।

সে আর বলতে! আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসেছি। ভারি হুলুস্থূলু বাধিয়ে দিয়েছিলে কিন্তু!

তুমি আবার থানায় যেতে গেলে কেন? কত আজেবাজে ব্যাপার ঘটে ওখানে।

এখন আমারও ভয় কেটে গেছে। কোনোদিন আমিও ভিরমি খাইয়ে দিয়ে আসবো হতচ্ছাড়াদের!

গল্প বেশ জমেছে। এদিকে রাত শেষ হয়ে এলো কিনা বুঝতে পারছি না। ঘড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে বহুক্ষণ। হাত-ই নেই তো হাতঘড়ি। এই অন্ধকারের রাজত্বে সময়ের কি কোনো দরকার আছে? এপারের সময়সীমা আলো ফোটা পর্যন্ত।

স্টেশন চত্বর শুনশান। প্রথম ট্রেন ঢুকবে ভোর চারটেয়। পণ্ডিত এখনো এলো না। তাকে সব বলে রাজি করাতে হবে। ভেতরে ভেতরে আবার একটা ছটফটানি। বাড়ির লোকেরা এখন কী করছে? একবার গিয়ে দেখে আসব নাকি!

বৌটি বলল, হ্যাঁগা শোন না। ওনাকে একটু কোথাও ভালো জায়গায় বেড়িয়ে নিয়ে এসো না। মনটা ঠিক হত! কেমন নেতিয়ে আছেন দেখছ না?

চালাক বলল, মন্দ বলনি। চল শহরের ভেতরটা দেখে আসি।

দুজনে হুস্ করে ভেসে পড়লাম। জামা-জুতো পরা নেই। মাথা আঁচড়ানো নেই। পকেটে টাকাপয়সা নেবার দরকার নেই। কোনো কিছুরই বালাই নেই। ইচ্ছে মতো নিজেকে হাওয়ায় ছেড়ে দিলেই হয়।

এতো রাতেও কিছু কিছু বাড়িতে আলো ঝলমল করছে। উৎসব বাড়ি। হোটেল। হাসপাতাল। নদীর ওপর দীর্ঘ সেতুতে আলোর মালা। কোথাও কোনো ঘরে এক ছাত্র রাত জেগে পড়াশোনা করছে। কোনো মুমূর্ষু রোগীর পাশে তার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে অতন্দ্র। শহরের প্রান্তে একটি বড় গেটওয়ালা বাড়িতে অনেক মানুষের সমাগম। গেটে দুজন সশস্ত্র প্রহরী। সাধারণ কটা মাত্র আলো। লোকজন নিঃশব্দে চলাফেরা করছে। নামী কোনো ব্যক্তি মারা গেলেন নাকি!

চালাক বলল, চল দেখে আসি।

ভেতরে ঢুঁ মারতেই বুঝলাম গতিক সুবিধের নয়। বাড়ির মাঝখানে বিশাল এক হলঘরে আরো অনেক লোক। তাদের সাজ-পোশাক ধরন-ধারণ খুবই সন্দেহজনক। হলের চারকোণে চারজন কড়া চেহারার জোয়ান লোক আধুনিক বন্দুক তাক করে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। মনে হয় খুব জরুরি কোনো মিটিং চলছে। অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করেও কিছু আঁচ করতে পারলাম না। এতো গোপনীয়তা দেখে সন্দেহ হল। এরা সন্ত্রাসবাদী নয়তো? সাংঘাতিক কোনো মতলব ভাঁজতে এখানে এসে জড় হয়েছে? মনে হতেই রাগে আমার গা গমগম করে উঠল। এদের ঠেকাতেই হবে। চালাককে নিয়ে বাইরে এসে ল্যাম্পপোস্টের মাথায় ইলেট্রিকের তার দোলাতে লাগলাম জোর

হাওয়ার দাপটে। দুটো তার ঠেকাঠেকি হতেই সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভেতরে চাপা হল্লা আর দুদ্দাড় শব্দ। মোটামুটি ভেস্তে দেওয়া গেছে। আজ আর কিছু হবে না এদের!

বাড়িটা চিনে রেখে দুজনে আবার ভাসতে লাগলাম। শহরের শেষ সীমানায় নদী। তার তীর ঘেঁষে বিশাল এক মন্দির। গায়ে লাগানো চমৎকার এক ঘাট। সবই জনহীন। নদীর ঘাটে নেমে বসলাম। এই নদী-ই আমার মফস্বল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। কত সাঁতার কেটেছি এর বুকে। নৌকা বেয়েছি। বেশ শান্ত হয়ে আসছিল মনটা।

চালাক পাশ থেকে বলল, শুনতে পাচ্ছ?

চালাকের কথা ভুলেই গেছিলাম। নিজের কথা-ও। এমনকি আমি যে এখন ভূত সে কথাটা-ও। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম, কী?

শোন, মন্দিরের ভেতরে কেউ ঢুকেছে। ভালো করে শোন।

ভূত হওয়ার পর শোনা আর দেখার ক্ষমতা বেশ বেড়েছে। কান পাততেই মৃদু ঠুকঠাক খসখস শব্দ।

চালাক উত্তেজিত স্বরে বলল, খুব ছোট ছোট দুটো আলো দেখতে পাচ্ছ? লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে! তার মানে দরজা খোলা! চল তো দেখি।

অবাক কাণ্ড! মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে তালা ভেঙে। লোহার গেটের শেকলটাও কাটা। ভেতরে দুজন লোক ছোট ছোট টর্চ জ্বালিয়ে দেবীর গা থেকে সোনার গয়না সব খুলে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরছে। আর একজন গেটের বাইরে পিস্তল হাতে পাহারা দিচ্ছে। তার মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমি হতভম্ব হয়ে দেখছিলাম। জাগ্রতা মায়ের গায়ে হাত! চোরগুলোর সাহসকে বলিহারি!

চালাক আবার চমকে দিল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? এগুলোকে ভাগাতে হবে না?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু মা সহ্য করছেন কী করে?

আরে! মা নিজেই তো আমাদের এখানে আনল। চটপট খেল্ শুরু কর।

মায়ের মন্দিরে ঘূর্ণি তোলা কি ঠিক হবে?

খুব ঠিক হবে। মা তাই চাইছে। তবে শুধু ঝড়ে এখানে পারবে না। আগুন চাই। তুমি সেটা দেখ। ততক্ষণে আমি এদের হাত চারটে অসাড় করে দিই। বেশিক্ষণ কিন্তু পারব না। আমার শক্তি শেষ হয়ে যাবে। তুমি শিগগির আগুনের বন্দোবস্ত কর।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মন্দিরের ভেতরটা কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। লোক দুটো বরফের চাঁই-এর মতো ধুপধুপ করে পড়ে গেল বেদী থেকে। আমি বেদীর নীচের জ্বলন্ত প্রদীপটা হাওয়ায় ভাসিয়ে এনে ফেললাম এককোণে জমা করে রাখা শুকনো শালপাতার ঝুড়িতে। কিছু পাটকাঠি ছিল তাতেও আগুন ধরে গেল। জ্বলন্ত ঝুড়িটা এবার উড়িয়ে নিয়ে বাইরের লোকটার গায়ে। সে পড়িমরি করে দৌড় লাগাল। তার পোশাকে আগুন লেগে গেছল। সে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে।

মন্দিরে ফিরে দেখি পাটকাঠির আগুনে ঘর গরম হয়ে উঠতেই লোক দুটো উঠে বসে ব্যাগটার দিকে হাত বাড়াচ্ছে।

চালাক বলল, ব্যাগটা ওড়াতে পারবে?

বললাম, দরকার নেই। ওদের পোড়াও।

আগুন লাফাতে লাফাতে এসে পড়ল দুজনের গায়ে। শার্ট-প্যান্ট দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। লোক দুটো 'রক্ষা কর মা, রক্ষা কর মা' বলতে বলতে একদৌড়ে নদীতে। ঝপাং ঝপাং করে দুটো শব্দ হল। আমরা দুজনে দেবীর বেদীর নীচে বসে বসে জিরোতে লাগলাম। ক্ষয়ে যাওয়া শক্তি ধীরে ধীরে পূরণ হচ্ছে। মাকে গয়না পরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। ওগুলো সেরকমই

পড়ে থাকল। দুজনে মিলে প্রদীপ যথাস্থানে রেখে ছড়ানো আগুন সব নিভিয়ে ফেললাম। আরো কিছুক্ষণ দেখে হাওয়া তুলে দরজা ভেতর থেকে চেপে বন্ধ করে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। নদীর পুব পাড়ে তখন আলোর আভাস।

তড়িঘড়ি গাছে ফিরতেই পণ্ডিতের গলা, তুমি তো দেখছি মহা করিতকর্মা হে! এক রাতেই যা কাণ্ড করে বেড়ালে!

অবাক হতে গিয়েও হলাম না। পণ্ডিত অনেক উঁচুতলার ভূত। সে সব জানতে পেরে যায়। আমি চুপ করে থাকলাম। চালাক-ও দেখি কিছু বলছে না। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নাকি! পণ্ডিত বললেন, এমনই তো চাই! এতোদিনে একটা ভালো জুটি পাওয়া গেল। কাল থেকে তোমরা দুজনে আমার সঙ্গে বেরোবে।

একটু থেমে আরও গলা চড়িয়ে বললেন, কী গো মেয়ে! তোমার আবার একলা একলা ভয় করবে না তো?

ভেতর থেকে মেয়েলি স্বর, না বাবা, আমার ভয় কেটে গেছে। বলেন যদি আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

এক্ষুনি দরকার নেই। সময়মতো ঠিক কাজে লাগিয়ে নেবো।

হাওয়ার ছোট্ট এক ঝাঁকুনিতে বুঝলাম এবার আমাকে বলছেন, তোমার জন্যে একটা ভালো নাম ঠিক করে রেখেছি। দাহ হয়ে গেলেই জানিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, শোন, তোমার কাজ হয়ে যাবে। মন খারাপ করে থেকো না।

ভূত হয়ে পড়ার জন্যে বিকেল থেকে যে মন খারাপ ছিল, ভূত হওয়ার মজা বুঝতে পেরে এখন সেটা বেমালুম উবে গেল।

শ্রাবণ ১৪১২

নিশিরাতের আগন্তুক

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

শেয়ালদার অফিস টাইম। হাজারো ডেলি প্যাসেঞ্জার আর দু'এক মিনিট পর পরই ট্রেন। ভিড় আর হৈচৈ। নামার জন্য ধাক্কাধাক্কি।

সকাল নটায় ট্রেন থেকে নেমে ব্যাগে হাত দিয়ে হায় হায় করে উঠল রজত। ডাঃ রজত সেন। মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জেন। হাতের ব্যাগ ফাঁকা, হাজার তিনেক টাকা ছিল, কারো হাতসাফাইতে হাওয়া। সামনেই বড় বড় হরফে রেলের সতর্কবাণী—চোর জুয়াচোর পকেটমার সব কাছেই আছে, সাবধান।

সাবধানেই ছিল রজত। কাঁচড়াপাড়ার দিদির বাড়ি থেকে আসার পথেই অঘটন। জামাইবাবু হাসপাতালে ভর্তি, ওষুধপত্তরের খরচ, বেড ভাড়া, মেডিসিন—কখন কী লাগে কে জানে? লাফিয়ে লাফিয়ে রোজই খরচ বাড়ছে। এখন কোথা থেকে জোগাড় করবে টাকা? ভাবতে ভাবতে মুখ শুকিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। দারুণ হাতসাফাই, ব্যাগের চামড়া কেটে দু'ভাগ।

দাঁড়িয়ে পড়াটা যেন আরো অপরাধ। কপালে দুশ্চিন্তার ঘাম। ভিড়ের ধাক্কায় টাল সামলানো দায়। কেউ কেউ বলল, কী হল মশাই, টাকা গেছে? পুলিশকে জানিয়ে রাখুন।

পুলিশকে জানিয়ে কী হবে? ঘণ্টা খানেকের ঝামেলা। এফ. আই. আর করো, লেখো তারপর সইসাবুদ। থানার ব্যাপার—ভাবতে ভাবতে বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

এমন সময় হঠাৎ দেখে খেরো। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। নাম শশধর দাস। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা—ঐ নামে কেউ চেনে না এখন। খরগোশ-ঠোঁট ছিল, জন্ম থেকেই কাটা। রজত তখন কলেজের ছাত্র, সেই থেকে আলাপ। সবাই বলত ঠোঁট-কাটা শশা, কেউ বলত খেরো, শালা ছিঁচকে চোর, প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে ঠিক করার জন্যে ডাঃ রজতের পায়ে এসে পড়েছিল। আর. এস. দাদা বলত, একটু খাতির করিস কিন্তু। শশক-ঠোঁট, আই মিন হেয়ার লিপ, তারা খুব বুদ্ধি ধরে। ওর আঙুলগুলো দেখছিস তো? কত লম্বা লম্বা। আঙুলের মাঝে ব্লেড ধরে অপারেশনে ওস্তাদ। পেটমোটা ব্যাগ চিরে জিনিসপত্তর উধাও করে ম্যাজিক দেখায়। চুরি, ছিনতাই, ছিঁচকেমি, হাতসাফাই সবেতে নাম্বার ওয়ান। তবে, হাঁ, ডাক্তারদের খাতির করে। ওকে সার্জারি করে ঠিক করে দিয়েছ যে। বৌবাজারের পানের দোকানে ঠেক আছে বেনামিতে। সেখানে খবর দিলেই এসে যাবে। হারানো জিনিস ফিরে পাবি।

সেই খেরোকে দেখে বুকে বল পেল রজত। কপালের ঘাম মুছল, বলল, খেরো তুই এখানে?

না এসে কী করি, ডাক্তারবাবু! কাল বিকেলেই তো ফেরার কথা ছিল আপনার।

কি করে ফিরি বল খেরো? দিদির চোখে জল, জামাইবাবুর প্রস্টেট অপারেশন বলে কথা। অরুণাভ স্যার এত নামকরা ডাক্তার, প্রফেসর। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে বিকেলে দিদিকে ফোনে কথা বলিয়ে দিলাম। কত ব্যস্ত লোক, টানা আধঘণ্টা ধরে ভরসা দিলেন। ব্যাস ট্রেন ফেল।

অত কথা শোনার ধৈর্য নেই যেন খেরোর, বলল, আর এস সাহেব ওদিকে চিন্তায় মরেন—ইমার্জেন্সিতে কী ভিড়! কী ভিড়! সকালে কাঁচড়াপাড়ায় টেলিফোন করে জেনে নিয়েছেন

আপনি আসছেন। বললেন, যা খেরো, স্টেশন থেকে ওকে ডিরেক্ট নিয়ে আসবি হাসপাতালে, বাগুইআটির বাড়িতে যেন না যায়। আপনি টাকা হারিয়ে যা করছেন, মনে হচ্ছে—মেয়ের বিয়ে, সব টাকাই চলে গেছে। ভগ্নীপতির অপারেশন আটকাবে না, আমরা আছি না। দেখি দেখি, আপনার হাতের ব্যাগটা দেখি। বাঃ বাঃ, কীরকম ধারালো হাত আর ব্লেডের কারসাজি। প্রফেসর স্যারও বোধ হয় ওর কাছে ফেল। ছুরির একটানে প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড কি বার করতে পারবেন? ব্যাগটায় নিখুঁত অপারেশন।

বললাম, ফাজলামি রাখ খেরো। মরছি নিজের জ্বালায়, তুই হাসছিস। টু পাইস ইনকাম হচ্ছে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় দেখেই বুঝতে পারি।

না স্যার, ফর্সা চেহারায় তরোয়াল গোঁফের ফাঁকে মিচকি হাসি। হাতসাফাই করতাম বদনাম ছিল, এখন ওসব করি না তবে খেয়াল রাখি। আমার চাল নেই, চুলো নেই, বৌটা গতবছর গলায় দড়ি দিল, কিছুদিন জেলে ছিলাম। অনেকবার গেছি। এখন একদম ভদ্দরলোক, জেন্টলম্যান। লোকের কাছে শশধরবাবু।

২

বলতে বলতে হাত ধরে টানল, প্ল্যাটফর্মের সাইডে নিয়ে এল, স্যার, এটা আমার এলাকা। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত। এই জায়গায় আমার ডাক্তারবাবুর ব্যাগে হাত, সেমসাইড গেম। একটু বুকস্টলের কাছে দাঁড়ান, আমি আসছি।

বলেই কানের সামনে ফিসফিস করে, দিন তিনেক আগে আমার পানের দোকানে খবর দিয়েছিলেন, ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনে বাসে উঠতে গিয়ে পকেটমারি। আপনার দামী পেন গায়েব। তাও সোনার পেন, কানাডা থেকে মামা পাঠিয়েছিলেন। হায় হায়, কী দিনকাল, মায়ের মন্দিরের সামনে হাতসাফাই। ঘোর কলি, পাপ পাপ, দুনিয়াটা চোর-জোচ্চরে ভরে গেছে। দেখবি তো কার লোক। শালাদের নিয়ে আর পারি না। ওটা উদ্ধার করেছি। ফিরে পাবেন।

বলে কী খেরো! পেন পাওয়া গেছে! ডাক্তার রজত সেন হতবাক। মামা গত মাসেই পাঠিয়েছিলেন। হাজার চারেক টাকা দাম।

খেরো বলেছিল, বুঝলেন স্যার, ছিঁচকেমি। শশধরের এলাকায় সাহস তো কম নয়। টাকা নিয়ে এখনও ভেবে যাচ্ছেন দেখছি? দেখি কী করতে পারি। কোন বজ্জাতের কাজ এটা।

লোকজনের ভিড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে খেরো নিমিষে উধাও হয়ে গেল। মিনিট দশেক বাদে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হাতে পেটমোটা খামের বাণ্ডিল।—তিন হাজার আছে, পাক্কা, গুনে নেবেন স্যার। না, আর দেরি নয়, বাস ধরে হাসপাতাল যেতে গেলে ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। সব ব্যাটারা টাকা হাতাবার জন্য ওৎ পেতে আছে। তারচে আমার সঙ্গে আসুন, নির্ভাবনায় আসতে পারেন। এখানকার সব দাগীদের চিনি।

রজতকে নিয়ে লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল স্টেশনের বাইরে। লাগোয়া চত্বর, প্যাসেঞ্জারদের ভিড়। ট্যাক্সির জন্যে লম্বা লাইন। লোকজনের হৈচৈ, গণ্ডগোল।

খেরো হাসল, ঘাবড়াবেন না স্যার, আপনাকে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করছি। ঐ তো রামধন, প্রাইভেট গাড়ি, না না, আপনি কথা বললে ওরা ভাড়ার নামে গলায় টাকার কোপ বসিয়ে দেয়। এই রামধন, রামধন—

রোগা পাতলা ধূর্ত চেহারার লোক, শিয়ালের দৃষ্টি। এগিয়ে এল, জোড় হাত। খেরোকে বলল, হ্যাঁ স্যার, বলুন।

বজ্জাত বদমাশ লোক, আগে আমাকে বলতিস ছিঁচকে চোর, দাগী, এখন চাপে পড়ে এই

শশধর দাসকে বাপ বলতেও পারিস। তোর বৌয়ের তিনভরি হারটা উদ্ধার করেছিলাম, দেরিতে খবর দিয়েছিলি। আমার পা ধরে কান্নাকাটি। সোনা গলিয়ে ফেলেছিল। যাক, ভরি আড়াই তো ফিরে পেয়েছিস।

বুঝতে পেরে রামধন বলল, সাহেবের গাড়ি লাগবে?

ডাক্তার, বুঝলি ডাক্তার। দিনকাল জঘন্য। কোনোদিন গুলি অথবা চাক্কুতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবি। এঁরাই তখন ভরসা। আর তোর গাড়িটাও ছিনতাই করা গাড়ি। সব জানি, মুখ খুলি না। সবই পাপী পেটের জন্য। খা, কিছু করে খা। বলতে বলতে নিজেই এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল, চলে আসুন স্যার। বসে পড়ুন। এই রামধন, গাড়ি স্টার্ট কর। চটজলদি পৌঁছে দিবি। এক পয়সা নিবি না। আমার খরগোশ-ঠোঁট, তোরা বলতিস খেরোদা, এঁরাই ঠিক করেছিলেন।

৩

পুলিশ কনস্টেবল এগিয়ে এল, হাতে ছোট লাঠি। গাড়িতে ঠুকে বলল, এদিকে গাড়ি রাখা বে-আইনি। কেস ঠুকে দেব।

প্রথমে ধমকে উঠল খেরো, খবরদার, আইনের ভয় দেখিও না, পরে নরম গলা, মহিন্দার ভাই, জান তো কাল কী ঝঞ্ঝাট! বিস্ফোরণে উড়ে গেছে আমাদের ওদিককার মহল্লা। বৌবাজারে কাতারে কাতারে লোক জখম। অনেকে মরে ভূত। সে দৃশ্য সহ্য হয় না, ভাবতে গেলে মনে হয় আমিও মরে গেছি। ইনি আমাদের বড় হাসপাতালের ডাক্তার সাব, এখনও ডেডবডি, ইনজুরি কেস আসছে। ইমার্জেন্সি কেস, ছেড়ে দাও ভাই। না হলে কেস দেখবে কে? কাতরানো লোকজনদের কথা ভাব।

খেরোর কথা শুনে রজত অবাক হয়ে গেল, কাল কী হল রে খেরো? জানি না তো।

হ্যাঁ স্যার, লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, কলকাতায় বোমাবাজি, বিস্ফোরণ সব যেন জলভাত। এই রামধন, গাড়ি স্টার্ট দে। স্যার, আপনি সোজা ইমার্জেন্সিতে চলে যাবেন। আপনার জন্য আর. এস. স্যার ওয়েট করছেন। হেল্পিং হ্যাণ্ড দরকার। না, ভাববেন না। টাকা পেয়ে গেছেন, পেনটাও আজই পাবেন।

ঠিকই বলেছে খেরো। ইমার্জেন্সির সামনে ভিড় আর ভিড়। হৈ-হট্টগোল। পুলিশের গাড়ি, অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স—ইমার্জেন্সিতে ঢোকাই দায়। চারিদিকে রোগীর আত্মীয়-স্বজনের কান্নার শব্দে বাতাস ভারি। রিকশা, টেম্পো, ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্সে কাতারে কাতারে সব কেস—এক এক জন আসে আর হাজার লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বীভৎস সব রোগী, কারও হাত গেছে, কারও পা। ঝলসে গেছে অনেকে—ডেডবডির মিছিল। পুড়ে যাওয়া চোখমুখ। হাসপাতাল সুপার থেকে ভিজিটিং সার্জেনরা পর্যন্ত ব্যস্ত। মন্ত্রীদের ছুটোছুটি। বার বার জ্বলে উঠছে প্রেসের ক্যামেরা। লোক সামলাতে সাদা পোশাকের পুলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া করছে বার বার।

ডাঃ রজতকে দেখতে পেয়ে ওয়ার্ড মাস্টার ছুটে এল, আর বলবেন না স্যার। বৌবাজার এমনিতে ঘিঞ্জি জায়গা। ব্যস্ত অঞ্চল। উপরে গোডাউন, চুন, বালি, সিমেন্টের দোকান। বোমা বাঁধতে গিয়ে হঠাৎ অঘটন—বারুদের বিস্ফোরণ। পর পর অনেকগুলো দোকান উড়ে গেছে, ভেঙে পড়েছে। সব ডেডবডি আসেনি এখনও। চলুন, অনেক ডাক্তার কাজ করেও সামাল দিতে পারছেন না। অক্সিজেন বাড়ন্ত, স্যালাইন ওয়াটার স্টকে যা ছিল সব প্রায় শেষ। ড্রিপ দেওয়াই ঝামেলা। পার্টি জানতে পারলে রক্ষে নেই। ইমার্জেন্সি গুঁড়িয়ে দেবে। এখন তো কথায় কথায় ডাক্তারদের উপর হামলা।

ইমার্জেন্সির ভেতরে ভ্যাপসা গন্ধ। রক্ত আর চুন-বালিতে, ধুলোয় মেশামেশি থেঁৎলে যাওয়া মুখ আর শরীর দেখে চেনার উপায় নেই। ডাক্তারের টেবিল ঘিরে লোকজন। রোগী দেখার টেবিলে খাবি খাচ্ছে মৃতপ্রায় পেশেন্ট—নাকে নল, হাতে বোতল থেকে স্যালাইন ড্রিপ, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ। ভালো করে পরীক্ষা করাও মুশকিল। স্ট্রেচার থেকে ফটাফট ডেডবডি নামিয়ে খালি করে আবার বডি আনতে ছুটছে লোকজন। রণক্ষেত্র যেন।

ডাঃ অনির্বাণ রজতের সিনিয়ার। একাই যেন একশো। দশ হাতে কাজ করে সামাল দিতে পারে না। শুধু রোগী দেখা ও চিকিৎসা নয় কাগজের হাজার কাজ। নাম, ঠিকানা, হিস্ট্রি অব ইনজুরি, কনডিশন অব পেশেন্ট, ক্ষতস্থানের বিবরণ—সবই পুলিশ কেস যে। ডেডবডিতে নাম্বার লাগিয়ে সব চলে যাচ্ছে মর্গে—পোস্টমর্টেম হবে। কম ঝামেলা নাকি!

রজতকে দেখতে পেয়ে অনির্বাণ হাসল, এসে গেছিস! বাঁচা গেল। ইমার্জেন্সিতে আজ শান্তি নেই। সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। স্যারেরাও কাজ করছেন তবু সামাল দেওয়া মুশকিল। আজ অনেক বেশি ডাক্তার সুপার সাহেব খবর দিয়ে আনিয়েছেন। আমি আর সবিতা পালা করে দেখছি। মুখ-চোখ অধিকাংশের উড়ে গেছে। চেনা দায়। কাগজে লিখতে হয়—ডেথ। রাইগার মর্টিস, মানে হাত পা-শক্ত না হলে ডিক্লারেশন দিই কী করে। পাক্কা তিন ঘণ্টা লাগে। তুই এসেছিস, এবার আমি ঘরে গিয়ে ঘণ্টা খানেক রেস্ট নিই।

রক্ত, ওষুধ, তুলো, গজ, ডেটল, ব্যাণ্ডেজের গন্ধ চারিদিকে। রাইটার্স থেকে এসে গেছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক—কর্তাব্যক্তিরা। লোকেরা হৈ হৈ করে ছুটে আসছে, পুলিশ তাড়া করছে, কী হচ্ছে মশাইরা, ডাক্তারদের কাজ করতে দিন। একদম ঢুকবেন না।

৪

জ্বর নিয়ে কাজ করছে সমর। রজতের রুমমেট। অত্যধিক পরিশ্রমে দুপুর একটা নাগাদ বমি। নিজেই একজামিনেশন টেবিলে।

আর. এস. দাদা আর ভিজিটিং ডাক্তার ছুটে এলেন। প্রেশার দেখে বললেন, ইউ নিড রেস্ট। যাও, হোস্টেলে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

কিন্তু যেতে চায় না সমর, কর্তৃপক্ষের মর্জি বলে কথা, ঘণ্টা না পেরোতেই আবার হয়তো তুলে আনবে। রোগী বেশি, সে তুলনায় ডাক্তার কম।

লোকাল এম. এল. এ সমরের জানাশোনা। ও আবার দারুণ প্লেয়ার। মোহনবাগানে খেলে। সব শুনে বললেন, আমার গাড়িতে চলে যাও, লেকটাউনের বাড়িতে বিশ্রাম করো। দরকার হলে পরে দেখা যাবে।

সমর চলে গেল। ডাঃ রজতের ডিউটি দুটো পর্যন্ত। মাথার উপর বাড়তি চাপ—রিলিভার আসেনি সমরের।

সার্জেন ভট্টরাজ, ইমার্জেন্সি ইনচার্জ ভগবান মানেন, বললেন, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, ম্যানেজ করে দে। দুটোর পর নয়, রাত দশটা পর্যন্ত চলিয়ে যা। দেখছিস না লোকজন কাতরাচ্ছে। যতদূর সাধ্যি কাজ করছি সবাই, মানুষের কপালে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা, রোগভোগ দুর্ঘটনা। আমরা চেষ্টা করি মাত্র, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে। রোগী মরে যাবে ভাবলে চলে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কাজ করে যা—কাজ।

একনাগাড়ে কাজ করতে করতে শরীর যেন বইছে না। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসতে চাইছে রজতের। পকেটে সেই হাজার তিনেক টাকা বার বার দেখছে।

ডাঃ ভট্টরাজ বললেন, নো চিন্তা, টাকাটা হাসপাতাল অ্যাকাউন্টে জমা করে দিচ্ছি। ঐ তো

প্রফেসর চৌধুরীও কাজ করছেন। কোনো ক্লান্তি নেই। কালই তোমার পেশেন্টের অপারেশন। একটু আগেই কথা হল। সিস্টার, ও সিস্টার, অ্যাকাউন্ট অফিসার পাশেই, ডাকুন না, টাকাটা রিসিভ করে রিসিট কেটে দিন।

ইমার্জেন্সি সিস্টারের দয়ার শরীর, কী স্যার, ট্রেন থেকে নেমেই কাজে হাত দিয়েছেন। এখন বাজে রাত আটটা, পেটে কিছু পড়েনি মনে হচ্ছে। টাকার রসিদ তো পেয়ে গেলেন, এবার একটু গলাটা ভিজিয়ে নিন। এই যে ফ্লাস্ক থেকে কাপে চা ঢেলে দিচ্ছি—সঙ্গে নোনতা বিস্কুটের প্যাকেট, আপনি পছন্দ করেন। খেরো দিয়ে গেছে।

খেরো? অদ্ভুত লোক তো সিস্টার।

ইয়েস ডক্টর। হাঁ, সেই কাটা ঠোঁট মেরামতি করা পেশেন্ট। গোঁফ রেখেছে এখন আর বোঝা যায় না। নিন নিন, পাশের ছোট টেবিলে বসে পড়ুন। পর্দা ঘেরা জায়গা। কী আশ্চর্য এখনও এত লোকজন—উটকো লোকই বেশি।

৫

অনির্বাণ হঠাৎ এল। ও কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। বলে উঠল, আপনারা সবাই কি পার্টির লোকজন? বাড়ি ভেঙে চাপা পড়া ডেডবডিগুলো আসছে। রক্ত চাই। এই যে নামের লিস্ট, পাঁচ বোতল রক্ত দরকার, আরজেন্ট। যান মশাইরা, ব্লাড ডোনেট করুন, বলতে বলতে হুঙ্কার ছাড়ল।

ব্যাস নিমিষেই লোকজন হাওয়া—কেটে পড়ল।

অনির্বাণ রজতের কাঁধে হাত রাখল, এবার তুই রেস্ট নিতে পারিস। জামাইবাবুর অপারেশনের জন্যও রক্ত দরকার। রক্তের স্যাম্পেল নিয়ে ছুটে গেছে খেরো। প্রফেসর চৌধুরীর সঙ্গেও কথা বলল। কত পেশেন্ট আমরা দেখি, ভালো করি, কিন্তু পরে কেউ মনে রাখে না। খেরো দ্যাখ ঠিকই মনে রেখেছে। আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওর ছোট্ট পানের দোকানটাও নাকি উড়ে গেছে কিন্তু কোনো আফশোস নেই।

রজত বলল, রিলিভার আসেনি যে। দেখছ না লোকগুলো কাতরাচ্ছে। সারা শরীর ময়দা, চুন, কাদায় লেপা। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করা দায়। মেডিসিন, গাইনি, সার্জারির ইনটারনরাও কাজ করছে। সবে মাত্তর ট্রেনিং-এ ঢুকেছে, ওরা তো ইনজুরি কেস ট্যাকেল করায় এক্সপার্ট নয়।

ঘাবড়াস না রজত, আমি আর. এস. দা আছি। আরও ডাক্তার আসছে, গাড়ি গেছে। কী রে, রোগীর হাত ধরে বসে আছিস? পা-হাত থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কমপ্রেশন ব্যাণ্ডেজ দে।

না অনির্বাণ, পাল্‌স পাচ্ছি না, পেশেন্ট সিঙ্কিং। এখুনি ড্রিপ দেওয়া দরকার। অন্য চারটা রোগীও খাবি খাচ্ছে। লোক কম, বড় সিস্টারই শিরার মধ্যে সূচ ঢুকিয়ে ওষুধ চালিয়ে দিয়েছেন। এত এক্সপার্ট জানতাম না। শুনেছি আগে ওঁরাই সব করতেন ডাক্তারদের হাত দিতে হত না।

কথা শুনে এগিয়ে এল অনির্বাণ, সত্যি বলেছিস, পেশেন্ট সিঙ্কিং, প্রেশার পাওয়া যাচ্ছে না। সিস্টার, ও সিস্টার, পাশের ইমার্জেন্সি ওটিতে অ্যানেশসথেটিস্ট স্যারদের ডাকুন। পা কেটে বাদ দিচ্ছেন ভিজিটিং, ওঁরা তো মাথার পেছনে যন্ত্র নিয়ে বসে, বয়েল্‌স অ্যাপারেটাস। একটু ডাঃ পাত্রকে খবর দিন না—আশিসদা। আমি অক্সিজেন চালিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু নাকে নল ঢোকানো যে মুশকিল।

আশিস এল, সিনিয়ার দাদা—সঙ্গে ভিজিটিং অজ্ঞান স্যার সুপ্রতীক সেন। সবাই ডাকে অজ্ঞান সেন। দুজনেই দেখলেন। আশিস স্টেথো দিয়ে বুক শুনল, বলে উঠল, তোরা গাধা। কুঁচকির কাছে ছুরির টানে ওপেন করে দে, আমিই দিচ্ছি। সিস্টার, স্কালপেল প্লিজ আর ডেকাড্রন, সিরিঞ্জ দিন,

এটা কোনো ব্যাপার হল! অজ্ঞান সেন সাহেবের সায়ে আশিসের নিপুণ হাতে শিরা বেরিয়ে এল কুঁচকিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রেশার বাড়াবার ইঞ্জেকশন দিয়ে বলল, নে, এখানেই ড্রিপের বোতলের নল লাগিয়ে দে, প্রাণপাখি কিচ কিচ করে ডাকছে, হার্ট বন্ধ হয়নি এখনও। আশা আছে।

কোনো কথা যেন মাথায় ঢুকছে না রজতের। কাল জামাইবাবুর অপারেশন, দিদি এসে বসে আছেন। একমুহূর্তের জন্য ইমার্জেন্সি ছেড়ে বেরোতে পারেনি।

অনির্বাণ ড্রিপ চালাতে চালাতে বলে, চিন্তার ব্যাপার রে। জামাইবাবুর রক্ত নেগেটিভ গ্রুপের। হাসপাতালে, বাইরে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। খেরো ঘণ্টাখানেক আগে খবর দিয়েছে—এই যে অরুণাভ স্যার এসে গেছেন। তোর জন্যেই। মুখটা থমথমে, গম্ভীর।

প্রফেসর চৌধুরী রজতের পিঠে স্নেহের হাত রাখলেন, অবাক হবার কিছু নেই, আমি অপারেশনের আগের দিন রাত্রিতে পেশেন্ট দেখতে আসি। রুটিন অ্যাফেয়ার। নেগেটিভ গ্রুপের ব্লাড না পাওয়া যাক, পেট ওপেন করব না, ইউরেনারি রুটে নল ঢুকিয়ে চোখে টেলিস্কোপিক লেন্সে দেখে আস্তে আস্তে কুরে গ্ল্যাণ্ড বের করে আনব। বিলেতে হামেশাই করেছি।

অজ্ঞান সেন বললেন, খুব ডিফিকাল্ট সার। টি. ভি.-তে দেখে করলে অনেক সোজা, বিদেশে চালু হয়েছে, এখনও এদেশে হচ্ছে না। কিন্তু কী করে করবেন ট্রান্স ইউরেথ্রাল বিসেকশন প্রস্টেট! টেলিস্কোপিক লেন্স যে খারাপ।

হা হা করে হাসেন প্রফেসর চৌধুরী, আমি জানতাম না কিন্তু খেরো কী করে জানল? দোকান থেকে এসে ঠিক করে দিয়েছে, ওরই প্রচেষ্টা। হি ইজ গ্রেট—আমি চেক করে নিয়েছি।

রজতের শরীর খারাফ লাগছিল। এমনিতেই ওর লো প্রেশার, মাথা ঘুরছে মনে হচ্ছে।

ধরে ফেললেন প্রফেসর।—অনির্বাণ এসে গেছে, হেড ডিপ ডাঃ পল্লবও এখানে। যাও, ঘরে গিয়ে রেস্ট নাও। পার্থ সেন নতুন ভিজিটিং, এরা সবাই আছে, চিন্তা করো না। হস্টেলে যাও।

ডাঃ পল্লব ঘোষ স্যার এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ, রেগে গেলে দুর্বাসা। ইমার্জেন্সিতে বার বার ঢুকছেন। ছোটাছুটির মধ্যে হাজারো টেলিফোন, পাশের ছোট ঘরটায় প্রেস মিটিং, রাইটার্সের কল—মাথা খারাপ হবার জোগাড়। ক্ষেপেই গেলেন, এই যে কালি, সুখিয়া, রামপুজন ডোম, তোরা ভেবেছিস কী! গাদাগাদি করে লাশ পড়ে আছে ঘরের সাইডে, এখনও ঠাণ্ডা ঘরে ঢোকাসনি। মড়া বলে অবজ্ঞা! ভালো করে গা-হাত-পা মুছিয়ে পরিষ্কার কর। মুখে তোদের ধেনোর গন্ধ, কাছে যাওয়া দায়, নাম্বার অনুযায়ী ঢোকা, না হলে কমপ্লেন করব, চাকরি খেয়ে নেব।

গজগজ করেন, ভেবেছে কী বজ্জাতগুলো! তালে গোলে হরিবোল। একটা লাশ হাতিয়ে নিয়ে কঙ্কাল করে বিক্রি করলে অনেক টাকা। জানি না বুঝি! কিন্তু রজত, তোর কী হল? দরদর করে ঘামছিস। অনির্বাণ যা, ওকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আয়, কুইক। জীবনে এত প্রেশারে কাজ করেনি বেচারা। এমনিতেই দুবলা পাতলা.......

৬

বিকেল থেকেই মেঘ জমেছিল সঙ্গে হাওয়া। ইমার্জেন্সির ভেতর বোঝা দায়। গুমোট দমবন্ধ অবস্থা। বাইরে দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি। ভয়ঙ্কর একটা দিন কাটিয়ে রাত্রি নটায় হস্টেলে। রাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তির ঢল।

রজতের হস্টেলের ঘরটা ওপরে কোনার দিকে। অনির্বাণ পৌঁছে দিয়ে যেতেই বৃষ্টি নামল।

দরজা-জানালার শার্সিতে জলের জাপটা। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বারবার। হাওয়ার দাপটে, বাজের শব্দে, জলের তোড়ে কেমন অদ্ভুত এক পরিবেশ। লাইট নিভে গেল ঝুপ করে। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।

রুমমেট নেই, ঘর অন্ধকার। মাঝে মাঝে আকাশ চিরে বিদ্যুতের রেখা, ঘরে জলের ছাট। শার্সিঅলা কাচের জানালা বন্ধ করে শুয়ে পরল রজত। আজকাল এমনই হয়, মাঝে মাঝে লোডশেডিং। গভরমেন্ট বাড়ি বানিয়ে নিশ্চিন্তি। তারপর যা হবার হোক। হস্টেলে ছিটকিনি লাগে না, জানালার কাচ খুলে পড়ে যায়, সারাই করা মহা ঝামেলা। একে লেখো, তাকে ধরো। পরিশ্রান্ত শরীরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না দিতেই ঘুম। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। জানালায় খুট খুট আওয়াজ। কেউ যেন ধাক্কা দিচ্ছে। আঁধারে মালুম হয় না ভালো করে। পেন্সিল টর্চ জ্বালাতে গিয়ে দেখল ব্যাটারি ডাউন। উঠল রজত। বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে ঘড়িতে দেখল রাত দুটো। জানালার শার্সি কাঁপছে। বাইরে জল নেমেছে অঝোর ধারায়। কাচের জানালা, ভেঙে না পড়ে। খুলতেই চোখেমুখে বৃষ্টির ঝাপটা। জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

চোখ দুটো বুজে আসছিল, শুতে না শুতেই আবার বাজের শব্দ। জানালার শার্সিতে কেউ যেন ঠুক ঠুক করে আওয়াজ করছে, খোলার জন্যে ধাক্কা দিচ্ছে। বৃষ্টি ছাপিয়ে সেই শব্দ জোরদার। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়। হোকগে যাক, পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল ডাঃ রজত সেন। হস্টেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার, প্যাসেজ লাইট নেই। মাথায় হাজার চিন্তা—কালকেই অপারেশন। ভাগ্যিস খেরো ছিল। জটিল সার্জারি। টেলিস্টোপিক লেন্সে চোখ রেখে কাজ, ঠিক না থাকলে মুশকিল হত।

মাথার পাশেই জানালা। হঠাৎ এক ডাকাতে হাওয়ায় জানালার পাল্লা খুলে গেল। ঝনঝনিয়ে উঠল কাচের শার্সি। টেবিল থেকে উল্টে পড়ল জলের গ্লাস, কুঁজো। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সব।

জানালার দিকে ঘুরে তাকাতেই চমকে উঠল রজত। গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়াশরীর—চুনধোয়া সাদা চেহারা, একটা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, অর্ধেক মাথা আর মুখ চেপ্টে থেঁতলে গেছে। রাস্তা থেকে পাইপ বেয়ে উঠে এসেছে যেন। আতঙ্কের স্রোত নেমে আসছে রজতের সারা শরীর জুড়ে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দেখে আগন্তুকের হাতে একটা সাপ—ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। ছায়ামূর্তিটার নিঃশ্বাসে সাপের ফোঁসফোঁসানি।

কে? কে? চিৎকার করে উঠল রজত। গলা শুকিয়ে কাঠ। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। দরজার দিকে ছুটে গেল। বাইরে প্যাসেজে যেতে পারলে অনেক নিরাপদ। পাশের ঘরে হয়তো বন্ধুরা রয়েছে। আগন্তুকের মুখে পিশাচের হাসি। জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে হাতটা লম্বা হয়ে ধেয়ে আসছে রজতের দিকে। চামড়া-মাংস উঠে গিয়ে যেন কঙ্কালের হাত। লম্বা হচ্ছে, মুঠো শক্ত। হঠাৎ কী যেন ছুঁড়ল।

ছোরা নাকি? দরজার কাছে ঠকাস শব্দে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল বুঝি। ভ্যাপসা পচা গন্ধ—রক্তের গন্ধ চারদিকে।

ডাঃ রজতের মুখ দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ, ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। সেই ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ায় ভাসছে। কথা বলার শক্তি নেই রজতের। তারপর চোখ দুটো বুজে এল। জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছে, অতলান্ত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাস, তারপর কী হয়েছিল মনে নেই।

ভোরে জ্ঞান ফিরতেই দেখে মাথার সামনে সমর, পাশে ওয়ার্ড বয়, হাতে কলবুক।

সমর বলল, কী রে, অনেকক্ষণ ডাকছি সাড়া দিলি না, ভাবলাম মরেই গেছিস। হাত ধরে টানতে তবে চোখ খুললি। সারা রাত ডিউটি দিয়েছি, সব কেস শেষ। এই মাত্তর ডেডবডি এল, গত দু'দিন ধরে চাপা পড়ে ছিল। জানি না আরো আছে কিনা। লোকজনেরা দিনরাত কাজ করছে—ধ্বংসস্তূপ সরাচ্ছে।

কলবুক এগিয়ে দিল ওয়ার্ড বয়, সই করুন স্যার। আরো দু'বার ঘুরে গেছি। কত কড়া নাড়লাম, দারুণ ঘুম আপনার।

বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রজত। জলে ভিজে গিয়েছে বিছানাপত্তর। এখন আকাশ পরিষ্কার, জানালা দিয়ে ভোরের আলো, ফুরফুরে হাওয়া। সেই ছায়ামূর্তির কথ ভেবে আতঙ্কে শিউরে উঠল। জানালার দিকে এগিয়ে গেল—গরাদে দেখে জল ধোয়া রক্তের দাগ। সাদা চুনের আঙুলের ছাপ।

সমর হাসে, কী রে, কথা বলছিস না কেন, রজত? মনে হচ্ছে ভূতে পেয়েছে। কলবুকে সই কর, এই নে আমার পেন। জামাকাপড় তো পরাই আছে, ইমার্জেন্সিতে কেসটা অ্যাটেণ্ড করে ইউরোলজির ও. টি.-তে চলে যাস—প্রফেসর চৌধুরী এসে যাবেন একটু পরেই।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বিছানার দিকে তাকাতেই হতবাক রজত । মামার পাঠানো সেই সোনার পেন। বোধহয় সেই আগন্তুক ছুঁড়ে দিয়েছিল, বীভৎস দেখতে সেই লোক। দরজায় ঠকাস করে শব্দ করে গোঁত্তা খেয়ে ফিরে এসেছে বিছানায়। আশ্চর্য তো! কাল রাত্তিরে সেই মানুষটাই ছুঁড়ে দিয়েছিল। হাতে সাপ ছিল। না না, এখন মনে হচ্ছে সেটা দেখার ভুল। হাতে উল্কি—ফণা তোলা সাপ।

৭

ইমার্জেন্সিতে পৌঁছুতেই সিনিয়ার দাদা যেন অকূলে কূল পেল। চোখ দুটো লাল, বলল, একটা অভিশপ্ত রাত্রি গেল, এখন আর পারছি না। নতুন ডেডবডিটার বিবরণ লিখছিলাম। অনক্লেমড অ্যাণ্ড আন-আইডেন্টিফায়েড।

বলতে বলতে হাই তুলল, এখনই বডিটা ঠাণ্ডা ঘরে চলে যাবে। চিরাই-ফিরাই হবে। আমি যাচ্ছি, পেপার ওয়ার্কটা তুই করে দে। তোর পকেটে দেখছি দারুণ কলম। হারিয়ে যেতে কতক্ষণ! নে নে, আমার এই সস্তা পেনে লেখ—

পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর, ডাক্তার সাব একটু হাত চালিয়ে, এটাই বোধ হয় লাস্ট কেস। ওদিককার পানের দোকানের পাশে দু'দিন ধরে চাপা পড়েছিল। রামু ডোম, তুই অকম্মার ঢেঁকি। ডোমের কাজ করিস, নড়তে-চড়তেই আধঘণ্টা। স্ট্রেচারটা এগজামিনেশন টেবিলে তোল, বলতে বলতে ভুঁড়ির উপর বেল্ট আঁটলেন।

রজত বলল, এই রামু, চাদর সরা, ইনজুরি দেখে নিই। ইন্সপেক্টর সাব, আপনার নাম বলুন, পেপারে লিখতে হবে ব্রট বাই—

কথা শেষ করার আগেই রামু কাপড় সরাল। সারা শরীর রক্ত মাখা, মরে কাঠ, ডান হাতটা বেরিয়ে এল। থেঁতলানো হাতের চামড়া কেমন বিবর্ণ, কালচে। থেঁতলে যাওয়া মুখ, চোখটা একদিকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, খুলি উড়ে গিয়ে মগজ দেখা যাচ্ছে। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। বীভৎস চেহারা—সারা শরীরে চুন-বালি মাখা।

হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গেল রজতের। হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে এই ছায়ামূর্তিই গরাদ ধরে ঝাঁকাচ্ছিল। পেন ছুঁড়ে দিয়েছিল। কে? কে?

কী মনে করে লাফ দিয়ে দাঁড়াল, ডান হাতটা টেনে ঘুরিয়ে দেখল। হাতে উল্কি আঁকা সাপ—ফণা তুলে দাঁড়ানো, যেন হিস হিস করে উঠছে বার বার। ঐ 'সাপটা'ও প্লাস্টিক সার্জারি করে তুলে দিতে চেয়েছিল খেরো। পল্লব স্যার ধমকে উঠেছিলেন, আগে ঠোঁটটা ঠিক করে দিই, জন্মবিকৃতি। হাতের কথা পরে ভাবা যাবে।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রজত। কথা নেই মুখে। সিনিয়র দাদা বলল, কী রে, চুপ করে গেলি যে! নে নে, লিখতে শুরু কর। একটু বাদেই সুপার স্যার আসবেন। আমার পেনটা নে।

রজত ওর সোনার পেনটা বার করল। আজেবাজে পেন নয়, সোনার হরফেই তো ওর নাম লেখা দরকার। হ্যাঁ, ওই এসেছিল কাল রাত্তিরে, পেন ফেরত দিয়ে গেছে।

দাদা বলল, কী রে, চিনিস নাকি?

উত্তর নেই রজতের মুখে। চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। *

শারদীয়া ১৪১২

---

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে। চরিত্রগুলো কাল্পনিক।

বেহালাবাদক নিরন্তর সাধু খাঁ

বাণীব্রত চক্রবর্তী

বয়স হলে কি মানুষের ধৈর্য কমে যায়! কিংকর বর্মনকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। একদিন অন্তর অমানিশা পত্রিকার সম্পাদক কিংকর বর্মন রজনীবাবুকে ফোন করে জিগ্যেস করছেন, 'গল্পটা এবার লিখতে শুরু করছেন?' রজনীবাবুর সেই একই উত্তর, 'না।'

অমনিশা পত্রিকায় ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কোনও গল্প ছাপা হয় না। রজনীবাবু ভূতের গল্প ছাড়া অন্য কোনও গল্প লেখেন না। তাও আবার কোনও ভৌতিক অভিজ্ঞতা লাভ না করলে লিখতে পারেন না। কিংকর বর্মন ভালো করেই জানেন। তাহলে তিনি একদিন অন্তর রজনীবাবুকে ফোন করে অস্থির করে তুলেছেন কেন? দিন পনেরো আগে রজনীবাবুর জীবনে এক ভৌতিক ঘটনা ঘটেছে। তবুও রজনীবাবু গল্পটা লিখছেন না।

একদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কিংকরবাবু নিজেই চলে এলেন রজনীবাবুর কালীঘাটের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে রজনীবাবুর বন্ধুত্ব পঞ্চাশ বছরের। অমানিশা পত্রিকার বয়স পঞ্চাশ হতে চলল। পুজোর সময় একবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঊনপঞ্চাশটা সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। কয়েক মাস বাদে পুজো। পঞ্চাশতম সংখ্যা বেরোবে। তার জন্যই এত তাড়া।

রজনীবাবু রাশভারী মানুষ। রেগেমেগে বন্ধুকে দু-চার কথা শুনিয়ে দিতেও পারেন। হয়তো বলতে পারেন তিনি আর অমানিশায় লিখবেন না। এইসব ঝুঁকি নিয়ে কিংকরবাবু রজনীবাবুর কাছে এসেছেন।

চা খেতে খেতে রজনীবাবু খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বন্ধুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, 'আসুন। হরি, কিংকরবাবু এসেছেন। চা দে।' চেয়ারে বসতে বসতে কিংকরবাবুর মনে হল কাল রাতে নিশ্চয়ই রজনীবাবু গল্পটা লিখে ফেলেছেন। হরি তক্ষুনি চা দিয়ে গেল আর বলল, 'কচুরি ভাজছি। একটু পরে দিচ্ছি।' কিংকরবাবু চায়ে পরিতৃপ্তির একটি চুমুক দিয়ে মুখ তুললেন। রজনীবাবু খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে চা খাচ্ছেন। কিংকরবাবু সানন্দে জিগ্যেস করলেন, 'গল্পটা লিখে ফেলেছেন মনে হচ্ছে।' রজনীবাবু চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'একটা অক্ষরও লিখিনি।'

কিংকরবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, 'লেখেননি!' রজনীবাবু মাথা নাড়লেন, 'না।' কিংকরবাবু বললেন, 'কিন্তু ভৌতিক অভিজ্ঞতা তো আপনার হয়েছে। সেই কুরুবক নদীর ঘাট। বেহালা বাজাতে বাজাতে নিরন্তর সাধু খাঁ ঝপ করে সেই নদীতে পড়ে গেলেন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আপনার চোখের সামনে তিনি নদীর ভেতর তলিয়ে গেলেন। গভীর রাত। নির্জন চারদিক। তারপর ঘেঁটুপুর স্টেশনে এসে দেখলেন একটা বেঞ্চিতে বসে নিরন্তর সাধু খাঁ একমনে বেহালা বাজাচ্ছেন। এসব কথা তো আপনি আমাকে বলেছেন। এর পরেও গল্পটা লিখছেন না কেন! এমন তো আপনার হয় না।'

হরি দুজনের জন্য কচুরি-তরকারি, খাবার জল একটা ট্রে করে নিয়ে এল। সেগুলি একে একে টেবিলের ওপর রাখল। রজনীবাবু বললেন, 'নিন। খেতে শুরু করুন।' কিংকরবাবুর আবার মন খারাপ হয়ে গেছে। এদিকে খিদেও পেয়েছে। কচুরি খেতে শুরু করলেন। রজনীবাবু খেতে খেতে বললেন, 'হ্যাঁ। আপনাকে শুধু ওইটুকুই বলেছি। আসলে কী জানেন। ঘটনাটা কেমন খাপছাড়া।

আর একবার ওখানে যেতে হবে। তারপর যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনাটা পাই তখন গল্প লিখব।' কিংকর বর্মন বললেন, 'কবে নাগাদ যাবেন!' রজনীবাবু বললেন, 'যেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখব বৃষ্টি পড়ছে। সেদিন।' এমন অদ্ভুত উত্তর শুনে কিংকর বর্মন হতবাক হয়ে গেলেন।

।। দুই ।।

রজনীবাবু তাঁর গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরোলে ট্যাক্সিতে ওঠেন। কখনও ফাঁকা ট্রাম পেলে তাতে ওঠেন। দিন সতেরো আগেকার কথা। সেদিন শেষ বিকেলে ট্রামে চেপে চলে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় গড়ের মাঠে। একটা নিরালা জায়গা দেখে বসলেন। সিগারেট ধরালেন। বিকেল শেষ হয়ে আসছিল। অপরূপ সূর্যাস্ত দেখে বিমোহিত হলেন। তিনি কবি নন। এক ডাকসাইটে ভূতের গল্প লেখক। তবু লেখক তো। ময়লা হয়ে যাচ্ছে আকাশ। পাখির দল বাসায় ফিরছে। সন্ধে নামছে। কাছাকাছি কোনও আলো নেই। বেশ তফাতে একটা ল্যাম্পপোস্ট। অন্ধকার নেমে এল। তারই মধ্যে তিনজন মানুষ এসে তাঁর পাঁচ হাত দূরে বসল। মনে হল গরিব মানুষ। দুজনের হাতে ছাতা। ওদের মধ্যে একজন একটা বিড়ি ধরাল। একজনের চোখে চশমা। তৃতীয়জনের ন্যাড়া মাথা। অন্ধকারে স্পষ্ট লোকগুলিকে দেখা যাচ্ছে না। বিড়ি টানতে টানতে লোকটা কাশছিল। চশমা পরা লোকটা একটা চাওয়ালাকে ডাকল। ওদের চা দিয়ে চাওয়ালা রজনীবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল। রজনীবাবু এক ভাঁড় চা কিনলেন। চা খেয়ে উঠতে হবে।

ওই তিনটে লোক কথাবার্তা বলছিল। পরের কথাবার্তা শোনার কৌতূহল তাঁর নেই। চা খেতে খেতে রজনীবাবু ভাবছিলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলের গায়ে একটা ইংরেজি বইয়ের দোকান আছে। আজকাল ফরাসি, ইতালিয়ান লেখকরাও ভূতের গল্প লিখছেন। সেসব ইংরেজিতে তরজমাও হচ্ছে। এখান থেকে উঠে ওই বইয়ের দোকানে যাওয়া যেতে পারে।

উঠব উঠব করছেন হঠাৎ ওদের কথাবার্তা তাঁর কানে এল। ন্যাড়া লোকটা বলছে, 'একশো বছর আগে নিরন্তর সাধু খাঁ দেহ রেখেছেন। ভারী চমৎকার বেহালা বাজাতেন। দিন দশেক আগে তাঁকে দেখেছি কুরুবক নদীর পাড়ে বলে বেহালা বাজাচ্ছেন। ' চশমা পরা লোকটা জিগ্যেস করল, 'কুরুবক নদীটা আবার কোথায়!' বিড়ি খাচ্ছিল যে, সে বলল, 'ঘেঁটুপুর ইস্টিশান থেকে এক কোশ দূরে।' ন্যাড়া বলল, 'শ্যালদা থেকে গাড়ি ধরে যেতে হয়। যেদিন কলকেতায় সকাল থেকে বিষ্টি পড়ে সেদিন ওখানে গেলে নিরন্তর সাধু খাঁকে দেখা যায়। তাঁর ব্যায়লা শোনা যায়। তাঁর সম্পক্কে সব জানা যায়।

রজনীবাবু ঠিক করলেন কালই ঘেঁটুপুর যাবেন। আজকাল মাঝে মাঝে সকালে বৃষ্টি হচ্ছে। বইয়ের দোকানে গেলেন না। ট্রাম ধরে বাড়ি ফিরে এলেন।

পরের দিন সকালে বৃষ্টি হল না। কিন্তু রজনীবাবু ঠিক করলেন তবু আজ বিকেলের ট্রেন ধরে ঘেঁটুপুরে তাঁকে যেতেই হবে। কোন ট্রেন সেখানে যায় তাঁর জানা নেই। বাড়িতে টাইম টেবিলও নেই।

তখন বেলা এগারোটা হবে। হরি এসে বলল, 'টাকা দিন। বাজারে যেতে হবে।' টাকা নিয়ে হরি বাজারে গেল। ঘেঁটুপুর যাওয়ার ট্রেন বিকেলে কি ছাড়ে? কোন ট্রেন ঘেঁটুপুরে যায়? কিংকরবাবুকে ফোন করে কোনও লাভ নেই। তিনি তাঁর ছাপাখানা আর অমানিশা নিয়ে মশগুল থাকেন। এক বছর ধরে অমানিশার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কারা কারা এখন চমকপ্রদ ভূতের গল্প লিখছেন তার সন্ধান করেন। একশো বছর আগেকার কোন কোন পত্রিকায় অসাধারণ ভূতের গল্প প্রকাশিত হয়েছে সেই অনুসন্ধানে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিতে ঘোরেন। নতুন লেখকের লেখা,

পুরোনো গল্পের পুনর্মুদ্রণ আর কিছু কিছু বিদেশি লেখকের ভূতের গল্পের তরজমা এবং কোহিনুরের মতো রজনীবাবুর গল্প নিয়ে মহালয়ার দিনে শারদীয়া অমানিশ প্রকাশিত হয়।

হঠাৎ রজনীবাবুর ইসমাইল চৌধুরীর কথা মনে পড়ে গেল। ইসমাইল রজনীবাবুর গল্পের অন্ধ ভক্ত। বয়স পঞ্চাশ। পরিভ্রমণ নামে একটা ভ্রমণ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বার করে।

নোটবুক থেকে ইসমাইলের ফোন নাম্বার বার করলেন। একটা ল্যাণ্ড ফোন আর চারটে মোবাইল নাম্বার। ইসমাইলের প্রথম মোবাইল নাম্বারে ফোন করলেন। ইসমাইল ফোন ধরল। রজনীবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কেমন আছো!' ইসমাইল আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠল, 'রজনীবাবু, আপনি!' রজনীবাবু বললেন, 'তোমাকে আমার একটা উপকার করে দিতে হবে।' ইসমাইল বললে, 'বলুন। কী করতে হবে।' রজনীবাবু জিগ্যেস করলেন, 'ঘেঁটুপুর নামে কোনও জায়গা আছে!' ইসমাইল বলল, 'আছে।' রজনীবাবু বললেন, 'সেখানে কুরুবক বলে কোনও নদী আছে!' ইসমাইল বলল, 'হ্যাঁ।' রজনীবাবু বললেন, 'ঘেঁটুপুর যাওয়ার জন্য বিকেলে যদি কোনও ট্রেন থাকে আমাকে একটু সবিস্তারে বলো তো।' ইসমাইল বলল, 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন। কম্পিউটার দেখে সব বলে দিচ্ছি।'

এক মিনিটের মধ্যেই ইসমাইল সব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বলে দিল। পাঁচটা আটতিরিশের একটা ট্রেন আছে। লাস্ট ট্রেন ছটা একুশে। শেয়ালদা থেকে ঘেঁটুপুর যেতে সময় লাগবে তিন ঘণ্টা বাইশ মিনিট। কোন ট্রেন, টিকিটের কত দাম, ওই ট্রেন সাধারণত ফাঁকা থাকে, কোনও রিজারভেশনের দরকার নেই ইত্যাদি জানিয়ে বলল, 'ক'টার ট্রেনে যাবেন বলুন, গাড়ি নিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি।' রজনীবাবু বললেন, 'পাঁচটা আটতিরিশেরটায় যাব। না না। তোমাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। আচ্ছা ইসমাইল, আমাদের দেশে কুরুবক বলে কোনও নদী আছে জানতাম না। ব্যাপারটা কী!' ইসমাইল হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'আসলে ওটা রূপনারায়ণেরই একটি অংশ। এই নদীটার পাশে অজস্র ঝাঁটি ফুলের গাছ আছে। তা থেকেই কোন রসিক মানুষ এমন নামকরণ করেছেন। তাই স্থানীয় মানুষদের কাছে নদীটার নাম কুরুবক হয়ে গেছে। ঝাঁটি ফুলকে তো কুরুবক বলা হয়। এই আর কি।' একটু থেমে বলল, 'কিন্তু আজ তো ফিরতে পারবেন না। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নটা হয়ে যাবে। স্টেশনের কাছে যাদববাবুর হোটেল আছে। এক্ষুনি যাদববাবুকে ফোন করে বলে দিচ্ছি। আপনার জন্যে যাতে একটা ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখেন। হোটেলটি পরিষ্কার-পারিচ্ছন্ন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও ভালো।' রজনীবাবু ভেবে দেখলেন প্রস্তাবটি মন্দ নয়। তাঁকে ঘেঁটুপুরে রাত্তিরটা থাকতেই হবে। কুরুবক নদীর ঘাটে কখন নিরন্তর সাধু খাঁর দেখা পাবেন তার ঠিক নেই। হয়তো মধ্যরাতে দেখা পেলেন। নিরন্তর সাধু খাঁ একশো বছর আগে বেঁচে ছিলেন। এখন তিনি অশরীরী। অশরীরীর মনের খেয়াল বড়ই রহস্যময়।

রজনীবাবু বললেন, 'বেশ, সে ব্যবস্থাই করো। থাকা-খাওয়ার যা খরচ তাই দেব। তুমি আবার যাদববাবুকে বলে কনসেশন করতে যেয়ো না।' ইসমাইল বলল, 'যাদববাবু আপনার লেখার ভারী ভক্ত। আপনাকে পেলে উনি বর্তে যাবেন। কিছুতেই আপনার কাছ থেকে কোনও টাকাপয়সা নিতে রাজি হবেন না।' রজনীবাবু বললেন, 'তা হলে ওই হোটেলে ওঠা যাবে না। ওখানে কি আর হোটেল নেই!' ইসমাইল বলল, 'না। ওই একটাই হোটেল। হোটেলের নাম যাদববাবুর হোটেল।' রজনীবাবু বললেন, 'তাহলে আমাকে স্টেশনেই রাত কাটাতে হবে।' ইসমাইল বলল, 'না। না। যাদববাবুর হোটেলেই থাকবেন। ভদ্রলোককে আপনার ইচ্ছার কথাটা জানিয়ে দেব।' রজনীবাবু বললেন, 'হোটেল থেকে কুরুবক নদীটা কতদূর!' ইসমাইল বলল, 'মাইল দুয়েক হবে। হোটেলের সামনে থেকে ভ্যান-রিকশা পেয়ে যাবেন।' এবার রজনীবাবু বেশ পরিতৃপ্ত হলেন, 'কাজের মানুষ তুমি। ফোনে তোমাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম। একদিন সময় করে আমার বাড়িতে এসো। আসার আগে আমাকে একটা ফোন কোরো।'

।। তিন ।।

দুপুরে খেতে খেতে হরিকে বললেন, 'বিকেল চারটের সময় একটা ট্যাক্সি ডেকে দিবি। শেয়ালদা স্টেশনে যাব।' হরি জিগ্যেস করল, 'কলকাতার বাইরে কোথাও যাচ্ছেন নাকি।' রজনীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। কাল সকালে ফিরব।' হরি বলল, 'সঙ্গে আমাকে নিয়ে চলুন। কয়েকবার তো আপনার সঙ্গে ভূতের সন্ধানে গিয়েছি। সারাদিন বাড়িতে থেকে থেকে কোমরে বাত ধরে গেল।' রজনীবাবু বললেন, 'আজ নেওয়া যাবে না। পরে যদি কোথাও যাই তখন ভেবে দেখব।'

চারটের সময় হরি ট্যাক্সি ডেকে আনল। একটা ঝোলা ব্যাগে রাতে শোওয়ার জামা-কাপড়, টর্চ, এক প্যাকেট মোমবাতি, খান দুই দেশলাই, তোয়ালে, সাবান, পেস্ট, ব্রাশ ইত্যাদি। তাছাড়া সিগারেট। কিছু টাকা পাঞ্জাবির পকেটে। কিছু ব্যাগের ভেতর বটুয়াতে। তা ছাড়া ডুপ্লিকেট চশমা। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় লাঠিটা নিতে ভুললেন না। সব সময় লাঠি ব্যবহার করেন না। দূরে যাচ্ছেন বলে নিলেন। রজনীবাবুর বয়স সত্তর। এখনও বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। অসুখ-বিসুখের বালাই নেই। খেতে ভালোবাসেন। হজমও করতে পারেন।

স্টেশনে এসে দেখলেন একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন। টিকিট কাউন্টারে বেশি ভিড় ছিল না। টিকিট কিনে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে এসে দেখলেন ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ইসমাইল বলে দিয়েছিল কোন ট্রেন ঘেঁটুপুরে যায়। এটা সেই ট্রেন। ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকা। রজনীবাবু ট্রেনে উঠলেন। জানালার ধারে ফাঁকা জায়গা পেয়ে বসলেন।

ইসমাইল বলে দিয়েছিল ঘেঁটুপুরের আগের স্টেশন আকাশমণি। এ লাইনে স্টেশনের নাম গাছের নামে। নদীরও তাই। ট্রেন এখনও ছাড়েনি। এবার কিছু লোকজন ট্রেনে উঠছে। তবুও ট্রেন একরকম ফাঁকা। এবার এক ভদ্রলোক এসে রজনীবাবুর সামনের সিটে বসলেন। মোটাসোটা চেহারা। বাউলদের মতো মাথায় চুড়ো খোঁপা। গায়ে গেরুয়া ফতুয়া। মালকোঁচা করে ধুতি পরা। মুক ভরতি পান। চিবোচ্ছেন। কাঁধের বড় ঝোলা ব্যাগটি পাশে রেখেছেন। ব্যাগের ফাঁক দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষীণ আভাস উঁকি মারছে। বাউল-টাউল হবেন হয়তো। ট্রেন ছাড়ল। রজনীবাবু ঘড়িতে দেখলেন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা আটতিরিশ। রজনীবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল গড়ের মাঠের সেই তিনটি লোকের কথা। ন্যাড়া লোকটা বলেছিল, 'যেদিন কলকেতায় সকাল থেকে বিষ্টি পড়ে সেদিন ওখানে গেলে নিরন্তর সাধু খাঁকে দেখা যায়। তাঁর বেহালা শোনা যায়। তাঁর সম্পক্কে সব জানা যায়।' রজনীবাবু আকশের দিকে তাকালেন। মেঘের চিহ্ন নেই।

গড়ের মাঠের ওই তিনটি লোক মিথ্যে কথা বলেনি তো! ওদের কথা শুনে বোকার মতো ঘেঁটুপুরে যাচ্ছেন না তো! কিন্তু ইসমাইল তো বলল ঘেঁটুপুর আর কুরুবক নদীর কথা। তবে বেহালাবাদক নিরন্তর সাধু খাঁর অশরীরী অস্তিত্ব এখনও প্রমাণের অপেক্ষায়।

রজনীবাবু একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভেঙে গেল। একটা স্টেশন পেরিয়ে ট্রেনটা আবার ছুটছে। ঘড়িতে দেখলেন সাতটা। এখনও দু'ঘণ্টা দেরি। ট্রেনের কামরার শতকার পঁচানব্বই ভাগ আলো জ্বলছে না। দু-একটা জ্বলছে। তাও একটু দূরে। চারপাশটা দেখে নিলেন। তাঁর মনে হল পেছনের দিকে সেই তিনটি লোক বসে আছে। একজনের চোখে চশমা, একজনের মাথা ন্যাড়া, একজনের মুখে জ্বলন্ত বিড়ি। এখন তো ট্রেনে ধূমপান নিষিদ্ধ।

হঠাৎ সব আলো জ্বলে উঠল। সেই লোক তিনটেকে দেখতে পেলেন না। সিট ফাঁকা।

তিনি বুঝতে পারলেন এসব তাঁর মনে ভুল। দুটো স্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পর এবার কামরার সব আলোগুলি নিভে গেল। রজনীবাবু আবার পিছন ফিরে তাকালেন। অন্ধকার। কেবল একফোঁটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। কে যেন বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে। আবার একটু পরে আলোগুলি জ্বলে উঠল। রজনীবাবু দেখলেন ওরা তিনজন নেই। সিট ফাঁকা।

সামনের ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'কাউকে কি খুঁজছেন?' রজনীবাবু বললেন, 'না তো!' ভদ্রলোক পান চিবোতে চিবোতে জিগ্যেস করলেন, 'যাবেন কোথায়!' প্রশ্নটা এড়িয়ে রজনীবাবু বললেন, 'আপনি বুঝি একতারা বাজিয়ে বাউল গান করেন।' ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'অনেকেই এই ভুলটা করেন। আমি বাউল নই। আমার নাম অনবরত সাধু খাঁ। বেহালা বাজাই। থাকি ঘেঁটুপুরে। দিল্লির এক কনফারেন্সে বেহালা বাজাতে গিয়েছিলাম। দু'দিন কলকাতায় থেকে বাড়ি ফিরছি।' রজনীবাবুর শরীরের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল, 'বহুকাল আগে নিরন্তর সাধু খাঁ নামে এক বেহালা বাদক ছিলেন।' অনবরতবাবু বললেন, 'উনি আমার প্রপিতামহ। গিরিশ ঘোষের নাটকে বেহালা বাজাতেন। আমরা বংশপরম্পরায় বেহালা বাজাই। আমার প্রপিতামহের নামটি জানলেন কোথা থেকে!' রজনীবাবু বললেন, 'এখন ঠিক মনে পড়ছে না।'

গাড়ি ঘেঁটুপুর স্টেশনে এসে থামল। নমস্কার জানিয়ে অনবরত সাধু খাঁ ট্রেন থেকে নামলেন। তারপর রজনীবাবু। কিন্তু স্টেশনে নেমে রজনীবাবু আর অনবরত সাধু খাঁকে দেখতে পেলেন না।

স্টেশনের কাছেই যাদববাবুর হোটেল। হোটেলে ঢুকে রিসেপশনে গিয়ে রজনীবাবু নিজের পরিচয় দিলেন। যাদববাবু তখন সেখানেই ছিলেন। রজনীবাবুকে পেয়ে ভদ্রলোক তাঁকে কী ভাবে আপ্যায়ন করবেন ভেবে কূল পাচ্ছিলেন না। রজনীবাবু বললেন, 'এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! খানিক পরে আমাকে ভাত আর মাছের ঝোল দেবেন। খেয়ে একটু বেরোব। এখন কি চা পাওয়া যাবে?' যাদববাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। চলুন, আপনার রুমে।'

ঘরটা ভালো। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খোলা জানলা দিয়ে দূরে একটা নদীর রেখা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত ওটাই কুরুবক নদী। যাদববাবু বললেন, 'দরকার হলে এই বেলটা টিপবেন। আমি চলে আসব।' একটু পরে চা আর চিকেন পকোড়া এসে গেল।

নিজের রুমে বসে দশটা নাগাদ ভাত আর কাতলা মাছের ঝোল খেলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর বেরোবেন বলে তৈরি হতে হতে দেখলেন আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। বেল টিপলেন। তক্ষুনি যাদববাবু হাজির। রজনীবাবু বললেন, 'আমাকে একটা ছাতা দিন।'

ছাতা হাতে বেরোলেন। ভ্যান-রিকশায় একেবারে কুরুবক নদীর ধারে। তারপর যা হয়েছিল তা এই গল্পের গোড়াতে কিংকর বর্মন বলেছেন। রজনীবাবু তাঁকে ওইটুকু ঘটনাই বলেছিলেন।

।। চার ।।

রজনীবাবু সাধারণত বেশ বেলার দিকে ঘুম থেকে ওঠেন। রাত এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ করেন। আজ ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে দিলেন। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। হরিকে ডাকলেন, হরি এসে অবাক, 'এর মধ্যে উঠে পড়েছেন!' রজনীবাবু বললেন, 'আর একটু হলে আমার ঘর জলে ভেসে যেত। কী জোরে বৃষ্টি পড়ছে দেখেছিস!' হরি জিভ কাটল, 'তাই তো'!' রজনীবাবু বললেন, 'কখন থেকে বৃষ্টি পড়ছে জানিস!' হরি কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'আজ্ঞে ভোর ছ'টা থেকে। পাঁচ মিনিট হল বৃষ্টির তোড়টা বেড়েছে। এতক্ষণ তো টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।' রজনীবাবু বললেন, 'একবেলার মতো রান্না করবি। সেদিনের মতো বিকেল চারটে নাগাদ বেরোব। কাল ফিরব। আজ তুই আমার সঙ্গে যাবি।'

আজকের ট্রেন সেদিনের মতো ফাঁকা। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে। তবে এখনও আকাশে মেঘ জমে আছে। ন্যাড়া লোকটা বলেছিল, 'যেদিন কলকেতায় সকাল থেকে বিষ্টি পড়ে......।' আজ সকাল থেকে বৃষ্টি পড়েছে। রজনীবাবু যাদববাবুকে ফোন করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কাজের লোককে নিয়ে আজ ঘেঁটুপুরে যাচ্ছেন। যাদববাবু বলেছেন, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

যথাসময় ট্রেন ছাড়ল। আজ ট্রেনে অনবরত সাধু খাঁকে দেখতে পেলেন না। আজও মাঝে মাঝে ট্রেনে আলো নিভে যাচ্ছিল। যখন ট্রেনে একটা-দুটো আলো জ্বলছিল তখন রজনীবাবুর মনে হচ্ছিল ওই তিনটে লোক পেছনের সিটে বসে আছে। আজও এটাকে রজনীবাবু মনের বিভ্রম বলে উড়িয়ে দিলেন। রজনীবাবুর পাশে হরি বসেছে। রজনীবাবুর ও হরির ছাতা হরির কাছে। হরি একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়েছে।

হরির বিশেষ কোনও কৌতূহল নেই। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এসব প্রশ্ন সে করেনি। ঘর থেকে অনেকদিন পর বাইরে বেরোতে পেরেছে তাতেই তার আনন্দ। বিশেষ করে ট্রেনে চেপে যাওয়া। সে জানে বাবু কোনও ভূতের সন্ধানে যাচ্ছেন হয়তো। রজনীবাবুর সঙ্গে থেকে থেকে তার ভূতের ভয়টা উবে গেছে।

রাত দশটা কুড়ির সময় ডিমের ঝোল আর ভাত খেয়ে ছাতা হাতে রজনীবাবু যাদববাবুর হোটেল থেকে বেরোলেন। এবারে লাঠি আনেননি। ভ্যান-রিকশায় উঠলেন। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। নদীর কাছে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

নদীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তাঁর কানে এল বেহালার সুর। নিরন্তর সাধু খাঁ কি নদীর ধারে বসে বেহালা বাজাচ্ছেন? গিরিশবাবুর জনা নাটকে কি নিরন্তর এই সুরে বেহালা বাজাতেন! খানিকটা এগিয়ে দেখলেন অন্য এক ভদ্রলোক বেহালা বাজাচ্ছেন।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন অনবরত সাধু খাঁ একমনে বেহালা বাজাচ্ছেন। সুরটা কেমন চেনা চেনা। বৃষ্টি থেমে গেছে। গতবার কুরুবক নদীর ধারে বসে নিরন্তর সাধু খাঁ এই সুরে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। তবে বেশিক্ষণ সে বাজনা শুনতে পাননি। নিরন্তর বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ ঝপ করে নদীর ভেতর পড়ে গিয়েছিলেন। রজনীবাবুর চোখের সামনে জলের অতলে তলিয়ে গেলেন। গভীর রাত। রজনীবাবু আস্তে আস্তে রিকশার খোঁজে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে নদীকে পেছনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। নিরন্তর সাধু খাঁ মারা গেছেন একশো বছর আগে। কিন্তু তাঁর অতল জলে তলিয়ে যাওয়াটার নিশ্চয়ই কোনও মানে আছে। সেদিন রজনীবাবু এই কথাটাই ভেবেছিলেন। আজও তার সদুত্তর পাননি। সেই উত্তর পেলে কিংকর বর্মনকে চিন্তা-মুক্ত করতে পারবেন। কিংকর বর্মন অমানিশার পুজো সংখ্যার গল্পটা পেয়ে যাবেন।

সেদিন কুরুবক নদীর ঘাটে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর নিরন্তর সাধু খাঁয়ের দেখা পেয়েছিলেন। গায়ে একটা কালো কোট। তাও তাপ্পি মারা। কোটে কতগুলি মেডেল আটকানো ছিল। হেঁটো ধুতি। খালি পা। একমুখ সাদা দাড়ি-গোঁফ। উসকো-খুসকো পাকা চুল। নিরন্তর বলেছিলেন, 'গিরিশ ঘোষের নাটকের দলে আমি বেহালা বাজাই। শুনুন আমার বাজনা।' এই কথা বলে বেহালা বাজাতে শুরু করেছিলেন। তারপর ঝপ করে নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন।

সেদিন ঘেঁটুপুর স্টেশনে ফিরে আরও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে নিরন্তর সাধু খাঁ একমনে বেহালা বাজাচ্ছিলেন।

বাজনা থামিয়ে অনবরত সাধু খাঁ মুখ তুললেন, 'আসুন রজনীবাবু। এতক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।' রজনীবাবু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি আমার নাম জানেন!' অনবরতবাবু উঠে দাঁড়ালেন, 'জানি। আপনি যে একজন ডাকসাইটে ভূতের গল্প লেখক তাও জানি!' রজনীবাবু বললেন, 'কই, সেদিন তো ট্রেনে কিছু বললেন না।' অনবরতবাবু বললেন, 'সেদিন জানতাম না। জেনেছি কাল রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে। বড়দাদু এসে আমাকে বলে গেলেন।' রজনীবাবু বললেন, 'স্বপ্নে! বড়দাদু বলে গেলেন মানে!' অনবরতবাবু বললেন, 'বড়দাদু মানে নিরন্তর সাধু খাঁ। সব ব্যাপারটা গুছিয়ে বলতে হবে। কোথায় বসা যায় বলুন তো!' আকাশ এখন

পরিষ্কার। নদীর একপাশে বটগাছের নীচে একটা পাথরের বড় টুকরো পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে অনবরতবাবু বললেন, 'চলুন, ওইখানে বসা যাক।'

দুজনে পাশাপাশি বসেছেন। রজনীবাবুর মুখে সিগারেট। অনবরতবাবু পান খেতে খেতে বললেন, 'মাঝে মাঝে স্বপ্নে বড়দাদু আমাকে দেখা দেন। দিল্লি যাওয়ার আগে দেখা দিয়ে বলেছিলেন কোন সুর কী ভাবে বাজাব। তাঁর আদেশ অনুসারে বেহালা বাজিয়ে কনফারেন্স মাত করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কাল যখন স্বপ্নে আবার বড়দাদু দেখা দিলেন তখন অবাক হয়ে গেলাম। আজ আবার তিনি আমাকে কী বলতে এসেছেন? তখন উনি আপনার কথা বললেন। আপনি কী লেখেন সেটাও বললেন। আর আমাকে বললেন রাতে কুরুবক নদীর ধারে বসে বিল্বমঙ্গলের নাটকের গৎ যেন বাজাই। একদিন নাকি সেই গৎ তিনি আপনাকে শুনিয়েছিলেন।' রজনীবাবু জিগ্যেস করলেন, 'বড়দাদুকে কি কেবল স্বপ্নেই দেখতে পান? আমার মতো চাক্ষুষ দেখেননি।'

অনবরত সাধু খাঁ মাথা নাড়লেন, 'না। কেবল স্বপ্নেই মাঝে মাঝে তাঁকে দেখি।' রজনীবাবু আর একটা সিগারেট ধরালেন, 'একটা জিজ্ঞাসার এখনও নিরসন হয়নি।' অনবরতবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কী জিজ্ঞাসা?' রজনীবাবু বললেন, 'ওঁর মৃত্যু কী ভাবে হয়!' অনবরতবাবু বললেন, 'একশো বছর আগেকার ব্যাপার। তবে বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছি এই নদীর ধারে বসে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ এই নদীর জলে পড়ে যান। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল ওই দিনই মহাত্মা গিরিশচন্দ্র দেহরক্ষা করেন।' রজনীবাবু বললেন, 'কোন মাসের কত তারিখে আপনার বড়দাদু মারা যান তা কি জানা আছে!' অনবরতবাবু বললেন, 'ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখে।' রজনীবাবু বললেন, 'হ্যাঁ ওই মাসের ওই তারিখে গিরিশবাবু দেহরক্ষা করেন। সালটা উনিশশো বারো। একশো বছর হল বইকি।'

পরের দিন হরিকে নিয়ে রজনীবাবু কলকাতায় ফিরলেন। নিরন্তরবাবুর রহস্যের সমাধান হলেও মনে একটা খুঁত থেকে গেল। ময়দানের ওই তিনটি লোক সম্পর্কে। অনবরতবাবু ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে সেদিন বিকেলে অনবরতবাবুকে ফোন করে ওই তিনটি লোকের কথা সবিস্তারে বললেন। অনবরতবাবু বললেন, 'ওরা তিনজন আলাদা আলাদা যাত্রাদলে বেহালা বাজাত। ন্যাড়া লোকটা একবার ঘেঁটুপুরে আমার কাছে এসেছিল। ওদের দশপানি যাত্রাপার্টিতে যদি জয়েন করি। দলের অধিকারী বলে পাঠিয়েছিলেন। অনেক টাকা মাইনে। রাজি হইনি। পরের ব্যাপারটা ভারী দুঃখের। রাজভবনের কাছে বাসে চাপা পড়ে নাকি তিনজনেই মারা যায়। মনে হয় ময়দানে ওদের সেদিন দেখেছিলেন সেদিনই সন্ধের পরে ঘটনাটা ঘটে।'

সন্ধেবেলায় রজনীবাবু কিংকর বর্মনকে ফোন করলেন, 'কাল বেলার দিকে আসবেন। পুজোর গল্প পেয়ে যাবেন।'

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত এগারোটায় রজনীবাবু নিরন্তর সাধু খাঁর গল্পটা লিখতে শুরু করলেন।

শারদীয়া ১৪১৯

স্বামীজীর ভূতদর্শন

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়পুর থেকে যাত্রা করেছেন স্বামীজী খেতড়ি অভিমুখে। দীর্ঘপথ চলেছেন উটের গাড়িতে। সঙ্গে রাজাসাহেব ও তাঁর অমাত্যবর্গ। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় তাঁরা হাজির হলেন পিথমপুরীগঞ্জে। এটা মরুভূমির মাঝে এক 'পড়াওয়ে' অর্থাৎ পান্থশালা। দোকানপাট সবই আছে। আছে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও। যানবাহী পশুদেরও আস্তাবল আছে। মহারাজা স্বামীজীর বিশ্রামের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। নৈশভোজ শেষ হলে সকলে শয্যা নিলেন। স্বামীজীও ঢুকলেন তাঁর ঘরে।

মরুভূমির রাত্রি গাঢ় হল। দিনের বেলা ভীষণ গরম হলে রাত্রে হাওয়া বয় সেখানে। অনেকটা স্বস্তি। সারাদিন গরমে কষ্ট পেয়েছেন খুব, তাই শুয়েই স্বামীজী একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। হঠাৎ যেন শুনতে পেলেন সশব্দে ঘরের পাল্লা দুটো খুলে গেল। হাওয়ার বেগ ঘরটা ভরিয়ে দিল। স্বামীজী ভাবলেন, তাড়াতাড়িতে হয়তো দরজায় খিল দেওয়া হয়নি; সেই কারণেই হাওয়ার বেগে পাল্লা দুটো খুলে গেছে। তিনি এ ব্যাপারে আর চিন্তিত হলেন না। ঘুমাতে চেষ্টা করলেন।

কিছুক্ষণ কাটল। তারপর দেখলেন, দরজার পাল্লা দুটো আবার সশব্দে এঁটে গেল। এবারও চিন্তিত হলেন না। ভাবলেন হাওয়ার বেগেই দরজার পাল্লা দুটো যেমন খুলে গিয়েছিল, হাওয়ার বেগেই তারা এঁটে গেছে। ভালোই হয়েছে। তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চাইলেন।

ঘুম কিন্তু এল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলেন, কারা যেন তাঁর চৌকিটা নড়াচ্ছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। আর কোনো কম্পন নেই। ভাবলেন—মনের ভুল। আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই চৌকির কম্পন। এবার একটু চিন্তিত হলেন। কিন্তু উঠলেন না। ক্রমে চৌকির কম্পনবেগ বাড়তে লাগল। আর থাকতে না পেরে চৌকি থেকে মেঝেতে নামলেন। ঘরের লণ্ঠনটি নিয়ে ঘরের ভিতরের চারপাশ লক্ষ করতে লাগলেন। কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন এবং ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলেন। কিছুটা সময় কাটতেই বাইরে থেকে ফিসফিস আওয়াজ তাঁর কানে এল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জানলার দিকে তাকাতে চাইলেন কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। তন্দ্রাচ্ছন্নই আছেন, হঠাৎ মনে হল কারা যেন জানলার কাছে এসে জমায়েত হয়ে তাঁকে কিছু বলছে। তন্দ্রা কাটিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, কে তোমরা? স্পষ্টভাবে জানলার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না।

আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন। স্বপ্নের ঘোরে দেখলেন, আবার জানলার কাছে কতকগুলো মুখ—কেমন যেন কালো কালো বিকৃত আকারের—তাদের মাথায় চুল নেই। তারা যেন বলছে, স্বামীজী, আমরা বড় কষ্টে আছি, আমাদের উদ্ধার করুন, আমাদের কৃপা করুন। স্বামীজী স্বপ্নের ঘোরেই প্রশ্ন করলেন, তোমরা কারা? কী

চাও? ততক্ষণে স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেছে। বিছানায় উঠে বসেছেন। তারপর দরজা খুলে বাইরে এলেন। চারদিকে তাকালেন, কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না।

ততক্ষণে রাত্রি অবসানের মুখে। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে পুবের আকাশে। বাইরে পায়চারি করতে লাগলেন স্বামীজী। সকাল হতে না হতেই রাজভৃত্য চা নিয়ে হাজির হল স্বামীজীর ঘরে। চা পান করেই স্বামীজী ছুটলেন পান্থশালার মালিকের কাছে। তাঁর কাছে রাত্রের ঘটনা বিবৃত করে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো? পান্থশালার মালিক জানালেন, কয়েক বছর আগে এক শীতের রাত্রে একটি পরিবারের সকলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। তারা ছিল স্বামী-স্ত্রী ও একটি বাচ্চা। তাদের অতৃপ্ত আত্মাই আপনার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করেছে।

পান্থশালা মালিকের কথাগুলো শুনতে শুনতে স্বামীজীর মুখ বিষণ্ণতায় ভরে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করলেন।

শারদীয়া ১৪২০

তথ্যসূত্র ঃ * স্বামী বিবেকানন্দ (২য় ভাগ) প্রমথনাথ বসু, উঃ কাঃ ২০১২। পৃঃ ১৯৪

* স্বামীজীর পরিচিত মুসারফ খানের দৌহিত্র ৮০ বছরের প্রবীণ খেতড়ি নিবাসী আবদুল হামিদের প্রদত্ত তথ্য থেকে। এ ঘটনা তিনি তাঁর মায়ের কাছে শুনেছেন।

জেনুইন বন্ধু

শুভমানস ঘোষ

সন্ধের মুখে-মুখে ঘটনাটা ঘটল, দীপ্তাগ্নিবাবু দেখলেন, রেললাইনের ধার দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসছেন শিবাংশু প্রামাণিক। আজও শিবাংশুর পরনে ধুতি, পাঞ্জাবির ওপর খয়েরি বর্ডারের আনকোরা নতুন সাদা শাল, মাথায় কালো কুচকুচে চুলের নকলে তৈরি টুপি।

কালও এই পোশাকে গঙ্গার ধারের ইভনিং আড্ডায় এসেছিলেন ভদ্রলোক, দেখে দীপ্তাগ্নিবাবু রসিকতার লোভ সামলাতে পারেননি, বলেছিলেন, করেছিস কী শিবু, তোকে চেনাই যাচ্ছে না। শালটা কে কিনে দিল? ছেলে? আর টুপিটা? বউমা?

আড্ডার বয়স্ক সদস্যরা হেসে উঠেছিলেন। নতুন শাল আর টুপি পরে এমনিতেই একটু অস্বস্তিতে ছিলেন শিবাংশু, আরও গুটিয়ে গেলেন, হে-হে করে হেসে ম্যানেজ করতে গেলেন, দাঁড়াল না, দীপ্তাগ্নিবাবু আবার খোঁচা দিলেন, যত বয়েস বাড়ছে তত তুই ইয়াং হচ্ছিস শিবু। হঠাৎ এত সাজগোজের ঘটা? ব্যাপারটা কী বল তো?

শিবাংশু ফ্যাকাশে হেসে জানিয়েছিলেন, রাতে একটা বিয়েবাড়ি আছে, ছেলে-বউমাকে নিয়ে গাড়ি এখান থেকেই তাঁকে তুলে নেবে, তাই একেবারে রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

তাই বল্‌, বিয়েবাড়ি! দীপ্তাগ্নিবাবু আবারও মন্তব্য জুড়েছিলেন, আছিস ভালো!

এবার আর খোঁচাটা হজম হয়নি শিবাংশুর, আচমকা চেহারাটা বদলে গিয়েছিল তাঁর, রাগে জ্বলে উঠে বলেছিলেন, কেন তোর হিংসে হচ্ছে?

দীপ্তাগ্নিবাবুর একটাই ছেলে, বিয়ে-থা করে সে আলাদা, বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ফলে কথাটা তাঁর গায়ে লেগে যায়, তিনি পাল্টা রুখে ওঠেন, কতদিনের বন্ধু তাঁরা, সব ভুলে দুই প্রৌঢ় বিশ্রীভাবে ঝগড়া করতে শুরু করেন, দেখতে-দেখতে হাতাহাতি পর্যন্ত গড়িয়ে যায় তা, একেবারে ঢি-ঢি পড়ে যায় চারদিকে।

ঘটনাটার পর আর সেখানে দাঁড়ানোর মুখ ছিল না দীপ্তাগ্নিবাবুর, বাড়ি ফিরে মোবাইল আর ল্যাণ্ড দুটো টেলোফোনই অফ করে না খেয়ে সকাল-সকাল লেপ টেনে শুয়ে পড়েছিলেন। রাগে একেবারে ফুঁসছিলেন। মনে মনে বলছিলেন, জীবনে আর সম্পর্ক রাখব না শিবাংশুর সঙ্গে, মুখদর্শনও করব না বদমাশটার।

তাই গেলেই পাছে মুখটা দেখতে হয় বন্ধুর, আজ বিকেলে আর গঙ্গার ধার মাড়াননি দীপ্তাগ্নিবাবু, গঙ্গা থেকে পাক্কা দু'কিলোমিটার দূরের রেললাইনের ধারটাই বেছে নিয়েছিলেন ইভনিং ওয়াকের জন্য। গঙ্গার ধারে সব সময় মানুষের মেলা, সেই তুলনায় এদিকটা বেশ নির্জন ও খোলামেলা, অজস্র ঝোপঝাড়, গাছপালা, পাখপাখালি।

জায়গাটা মর্নিং ওয়াক বা ইভনিং ওয়াকের পক্ষে আইডিয়াল হলেও ওয়াকারদের এদিকটায় আসা-যাওয়া নেই বললেই চলে, কারণ, ট্রেনের শব্দ। ঘরের নিত্য ক্যাচর-ম্যাচরের হাত থেকে রেহাই পেতে বাইরে বেরিয়েও আবার ট্রেনের ঝড়াং-ঝড়াংয়ের মুখে পড়তে কেউ রাজি নয়।

দীপ্তাগ্নিবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। কী ব্যাপার, গঙ্গা ছেড়ে তাঁর পিছন-পিছন বন্ধুও এখানে? তবে

কি তাঁর এখনও রাগ মেটেনি, ফয়সালা করতে এসেছেন? দেখতে দুবলা-পাতলা হলেও কাল হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন শিবাংশুর গায়ে কী সাংঘাতিক জোর, রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে অ্যায়সা একখানা ঘুঁষি হাঁকড়েছিল! ভাগ্যিস সময়মতো মুখটা সরিয়ে নিয়েছিলেন, কানের এক ইঞ্চি ওপরে পড়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত নড়িয়ে দিয়েছিল, এখনও জায়গাটা টনটন করছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল দীপ্তাগ্নিবাবুর। নাহ্, আজ আর একতরফা মার খাবেন না, পাল্টা দিয়ে দেবেন, জান কবুল!

কিন্তু কোথায় কী, শিবাংশু সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তার পর হাঁফ ছেড়ে বললেন, এই যে দীপু, তোকেই খুঁজছিলাম। কাল রাগের মাথায় কী করতে কী করেছি, বড্ড লজ্জায় পড়ে গিয়েছি রে! আমায় ক্ষমা কর ভাই।

দীপ্তাগ্নিবাবু একটু যেন ঘাবড়েই গেলেন, অ্যাঁ!

হ্যাঁ। অনুশোচনায় ভেঙে পড়লেন শিবাংশু, কতকালের বন্ধু আমরা। গঙ্গার ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে আনন্দ করে কাটিয়েছি, একে অন্যের বাড়িতে গিয়েছি, সারারাত তাস খেলেছি, ফিস্টি করেছি, কাজে-অকাজে, দায়ে-অদায়ে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, অথচ কাল—আরে ছি ছি! মাফ করে দে ভাই।

দীপ্তাগ্নিবাবুর সমস্ত বিরূপ ভাব কেটে গেল, তিনিও 'এ কী বলছিস' বলে লজ্জিত গলায় বললেন, তুই একা ক্ষমা চাইছিস কেন শিবু, আমারও দোষ ছিল, তোর হাই প্রেশার, আমারই উচিত হয়নি তোকে ওইভাবে খোঁচা দেওয়া। ইস, কাল রাগের মাথায় তোর গালটা কী বিশ্রীভাবে আঁচড়ে দিয়েছি।

আরে ওটাই তো সব গোলমাল করে দিল। ভেবেছিলাম চেপে যাব, ধরা পড়ে গেলাম ছেলের কাছে। শিবাংশু দুঃখিত গলায় মাথা নাড়িয়ে বললেন, ছেলে আর তার বউ রেগেই আগুন, টানতে টানতে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন, বিয়েবাড়ি মাথায় রইল, ছেলের কাছে গালাগালি খেতে-খেতে শেষ!

ছি ছি ছি। দীপ্তাগ্নিবাবুর মনে হল মাটিতে মিশে যান।

ছেলেপুলে থেকেও যে নেই তুই বেঁচে গিয়েছিস দীপু, ছেলেপুলের অনেক জ্বালা। বলতে-বলতে গলার স্বর খাটো করে শিবাংশু জুড়লেন, জানিসই তো, ছেলে আমার সুবিধের নয়, সব শুনে তখনই থানায় যেতে চাইছিল, অনেক কষ্টে আটকেছি।

দীপ্তাগ্নিবাবু নার্ভাস হয়ে গেলেন, কে-কেন? দেবু থানায় যেতে চাইছিল কেন?

উত্তরে শিবাংশু যা জানালেন ভয় ধরে গেল দীপ্তাগ্নিবাবুর, দেবুকে কাল আটকানো গেলেও তার যা ভাব দেখছেন শেষমেশ আটকানো যাবে না, এর মধ্যে থানায় গিয়ে দীপ্তাগ্নিবাবুর নামে এফআইআর করে এসেছে কিনা তাই-বা কে জানে।

রেললাইনে ট্রেন এসে গেল, লাইনের সঙ্গে চাকার তীক্ষ্ণ শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। নাহ্, কাল বড্ড কাঁচা কাজ হয়ে গিয়েছে, বন্ধুর সঙ্গে মারপিট করে এই বয়েসে জেলে গেলে আর দেখতে হবে না, লোক এমনিতেই হাসছে, এরপর ঢিল ছুড়বে, কাদা ছেটাবে গায়ে। এ কী বিপদে পড়লাম রে বাবা! টেনশনে হাতের তালু ঘেমে উঠল দীপ্তাগ্নিবাবুর।

তবে তুই ঘাবড়াস না দীপু। ট্রেন চলে যেতে শিবাংশু আশ্বস্ত করলেন দীপ্তাগ্নিবাবুকে, আমি এর একটা উপায় করেছি।

অকূলে কূল পেলেন দীপ্তাগ্নিবাবু, কী? কী?

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

থানায়। তুই আমার এতদিনের বন্ধু, তোর ক্ষতি আমি কিছুতেই হতে দেব না।

কী করবি তুই? তবু গলা কাঁপছে দীপ্তাগ্নিবাবুর।

আরে টেনশন করছিস কেন? শিবাংশু প্ল্যানটা পরিষ্কার করলেন, চল দুই বন্ধু একসঙ্গে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে আসি, দেবু যদি কমপ্লেন করতে আসে যেন অ্যাকশন না-নেওয়া হয় এই বলে চেপে দিয়ে আসি পুলিশকে।

বুকের ভার সামান্য নামল দীপ্তাগ্নিবাবুর, তবু মনটা খচখচ করছে, বলবেন কি বলবেন না করে বলেই ফেললেন কথাটা, পুলিশ বলে কথা, মুখের কথায় কি কাজ হবে শিবু?

হবে না বলছিস? শিবাংশু কাঁধ ঝাঁকালেন, তা হলে লিখিত দিয়ে আসব, দুই বন্ধুর জয়েন্ট পিটিশন, তুই রাজি?

সব সংশয় চলে গেল দীপ্তাগ্নিবাবুর, শিবাংশুর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে শিবাংশুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুই আমার সত্যিকারের বন্ধু শিবু!

বলছিস? শিবাংশু হা-হা করে একচোট হেসে গম্ভীর হয়ে গেলেন, মাথা নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, কাল আমরা দুই সিনিয়ার সিটিজেন বন্ধু গঙ্গার ঘাটে যা করেছি তার পর থেকে বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলাম, একেবারে মরমে মরে ছিলাম, বুঝলি?

আর বলিস না! দীপ্তাগ্নিবাবুও বললেন, যত বয়েস বাড়ছে তত আমরা ছেলেমানুষ হচ্ছি! লজ্জা! লজ্জা!

তোকে নিয়ে বড্ড চিন্তা ধরে গিয়েছিল রে দীপু, এতক্ষণে একটু হালকা হল বুকটা, আহ্! শিবাংশু হাত ধরে টানলেন বন্ধুর, চল!

চল!

কর্কশ শব্দে আকাশ ফালা-ফালা করে ছুটে এল এক্সপ্রেস ট্রেন। দীপ্তাগ্নিবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বুকের বোঝা তাঁরও নেমে গিয়েছে। খুব ভালো লাগছিল! খুব! বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়ার পর ভাব হলে কী যে ভালো লাগে!

দুই

কিন্তু কোথায় স্বস্তি? কোথায় ভালো-লাগা? সেদিন মাঝরাতেই সদর দরজায় কড়া-নাড়ার বিকট শব্দে ঘুমটা ভেঙে খান-খান হয়ে গেল দীপ্তাগ্নিবাবুর। একমাত্র ছেলে থেকেও নেই, স্ত্রীও বাপের বাড়ি গিয়েছেন, কাল সকালে ফিরবেন, অন্য সময় বন্ধু শিবাংশুকে ডেকে এনে সারারাত দুই বন্ধু তাস খেলেন, আড্ডা দেন, কিন্তু কালই এতবড় কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, তাই থানা থেকে বেরিয়ে কথাটা বলবেন-বলবেন করে বলা হয়নি।

কিন্তু এত রাতে কে? তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে ছুটে দরজায় গিয়ে হাঁকলেন দীপ্তাগ্নিবাবু, কে?

বাইরে থেকে ভারী গলায় কেউ সাড়া দিলেন, দরজা খুলুন! আমরা পুলিশ।

পুলিশ! থানায় গিয়ে জয়েন্ট পিটিশন দিয়ে আসার পরও পুলিশ? কাঁপা-কাঁপা বুকে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে কয়েকজন উর্দিপরা লোক ঘরে ঢুকে এলেন, তাঁদের মধ্যে কালো ও খেঁকুরে চেহারার থানার মেজোবাবুকে চিনলেন দীপ্তাগ্নিবাবু, বিকেলে শিবাংশুর সঙ্গে থানায় গিয়ে তাঁর হাতেই পিটিশন দিয়ে এসেছেন তাঁরা।

আ-আপনি স্যার?

হ্যাঁ আমি। মুখ থমথম করছে মেজোবাবুর, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দাঁড়ানো কন্সটেবলকে অর্ডার করলেন, যাও গাড়ি থেকে দেবার্থীবাবুকে নিয়ে এসো।

কে দেবার্থীবাবু? বলেই দীপ্তাগ্নিবাবুর মনে পড়ে গেল, বললেন, দেবু—শিবাংশু প্রামাণিকের ছেলে?

রাইট। মেজোবাবু তীক্ষ্ণচোখে দেখছেন।

তবে কি পিটিশনে কাজ হয়নি? দেবুর প্রেশারে পুলিশ ছুটে এসেছে তাঁকে ধরে গারদে ভরে দেওয়ার জন্য? কিন্তু এতবড় বাড়ি ফাঁকা ফেলে কী করে যাবেন এখন পুলিশের সঙ্গে? সব চোরে লুটেপুটে নেবে যে। কেন যে লজ্জায় পড়ে আজ শিবাংশুকে তাঁর সঙ্গে থাকতে বললেন না! দীপ্তাগ্নিবাবুর মনে হচ্ছিল, মাথার চুল ছেঁড়েন, গলা ফাটিয়ে কেঁদে ওঠেন! কাল গঙ্গার ঘাটে এ কী সর্বনাশা কাণ্ড ঘটিয়ে এসেছেন।

ভাবতে-ভাবতে ঘরে এসে দাঁড়াল শিবাংশুর ছেলে দেবু। তার দিকে চেয়ে দীপ্তাগ্নিবাবু জোর ধাক্কা খেলেন। দেবুর পরনে কাছা, তীব্র শোকে মুখখানা কালো হয়ে আছে। তার বাবা মারা গিয়েছেন।

বাবা! বলো কী! দীপ্তাগ্নিবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আরে বিকেলেই তো তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।

ও। পলকে দেবুর মুখখানা মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল, দীপ্তাগ্নিবাবুর দিকে চেয়ে ভয়ার্ত গলায় প্রশ্ন করল, দীপকাকা, বাবার সঙ্গে বিকেলে সত্যি-সত্যি আপনি থানায় গিয়েছিলেন জয়েন্ট পিটিশন দিতে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দীপ্তাগ্নিবাবু বললেন, শিবুই তো নিয়ে গেল আমায়। এই তো মেজোবাবু সাক্ষী আছেন।

ঘাড় দুলিয়ে সায় দিলেন মেজোবাবু দেবুকে বললেন, কী বলেছিলাম দেবার্থীবাবু, এবার বিশ্বাস হল তো? আপনার বাবাই চাননি আপনি দীপ্তাগ্নিবাবুর বিরুদ্ধে এফআইআর করুন।

দীপ্তাগ্নিবাবু চমকে উঠলেন, অফিসারের দিকে চেয়ে ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করলেন, ও কি আমার নামে এফআইআর করেছে?

করেননি, তবে করতে গিয়েছিলেন। মেজোবাবুর মুখ থেকে গাম্ভীর্য খসে পড়ল, চঞ্চলভাবে চারপাশটা দেখে নিয়ে গলা খাটো করে বললেন, বাবার সৎকার করে শ্মশান থেকে এই একটু আগে উনি ডাইরেক্ট চলে আসেন থানায় আপনার নামে এফআইআর করতে। আমি দেখিয়ে দিলাম আপনাদের পিটিশন, কিন্তু বিশ্বাসই করতে পারলেন না, তখন আমিই বললাম, বিশ্বাস না হয় চলুন দীপ্তাগ্নিবাবুর বাড়ি।

দীপ্তাগ্নিবাবুর মনে হল, বুকটা ব্যথা-ব্যথা করছে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন মেজোবাবুর দিকে, আপনিও বলছেন শিবু মারা গিয়েছে? আমার এতদিনের একজন বন্ধু মারা গেল একটা খবর পর্যন্ত পেলাম না?

মেজোবাবু বিষণ্ণভাবে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, কী করে পাবেন? শুনলেন তো, ইনি তাঁর বাবার মৃত্যুর জন্য আপনাকেই দায়ী করেছেন। কাল আপনারা ঝগড়া-মারপিট করেছিলেন না?

হ্যাঁ করেছিলাম। একশোবার করেছিলাম। দীপ্তাগ্নিবাবু আচমকা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, দেবুর দিকে চেয়ে ঘোরের মাথায় বলতে থাকলেন, শোনো দেবু, যতই আমরা লড়াই-ঝগড়া করি না কেন, আমরা কিন্তু পরস্পর পরস্পরের বন্ধুই ছিলাম, জেনুইন বন্ধু। তোমার বাবা আমাকে কতটা ভালোবাসতেন বিশ্বাসই করতে পারবে না।

'কিন্তু দীপকাকা আমিই বা বিশ্বাস করি কী করে?' বলে দেবু যা জানাল, অকল্পনীয়; কাল

গঙ্গার ঘাটে দীপ্তাগ্নিবাবুর সঙ্গে ঝগড়ার ঘটনার পরই বাড়ি ফিরে মাঝরাতে শিবাংশু অসুস্থ হয়ে পড়েন, সকালে টের পেয়ে দেবুরা তাঁকে নার্সিংহোমে শিফট করে, কিন্তু লাভ হয় না, দুপুর তিনটে নাগাদ শিবাংশু মারা যান। যে-মানুষটা দুপুর তিনটেয় মারা যান, তিনিই বিকেলে দীপকাকার সঙ্গে থানায় যান কী করে?

ভয়ে-বিস্ময়ে চেয়ার থেকে যেন ছিটকে পড়ে যাবেন বলে মনে হল দীপ্তাগ্নিবাবুর, চিৎকার করে উঠলেন, দুপুর তিনটেয়? আজ দুপুর তিনটেয়?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে দেবু একচোখ অবিশ্বাস নিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। দীপ্তাগ্নিবাবুও চেয়ে আছেন, চেয়ে আছেন। চেয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তাঁর মনে হল, সিনিয়র সিটিজেন বন্ধুর দয়ায় থানা যখন এফআইআর নেয়নি, বাড়ি ফেলে রাতবিরেতে পুলিশের সঙ্গে যেতে হবে না, বাড়িতেই থাকতে হবে তাঁকে। কিন্তু ঘটনা হল, আজ বাড়িতে গিন্নি নেই, ফাঁকা বাড়িতে এরপর তাঁর রাতটা কাটবে কী করে? পুরনো দিনের মতো জেনুইন বন্ধুর সঙ্গে তাস খেলে?

আস্তে-আস্তে দীপ্তাগ্নিবাবুর চোখ দুটোও স্থির হয়ে এল।

শারদীয়া ১৪২১

লাল পাথরের আংটি

চঞ্চল কুমার ঘোষ

সম্বলপুর স্টেশনে বসেছিলাম। লাইনে কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে, ট্রেন আসতে একঘণ্টা দেরি। সন্ধে হয় হয়। অল্প কিছু লোকজন ছাড়া গোটা স্টেশন চত্বরটাই ফাঁকা। চারদিক নিঃঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশ। চুপচাপ এইভাবে বসে থাকাটা কীরকম যন্ত্রণাদায়ক ভুক্তভোগী ছাড়া কারো পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। একটা পুরোনো খবরের কাগজ, ইতিমধ্যে বার দুয়েক পড়া হয়েছে সেটাতেই আবার মনোনিবেশ করলাম।

মনে হচ্ছে বাঙালি?

অপরিচিত কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে তাকালাম। রোগা লম্বা, আধময়লা রং, কাঁচাপাকা দাড়ি, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমি কিছু জবাব দেবার আগেই ভদ্রলোক পাশে বসে পড়লেন। খবরের কাগজটা বন্ধ করে বললাম, কী করে বুঝলেন আমি বাঙালি?

ভদ্রলোক আমার হাতের কাগজটার দিকে আঙুল তুলে মুচকি হেসে জবাব দিলেন, ওটা দেখে। বাঙালি না হলে এই ওড়িয়া দেশে কে বাংলা কাগজ পড়বে।

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গি দেখে মনে হল মিশুকে মানুষ। ভালো লাগল। সময় কাটাবার মতো কাউকে পাওয়া গেল। বললাম, এদিকে কোথায়।

যাব বলাঙ্গীর। আপনি?

আমি কলকাতায় ফিরব। অফিসের কাজে এসেছিলাম। প্রথম এলাম। তা আপনি কি এদিকেই থাকেন? আলাপটা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

ভদ্রলোক বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সেরকমই বলতে পারেন। চাকরিসূত্রেই আসা। প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল।

কোথায় চাকরি করতেন?

এই সম্বলপুরে এক জঙ্গল ইজারাদারের ম্যানেজার।

জঙ্গলের চাকরি, তাহলে তো অভিজ্ঞতা অনেক।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, অভিজ্ঞতা, সে বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে।

সিগারেটে টান দিয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন মানুষটা। মনে হল আরেকটু নাড়াচাড়া দিলেই ভদ্রলোকের কাছে ঘণ্টাখানিক সময় কাটাবার মতো রসদ পাওয়া যাবে। বললাম, যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, বলুন না জীবনের কোনও আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা।

ভদ্রলোক চুপ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলাম আমার কথায় ভাবতে আরম্ভ করেছেন। খানিকপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, পর পর সিগারেটে বেশ কয়েকটা টান দিয়ে বললেন, একটা ঘটনা, এমন ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে বিশ্বাস করতে পারি না, কিন্তু ঘটেছিল।

বেঞ্চির ওপর পা তুলে আরাম করে বসলাম। আকাশে আঁধারের ছায়া। দিন শেষে পাখিরা

ঘরে ফিরছে। সামনের একটা গাছে তাদের কলরব। কয়লা বোঝাই একটা মালগাড়ি লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক শুরু করলেন ঃ

ঘটনাটা ঘটেছিল খ্যাংরাপালির ডাকবাংলোয়। খ্যাংরাপালি হচ্ছে ডুংরিপালির পরের স্টেশন। ওড়িশায় পালি মানে গ্রাম। সম্বলপুর থেকে ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। ওড়িশার সবচেয়ে বড় নদী—মহানদীর তীরে পুরোনো শহর সম্বলপুর। দেবী শ্যামলাইয়ের নামে শহরের নাম। মাঝখানে বুড়োরাজা পাহাড়ে শিবের মন্দির। স্টেশনের কাছেই তখন আমাদের ডিপো। জঙ্গল থেকে কাঠ এনে সেখানে চেরাই করে রেলের ওয়াগানে ভরে নানান জায়গায় পাঠানো হত। আমার ওপর সব দেখা-শোনার ভার।

একদিন আমার মালিক ঘোষবাবু খবর পাঠালেন, খুব জরুরি দরকার, চলে এসো। ভোরের ট্রেনে বেরিয়ে পড়লাম। চক্রধরপুরে ঘোষবাবুর বাড়ি। বাতের ব্যথায় পনেরো দিন ধরে ভদ্রলোক শয্যাশায়ী। দুপুর নাগাদ চক্রধরপুরে পৌঁছলাম। স্নান-খাওয়া সারা হতেই ঘোষবাবু বললেন, তোমাকে বলাঙ্গীর যেতে হবে। বলাঙ্গীরের মহারাজা একটা জঙ্গল লিজ দেবেন। অন্য কেউ নেবার আগেই তুমি গিয়ে কথাবার্তা বলে টাকা দিয়ে বায়না করে এসো। একটু সুস্থ হলেই আমি বাকি টাকা পৌঁছে দিয়ে আসব।

পরদিন সকালে সুটকেস ভর্তি টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ট্রেনে চক্রধরপুর থেকে সম্বলপুর। সেখান থেকে গাড়ি বদল করে বলাঙ্গীর। তখন সবে মাত্র মহানদীর ওপর রেলব্রিজ তৈরি হয়েছে। সারাদিনে দুটো গাড়ি আসে-যায়। সম্বলপুরে পৌঁছে হাতে কিছুটা সময় ছিল। বলাঙ্গীর যাওয়ার গাড়ি তখনও আসেনি। নিজের ডেরায় চলে গেলাম। স্নান সেরে জামাকাপড় পালটে স্টেশনে ফিরতেই বলাঙ্গীরের গাড়ি এসে পড়ল। একটা ফাঁকা বগিতে উঠে পড়লাম। ব্যাগ, সুটকেস রেখে আরাম করে বসতেই খেয়াল হল দুপুরের খাবার! কাজের ছেলেটা টিফিন কৌটোয় ভরে দিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে ঘরের বিছানার ওপরেই রেখে এসেছি। ট্রেন তখন মহানদীর রেলব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। অগত্যা পরের স্টেশন না আসা পর্যন্ত দু'পাশের পাহাড়-জঙ্গল দেখে সময় কাটাতে হবে। ট্রেন যখন বড়গড়ে এল খিদেয় পেটের মধ্যে একগণ্ডা ইঁদুর নাচানাচি করছে। এখানে ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। সুটকেস, ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়লাম। ছোট স্টেশন। দু'চারজন মানুষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। খাবারের কোনও দোকান চোখে পড়ল না। কুলি গোছের একজন লোক বলল, স্টেশনের বাইরে খাবারের দোকান আছে। দেখুন খোলা কিনা।

প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে একটু এগিয়ে কয়েকটা মাটির ঘর। সেখানেই মাঝবয়সি একটা বউ মুড়ি-তেলেভাজা বিক্রি করছিল। দেহাতি লোকেদের ভিড়। আমার ভদ্র পোশাক দেখেই বোধহয় দোকানি বলল, একটু দাঁড়ান বাবু। গরম গরম ভেজে দিচ্ছি।

গরম তেলেভাজা খেতে গিয়েই বিপত্তিটা ঘটল। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। চোখের সামনে ট্রেন চলে যাচ্ছে, আমার হাতে তেলেভাজা আর মুড়ি। হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছি। ট্রেনের লেজটুকু একটু একটু করে অদৃশ্য হতেই হুঁশ হল, বলাঙ্গীর যাওয়ার আর কোনও ট্রেন নেই। অচেনা-অজানা জায়গা। ভয়ের কথা সঙ্গে একবাক্স টাকা। ভাবনায় পড়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্মের লাগোয়া অফিস ঘর। টেবিলে বসে কাজ করছিলেন স্টেশনমাস্টার। গিয়ে বিপদের কথা বললাম, যদি কোনও একটা ব্যবস্থা করা যায়।

মাঝবয়সি শক্তসমর্থ চেহারার এক ভদ্রলোক স্টেশনমাস্টারের সামনে বসেছিলেন। স্টেশন-মাস্টার কিছু জবাব দেওয়ার আগেই ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় যাবেন?

বলাঙ্গীর।

স্টেশনমাস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন, শিবরামজী, আপনিও তো বলাঙ্গীর যাচ্ছেন। এনাকে নিয়ে যান।

শিবরাম নামের ভদ্রলোক কিছু ভাবলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কোনও অসুবিধে নেই। গাড়ি খালি যাচ্ছে, চলে আসুন।

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ধন্যবাদ।

স্টেশনমাস্টার হাসতে হাসতে বললেন, আপনার ভাগ্য ভালো, শিবরামজী এখানে কাজে এসেছিলেন। নয়তো কাল ভোরের আগে ট্রেন পেতেন না।

মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়ে শিবরামজীর সঙ্গে জিপে গিয়ে বসলাম। ফাঁকা রাস্তা। মানুষজনের বসতি নেই। দু'ধারে হালকা জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়। মাঝে মাঝে ছোট ছোট নদী। ব্রিজের ওপর থেকে দু'ধারে চোখে পড়ে শুধু বালি আর বালি, মাঝে নালার মতো সরু জলের রেখা।

ঘণ্টাখানিক গিয়েছি, হঠাৎ একটা ঝাঁকানি খেয়ে গাড়িটা রাস্তার একদিকে কাত হয়ে পড়ল। জোরে ব্রেক কষলেন শিবরামজী। সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনওরকমে সামলে নিলাম। ততক্ষণে গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়েছেন শিবরামজী। চাকার দিকে তাকিয়ে একরাশ বিরক্তি ফুটে উঠল মুখে। বিড়বিড় করে বললেন, টায়ার ফেঁসেছে। রাস্তার যা অবস্থা।

কী হবে এখন?

টায়ার আছে। চেঞ্জ করতে হবে। সময় লাগবে। কথা বলতে বলতেই শিবরামজী গাড়ির পেছন থেকে যন্ত্রপাতি বার করতে আরম্ভ করলেন।

আমার কিছু করবার নেই। গাড়ি থেকে নেমে একটা পাথরের ওপর বসে পড়লাম। আজ সকালে কার মুখ দেখেছি কে জানে। একটার পর একটা বিপত্তি। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত গিয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে তখনও আলোর আভা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা তখন আমার নেই। সঙ্গে এতগুলো টাকা। মহারাজের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। শিবরামজীর টায়ার পালটাতে পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল। যখন গাড়ি ছাড়ল দূরের পাহাড়গুলো অস্পষ্টতার মাঝে হারিয়ে গিয়েছে।

খানিকটা যেতেই রাত নেমে এল। বোধহয় অমাবস্যা। সামনের হেড-লাইটের আলো ছাড়া চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। গাড়ির দোলানিতে ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। আচমকা একটা বিচ্ছিরি আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শিবরামজী সিটের পেছনে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে হাত দুটো সামনে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, আবার টায়ার পাংচার।

আঁতকে উঠলাম। ক্যারিয়ারে একটাই স্পেয়ার টায়ার ছিল, সেটাই লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিবরামজী গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন। হাতে টর্চ। কে জানে ভদ্রলোক হয়তো ভাবছেন তাঁর কপালে একটা অপয়া লোক এসে জুটল, নয়তো দু'বার গাড়ির টায়ার ফাঁসে!

কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। চারপাশে এত অন্ধকার আর দম বন্ধ করা নিস্তব্ধতা, বুকের মধ্যে শিরশির করছিল।

শিবরামজী হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে আমার দিকে ফিরলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, এখানে একটা ডাক-বাংলো আছে। চলুন, এগিয়ে গিয়ে দেখি।

গাড়ি?

ও কেউ নেবে না। নিস্পৃহভাবে জবাব দিলেন শিবরামজী।

শিবরামজীর গাড়ি নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা না থাকলেও আমরা টাকার বাক্স নিয়ে দুর্ভাবনা বেড়েই চলেছে। তাড়াতাড়ি সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। সেই দুপুরে একঠোঙা

মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়েছি। খিদেটাও পেটের মধ্যে চনচন করছে। শিবরামজী বেশ জোরেই হাঁটছেন। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। কোথায় চলেছি কে জানে।

আধঘণ্টার মতো হেঁটেছি, রাস্তা ছেড়ে একটু দূরে চোখে পড়ল সাদা বাড়ি। একতলা, টিনের চাল, সামনে লম্বা বারান্দা। চারদিকে বাগান, তারের বেড়া দেওয়া। বড় লোহার গেট। গোটা বাড়িটাই অন্ধকার। কেমন গা ছমছমে ভাব। মানুষজন আছে বলে মনে হচ্ছিল না। একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ। শিবরামজী গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন। বারান্দার সামনে গিয়ে ডাক দিলেন, রঘুনাথ! রঘুনাথ!

একটু পরেই বাড়ির পেছন দিক থেকে লণ্ঠন হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল। মাঝামাঝি বয়েস। রোগা, লম্বা, বেতের মতো শরীরটা সামান্য বেঁকে গিয়েছে। সামনে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে শিবরামজীকে একবার দেখে নিয়ে বলল, কেমন আছেন বাবুজী?

ভালো। মাথা নেড়ে জবাব দিলেন শিবরামজী। রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। আজকের রাতটা আমার এই বন্ধুর জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

রঘুনাথ আমার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলল, আসুন বাবু। সব ঘর খালি। কোনও অসুবিধে হবে না।

শিবরামজী আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, আপনি যান। রঘুনাথ আমার অনেক দিনের চেনা। সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আপনি আসবেন না? জিগ্যেস করলাম আমি।

শিবরামজী একটু ইতস্তত করে বললেন, আমাকে সম্বলপুর যেতে হবে। পথচলতি লড়ি পেয়ে যাব। নতুন টায়ার এনে সকালের মধ্যে গাড়ি ঠিক করে নেব। আপনি থাকুন, আমি ঠিক সময়ে এসে আপনাকে তুলে নেব।

শিবরামজী চলে যেতেই রঘুনাথ লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলল, এদিকে আসুন, বাবু।

বারান্দায় উঠতেই গাটা ছমছম করে উঠল। লণ্ঠনের আলোটা চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে কেমন বেমানান মনে হচ্ছে। পর পর ঘর। গোটা বাড়িটাকে ঘিরে বারান্দা। কয়েকটা কাঠের চেয়ার পাতা। একটা ঘর খুলে দিল রঘুনাথ। বাইরে থেকে যা ভেবেছিলাম ভেতরটা তার চেয়েও সুন্দর। পাশাপাশি দু'খানা খাট পাতা। একদিকে চেয়ার-টেবিল। বড় কাঠের আলমারি। জানলায় পর্দা দেওয়া।

রাতে কী খাবেন, বাবু? রঘুনাথ জিগ্যেস করল।

এখন আর খাবারের বাদবিচার করবার মতো অবস্থা নেই। বললাম, তুমি যা খাবে তাই খাব।

লণ্ঠনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চলে গেল রঘুনাথ। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। জনমানবহীন এই ডাকবাংলোয় আমাকে কেউ খুন করে চলে গেলেও কেউ জানতে পারবে না। সুটকেসটা আলমারিতে রাখলাম। পাশেই জানলা। পর্দা সরাতেই দেখলাম বাগানের মধ্যে বড় ইঁদারা। রঘুনাথ জল তুলছে। আমাকে দেখে বলল, বাবু, আপনার চানের জল।

কনকনে ঠাণ্ডা জল। মাথায় ঢালতেই শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। সারাদিনের ধকলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুতেই শুতেই ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ একটা অদ্ভুত আওয়াজ আর অস্বস্তির মধ্যে ঘুমটা ভেঙে গেল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন একটা মানুষের আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে যেমন হয়। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল স্বাভাবিক হতে। আমি কোথায় শুয়ে আছি বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বিছানায় উঠে বসে চারদিকে তাকাতেই গতদিনের সব ঘটনা মনে পড়ে গেল। গাড়ি খারাপ হয়ে

এই ডাকবাংলোয় এসে উঠেছি। একটা শব্দ ভেসে আসছিল। কান খাড়া করে সেই শব্দটা শোনবার চেষ্টা করলাম। খুব হালকা অস্পষ্ট। একটু পরেই ধীরে ধীরে শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। কেউ যেন দূর থেকে ছুটে আসছে। ঝুম ঝুম শব্দ বাতাসে ভেসে উঠছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। তারাভরা এক টুকরো আকাশ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।

একটু চুপ করে বসে রইলাম। শব্দটা এবার পরিষ্কার। কোনও মেয়ের পায়ের নূপুরের শব্দ। বারান্দা পেরিয়ে আমার ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে গেল। তারপরই দরজায় খুট খুট। খুব জোরে নয়, কিন্তু বার বার। মনে হচ্ছে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একলাফে বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

কে?

দরজাটা খুলুন, আমার খুব বিপদ।

কোনও মেয়ের স্পষ্ট গলার স্বর। চমকে উঠলাম। এত রাতে একটা মেয়ে এই নির্জন ডাকবাংলোয়! কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি তো! সঙ্গে এত টাকা। যার যাই হোক, আমি দরজা খুলব না।

আবার দরজায় ঠক ঠক শব্দ, আবার সেই করুণ আর্তনাদ—আমাকে বাঁচান। ওরা আসছে।

কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যদি সত্যি মেয়েটার বিপদ হয়! স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথা চিন্তা করব? মনে মনে একটা খচখচ ভাব জেগে উঠল। এক সময় সব সংশয়টুকু ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমার যা হয় হোক মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে।

দরজা খুলে দিলাম। কিছু বোঝার আগেই ঝড়ের বেগে একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল। উনিশ-কুড়ির বেশি বয়েস নয়। একপলক দেখেই মনে হল বড় ঘরের মেয়ে। দামি সাজ-পোশাক পরা। উত্তেজনা আর আতঙ্কে চোখ-মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়েটা বলল, শয়তানগুলো আমার পিছু নিয়েছে। আজকের রাতটুকু আপনার ঘরে থাকতে দিন। সকাল হলেই চলে যাব।

মেয়েটা কে, কোথা থেকে এসেছে, কিছুই জানি না। বললাম, তুমি কে?

মেয়েটা এক ঝটকায় দরজা বন্ধ করে ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, চুপ, কথা বলবেন না। ওরা শুনতে পাবে।

বুঝতে পারলাম মেয়েটা এ ঘরে আছে কাউকে জানাতে চায় না। জানলাটা বন্ধ করে লণ্ঠনটা তুলে ধরতেই চমকে উঠলাম। মেয়েটা যেন গয়নায় মোড়া। গায়ের ওড়নটা সরে গিয়েছে। ফিকে আলোতেও চোখ ঝলসে যাচ্ছে। ছবিতে রাজা-মহারাজের ঘরেই এত গহনা দেখেছি। মুহূর্তে বুঝতে অসুবিধে হল না এই গহনার লোভেই কেউ মেয়েটার পিছু ধাওয়া করেছে। পাছে তারা এখানে এসে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি আলোটা কমিয়ে দিয়ে বললাম, কোনও ভয় নেই। তুমি খাটে শুয়ে পড়ো। আমি চেয়ারে বসে বাকি রাতটা কাটিয়ে দেব।

ঘুমের রেশটা তখনো বোধহয় একেবারে কাটেনি, বসে থাকতে থাকতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে শিবরামজীর গলা। তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকালাম। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝেতে রোদ এসে পড়েছে।

একি! মেয়েটা নেই। বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল। ছুটে গিয়ে আলমারি খুললাম। সুটকেস, ব্যাগ, টাকা সব ঠিকই আছে। মেয়েটা চলে গিয়েছে। কিন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ছিটকিনি দেওয়া। সব কেমন ধোঁয়াশার মতো।

দরজা খুলে দিলাম। সামনে শিবরামজী। চোখে-মুখে রাত জাগার চিহ্ন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন, গাড়ি তৈরি।

জিনিসপত্র বার করতে গিয়ে চোখে পড়ল বিছানার ওপর একটা আংটি। মাঝখানে রক্তের

মতো লাল পাথর বসানো। কাল রাতে আমি যখন বিছানায় শুয়েছিলম তখন স্পষ্ট দেখেছিলাম ফাঁকা বিছানা। কোনও কিছু ছিল না। তবে কি মেয়েটার আংটি, আমার উপকারের প্রতিদান?

রঘুনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। জিগ্যেস করলাম, কাল রাতে কেউ কি এখানে এসেছিল? একটা মেয়ে।

রঘুনাথ কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু ভাবে, তারপর বলল, আপনারা ছাড়া তো আর কেউ আসেনি।

তুমি ঠিক জান রাতে কেউ আসেনি? আমি জিগ্যেস করলাম।

রঘুনাথের মুখটা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, রাতে আমার ভালো ঘুম হয় না, বাবু। কেউ এলে ঠিক জানতে পারতাম।

শিবরামজী বললেন, নতুন জায়গা, হয়তো ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন।

কেউ আসেনি তবে মেয়েটা কে। প্রশ্নটা মনের মধ্যে খচখচ করে উঠল।

সকালেই বলাঙ্গীর পৌঁছে গেলাম। মহারাজের সঙ্গে কাজকর্ম ভালোভাবে মিটে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে বৈঠকখানার ঘরে বসে আছি, হঠাৎ চোখে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা মেয়ের ছবি। খুব চেনা মুখ। উঠে গিয়ে ভালো করে তাকাতেই চমকে উঠলাম। কাল রাতে আমার ঘরে একেই দেখেছি। পাশে নায়েব দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কার ছবি?

মহারাজের ছোট মেয়ে পদ্মা। বড়গড়ে একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। ফেরার সময় মাঝপথে হঠাৎ গাড়িটা খারাপ হয়ে যায়। কয়েকজন লোক রাজকুমারীকে দেখে তাড়া করে। ছুটতে ছুটতে রাজকুমারী গিয়ে পড়েন খ্যাংরাপালির ডাকবাংলোয়। সেদিন রাতে যারা ওখানে ছিল কেউ দরজা খোলেনি। সম্মান বাঁচাতে ডাকবাংলোর পেছনে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন রাজকুমারী।

মুহূর্তে চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। তাহলে কাল রাতে যাকে দেখেছিলাম? কিছু প্রশ্ন করবার আগেই হঠাৎ খেয়াল হল ডাকবাংলোর বিছানায় যে আংটিটা পেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে আংটিটা বার করে নায়েবের দিকে এগিয়ে দিলাম, এটা কার জানেন?

আংটিটা হাতে নিয়ে কয়েক পলক দেখেই প্রায় চিৎকার করে উঠলেন নায়েব, এ আংটি আপনি কোথায় পেলেন? এ তো ছোট রাজকুমারীর আংটি। দেখুন নাম লেখা রয়েছে পদ্মা।

অনুভূতিগুলো আলগা হয়ে আসছিল। বোবা বিস্ময়ে কেমন নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। এও সত্যি!

আবার নায়েবের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর, কোথায় পেলেন এই লাল পাথরের আংটি?

অস্ফুটে জবাব দিলাম, সে এক আশ্চর্য কাহিনি........।

অগ্রহায়ণ ১৪১৭

সাইক্লিস্ট

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

ময়ূখের বেশ পছন্দ হয়ে গেল বাড়িটা। চারপাশটা ছায়াময়। শালগাছে ঘেরা। বাড়ির সামনে থেকে একটা রাস্তা শালবনের গা ঘেঁষে এগিয়ে হারিয়ে গেছে একটা বাঁকের আড়ালে। বাঁকের ওপাশে মনে হয় একটা নদী আছে, দূর থেকে চিকচিক করছে জায়গাটা। নিঝুম দুপুরে শালের বন থেকে ভেসে আসছে পাতা খসার অস্পষ্ট সরসর শব্দ, কখনও বা নাম-না-জানা পাখির ডাক। এর মধ্যেই একলা দাঁড়িয়ে আছে ঢালু ছাদওলা ছিমছাম ছোট্ট বাড়িটা।

ভাড়া সংক্রান্ত প্রাথমিক কথাবার্তা মিটে যাবার পর বাড়ির বৃদ্ধা মালকিন ময়ূখকে তার থাকার জন্য যে ঘরটা দেওয়া হচ্ছে সেখানে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমি কোনোদিন ঘর ভাড়া দেইনি। আসলে আমার স্বামী দীর্ঘদিন অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না, কথাবার্তাও বলতে পারেন না। আমাদের সঞ্চয় শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর ওষুধপত্রের জন্য টাকার প্রয়োজন সেজন্যই ভাড়া দিতে হচ্ছে। উনি ওপাশের একটা ঘরে থাকেন।'

বৃদ্ধার সঙ্গে ঘরে ঢুকল ময়ূখ। সুন্দর ভাবে সাজানো ঘরটা। খাট, আলমারি, লেখার জন্য টেবিল, সব কিছুই আছে। বেশ বড় একটা জানলাও আছে রাস্তার দিকে। আর সেই জানলার পাশে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে তেল রঙে আঁকা একটা বড় ছবি। সে ছবিটা ভালো করে দেখার পর বেশ অবাক হয়ে গেল ময়ূখ। আরে জানলা দিয়ে যা দেখা যাচ্ছে তা সব কিছুই তো দেখা যাচ্ছে ছবিটাতে। যেন এই জানলার সামনে বসেই কেউ এঁকেছিলেন ছবিটা। ঐ তো কম্পাউণ্ডের বাইরে গেটের বাঁপাশে অন্যদের থেকে কিছুটা তফাতে একলা দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট শালগাছটা। ঐ তো আরো কিছুটা এগিয়ে পথের ডানপাশে উঁচু ঢিবি মতো জায়গাটা। লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা, ঐ তো বাঁকটা। ছবির চাঁদের আলোয় সব কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শালবনের মাথার ওপর সোনার থালার মতো চাঁদ উঠেছে। সে আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শালের বাগান, আর তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা রাস্তাটা। শুধু একটা জিনিস বাড়তি আছে ছবিটাতে। দূরে বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন সাইক্লিস্ট। তার ছবিটা এত ছোট যে তার মুখ বোঝা যাচ্ছে না, তাছাড়া মাথায় একটা টুপিও সম্ভবত আছে। তবে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় চন্দ্রালোকিত রাস্তা ধরে সে যেন এ বাড়ির দিকেই আসছে!

ময়ূখ অবাক হয়ে বৃদ্ধাকে জিগ্যেস করল, 'ছবিটা কার আঁকা?'

বৃদ্ধা মৃদু হেসে বললেন, 'আমার স্বামীর। অনেক পুরোনো ছবি। আসলে পঞ্চাশ বছর আগে উনি আর্ট কলেজের যখন ছাত্র ছিলেন তখন উনি আর তাঁর এক বন্ধু এখানে এসেছিলেন ছবি আঁকার জন্য। এ জায়গা দুজনেরই ভালো লেগে গেল। কাজ জুটিয়ে এখানেই থেকে গেলেন তাঁরা। সাইকেল নিয়ে দুই বন্ধু মিলে ঘুরে বেড়াতেন এই রাস্তায়, শালের জঙ্গলে....।' একথা বলার পর ভদ্রমহিলা প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'আপনার ঘর পছন্দ হয়েছে তো?'

ময়ূখের ঘর পছন্দ না হবার মতো ব্যাপার নেই। তাছাড়া সে তো মাত্র তিনরাত কাটাবে এ ঘরে। এখানে একটা সরকারি অফিসে অডিট অর্থাৎ হিসাব পরীক্ষার জন্য সে এসেছে। সারাদিন তার সেখানেই কাটবে। শুধু রাতটুকু শোবার জন্যই তার এ ঘরের ব্যবস্থা। রান্নারও কোনো পাট

নেই তার। যেখানে সে কাজ করবে সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুমও আছে। আর কী চাই? সে জবাব দিল, 'না, আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

বৃদ্ধা এরপর মামুলি কিছু কথাবার্তা বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। অফিসের যে লোকটা তাকে এ বাড়িতে এনেছিল সে এতক্ষণ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গের সামান্য কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লোকের সঙ্গে ময়ূখ রওনা হয়ে গেল তার কাজের জায়গাতে।

রাত আটটা নাগাদ বাড়িটাতে ফিরল ময়ূখ। বাড়ির চারপাশে কাঠের তৈরি নিচু বেড়া দেওয়া আছে। তার দরজা খোলার শব্দ শুনেই মনে হয় একবার বাড়ির কোনো একটা ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা, তারপর ময়ূখকে দেখে আবার ভিতরে ঢুকে গেলেন। অফিসেই খাওয়া সেরে এসেছে ময়ূখ। সারাদিন নানা ধকল গেছে তার। ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতি নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্যই হয়তো মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। সামনে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চাঁদের আলোতে শালবন, রাস্তা সব কিছু দেখা যাচ্ছে। ময়ূখের চোখ গেল ছবিটার ওপর। ময়ূখের খাটের মাথার ওপর জাফরিবিহীন বেশ বড় গোলাকার ঘুলঘুলিটা দিয়ে বাইরের চাঁদের আলো এসে পড়েছে ছবিটার ওপর। স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ছবিটা। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ময়ূখের একটা অদ্ভুত ব্যাপার হঠাৎ মনে হল। ছবির সেই সাইক্লিস্টের চাকা দুটো যেন ধীর গতিতে ঘুরছে। তাছাড়া সে যেন তার আগের জায়গাতে নেই। সেই বাঁকের মুখ থেকে অনেকটা এগিয়ে সে এসে দাঁড়িয়েছে রাস্তার পাশে সেই টিবি মতো জায়গাটার কাছে। আকারেও যেন একটু বড়ো হয়েছে সেই সাইকেল আরোহী। দূর থেকে কাছে এলে যেমন হয়। এ ব্যাপারটা কি ময়ূখের দৃষ্টিবিভ্রম? নাকি আলো-ছায়ার খেলা? ব্যাপারটা ঠিক ধরতে না পেরে সেই ছবির দিকে তাকিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়ল ময়ূখ। শেষ রাতের দিকে আবারও একবার ঘুম ভেঙে গেল তার। একটা অস্পষ্ট গোঁগোঁ শব্দ যেন কোথা থেকে ভেসে আসছে। শব্দটা অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শালবনের মাথার আকাশ লাল হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে শোনা যেতে লাগল পাখির কলকাকলি।

।। ২।।

সকালবেলা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোবার আগে ছবিটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে হাসল ময়ূখ। গত রাতের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল তার। না, ছবিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই ছোট্ট সাইক্লিস্ট বাঁকের মুখে একই জায়গাতে আছে। আর তার চাকাও ঘুরছে না। ছবির সাইক্লিস্টের কি সাইকেল চালানো সম্ভব?

দরজা ঘুলে বাইরে বেরোতেই ময়ূখ দেখল বৃদ্ধা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ময়ূখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি জানতে চাইলেন, 'কী, ঘুম হল রাতে? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

ময়ূখ হেসে বলল, 'অসুবিধা হয়নি। তবে ভোর রাতে কীরকম একটা শব্দ শুনলাম। মনে হল মানুষের গলা....।'

বৃদ্ধা একটু বিষণ্ণ ভাবে বললেন, 'ওটা ওঁর গলা। আসলে পূর্ণিমা-অমাবস্যা এলে ওঁর অসুস্থতা একটু বাড়ে। উনি তো কথা বলতে পারেন না। পক্ষাঘাতগ্রস্ত। মুখ দিয়ে ওরকম শব্দ করেন। আগামীকাল আবার পূর্ণিমা। ওঁর কষ্ট বাড়ছে।'

তঁরা কথা শুনে ময়ূখ সৌজন্যর খাতিরে বলল, 'ওঁকে একবার দেখা যাবে?'

ভদ্রমহিলা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন একটু ইতস্তত করেই বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

ময়ূখকে নিয়ে ভদ্রমহিলা একটা ঘরে ঢুকলেন প্রথমে, তারপর সে ঘর পেরিয়ে ঢুকলেন অন্য একটা ঘরে। একটা বাতি জ্বলছে ঘরে। ঘরটাতে কোনো জানলা নেই। ঘরের মাঝখানে একটা উঁচু সেকেলে পালঙ্কে শুয়ে আছেন একজন বৃদ্ধ। মাথায় সাদা শনের মতো চুল, চোখের পাতা বোজা। সম্ভবত ঘুমাচ্ছেন তিনি। খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা দু-জন। বৃদ্ধা পরম মমতায় শুয়ে থাকা মানুষটার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'আপনি যে ঘরটায় আছেন, সেখানেই উনি থাকতেন।'

ময়ূখ বলল, 'ও ঘরটা তো বেশ ভালো। বড় জানলা দিয়ে আলো-বাতাস খেলে। ওনাকে এ ঘরে আনলেন কেন?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'ঐ জানলাটা নিয়েই তো সমস্যা। শীত-বর্ষা কিছুতেই ওই জানলা বন্ধ করতে দিতে চাইতেন না উনি। গতবার শীতে জানলা খোলা রেখে শরীরটা আরও খারাপ হয়ে গেল। আর তার পর থেকেই বাধ্য হয়ে ওনাকে এ ঘরে এনে রাখতে হয়েছে।'

মিনিটখানেক সে ঘরে থাকল ময়ূখ। তারপর সে ঘর, সে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে রওনা হল তার কাজের জায়গাতে।

সারাদিনটা কাজের চাপে কী ভাবে গেটে গেল তা বুঝতে পারল না ময়ূখ। অফিসের একটা গাড়ি যখন বাড়িটার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল তখন বেশ রাত। প্রায় দশটা বাজে। চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। শালবনের দিক থেকে ভেসে আসছে পাতার ফিসফিসানি আর ঝিঁঝির কলতান। বাড়িতে পা দিতেই সেই গোঁ গোঁ শব্দটা শুনতে পেল ময়ূখ। বেশ জোরেই হচ্ছে শব্দটা। এমনকী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরও কানে আসতে লাগল সে শব্দ। সম্ভবত সেই ভদ্রলোকের অসুস্থতা আরও বেড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় শুয়ে পড়ল ময়ূঘ। বৃদ্ধর আর্তনাদ থেমে গেল একসময়। ঘুম নেমে এল তার চোখে।

মাঝরাতে সম্ভবত আবারও কারও আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল ময়ূখের। ঘুম ভাঙার পর অবশ্য আর কোনো শব্দ শুনতে পেল না সে। খাটের সামনে তার পায়ের দিকে খোলা জানলা। আগামীকাল পূর্ণিমা। আকাশে প্রায় পূর্ণচাঁদ। সেই আলোতে আরও স্পষ্ট আজ বাইরেটা। শালের বন, তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া পথ, পথের পাশে সেই উঁচু মতো জায়গা বা ঢিবিটা, রাস্তার শেষে বাঁকটা, সবকিছুই আজ আরও স্পষ্ট। আর এরপরই আধো ঘুম চোখে তাকাল দেওয়ালের গায়ের ছবিটার দিকে। ছবিটাও যেন আরও বেশি স্পষ্ট। ছবির চাঁদের আলো যেন আজ ছড়িয়ে পড়েছে ফ্রেমের আনাচে -কানাচে। আর সেই ছবির দিকে তাকিয়ে আজ আরও বেশি অবাক হয়ে গেল ময়ূখ। সেই সাইকেল আরোহী তার নিজের জায়গাতে নেই। দূরের সেই বাঁক থেকে আরও অনেকটা এগিয়ে এমন কী রাস্তার মাঝপথে সেই ঢিবিটাকেও পিছনে ফেলে অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসে দাঁড়িয়েছে সে। তাকে কালকের থেকেও বড় দেখাচ্ছে। তার অবয়ব, সাইকেলের গড়ন, সবকিছুই আজ অনেক বেশি স্পষ্ট। লোকটার ছিপছিপে চেহারা, পরনে সম্ভবত একটা ব্রিচেস, পায়ে শ্যু, মাথায় একটা টুপি। টুপির আড়ালে তার মুখ বোঝা না গেলেও সম্ভবত সে তাকিয়ে আছে, এ বাড়িটার দিকেই। ময়ূখের আরো মনে হল, তার সাইকেলের চাকা দুটো যেন খুব ধীর গতিতে ঘুরছে। চাঁদের আলোতে কাঁকর বিছানো রাস্তা ধরে খুব ধীর গতিতে এ বাড়ির দিকে এগোচ্ছে।

ব্যাপারটা দেখতে পেয়েই বিস্ময়ে ঘুম ভাবটা কেটে গেল ময়ূখের। সে আর আগের দিনের মতো শুয়ে থাকতে পারল না। বেডসুইচ থেকে আলো জ্বালিয়ে খাট থেকে নেমে সে গিয়ে দাঁড়াল ছবিটার একদম কাছে। কী আশ্চর্য ছবির সবকিছু তো ঠিকই আছে। সেই সাইক্লিস্ট তো রাস্তার

দূর প্রান্তে বাঁকের মুখেই দাঁড়িয়ে। সাইক্লিস্টের একটা ছোট্ট অস্পষ্ট অবয়ব। তাহলে এতক্ষণ কী দেখল ময়ূখ? নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আলো-ছায়ার খেলা। নিজের মনে হাসল সে। তবুও ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। ছবিটা অনেক পুরোনো। জায়গায় জায়গায় ক্যানভাসটা পোকায় কেটেছে, অনেকটা অংশ বিশেষত রাস্তার শেষে যে জায়গাতে সাইক্লিস্ট দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গায় কাপড়টা বেশ ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। আঙুল দিয়ে টোকা দিলেই হয়তো জায়গাটা খসে পড়বে। কিছুক্ষণ ছবিটা দেখার পর বাতি নিভিয়ে ময়ূখ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

।। ৩ ।।

সকালবেলা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গোঙানির শব্দেই ময়ূখের ঘুম ভাঙল। বেশ জোরে জোরে আর্তনাদ করছেন ভদ্রলোক। ময়ূখ ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার ছাপ। ভোরের নতুন আলোও ধুয়ে দিতে পারছে না তাঁর ক্লান্তিকে। ময়ূখ তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ওনার অসুস্থতা কি আরও বেড়েছে?'

ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, কাল থেকে আরও বেড়েছে।'

'ডাক্তার ডেকেছিলেন?'

বৃদ্ধা এবার অসহায় ভাবে বললেন, 'ডাক্তার ডেকে তেমন কোনো লাভ হবে না। তারা আগেই দেখে বলে গেছেন, নতুন কোনো ওষুধ দেবার ব্যাপার নেই। আজ রাতটা যদি কোনো ভাবে....।' কথা শেষ না করে তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। সকালবেলা ময়ূখ যতক্ষণ বাড়িটাতে থাকল ততক্ষণই তার কানে আসতে লাগল সেই ভদ্রলোকের গোঙানির শব্দ। প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন ভদ্রলোক।

অফিসে গিয়ে শেষদিনের যাবতীয় কাজ মিটিয়ে এদিন বাড়িটাতে পৌঁছতে রাত নটা বাজল ময়ূখের। আজ পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বাড়ির পাশের শালের বন, তার মাঝখান দিয়ে এঁকে-বেঁকে দূরে বাঁকের দিকে হারিয়ে যাওয়া রাস্তাটা। কিন্তু চাঁদের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকা ঢালু ছাদ আর বারান্দাঅলা বাড়িটা আজ কেমন যেন নিঝুম বলে মনে হল ময়ূখের। কোথাও কোনো শব্দ নেই। সেই বৃদ্ধর আর্তনাদও আর শোনা যাচ্ছে না। ময়ূখ একবার ভাবল ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করে বৃদ্ধ কেমন আছেন সে ব্যাপারে খোঁজ নেয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল কাল রাত জাগার পর আজ হয়তো তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধাকে এখন আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না। কাল সকালে চলে যাবার সময় একবার তো তঁরা সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তখন কথা হবে। এই ভেবে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পরদিন ভোরবেলা এ বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় ফিরবে ময়ূখ। একটা গাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। সকালে সে গাড়ি তাকে নিতে আসবে। সামান্য গোছগাছ সেরে নিয়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল ময়ূখ। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। মুগ্ধভাবে ময়ূখ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল শালের বন, রাস্তার দিকে। তারপর বিছানায় যাবার আগে ইচ্ছা করেই আজ জানলার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিল। ময়ূখের মনে হল খোলা জানলা দিয়ে চাঁদের আলো তার মুখে এসে পড়ে বলেই তার ঘুম ভেঙে যায়। পাল্লা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে।

কিন্তু এদিন রাতেও আগের দু-দিনের মতোই ঘুম ভেঙে গেল তার। প্রথমে তার চোখ পড়ল খাটের পাশে টেবিলে রাখা টাইমপিসের ওপর। ঘড়িটার রেডিয়ামের কাঁটা জানান দিচ্ছে রাত প্রায় তিনটে বাজে। সোজা হয়ে শুল ময়ূখ। আর এরপরই অন্যদিনের মতো চোখ গেল তার সামনাসামনি দেওয়ালের গায়ে ঝুলতে থাকা ছবিটার ওপর। ঘুলঘুলি দিয়ে আজও চাঁদের আলো

এসে পড়েছে ছবির ওপর। তাছাড়া ছবির চাঁদটা যেন আজ উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে ক্যানভাসে। সেই আলোতে ময়ূখ স্পষ্ট দেখল সেই সাইক্লিস্ট নিজের জায়গাতে নেই। রাস্তার দূরবর্তী বাঁকে, রাস্তার মাঝামাঝি দূরত্বে পথের পাশের সেই ঢিবি অতিক্রম করে সে বাড়িটার অনেক কাছে, গতরাতের চেয়েও অনেক কাছে চলে এসেছে। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার পায়ের সঞ্চালন, চাকার ঘূর্ণন। তবে সব কিছুই বেশ ধীর গতিতে। এক সুতো এক সুতো করে ছবির রাস্তাটা অতিক্রম করছে লোকটা। না, এরকম দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে না। ময়ূখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, ধীরে ধীরে লোকটা রাস্তা অতিক্রম করে ছবির ফ্রেমের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে ময়ূখ দেখতে লাগল সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য। হ্যাঁ, চাকাটা ঘুরছে! প্যাডেল করছে লোকটা! হ্যাঁ, ক্রমশ বড় হচ্ছে তার অবয়ব!

সাইক্লিস্ট একসময় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বাড়ির একদম কাছে একলা দাঁড়ানো সেই বিরাট শালগাছটার নীচে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। মাথায় টুপি, পরনে ব্রিচেস, পায়ে শ্যু। এমন কী সাইকেলের ঘন্টি, চাকার স্পোকগুলোও দেখা যাচ্ছে। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার যেন মাথাও নাড়ল লোকটা। আর এরপরই যেন জানালার বাইরে থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ বেশ কয়েকবার কানে এসে লাগল ময়ূখের। সাইকেলের ঘন্টির মৃদু টিং টিং শব্দ। হ্যাঁ, সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে ঘন্টির শব্দ।

ব্যাপারটা কী ঘটছে আজ তাকে বুঝতেই হবে। বিছানা ছেড়ে উঠে ময়ূখ এগিয়ে গেল জানলার দিকে। পাল্লাটা একটু ফাঁক করে তাকাল বাইরের দিকে। চমকে উঠল ময়ূখ। চাঁদের আলোতে সেই শালগাছের নীচে সত্যিই এসে দাঁড়িয়েছে একজন সাইক্লিস্ট! মাথায় টুপি, পরনে ব্রিচেস, পায়ে শ্যু। সে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। হুবহু দেওয়ালের ছবিটার মতো! সাইকেলের ঘন্টিটা মাঝে মাঝে আস্তে আস্তে বাজাচ্ছে সে। টিং-টিং-টিং-টিং....কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল ময়ূখ। তাদের বাড়ি থেকে একটা মানুষ ধীর পায়ে বেরিয়ে এগিয়ে গেল সাইক্লিস্টের দিকে। কে ও? তবে কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়াও এ বাড়িতে অন্য কেউ থাকেন! ময়ূখের দিকে পিছন ফিরে হাঁটছে বলে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ময়ূখ। দ্বিতীয় লোকটা কাছে যেতেই তাকে দেখে সম্ভবত সম্ভাষণসূচক মাথা নাড়ল সাইক্লিস্ট। তারপর সে সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে নিল। দ্বিতীয় লোকটা নিঃশব্দে চেপে বসল তার সাইকেলের পিছনের কেরিয়ারে। শালবনের মাঝখান দিয়ে চন্দ্রালোকিত পথ ধরে যেখান থেকে সে এসেছে সেদিকে লোকটাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল সাইক্লিস্ট। বিস্মিত, হতভম্ব ময়ূখ চেয়ে রইল সেই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে। একসময় লোকটাকে নিয়ে দূরে পথের বাঁকে হারিয়ে গেল সেই সাইক্লিস্ট।

।। ৪।।

ঘরের বাইরে বারান্দায় কাদের কথাবার্তার শব্দ যেন ময়ূখের ঘুম ভাঙল। ময়ূখের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গত রাতের স্মৃতি। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। শালবনের মাথার ওপর সূর্য উঠে গেছে তখন। বারান্দায় বেশ কয়েকজন লোক। এক ভদ্রলোকের গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে, সম্ভবত তিনি ডাক্তার হবেন। সেই বৃদ্ধাও আছেন তাঁদের সঙ্গে। লোকজনের টুকরো টুকরো সংলাপ শুনে ময়ূখ অনুমান করল সেই অসুস্থ বৃদ্ধ আর নেই। ময়ূখ এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বৃদ্ধার সামনে। তাকে দেখে বিষণ্ণ হেসে বৃদ্ধা বললেন, 'এ বাড়ির মানুষটা আর নেই। ভালোই হল, অনেকদিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। আসলে কি জানেন যৌবনে তিনি তাঁর যে বন্ধুর সঙ্গে এ জায়গাতে পা রেখেছিলেন, যার সঙ্গে সাইকেল চেপে ঘুরে বেড়াতেন এই শালের বনে, বছরখানেক আগে তার মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে বন্ধুবিচ্ছেদ আর সইতে পারেননি তিনি। তারপর

থেকেই ওঁর শরীরটা ভেঙে পড়ল। একদিন পূর্ণিমার রাতে উনি নাকি দেখেছিলেন ঐ যে ঐ শালগাছের নীচে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে নাকি ডাকছেন তাঁর বন্ধু। এরপরই আমি ওনাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যাই। কিন্তু পূর্ণিমা এলেই তারপর থেকে কেমন যেন করতেন উনি। কাল তো পূর্ণিমা ছিল....।' ঠিক মতো কথা শেষ করতে পারলেন না ভদ্রমহিলা।

ময়ূখ শুধু তাঁকে জিগ্যেস করল, 'কখন ঘটল ব্যাপারটা?'

'ডাক্তারবাবু তো বললেন রাত তিনটে নাগাদ হবে।' কান্নাভেজা গলায় জবাব দিলেন বৃদ্ধা।

ময়ূখ ঘরে ফিরে এসে ছবিটার সামনে দাঁড়াল। প্রায় সবকিছু ঠিকই আছে ছবিটাতে। চন্দ্রালোকিত শালের বন, সেই রাস্তা, রাস্তার পাশের ঢিবি, পথের শেষের বাঁকটা। শুধু নেই সেই সাইক্লিস্ট। পোকায় কাটা ক্যানভাসের সেই ছোট্ট অংশটা কোথায় যেন খসে পড়েছে। চাঁদের আলোতে শালবনের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীকে নিয়ে দূরে ঐ পথের বাঁকে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সেই সাইক্লিস্ট।

শারদীয়া ১৪২০

পিছনে হাঁটা

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

শুনুন আপনারা—আমি আজকে এমন একটা জিনিস দেখাতে চলেছি, যা আমার আগে কেউ কোনোদিন দেখায়নি, আর কেউ কোনোদিন হয়তো দেখাবেও না। আমিও এই শো আর দ্বিতীয়বার করব না। আজকেই প্রথম, আজকেই শেষ। ঠিক যেমন বলেছিলাম—

বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান স্টিভ সদর্পে বলে উঠলেন।

মুহূর্তে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রেক্ষাগৃহে কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল। এবারই কি শুরু হতে চলেছে স্টিভের সেই বহু প্রতীক্ষিত ম্যাজিক—'পিছনে হাঁটা'!

এরই প্রত্যাশায় লণ্ডনের মানুষ আজ এই প্রেক্ষাগৃহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চড়া দামে একমাস আগে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ম্যাজিশিয়ান স্টিভ-এর সব ম্যাজিকই প্রায় অসাধারণ। আর যেখানে স্বয়ং স্টিভই যখন বলেন তিনি যা দেখাতে চলেছেন, তা উনি আর দ্বিতীবার দেখাবেন না—তা প্রত্যাশার পারদকে কোথায় নিয়ে যায়, তা বলার দরকার পড়ে না।

আস্তে আস্তে গুঞ্জন থেমে গেল। স্টিভ একটা ঘড়ি টেবিলের উপর এনে রাখলেন। ছোট ঘড়ি। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা না গেলেও ঘড়িটা যে একটু অন্যরকম তা বোঝা যাচ্ছে।

স্টিভ ঘড়িটা হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠলেন, আমার এ ঘড়িটা সামান্য ডিফেক্টিভ। ডিফেক্টটা কিরকম তা একটু পরে আপনারা বুঝবেন। আমি এতে এখন থেকে পনেরো মিনিট বাদে একটা অ্যালার্ম দিলাম। এই পনেরো মিনিট আমরা অন্য একটা ম্যাজিক দেখাব। শুধু সময়টা দেখে নিন। এখন সন্ধে ছ'টা। কি, সন্ধে ছ'টা তো?

হল জুড়ে প্রবল সাড়া এল, হ্যাঁ ছ'টা।

ওকে, লেট দ্য ম্যাজিক বিগিন নাউ। স্টিভের পরনে সাদা প্যান্ট। কালো বো টাই। স্টিভ টাইটা খুলে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সেটা একটা পায়রা হয়ে হলের মধ্যে দু'তিন মিনিট ধরে উড়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। হাততালিতে হলঘরে এখন কান পাতা দায়। তবে স্টিভের পক্ষে সবই সম্ভব। এ ধরনের ম্যাজিক তো অন্যান্য ম্যাজিশিয়ানরাও করে দেখাতে পারে। কিন্তু যে স্টিভ ম্যাজিক করে জাহাজ ভ্যানিশ করে দিতে পারেন, কাগজের প্রথম পাতায় তিনদিন পর কী কী থাকবে বলে দিতে পারেন আগে থেকে, তাঁর কাছে এটা কিছুই নয়। স্টিভ এবার একের পর এক তাসের ম্যাজিক দেখাতে থাকেন। বিভোর দর্শকের আর হুঁশ থাকে না। তার মাঝেই হঠাৎ পাশের টেবিলে রাখা ঘড়িটাতে তীব্র আওয়াজ করে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। হাতের তাসটাকে টেবিলে রেখে স্টিভ এগিয়ে যান ঘড়িটার দিকে।

ডানহাতে ঘড়িটা ওপরের দিকে তুলে বলে ওঠেন, ঘড়িতে অ্যালার্ম যখন দিয়েছিলাম তখন বেজেছিল ছ'টা। অ্যালার্ম দিয়েছিলাম ছ'টা পনেরোয়। অথচ এখন এ ঘড়িতে সময়টা দেখুন, কটা বলুন তো? ফের নিজেই বলেন, পাঁচটা। আর আপনাদের ঘড়িতে?

পরীক্ষার রেজাল্টের অ্যানাউন্সমেন্টের সময় যেমন সব নিয়ম অনেক সময় ভেঙে যায়, ঠিক তেমনই হলের মধ্যে মুহূর্তে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে গেল। হলের অভিজাত দর্শকরা বিস্ময়ে শিশুর মতো চিৎকার করে উঠল। প্রত্যেকের ঘড়িতে পাঁচটা। বিকেল পাঁচটা।

মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে নিলেন স্টিভ। মাথা ঝুঁকিয়ে বলে উঠলেন, আমরা অ্যালার্ম দেওয়ার সময় থেকে একঘণ্টা পিছনে চলে গেছি। এখন সময় হল পাঁচটা। আপনারা কত সহজে বাড়তি কিছু সময় পেয়ে গেলেন, তাই না?

দর্শকরা এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেল। হাততালি চলতেই থাকে—বহুক্ষণ। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে স্টিভকে অভিবাদন জানাতে থাকে। অ্যালার্মটা তখনও বেজে চলেছে।

হ্যাঁ, অ্যালার্মটা এখনও বেজে যাচ্ছে। ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে অতীন। বেডসাইড টেবিলে ঘড়িটা। কী ভয়ানক স্বপ্ন'! মনে হচ্ছে সব যেন সত্যি। ঘুমন্ত চোখে হাত বাড়িয়ে অ্যালার্ম বন্ধ করতে গিয়ে চমকে উঠল অতীন। এ ঘড়িতেও পাঁচটাই বাজে।

অ্যালার্ম বন্ধ করে বেশ খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থাকে অতীন। এ কি সম্ভব! ওর স্পষ্ট মনে আছে। ছ'টায় শুয়েছিল সাতটায় অ্যালার্ম দিয়ে।

নাহ্ গত কয়েকদিনের পরিশ্রমের জন্যই বোধহয় মাথার ঠিক নেই। তারপরে অসময়ে দিবানিদ্রা। উঠে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল অতীন। বাইরে এখনো দিনের আলো। রবিবার বিকেল, তাই লোকের দেখা নেই।

হঠাৎ একটা লাল টয়োটা গাড়ি সামনের রাস্তা দিয়ে গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়েই উল্টোদিক থেকে আসা অন্য একটা গাড়িকে জায়গা দিতে গিয়ে জোরে ব্রেক কষল। চমকে উঠল অতীন। ঠিক, হ্যাঁ ঠিক এই ঘটনাটাই অতীন দেখেছিল ঘুমোতে যাওয়ার আগে। আর ঠিক এর পর পরই দুটো স্কুলের ছেলে সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট পরে ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট হাতে সামনের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। হলও তাই। ছেলে দুটো সামনের রাস্তা দিয়ে এসে ডানদিকে বাঁক নিয়ে অতীনের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেল।

এটা কি স্বপ্ন! এই ২০১৪ সালে ওয়েলস-এর বুকেও এরকম সম্ভব? অতীন ফিরে এসে ঘড়িটা হাতে তুলে নিল। ৬ ইঞ্চি বাই ৪ ইঞ্চি চৌকো আকৃতির কাঠের ঘড়ি। উপরে চারটে সুইচ। তার মধ্যে একটা অ্যালার্মের জন্য। কাঠের উপর নানা কারুকার্য করা। বেশ বড় সাদা ডায়াল। এখন এরকম ঘড়ি দেখতে পাওয়া যায় না। তিনমাস হল ওয়েলস-এর এই ছোট শহর কার্লিয়নে এসেছে অতীন। একটা পাঁচ ঘরের বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানেই একা থাকে। গতকাল বাড়ির স্টোররুম পরিষ্কার করতে গিয়ে একটা দেরাজের মধ্যে ঘড়িটাকে দেখতে পায়। দেখেই আগ্রহ হয়। এই প্রথমবার ওটাতে অ্যালার্ম দিয়েছিল আজ।

ছুটির দিন। তাহলেও নানান কাজ আছে। এখানে রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার, বাগানের দেখাশোনা—এ সব কিছুই অতীনকেই সামলাতে হয়। তাই ঘড়ির পিছনে আর সময় নষ্ট না করে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অতীন। নিশ্চয়ই এসব মনের ভুল। হয়তো গাড়িটাও স্বপ্নের মধ্যেই দেখেছিল। কে বলতে পারে!

সব কাজ শেষ করতে ন'টা বাজল। বাইরে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। ডিনার শেষ করে পড়ার টেবিলে একটা বই নিয়ে পড়তে বসেছিল অতীন। হঠাৎ কী খেয়াল হতে উঠে দাঁড়ায়। ঘড়ির কাছে গিয়ে অ্যালার্ম দিলে সাড়ে ন'টায়। একবার টেস্ট করে দেখা দরকার সন্দেহটা নেহাৎ অমূলক কিনা। ফের টেবিলে এসে বসল অতীন। বই পড়তে পড়তে মাঝে-মধ্যেই আড়চোখে তাকাতে থাকে ঘড়িটার দিকে। ন'টা পাঁচ-দশ-পনেরো, তারপর হাতের বইটায় এতটাই নিমগ্ন হয়ে পড়ল যে বাকি সময়টা আর খেয়াল রাখতে পারেনি। হঠাৎ অ্যালার্মের শব্দে হুঁশ ফেরে। ঘড়িটা হাতে নিয়েই শিহরন হল অতীনের। রাত আটটা। অর্থাৎ ঘড়িটা ফের ফিরে গেছে অ্যালার্ম দেওয়ার একঘণ্টা আগে।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য টেবিল ল্যাম্পের আলোর তলায় ঘড়িটাকে ধরল অতীন। হ্যাঁ আটটাই। পাশে দামি হাতঘড়িটাও রাখা ছিল। সেটাতেও একই সময়। তাহলে কি ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে ও স্বাতীর ফোনটা পাবে, ঠিক যেরকম এসেছিল! মোবাইলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল অতীন। সব যেন কিরকম গুলিয়ে যাচ্ছে। ওর বুদ্ধি-বিবেচনা বোধ সব যেন হেরে যাচ্ছে একটা ভূতুড়ে ঘড়ির কাছে।

ঠিক আটটা পাঁচেই ফোনটা এল স্বাতীর। সেই এক কথা। শোনো, বুবু ফের বায়না করছে। তোমাকে অনেকদিন দেখেনি। সমানে 'কবে আসবে' 'কবে আসবে' করছে। নাও, ওকে বোঝাও।

সেকি! অনেক রাত হয়ে গেছে তো ওখানে! এখনও জেগে আছে? দাও ওকে দাও......বুবু সোনা, কেমন আছো?

বাবা তুমি কবে আসবে? তুমি বলেছিলে আমার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলবে, পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

সোনা, আর তো কয়েক মাসের ব্যাপার। দেখতে দেখতে ছ'সাত মাস কেটে যাবে। তারপর যাব। তুমিও ততদিনে আর একটু বড়ো হয়ে যাবে।

না বাবা, তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি আসতে হবে।

না সোনা, তা হয় না। এখানে অফিসের কাজে এসেছি। বললেই কি আর যাওয়া যায়? দাও, মাকে দাও ফোনটা।

স্বাতীর সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা বলে অতীন।

ফোনটা ছাড়ার পর উত্তেজনায় এক গ্লাস জল ঢকঢক করে শেষ করল অতীন। তাহলে কি সত্যিই যখন ইচ্ছে একঘণ্টা পিছিয়ে যাওয়া যায় এ ঘড়ির বদান্যতায়? এরকম কি বাস্তবে সম্ভব?

একটা নামী স্টিল কোম্পানির হয়ে ওয়েলসে বহুদিনের জন্য এসেছে অতীন। দেশের বাড়িতে মা, বৌ ও ছেলে আছে। কিছু অসুবিধে থাকায় ওদের এখানে আনা সম্ভব হয়নি।

কলকাতায় থাকলে এ ঘড়িটা নিয়ে এক্ষুনি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করা যেত। এখানে কার সঙ্গেই বা কথা বলা যায়? কিন্তু এ উত্তেজনা নিয়ে বাড়িতে একা বসে থাকাও অসম্ভব। বাড়ির দরজাটা লক করে ঘড়িটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল অতীন। এ জায়গাটা এখন একদম শুনশান। রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া। তাই আশপাশের বাড়িগুলোর আলো নিভে গেছে। টিমটিম করছে রাস্তার হলুদ আলো। আকাশে এখনও সদ্য ডোবা সূর্যের আলোর স্পর্শ। গ্রীষ্মকাল, তাই বেলা অনেক বড়ো। বাইরের আবহাওয়া বেশ মনোরম। ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে।

খানিক দূরে একটা পার্ক আছে। বেশ বড় পার্ক। পার্কের চারধারে ঘোরানো হাঁটার রাস্তা। প্রচুর গাছ। মাঝখানে একটা ছোট পুকুরকে ঘিরে অনেক বেঞ্চি পাতা আছে বসার জন্য। একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল অতীন।

ঘড়িটাকে অনেক খারাপভাবে ব্যবহার করা যায়। একঘণ্টার মধ্যেই এত কিছু পাল্টে যায় যে সেটা জানা থাকলে রাতারাতি কোটিপতি হয়ে উঠতে পারে অতীন। আবার এটাকে ভালো কাজেও লাগানো যেতে পারে। এই যেমন কয়েকদিন আগে একটা বড় ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। হয়তো সময়মতো একঘণ্টা পিছিয়ে গেলে ঐ অ্যাক্সিডেন্টটা থামানো যেত। অনেক লোকের জীবন বাঁচানো যেত। একঘণ্টা পিছিয়ে গেলে একটা ক্রিকেট বা ফুটবল মাচের রেজাল্টও বদলে দেওয়া যায়। অনেক বড় বড় বিপর্যয় থামিয়ে দেওয়া যায়। উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করল অতীন।

কিন্তু নিজের জীবন পাল্টে দেওয়া যায় না। কথাটায় চমকে উঠে ঘাড় ঘোরাল অতীন। পাশেই বেঞ্চিতে কখন জানি আরেকজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসে বসেছেন। মাঝবয়সী, সৌম্য সুন্দর

চেহারা। চোখ-নাক-মুখ তীক্ষ্ণ। পুরোনো দিনের ভারী ফ্রেমের চশমা। কাঁচা-পাকা চুল। সাদা দাড়ি। কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট। আশ্চর্য একেই তো স্বপ্নে দেখেছিল অতীন।

হ্যাঁ, অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু নিজের জীবন পাল্টে দেওয়া যায় না।

কথাটা বলে লোকটা ডানহাতটা অতীনের দিকে বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য।

আমার নাম স্টিভ। একটা সময় ম্যাজিক দেখাতাম। ম্যাজিকই ছিল আমার দিনরাতের স্বপ্ন—সাধনা। বুঝলে যেটাই মনে হত অসম্ভব—সেটাই সম্ভব করার চেষ্টা করতাম। উপায়ও বার করে ফেলতাম। লোকে আমাকে হুডিনির সঙ্গে তুলনা করত। আমার ম্যাজিক শোগুলোর টিকিট একমাস আগে সব বিক্রি হয়ে যেত।

তা আপনাকেই তো আমি খানিক আগে—বলতে গিয়ে থেমে গেল অতীন। স্বপ্নে দেখেছে বললে নির্ঘাৎ পাগল ভাববে।

হ্যাঁ, স্বপ্নে দেখেছিলে, তাই তো? অনেক স্বপ্ন সত্যি হয়, বুঝলে! তা, যা বলছিলাম—আমার ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, পিটার। ওর সেদিন প্রবল জ্বর। আর আমার আবার একটা ম্যাজিক শো-এর ট্যুরে ইউরোপ যাওয়ার কথা ছিল। ম্যাজিক শো শেষ করে যখন তিনদিন বাদে ফিরলাম—তখন সব শেষ। পিটার আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এখনকার মতো এত সহজে তখন যোগাযোগ করা যেত না। তাই আমাকে বাড়ি থেকে ওরা খবর পাঠাতে পারেনি।

আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম। তখনই মনে হল যদি কোনোভাবে অতীতে ফেরা সম্ভব হত। হ্যাঁ, সময়ের পিছন দিকে, যেখানে গেলে পিটারকে ফিরে পাব। আমার ছোট ছোট অনেক ভুল শুধরে নিতে পারব। ওকে আরেকটু সময় দিতে পারব। কিন্তু না, মজাটা দেখো, পারলাম—কিন্তু শুধু একঘণ্টা পিছিয়ে যেতে পারলাম। প্রতি মুহূর্ত যেখানে ছুটে এগিয়ে চলেছে, দুরন্ত গতিতে সব হিসেব উল্টেপাল্টে, সেখানে একঘণ্টা পিছিয়ে কি লাভ! ঐ ম্যাজিক ঘড়িটা আমারই তৈরি করা। একবার, শুধু একবারই একটা ম্যাজিক শো করেছিলাম ঐ ঘড়িটা দিয়ে। তারপর আর কোনো শো হয়নি, দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্টিভ।

কেন?

হ্যাঁ, সেকথাই বলছি। তুমি তো শো-এর খানিকটা স্বপ্নেই দেখেছ তাই না? শো-এর পর সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড। খবর মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ এই প্রথম একটা একঘণ্টার শো হয়েছিল যা ছ'টায় শুরু হয়ে ছ'টাতেই শেষ হয়। অর্থাৎ সময়ের কোনো হিসেবই মিলছিল না। আর একটা কারণও অবশ্য ছিল।

কী সেটা? শুকনো গলায় অতীন বলে ওঠে।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল স্টিভ। তারপর ফের বলতে শুরু করল, সেদিনের লাস্ট ইভেন্টটা ছিল সাপের সঙ্গে কিছুক্ষণ। আমাকে একটা কাচের বাক্সের মধ্যে শিকল দিয়ে বেঁধে তিনটে বিষাক্ত সাপ ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি পাঁচ মিনিট পর বাক্স থেকে বেরিয়ে আসব।

দর্শকদের সে কী উৎসাহ, কী বলব! তবে তখনও তারা সবাই বিভোর হয়েছিল ঐ ঘড়ির ম্যাজিকটাতেই। তাই বাক্সের মধ্যে প্রত্যেকটা বিষাক্ত ছোবলে আমি যখন কেঁপে কেঁপে উঠেছি, চিৎকার করে উঠেছি, তখন তারা বাইরে থেকে দেখে ভেবেছে—ম্যাজিশিয়ান স্টিভের কাছে এ আর কী? নির্ঘাৎ অভিনয়। বুঝতে পারেনি যে আমি আমার মৃত্যুর অপেক্ষা করছিলাম। তাই আমার নিথর দেহ যখন দশ মিনিট বাদে বাক্স থেকে বের করে আনা হয়েছিল, তখন সবাই, এমনকি আমার সঙ্গী কলাকুশলীরাও ভাবছিল আমি অভিনয় করছি, এই বুঝি ফের উঠে দাঁড়াব। এই বুঝি টুপিটা হাতে নিয়ে সদম্ভে কুর্নিশ করে বলে উঠব, 'দ্য ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি ওয়ান—দ্য গ্রেটেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ অলটাইম—স্টিভ।'

উত্তেজিত হয়ে অতীন উঠে দাঁড়াল এবার।

মা-মানে—আপনি—তখন মারা গিয়েছিলেন!

অতীনের কথা গ্রাহ্য না করেই স্টিভ বলতে থাকল, বুঝলে, পিটারের সঙ্গে আগে কখনও পাঁচ মিনিট সময়ও কাটাইনি। পিটারের মার সঙ্গেও না। কথা বলারই সময় পেতাম না। শুধু নিজের নামের মোহে—নিজের ম্যাজিকে মত্ত ছিলাম। আমার নাম যখন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল—তখনও বুঝিনি যে পিটার পাঁচ বছরের হয়ে গেছে। আর সবার ভিড়ের মধ্যে আমি কত একা। যখন বুঝলাম, তখন পিটার চলে গেছে। পিটারের মা সেও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শুধু রয়ে গেছে সময় আর একাকিত্ব।

শেষ দু'বছর আমি শুধু চেষ্টা করে গেছি কিভাবে আবার সেই দিনগুলোতে ফেরা যায়। সেই দিনগুলোতে যখন পিটার সবে হামাগুড়ি দিতে শিখছিল। আধো আধো কথা বলতে শিখছিল। পারিনি। একঘণ্টা অতীতে গিয়ে আর যাই হোক হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোকে ফিরে পাওয়া যায় না। তাই আমি যা বলছিলাম—ও ঘড়ির মোহে পড়ো না। আমি বন্ধু, শুধু ঘড়িটা নিয়ে গেলাম। আর দিয়ে গেলাম কিছুটা বাড়তি সময়। ভুল করো না।

বলে ঘড়িটা নিয়ে স্টিভ উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-সুস্থে এগিয়ে গেল পার্কের গেটের দিকে। আর তারপরই কিভাবে যেন হঠাৎ করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

স্টি-স্টিভ—ডাকতে গিয়ে গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না অতীনের। আর তার মধ্যেই বেজে উঠল পকেটে রাখা ফোনটা। চমকে উঠে ফোনটা ধরল অতীন। স্বাতীর ফোন। হাতঘড়িতে আবার সময় আটটা পাঁচ।

শোনো, বুবু ফের বায়না করছে, তোমাকে অনেকদিন দেখেনি। সমানে 'কবে আসবে' 'কবে আসবে' করছে। নাও ওকে বোঝাও।

সেকি! অনেক রাত হয়ে গেছে তো ওখানে! এখনও জেগে আছে? দাও ওকে দাও....বুবু সোনা, কেমন আছো?

বাবা তুমি কবে আসবে? তুমি বলেছিলে আমার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলবে, পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ সোনা—পরের সপ্তাহেই যাব।

পরের সপ্তাহে!

বুবু ফোনটা ছেড়ে মাকে বলে ওঠে, মা-বাবা বলেছে পরের সপ্তাহেই এখানে আসবে।

ফের স্বাতীর গলা, কী সব বলছ বলো তো! তুমি বলছিলে আসতে দেরি হবে। তোমার কন্ট্রাক্ট তো দু'বছরের। এখনও তো কয়েকমাস বাকি।

নাহ, আর দেরি নেই। পরের সপ্তাহেই ফিরব। না হলে ও আমায় পাগল করে দেবে। এখানকার কাজ শেষ, কাল ডিটেলে বলব।

ফোনটা ছেড়ে অতীন বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। প্লেনের ফেরার টিকিটটা খুব তাড়াতাড়ি বুক করে দিতে হবে।

শারদীয়া ১৪২১

ফকির মণ্ডলের পুঁথি

কুমার মিত্র

আজকের রাতের মতো এটাই শেষ খেয়া।

দ্বৈপায়নবাবু দেখলেন তিনিই শেষ খেয়ার শেষ এবং একমাত্র যাত্রী।

মধ্যবয়সি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানুষটির পুরো নাম দ্বৈপায়ন দেব। অধ্যাপক ও গবেষক। লেখালেখিও করেন নানা পত্র-পত্রিকায়। নামডাক যথেষ্ট। পি-এইচ-ডি করা পর্যন্ত বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পাঁচ-দশটা মেলা আর ধর্মস্থানে ঘোরাঘুরি, খানিকটা লাইব্রেরি-ওয়ার্ক—তাতেই কাজ চলে গিয়েছিল। কিন্তু লেখালেখি মানে অগ্নিপরীক্ষা। সম্পাদক আর পাঠক বড়ো কঠিন ঠাঁই। চর্বিতচর্বণ অচল। 'বিচ্ছুরণ' পত্রিকাতেই দ্বৈপায়নবাবুর সিংহভাগ লেখা বেরোয়। বিচ্ছুরণ-এর সম্পাদক মশাই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, দেখুন মিঃ দেব, পুরোনো কাসুন্দিতে চলবে না, নতুন মালমশলা চাই। বাজারে অনেক লোক নেমে পড়েছে। তাদের সরেজমিন তদন্ত আর ময়না তদন্ত, মানে স্পট সার্ভে তার বিশ্লেষণ দুটোই ভালো। আর পরিতোষ পাছালের কথা তো জানেনেই। আপনার থেকে বয়সে একটু ছোটই হবেন। দেখার চোখ, পরিশ্রম করার ক্ষমতা, কলমের জোর—কোনোটাতেই কমতি যান না। বি কেয়ারফুল।

দ্বৈপায়নবাবু মিনমিনে গলায় কেবল বলতে পেরেছিলেন, বলছেন কী!

ঠিকই বলছি। পরিতোষ পাছাল আপনার আসন টলিয়ে দিলে অবাক হবার কিছু নেই।

দ্বৈপায়নবাবু এতদিন জানতেন চাষা-ভুসো, আউল-বাউল আর মাটি-ঘেঁষা মানুষদের নিয়ে লেখালেখির ক্ষেত্রে তিনিই শাহেনশা-বাদশা। তাহলে পরিতোষ পাছালই কি হতে চলেছেন নতুন তারকা! কিন্তু ওইসব ফালতু পাছাল-ফাছাল এসে তাঁর মৌরুসি পাট্টা হঠিয়ে দেবে ভাবতেই গায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগে দ্বৈপায়নবাবুর।

তবে ছ্যাঁকা লাগলেই তো হবে না। নিজের আসন বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হবে যে!

সেইজন্যেই তো এসেছিলেন এই প্রায়-অচেনা দক্ষিণ অঞ্চলে। কুলডাঙার বারুণির মেলা দেখতে। মেলা আর লোক-উৎসব দেখতে বড্ড ভালো লাগে তাঁর। মন ভরে যায়। তো সেই ভালোবাসাই কাল হল। মেলা দেখার ঘোরে কখন যেন সাঁঝ নেমে এল। অথচ মেলা দেখার উদ্দেশ্যে নয়, এখানে তিনি এসেছিলেন অন্য খোঁজে। সে জায়গাটার নাম চন্দ্রদ্বীপ। গাথা পঞ্চকের কবি ফকির মণ্ডলের আস্তানা ছিল চন্দ্রদ্বীপেরই মধ্যে কোথাও। উঁচু জাতের লোক ছিলেন না ফকির মণ্ডল, লোকে বলত কৈবর্ত-কবি। চন্দ্রদ্বীপের জমিদার রঘুনাথ চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েই লিখেছিলেন গাথা পঞ্চক এবং আরো অনেক পুঁথি। উঁচুদরের কবিত্ব ছিল। তাঁর কাহিনিকাব্যের পঙ্‌ক্তি একসময় মানুষের মুখে মুখে ফিরত । কিন্তু সেইসব পুঁথি বই হিসেবে ছাপা হয়নি। এ জিনিস এখন গবেষক-লেখকদের কাছে স্বর্ণখনি। তবে চন্দ্রদ্বীপ তো এক বিঘত জায়গা নয়। কোথায় ছিল সেই কৈবর্ত-কবির আস্তানা কে বলে দেবে? মেলায় দু'চারজনকে জিগ্যেস করেছিলেন, পেয়েছেন নানা উল্টোপাল্টা আর গোলমেলে উত্তর।

আমি কিন্তু জানি বাবু।

চমকে উঠলেন দ্বৈপায়নবাবু। কে, কে বলল একথা?

নিজের ভাবনায় এতই তন্ময় ছিলেন যে পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে খেয়ালই ছিল না। তা এখানে কে আর বলবে কথাটা মাঝি ছাড়া? মাঝিই বলেছে। নৌকোর গলুইয়ের দিকে তাকালেন। আকাশে এক ফালি চাঁদ রয়েছে। গাঙের বুকে একরকম ধূসর আভা থাকে, এখানেও আছে। তবু মাঝি লোকটাকে কেমন দূরবর্তী মনে হচ্ছে। মুখখানা কেমন কুয়াশামাখা।

শুধোলেন, কী যেন বললে তুমি?

উত্তর এল, বললুম আমি জানি।

কী জানো?

যে জন্যে আপনি এয়েচেন। ফকির মণ্ডলের আস্তানা।

দ্বৈপায়নবাবু সত্যিই অবাক, আমি ফকির মণ্ডলের কথা ভেবে এসেছি জানলে কী করে তুমি?

একটা অস্ফুট শব্দ ভেসে এল। মনে হল মাঝি হাসছে।

আগে বলুন ঠিক বলেছি কিনা।

ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি—

বাবু, আপনি কি যাবেন সেখানে?

এই রাতে? আমাকে যে বাড়ি ফিরতে হবে।

তা হলে বাড়িই ফিরে যান। আমি আর কী করতে পারি!

দ্বৈপায়নবাবু বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন। ঝড়-বৃষ্টির দিন হলেও আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। অবশ্য জোরালো বাতাস দিচ্ছে। সেটা যে কোনো মুহূর্তে ঝড়ের হাওয়ায় বদলে যেতে পারে। আর ঈশান-নৈর্ঋৎ থেকে পাহাড়প্রমাণ কালো মেঘও ছুটে আসতে পারে। কিন্তু এ সুযোগ হারালে আর কি ফিরে পাবেন? তবে ভাববার ব্যাপারও আছে। অজানা ভুঁই, অচেনা মানুষ। কিন্তু না, এসব ভাবলে গবেষকদের চলে না। তাছাড়া ওই পরিতোষ পাছাল—

দ্বৈপায়নবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল—নিয়ে চলো হে মাঝি। ফকির মণ্ডলের আস্তানায় নিয়ে চলো। বাড়ি যখন হোক ফিরলেই হল। তবে—

মাঝি যেন বিড়বিড় করে বলল, আমাকে বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি! শুনুন বাবু মানুষ ছাড়া আর কেউ অবিশ্বেসের কাজ করে না।

মাঝির কথাগুলো যেন কেমন কেমন। তবু তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না দ্বৈপায়নবাবু। পরিতোষ পাছালের কথা মনে এলে তাঁর সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায়। আর ফকির মণ্ডলের আস্তানায় যেতে পারবেন, এই বিরল ও অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় তাঁর অন্য সব চিন্তা গুরুত্বহীন হয়ে গিয়েছে।

একসময় গাঙ ফুরোল, মাঝি ডাঙায় নামল আর অন্ধাকারের মধ্যেও আশ্চর্যরকম সহজে হেঁটে চলল। নাকি উড়ে চলল। দ্বৈপায়নবাবু পিছু পিছু হাঁটছেন, তাল রাখতে না পেরে পিছিয়েও পড়ছেন। মাঝি একটু দাঁড়াচ্ছে, হাতছানি দিয়ে ইশারা করছে। শূন্যের পটভূমিতে সেই হাত অদৃশ্য এক সুতোর টানে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে অধ্যাপকমশাইকে। বনজঙ্গল, মাঠ, ভাঙাচোরা বাড়ির আশপাশ পেরিয়ে কিংবা পাশে রেখে মাঝি এক জায়গায় থামল, হাতের আঙুল তুলে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, ওই হচ্ছে ফকির মণ্ডলের বাড়ি।

এর নাম বাড়ি? এ তো উঁচু ঢিবির ওপর ছোটখাটো একটা ভগ্নস্তূপ।

ওটাই বাড়ি আজ্ঞে। মানে ছিল একসময়। তা ধরুন শ-দেড়েক বছর আগে। ওখানে খুঁজুন। যা খুঁজছেন তা পেয়ে যাবেন। তবে খুঁজে বের করা আপনার কম্ম নয়। আমি না হয় সঙ্গে যাচ্ছি। আচ্ছা, আপনি আগে একটু খুঁজে দেখুন, দেখি আপনার কেরামতি।

দ্বৈপায়নবাবুর মনে হল মাঝি লোকটা মুচকে মুচকে হাসছে। তা হাসুক। গবেষক ধরনের

মানুষেরা কীরকম খোঁজারু তা তো আর এই গেঁয়ো লোকটা জানে না। বাড়িটা নেহাত ছোটখাটো ছিল না। পাকা বাড়িই বটে। হয়তো জমিদার রঘুনাথ চৌধুরীর বদান্যতাতেই তাঁর প্রিয় কবি এরকম একটা বাড়ির মালিক হতে পেরেছিলেন। প্রায় সব ঘরই ভূমিসাৎ, কেবল দু'একখানা তখনও ঘাড়ভাঙা দ' হয়ে দাঁড়িয়ে। দ্বৈপায়নবাবুর সঙ্গে টর্চ ছিল। সেটা জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি করলেন তাঁর প্রার্থিত বস্তুর। কিন্তু ঘেমেনেয়ে একসা হওয়াই সার।

এবার দেখুন আমার কেরামতি।

আগে থেকে যেন খুঁজে রাখাই ছিল মাঝির। অন্তত সেইরকম মনে হল দ্বৈপায়নবাবুর। ভাঙাচোরা ছোট একটা ঘর। আগে হয়তো শস্য রাখা হত। তার মধ্যে কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকের ভেতর থরে থরে কয়েকটা খেরোর খাতা সাজানো। লাল কালি দিয়ে লেখা। অক্ষরের গড়ন দেখে মনে হয় খাগের কলমে লেখা। মঙ্গলকাব্যের একটা বিশেষ ধারা নিয়ে লিখেছেন কবি। এগুলো নিছক খাতা নাকি সোনার খনি! দ্বৈপায়নবাবু খাতাগুলোকে বুকে চেপে ধরলেন গভীর আনন্দে। না, তাঁকে আর সিংহাসনচ্যুত হতে হবে না। কোনো পরিতোষ পাছালের সাধ্য নেই তাঁকে টপকে যাবার। কিন্তু যার জন্যে তাঁর এই সৌভাগ্য সেই লোকটা গেল কোথায়? তাকে একটা ধন্যবাদও তো জানাতে হবে। পারলে কিছু পয়সাও হাতে গুঁজে দিতে হবে।

মাঝি, ও মাঝি। কোথায় গেলে হে?

সাড়া নেই। নিঃসাড় নিস্তব্ধ ধ্বংসপুরীতে নিজের কণ্ঠস্বরই কেমন বিচিত্র শোনাল দ্বৈপায়নবাবুর। কোথায় মাঝি?

এদিকে মুশকিল হল কী হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। কখন যে মেঘ জমেছে, হাওয়া উতল হয়েছে অধ্যাপক টেরই পাননি।

রাতটুকি কোনোক্রমে কাটালেন ওই ধ্বংসপুরীতেই। ভোরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সুয্যি উঠল। দিনের আলোয় চারপাশের চেহারা দেখে আঁতকে উঠলেন অধ্যাপকমশাই। এখানে কতকাল যে মানুষ বাস করেনি তা কে বলবে!

সর্বক্ষণের সঙ্গী বড়সড় ঝোলা ব্যাগটায় খাতাগুলোকে পুরে ধ্বংসপুরী থেকে নেমে এলেন দ্বৈপায়নবাবু। একটা পায়ে-চলা রাস্তা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখলেন একজন বুড়ো গোছের লোক একপাল গরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে।

ও মশাই, এদিকে স্টেশনটা কতদূরে বলতে পারেন?

লোকটি ফিরে তাকাল। চোখে-মুখে অবাক হবার ভাব। এই সাত সকালে এমন একজন ভদ্রবেশধারী ভব্য-চেহারার মানুষকে দেখবে বলে আশাই করেনি। বলল, আপনাকে নতুন লোক মনে হচ্ছে। এত সকালে আসছেন কোত্থেকে?

দ্বৈপায়নবাবু সংক্ষেপে যা বলার বললেন, সব শুনে লোকটি বলল, ফকির মণ্ডলের গুষ্টি তো বছর পঞ্চাশ আগেই শেষ হয়ে গেছে। আমরা ছেলেবেলা থেকেই ও-বাড়িটা ওরকমই দেখছি। কাকা-জ্যাঠাদের মুখে শুনেছি জমিদার রঘুনাথ চৌধুরীর পেয়ারের লোক ছিল ফকির মণ্ডল। কী সব লেখাজোখা করত মণ্ডলমশাই। তা কাকা-জ্যাঠারাও তাকে কখনও দেখেনি, গল্প শুনেছে শুধু। আর যে মাঝির কথা বলছিলেন ওর নাম কেষ্ট মাঝি। ও আসলে মণ্ডল বংশেরই লোক। ও যখন মাঝিগিরি করত তখন আমরাই নেহাত ছেলেমানুষ। গাঙে ওঁর নৌকোডুবি হয়। তাতে অনেক যাত্রী মারা যায়। কেষ্ট মাঝিরও হদিস মেলেনি।

দ্বৈপায়নবাবু খুব একটা অবাক হলেন না। ওঁর গোড়া থেকেই কেমন সন্দেহ হচ্ছিল গতরাতের শেষ খেয়ার মাঝি মানুষ নয়, অন্য কিছু।

পুজোর বেশ কিছুদিন পর 'বিচ্ছুরণ' কাগজের অফিসে গিয়েছেন দ্বৈপায়নবাবু, সম্পাদকমশাই একগাল হেসে বললেন, আপানার লেখার রি-অ্যাকশন দারুণ। সুপার-ডুপার হিট। প্রশংসার চিঠির বন্যা একেবারে। আপনার সাম্রাজ্য অটুট রইল মশাই। পরিতোষ পাছাল বিচ্ছিরি রকমের ডুবিয়েছে। অথচ ফকির মণ্ডলের পুঁথির কথা ওকেই আগে বলি, পরে আপনাকে। পাছালকে তো করিৎকর্মা লোক বলে জানতাম, ভুলটা ভেঙে গেল। ফকির মণ্ডলের আস্তানাই বের করতে পারল না, পুঁথি তো পরের কথা। অথচ আপনি পারলেন, ব্যাপারটা কী বলুন তো!

দ্বৈপায়নবাবু অধ্যাপকসুলভ বিনয়-মধুর হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, সে উহ্যই থাক। এ জন্যে আমি যার কাছে ঋণী তাকে না দেওয়া যায় ধন্যবাদ, না পুরস্কার, না উপহার।

'বিচ্ছুরণ'-এর সম্পাদকের মুখে বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা, এরকম কেউ আছে নাকি?

দ্বৈপায়নবাবু রহস্যময় হাসি হাসলেন, আছে। কিংবা ছিলও বলতে পারেন।

কার্তিক ১৪১৮

বাসা বদল

ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায়

একতলা বাংলো বাড়ি। সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে বাজারের দিকে। পিছনে একফালি জমিতে কয়েকটি কাঁঠাল, আম, জাম, নিম গাছ। আগাছা, ঝোপঝাড়। প্রায় ডোবার মতো ছোট একটা পুকুর। পাশে কুয়ো। পাঁচিলের ওপারে ধু-ধু ধানক্ষেত।

শ্যামলী দেবী ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। ভালো লাগছিল। এই কোয়ার্টারটা শহরের বাইরে। শান্ত পরিবেশ, হই-হট্টগোল নেই। উটকো লোক যখন-তখন উপদ্রব করবে না। অনেক দিনের শখ, বাগান করা। ফুলের বাগান। এবার মিটবে।

তবে সে আর কতদিন! বড়জোর দু-তিন বছর। তারপরেই তো 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।' ফের বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে নতুন ঠিকানা। পুলিশ তো নয়, যেন ভবঘুরের জীবন।

আজকের দিনটাই তো! সেই সকাল থেকেই চলছে গুছিয়ে নেওয়ার কাজ। মালপত্র কালকেই এসে গেছিল। পৌঁছবার পর থেকে মুখ তোলার ফুরসত পাননি। তবে বহুদিনের পুরোনো হাবিলদার সুবোধ ছিল। হাতে-হাতে এগিয়ে দিয়েছে। কর্তার তো এ সব কোনও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। গাড়িতে মা-মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে সোজা অফিস। থানার চার্জ বুঝে নিতে হবে।

সবচেয়ে ক্ষতি হয় দোলার লেখাপড়ার । মেয়েটা বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় মনে আছে। হলে হবে কী, বাবার চাকরির কল্যাণে বেচারি একটু থিতু হতে পারে না। দু-বছর হল কি হল না, পুরোনো স্কুল, বন্ধুদের ছেড়ে নতুন স্কুল, নতুন পরিবেশ। ভালো মাস্টারও পাওয়া যায় না সব জায়গায়। কোথাও শহুরে পরিবেশ, কোথাও আবার গণ্ডগ্রাম।

ভাবতেই রাজ্যের চিন্তা ঢুকে এল মাথায়। এই নিশিগঞ্জই বা কেমন হবে? ভালো স্কুল, শিক্ষক পাওয়া যাবে তো? তাছাড়া সবসময়ে একজন কাজের মেয়ে চাই। কাল সুবোধ এলে ওকে খোঁজখবর নিতে পাঠাতে হবে।

—মা, মা! তুমি কোথায়?

দোলনের ডাকে শ্যামলী দেবীর ঘোর গেটে গেল। তাই তো! মেয়েটা একেবারে একলা আছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে।

যা-ই।—শ্যামলী। দ্রুত বাড়ির সামনের দিকে ঘুরলেন।

না, দোলন একা নেই। একজন মহিলার সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছে। ওঁকে দেখে হাত নেড়ে ডাকল।

আসুন।—ভদ্রমহিলা একগাল হেসে বললেন, আমার নাম মলিনা। খবর পেয়ে আলাপ করতে চলে এলুম।

খুব ভালো করেছেন।—শ্যামলীও হাসলেন, আমি শ্যামলী। আসুন, ভিতরে আসুন।

মহিলাকে প্রথম দেখাতেই তাঁর ভালো লেগে গেছে। মোটেই আর পাঁচজন গ্রামের বউ-মেয়েদের মতো নয়। সুশ্রী ছিপছপে চেহারা। কথাবার্তা, ভাবভঙ্গিতে রুচির পালিশ রয়েছে।

বাইরের ঘরে চেয়ারে বসতে-বসতে শ্যামলী বললেন, চা খাবেন তো? একটু চা করি?

কোনও প্রয়োজন নেই।—মলিনা বললেন, আমার চায়ের অভ্যাস নেই। আপনি বসুন, একটু

কথা বলি। এই পোড়াদেশে দুটো মনের মতো কথা বলার লোক পাই না। আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

—আমারও। এক্কেবারে ঠিক কথা বলেছেন দিদি। বেশিরভাগ জায়গায় তো সময় কাটতে চায় না। কী করি, ঘরদোরের কাজকর্ম সেরে বই নিয়ে বসে যাই। আমার মেয়েও লক্ষ্মী। স্কুল থেকে ফিরে একা-একা বেচারি ঘুরে বেড়ায়, নয়তো পুতুল খেলে। তেমন বন্ধু পেলে তো! তবু এবার আপনাকে....কাছেই থাকেন বুঝি? কোয়ার্টারে?

—হ্যাঁ। অনেক দিন একা-একা! মাঝে মাঝে দম আটকে আসে। উপায় নেই। যতদিন না উপরওয়ালার নোটিশ আসছে, পড়ে থাকতে হবে।

—আপনার ছেলেমেয়ে?

—আপনার মতো। একটাই মেয়ে।

—তা-ই? এমা—ওকে নিয়ে এলেন না কেন? দোলার সঙ্গে খেলত। ওর বন্ধু হত। বড় বুঝি?

—না-না, ওরই বয়েসি। একটু চুপচাপ গোছের, কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। দেখি, কাল নিয়ে আসব।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আনবেন। এক কাজ করুন না, ইস্কুল থেকে ফিরলে একটু আগে-আগে পাঠিয়ে দিন। আপনি হাতের কাজ সেরে পরে আসুন। বাচ্চারা মনের মতো সঙ্গী পেলে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে যায়।

—ঠিক আছে। আজ তাহলে উঠি?

—আর একটু বসুন। এই তো এলেন। দিদি, আপনার কর্তা কোথায় আছেন?

—পুলিশে।

—পুলিশে? বাব্বা, কী মিল আমাদের! এই থানায়?

—আগে ছিলেন। এখন—

—বদলি হয়ে গেছেন, তাই না? নতুন জায়গায় বাসা পাননি, আপনাদের নিয়ে যেতে পারছেন না। বড় সায়েবরা দুমদাম বদলির অর্ডারে সই করে দেয়, একবার ফিরেও দেখে না অফিসারদের সুবিধে-অসুবিধে। ওদের আর কী, বলুন? কী বলব দিদি, এইসব যন্ত্রণায় আমার তো পুলিশের চাকরি দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। বাইরে থেকে লোকে ভাবে, কত বড় চাকরি, কত টাকা, কত ক্ষমতা।

—যা বলেছেন! আমার তো জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল।

বলতে-বলতে হঠাৎ মলিনার গলা ধরে এল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন। শ্যামলী অপ্রস্তুত। হয়তো না জেনে মলিনার কোনও গোপন কষ্টে ব্যথা দিয়ে ফেলেছেন।

মলিনা উঠে দাঁড়ালেন। চোখ ছলছল করছে। বললেন, আজ যাই। কাল ফাঁক পেলে চলে আসব।

—নিশ্চয়ই। আমি অপেক্ষা করে থাকব। যত তাড়াতাড়ি পারেন। আর মেয়েকে বলবেন, যখন খুশি চলে আসতে।

কথায়-কথায় কেউই খেয়াল করেননি, সন্ধে পার হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে, জোনাকি উড়ছে।

বাইরে গ্রিল গেটে আলতো শব্দ হল, মলিনার শরীর মিশে গেল অন্ধকারে।

—এ কী গো! সারা বাড়ি যে অন্ধকার। আলো জ্বালাওনি?

টুপিটা হাতে নিয়ে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন অমিয়নাথ চৌধুরী।

জ্বালাচ্ছি বাবা, জ্বালাচ্ছি।—শ্যামলী আপশোসের সুরে বললেন, ইস্‌স, একটু আগে এলেই দেখা হয়ে যেত। খুব মিশুকে মহিলা। এইমাত্র গেলেন। দুজনে সুখদুঃখের কথা বলতে-বলতে সব ভুলে গেছি। কথা বলার লোক তো পাই না।......তোমার আর কী, সারাদিন লোকজন নিয়ে হইহই করছ, ধমকাচ্ছ, চোর-ডাকাত ঠ্যাঙাচ্ছ, আমার যে কীভাবে সময় কাটে—!

—এই দ্যাখো, আবার ফাটা রেকর্ড বাজাতে শুরু করলে! কার কথা বলছ? কে এসেছিলেন?

—মলিনা। ভারি ভালো মেয়ে। আমারই বয়েসি হবে। আমাদের মতন একটাই মেয়ে। বলল তো দোলারই বয়েসি।

—বাঃ তবে আর কী! মা-মেয়ে দুজনেই সঙ্গী পেয়ে গেলে। এই অঞ্চলের বাসিন্দা?

—না গো, সেও ভারি মজার ব্যাপার। সেখানেও মিল। পুলিশ ফ্যামিলি। কর্তা এই থানাতেই আগে নাকি ছিলেন। বদলি হয়ে গেছেন। বাসা পেলে বউ-বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন।

—এই থানাতেই ছিলেন? কী নাম?

এ-হে-হে!—শ্যামলী জিভ কেটে বললেন, দেখেছ, কথায়-কথায় ওর কর্তার নামটা জিগ্যেস করতেই ভুলে গেছি। তুমি নিশ্চয়ই চিনবে। কাল ঠিক জেনে নেব।....চা করি?

—করো। আমি গায়ে জল ঢেলে আসছি। শোনো, সঙ্গে মুড়িটুড়ি থাকলে দিও। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। টিফিন করার সময় পাইনি।

—বলো কী গো! এত কাজের চাপ?

—চাপ মানে? বাপ্‌রে বাপ্! ডিস্টার্বড এরিয়া। গোলমাল লেগেই আছে। জমিজমার গোলমাল, তার উপর ডাকাতি। কালেকই রাতে নাকি দু জায়গায় দুটো মেজর ডাকাতি হয়েছে। একাধিক গ্যাং এখানে অপারেট করছে। সাধে কি আর এখানে আমায় বাড়সায়েব ঠেলেছে!

বলতে-বলতে অমিয়বাবু শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

—এই দ্যাখো! মেয়েটা যে ঘুমিয়ে কাদা।...বাবিসোনা, ও বাবিসোনা! ওঠো, উঠে পড়ো। এরপর রাতে আর ঘুম আসবে না। কাল তোমায় স্কুলে নিয়ে যাব।

মা, মা! একটু আটা দাও তো।

শ্যামলী দেবী দুপুরের রান্না করছিলেন, একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে। বাবার সঙ্গে গেছিল নিশিগঞ্জ গার্লস স্কুলে ভর্তি হতে। একটু আগেই অমিয়বাবু নামিয়ে দিয়ে গেছেন।

—আটা! আটা দিয়ে কী করবি?

—গোল্লা পাকাব।

—গোল্লা?

—হ্যাঁ, গোল্লা। ছোট-ছোট আটার গুলি। মাছের টোপ হবে। বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরব।

—মাছ ধরবি? কোথায় রে?

—কেন আমাদের এই পুকুরে।

—ওই ডোবায়? দূর! ওতে মাছ আছে নাকি? তোর যেমন বুদ্ধি!

—হ্যাঁ, মা আছে। তুমি দাও তো!

—দিচ্ছি, বাবা দিচ্ছি। কিন্তু ছিপ-বঁড়শি পাবি কোথায়? বাবা কিনে দিল বুঝি?

—না, না, কিচ্ছু কিনতে হয়নি। আমাদের এখানেই ছিল। তাড়াতাড়ি দাও।

দোলনের আর তর সইছে না। চোখ দুটো উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে।

শ্যামলী বাটিতে একমুঠো আটা ঢেলে দিলেন। দোলন একছুটে চলে গেল বাড়ির পিছন দিকে। এখানে ছিপ-বঁড়শি পেল কোত্থেকে? অমিয়বাবুর তো কোনোকালে মাছ ধরার বাতিক ছিল

না। আগে থেকেই ছিল? খুঁজে পেয়েছে? হয়তো আগে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের ফেলে যাওয়া জিনিস।

তরকারি কড়াই থেকে বাটিতে নামিয়ে স্টোভ নেভালেন শ্যামলী দেবী। হাত মুছে বেরিয়ে এলেন।

ওই তো! দোলা চুপ করে ডোবার ধারে বসে আছে। ছিপ ফেলে। পাশে একটা কাগজের ওপর আটার ছোট-ছোট গুলি পাকানো।

আশ্চর্য! পাশে একটা চকচকে পুঁটি মাছও শুয়ে আছে। দোলা এর মধ্যে মাছ ধরতেও শিখে গেছে।

মেয়ের পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামলী দেবী। ছিপের ফাতনা কাঁপছে তিরতির করে। একেকবার টুক করে সোজা হচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে।

দোলা ফিসফিস করে বলছে, অ্যাই লিলি, কী করব? টানব? কীরে, কথা বলছিস না কেন? এবার টানব? বল কীরে?....আচ্ছা—

ছিপ ধরে সজোরে টান দেয় দোলা। শূন্যে পাক খেয়ে সুতো-ফাতনা ছিটকে আসে ডাঙায়। বড়শিতে গেঁথে আছে আরেকটা পুঁটি, ছটফট করছে।

আর তখনই মাকে দেখতে পেয়ে গেল দোলা। আনন্দে ডগমগ করছে।

—তুমি! দেখলে মা, দেখলে? এর মধ্যেই দু-দুটো মাছ ধরে ফেলেছি। এই পুকুরে অনেক মাছ আছে। লিলি, লিলি কোথায় গেল বলো তো? দেখেছো ওকে?

লিলি!—শ্যামলী ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, আমিই তো এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম তোর পিছনে।

—সে তো দেখছিই। ওখানে লিলিও ছিল। ওকে দ্যাখোনি? কী বলছ? ওই তো আমায় সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিল। কিভাবে বঁড়শিতে টোপ পরাতে হয়, ছিপ ফেলতে হয়, ফাতনা নড়লে ছিপে টান মারতে হয়, সব। বলল, মাছ ধরার সময় কথা বলতে নেই। জলে মধ্যে শব্দ হয়, মাছ পালিয়ে যায়। ছোট ঘরটা থেকে ছিপ খুঁজে দিল। কুলুঙ্গির ওপর রাখা ছিল, আমি পেড়ে আনলাম। ও এই বাড়ির সব চেনে।

—লিলিটা কে, সেটা বলবি তো? যে ইস্কুলে গেলি, ওখানে পড়ে? আজ আলাপ হল বুঝি?

—ধ্যাৎ! তুমি না মা, কিচ্ছু বোঝ না। লিলিকে চিনলে না? কাল যার কথা বলছিলে তোমরা। মলিনা কাকিমার মেয়ে।

—মলিনার মেয়ে। দ্যাখো কাণ্ড! সে এসে গেছে? তোর সঙ্গে ভাবও হয়ে গেছে? খুব ভালো! আমায় দেখে লজ্জা পেয়ে লুকোল বুঝি? খুব দুষ্টু তো! দ্যাখ, দ্যাখ, ধরে নিয়ে আয় ওকে।

দোলা ছিপ-টিপ ফেলে ছুটল। শ্যামলী খুব খুশি। যাক এতদিনে মেয়েটার একটা সঙ্গী জুটল। সারাদিন বেচারি একা, মনমরা হয়ে থাকে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে দোলা হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। ঠোঁট ওল্টাল।

—কীরে, বন্ধুকে খুঁজে পেলি না? এইটুকু তো বাড়ি।

—না মা, সব জায়গায় খুঁজলাম।

—তুই একটা ভোঁদা। ভালো করে দ্যাখ, খাটের তলায়-টলায় লুকিয়ে আছে। বা হয়তো ওই ছোট ঘরটার কোথাও—তুই তো বললি, ও এই বাড়িতে আগে এসেছে। কোথায় কী আছে, সব জানে।

—এসেছে কী মা, ও তো বলল ওরা আগে এই কোয়ার্টারেই থাকত।

—এখানেই থাকত? ওর বাবা কি এই থানার বড়বাবু ছিলেন?

—তা বলতে পারব না। সেসব কিছু বলেনি।

—জিগ্যেস করবি তো! তোকে নিয়ে আর পারি না। কাল ওর মা অবশ্য বলল, কাছেই থাকে। ওর বাবা বদলি হয়ে গেছেন। বাসা পেলে নিয়ে যাবেন। এতক্ষণ একসঙ্গে আছিস, কোনও কথাটাই ঠিকঠাক বলতে শিখলি না।....আমি যাই, মাছের ঝোল বাকি আছে। লিলি এলে আমার কাছে নিয়ে আসিস। একটু মিষ্টি-টিষ্টি দেব। ছোট্ট মানুষ, এই প্রথম এল।

শ্যামলী বাড়ির দিকে হাঁটলেন। মেয়েটা বড্ড লাজুক। মলিনা বলেছিল। মায়ের ঠিক উলটো।

বাইরের ঘর পেরিয়ে বাঁ-দিকে রান্নাঘর, ডানদিকে শোবার ঘর। বড় চৌকি পাতা। শ্যামলী থমকে দাঁড়ালেন।

বিছানার চাদর লণ্ডভণ্ড, কুঁচকে গেছে। সাদা চাদরের ওপর কাদাপায়ের ছাপ। ছোট-ছোট পা। এইমাত্র যেন বাচ্চারা খাটে উঠে হুটোপাটি করে গেছে।

ওফ্, এদের নিয়ে পারা যায় না। নিশ্চয়ই লিলি আর দোলা খাটে উঠে লাফালাফি করেছে। একা থাকলে দোলা খুবই শান্ত। যেই বন্ধু পেয়েছে, অমনি লাগামছাড়া।

রাগে গা জ্বলে গেল শ্যামলীর। নাঃ, লিলি চলে গেলে ওকে কষে বকুনি দিতে হবে। সদ্য কাচা চাদর, আজই পেতেছেন, এই অবস্থা করে ছেড়েছে। এখন আবার নতুন একটা পাততে হবে। এতে তো আর রাতে শোওয়া যাবে না।

নিজের মনে গজগজ করতে-করতে শ্যামলী রান্নাঘরে ঢুকলেন।

—বউদি! বউদিমণি!

সুবোধ ডাকছে। কাল বিকেলে গেছে, আজ এতক্ষণে এল। পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, সকাল হলেই চলে আসতে। মহা ফাঁকিবাজ।

—ব্যাপারটা কী সুবোধ? এখন ক'টা বাজে? কাল তোমায় কি বলে দিয়েছিলাম?

—বউদিমণি, ইস্টিশনে গেছিনু। সার টিকিট কাটতে পেইঠেছিলেন। লম্বা লাইন ছেল।

—ট্রেনের টিকিট? কার?

—আপনাদের গো বউদিমণি। সার এই চিঠি দেছেন।

সুবোধের হাত থেকে হতভম্ব শ্যামলী চিরকুটটা নিয়ে পড়ে ফেললেন। তিন লাইনের চিঠি। 'আজ রাতেই কলকাতা যেতে হবে, মার শরীর খারাপ। রেডিওগ্রাম এসেছে। ব্যাগ গুছিয়ে নিও।'

ঠিক তখনই বাড়ির পিছনদিক থেকে দোলা দৌড়ে এল।

—মা! এই দ্যাখো! আটটা পুঁটিমাছ ধরেছি।

দোলার চোখেমুখে খুশি জ্বলজ্বল করছে। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না শ্যামলী।

—একটু ভেজে দাও না মা!

—দিচ্ছি, একটু সবুর কর। তোর বন্ধুকে নিয়ে আয়।

—লিলির কথা বলছ?

—না তো কী! কোথায় সে?

—ও চলে গেছে মা।

—সে কী রে! তোকে এত করে বললাম, নিয়ে আসতে। প্রথম দিন এল।

—বলেছিলাম মা। ও বলল, তাড়া আছে। কাল আসবে।

—সত্যি, তুই না—! ওকে মাছ দিয়ে দিয়েছিস?

—নিল না মা। আমার থেকে অর্ধেকটা, চারটে দিয়েছিলাম। বলল, ওরা নাকি মাছই খায় না।

—শুয়ে পড়েছ?

—না। কিছু বলবে?

—বলছি, মার কি বাড়াবাড়ি কিছু হয়েছে?

—মনে হচ্ছে। নইলে রেডিওগ্রাম আসত না। আমি তো ধরেই নিয়েছি, তোমাদের এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকতে হবে।

—সেজন্যেই কি তুমি এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে বললে?

—ঠিক সেজন্যে নয়। তোমরা নিশিগঞ্জে থাকলেও আমি বাসা পালটাতাম।

—কেন বলো তো? অত সুন্দর বাংলো-বাড়ি, কতখানি খোলা জায়গা, বাগান-পুকুর। আমার তো ভারি পছন্দ হয়ে গেছিল। তোমার কি থানা দূরে বলে সমস্যা হবে, ভাবছ?

—ওটুকু সমস্যা মানিয়ে নেওয়া যেত।

—তবে? তবে শুধুমুদু বাসা বদলাচ্ছ কেন? আমরা ফিরে এলে ওখানেই থাকব। আমি একটা সমবয়েসি সঙ্গী পেয়েছিলাম। কি মিশুকে মেয়ে, গল্পে গল্পে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত। বাবিসোনারও বন্ধু জুটে গেছিল। একদিনেই দুজনে গলায়-গলায় ভাব। আমার তো মলিনার জন্যে মন-খারাপ করছে। হয়তো আর দেখাই হবে না।

—দেখা না হওয়াই ভালো।

—ভালো! কী বলছ?

—হ্যাঁ, আর দেখা না হওয়াই ভালো। দাঁড়াও, কোন স্টেশন এল দেখি।

রাতের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ঘটাং ঘটাং করতে করতে থামল। অমিয়বাবু মাথা তুলে দেখলেন, বেলডাঙা। জনশূন্য প্ল্যাটফর্ম। তারপর বললেন, যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি।

শ্যামলী উত্তেজিতভাবে বার্থে উঠে বসলেন।

—কী বলতে চাইছ, খুলে বল! আমার এইসব রহস্য ভালো লাগছে না।

—তুমি সহ্য করতে পারবে?

—না পারার কী আছে? তুমি বলবে, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ওদের ফ্যামিলি ভালো নয়। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করো না। এই তো?

বাঃ! তুমি দেখছি, নিজেই সব বলে যাচ্ছ!—অমিয়বাবু ম্লান হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি খবর নিয়েছি। খবর নিয়ে কিছুই জানতে পারিনি। নিশিগঞ্জের একজন লোকও মলিনা, তার মেয়ে বা কর্তাকে চেনে না। এরকম কোনও পরিবার এ-তল্লাটে থাকে না।

একটু থেমে বললেন, তুমি বলেছিলে, মলিনার স্বামী এই থানাতেই ছিলেন। আমি আজ সকালে থানার রেকর্ড বুক নিয়ে বসেছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে এক দারোগা নিশিগঞ্জ থানার চার্জে ছিল। নরেশচন্দ্র সরকার। তার স্ত্রীর নাম মলিনা, একমাত্র মেয়ের নাম লিলি। স্ত্রী এবং মেয়ে দুজনেরই এক রাতে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। সম্ভবত সুইসাইড। মা মেয়েকে বিষ খাইয়ে নিজেও খেয়েছিল....

শ্যামলী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না।

—নরেশ সরকার তার আগেই কোনও একটা অভিযোগে সাসপেণ্ড হয়েছিল। সেই অভিমানেই বোধহয় মলিনা.....এটা আমার অনুমান। কারণ, এর পরে ফাইল বা রেকর্ড বুক দেখার আর সময় পাইনি। বাড়ির খবরটা, কতগুলো জমিজমার মামলার বাদী-বিবাদীরা থানায় এসে গেল। শেষ পর্যন্ত নরেশ সরকারের কী হয়েছিল, জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই।

শারদীয়া ১৪১২

এক ভূত-মানুষের গপ্পো

ডাঃ মহুয়া দাশগুপ্ত

এটা ভূত-মানুষের গল্প। তার নাম গোপলু। সে ছোট্ট ভূত। তার সঙ্গীসাথীরা তাকে ত্যাজ্যভূত করেছে। কারণ সে মানুষদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে।

সঙ্গীরা ছাড়লেও গোপলু ছোট্ট ছোট্ট মানুষ বন্ধুদের সঙ্গে মস্ত এক হাউজিং সোসাইটি যার নাম অচিনপুরী সেখানে বেশ দিব্যিই আছে। তার বন্ধুরা তাকে ম্যাজিক আঙ্কল বলে ডাকে। তাদের কাছে সে 'ওপেন সিক্রেট'। সব বড়রা অবশ্যি তার কথা মানে না। কারণ, তারা বড় হতে গিয়ে ছোট হতে ভুলে গেছে।

সব বললাম, কারণ, কেউ কেউ তাকে হয়তো অন্যরকম—

ফ্ল্যাট তিনশো একে মহাব্যস্ততা। গতকাল থেকে কত লোক যে ঢুকছে, বেরুচ্ছে! এই মাত্র দোতলায় রায়রা হাতে করে উপহার নিয়ে ঢুকল। তাদের পিছু গোপলুও।

বসার ঘরে অনেক লোক। চা খাচ্ছে, মিষ্টি মুখে পুড়ছে। গোপলুর পা আটকে গেল। বড় বড় ছানার মিষ্টি—মোটা ক্ষীরের চাদরে জড়ানো! পেটমোটা মজুমদারের প্লেটে চারটে বড় ক্ষীরকদম। দুটো মুখে।

গোপলু সোফায় উঠে তার ঘাড়ে ফুঁ দেয়। অন্যমনস্কভাবে ঘাড় চুলকায় মজুমদার। সেই সুযোগে দু'খানা ক্ষীরকদম গোপলুর পেটে।

খানিক পরেই প্লেটে নজর পড়ে মজুমদারের। হিসেবটা গুলিয়ে গেছে ভাবল। এদিকে গোপলু খুশি মনে এতগুলো মানুষের খুশির হিসেব খুঁজতে বেরুল।

তিনশো একে ওর আনাগোনা নেই। এখানে ওর সাইজের কেউ নেই যে। সে নিয়ে এ ফ্ল্যাটের মালিক দুবেজীকে সঙ্গীসাথীদের কাছে দুঃখ করতে ও শুনেছে। মর্নিং ওয়াকের ফাঁকে মাছ-পুকুরের ধারে বসে ওনারা জিরোন। সে সময়ে গোপলুও আশপাশেই থাকে কি না!

দুবের নাকি খেলা করার সঙ্গী নেই! দশ বছর বিয়ে হল বেটার ঘরে নাতি হল না—

ফ্ল্যাটের ভিতর এ ঘর সে ঘর করতে করতে গোপলু ডান দিকে কোনার ঘরটায় ঢুকে পড়ে। কোণে রাখা একটা চেয়ারে সাদা পোশাক পরা এক ছোট্টখাট্ট মহিলা। তার নজর খাটের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে গোপলু দেখে খাটের উপর গোলাপী মশারির মধ্যে ছোট্ট একটা পুতুল! সেও বেশ গোলাপী গোলাপী। ঘুমাচ্ছে। মাঝে মাঝে অবশ্য পিটির পিটির তাকাচ্ছে আবার হাসছেও।

গোপলু সটান গিয়ে তার পাশটিতে বসে গালে আলতো করে হাত বোলাল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, আমরা বন্ধু। ছোট্ট পুতুলটা পটাং করে চোখ মেলে গোপলুর দিকে পষ্ট তাকিয়ে ঠোঁট নেড়ে বলল, বন্ধু। তারপরই চোখ বুজে ঘুমের কোলে হারিয়ে গেল।

তার আয়া-মাসি দু'বার নিজের কপাল-বুকে দু'আঙুল ছুঁইয়ে তার মাথায় দু'বার ছুঁইয়ে কী যে সব বিড়বিড় মন্ত্র জপল, গোপলু সে ধাক্কায় এক্কেবারে আউট!

দেখতে দেখতে ছ'সাত মাস কাটল। ছোট্ট পুতুলটা বেশ সড়গড় হয়ে উঠেছে। তার নাম

উতল। সবার সঙ্গে তার ভাব। সবচেয়ে বেশি ভাব গোপলুর সঙ্গে। সেই প্রথম দিন থেকে। যখন উতল না-মানুষ-না-পরী এমন একটা অবস্থায় ছিল।

উতল খুব চটপটে আর ছটফটে। তিনমাসে বসতে শিখেছে! চারমাসে হামা! একবার তো তিনমাসের ঘুমন্ত উতলকে খাটে শুইয়ে রেখে তার মা চান করতে ঢুকেছিল। সে সময়েই সে উঠে পড়ে এক্কেবারে খাটের কোনায়। ভাগ্যিস গোপলু ছিল। সে চট করে উল্টোদিকে মানে খাটের মাথার দিকে গিয়ে নাচানাচি শুরু করল—সে দেখে উতল ঘুরে গেল! যতক্ষণ না 'ভাবী' চান সেরে বেরুল ততক্ষণ সেদিন গোপলুকে নাচতে হয়েছিল।

এইটে এখন গোপলুর নতুন কাজ! ওর পুরোনো বন্ধুরাও ওকে মিস করে।

যাই হোক উতলের দুষ্টুমির লেখাজোকা নেই। শুধু নিজের কাজগুলো যেমন খাওয়া, চান করা এসবে তার ভারী আপত্তি!

ভোর সাড়ে ছ'টায় উতলের দাদি একবাটি দুধ-সুজি নিয়ে খাওয়ানো শুরু করে। ঝিনুকে করে গলায় ঢালে। উতল গরগর আওয়াজ তোলে। মুখ বন্ধ করে রাখে। গাল ফুলিয়ে রাখে। ঠোঁট চিপে রাখে। কত কীই যে করে! গোপলু দাদিকে হেল্প করার জন্য অঙ্গভঙ্গি করে। সে সব দেখে উতল হাসে—মুখের দুধ-সুজি গড়িয়ে পড়ে। গোপলু জিভ কাটে। উতল হাত-পা ছোঁড়ে। দুধ-সুজির বাটি উল্টে দাদির কোলে! হে রাম—হে রাম করতে থাকে দাদি। ব্যাস্ গোপলুও সেখান থেকে ফটাস্।

তবে, গত ক'দিন উতলের কাছে যেতে পারেনি গোপলু। তার দুটো কারণ। এক, উতলের দাদির ধারণা, তার নাতির নজর লেগেছে। তাই সে শুকিয়ে যাচ্ছে। এটা সত্যি নয়। উতল বেশ গাবলা-গুবলো, কিন্তু দাদিদের ধারণা তো কেউ পাল্টাতে পারে না। যাই হোক, এ কারণে দুবেদের বাড়িতে দু'দিন আগে ঝাড়ফুঁক, পুজো-টুজো হয়। এ ফলে হোক বা এর-ওর বাড়িতে আনতাবড়ি খাওয়ার ফলেই হোক গোপলুর শরীরটা একটু খারাপ হল। এ কী? তোমরা অবাক হচ্ছ? না, না—ভূতেদেরও শরীর-মন এসব খারাপ হয় বৈকি। তারা তো সৃষ্টিছাড়া নয় রে বাবা! তবে, সাধারণত তারা আপনা-আপনি ঠিকও হয়ে যায়।

ঠিক হওয়ার পর গোপলুর তো বেশ খিদে পেল। কেয়ারটেকারের ঘর থেকে ভেসে আসা গন্ধটায় ওর খিদে আরও চাগাড় দিল। কেয়ারটেকারের নাম যতীন।

যতীন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। তার ইস্কুলে পড়া ছোট মেয়ে টুলে বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরিজি অ্যালফাবেট পড়ছিল। এর পর নামতা। বাবা ঝাঁট দিলে কি হবে, আর ও বাড়ির মোতিমাসির সঙ্গে গল্প করলেই বা কী, একখানা কান তার এদিকেই খাড়া। পুতুলও অবিশ্যি কায়দা জানে। টুলের উপর ভাত আর ডিমের তরকারি ঠাণ্ডা হচ্ছে। দশ দশকে না পড়া অব্দি খাওয়া যাবে না। বাবার হুকুম।

জিভের জল সুড়ুৎ করে টেনে পুতুল দৌড়য় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, পাঁচ দশে পঞ্চাশ, ছয় চারে.....। তার চোখ বাঁই বাঁই ঘোরে চারিদিকে।

বিপদ হঠাৎ এল। আট দু-গুণে ষো....বলতে বলতে পুতুলের মুখ গোল হয়ে গেল। সে দেখল ডিম-ভাত হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। বা-বা-আ বলে ডুকরে উঠল পুতুল।

কী রে? যতীন হাঁক পাড়ে।

ভূ—বলতে গিয়ে থেমে যায় পুতুল। গোপলু তারও খেলার সঙ্গী। মাঝেসাঝে কারু হাত থেকে আইসক্রিমের কাঠিটা বা ঝালমুড়ির ঠোঙাটা যে তাকে দেয়নি এমন তো নয়! বা, মোটি টিল্লুর হাত থেকে বাঁচায়নি এমনও নয়। তাছাড়া ভূত-টুত যদি বাবা না মানে? তাকেই পেটায়? তাই বুদ্ধিমতী পুতুল নাকিসুরে বলে—নেগেঁচে। তারপর গোপলুকে এত্তবড় জিভ বার করে ভ্যাঙচায়।

এদিকে গোপলু যে ভালো হয়ে উঠেছে সে খবর টের পেয়েছে উতলও। অ্যাদ্দিন সেও অনেক ঝামেলা করেছে। মাঝরাতে কেঁদে উঠেছে। স্বপ্ন দেখেছে এই মনে করে তার কপাল-পা মিলিয়ে মা-ঠাকুমা মিলে খান দশেক কাজল টিপ পরিয়েছে, কোমরে ঝুলিয়েছে খান ছয়েক ঘুনসি। ওর যে বন্ধুকে হারিয়ে মন খারাপ, তা এরা বুঝবে কী করে?

পুতুলের পড়া-কান্না-চেঁচামেচি সবই উতল শুনেছে। সে তো 'অ্যাড্ভ্যানস্ড' বাচ্চা। সে ডাক পাঠিয়েছে তার বন্ধুকে—গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে। সে ভাষা আর কেউ না বুঝলেও, তার বন্ধু বুঝবে—এটা সে জানে। এসব ব্যাপার বাচ্চাদের থাকে। বড়রা তা বুঝতে পারে না। প্রাকৃতিক ব্যাপার বড়রা কবেই বা বুঝেছে? কাকেদের দেখো—যখন ক্ক ক্ক ডাকে তখন তারা কৌতূহলী, ঝগড়া করার সময় ক্যা ক্যা, ভিজে গেলে আরও দু-চারটে অ্যা যোগ হয়। ভোরে যখন গলা সাধে তখন ক্কা-আ-আ ডাক ছাড়ে। চাইলে, ঠিকই বুঝবে।

এদিকে তখন বাড়িতে ঠাম্মা আর ঠাকুরদা ছাড়া কেউ নেই। ঠাম্মা ঠাকুরদাকে পাহারায় রেখে চানে গেছে। নাতির চেঁচামেচি শুনে ঠাকুরদাদা নার্ভাস। কোলে নিয়ে ঘোরায়—ভোলায়। উতল ভারী ইনটেলিজেন্ট। সে তাড়াতাড়ি নেতিয়ে পড়ে। না হলে ঠাকুরদা তাকে সামলাতে পারত? মাঝখান থেকে ঠাম্মা কলঘর থেকে বেরিয়ে ঠাকুরদাকে বকাবকি করত কোনো কাজের না বলে!

কিন্তু বন্ধু এল না কেন? উতলের ভারী রাগ হল।....

গোপলু আসবে কী? সে ঝাড়ফুঁকের ভয়ে আর এধারে সহজে ঘেঁষছে না।

উতল রাগে ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলল দু'বার।

ঠাকুরদা দেখল নাতি গভীর ঘুমে। তাই অমন শ্বাস ফেলছে। সে নাতিকে বিছানায় শুইয়ে খেলার খবরের পাতায় ডুব দিল।

উতলকে দিনের বেলায় মেঝেতে বিছানা পেতে শোয়ানো হয় আজকাল। সে খানিক বাদে চোখ খুলে চারপাশ দেখে হামা টেনে দরজার দিকে এগোল।

বাজার নিয়ে ঘরে ঢুকছিল বাঁকা। তার হাতে চারটে মস্ত থলি। সে টেরও পেল না কখন কোন থলির আড়ালে উতল হামা টেনে বাইরে চলে গেল।

লিফটে চড়ে বাঁকা নেমেছে, লিফটের দরজা তখনও খোলা। উতল গুটগুটিয়ে তার ভিতর ঢুকতে না ঢুকতেই লিফটের দরজা বন্ধ।

খানিক বাদে উপর থেকে কেউ বোতাম টিপেছে। উতলসুদ্ধু লিফট সড়াৎ করে উপরে উঠে গেছে। সোজা দশতলায়।

বোতাম টিপেছিল চাঁদু। সে ম্যাগাজিন এডিটর। এগারোটায় অফিস বেরোয়। চাঁদু বংশপরম্পরায় বেজায় বড়লোক। কাজ-টাজের তার বিশেষ দরকার নেই। তবু কিছু একটা করা! সে কিন্তু পত্রিকার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। প্রচুর ভাবনা-টাবনা করে। এখনও লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। কী যে ভুলে যাচ্ছে? আরে—আজই অ্যাক্টর চাওনির একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে। একটা ফোন করে কনফার্ম করতে বলেছিল না? আরেঃ, মোবাইলটাই তো নিতে ভুলে গেছে। ভাগ্যিস! এই ডাবলুটার জন্য! বেরোনোর সময় যত ঝামেলা! চাঁদু ফের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ায়—মোবাইলটা আনতে।

দশতলায় পৌঁছে অটোমেটিক লিফট হাঁ করে দাঁড়ায়। কার অপেক্ষায়। কেউ ঢোকে না। তবে উতল হামা টেনে বেরিয়ে যায়। খানিক অপেক্ষা করে লিফট আবার নীচে নেমে যায়।

উতল দশতলায় নেমে দেখল কেউ কোত্থাও নেই। এই ফ্লোরটাই শেষ ফ্লোর। টানা বারান্দার শেষ মুড়োয় একখানা বড় ফ্ল্যাট। বারান্দার সামনে মস্ত টেরাস। মাঝে ফ্রেঞ্চ উইনডো। টেরাসে গ্রিলের রেলিং, উপরে ফলস্ সিলিং। ক'টা টব রেখে একটু বাগান করার চেষ্টা। বসার জন্য

দু-চারটে বেঞ্চিও আছে। এখান থেকে পাখির চোখে শহরের অনেকটা দেখা যায়—নানান শহুরে জটিলতা মাইনাস করে উপভোগ করা যায় সূয্যি ওঠা বা চাঁদ ডোবা। যে কেউ আসতে পারে এখানে—তবে রাতে কেয়ারটেকার এসে তালা দিয়ে যায়।

কিন্তু, এখুনি একজন এখানে ঢুকেছে—সে উতল। আরও একজন সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছে—সে ডাবলু। তার মনিব সাত-পাঁচ ভাবনার চোটে ফ্ল্যাটে তালা না দিয়ে চলে গেছে এবারে—আর দরজা খোলা পেয়ে দু'লাফে টেরাসে চলে এসেছে ডাবলু।

উতলকে পেয়ে ডাবলু খুব খুশি। সে মুখ তুলে উয়াও উফ্ করে পেল্লায় ডাক ছাড়ল। সে ডাক শুনল গোপলুও।

সময় নষ্ট না করে ডাবলু দাঁতে চিপে তার বলটা নিয়ে এল। চাঁদুকেও খেলতে বলেছিল—তা তার সময় নেই! সে বলটা উতলের দিকে ছুঁড়ে দিল। উতল দ্রুত হামা টেনে বলের পিছনে দৌড়ল। খুশির চোটে গড়াগড়ি দিল ডাবলু।

সারা টেরাস ধরে দুজনের দস্যিপনা শুরু হল।

এদিকে তিনশো একে বেজায় শোরগোল পড়ে গেছে। উতল যে নেই এটা ঠাম্মা কলঘর থেকে বেরিয়েই দেখেছে। দুবেজী ততক্ষণে মুখের উপর কাগজ চাপা দিয়ে ঘুমে। বাঁকা রান্নাঘরে ব্যস্ত। উতল উতল—ঠাম্মা শোরগোল তোলে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে দুবে। বঁটি ফেলে ছুটে আসে বাঁকা। এ-ঘর-ও-ঘর-বারান্দা-বাথরুম আতিপাতি করে সব খোঁজা হয়। কোথায় উতল?

এদিকে টেরাসে উতলও কান্নাকাটি জুড়েছে। তার খিদে পেয়েছে। খেলতেও আর ভালো লাগছে না। মা কোথায়? বাবা? ঠাম্মা? ঠাকুরদা? বাঁকা? ডাবলু তার পেডিগ্রি ফুড এনে নতুন বন্ধুকে দিয়েছে। তার থেকে কটা চিবিয়ে উতলের কান্নার পারদ আরও চড়েছে।

ঠাম্মার দু'চোখ বেয়ে জল গড়ায় অবিরাম। সে পুজোর ঘরে ঢুকে কৃষ্ণঠাকুরের পায়ে শুয়ে পড়ে মাথা কুটতে লাগল। সত্য দুবের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সে ভেবেই পায় না কোথায় গেল উতল। ফোন ঘোরাতে থাকে দুবে। থানা-ফায়ার-স্টেশন-ছেলে—সবাইকে ফোন করতে থাকে।

খবর পেয়ে ছেলে নীতিন ঘাবড়ে যায়। সে মিটিং ক্যানসেল করে বৌ-এর স্কুলে যায়, তাকে তুলে নিয়ে বাড়ি আসে। রকম দেখে ঘাবড়ে যায় পুষ্পাও। সে বলে, কী হল? ড্যাডির কিছু হয়েছে? মাম্মির?

না না । ঘাড় নাড়ে নীতিন।

তাহলে? চেঁচিয়ে ওঠে পুষ্পা।

উতল। উতলকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কী? কে কিডন্যাপ করল? পুষ্পা চোখের সামনে আঁধার দেখে।

এদিকে উতল কাঁদতে কাঁদতে এক্কেবারে টেরাসের কিনারে চলে এসেছে। রেলিংটাও নিচু হাইটের আর তার থামগুলোর মধ্যেও অনেক ফাঁক। সে ফাঁক দিয়ে সে হাত তারপর মাথাটাও বার করেছে। তারপর গলা—বুক—

উতল বুদ্ধিমান—কিন্তু এখন ওর সব গুলিয়ে গেছে। বিপদ আঁচ করল ডাবলু। সে দৌড়ে এসে উতলের প্যান্ট খামচে ধরল। তাতে কত আটকায়? এদিকে ছেড়ে দিলে যদি সে পড়ে যায়? ডাবলু চিৎকারও করতে পারছিল না।

নীতিন তখন কমপ্লেক্স-এ ঢুকছিল। গোপলু হিন্দালুর বারান্দায় বসে আমকাসুন্দি চাটছিল—সে অসময়ে নীতিনের গাড়ি দেখে কৌতূহলী হল। কিন্তু, গাড়ি থেকে নীতিন আর পুষ্পাকে কাঁদতে কাঁদতে নামতে দেখে সে বেশ ঘাবড়েও গেল। ভয় আর কৌতূহল দুয়ের মধ্যে কৌতূহলের জিত হল। সে পুষ্পার পিছনে তিনশো একে ঢুকল। তারপর, তার ব্যাপার বুঝতে সময় লাগল না বেশি।

বন্ধুকে খুঁজতে মানুষগুলোর সঙ্গে গোপলু ভূতও সারা তল্লাট ঘুরে ফেলল। আরও তাড়াতাড়ি। হাওয়ায় ভেসে সাঁৎ করে উঠে গেল ছাতে—সেখান থেকে ভালোভাবে দেখবে বলে। আর—নীচে তাকিয়ে তারও বুক হিম। উতল তখন ঝুলে আছে কার্নিশের কোনায়।

তাড়াতাড়ি টেরাসে নামল গোপলু। তাকে দেখে বেজায় ভয় পেয়ে দাঁতমাত ছেড়ে লেজ গুটিয়ে ডাবলু দৌড় দেবে—তার আগে গোপলু পালাল। সোজা তিনশো একে।

সেখানে গিয়ে পুষ্পার কানে সে ফিসফিস করতে লাগল।

পুষ্পা ভাবে কানে কেন হাওয়া লাগে? সে দু'বার অন্যমনস্কভাবে হাত নাড়ল। কিন্তু তার কানে কে যেন সমানে কোথায় যেতে বলছে। সে মন দিয়ে শুনল তরপর 'উতল উতল' করে লিফটের দিকে দৌড়ল। ততক্ষণে তিনশো একে অনেক লোক। তারাও সিঁড়ির দিকে ছুটল।

পুষ্পাকে গাইড করে নিয়ে চলল অদৃশ্য গলা। পুষ্পা তখন ভাবছে কৃষ্ণ-ভগবানই তাকে সাহায্য করতে এসেছেন। টেরাসের কিনারে পৌঁছে ছেলেকে অমন অবস্থায় দেখে পুষ্পার বুক কেঁপে উঠল। সে ছুট্টে গিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিল।

ডাবলু অনেক বাহবা পেল। সে দাঁত দিয়ে প্যান্ট কামড়ে ধরেছিল, ভূত দেখেও পালায়নি, মেডেল তো তার পাওয়ারই কথা। তবে, এর পর থেকে চাঁদু আর ফ্ল্যাটে তালাচাবি লাগাতে ভুলত না।

পরিবর্তন হল তিনশো একেও। নীতিন উতলের জন্য বারো ঘণ্টার আয়া রাখতে চেয়েছিল। বাধা দিল পুষ্পা। সে বলল, ভেবো না, ওর বন্ধু আছে। সেই ওকে দেখবে।

তুমি কী করে বুঝলে? কে ওর বন্ধু?

আছে, আছে। তাই না রে উতল? পুষ্পা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল।

উতল দুধে-দাঁতে হাসে। মা সব বোঝে। সত্যি কি তাই?

এরপর আবার পুরোনো রুটিন—

ঠাম্মার কোলে উতল। চোখ বন্ধ। মুখভর্তি দুধ-সুজি। গলায় সুড়সুড়ি দিয়েও গেলানো যাচ্ছে না। গোপলু ঠাম্মাকে সাহায্য করতে মুখ ফোলায়, জিভ বার করে, এক চোখ উপরে তুলে অন্য নাক ফোলায়—চোখের কোণে এসব দেখে উতল ফ্যাচ্ করে হেসে ফেলে। মুখভর্তি দুধ-সুজি ঠাম্মার চোখে-মুখে ঠিকরে লাগে। মনে হয় ঠাম্মা সুজির টিপ পরেছে। গোপলু খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বারান্দার কাকটা ক্ক ক্ক করে জানতে চায়—এত হাসি কিসের।

ঠাম্মা 'আর পারি না বাবা' বলে চামচ-বাটি রেখে মুখ ধুতে ওঠে—গোপলু টুপ করে দুধ-সুজির বাটিতে ডুব লাগায়—

শারদীয়া ১৪২০

প্রকৃত বন্ধু

শ্রীশশিভূষণ মণ্ডল

গাঁয়ের দু'জন যুবক। প্রাণবন্ধু ও জগবন্ধু। নামের মিল দেখে মনে হয় দুই সহোদর, কিন্তু তা নয়। তবে তারা পরস্পর সহোদর ভাই না হলেও তাদের বন্ধুত্ব ছিল ভ্রাতৃত্বের চেয়ে ঢের বেশী গাঢ়। একসঙ্গে খেলাধুলো করে, গ্রীষ্মের দুপুরে পরের গাছের কাঁচা আম পেড়ে নুন দিয়ে খেয়ে, পাঠশালা পালিয়ে পদ্মদীঘিতে শালুক তুলে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়িয়ে, বল-খেলায় হেরে মারামারি করে, রাত্রে গুরুজনদের লুকিয়ে যাত্রা শুনে এবং এমনি ধারা আরও কতশত কীর্তি-কলাপের ভেতর দিয়ে তারা শৈশব থেকে কৈশোর কাটিয়ে আজ এসে পা দিয়েছে যৌবনে। দু'জনের বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় থেকে আরও গাঢ়তর হয়েছে। একটু-আধটু মান-অভিমান বা বাদানুবাদ যে কোন সময় হয়নি তা নয়, তবে তা সঙ্গে সঙ্গেই মিটে গেছে।

আজ তারা সংসারী। দু'জনেই বিবাহিত; সন্তানের পিতা। উপজীবিকা হিসেবে তারা তরি-তরকারির ব্যবসা করে। দুপুরের পরে কাছের বা দূর গ্রামের হাট অথবা বাজার থেকে কিংবা লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তারা বিভিন্ন রকমের তরকারি সংগ্রহ করে নিজ নিজ ঝাঁকা ভরতি করে। তারপর সেই ঝাঁকা মাথায় নিয়ে তারা নিয়মিত একসঙ্গেই ক্যানিং লাইনের কলকাতাগামী প্রথম ট্রেন, যেটা চাম্পাহাটী স্টেশন থেকে সকাল পাঁচটা বেজে আঠারো মিনিটে ছাড়ে, সেই ট্রেনে আসে কলকাতায়। তারপর বৈঠকখানা বাজারে তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় বসে তরকারি বিক্রি করে, এবং বিক্রি-শেষে আবার তারা দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে দশটার ট্রেনে চেপে বসে বাড়ি ফেরবার জন্যে। এইভাবেই সুখে-দুঃখে তাদের দিন কোনরকমে বেশ কেটে যাচ্ছিল।

একদিন দু'জনেই তরকারির বোঝা নিয়ে বৈঠকখানার বাজারে গেছে। জগবন্ধুর তরকারি আগেই বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু প্রাণবন্ধুর তখনও হয়নি। এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।

জগবন্ধু বললো, "হ্যাঁরে! আমি এই ট্রেনেই চলে যাব? না—তোর জন্যে অপেক্ষা করবো?"

প্রাণবন্ধু বললো, "তুই এই ট্রেনে বাড়ি চলে যা, আমার আজ দেরি হবে। তা ছাড়া খবর পেলুম শাশুড়ীর বড় অসুখ। আমি যদি বারোটা পাঁচের ট্রেনে না ফিরি তো বাড়িতে বলে দিস আমি শ্বশুরবাড়ি গেছি। তারা যেন আমার জন্যে চিন্তা না করে।"

জগবন্ধু বাড়ি চলে গেল। প্রাণবন্ধুর তরকারি বিক্রি শেষ হতে বারোটা বেজে গেল। ঝাঁকা গুছিয়ে নিয়ে বাজারের ভিড় ঠেলে বার হতে আরও মিনিট দেড়েক চলে গেল। বারোটা পাঁচে ট্রেন। বৈঠকখানা বাজার থেকে বের হয়েই বড় রাস্তা। স্রোতের মত সবরকমের যানবাহন যাতায়াত করছে। শিয়ালদা মেন স্টেশনের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো তখন বারোটা বেজে দু' মিনিট হয়েছে। সে রাস্তাটার দিকে লক্ষ্য করে দেখলো যে একটা মাল-বোঝাই লরী ধীরগতিতে আসছে। একটু ছুটে গেলেই লরীটা তার কাছে পৌঁছবার আগেই সে রাস্তা পার হয়ে যেতে পারবে। সে ঝাঁকাটা মাথায় নিয়ে জোরে দিল এক ছুট। কিন্তু সে জানতে পারল না যে তার প্রাণহন্তারক ট্যাক্সিটা কখন লরীটাকে অতিক্রম করবার জন্যে দ্রুত দৌড় দিয়েছে। রাস্তা পার হয় হয়, এমন সময় সেই ট্যাক্সিটা প্রাণবন্ধুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দু'ধারে পথচারীরা 'গেল গেল' বলে চিৎকার করে উঠলো। ঝাঁকাটা দূরে ছিটকে পড়ে ধুঁকছে; মাথার উপর দিয়ে দুটো চাকাই

চলে যাওয়ায় মাথাটা থেঁতলে গেছে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। একটা পা আর একটা হাত দুমড়ে ধনুকের আকার নিয়েছে।

এরপর যা হয়ে থাকে তাই হল। জনতার মধ্যে থেকে এক সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাকে নিয়ে গিয়ে নীলরতন হাসপাতালে জরুরী বিভাগে ভরতি করে দিলেন। কিন্তু কিছুই হলো না, গরিবের প্রাণ রাত এগারোটায় শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে এক অখ্যাত গাঁয়ের এক দুঃস্থ পরিবারের বুকে নেমে এলো অন্ধকার হাহাকার। দীপ নেভবার আগে যেমন একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনই প্রাণবন্ধুর জীবনদীপ নেভবার আগে একবার ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিল তার,—বলতে পেরেছিল তার নাম, ধাম আর বন্ধুর নাম। চেয়েছিল জল আর সকলের মুখের দিকে দেখেছিল তাদের মধ্যে তার বন্ধু আছে কিনা?

এদিকে জগবন্ধু যথাসময়ে ট্রেন থেকে নেমে আগেই প্রাণবন্ধুর বাড়িতে খবর দিয়ে, তাদের চিন্তা করতে মানা করে তবে নিজের বাড়িতে ফিরেছে। দুপুরের পর সে যথারীতি তরকারির বোঝা করেছে। সেদিন প্রাণবন্ধু না থাকায় বোঝাটা বেশ ভারীও হয়েছে। রাতে শোবার আগে খবর নিয়ে জেনেছে যে প্রাণবন্ধু ফেরেনি, তাতে তার শুতে যেতে একটু রাতও হয়ে গেল, ঘুম আসতেও একটু দেরি হলো।

শীতের দিন। ট্রেনটা বেশ রাত থাকতেই চাম্পাহাটীতে আসে ও ছেড়ে যায়। জগবন্ধুর সেদিন ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি বোঝা নিয়ে স্টেশনের দিকে আসছে। রাস্তার পাশে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ, তার তলাতে আসতেই পিছন থেকে প্রাণবন্ধুর গলা সে শুনতে পেল, "কিরে জগ! অত তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস কেন?"

"কিরে তুই কখন ফিরলি?" বললো জগবন্ধু।

"আমি শেষ ট্রেনে রাত এগারোটায় ফিরেছি। তুই তাড়াতাড়ি যাসনি—এ ট্রেনে তোর যাওয়া হবে না; বিপদ আছে।"

"আরে দূর! বিপদ আবার কিসের? আর তাছাড়া এ ট্রেনে না গেলে মাল বিক্রি করে ফিরবো কখন? এ ট্রেনে আমাকে যেতেই হবে।"

"যাবি তো যাবি! তোর বোঝাটা বড় ভারী হয়েছে—একটু জিরিয়ে নে।'

সত্যিই জগবন্ধু আর পারছিল না; সে বললো, "তবে ধর—বোঝাটা নামাই।"

বোঝা ধরলো—জগবন্ধু বোঝা নামালো। কিন্তু সে কাউকেই দেখতে পেলো না। সে মনে করলো বড্ড কুয়াশা সেজন্যেই বোধহয় সে প্রাণবন্ধুকে দেখতে পাচ্ছে না। এমন সময় ভোরের ট্রেনটা চাম্পাহাটী থেকে ছাড়বার শব্দ হলো। জগবন্ধু তাড়াতাড়ি বললো, "যাঃ! তোরই জন্যে ট্রেনটা চলে গেল।"

"যাকগে—ভালই হলো, এ ট্রেনে গেলে তোর বিপদ হতো। তবে ভাই আমার ছেলেমেয়ে আর বউ রইলো...তুই দেখিস!" বললো প্রাণবন্ধু।

"কেন রে আজ একথা বলছিস কেন?"

কোন উত্তর নেই, আর কোন শব্দও নেই। প্রাণবন্ধু যে জায়গাটায় বসেছিল, জগবন্ধুর মনে হলো সে জায়গাটা যেন খালি, তবু সে জিজ্ঞেস করল, "কই রে প্রাণবন্ধু, উত্তর দিচ্ছিস না কেন?"

উত্তর আর পাওয়া গেল না। তখন সে উঠে চারদিকটা হাত দিয়ে দিয়ে দেখলে—কেউ নেই, কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে সেখানে তখন এসে গেছে। জগবন্ধু তাদের জিজ্ঞেস করলো কাউকে এ রাস্তা দিয়ে ফিরতে দেখেছে কিনা? তারা বললো, "না-তো।" তখন জগবন্ধুর মনে সন্দেহ এসে গেল, সে বললো, "ভাই! তোমাদের যে কেউ আমার মাথায় বোঝাটা দয়া করে তুলে দাও। আজ আর আমি কলকাতায় যাবো না।"

তারা বোঝা তুলে দিল। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বোঝাটা নামিয়ে ছুটে গেল প্রাণবন্ধুর বাড়ি। সেখানে গিয়ে শুনলো প্রাণবন্ধু ফেরেনি। তখন কারুরই কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই সে ছুটলো স্টেশনের দিকে কলকাতাগামী দ্বিতীয় ট্রেন ধরবার জন্যে। কেননা সোনারপুর স্টেশনের কাছে ছিল প্রাণবন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু চাম্পাহাটীতে এসে শুনলো যে ট্রেন আজ আর চলবে না। সোনারপুর স্টেশন ছাড়িয়ে লেভেল ক্রসিং-এর মুখে দুটো ট্রেনে 'কলিশন্' হয়েছে; বহু যাত্রী মরেছে, বিশেষতঃ ক্যানিং ট্রেনের বাজার-গাড়ির যাত্রীরা প্রায় সবাই মরেছে।

জগবন্ধুর তখন মনে পড়ে গেল প্রাণবন্ধুর কথা—"যাক্‌গে ভালই হল। এ ট্রেনে গেলে তোর বিপদ হতো।" রেলের লাইন ধরে ছুটলো জগবন্ধু সোনারপুরের দিকে। বহু লোক আসছে আর বহু লোক যাচ্ছে ট্রেন দুর্ঘটনা দেখবার জন্যে। সবারই মুখে কোথাকার কে মরেছে, কে বেঁচে গেছে—শুধু এই কথা। কিন্তু জগবন্ধুর কোন দিকে কান নেই—কোন দিকে লক্ষ্য নেই, ছুটছে তো ছুটছে। অবিরাম ছুটে পার হয়েছে পাঁচ মাইল; বিশ্রাম নেই। একেবারে প্রাণবন্ধুর শ্বশুরবাড়ির দরজায় গিয়ে সে ছোটা থামালো। সেখানে জানতে পারলো যে প্রাণবন্ধু এখানেও আসেনি!

কারও কৌতূহলের কোন উত্তর না দিয়ে সে আবার ছুটলো সোনারপুর স্টেশন পেরিয়ে রাজপুর বাজারের দিকে। সোনারপুর স্টেশন পার হবার সময় লক্ষ্য পড়লো দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত ট্রেনের দিকে। দেখলো জনকয়েক ব্যাপারীর দেহ ইঞ্জিনের সঙ্গে লেপটে গেছে। বীভৎস দৃশ্য! শিউরে উঠলো জগবন্ধু, গায়ের লোমগুলো তার খাড়া হয়ে উঠলো। সময় নেই তার এসব দেখবার, এখন সংবাদ নিতে হবে তার বন্ধু কোথায়! সারা রাস্তা ছুটে ছুটে এসে রাজপুর থেকে সে কলকাতাগামী বাসে চাপলো।

বাসে বাসে একেবারে বৈঠকখানা বাজারের সামনে নামলো। গতকালের ট্যাক্সি দুর্ঘটনার কথা অনেকেই জানতো। তাদের কাছে খবর পেয়েই জগবন্ধু ছুটে গেল নীলরতন সরকার হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে শুনলো গত রাত্রে এগারোটায় প্রাণবন্ধুর বন্ধুবৎসল প্রাণ শেষ হয়ে গেছে। জগবন্ধু লাশ-ঘরে গিয়ে প্রাণবন্ধুর দেহের ওপর হাহাকার করে আছড়ে পড়লো; তার দু'চোখে নেমে এলো শ্রাবণের ধারা।

পাগলের মত প্রাণবন্ধুর মরা দেহটা জড়িয়ে বিড়বিড় করে জগবন্ধু বলছিল—"বন্ধু! তুমি মরে গিয়েও প্রেতরূপে আমার কাছে গিয়ে আমাকে রাস্তায় আটকে দিয়ে ট্রেন ফেল করিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছ। জীবদেহে ও মরদেহে উভয় অবস্থাতেই তুমি তোমার বন্ধুত্ব দেখিয়ে গেলে। সত্যিই তুমি আমার প্রাণের বন্ধু। তোমার প্রাণবন্ধু নাম রাখা সার্থক হয়েছে। তবে তুমি যদি এখনও প্রেতরূপে আমার কাছাকাছি থাক তো শুনে যাও—তোমার শেষ কথা আমি রাখবো;—আমার ছেলেমেয়ে যদি একবেলা একমুঠো খেতে পায় তো তোমার ছেলেমেয়েও খেতে পাবে।"

এ কথা কেউ জানে না বা কেউ শোনেনি অথবা কেউ শুনেও বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি জানি জগবন্ধু তার কথা আমরণ পালন করেছিল।

ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রেতাত্মার ভূমিকায় আত্মা

নীলোৎপল কবি

হারিকেনটা জ্বলছে। ছানিপড়া চোখের মত। মাস্টারমশায়ের আসার সময় হয়েছে। রোজকারমত দাদু অদূরের তক্তাপোশখানায় ব'সে। গড়গড়ার সটকাটা আলতোভাবে ঠোঁটে চেপে গর্—গ—রর্ করছেন। এইমাত্র 'আসছি' বলে কোথায় যেন গেলেন। খড়মের খটখট শব্দ খ—ট্—খ—ট—খ্—খ—ট্—ট হয়ে দাদুর পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেল। এ ঘরে টুঁ-শব্দ করার দ্বিতীয় কেউ নেই। কাউকেই আসতে দেওয়া হয় না। পাছে পড়াশুনায় বাদ সাধে—তাই। ক্ষীণ আলোয় ঘরের আশ-পাশে ও পিছনে থমথমে অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। হট্ করে চোখ ফেরাতেও সাহস হয় না। কি জানি, কিম্ভূতকিমাকার একটা ভীষণ কিছু যদি চোখে পড়ে! ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। রবীন হারিকেনটা দু'হাতে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নেয়। দাদু গতকাল একটা ভূতের গল্প বলেছিলেন। শুনতে কি যে ভয় করছিল। রবীনের একা একা ভীষণ ভয় করছিল। ওকে ভয়তরাসে দেখে গল্পটাই যেন জীবন্ত হয়ে পাশে এল। নিজের মুখে গল্প শুনিয়ে ওকে সাহস দেবে। একটা মৃদু শব্দ হল। সামনের চেয়ারখানা নড়ে উঠল না। হাতল দুটো নড়ছে যেন! একছুটে মা'র কাছে পালিয়ে যাবার কথা ভাবে। মা'র বুকের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় রবীনের। কিন্তু পারে না। অবশ হয়ে যেতে বসেছে। থরথর করে পা দুটো কাঁপছে। গতকালের গল্পটা আরো কাছে এল। গল্প বলতে শুরু করল—

—ভূত নেই কিরে?—উত্তরে দাদু বলেন। তবে শোন—গড়গড়ার সটকাটা ঠোঁটে চেপে গর্—গ—রর্—। আদর পেয়ে মিনিটা যেমন ডাকে। ওমনি দু'বার শব্দ হল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে দাদুকে ঘিরে বসলাম।

—বুঝলি, তখন দেশের বাড়িতে থাকি। শহরের মত এত সুবিধা ওখানে কোথায়। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। মঙ্গলবারে আর শুক্রবারে। তাও কি ধারেকাছে। কয়েক ক্রোশ দূরে। নদীর চড়ায়। রসুলপুরের হাট। সেখান থেকেই দরকারী সবকিছু কেনাকাটা করতে হয়। আনাজ তো বটেই। তা, সেদিন ছিল শুক্রবারের হাট। বেলা থাকতেই হাটে রওনা হলাম। সঙ্গে বুধোন—বাড়ির বিশ্বস্ত চাকর। কেনাকাটা করতে বেলা গড়িয়ে গেল। সূর্যদেব তখন শ্রান্ত শরীরে পশ্চিমাকাশের প্রান্তে ঢলে পড়েছেন। ঠিক যেন রাঙাদির কপালের সিঁদুরটিপ। রাঙাদির মুখের রঙে আকাশের প্রান্ত রাঙানো। তড়িঘড়ি করে সবকিছু বস্তায় পুরলাম। বুধোনের মাথায় তুলে দিলাম। হাট ছেড়ে পথে নেমেছি। হঠাৎ তখন খেয়াল হল। আরে যা! মাছ কেনা হয়নি তো। মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে তাইতো-তাইতো করলাম। বুধোনকে এগোতে বললাম। আমি আবার হাটে ফিরলাম। দরদাম করে মাছ কিনতে অনেকটা সময় নষ্ট হ'ল। চারিধারে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার নেমেছে। যেন বোরকা পরে দিন-বিবি হেঁটে চলেছে অনন্তকালের পথ ধরে। দিনটাকে বিবি মনে করলে, রাতের আঁধারকে বোরকা বলে চালানো যায়।

প্রথমে মাঠ। তারপর একটা বিল পড়ে। বিলের ধার দিয়ে গিয়ে উঠতে হবে সদর রাস্তায়। সদর রাস্তা ছেড়ে আরো দুটো কাঁচা রাস্তা। তবে বাড়ি। এক কথায়, হাট থেকে বাড়ি কুখ্যাত গোবিন্দপুরে যাবার সামিল। গাঁয়ের পথে রাতে কখনোসখনো দু'একজন সঙ্গী পাওয়া যায়।

চারিদিকে অন্ধকার থমথম করছে। অগাধ সমুদ্রের উদরের মত। মাছটা হাতে ঝুলছে।—উঁহু! রবীন, মুখটা বন্ধ কর, লাল ঝরবে।

সবাই খুকখুক করে হাসলাম। দাদু একটা পান মুখে দিয়ে আবার শুরু করলেন।

—ধাঁইধাঁই করে হেঁটে চলেছি। নির্জন মাঠটা হাটহাট করছে। মাঠ পেরিয়ে এলাম। দুটো রাস্তাও। শেষ রাস্তায় এসে উঠলাম। তখন কেন যেন গা ছমছম করে উঠল। সামনে একটা উপেক্ষিত পরিত্যক্ত ভিটে। ঐ ভিটেতে তিনু মাঝি গলায় ফাঁস দিয়ে মরেছিল। সে অনেকদিন আগের কথা। তিনু আকালের হাতে খুন হল। পেটের ক্ষিদের সঙ্গে পারিবারিক কলহ ওকে গলা টিপে শেষ করল। তিনুর পরিবার ভিটের মায়া কাটিয়ে ভেগে গেল। আজ ওখানে বাঁশের ঝাড় আর শ্যাওড়াগাছগুলো সপরিবারে সংসার গেরস্থালি নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

সেই জনশূন্য ভিটে থেকে কে একজন ব্যাটাছেলের আর্ত চীৎকার বুকে ঘা দিল। ভীষণ ভয় হল। আগেপিছে তাকিয়ে একজন সঙ্গীর খোঁজ করলাম। এই সময়ে কেউ যদি আলো নিয়ে আসত! তাইতো, ও কে যায়! আলো নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। ওর সঙ্গ নিতে জোরে পা চালালাম। পিছন থেকে হাঁকলাম—ওহে, কে যাও? দাঁড়াও না একটু। ও দাঁড়াল। অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম লোকটাকে। পরনে আটপৌরে ধুতি। খালি গা। ছিপছিপে চেহারা। এবড়োখেবড়ো মুখমণ্ডল। কাঁধে জাল। এক হাত দিয়ে ধরা। অন্য হাতে একটা ভাঙা হারিকেন। কালিঝুলি মেখে আলোর রশ্মি নিজের বুকে চেপে রেখেছে। লোকটা মাছ ধরতে চলেছে, ধারেকাছে কোথাও। জিজ্ঞাসা করলাম—এই রাত-বেরাতে কোথায় যাবে মাছ ধরতে? লোকটা প্রত্যুত্তর করল না। শুধু ইশারায় এগিয়ে যেতে বলল। লোকটা যেন জটিল কিছু একটা ভাবছে। অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হল। কথা বলা বৃথা। তাই বুদ্ধিমানের মত ওর পিছু পিছু চললাম। উভয়ের মধ্যে একটাও কথা হল না। সামনেই মস্ত বাঁশঝাড়। একটা অস্পষ্ট পাহাড়ের মত। সেখানে ঘটল একটা অভাবনীয় ঘটনা। আকাশে মেঘ নেই। ঝড়ের পূর্বাভাস নেই। হঠাৎ ঝ'ড়ো হাওয়ার ঝাপটায় বাঁশের ডগাগুলো দুলে উঠল। বিকট শব্দ হল। সড়সড় শব্দে রাশি রাশি বাঁশপাতা ঝরে পড়ল অন্ধকারে পথ হাতড়ে।

মট্—মটাস্। একটা পেল্লাই বাঁশ আমূল উপড়ে পড়ল। ঠিক আমার পায়ের কাছে। পথ আটকে। আর একটু হলে মাথায় পড়ত। ইস্! গায়ের লোমগুলো সূচের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ফুসফুস বুঝি থেমে যায়। গায়ের রক্ত হিম। ভয়ে মৃতপ্রায়। ঠকঠক করে দাঁতে দাঁত বাজছে। চোখ দুটো ছানাবড়া। কণ্ঠস্বর মাথায় উঠে গেছে। পা দুটো মাটির গায়ে আটকে গেছে। চোরাবালির কবলে পড়েছি যেন। ভয়ে পঙ্গু, অথর্ব। এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। যখন মুমূর্ষু ভাব কেটে গেল তখন লোকটাকে দেখতে পেলাম না। আর কি দাঁড়াতে সাহস হয় ওখানে! পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করলাম। মরিয়া হয়ে দৌড়—দৌ—ড়—। হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির দোরে পৌঁছুলাম। বুধোন আলো নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে। মাছটা বাড়িয়ে ধরলাম। ও চিলের মত ছোঁ দিয়ে মাছটা কেড়ে নিলে। অদ্ভুত ব্যবহারে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কে! আঁতকে উঠলাম। প্রাণ উড়ে গেল। এ যে সেই এবড়োখেবড়ো বিশ্রী মুখ। জাল কাঁধে। হারিকেন হাতে। সেই লোকটা। ভূত? ভূত! ভূ—ত—! অ্যাঁ-অ্যাঁ করতে করতে জ্ঞান হারালাম। তারপর—।—খুব ভয় হচ্ছে বুঝি? দাদু হেঁয়ালি করে জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা দাদুর গায়ে লেপটে বসলাম। অন্ধকারে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম।

হারিকেনটা জ্বলছে। মাস্টারমশায়ের আসার সময় হয়েছে। দাদু 'আসছি' বলে কোথায় যেন গেলেন। ঘরে টুঁ-শব্দ করার দ্বিতীয় কেউ নেই। রবীন একা। ও হারিকেনটা বুকে জাপটে ধরে। খোলা জানালায় তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে ওঠে। কোনরকমে কষিকাঠটা হাতে তুলে নেয়। যেমন-তেমন করে খোঁচা দিয়ে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিতে যাবে কি যাবে না। তখুনি ও স্পষ্ট দেখতে পায়।

কঙ্কালসার একটা প্রেতবৎ নগ্ন লোক। তার চোখ দুটো কোটরে জ্বলছে। একটা লিকলিকে হাত বাড়াল। চিঁ চি স্বরে কি বললে। নাকি সুরে। ওরে বাব্বা! রবীন ঢোক গিলতে পারল না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আড়ষ্টকণ্ঠে ভূত—ভূ—উ—উন—করে গোঙায়। হারিকেন চেয়ার সমেত উলটে নীচে পড়ে যায়। জ্ঞান হারায়।

বাড়ির সবাই সচকিত হয়ে ছুটে আসেন। ব্যথিত চোখে মা। খুন্তি হাতে পিসিমা। নামাবলী গায়ে দাদু। দুরুদুরু বুকে আর সবাই। ব্যাপারটা কি হল বুঝতে না পেরে হাউমাউ করেন। রবীনকে মাটিতে আড়ষ্ট দেখতে পান—। কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। তাল কেটে যায়। দৈনন্দিনের ছন্দ মেলে না। সবার চোখেমুখে আহা-উহু। জল আন। পাখা কৈ? ডাক্তারবাবুকে—

দাদুর এতক্ষণে খেয়াল হল। তাইতো, বুধোনকে দেখছি না তো। বুধোন কোথায়? বুধোন। ও বু—ধো—ন—পাজি।!

—এই যে বাবু আমি। চোর পাকড়েছি। আমি রান্নাঘরের পিছনে। আদাড়ে। অতঃপর তম্বি করে বলে—ব্যাটা, আমার চোখে ধুলো দিতে চায়। অ্যাঁ!

বুধোনের কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে হারিকেন নিয়ে সবাই ছুটে গেল। বুধোন সবাইকে দেখে খুশিতে বীরত্বে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—আমি দেখলাম—ছুটে—পালাতে—হু-হু! আমার চোখে—হু-হু! অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে দাদু বিস্ময়ে হতবাক। শীর্ণকায় লোকটাকে বুধোন ওর শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে। দাদু আলো তুলে ওর মুখের সামনে আনেন। লোকটার মুখে পুরো একটা ছাইমাখা রুটি। শ্বাসরোধ হবার উপক্রম আর কি! দু'চোখে জল। ও বার বার দু'হাত কপালে ছুঁইয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ক্ষিদেয় চিপ্‌সে যাওয়া পেটে হাত রেখে ইঙ্গিতে কিছু আহার্য ভিক্ষা করছে। দাদু সমীহ দৃষ্টিতে লোকটার আপাদমস্তক দেখলেন। দয়ার্দ্র হলেন। ও-ও হয়ত বুঝল। চোখ বড় করে রুটিটা গলাধঃকরণ করল। সাপে যেমন ব্যাঙ গেলে, তেমন করে। হাউমাউ করে কেঁদে দাদুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। জড়িয়ে পড়ল। কিছুতেই পা ছাড়তে চায় না। আর কান্নাও থামে না।

—আ মল যা!—পিসিমা আর দাঁড়ালেন না। বাড়ির মধ্যে ফিরে গেলেন। দাদু স্বগতোক্তি করলেন—হায়রে সোনার বাঙলা! অতঃপর কৃত্রিম রোষে লোকটার দিকে কটমট করে তাকালেন। এত বড় আস্পর্ধা! ভূত সেজে ভিক্ষা করা। আমার দাদুকে (অর্থাৎ রবীনকে) ভয় দেখানো। চাবকে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেব না! বুধোনকে উদ্দেশ করে বললেন—যা, হতভাগাকে বৈঠকখানায় তালা দিয়ে রাখগে। আগে ওকে একপেট খাইয়ে চাঙ্গা কর। আমি চাবুক নিয়ে আসছি। হুম্! এই বলে বুধোনকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

রাতে লোকটা খেয়েছিল অনেক। সকালে দাদু ওখে কাছে ডেকে আনলেন। দিনের আলোয় চিত্রশিল্পীর মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—হুঁ!

দাদুর আদৌ চাবুক ছিল না। কাঙাল লোকটাকে এক জোড়া চাবুক আনবার ফরমাশ করলেন। কয়েকটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন—নে।

ও চোখের জলে ভেসে বললে—বাবু—

দাদু গমগম করে বললেন—হ্যাঁ, এক জোড়া চাবুক—।

মাঘ ১৩৬৮

পাখি

দিলীপ কুমার মজুমদার

আমাদের বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায় আমরা বসেছিলাম। আমি, ছোট্‌কা আর বাবা। বাবা ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। সেদিন রবিবার। সকাল নটার মধ্যে আমাদের পড়া হয়ে গেছে। ছোট্‌কা একটা ভাঙা লাটাই ঠিক করছিল। হঠাৎ দূরে শোনা গেলো—পাখি লাগবে! পাখি! টিয়া, ময়না লাগবে!

ছোট্‌কা চকিতে মুখ তুলে দূরে বড় রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলো, তারপর আমার কানে কানে একটা কথা বলে দিল। সবাই বলে ছোট্‌কা নাকি আমার গুরু আর আমি তার শিষ্য। আমি বাবার কাছে আবদার ধরলাম—বাবা, পাখি কিনে দাও।

বাবা মুখের ওপর থেকে কাগজ সরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো, পাখি! কোথায়? বাবার কথা শেষ হতে না হতে পাখিওয়ালা আমাদের বাড়ির কাছে চলে এসেছে। তারপর ছোট্‌কার ইশারায় সে দাঁড়িয়ে পড়ে বারান্দার সামনে। বাবা তাকে দেখেই বলে উঠলো—এই রে, সাতসকালেই তুমি এলে আমায় বধ করতে।

পাখিওয়ালা ময়লা দাঁতগুলো বার করে হাসলো। তারপর কাঁধের লাঠি সমেত খাঁচাগুলো রাস্তার ধারে নামালো। আমাদের বাঁ দিকে খাঁচাগুলোতে আছে দুটো ময়না আর তিনটে টিয়া আর ডান দিকে খাঁচাগুলোতে শুধু টিয়া। আমি বাবাকে বললাম—বাবা, আমি টিয়া নেবো।

—পাখি যে নিবি খাঁচা কোথায়? বাবা জিজ্ঞেস করলো আমাদের।

ছোট্‌কা যেন প্রস্তুত ছিল। বলে উঠলো—আমাদের একটা খাঁচা আছে, বড়দা।

—আছে নাকি?

—আছে, পেতলের বড় খাঁচা, সিঁড়ির নিচে আছে।

—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ছয়-সাত বছর আগে ধর্মতলায় এক নিলামের দোকান থেকে কিনেছিলাম। কোনো এক জমিদার বাড়ির নাকি খাঁচাটা।

—তাহলে কিনে দাও না বাবা। আমি আবার আবদার ধরলাম বাবার কাছে।

—আচ্ছা, আচ্ছা, দেখি আগে—

বাবা কথাটা শেষ করতে না করতেই ছোট্‌কা উধাও। আমিও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে বাড়ির ভিতর গেলাম। সিঁড়ির নিচে অন্ধকার জায়গা থেকে ছোট্‌কা একটা বিরাট খাঁচা টেনে বার করলো। আগাগোড়া পেতলের। কিন্তু ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। ছোট্‌কা খাঁচাটা নিয়ে দৌড়ে গেল কলতলায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তপু, যা তো বৌদির কাছ থেকে একটু তেঁতুল নিয়ে আয় তো।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘর থেকে এক খাবলা তেঁতুল এনে দিতেই ছোট্‌কা আমায় বললো, দ্যাখ, তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া, নইলে হয়তো পাখিওয়ালা চলে যাবে। আমি খাঁচাটা নিয়ে আসছি।

আমি ছুটে গিয়ে বাইরে গিয়ে দেখি বাবা তখনও দরাদরি করছে। শেষে একটা রফা হলে বাবা বললো—দেখ, কোনটা নিবি, একটা ভালো দেখে বাছ দেখি। আমি দেখে শুনে একটা লম্বা

লেজওয়ালা টিয়া বাছলাম। বাবা বললো, দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু দেখ কতদিন বাঁচে। এর আগে দু'দুবার পাখি কিনেছিলাম। প্রথমবার ময়না। শেষবার টিয়া। দুবারই মরে গেলো।

—এর আগেও পাখি কিনেছিলে বাবা? আমি জিজ্ঞেসা করলাম।

—হ্যাঁরে, তখন তুই খুব ছোট, তোর মনে নেই। দুটো পাখিই মরে গেলো।

—কি হয়েছিল বাবা, অসুখ করেছিল?

—কি জানি। দিনের বেলা কিনলাম। পরদিন সকালে দেখলাম খাঁচার মধ্যে মরে পড়ে আছে।

এর মধ্যে ছোট্‌কা খাঁচা নিয়ে হাজির। পাখিওয়ালা পিতলের বড় খাঁচা দেখে অবাক হয়ে বললে—সুন্দর খাঁচা বাবু, এতে অনেক পাখি ধরবে। একটাতে বেমানান লাগবে।

বাবা বলে উঠলো—না না। একটাই যথেষ্ট।

একটু পরে পাখিওয়ালা পাখির খাঁচাগুলো কাঁধে তুলে চলে গেল। আমরা টিয়া সমেত খাঁচাটা নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেলো। কাকা-কাকীমা, রানুদি, পিণ্টু সবাই এসে হাজির। আমার তখন খুব মজা লাগছে। আমার পছন্দ করা টিয়াটাকেই সবাই প্রশংসা করছে। লম্বা লেজ, গায়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙ। গলার কাছে লাল রঙের গোল দাগ। আর সেখানে খানিকটা নীলাভ রঙ ছড়ানো। চোখ দুটো শুধু ঘুরছে আর ঘাড় বেঁকিয়ে সবাইকে দেখছে। মনের আনন্দে একবার একটা ডিগবাজি খেলো। বাড়ির ভেতর আমাদের বিরাট উঠোন আছে, তার এক কোণে খাঁচাটা রাখা হয়েছে। পিণ্টুটা খাঁচার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিতেই কাকীমা ওর হাত টেনে নিল।

—এক্ষুণি কামড়ে দিত।

পিণ্টু কামড়ে দেওয়া কাকে বলে বোঝেও না। তাই ভয়ও পায় না। ও আবার চেষ্টা করে খাঁচায় হাত দিতে। কাকীমা ওকে ধরে রাখে। ছোট্‌কা জলে এনে দিল খাঁচার মধ্যে রাখা পেতলের বাটিতে। তারপর মুঠো করা হাতের ভিতর থেকে ছোলা বার করে দিল বাটিতে। কাকা বলে উঠলো—ছোলা কোথায় পেলি এর মধ্যে? আগে কেনা ছিল নাকি?

—না, আমি পাখিওয়ালার কাছ থেকে একটু চেয়ে নিয়েছি।

রানুদি কতগুলো লঙ্কা এনে দিতেই টিয়াটা এগিয়ে এসে একটা লাল লঙ্কা তুলে নিল। রানুদির সেকি হাততালি! আমি বললাম—রানুদি, তুমি ওকে লঙ্কা দিলে, ওর ঝাল লাগবে না?

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। ছোট্‌কা বললো—যাঃ বোকা, ওরা তো লঙ্কাই খায়। ওদের আবার ঝাল লাগে নাকি!

পাখিটা লঙ্কাটা নিমেষের মধ্যে খেয়েই টুই করে ডেকে উঠলো। একটু পরে মা এসে হাজির। রান্নাতে ব্যস্ত থাকায় এত গোলমাল মার কানেই যায়নি। মাকে দেখে আমি দৌড়ে গেলাম, বললাম—মা, দেখবে এসো, আমরা একটা টিয়া কিনেছি। কী সুন্দর!

—টিয়া? কই দেখি? মা ঝুঁকে খাঁচাটা দেখলো, তারপর বলে উঠলো—আবার পাখি! তোদের কি আর শিক্ষা হবে না! দু'দুবার কিনে ঠকেছিস। একদিনও টেঁকেনি।

—না বৌদি, এটা খুব ভালো। দেখছো না কেমন ডিগবাজি খাচ্ছে। ছোট্‌কা হাসিমুখে বললো।

—রাখ তোর ডিগবাজি। কে কিনে দিয়েছে শুনি? নিশ্চয় তোর বড়দা, না? না হলে এমন হয়, দু'দুবার পাখি মরে গেলো, তাতেও শিক্ষা হয় না।

—না দিদি, আগের গুলোকে বোধহয় ইঁদুরে খেয়েছিল। এমন ইঁদুর আর ছুঁচো বাড়িতে! কথাটা এবার কাকীমা বললো।

—যা বলেছিস, ছুঁচোগুলো তো একেবারে পাকা বাসিন্দা হয়ে গেছে এ বাড়িতে। এরপর ওরাই আমাদের ভিটে ছাড়া করবে।

—পুরোনো বাড়িতে এসব হবেই। কথাটা বললো বাবা। বাবা কখন যে উঠোনে এসেছিল দেখতেই পাইনি।

এবার কাকা এসে আমাদের বাঁচালো। এগিয়ে এসে মাকে বললো, রাখো তো এসব বৌদি, মাংসটা বোধহয় হয়ে গেলো। যা গন্ধ ছেড়েছে না! একটু টেস্ট করাবে না?

এক মুহূর্তে মার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। চাখবে? তা এসো ঠাকুরপো। যাই বলো না কেন, তোমার বাপু একটুতেই জিবে জল এসে যায়।

—তোমার রান্না পেলে তা একটু আসে।

কথা বলতে বলতে মা আর কাকা এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। সবার মুখে হাসি ফিরে আসে। আবার খাঁচার মধ্যে টিয়াটার কাণ্ড দেখতে থাকে। টিয়াটা কেবলই ডিগবাজি খাচ্ছে দাঁড়ের ওপর । সেদিন কী আনন্দেই যে কেটে গেলো আমাদের! সারাদিনই টিয়াটাকে ঘিরে আছি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছোলা আর জল দেওয়া হচ্ছে। পিণ্টু একসময় বলে, মা, পাখি ভাত খাবে না?

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলো। কাকীমা ওর কাছে এসে বললো, না, পাখি ভাত খায় না, তুমি খাবে চলো।

কাকীমা ওকে কোলে তুলে নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেলো।

সেদিন আমি খেলতেও গেলাম না। মণ্টু, পানু এসে ফিরে গেলো। সন্ধ্যা হয়ে এলো। পড়তে বসতে হলো বড়দের ভয়ে। কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছিলাম না। বইয়ের পাতায় যেন টিয়াপাখিটাই দেখছিলাম। ছোট্‌কারও একই অবস্থা। বইটা সামনে খোলা রইলো সারাক্ষণ। একবারও পাতা ওল্টালো না ছোট্‌কা। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার আমরা বারান্দায় গেলাম। খাঁচাটা কাপড় মেলার তারে ঝুলিয়ে দিয়েছে ছোট্‌কা। দাঁড়ের ওপর চুপটি করে বসে আছে টিয়াটা। মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে আর খুলছে। ছোট্‌কা একসময় ঘরে এসে বললো, দেখ তপু, ওকে রাতে বাইরে রাখবো না। এখানে আমাদের ঘরেই রাখবো। কি জানি বাইরে যদি কিছু একটা হয়ে যায়।

আমারও তাই মনে হলো, বাইরে রাখা ঠিক হবে না। কিছু হয়ে গেলে টেরও পাবো না। তাই আমি বললাম, ভালোই তো, এখানে থাকবে। আমরা রাতে দেখতে পাবো।

ছোট্‌কা বললো—কিন্তু এখন নয়, সবাই শুতে গেলে পরে নিয়ে আসবো।

রবিবার দিন এমনিতেই সব কাজ দেরি করে হয়। তাই আমাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেও দেরি হয়ে গেলো। সবাই একে একে যে যার ঘরে চলে গেলো ঘুমোতে। আমি আর ছোট্‌কা এই ঘরে পড়াশুনা করি আর থাকি।

ক্লাস সিক্সে ওঠার পর থেকে এ ঘরে ছোট্‌কার সঙ্গে থাকার জায়গা হয়েছে আমার। আমি বড় হয়ে গেছি। আর মার কাছে শুই না।

ঢং ঢং করে বারান্দার ঘড়িটায় এগারোটা বাজলো। বারান্দার সব আলো নিভে গেছে। আমরা চুপিচুপি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি অন্ধকার বারান্দায় ঝুলন্ত খাঁচাটার নিচে দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। ছোট্‌কা দ্রুত সামনে যেতেই একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলো একটা কালো বেড়াল। পাশের বাড়ির সুনীলদের বেড়াল ওটা। ভীষণ চোর বেড়ালটা। আমাদের রান্নাঘর থেকে প্রায়ই চুরি করে। মা ওকে দেখলেই দূর দুর করে তাড়া করে। আজ কেন এসেছিল বেড়াল। নিশ্চয় টিয়াটার জন্য। খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি টিয়াটা চুপ করে বসে আছে দাঁড়ের ওপর। আমাদের দেখে একটু সরে বসলো। চোখ দুটো পিট্‌পিট্ করলো বার কয়েক। ছোট্‌কা খাঁচার মাথার হুকটা আঙুলে ধরে দ্রুত তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলো। আমিও পিছু পিছু ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। ছোট্‌কা খাঁচাটা আমাদের পড়ার টেবিলে রাখলো।

রাত গভীর হতে থাকে। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে বারান্দার পুরোনো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে

বারোটা বাজলো। আমার পায়ের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দূরে কতগুলো কুকুর তখনো ডাকছিল। মাথা তুলে দেখলাম, ছোট্‌কা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে টেবিলের কাছে। টেবিলের ওপর ছড়ানো বইগুলো ছোট্‌কা গুছিয়ে রাখছিল। একটু পরে লাইট নিভিয়ে ছোট্‌কা শুয়ে পড়ল। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তবু ঘুম আসছিল না। ভাবছিলাম কাল আমরা স্কুলে চলে গেলে কে টিয়াটাকে জল দেবে, ছোলা দেবে। এ কথা ছোট্‌কাকে বলতেই ছোট্‌কা জবাব দিল, রানু দিয়ে দেবে।

—বাঃ, রানুদির ইস্কুল নেই বুঝি!

—ও হ্যাঁ, তাহলে বৌদিদের বলে যাবো।

—মা দেবে না, দেখো।

—না রে, বড় বৌদি ওরকম রাগ করে বলে বলছিস, পরে দেখিস ঠিক দেবে।

—দেখা যাক।

আবার নীরবতা। ঘুম আসছে না কিছুতেই। হঠাৎ একটা সরসর আওয়াজ। চোখ মেলে তাকালাম। আবার শুনলাম একই শব্দ। শব্দটা টেবিলে রাখা খাঁচাটার ভিতর থেকে আসছে মনে হলো। আমি উঠে বসতেই দেখি ছোট্‌কা উঠে লাইটা জ্বালিয়ে ফেলেছে। খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি টিয়াটা জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে আছে। মাঝে মাঝে ডানা দুটো খোলার চেষ্টা করছে। মাথাটা পায়ের কাছে ঘুরিয়ে নামাচ্ছে। ঠোঁট দিয়ে পায়ের কাছে ঘষছে। আমাদের দেখতে পেয়ে ও আরও ছট্‌ফট্ করে উঠলো। মনে হলো, যেন কোনো কিছুর জন্য ওর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। ভয়ও পেয়েছে। একটু পরে ডানা গুটিয়ে আবার দাঁড়ের ওপর উঠে ঝিমুতে লাগলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম দু'জনে। কিন্তু ইঁদুর বা ছুঁচো কিছুই পেলাম না। তবুও চিন্তা রইলো, টেবিলের পায়া বেয়ে ওঠা ওদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ছোট্‌কা বললো, কাল যেভাবেই হোক সিলিং থেকে একটা দড়ি ঝুলিয়ে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবো। ছোট্‌কা ঠিকই বলেছে। এরকম ব্যবস্থা হলে খুব ভালো হয়। আর ভয়ের কিছু থাকবে না।

আমরা আবার শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেন স্বপ্ন দেখছিলাম টিয়াটা খাঁচা খুলে বেরিয়ে পড়েছে। আমরা তাকে ধরার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। টিয়াটা ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে আর কর্কশ স্বরে ট্যাঁ ট্যাঁ আওয়াজ করছে। ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু তখনো আওয়াজ হচ্ছে। তাকিয়ে দেখি আলোটা জ্বলছে। ছোট্‌কা খাঁচাটার কাছে দাঁড়িয়ে। আমি উঠে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দুজনে মুখে চুক্‌চুক্ আওয়াজ করে ওকে থামাতে চেষ্টা করছি। একটু পরে যেন আমাদের ও দেখতে পেলো। আওয়াজটা বন্ধ হলো। খোলা পাখা দুটো বন্ধ করে নিজেকে গুটিয়ে চুপ করে বসলো খাঁচার এক কোণে। আমরা কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। টিয়াটার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। গায়ের রোঁয়াগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। লেজটার শেষ দিক যেন ছিঁড়ে গিয়েছে মনে হলো। ছোট্‌কা বলে উঠলো—অদ্ভুত ব্যাপার! পাখিটা ভীষণ ভয় পেয়েছে। অথচ কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। দেখ তো সুনীলদের কালো বেড়ালটা খাটের নিচে বা কোথাও আছে কিনা?

আমি খাটের নিচে ও ঘরের সব কোণাগুলো খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না। ছোটকা আবার বললো, কোনো রোগটোগ নেই তো এটার! গায়ের পালকগুলো উঠে উঠে যাচ্ছে দেখ্।

আমি উত্তর না দিয়ে টিয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকি। ও যেন ভালো করে আমাদের দিকে তাকাতেও পারছে না। ক্লান্তিতে ওর চোখ দুটো বুজে আসছে। সকালের তরতাজা সবুজ পাখিটার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। এখন যেন বিধ্বস্ত হয়ে ময়লা ন্যাকড়ার মতো খাঁচার

এক কোণে পড়ে আছে। কিন্তু আমিও তো আর চোখ খুলে রাখতে পারছি না। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। কোনোরকমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ছোট্‌কা তখনো খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ কী একটা আওয়াজে আবার ঘুম ভেঙে গেলো। এ তো দেখছি মহা জ্বালাতন! অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে তখন। ঘরের আসবাবপত্র অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছিল। উঠে বসে পড়ার টেবিলের দিকে চোখ রাখতেই আমার বুকে যেন একসঙ্গে একশ হাতুড়ির ঘা পড়লো! দু'হাতে চোখ কচলে আবার তাকাতেই সেই একই দৃশ্য! আমার হাত-পা কাঁপতে লাগলো। দূরে খাঁচাটার মধ্যে যেন একটা হালকা আলো দেখা যাচ্ছে। আর সেখানে সেই আলোতে দেখলাম এক ভীষণ দৃশ্য। একটা বিরাট সাদা কাকাতুয়া সেই অসহায় টিয়াটাকে তার তীক্ষ্ণ ঠোঁটের কামড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। টিয়াটা আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুক্তি পেতে। কিছুক্ষণ লড়াই করার পর আর প্রতিরোধ করতে পারলো না। ধীরে ধীরে তার ঘাড় কাৎ হয়ে পড়লো। হিংস্র কাকাতুয়াটা তবু তাকে ছাড়ে না। ক্রমাগত নখের আঁচড়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। তার দুটো ডানা দিয়ে সে বারবার ঝাপটা দিচ্ছে। লাল চোখ দুটি কি ভীষণ ও ভয়ঙ্কর। শেষ পর্যন্ত টিয়াটার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো খাঁচার মধ্যে। আর শত্রুনাশের পর কাকাতুয়াটা যেন তৃপ্তিতে পাখা দুটো গুটিয়ে নিল। তারপর দাঁড়ের ওপর লাফিয়ে উঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো। সে আওয়াজে আমি চমকে উঠি। সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ক্লান্ত ঘুম জড়ানো চোখে দেখলাম, খাঁচার মধ্যে সেই হালকা আলোটা নিভে আসছে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে সেই হিংস্র সাদা কাকাতুয়াটা। শুধু আধো অন্ধকারে খাঁচায় পড়ে থাকে সবুজ টিয়াটা। অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। আমি যেন বুঝতে পারছি জমিদারবাড়ির খাঁচার রহস্য।

অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে ডান হাতটা তুলে ছোট্‌কার গায়ে রাখলাম। ডাকবার চেষ্টা করেও পারলাম না। গলা শুকিয়ে গেছে। ছোট্‌কা চকিতে উঠে আমার দিকে তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরে ফেললে, তারপর যেন চিৎকার করে উঠলো, তপু, তপু, তুই এ'রকম করছিস কেন? তপু!

আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। কোনোরকমে শুধু আঙুল তুলে খাঁচার দিকে দেখালাম। এর পর আর কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু ছোট্‌কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

—তপু, কি হয়েছে, তপু তুই কি দেখেছিস বল?

কার্ত্তিক ১৩৯৪

অশথ গাছের পেত্নী

শৈলেন্দ্র নাথ গুঁই

গ্রামের শেষ প্রান্তে জলার ধারে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। লোকে বলে, ও গাছে ভূত-পেত্নীর বাসা, তাই বড় একটা কেউ দুপুরে বা সন্ধ্যার পর ও পথ মাড়ায় না।

গোয়ালাদের মেয়ে রামী, সেদিন বিকালবেলায় দাওয়ায় বসে এক কাঁসি মুড়ি নুন-তেল মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল, এমন সময় মা এসে হাঁক দিলেন—রামী, কালী গাইটা এখনও ঘরে ফিরল না, যা খুঁজে নিয়ে আয়।

এমন আয়েসটা ছাড়তে রামীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কথা না শুনলে পিঠে চাপড় পড়বে, এই ভয়ে রামী কাঁসিটা ঘরের তাকে রেখে কালী গাই-এর খোঁজে ছুটল। অনেক গরু তার চোখে পড়ল, এক কালী গাই ছাড়া। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যেবেলা সে এসে পড়ল গাঁয়ের প্রান্তে সেই অশথ গাছের তলায়। এখানেও সে কালী গাই-এর দেখা পেল না। ফিরতে যাবে, এমন সময় কে হঠাৎ বলে উঠল—তুই কে রে? এসময় এখানে এলি কেন? জানিস না, এখন আমাদের ঘুরে ফিরে বেড়ানোর সময়!

রামীর বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল। তার এতক্ষণ ভূত-পেত্নীর কথা মনেই ছিল না, শুধু কালী গাই তার মাথায় ঘুরছিল। এখন সে কি করে!

আবার কে বলে উঠল—তুই কে রে? তোর নামটা কি?

এবার রামী ভয়ে ভয়ে বলে উঠল—রামী।

কি বললি? এই বদ্ নামটা ছাড়া আর কোনো নাম খুঁজে পাস না? নামটা বদলে কালী রাখ। কালী আমাদের দেবতা।

রামী ভয়ে ভয়ে বলল—ওটা তো আমাদের একটা গরুর নাম, তাকে খুঁজতেই তো এখনে এসে পড়েছি।

ওঃ, বুঝেছি। যখন এসেই পড়েছিস তখন তোকে একটা কথা বলি। তুই কাল একটা মুড়োর ঝাল রেঁধে দুপুরবেলা আমায় দিয়ে যাস। রোজ রোজ ভাগাড়ের মরা মোষ-গরু খেতে আর ভালো লাগে না। বুঝলি? তোকে একটা ভালো জিনিস দেবো—আর তোকে আমি বামী বলে ডাকবো।

রামী বলল—তাই ডেকো, এখন আমি যাচ্ছি।

তাই যা, কাল মনে করে রুই মাছের মুড়োর ঝাল দিয়ে যাস আর জিনিসটা নিয়ে যাস। দেখগে যা, তোদের কালী গাই এতক্ষণে বাড়ি ফিরেছে।

রামী আর না দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি ফিরে এলো। এসে বেশ খানিকক্ষণ দাওয়ায় জিরিয়ে নিয়ে আবার মুড়ির কাঁসি নিয়ে বসল। মা গোয়ালঘরের কাজ সেরে এসে দাঁড়াতেই রামী মাকে নিয়ে ঘরে গিয়ে পেত্নীর সব কথা খুলে বলল।

মা শুনে বলল—তাই নাকি? কাল একটা বড়ো মাছের মুড়ো আনিয়ে রেঁধে দেবো। তুই দিয়ে আসিস। দেখ না, তোকে কি জিনিস দেয়।

রামীর এখন একটু সাহস বেড়ে গেছে। পরের দিন দুপুরে রামী সত্যসত্যই একটা মুড়োর ঝাল কলাপাতায় মুড়ে অশথ গাছের তলায় গিয়ে রাখল।

কিরে, এনেছিস দেখছি, তুই এখন পিছন ফিরে দাঁড়া, খেয়ে নিয়ে তোকে সেই জিনিসটা দেবো।

রামী পিছন ফিরে দাঁড়াল। একটু পরেই দেখে তার সামনে কোথা থেকে একটা বড়ো কড়ি এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পেত্নীটা বলে উঠল—এটা নিয়ে যা, চুলের সঙ্গে বেঁধে রাখবি, আর এই কড়ি ধোয়া জল যাকে খাওয়াবি, তার সব ব্যামো সেরে যাবে। তবে মাঝে মাঝে আমায় মুড়োর ঝাল দিয়ে যাস।

দু-চার দিনের মধ্যে কড়ির গুণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল, কিন্তু কোথা থেকে কি ভাবে কড়িটা পাওয়া গেছে সেটা খুব গোপনে রাখা হলো। রামীর মা প্রচার করে দিল, রামী স্বপ্নে এক মহাপুরুষের কাছে এটা পেয়েছে।

রামীদের বাড়িতে চারিধার থেকে লোক আসতে লাগল। এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা ফি হয়ে গেল কড়ি-ধোওয়া জল খেতে। যাদের শক্ত ব্যামো তারা স্বেচ্ছায় দশ-বিশ টাকা দিতে লাগল। রামীদের বাড়িতে মা-লক্ষ্মী উথলে উঠলেন।

হঠাৎ একদিন প্রায় সন্ধ্যার সময় রামী মাথায় হাত দিয়ে দেখে কড়িটা চুলে বাঁধা নেই। কোথায় গেল? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালেই রামী ছুটল অশথতলায়। গিয়ে দাঁড়াতেই কে বলে উঠল—কিরে কড়িটা হারিয়েছিস বুঝি, তা পেছনে গিয়ে ওপর দিকে চেয়ে দেখ।

রামী পিছনে গিয়ে দেখে ও-গাঁয়ের নটবর ডাক্তারের বৌ ওপর দিকে পা আর নিচে মাথা করে হাঁকপাঁক করছে। কি ব্যাপার! রামী কিছু বুঝতে পারল না। পেত্নী এবার বলল—ও-ই কাল তোর মাথা থেকে কড়িটা খুলে নিয়ে গেছে, তাই ওকে ধরে এনে ঝুলিয়ে রেখেছি। তবে ওর বিশেষ দোষ নেই, নটবর ডাক্তারের মোটে রোগী হচ্ছিল না। তুই এক কাজ করবি, খালি পুরনো রোগের রোগীদের জল খেতে দিবি, অন্য সব রোগীকে ডাক্তারের কাছে পাঠাবি, বুঝলি? এখন আমি ওকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুই ওর সঙ্গে যা, কড়িটা তোকে দিয়ে দেবে। বার বার তিনবার। আবার হারালে কিন্তু ফেরত পাবি না।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ রামীদের দোরগোড়ায় একটা হল্লা শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা ষণ্ডা মার্কা লোক ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। রামীর বাবা দাওয়ায় বসে ছিল, ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা লোক এগিয়ে এসে বলল—সেই মেয়েটা বুঝি তোর মেয়ে, যে কড়ি-ধোওয়া জলে রোগ সারায়।

রামীর বাবা ভয়ে শুধু ঘাড়টা নাড়তে পারল।

সেই লোকটা এবার চেঁচিয়ে বলল—আমরা সেই কড়িটা নিতে এসেছি, ডাক তোর মেয়েকে। চালাকি করলে মেয়েটার মাথাটাই কেটে নিয়ে যাবো।

রামীর মা তখন রামীকে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো—এই যে বাবা, এই আমাদের মেয়ে। এর মাথাটা কেটো না বাপ। তোমাদের সামনে ওর চুল থেকে কড়িটা খুলে দিচ্ছি।

এই কথা বলে রামীর চুলে বাঁধা কড়িটা খুলে নিয়ে রামীর মা সর্দারের হাতে দিয়ে দিল।

কড়িটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে সর্দার সেটা নিজের ট্যাঁকে গুঁজলো, তারপর সকলে বেরিয়ে গেল।

রামী এবার ভরসা করে বলল—মজা টের পাবে এবার—এ পেত্নীর কড়ি। জোর করে নিজের কাছে রাখা যায় না।

সকাল হতেই রামী ছুটল অশথতলায় পেত্নীকে খবর দিতে। খবর আর তাকে দিতে হলো না, গিয়েই দেখে সর্দারটা মাথা নিচু করে ঝুলে হাঁকপাঁক করছে।

রামী যেতেই পেত্নী বলে উঠল—দেখ্ বামী, মজা দেখ্। ওকে আমি সহজে ছাড়ছি না, মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ছাড়বো।

দেখা গেল সর্দার দুটো হাত একসঙ্গে জোড় করল, যেন তাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করছে।

পেত্নী বলল—তোর হয়েছে কি? ফেল, ট্যাঁক থেকে কড়িটা মাটিতে ফেলে দে—

সর্দার তাই করল। পেত্নী বলল—বামী, যা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি যা—মুড়োর ঝাল আনতে ভুলিসনি কিন্তু।

দেখতে দেখতে রামী আঠারোয় পা দিল। মা রামীর বাবাকে বলল—আর তো মেয়েকে ঘরে রাখা যায় না গো, লোকে যে নিন্দে করছে। বলছে—মেয়ে অনেক টাকা রোজগার করছে তাই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না।

রামির মা-বাবা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু এ মেয়ের বিয়ে কি আটকায়? খবর পেয়ে পাত্রের বাবারা এসে বসে থাকতে লাগল। পছন্দের দরকার নেই, বৌ-এর সঙ্গে রোজগার বাঁধা।

বিয়ের রাতেই রামীর স্বামী বলল—কৈ তোমার কড়িটা দেখি?

রামী চুল থেকে খুলে স্বামীকে দেখাল। তার স্বামী খপ্ করে রামীর হাত থেকে কড়িটা কেড়ে নিয়ে বলল—এটা আর তুমি পাচ্ছ না, আমিই লোককে কড়ি-ধোওয়া জল দেবো।

রামী বলল—তা হয় না, ওটা আমার চুলে বেঁধে রাখাই নিয়ম। আর আমি না দিলে জলে কোনো কাজ হবে না।

রামীর স্বামী কিছুতেই কড়ি ফেরৎ দিল না। নিজের বালিশের তলায় রেখে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে কিসের একটা শব্দে রামীর ঘুম ভেঙে গেল, ধড়মড়িয়ে উঠে দেখে তার স্বামী বিছানায় নেই। তাহলে গেল কোথায়?

পরের দিন সকালেই রামী শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে গরুর গাড়ি চেপে সেই অশথতলায় এসে হাজির হলো। এসে দেখে তার স্বামী গাছে ঝুলছে।

পেত্নী বলল—যে কড়ি নেয় তারই এই শাস্তি হয়। তোর স্বামী বলে পার পাবে কি? যা তোর সোয়ামীকে নিয়ে যা। কিন্তু কড়ি আর পাবি না। বারবার তিনবার হলো।

রামী বললে—তোমার তাহলে রুই-এর মুড়ো আর শোল মাছ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

পেত্নী বলল—তা আর কি করি বল? কড়ির এই নিয়ম, না হলে গুণ থাকবে না।

মাঘ ১৩১৪

মরুগ্রাস

সঙ্কর্ষণ রায়

মিনতি মাখানো স্বরে উটওয়ালা দিলদার খাঁ তার উটের উদ্দেশে বললে, 'উঠ্ মেরা উটরানী।' কিন্তু উট নির্বিকার। তার হাবভাবে মনে হলো উটওয়ালার কথা যেন তার কানেও যাচ্ছে না।

রাজস্থানে থর মরুভূমির পশ্চিম প্রান্তে বারমেরের কাছে উত্তরলাই গ্রামে ক্যাম্প করে আমি এ অঞ্চলের মাটির তলায় চাপা পড়া জলের স্তরের খোঁজ নিচ্ছি। স্থানীয় কুয়োগুলোর মধ্যে তার হদিস মেলে না, কারণ এই সব কুয়ো অগভীর। তার অস্থায়ী জলের স্তরকে ছুঁয়েছে। পুব দিকে উত্তরলাই থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটি বিশুদ্ধ জলের বড় আকারের হ্রদ আছে। ওখানে স্থায়ী জলের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। এ কথা আমার গাইড মকবুলকে বলতেই সে ডেকে নিয়ে এসেছে উটওয়ালা দিলদার খাঁকে। আমাকে তার উটের পিঠে চাপিয়ে ঐ হ্রদের ধারে নিয়ে যেতে বলেছে। দিলদার নিয়ে এসেছে তার উট। তার পিঠে চেপে বসেছি। কিন্তু সে উঠছে না।

'উট যে উঠছে না!' কাতর স্বরে বললে দিলদার খাঁ। 'কি করি বলতো মকবুল?'

চালক হয়েও তুমি ওকে ওঠাতে পারছ না!' মকবুল শ্লেষমাখানো স্বরে বললে, 'দাঁড়াও ওকে আমি মোক্ষম দাওয়াই দিচ্ছি....'

বলে মকবুল ঝুঁকে পড়ে উটের গোটানো সামনের পা যেখানে শরীরে মিশেছে সেখানে কাতুকুতু দিতে থাকে। কাতুকুতু দিতেই উট উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু কর।

'ওকে থামাও দিলদার।' আমি বললাম, 'মকবুলকে তুলে নিতে হবে।'

'না হুজুর।' গম্ভীরমুখে দিলদার খাঁ বললে, 'মকবুলকে আমার উট কখনোই পিঠে তুলবে না। মকবুলের ওপরে ও রেগে গিয়েছে।'

'রেগে গিয়েছে কেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'এমনি কাতুকুতু দিলে কার না রাগ হয় বলুন।'

'কাতুকুতু দিলে তো মানুষ হাসে। সে হাসি কি রাগের হাসি?'

'হ্যাঁ হুজুর, কাতুকুতুর হাসি রাগের হাসি।'

'কিন্তু মকবুল ছাড়া আমি যে অচল। ও আমার সঙ্গে না থাকলে কে আমাকে পথ দেখাবে?'

'আমি দেখাব। যেদিকে এখন আমরা যাচ্ছি, সেদিককার পথ মকবুলের চেয়ে আমি ভাল চিনি। আমার চেয়ে ভাল চেনে আমার উটরানী। চোরাবালি বাঁচিয়ে পথ চলতে সে-ই পারে....'

একটানা বালির বিস্তারের মধ্যে কোথায় আছে চোরাবালি তা চোখে দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু দিলদারের উটরানী চলতে চলতে বুঝে নেয়। চোরাবালির পাশ কাটিয়ে যেতে থাকে সে।

উটওয়ালা দিলদার উটের চালক। কিন্তু চালক হিসেবে তার ভূমিকা কি তা বুঝতে পারি না। কারণ উটের পিঠে সে আমারই মতো জড়ভরত হয়ে বসে আছে। উটের মুখের লাগাম তার হাতে থাকলেও তাতে সে বিন্দুমাত্রও টান দিচ্ছে না।

'ব্যাপার কি দিলদার!' আমি বললাম, 'তোমার উটরানী তো নিজের মনেই চলেছে। তোমার হাতে লাগাম, তবু চালাচ্ছ না!'

'চালাব কি হুজুর!' দিলদার বললে, 'কোথায় চোরাবালি বুঝতে পারি না, আমি চালাতে গেলে তো উটরানীকে চোরাবালির মধ্যে নিয়ে ফেলবো।'

'তার মানে, তোমার উটরানী যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাচ্ছে!'

'না হুজুর। কোথায় যেতে হবে তা আমি আগেভাগেই বুঝিয়ে দিয়েছি উটরানীকে। ঠিক পুব দিকেই আছে ঐ নিপট। ঐ দিকেই সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের...'

'কি করে বোঝালে?'

'ইশারা করে, গায়ে হাত বুলিয়ে। চলতে শুরু করার আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি।'

'সে বুঝেছে কি না তা বুঝলে কি করে?'

'ওদিকে যেতেই চাইছিল না সে। উঠতেই চাইছিল না উটরানী। এর আগেও যত বার ওদিকে যেতে চেয়েছি, তত বারই সে এমনি উবু হয়ে বসে থেকেছে।'

'কেন বল তো?' আমি প্রশ্ন করি।

'দেখছেন না পথ কি রকম ভয়ঙ্কর।' দিলদার জবাব দিল, 'পদে পদে চোরাবালি....'

'চোরাবালি তো চেনে তোমার উট? তবু ভয়।'

'চেনে বলেই ভয়।'

'পথের কথা বলছ, কিন্তু পথ কই?'

'রেগী-স্থানে (বালির স্থান—মরুভূমি) পথ দেখা যায় না, পায়ে পায়ে চিনে নিতে হয়। তা-ই করছে আমার উটরানী।'

বালির মধ্যে এঁকে-বেঁকে চলে দিলদারের উট। দিলদার চুপ। তার মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। আমি কথা বলার চেষ্টা করতেই সে ইশারা করে থামিয়ে দিচ্ছে আমাকে।

কেন কথা কইব না আমার এই প্রশ্নের উত্তরে দিলদার বললে, 'দেখছেন না, আমাদের কথা কওয়া উটরানী পছন্দ করছে না! কোনো চিন্তা নেই, ও আমাদের ঠিক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে। এই দেখুন না, সোজা পুব দিকেই যাচ্ছে....'

আমার কোমরের বেল্টের সঙ্গে একটা চামড়ার কেসে কম্পাস বাঁধা ছিল। কম্পাসটা বের করে দেখি, চোরাবালি বাঁচিয়ে, ঠিক পুব দিকেই যাচ্ছে দিলদারের উট।

দিলদার খাঁ মরুভূমির মানুষ হলেও মরুভূমির বালির মধ্যে চোরাবালি চেনে না। মরুভূমি আমার গবেষণা ও সন্ধানের ক্ষেত্র হলেও আমি চোরাবালি চিনি না। অতএব আমাদের একমাত্র ভরসা দিলদারের উটরানী। সে যদি হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে থেমে যায়, কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, চোরাবালি গ্রাস করবে আমাদের।

'তোমার উটরানীকে খুশি রাখ দিলদার।' ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠি, 'দেখো, সে যেন বিগড়ে না যায়।'

'খুশি আর রাখতে পারছি কই।' দিলদার খাঁ কাতর স্বরে বললে, 'যেতে চাইছে না, তবু নিয়ে যাচ্ছি। জানি না, আমাদের তগদিরে আজ কি আছে! মনে মনে আল্লার কাছে দোয়া মাঙ্গুন হুজুর। আর দোহাই আপনাকে, চুপ করে থাকুন। উটরানীর হাবভাবে বুঝতে পারছি আমাদের কথাবার্তা সে সইতে পারছে না....'

নিঃশব্দে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে উটরানী। বালির ওপরে লম্বা লম্বা পা ফেলছে কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। কেমন ভয় হতে থাকে আমার। মনে হয় এই নীরবতার মধ্যে মরুভূমির আক্রোশ যেন পুঞ্জীভূত।

চারপাশে বালি রোদে ঝলমল করছে। বেলা বেড়ে যেতে রোদের প্রখরতা বাড়ে, বালির কণাগুলো আগুনের কণায় পরিণত হয়। তাদের মধ্যে দিয়েও সোচ্চার হয়ে ওঠে মরুভূমির

আক্রোশ। রবীন্দ্রনাথের একটি গানের দুটো কলি হঠাৎ মনে পড়ে গেল ঃ—'নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মত।

তোমার রক্তনয়ন মেলে।'

বালির রক্তনয়নে মৃত্যুক্ষুধাই ফুটে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের রাজপ্রাসাদের ক্ষুধিত পাথরের মতো ক্ষুধার্ত বালি যেন ওৎ পেতে আছে। উটরানী একটু অসতর্ক হলেই সে আমাদের গ্রাস করে ফেলবে।

বালির সমুদ্রের মধ্যে প্রায় দিশেহারা বোধ করতে শুরু করেছি, ভেবে পাচ্ছি না এর শেষ কোথায়। এমন সময় রিক্ততার বুকে হঠাৎ একটা অপরূপ ছবি ফুটে ওঠে। দেখে মনে হলো যেন কেউ ধূসর রঙের ক্যানভাসে নিবিড় সবুজ রঙের ছবি এঁকে আমাদের চোখের সামনে বসিয়ে দিয়েছে।

ছবি নয়, গাছপালা ও ঘাস দিয়ে ঘেরা একটি হ্রদ। স্থানীয় ভাষায় হ্রদকে বলে 'নিপট'। দিলদার খাঁ বলল, 'পৌঁছে গিয়েছি হুজুর। এই নিপটই তো দেখতে চেয়েছিলেন....'

নিপটের নিকটে এসে নিজের থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল উটরানী। উত্তরলাই থেকে যাত্রা শুরু করার পর এই প্রথম দিলদার খাঁ উটরানীর মুখে লাগানো লাগাম ধরে টান মারার সুযোগ পেল। লাগাম ধরে মৃদুমন্দ টান দিতেই উটরানী বসে পড়ে।

উটের পিঠ থেকে নেমে পড়ে আমি বললাম, 'এখন আমি এই হ্রদটাকে পরীক্ষা করব। তোমার উটরানীকে নিয়ে তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।'

'কতক্ষণ হুজুর?' দিলদার খাঁ প্রশ্ন করে।

'এই ধরো ঘণ্টা দুয়েক।' আমি জবাব দিলাম।

'কাছেই আমার ফুফুর (পিসির) বাড়ি। এই দুই ঘণ্টার মধ্যে আমি ফুফুর সঙ্গে মোলাকাত করে আসব।'

'কাছাকাছি কোনো লোকালয় তো চোখে পড়ছে না। এই জনমানবশূন্য জায়গায় কোথায় তোমার ফুফুর বাড়ি?'

'নিপটের ওপারে ছোট একটি গ্রাম আছে, এখান থেকে অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। আমার উটরানীর পিঠে চেপে ওখানে আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। চিন্তা করবেন না, দু'ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

উটরানীর পিঠে চেপে চলে গেল দিলদার খাঁ। হ্রদের তীর বরাবর এগিয়ে গেলেও বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে যেতে হয় তাদের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

হ্রদের জল পরীক্ষা করতে এসেছি, কাজেই পুরোপুরি হ্রদের জলের দিকে মনোনিবেশ করি। মরুভূমির মাঝখানে এই বিপুল জলের বিস্তার বিস্ময়কর। কোথা থেকে এল এত জল?

বৃষ্টিপাত এখানে খুবই কম। এই হ্রদ সৃষ্টিতে বৃষ্টির জলের ভূমিকা খুবই নগণ্য। নিঃসন্দেহে এর উৎস ভূগর্ভের জল। অর্থাৎ মাটির নিচে জলবাহী পাথরের স্তর আছে, সেই স্তর থেকে জল বেরিয়ে এসে হ্রদকে পুষ্ট করেছে। আকারে হ্রদটি বেশ বড়। ভূগর্ভের জলের স্তর থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। বেরিয়ে এসেছে শুধু নয়, বেরিয়ে আসছে সর্বদা। নইলে এই হ্রদের জল শুকিয়ে যেত।

হ্রদের বিপুল জলের বিস্তারের মধ্যে ভূগর্ভের স্থায়ী জলের স্তরকে যেন দেখতে পাই। ভূগর্ভের জলের স্তর এখানে ভূপৃষ্ঠে উঠে এসেছে। ভূগর্ভে মরুভূমির তলা দিয়ে তা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে বালি পরীক্ষা করে বলা কি সম্ভব?

বোধহয় না। মরুভূমির বালির দিকে তাকিয়ে কখনো অন্তঃসলিলা নদীর অস্তিত্বের আভাস

মেলে না। বালি পরীক্ষার চেয়ে ভাল এরকম আরও কয়েকটি হ্রদ খুঁজে বের করা। আরও হ্রদ খুঁজে পেলে হ্রদগুলির মাঝখানের অঞ্চলে নিশ্চিন্ত মনে ড্রিলিং করে জলের স্তরের নাগাল পাওয়া যেতে পারে। অতএব দিলদার খাঁয়ের উটরানীর পিঠে চেপে আরও অভিযানে বেরোতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে আরও হ্রদ, দিলদার খাঁ যাকে বলছে নিপট।

'বাবুসাব।' আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল একটি বাজখাঁই গলার আওয়াজে। চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি একজন লম্বা-চওড়া সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। সে আমার কাঁধে হাত রেখে বললে, 'এখান থেকে চল। এখনই....'

'কেন?' আমার প্রশ্নের জবাবে মুখে কিছু না বলে সে আমার হাত ধরে হ্রদের ধারে একটি পাথরের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

'এখানে নিয়ে এলে কেন আমাকে?' আমি রাগত স্বরে বললাম, 'কোথাকার কে তুমি, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়।'

'আমি যেই হই না কেন, তোমাকে বাঁচাবার জন্য নিয়ে এসেছি এখানে।' বুড়ো শান্ত গম্ভীর গলায় বললে, 'আঁধি আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে যাবে....'

'আঁধি! কই তার কোনো লক্ষণ তো....'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এল বালির ঝড়। এল না বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলা উচিত। পাথরের ঘরে আত্মরক্ষা করে বাইরে তার তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করি।

আকাশ ও মাটির মাঝখানের শূন্যস্থান পূর্ণ হয়েছে বালি দিয়ে। বালির মধ্যে আবর্তের পর আবর্ত ওঠে। এক একটি আবর্ত যেন আকাশ-মাটি-জোড়া স্তম্ভের আকার নেয়।

'দেখছ তো!' বুড়ো বললে, 'বালির ঐ ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে খড়কুটোর মতো উড়ে যেতে।'

'দিলদার খাঁয়ের কি হলো কে জানে!' আমি বললাল, 'সে তার উটের পিঠে চেপে নিপটের ওপারের গাঁয়ের দিকে গেল।'

'দিলদার খাঁ মরুভূমির মানুষ, উট মরুভূমির জানোয়ার। আঁধির মধ্যে আত্মরক্ষার কৌশল ওদের জানা আছে।'

আধঘণ্টার মধ্যে ঝড় থেমে গেল। ঝড় থামলেও বাতাসে বালি ভেসে বেড়ায়। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বালি সিল্কের পর্দার মতো মাটি থেকে উঠে আকাশকে ছুঁয়ে থাকে।

পাথরের ঘর থেকে বেরিয়ে বালির কুয়াশার মধ্যে হ্রদের ধার দিয়ে হাঁটি। পাথরের ঘরটি পাথরের স্তরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। খুব মন দিয়ে এই পাথর পরীক্ষা করি। আমার আশা পাথরের মধ্যে ফাটল দেখতে পাব, যার ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে এসে এই হ্রদকে পুষ্ট করে যাচ্ছে। বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, 'কি খুঁজছ অত মন দিয়ে?'

'পাথরের মধ্যে ফাটল খুঁজছি।' আমি জবাব দিলাম, 'যার ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে আসছে।'

'ফাটল আছে জলের তলায়। তাকে চোখে দেখা যায় না। চোখে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব আমি টের পাই।'

'কি করে?'

'আওয়াজ শুনে। সর্বদাই শুনতে পাই ফাটলের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে আসার আওয়াজ।'

'কই, আমি তো শুনতে পাচ্ছি না।'

'কান পেতে থাক, শুনতে পাবে।'

বুড়োকে প্রশ্ন করে তার পরিচয় জেনে নিই। তার নাম মইনুদ্দিন। যে পাথরের ঘরে সে থাকে তার পাশেই আছে জনৈক পীরবাবার সমাধি। আর আছে একটি শিবমন্দির। দুয়েরই দেখাশুনা করে সে।

'দরগা ও মন্দির দুয়েরই দেখাশুনা কর তুমি!' আমি অবাক হয়ে তাকালাম বুড়োর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ।' বুড়ো মৃদু হেসে বললে, 'একই সঙ্গে দরগা ও মন্দিরের দিকে মন দিতে কোনো অসুবিধে নেই আমার। কারণ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাই না।'

'শিবমন্দিরের পুজো-আর্চা, নিত্যকর্ম এসবও কি তুমিই কর নাকি?'

'এসবের আমি কি জানি! তবে মনে মনে সর্বদাই পুজো করি....'

মইনুদ্দিনের অনুরোধে আবার তার পাথরের ঘরের মধ্যে ঢুকি। জোয়ারি রুটি সেঁকে খেতে দেয় সে আমাকে। রুটির সঙ্গে দেয় আলুর তরকারি।

খাওয়া সেরে দিলদার খাঁ ও তার উটের জন্য অপেক্ষা করি। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে আসে, সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা ঘনায়। কিন্তু দিলদার আসে না তার উট নিয়ে।

'ব্যাপার কি ভাইসাহেব।' মইনুদ্দিন তার দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, 'উটওয়ালা তোমাকে না নিয়েই চলে গেল নাকি?'

'না, না, এ হতেই পারে না।' আমি বললাম, 'আমাকে নিয়ে এসেছে, আমাকে বাদ দিয়ে নিশ্চয়ই যাবে না।'

'যেতেও পারে। উটের মেজাজ-মর্জি যদি ঠিক না থাকে তোমাকে বাদ দিয়েই চলে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে উট হয়তো দিলদারের ফুফুর বাড়ি থেকে আসতেই চাইছে না। হয়তো উঠছেই না....'

'ঠিক বলেছ। উত্তরলাইতে দিলদারের উট উঠতেই চাইছিল না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দিলদার যদি তার উট নিয়ে না আসে আমি কি করে এখান থেকে বারমের যাব?'

'অন্য কোনো উটের পিঠে চেপে যাবে। কাল সকালে আমার উট রসদ নিয়ে গাঁ থেকে আসবে। সেই উটের পিঠে চাপিয়ে আমি নিজে তোমাকে উত্তরলাই নিয়ে যাবো। আজ রাতের মতো তুমি আমার গরিবখানায় থাকো।'

ক্রমশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সম্ভবত সেদিন অমাবস্যা। রাতে কখনই চাঁদ দেখা দেবে না। আকাশে চাঁদ না থাকলেও একটা অস্ফুট আলো বালির স্তর এবং নিপটের জল থেকে বেরিয়ে আসছে। এটা হয়তো আকাশের তারার আলোর প্রতিফলন কিংবা বালি বা জলের সঙ্গে মিশে থাকা স্বয়ংপ্রভ কোনো পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা আলো। মইনুদ্দিনকে ডেকে বললাম, 'দেখেছ কি রকম অদ্ভুত আলো।'

'ভূতুড়ে আলো এটা।' মইনুদ্দিন গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'এই আলোর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে নেই, চল ভেতরে যাই।'

ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে জোয়ারি রুটি সেঁকে মইনুদ্দিন। ওবেলার তরকারি ছিল, তাই দিয়ে রুটি খেয়ে নিয়ে আমরা শুয়ে পড়ি ঘরের মেঝেতে বিছানো খড়ের গাদার ওপরে। সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কাজেই শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি।

গভীর রাত্রে হঠাৎ দিলদারের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে থেকে দিলদার ডাকছে, 'বাবুসাব, বাবুসাব....'

ধড়ফড় করে উঠে বসি আমি খড়ের গাদার ওপরে।

'বাবুসাব বাবুসাব।' ডেকেই চলে দিলদার, 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন, উটরানীকে নিয়ে এসে গিয়েছি আমি।'

দিলদারের ডাক শুনে আমার ঘুম ভাঙলেও মইনুদ্দিনের ঘুম ভাঙে না। এমনি গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে দিলদারের ডাক তাকে স্পর্শও করে না।

আবার ডাকে দিলদার। আর দেরি না করে কোমরের বেল্টে কম্পাস গুঁজে কাঁধে হাতুড়ি, বালি ও পাথরের নমুনা দিয়ে ভরা ঝোলা ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

বাইরে এসেই দেখি উটের পিঠে বসে থাকা দিলদারকে। সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে যে অস্ফুট আলো বালি ও জলের ওপরে ফুটে উঠেছিল তা এখন গুটিয়ে এসে দিলদার ও তার উটকে ঘিরে ফেলেছে। যেন থিয়েটারের স্টেজের ওপরে ফেলা স্পট-লাইটের মতো আলোর বৃত্তের মাঝখানে এসে পড়েছে তারা।

দিলদারের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে উটের পিঠে পেছন ফিরে বসেছিল, উটও দাঁড়িয়েছিল পেছন ফিরে।

'উঠে পড়ুন হুজুর।' দিলদার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে, 'আর একটু দেরি করবেন না। ভোর হতে আর দেরি নেই।'

'ভোর হলে পর রওনা হলে হতো না!' আমি বললাম, 'চোরাবালি বাঁচিয়ে যেতে হবে, দিনের আলোতেই তো যাওয়া উচিত।'

'না না, দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই উত্তরলাইতে পৌঁছতে হবে আমাদের। নিন, আর দেরি না করে উঠে পড়ুন উটের পিঠে।'

'উঠব কি করে। তোমার উটরানী তো দাঁড়িয়ে আছে।'

'উটরানী নয়, অন্য উটের পিঠে উঠুন। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন উটরানীর পিছনে অন্য উটটা আপনাকে পিঠে তুলে নেবার জন্য উবু হয়ে বসে আছে।'

আলোর বৃত্তের বাইরে অন্ধকারের মধ্যে মাটির ওপরে অন্য উটটা বসেছিল বলে তাকে এতক্ষণ দেখতে পাইনি। কাঁধের ঝোলা থেকে টর্চ বের করে তার বোতাম টিপে আলো জ্বালাতেই তাকে দেখতে পেলাম।

'টর্চ নেভান।' ধমকের সুরে বলে ওঠে দিলদার, 'উঠে বসুন উটের পিঠে।'

অন্য উটটার পিঠে আমি উঠে বসতেই সে উঠে পড়ল। বললাম, 'কি দরকার ছিল আর একটা উটের।'

'উটরানী আর আপনাকে পিঠে নেবে না।' দিলদার বললে, 'তাই আমার ফুফুর উটটাকে নিয়ে এসেছি। ভয় নেই, তার জন্য আপনাকে বেশি টাকা দিতে হবে না।'

'তোমার ফুফুর উট এই মরুভূমির চোরাবালির পাশ কাটিয়ে চলতে পারবে কি?'

'ফুফুর উট আমার উটরানীর পেছনে পেছনে চলবে, কোনো চিন্তা নেই। আপনি ঠিক পৌঁছে যাবেন ক্যাম্পে।'

নিশ্চিন্ত হতে পারি বা না পারি উট চলেছে মুখটি তুলে। আমি তার পিঠে বসে থাকলেও তার চলার ওপরে আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দিলদারের উটরানীকে অনুসরণ করে চলে সে।

দিলদারের উটরানীকে ঘিরে যে আলোর বৃত্ত দেখেছিলাম উটরানীর সঙ্গে সঙ্গে তা চলতে থাকে। রাতের অন্ধকারে বালি ও হ্রদের জলের ওপরে যে অস্ফুট আলো ফুটে উঠেছিল তা লাটাইয়ের সুতোর মতো উটরানীকে জড়িয়ে ধরেছে। কেন এমন হয়েছে জানি না, আমার বুদ্ধিতে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

খানিকক্ষণ বাদে আমি উটরানী ও তার পিঠে দিলদারকে আর দেখতেই পাই না। শুধু আলোর বৃত্তটি এগিয়ে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'দিলদার।'

'বলুন হুজুর।' দিলদার জবাব দিল।

'কোথায় তোমরা?'

'এই তো আপনার সামনেই আছি। চেঁচাবেন না, উটরানী বিগড়ে যাবে।'

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তোমার উটরানী এই অন্ধকারের মধ্যে চোরাবালি বাঁচিয়ে যাচ্ছে কি করে?'

'এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। শুধু জেনে রাখুন আমার উটরানী ঠিকই যাচ্ছে....'

দিলদারের উটরানী যে সঠিক পথে চলেছিল তা বুঝতে পারলাম উত্তরলাইতে আমার ক্যাম্পে পৌঁছে। কিন্তু আশ্চর্য! ক্যাম্পে পৌঁছে উটের পিঠ থেকে নেমে দিলদার ও তার উটরানীকে আর দেখতে পাই না। ভাবলাম হয়তো দিলদারের উটরানী এখানে থামেনি। এগিয়ে গিয়েছে, তার বাড়ির দিকে।

পরদিন বিকেলে এল মইনুদ্দিন ও দিলদারের ফুফুর ছেলে। তারা এসেছে দিলদারের ফুফুর হারানো উটের খোঁজে। গতকালের আঁধির পর থেকে নাকি উটটা নিখোঁজ।

'এই তো আমাদের উট!' আমার তাঁবুর সামনে চরতে থাকা উটটার দিকে তাকিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে ফুফুর ছেলে মোরাদ, 'এটা এখানে এল কি করে?'

'এর পিঠে চেপেই তো ক্যাম্পে ফিরেছি।' আমি বললাম, 'শেষ রাত্রের দিকে দিলদার একে নিয়ে এসেছিল মইনুদ্দিনের ঘরে। মইনুদ্দিন শুনতে না পেলেও তার ডাক শুনে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম।'

'এ কি বলছেন আপনি!' মোরাদের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'ঠিকই বলছি আমি। দিলদার তার উটরানীর পিঠে চেপে একে নিয়ে এসেছিল। তারপর এই উঠের পিঠে চেপে দিলদারের উটরানীকে অনুসরণ করে আমি পৌঁছে গিয়েছি ক্যাম্পে।'

'এ কী করে সম্ভব! আঁধির মধ্যে দিশেহারা হয়ে দিলদার ও তার উট চোরাবালির ফাঁদে পড়েছিল। চোরাবালির মধ্যে ডুবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে!'

'ও কি বলছ মোরাদ!' মইনুদ্দিন বললে, 'নিশ্চিহ্ন তো হয়নি। চোরাবালি ওদের গ্রাস করলেও ওরা আছে! এই দেখছ না, পাথরসাহেবকে তাঁর ডেরায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওরা ওদের কর্তব্য সম্পূর্ণ করেছে।'

মোরাদ হতবুদ্ধির মতো তাকায় আমার মুখের পানে। তার মতো আমার মুখেও কোনো কথা সরে না। এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করতে পারি না।

মাঘ ১৪০১

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না

বরুণ দত্ত

ব্যবসার খাতিরে শহরে নিজের বলে একটু আশ্রয় একান্তই প্রয়োজন ছিল বিমলেন্দুর। যা দিনকাল পড়েছে, আর সব কিছুরই যা আকাশছোঁয়া দাম, তাতে বর্ধমান শহরের উপরে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই যে হয়েছে এইতো ভাগ্যের কথা।

জায়গাটাও খারাপ নয়—বাঁদিকে কার্জন গেট মাত্র আধ মাইল, আর ডানদিকে বর্ধমানের বিখ্যাত সর্বমঙ্গলার মন্দির কয়েকশ গজ মাত্র। নামটাই যা একটু কেমন 'ধোব্‌রা শহীদ'। তা হোক, নামে কি আর এসে যায়! প্রতিবেশীরা বেশ সহযোগী আর আন্তরিক।

বাড়ির সামনে ডানদিকে দেবত্রভূমি, সব পূজাপার্বণই হয় ওখানে। এই উপলক্ষেই প্রতিবেশীদের সঙ্গে চেনাজানা যাতায়াত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে বিমলেন্দু পালিত ও তার স্ত্রী ভানুমতীর। ছেলে দীপন ও মেয়ে সোমা তাদের লেখাপড়া, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদিতে দক্ষতা দেখিয়ে সবারাই প্রিয় হয়ে উঠেছে। এক কথায় বলা যায় নবাগত এই পরিবারটি এখন পাড়ার মধ্যমণি। সুতরাং পালিত পরিবারের সকলে মিলে দিনকয়েকের জন্য কোথাও বেড়াতে গেলেও বাড়ি পাহারার জন্য ভাবতে হয় না কিছুমাত্র। পাঁচজন এগিয়ে আসে।

সেবার পুরী গেল এক সপ্তাহের জন্য এমনই নিশ্চিন্তে। ভানুমতীর ছোট বোনের বিয়েতেও গিয়েছিল একই ভাবে। আবার বিমলেন্দুও একবার সৌমেন মুকুজ্জ্যের বাড়ি পাহারা দিয়েছে প্রায় বিশ দিন। তাঁরা গিয়েছিলেন রাজস্থান ভ্রমণে।

২৫ মার্চ ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভানুমতী দু'তিন দিনের জন্য গেছে দুর্গাপুরে ভাইদের বাড়িতে। বিমলেন্দুরও যাবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ কাজের চাপ একটু বেশি বেড়ে যাওয়ায় আর হয়ে উঠল না।

ভানুমতী কিছু কিছু রান্নাবান্না করে রেখে গেছে ফ্রিজে। বিমলেন্দুর রান্নার হাতও দারুণ। তাই বার বার স্ত্রীকে বলেও ছিল, কোনো প্রয়োজন নেই। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! গ্যাসে একজনের রান্না করে নিতে কতক্ষণ লাগে!

যাহোক প্রথমদিন স্ত্রীর রান্নাতেই চলে গেল বিমলেন্দুর। দ্বিতীয় দিন সকালও হয়ে গেল। সেদিন যদিও হাফ-ডে ছিল, তবু বাড়ি ফিরতে রাত ৮টা বাজল।

বিমলেন্দু পোশাক পাল্টে, হাত-মুখ ধুয়ে, চা করে নিয়ে এসে বসল। চা আর খবর কাগজে কাটিয়ে দিল এক ঘণ্টা। তারপর উঠে ভাতে ভাত করে নিল, মাখন দিয়ে খেয়ে নেবে। এসব ব্যবস্থা করে স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে বসল টি-ভির সামনে। ছেলে-মেয়ে বাড়িতে না থাকলে বড় খালি খালি লাগে বিমলেন্দুর। একসময় টি-ভি অফ্ করে উঠে পড়ল। খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানায় শরীর বিছিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয়লাভ।

বরাবর এক ঘুমেই রাত শেষ হয় বিমলেন্দুর। কিন্তু আজ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কেমন একটা অস্বস্তিতে। পাশের পুরনো বাড়ির ততোধিক পুরনো দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজল। শুক্লপক্ষের শেষ রাতের হাল্কা জ্যোৎস্না আসছে পশ্চিম দিকের জানালা দিয়ে। উত্তর দিকের বন্ধ

জানালাটা হঠাৎ খুলে গেল সশব্দে। বিমলেন্দু ভাবল বিড়াল ঢুকেছে। তবু টর্চ জ্বেলে দেখল। কই, কিছু না তো! হয়তো ঠিকভাবে বন্ধ করা হয়নি, তাই হাওয়ায় খুলে গেছে।

বিছানা থেকে নেমে জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল বিমলেন্দু। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই জানালাটা ফের সশব্দে খুলে গেল। একজোড়া বিড়াল ঢুকল ঘরে।

বিমলেন্দু মনে মনে ভাবল, সময়াভাবে হয়নি, এবার বাড়িটাকে একটু সারাতে-টারাতে আর রঙ করতে হবে। আর উঠল না সে জানালা বন্ধ করতে। কারণ এমন কিছু বাইরে নেই, ওরা খাবে বা নষ্ট করবে।

কতক্ষণ আর লেগেছে এই চিন্তাটুকু করতে! তারই মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল বিমলেন্দুর, মনে হলো হাজার মণ ওজন যেন ওর শরীরের উপরে কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে কঠিন নির্মম হাতে কেউ যেন ওকে গলা টিপে মারতে চাইছে।

সেই অদৃশ্য শক্তি বা শত্রুর সঙ্গে প্রাণপণ যুঝতে লাগল বিমলেন্দু। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলো কে একজন আক্ষেপের গলায় বলছে, 'এ নয় রে! আমাদের তো চাই বিমলেন্দু পালকে। পালিত নয়।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিমলেন্দুর শরীরের উপরের সেই হাজার মণ ওজনের চাপ, গলার কঠিন নিষ্পেষণ সবই যেন উবে গেল। তবু নড়তে-চড়তে পারল না, ঘেমে নেয়ে একশা।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। একসময় টর্চটা জ্বালার মতো মন ও শরীরের জোর ফিরে পেয়ে সেটা জ্বেলে ঘরের চারিদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। কোথাও কিছু নেই, শুধু উত্তরের জানালাটা খোলা।

এতক্ষণে খাট থেকে নামল ভরসা করে। দেখল একখানা চটি উল্টে পড়ে আছে। মনে পড়ল, চটিটা খোলার সময়েই পায়ে লেগে উল্টে গিয়েছিল। বাইরে এসে বাড়ির আলোগুলো একে একে জ্বেলে দিল। বাথরুমে গিয়ে গা-টা ধুয়ে এসে ঘামে ভেজা জামাকাপড় পাল্টালো বিমলেন্দু। রাত প্রায় তিনটে বাজে। এই সামান্য সময়ের মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল!

বিমলেন্দু কোনোদিন ভীতু ছিল না। এখনও তার গ্রামে রাত-বিরেতে যেতে হলে ৬/৮ মাইল রাস্তা একা হাঁটতে হয়। কোনোদিন ভয় পায়নি। অথচ নিজের বাড়ির মধ্যে একী হলো!

ঘুম একেবারেই কেটে গেছে। কি করা যায় এখন! স্টিরিওতে একটা রেকর্ড লাগিয়ে সোফায় বসে সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাতে থাকল। পড়া হচ্ছে না একটা লাইনও। সে না হোক, বাকি রাতটুকু বিমলেন্দু এভাবেই কাটিয়ে দিতে চায়।

একসময় ভয় ভয় ভাব আর অস্বস্তি অনেকটাই কেটে গেল। কিন্তু শরীরটা এখনও হাল্কা বা স্বাভাবিক হচ্ছে না!

পরদিন সকালে প্রৌঢ় প্রতিবেশী মিত্রমশাই ঠাট্টা করে বিমলেন্দুকে বললেন, কি মশাই, একলা বাড়িতে ঘুম আসছিল না নাকি? না ভয়টয় লাগছিল যে সারাবাড়ির আলো জ্বেলে রেখেছিলেন?

মিত্রমশাইয়ের রসিকতায় বিমলেন্দু কিছুটা অপ্রস্তুতের মতো হেসে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলল, বাজারে চললেন? সেরে আসুন। তারপর আমার এখানে আসবেন। একসঙ্গে চা খাবো, গল্পও করব। ততক্ষণে আমি আমার এদিককার কাজগুলো সেরে ফেলি।

বেশ, বেশ ভাই। আসব। আমার হাতেও কোনো কাজ নেই। তা আপনার জন্য বাজার-টাজার কিছু—

না মিত্রদা, সবই আছে ফ্রিজভর্তি। আপনার বউমার কাণ্ড।

বাজার বাড়িতে নামিয়ে মিত্রমশাই এক ঠোঙা গরম জিলিপি নিয়ে এসে ঢুকলেন বিমলেন্দুর বাড়িতে। বিমলেন্দুও নিয়ে এলো গরম সিঙাড়া। ফ্রিজে মিষ্টি আছে, প্রয়োজন হলে চলে যাবে

ভালই। চায়ের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ হয়ে গেছে আন্দাজে। প্রাতরাশে বসল মিত্রমশাই আর বিমলেন্দু।

নানা কথাবার্তা ও রসিকতায় প্রাতরাশ পর্ব শেষ হলে বিমলেন্দু বিনা দ্বিধায় কাল রাতের সব ঘটনা, সেই প্রথম জানালা খুলে যাওয়া, রাত দুটোর ঘণ্টা শোনা থেকে আরম্ভ করে, জেগে বসে রাত ভোর করা পর্যন্ত সব বলল।

মিত্রমশাই শুনে প্রথমে তো বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। ভেবেছিলেন পেট-গরমের ব্যাপার। তারপর কেমন খটকা লাগল। তিনি জানেন যে বিমলেন্দু পালিত বাজে বকার মানুষ নয়। তাই মিত্রমশাই বিমলেন্দুর সব কথাকেই এবার গুরুত্ব দিলেন। তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। বললেন, পালিত ভাই, বেরোবার জন্য একটু তৈরি হয়ে নিন তো। আমিও আসছি বাড়ি থেকে ঘুরে। ততক্ষণে আপনি আপনার স্কুটারটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিন। স্কুটারেই বেরোব আমরা। আর হ্যাঁ, বাড়িতে বলে আসছি, আমার ওখানেই দুপুরে ডাল-ভাত চাট্টি যা হয় খেয়ে নেবেন। একা একা রান্নার হাঙ্গামায় যাবেন না।

বিমলেন্দুর কোনো কথাই শুনলেন না মিত্রমশাই। কিছুক্ষণ পরে মিত্র বৌদি এসেও একই কথা বলে গেলেন।

স্কুটারে স্টার্ট দিতে গিয়ে বিমলেন্দু জিজ্ঞেস করল, মিত্রদা, আমরা কোনদিকে যাবো?

শ্মশান।

শ্মশান? বিমলেন্দু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ। শ্মশান চেনেন না? নির্মল ঝিল শ্মশান।

বিমলেন্দু আর কোনো প্রশ্ন না করে নির্মল ঝিলের দিকেই চলল। ভাবল, বয়স্ক মানুষ, তাই তার ঐ ভয়টয় পাওয়ার বিষয়ে হয়তো কোনো তান্ত্রিক-টান্ত্রিকের কাছে তাকে নিয়ে চলেছেন মিত্রদা।

শ্মশানে পৌঁছে স্কুটারটা একপাশে রেখে বিমলেন্দু মিত্রমশাইকে অনুসরণ করল। তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন ক্লার্ক-কাম-রেজিস্টারের ঘরে। জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বিমলেন্দু পালের ডেডবডি কি এসে গেছে?

ক্লার্ক রেজিস্টার দেখে বলল, না, ও নামের কোনো ডেডবডি তো আসেনি এখনো পর্যন্ত!

এলে একটু খেয়াল রাখবেন ভাই। আমরা না হয় আবার বিকেলের দিকে একবার আসব। আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় কিনা!

ঠিক আছে, আসবেন আপনারা। আমি নিশ্চয়ই খেয়াল রাখব। নামটা লিখে রাখছি, বিমলেনন্দু পাল বললেন তো?

হ্যাঁ ভাই। অনেক ধন্যাবাদ। চলি তাহলে।

বিমলেন্দুর কাছে কেমন যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এবার মিত্রমশাই বিমলেন্দুকে তাঁর এই শ্মশান অভিযানের কারণ বুঝিয়ে বললেন। তিনি যাচাই করে দেখতে চান যে, সত্যই যমরাজের প্রতিনিধিদের ভুলে অর একটু হলেই বিমলেন্দু পালের বদলে বিমলেনন্দু পালিত যমালয়ে যাচ্ছিল কিনা। অর্থাৎ যমরাজও তাঁর রাজ্যপাট এই মর্ত্যের রাজাদের মতোই চালাচ্ছেন কিনা!

বিমলেন্দু মিত্রমশাইয়ের কথায় হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া গল্প-সল্প ভালই হলো মিত্রমশাইয়ের বাড়িতে। বিকেলের দিকে ক'জন অতিথি এলো। তাদের মধ্যে তিনজন কাছাকাছি কোথায় বরযাত্রী যাবে। রাতে ঘুমোতে আসবে মিত্রমশাইয়ের বাড়িতে। পরদিন সকালে চা খেয়েই বিদায় নেবে।

খুব ভালো, মিত্রমশাই সানন্দে বলে উঠলেন, তিনজন কেন, তোমরা সবাই এলেও কোনো অসুবিধে হবে না। আমার বাড়ি তো আছেই, তারপর আমার এই প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতেও থাকতে পারবে।

মিত্রমশাই বিমলেন্দুর বাড়িতে এলেন তার সঙ্গে। ব্যবস্থা করলেন বিমলেন্দু আর একজন শোবে তার খাটে। অন্য দুজন শোবে পাশের ঘরে। তারপরও কেউ অতিরিক্ত এলে তখন অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। বরযাত্রীরা মাঝরাত্রির আগে ফিরতে পারবে না। ততক্ষণ মিত্রমশাই থাকবেন বিমলেন্দুর বাড়িতে।

বিমলেন্দু বুঝল যে মিত্রদা কালকের ঐ ঘটনার পরে আজ আর তাকে একা থাকতে দেবেন না। আর আগামী কাল তো ভানুমতীরা এসেই যাবে বিকেলে।

মিত্রমশাই অতিথিদের কাউকে কিছু বুঝতে দিলেন না। তাদের বললেন, তোমরা সময় মতো বেরিয়ে পড়ো বিয়েবাড়িতে। আমি এঁর সঙ্গে একটু কাজ সেরে আসছি।

অতিথিরা সায় দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আপনারা।

বাইরে এসে মিত্রমশাই বিমলেন্দুকে বললেন, চলুন ভায়া একটু বেড়িয়ে আসি।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতেই চলে এলেন শ্মশানে। এসে তাঁরা কি দেখলেন? এ যে বিজ্ঞান স্বীকার করবে না! বুদ্ধিতেও ব্যাখ্যা মিলবে না! বিমলেন্দু পালের শব এসেছে শেষ দুপুরে। দাহকাজ শেষ করে এখন ফিরছে তার বাড়ির লোকজন।

মিত্রমশাই একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোককে গিয়ে ধরলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, বিমলেন্দু বেশ কিছুদিন থেকেই ভুগছিল। কখনো ভালো হয়, তো কখনো খারাপ। আগের দিন মাঝরাত থেকে অবস্থা ক্রমশ ভালোর দিকে যাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ রাত প্রায় আড়াইটায় কেমন ছটফট করতে করতে হার্টফেল করে।

কার্ত্তিক ১৪০১

নীল গাড়ির মালিক

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

এই গাড়িটা? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সুকোমল। অবাক হলো, কেন না এমন একটা গাড়ির দাম মাত্র ত্রিশ হাজার হতেই পারে না। একেবারে নতুন বলতে গেলে। অবশ্য খবরটা দেবার সময় আফতার বলেছিল, আপনি ভাবতে পারবেন না স্যার, এত কম দামে এত ভাল গাড়ি পাওয়া যায়!

বিদেশী কোম্পানীর বড় অফিসার সুকোমল সেন ত্রিশ হাজার টাকা শুনে নাক কুঁচকেছিল। ত্রিশ হাজারে সেকেন্ড হ্যান্ড অ্যামবাসাডার মানে তিন দিন অন্তর পাঁচশো থেকে হাজার টাকা খরচা হবে। সস্তার তিন অবস্থা। বলেছিল, না-না, আফতার, ভাল গাড়ি চাইছি, সত্তর পর্যন্ত উঠব।

আফতার বলেছিল, ওটা ধরুন সত্তরই দাম, ত্রিশে পাচ্ছেন।

কেন?

রাত্তিরে গাড়িটায় ভূত ঢোকে! বলে আফতার হেসেছিল। অবিশ্বাসের হাসি।

কমপিউটার প্রফেশনাল সুকোমলও সে হাসিতে যোগ দিয়েছিল। বলেছিল, তাহলে তো গাড়িটার দাম আরো বেশি বলো। ভূতটারও তো কিছু দাম থাকা উচিত!

আফতার বলেছিল, চলুন আজকেই দেখাব, একটু বিকেল বিকেল যেতে হবে কিন্তু।

কেন, বিকেল বিকেল কেন?

সন্ধ্যে হলেই নাকি গাড়িটার মধ্যে ভূত ঢোকে। কেউ আর গাড়ির কাছে আসে না।।

সুকোমল আবার হেসেছিল।

ত্রিশ হাজারে একটা ভাল গাড়ি পাওয়ার লোভে সুকোমল আফতারের সঙ্গে একুশ মাইল বাস-জার্নি করে চলে এসেছে নীলগঞ্জে। বারাসাত থেকে বেশ খানিকটা দূরে। বাস থেকে নেমে রিকশা করে দু-মাইল গ্রামের ভেতরে যেতে হয়েছে। প্রসাদ গাঙ্গুলী এই গাড়িটার বর্তমান মালিক। ভদ্রলোকের তিনটে ইঁটখোলা, অনেক জমি-জায়গা, একটা পাঁউরুটির কারখানা আছে। অনেক টাকার মালিক ভদ্রলোক। এতদিন গাড়ি কেনেননি। এখন কিনেই বিক্রি করে দিতে চাইছেন। ষাট হাজার টাকায় গাড়িটা কিনে, আরও হাজার খানেক টাকা দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে গাড়িটা প্রায় চড়তেই পারেননি। কারণ নাকি সব ভুতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার।

আফতার সুকোমলের দপ্তুরী। থাকে বারাসাতের কাছে হৃদয়পুরে। নতুন বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে নীলগঞ্জ থেকে ইঁট আনতে গিয়েছিল। সেখানেই গাড়িটার খোঁজ পেয়েছে।

গাড়ির ইঞ্জিন অভিজ্ঞ চোখে দেখল সুকোমল। একেবারে নতুন। ভেতরটা সুন্দর করে সাজানো। সুকোমল নিচু হয়ে যখন গাড়িটার অবস্থা দেখছিল তখন দোতলা থেকে প্রসাদবাবু নামলেন।

ওসব কিছু দেখতে হবে না, সব একেবারে ঠিকঠাক আছে। আরে মশাই, তিন মাস হলো গাড়িটা কিনেছি। একগাদা টাকা খরচ করেছি।

তাহলে বিক্রি করছেন কেন? সুকোমল প্রশ্ন করল।

প্রসাদবাবুর কপালে দুটো ভাঁজ পড়ল। কেন আফতার সাহেব আপনাকে কিছু বলেনি?

ভূত? হাসল সুকোমল।

হাসুন, কিন্তু আমি....চুপ করে গেলেন প্রসাদবাবু। কিছুক্ষণ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে যাক, আমি হাফ দামেরও কমে গাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি, রিস্ক আপনাদের। আমি বিবেকের কাছে

পরিষ্কার থাকলাম। কথাটা বলে প্রসাদবাবু গাড়িটার দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন একটা জ্যান্ত বাঘ সামনে রয়েছে।

সুকোমল ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল টাকাটা না নিয়ে এসে খুব ভুল হয়েছে। এমন গাড়ির খোঁজ অন্য কেউ পেলে দশ হাজার টাকা বেশি দিয়ে এখনই নিয়ে নেবে। পকেটে সাত-আটশো টাকার বেশি নেই। হাজার দুয়েক থাকলেও একটা সাদা পেপারে এগ্রিমেন্ট করে যেতে পারত।

কি ভাবছেন? প্রসাদবাবু প্রশ্ন করলেন।

টাকা তো আনিনি সঙ্গে, কিন্তু গাড়িটা আমি কিনবো।

টাকাটা আমি একসঙ্গে নেব, অ্যাডভান্স নেব না।

কেন? সুকোমল বিস্মিত হলো।

এর আগে দু'বার টাকা ফেরত দিতে হয়েছে মশাই। সবাই ভয় পাচ্ছে। দাম কমাতে কমাতে ত্রিশ হাজারে এসেছি। প্রসাদবাবুর মুখে বিরক্তির ছাপ।

আফতার ফিসফিস করল, এত কিছু আমি জানতাম না স্যার। আপনি নেবার আগে একটু ভেবে দেখুন।

সুকোমল আফতারের কথা যেন শুনতেই পেল না। মনে মনে ভাবল বেশির ভাগ লোকই মিছামিছি ভয় পায়। একটা বাজে গল্পের জন্যে এমন সুন্দর গাড়ি ছেড়ে দেওয়া একেবারে বোকার মতো কাজ হবে। সে বলল, কাল সকালে টাকাটা এনে দেব। ধরুন বারোটা নাগাদ। ব্যাঙ্ক খুলবে দশটার সময়, তারপর আসতে যতক্ষণ।

ঠিক আছে, কাল আমি সারাদিনই বাড়িতে আছি, প্রসাদবাবু বেশ সন্তুষ্ট হলেন।

আপনি কাগজপত্র ঠিক করে রাখবেন। সুকোমল প্রসাদবাবুকে উদ্দেশ করে বলল।

কাগজপত্র একরকম তৈরি করাই আছে। আপনি টাকা নিয়ে আসলেই নামধাম সব লিখে দেব, এক ঘণ্টার মামলা।

সুকোমল তৃপ্তি নিয়ে গাড়িটা দেখল আবার। এতদিনে একটা মনের মতো গাড়ি পাওয়া গেল। সুন্দু নীল রঙ গাড়িটার। কথাটা মনে হতেই সে জিজ্ঞেস করল, নীল রঙটা কি আপনিই করিয়েছেন?

না-না, রঙ করাব কেন? গাড়িটার বয়স তো দু'বছর। আর আমি তো মাত্র তিন মাস হলো কিনেছি।

আগের মালিক কে জানেন?

ডাক্তার কে এস চাটার্জী। পুরো নাম কিরণশঙ্কর চ্যাটার্জী। খুব বড় ডাক্তার। কুড়ি বছর লন্ডনে ছিলেন। বছর দুই আগে বর্ধমানে ফিরেছিলেন। ফিরেই এই গাড়িটা কেনেন তেমন ব্যবহারই করেননি। এই গাড়িতেই স্ট্রোক হয়ে মারা যান ডাক্তার।

কথা বলার ফাঁকে গৃহভৃত্য প্রসাদবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল—কিরে গোবিন্দ!

গোবিন্দ, সুকোমল আর আফতারের দিকে তাকিয়ে বলল, মা বলেছেন, একটু চা জলখাবার খেয়ে যেতে।

প্রসাদবাবু জিভ কাটলেন, ছি! ছি! দেখেছেন গিন্নী আমার মনে করিয়ে দিল। আপনাদের এখনও ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাইনি। চলুন-চলুন, অনেকটা পথ বাস-জার্নি করেছেন।

সুকোমলের খিদে পেয়েছিল। আফতারের তাড়ায় দুপুরে ভালো করে টিফিনটাও খাওয়া হয়নি। ভেতরে গিয়ে বসতেই খিদের পরিমাণ-মতো খাবার এসে উপস্থিত হলো। গরম গরম ফুলকো লুচি, বেগুনভাজা, তরকারি, রসগোল্লা, সন্দেশ। সুকোমল হেসে বলল, এক গাড়ি কিনে আপনার তো অনেক লোকসান হলো, তারপর এত খাওয়ালে....

প্রসাদবাবু আবার জিভ কাটলেন, ওকি কথা বলছেন! আপনারা আমার অতিথি আর নারায়ণের কৃপায় আমার অভাব তো কিছু নেই!

খেতে খেতে অন্ধকার হয়ে গেল। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া গেল।

কে চালাচ্ছে? সুকোমল জিজ্ঞাসা করল।

প্রসাদবাবু চুপ করে থাকলেন।

গাড়িটা নিয়ে কেউ যেন চলে গেল, সুকোমল আবার বলল।

হ্যাঁ, গোবিন্দ নিয়ে গেল, একটা কাজে পাঠালাম।

গাড়িটা নিয়ে বেশি কথা বলা প্রসাদবাবু যেন চাইছেন না।

পরের দিন সকাল দশটাতেই সুকোমল বুঝতে পারল নীলগঞ্জে তার যাওয়া হচ্ছে না। দিল্লী যেতে হবে। কোম্পানীর জরুরী তলব। ভোরবেলাতেই ফোন করে কোম্পানীর চেয়ারম্যান তাকে জানিয়ে দিয়েছেন সকাল এগারোটার ফ্লাইটে তাকে দিল্লী যেতে হবে।

একেই বলে প্রাইভেট কোম্পানী, ছ্যা! ছুটি নেবার স্বাধীনতা নেই। সুকোমল গজগজ করল। আফতার আসতেই তাকে চেক দিয়ে বলল, টাকা তুলে সোজা চলে যাও প্রসাদবাবুর বাড়ি। একটা মানি রিসিট করিয়ে নেবে রেভেনিউ স্ট্যাম্পের ওপর। দু'দিন বাদে ফিরে এসে সব কাগজপত্র আমি ঠিক করে নেব।

গাড়িটা?

তুমি চালাতে পারো?

তা পারি, আগে তো অনেকদিন ট্যাক্সি চালিয়েছি। আফতার উত্তর দিল।

তবে আবার কি? সোজা আমার বাড়িতে ঢুকিয়ে দেবে।

আফতার চলে গিয়েছিল। দিল্লীতে সুকোমল দু'দিনের বদলে পাঁচ দিন আটকে গেল। মাঝখানে কলকাতার অফিসে ফোন করে একটা অদ্ভুত সংবাদ পেয়েছিল। আফতার ওইদিন থেকে অফিসে আসছে না।

কাউকে কি বিশ্বাস করা যাবে না! মনে মনে ভেবেছিল সুকোমল, কে জানে গাড়িটাকে ট্যাক্সির মতো খাটাচ্ছে কিনা!

দিল্লী থেকে ফিরে বাড়িতে গাড়িটা না দেখে সুকোমলের মাথা গরম হয়ে গেল। এত সাহস কোথায় পেল সে! জিনিসপত্র রেখেই সোজা প্রসাদবাবুর বাড়ি।

সেকি, আপনি গাড়ি পাননি! প্রসাদবাবু রীতিমতো অবাক হলেন, আফতার সেদিনই গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। টাকাও দিয়ে গেছে। মানি-রিসিটও দিয়ে দিয়েছি। তবে কাগজপত্র তো আপনার নামে হবে, আপনি দরকার হলে পুলিশে একটা ডাইরি....

না-না, সে কথা ভাবছি না, ভাবছি অ্যাকসিডেন্ট হলো না তো?

কখনই না, গতকালই ওকে মাথারাঙির মোড়ে দেখেছি গাড়ি নিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল। আরে মশাই, ভদ্রতার খাতিরেও তো একটু থামে!

কখন? সুকোমল প্রশ্ন করল।

সন্ধ্যে সাতটা-সাড়ে সাতটা হবে। অবশ্য সন্ধ্যেবেলায় আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি গাড়িতে উঠতাম না।

কেন?

কেন আবার, সন্ধ্যেবেলায় গাড়িটায় ডাক্তার চ্যাটার্জী চলে আসেন। আরে মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলেন প্রসাদবাবু, তার আগেই সুকোমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, গাঁজা। প্রসাদবাবু নিজের কথার তোড়ে শব্দটা শুনতে পেলেন না। সুকোমল তাড়াতাড়ি বলল, আমি

উঠি প্রসাদবাবু, দেখি করা যায়।

আমি বলি কি ওর বাড়ি চলে যান। এই মাথারাঙির মোড় থেকে বাস পেয়ে যাবেন, প্রসাদবাবু বললেন।

তাই যাব, বলে সুকোমল উঠে পড়ল।

মাথারাঙির মোড় প্রসাদবাবুর বাড়ি থেকে দু-মাইল। রিকশা পাওয়া গেল না। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল সুকোমল। খানিক দূর যেতেই গাড়ির হর্ন। সুকোমল রাস্তার ধারে চলে গেল। গাড়িটা তার গায়ের কাছে এসে থামল। নীল অ্যামবাসাডর। চালকের আসনে আফতার । হাসি হাসি মুখে সুকোমলের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কিছুই হয়নি। ওর পাশে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। গায়ে চাদর, মাথায় টুপি। অদ্ভুত সমন্বয়।

যা ভেবেছি তাই, ভাবে সুকোমল, গাড়িটাকে ভাড়া খাটাচ্ছে। মুখে বলল, তোমার ব্যাপারটা কি? অফিসে জয়েন করোনি কেন?

আফতার মুখের হাসিটাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বলল, বসুন স্যার, বলছি।

সুকোমল উঠে বসতেই আফতার গাড়ি ছেড়ে দিল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল নীল অ্যামবাসাডর।

এত জোরে চালাচ্ছ কেন? অ্যাকসিডেন্ট হবে যে! সুকোমল ভীত গলায় বলল।

উনি পছন্দ করেন স্যার। উনি এর থেকেও জোরে চালান। আফতার হাসিমুখ নিয়ে বলল।

গা জ্বলে যায় সুকোমলের আফতারের ওই সবজান্তা হাসি দেখে। গাড়িটার গতি ক্রমশ বাড়ছে।

আস্তে চালাও, সুকোমল ধমক দিল।

আগে সুকোমলের ধমকে আফতারের চোখে জল এসে যেত, কিন্তু এখন সেই ধমক শুনে সে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, উনি এর থেকেও জোরে চালান।

কে উনি? আমি গাড়ির মালিক। আমি বলছি আস্তে চালাও। সুকোমল চিৎকার করল।

না, সামনে বসা অচেনা ভদ্রলোক পিছনে ঘুরলেন, আমি গাড়িটার মালিক।

জলের গভীর থেকে যেন শব্দগুলো বেরিয়ে আসছে। সুকোমল দেখল কাগজের মতো সাদা মুখ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল তার। এটা কি মানুষের মুখ! আফতারের দিকে তাকিয়ে সুকোমল বলল, কে উনি?

ডাক্তার কিরণশঙ্কর চ্যাটার্জী। প্রসাদবাবু বলেছিলেন মনে নেই?

কাগজের মতো সাদা মুখটা ক্রমশ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। সুকোমলের পিঠ দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামছে। মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আফতার! কোনোক্রমে সুকোমল নামটা উচ্চারণ করল।

স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে আফতার সুকোমলের দিকে ঘুরে বসল।

একি করছ আফতার! কথাটা বলতে গেল সুকোমল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। একি! আফতারের চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে কেন? কপালটা ফেটে গেল। গল-গল করে রক্ত নামছে। সুকোমল আর্তনাদ করার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ বেরোল মাত্র। নিজের দেহটাকে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করল সুকোমল। গাড়ির দরজাটা খুলে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিতেই কে যেন সুকোমলকে ধাক্কা দিল।

হাসপাতালে জ্ঞান ফিরতে অফিসকর্মী দ্বিজেন কয়াল বলেছিল, বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, আপনি বারাসাতের হাইওয়ের যে জায়গায় পড়েছিলেন, আফতারও ঠিক ওই জায়গায় অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছে। একটা নীল অ্যামবাসাডর করে ও আসছিল। গাড়িটা পুলিশ আর খুঁজে পায়নি।

ভাদ্র ১৪০১

ডাক দিয়েছিল সুদাম

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সে অভিজ্ঞতা জীবনে ভোলার নয়। সুদাম, বাবলা, আমি—তিন মূর্তি মাঝরাত্তিরে আম চুরি করতে যাবো গলায়-দড়ির বাগানে। শ খানেক বছর আগে মজুমদার বাড়ির কোন এক বৌ নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল ওখানে, তাই ও-বাগানের নাম গলায়-দড়ির বাগান। ঐ বাগানেই মজুমদারদের বিখ্যাত গোলাপখাস আমগাছ। নাম শুনলেই জল আসে জিভে। গরমকাল। গাছটা আমে ভরভরন্ত। দিনের বেলায় পাড়ার জো নেই। কাজে কাজেই মাঝরাত্তিরে। দুপুরেই প্ল্যান পাকা আমাদের তিন মূর্তির। আজ রাতেই অপারেশন গোলাপখাস।

রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ জানলায় টোকা। চুপিচুপি বাইরে এসে দেখি সুদাম একা। ফিসফিসিয়ে শুধোই, কিরে, বাবলা কোথায়?

সুদাম জানায়, বাবলার বাবা হঠাৎ কলকাতা থেকে এসে পড়েছেন সন্ধ্যের সময়। ও আজ বেরোতে পারবে না।

একটু ছাঁৎ করে ওঠে বুকটা। আমাদের মধ্যে বাবলাই সবথেকে ডাকাবুকো। এ সঙ্গে থাকা মানেই বাড়তি একটা জোর। একে চুরির কেস, তায় আবার গলায়-দড়ির বাগান বলে কথা। এমন দিনে বাবলাটাকে সঙ্গে না পাওয়ার কোনো মানে হয়?

সুদাম বলল, দেরি করিসনি, তাড়াতাড়ি চল।

অগত্যা আমরা দুজনেই এগোই। সুদামের হাতে একটা বস্তা। বোঝাই করে আম আনা হবে।

পেরিয়ে গেলুম নন্দীদের বাঁশঝাড়। এখানটায় এলেই কেমন যেন গা-ছমছম করে। বাঁশঝাড় পেরিয়ে মুচিরডাঙার জঙ্গল। রাত নিঝুম। শুকনো পাতায় আমাদের পায়ের শব্দ। মুচিরডাঙা পেরিয়ে পায়ে পায়ে গলায়-দড়ির বাগানের সামনে আমরা। চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে পাশের খানাপুকুরের জল। খানিক দূরেই গোলাপখাস আমগাছটা।

সুদামের চোখ ওপর দিকে। গাছভর্তি আমের মেলা। আমি একবার চারপাশটা দেখে নিলুম। কেউ দেখে ফেললে পিটিয়ে তক্তা করে দেবে। আর ঠিক তখনই চোখে পড়ল ভয়ংকর দৃশ্যটা।

আমার আর সুদামের মাঝখানে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে এক হিলহিলে খরিশ গোখরো! মুখটা সুদামের দিকে। ভয়ে আতঙ্কে কাঠ আমি। একটু এদিকে-ওদিক হলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ও ছোবল বসাবে আমারই শরীরে। চেঁচিয়ে সুদামকে সাবধান করার মতো সাহসও তখন নেই আমার।

পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে ফণা নামাল গোখরোটা। 'মাগো' বলে আর্তনাদ করে উঠল সুদাম। ছিটকে কয়েক পা পিছিয়ে গেলুম আমি। সরসর করে সাপটা মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

মাটিতে পড়ে ছটফট করছে সুদাম। বাঁধার মতো দড়িদড়া নেই হাতের কাছে। ধরে ধরে সুদামকে নিয়ে চললুম ওর বাড়ির দিকে। রাস্তায় সুদাম বলল, সাপটাকে তুই আগে দেখতে পাসনি সন্তু?

লজ্জায় সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। বলেছিলুম, না রে।

চাঁদের আলোয় সুদামের চোখে মৃত্যুভয় দেখেছিলুম আমি। আকুল গলায় ও বলেছিল, আমি বাঁচবো তো সন্তু?

সুদাম বাঁচেনি। সাপে কামড়ানোর অ্যান্টি-ভেনম ইঞ্জেকশন আমাদের গাঁয়ে পাওয়া যায় না। ওর বাবা ওঝা ডেকেছিলেন। ঝাড়ফুঁক, হাতচালান করেছিল ওঝারা। মন্ত্র পড়েছিল অনেক। সুদাম বাঁচেনি। বাবলা শ্মশানে গিয়েছিল। আমার সাহস ছিল না যাওয়ার।

এই ঘটনার বছর দুয়েক পরের কথা। আমরা তখন ক্লাশ নাইনে পড়ি। গরমকাল। গোলাপখাস আমগাছে আবার আমের সমারোহ। লোভ হয়, মন টানে, কিন্তু জোর করে চোখ ফিরিয়ে রাখি। এই দু'বছরের মধ্যে ওধার আর মাড়াইনি আমরা।

সেদিন রাত্তিরে শুয়ে আছি ঘরে। গরমে ঘুম আসছে না। দেয়ালঘড়িতে ঢং করে ঘণ্টা বাজল। সাড়ে বারোটা। ঠিক তখন জানলায় টোকা। উঠে গিয়ে দেখি জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে বাবলা। হাতে একটা বস্তা। বললুম, কী ব্যাপার রে, তুই এখন?

ফিসফিস করে বাবলা বলল, গোলাপখাসের আম পাড়তে যাচ্ছি সন্তু। যাবি?

বুকটা কেঁপে উঠল। গোলাপখাস! খরিশ গোখরো, সুদাম, সেই ছটফটানি, দু'চোখ জোড়া মৃত্যুভয়....

শুকনো গলায় বললুম, ওখানে যাবি বাবলা?

বাবলা হাসল, ভয় পাচ্ছিস? আরে ভয় কি, আমি তো আছি। চলে আয়।

বাবলা ডাকছে। গোলাপখাস ডাকছে। অনেকদিন পর আবার অ্যাডভেঞ্চারের হাতছানি। থাকতে পারলুম না। চুপচাপ বেরিয়ে পড়লুম।

নিঝুম রাত। চাঁদের আলো। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। হাওয়া নেই। গুমোট। চারপাশ থমথমে। সারা গাঁ ঘুমোচ্ছে। আমরা দুজন হাঁটছি। সামনে বাবলা, পেছনে আমি। বাবলার হাতে বস্তা।

নন্দীদের বাঁশঝাড় পেরোচ্ছি আমরা। আগে অনেক রাতেই হেঁটেছি এ-পথে। কিন্তু গত দু'বছরে হাঁটিনি। কেমন অন্যরকম লাগছে চেনা রাস্তাটা। হঠাৎ একটা কটু গন্ধ ভেসে এল। চেনা গন্ধ, কিন্তু মনে করতে পারছি না কিসের।

চাপা গলায় বললুম, গন্ধটা কিসের রে বাবলা?

চলতে চলতেই বাবলা বলল, চিনতে পারছিস না?

বললুম, খুব চেনা লাগছে, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

বাবলা হাসল, একটু পরেই মনে পড়ে যাবে।

বাবলা এগোচ্ছে। পেছনে আমি। শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ। গন্ধটা পাক খাচ্ছে চারপাশে। কেমন ঝিমঝিম করছে মাথাটা। দু'বছর আগের সেই ভয়ংকর রাতটা চোখের সামনে ভাসছে।

এই গরমেও হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। বুঝতে পারছি ভয় করছে। তবে সঙ্গে আছে বাবলা। দুর্দান্ত সাহসী। পৃথিবীতে একমাত্র বাবাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। আর দূর থেকে গোলাপখাস ডাকছে।

কিন্তু গন্ধটা? কিসের গন্ধ?

মুচিরডাঙার জঙ্গলে পা রেখেই থমকে দাঁড়ালুম আমি। সামনে বাবলা নেই! নিশুতি রাতে মৃত্যুর গন্ধমাখা জঙ্গলে আমি একা! চাঁদের টুকরোটাকরা আলো আর অসংখ্য গাছপালার ছায়ায় মুচিরডাঙা রহস্যময়ী। গন্ধটা ভাসছে চারপাশে। দূরে কোথাও কোনো রাতচরা পাখির ডানা ঝটপট। কাছেই কে যেন নিশ্বাস ফেলল জোরে। নড়ার শক্তি নেই। কপালে ঘাম জমছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কোনোমতে ডাকলুম, বাবলা, তুই কোথায়?

ঠিক পেছন থেকে উত্তর এল, এই তো, তোর পেছনেই।

মুখ ফিরিয়ে দেখি পেছনে দাঁড়িয়ে বাবলা হাসছে। ধরে যেন প্রাণ এল। কপাল বেয়ে টসটস

করে ঘাম পড়ছে আমার। পা যেন চলতে চাইছে না আর। বললুম, আজ আর গিয়ে কাজ নেই বাবলা। ফিরে যাই চল।

বেপরোয়া গলায় বাবলা বলল, আরে দূর, কী যে বলিস! এত দূরে এসে ফিরে যাবো? চল, চল।

আবার পা বাড়ালুম আমরা। মুচিরডাঙার জঙ্গল পেরিয়ে গলায়-দড়ির বাগান। গন্ধটা এখনও ঘিরে রেখেছে আমাকে। একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। চোখে পড়ছে গোলাপখাসের আমগাছ। পাশে খানাপুকুরের জলে চাঁদের আলোর মায়াবী জেল্লা।

হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াল বাবলা, আর ঠিক তখনই কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, মাগো!

আর্তনাদটা যেন আছড়ে পড়ল সারা জঙ্গল জুড়ে। থরথর করে কেঁপে উঠলুম আমি। ফ্যাসফেঁসে গলায় বললুম, কে? কে চেঁচাল রে বাবলা?

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল বাবলা। বলল, আমি।

এ গলা বাবলার নয়। চমকে উঠে বললুম, কে?

উত্তর এল, আমি সুদাম।

দম বন্ধ হয়ে গেল। সামনের মূর্তির মুখে চাঁদের আলো পড়ছে। হ্যাঁ, সুদামই! সেই বড় বড় চোখ, টিকালো নাক, ঠোঁটের একটা কোণ একটু বাঁকা, কোঁকড়া-কোঁকড়া একমাথা চুল। দু'বছর পর এই গলায়-দড়ির বাগানে নিঝুম রাতে আমার সামনে সুদাম!

সুদাম বলল, কত দিন গোলাপখাসের আম খাইনি সন্তু!

আমার গলায় স্বর ফুটছে না। শুধু বললুম, সুদাম, আমি....

ঝট করে বস্তার মধ্যে হাত ঢোকাল সুদাম। পরক্ষণেই বার করে আনল হাতটা। শিউরে উঠলুম আতঙ্কে। চোখ দুটো বোধহয় বেরিয়ে আসবে ঠিকরে। সুদামের হাতের মুঠোয় একটা ভয়ংকর খরিশ গোখরো!

চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে গন্ধটা। শ্বাস নিতে পারছি না। মৃত্যুভয় গ্রাস করছে আমাকে। কাঁপা গলায় বললুম, তুই আমাকে মেরে ফেলবি, সুদাম?

ঠাণ্ডা গলায় সুদাম বলল, তুই-ও তো আমাকে মেরে ফেলেছিলি সন্তু।

সাপধরা হাতটা এগিয়ে আনছে সুদাম। কি ভয়ংকর প্রতিহিংসার আগুন ওর চোখে! আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, আমায় মেরে ফেলিসনি সুদাম!

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চাইল সুদাম। তারপর সাপের মতোই হিসহিস করে বলল, সাপ সন্তু, সাপ!

সুদামকে আর দেখতে পেলুম না। শুধু মনে হলো সাপটা আর সুদাম যেন মিশে গেল এক হয়ে। লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বিষধর খরিশ গোখরো। ফণাটা দোলাল কয়েকবার। তারপর চোখের নিমেষে ছোবল বসাল আমার শরীরে।

শেষবারের মতো আমি চিৎকার করে উঠলুম, সুদাম রে-এ-এ!

তারপর মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়লুম মাটিতে। জঙ্গল কাঁপিয়ে কে হেসে উঠল হা-হা করে। আর চারপাশে সেই কটু গন্ধটা...এতক্ষণ চিনতে পারলুম। শ্মশানে মড়াপোড়ার গন্ধ।

জ্ঞান ফিরেছিল পরের দিন দুপুরে। ভোররাত্তিরে আমাকে বাড়িতে না দেখে পাড়ার লোকেদের নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বাবা। গলায়-দড়ির বাগানে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় খুঁজে পান তাঁরা।

ভিড় ফাঁকা হতে বাবলা চুপিচুপি বলেছিল, কোন সাহসে তুই একলা যেতে গেলি ওখানে? আমাকে তো ডাকতে পারতিস একবার?

ওর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কাল রাত্তিরে তুই কোথায় ছিলিস বাবলা?

বাবলা বলল, বাড়িতেই তো ছিলুম। গরমে ঘুম আসছিল না। তুই গিয়ে জানলায় টোকা দিলেই বেরিয়ে আসতুম।

চুপ করে গেলুম।

বাবলা বলল, হ্যাঁরে, সাপটাকে মারলি কী দিয়ে?

চমকে চোখ তুললুম, সাপ?

হ্যাঁ, তোর একেবারে পাশেই তো মরে পড়েছিল খরিশ গোখরোটা।

উত্তর দিতে পারিনি আমি। সুদাম সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। সুদাম নিজে সাপ হয়ে ছোবল বসিয়েছিল। আমার শরীরের কোথাও কিন্তু সাপে কামড়ানোর কোনো চিহ্নই ছিল না। শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। তারপর কি গলায়-দড়ির বাগানের কোনো বিষধর খরিশ গোখরো সত্যিই কামড়াতে এসেছিল আমাকে? কে মেরেছিল সাপটাকে? সুদাম?

মড়াপোড়ার কটু গন্ধটা আবার ভেসে এসে ঘিরে ধরেছিল আমাকে।

শ্রাবণ ১৪০১

বুড়া পীরের দয়ায়

মুস্তাফা নাশাদ

একটু বেলা হতেই, বনের আগুনের মতো খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যে শোনে সেই অবাক হয়। বিশ্বাস করবে কি করবে না, দোটানায় পড়ে যায়। আর সন্দেহ ও ভক্তি মেশানো দৃষ্টিতে বুড়া পীরের ভাঙা সমাধির দিকে তাকিয়ে মাথা নত করে প্রণাম ও সালাম জানায়।

কিংবদন্তীর মতো এ তল্লাটে কথাটা চালু ছিল যে বুড়া পীর খুবই জাগ্রত! ভক্তিভরে তাঁকে ডাকলে, দেখা পাওয়া যায়। মুশকিল আসান হয়। বহু লোকে তাঁকে বহু ব্যাপারে ডেকেছিল। কিন্তু কেউই তাঁর দেখা পায়নি কোনো দিনও। তাই সবাই ধরে নিয়েছিল যে তাঁর সম্পর্কে এ্যাদ্দিন তারা যা শুনেছে তা কোনোটাই সত্য নয়। অন্ধবিশ্বাসের রটনাই সব। তা না হলে একটা প্রমাণও তো মিলতো? তা যখন আজ পর্যন্ত মেলেনি, তখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সবাই যখন বুড়া পীরকে ভুলতে বসেছে, ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

রোজকার মতো সেদিনও যে যার কাজে যাবার তোড়জোড় করছিল, ঠিক সেই সময় লোককে জানান দিয়ে গ্রামে ঢুকল বাঘজোলার হারাণ মণ্ডলের নাতি পরাণ মণ্ডল। কুড়ি-পঁচিশজন লোকের মাথায় ফল-মূল ও দই-মিষ্টির হাঁড়ি-চুবড়ি রয়েছে। সামনে-পিছনে নামী-বাজনদাররা বাজনা বাজাচ্ছে। মুহুর্মুহু বাজি ফাটছে আর ভক্তিতে হাত জোড় করে চোখ বুজে সবার আগে-ভাগে এগিয়ে চলেছে পরাণ।

গ্রামের মোড়ল অশীতিপর হাজি জামাল সাহেবের বৈঠকখানার কাছে এসে সবাই থামল। নানা লোকের শোরগোল ও ছেলেপিলেদের চেঁচামেচি শুনে অন্দরমহল থেকে বেরুলেন হাজি সাহেব। চুল, দাড়ি, ভুরু—সবই শন সফেদ। মাথায় ফেজ টুপি। এক হাতে তসবি দানা, অন্য হাতে লাঠি। বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন অবিশ্যি। তবে দেখলে কারো বুঝতে বাকি থাকে না যে হাজিসাহেব লম্বায় ছ-ফুটেরও বেশি এবং সুদুর আফগানিস্তান থেকেই যে একদা তাঁর পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন, সে বিষযে কোনো সন্দেহ নেই।

'কী ব্যাপার বলো তো? এত চেঁচামেচি কিসের?' হাজিসাহেব ভরাট গলায় জিগ্যেস করলেন।

'আলতাফ আফগানী নামে একজন লোকের খোঁজে এসেছেন এঁরা।' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন হাজিসাহেবের উদ্দেশে বললে, 'আমরা তো ঐ নামের কোনও লোককেই জানি না। তাই আপনার াকছে এঁদের নিয়ে এলাম।'

হাজিসাহেব তার কথা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। তারপর যে লোকটি আলতাফ আফগানীর খোঁজে এসেছিল তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি তাঁর নাম জানলে কি করে?'

'গতকাল রাত্তিরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। এবং তাঁরই দয়ায় আমি প্রাণে বেঁচে গেছি হুজুর!'

'কিভাবে?' হাজিসাহেব আরামকেদারায় বসে আলবোলায় একটা সুখটান দিয়ে ফের জিগ্যেস করলেন। উত্তরে লোকটি হাজিসাহেবের পায়ের কাছে বসে গতকাল রাত্তিরের সমস্ত ঘটনা একের পর এক সবিস্তারে বলতে শুরু করল। সবাই উৎসুক হয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

'দুপুরের পর থেকেই আকাশের হাব-ভাব খুব একটা ভাল মনে হচ্ছিল না। গোমড়া মুখ। থমথমে ভাব। মাঝেমাঝে দমকা বাতাস বইছিল। সন্ধ্যে না হতেই লোকজন যে যার বাড়ি ফিরতে

শুরু করল। দেখতে দেখতে গঞ্জের হাট ফাঁকা হয়ে গেল। আমিও মুদিখানা বন্ধ করে ঘাটের দিকে ছুটলাম। বাতাসের শোর একটু একটু করে তখন ক্রমেই বাড়তে শুরু করেছে। ঝড় ওঠার পূর্বাভাস। ঘাটে গিয়ে দেখলাম, নদী খুবই অশান্ত। ঢেউগুলো সব আছাড়ি-পাছাড়ি খাচ্ছে। আর তীরের দিকে আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে আসছে। একটাও নৌকা নেই। আকাশের অবস্থা খারাপ দেখে নৌকাগুলো বেলা থাকতে থাকতে ছেড়ে গিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ। সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে ভয়ে শিউরে উঠলাম....' বলতে বলতে লোকটা থামল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজোবার চেষ্টা করে বললে, 'একটু জল খাওয়াবেন হাজিসাহেব?'

'কেন খাওয়াব না বাবা? তুমি যে আমার মুশকিল আসান করতে এসেছ আজ!' হাজিসাহেবের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভরাট গলায় হাঁক পাড়লেন, 'ওরে কেলো, এক গ্লাস বাদামের শরবত নিয়ে আয় চটপট। আর শোন, গোলাপ জল ও জাফরান দিতে ভুলিস না যেন।'

হাজিসাহেবের কথা শেষ না হতে হতে ভিতর থেকে ভৃত্য বেলোয়ারী গ্লাসে বাদামের শরবত নিয়ে এল। লোকটা ঢকঢক করে এক নিশ্বাসে শরবতটুকু গলায় ঢেলে আবার বলতে শুরু করল—

'কি যে করি ভাবছি। বাড়ি ফেরা খুবই দরকার। বাড়িতে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছাড়া কোনও চতুর্থ ব্যক্তি নেই। এদিকে নন্দী ডাকাত সারা অঞ্চল কাঁপিয়ে ডাকাতি করতে শুরু করেছে। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি নিয়ে যে রেহাই দেবে, তা নয় কিন্তু। প্রাণে না মারলে ওর তৃপ্তি হয় না! তাই রাত্তির হলেই যে-যার বাড়িঘর ছেড়ে, বনে গিয়ে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচায়। আবার সকাল হলে যে-যার বাড়ি ফেরে। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা যায় যাক পৈতৃক প্রাণটা তো বাঁচবে!

খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি। চোখের সামনে বার-বার ভেসে উঠছে অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ। এমন সময় ঝড় উঠল। আরিব্বাস, সে কি ঝড়! যেন শিবের তাণ্ডব নৃত্য! তারপরই নামল বৃষ্টি মুষলধারে। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছুটে গেলাম পরিত্যাক্ত ইঁটভাটার শ্রমিকদের অস্থায়ী চালাঘরের দিকে। ঘরের কাছ বরাবর গিয়ে ভূত দেখার মতো অবস্থা হলো আমার। ঘরের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে ঘাপটি মেরে দলবল সমেত বসে রয়েছে নন্দী ডাকাত! প্রাণ বাঁচাতে আবার ছুটলাম খেয়াঘাটের দিকে। শিকারকে নাগালের মধ্যে এসে আবার পালাতে দেখে তারা রে-রে করে আমার পিছু নিল। ঘাটে পৌঁছে দেখি এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও ভৃত্যকে নিয়ে নৌকার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে আমি কাতরস্বরে বললাম, "দয়া করে আমাকে বাঁচান।"

"কোনও ভয় নেই! কী হয়েছে বল তো বাপু?" ভদ্রলোক আমাকে অভয় দিয়ে জিগ্যেস করলেন।

"নন্দী ডাকাত আমার পিছু নিয়েছে! এক্ষুণি এসে পড়ল বলে।" আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, "আপনারা জানেন না, ও বড় নিষ্ঠুর! রক্তপিপাসু!"

"তাই নাকি!" ভদ্রলোক নির্লিপ্ত ভাবে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন।

একটু পরেই নন্দী ডাকাত তার দলবল নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। তার দু-চোখে আগুন ঝরছে। হাঁপাচ্ছে, আর ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলছে। ক্রোধে ফেটে পড়ে সে বললে, "ওরে নচ্ছার! আমার হাত থেকে পালিয়ে যাবি কোথায়?" বলেই খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরল। আমি তখন প্রাণ-ভয়ে বলির পাঁঠার মতো ঠক-ঠক করে কাঁপছি। মুখে কোনও কথা সরছে না। ভদ্রলোকটির দিকে সাহায্যের জন্য করুণভাবে তাকিয়ে রইলাম।

"ওকে ছেড়ে দাও। নইলে ভাল হবে না।" ভদ্রলোক শান্ত ভাবে বললেন। নন্দী ডাকাতকে তিনি কোনও আমলই দিলেন না।

"বটে! ছেড়ে দাও বললেই ছেড়ে দিতে হবে?" নন্দী ডাকাত মুখ ভেঙচে বললে, "তোর কথায়! কে রে তুই?"

"তোর যম!" ভদ্রলোক দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘৃণাভরে বললেন, "যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, তাহলে ওকে ছেড়ে দিয়ে এই বেলা মানে-মানে কেটে পড়।"

"তবে রে ব্যাটা," বলেই নন্দী ডাকাত ভদ্রলোকের ঘাড়ে রামদা দিয়ে মারল এক কোপ। সঙ্গে সঙ্গে দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ফিনকি দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটল আকাশের দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! দেহ থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ল না! শূন্যে কয়েক মিনিট ভেসে রইল। তারপর বনবন করে চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে একসময় ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে এসে পড়ল। আপনা থেকে খট্ করে জোড়া লেগে গেল মাথাটা! আর....আর সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে ডাকাত নন্দীর চ্যালাচামুণ্ডেরা প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে যেদিকে পারল মারল দৌড়।

"চাঁদুরে, কেমন দেখলে খেল?" ভদ্রলোক নন্দী ডাকাতের ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিগ্যেস করলেন।

"ঘাট মানছি ওস্তাদ। ক্ষ্যামা দাও।" নন্দী ডাকাত ভিজে বেড়ালের মতো মিউ-মিউ করে বললে, "তোমার তুলনা তুমিই গুরু!"

"সেটি হবে না বাছাধন!" ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন।

"কেন গুরু?" নন্দী ডাকাত তাঁর মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে জিগ্যেস করল।

"ভূতকুলেও যে আজ পাত্রের বড়ই অভাব!" ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মনের মতো তো দূরের কথা, চলন-সইও একটাও মেলে না!" বলেই নন্দী ডাকাতের ঘাড়টা মটকে দিলেন। তারপর সঙ্গের ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, "একেই বড়জামাই করগে গিন্নি। খাঁদির সঙ্গে বেশ মানাবে! যা দশাসই তাগড়াই চেহারা ব্যাটার! আমি মেজজামাই যোগাড় করে একটু পরেই ফিরছি।" ভদ্রলোক তাঁর কথা শেষ করে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি ভয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লাম।'

বলতে বলতে থামল পরাণ মণ্ডল। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছল। উৎসুক গ্রামবাসীরা তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। সবাই চুপ। কেউ কোনো কথা বলছে না। সূচ পড়লেও শব্দ হয় অবস্থা। পরাণ মণ্ডল আবার বলতে শুরু করল—

'যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি যে কারা আমাকে খাসপুরের বাজ-পড়া ন্যাড়া নারকেল গাছটার মাথায় তুলে দিয়েছে। প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে। আর গাছটা ঝড়ের দাপটে মাতালের মতো একবার ডান দিকে হেলে পড়ছে তো পরমুহূর্তেই আবার বাঁ দিকে। প্রাণ হারাবার ভয়ে ছিনে জোঁকের মতো গাছটাকে আমি আঁকড়ে ধরে রয়েছি। কারণ, পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। চোখ বুজে গাছটাকে জাপটে ধরে রইলাম। এমন সময় অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম, কারা যেন গাছের তলায় চাপা স্বরে ফিসফাস করে কথা বলছে।

"খাঁদির তো না হয় একটা হিল্লে হলো। বুঁচির কি হবে এখন?"

"ছাড়া যখন পেয়েছি একবার, তখন বুঁচিরও একটা ব্যবস্থা করব গিন্নি! একটু সবুর কর। গাছে ব্যাটাকে হাওয়া খেতে তুলিনি। গাছ থেকে পড়লেই নির্ঘাৎ মারা যাবে। আর এভাবে মারা যাওয়া মানেই অপঘাতে মৃত্যু হওয়া। তখন ওকে মেজজামাই করায় কোনো বাধাই আর থাকবে না। কী বুঝলে?"

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। কেন আমাকে নন্দী ডাকাতের হাত থেকে বাঁচানো হলো। আর কেনই বা আমাকে গাছে তোলা হলো। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি খেয়াঘাটের সেই ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দু'জনেই করুণভাবে তাকিয়ে রয়েছেন ন্যাড়া নারকেল গাছটার দিকে। যেন এটা নারকেল গাছ নয়, জামাই গাছ! আর গাছটা থেকে নারকেলের পরিবর্তে আস্ত একটা করে জামাই পড়বে ধুপ-ধাপ করে। আর তাই কুড়িয়ে তারা ধন্য হবে। কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবে। এমন যখন অবস্থা ঠিক সেই সময় ধোঁয়াটে

আলোয় আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মসজিদের ভিতর থেকে আলখাল্লা পরা এক বুঢ়া পীরবাবা বেরিয়ে আসছেন। তাঁর একমুখ সাদা শনের মতো দাড়ি। মাথায় কাশফুলের মতো একরাশ সাদা চুল। ললাটের মাঝখানে আধুলির মতো কালো উজ্জ্বল দাগ। পাঁচ ওয়ক্ত নামাজ পড়ার নুরাণী চিহ্ন! তাঁর এক হাতে তসবি দানা, অন্য হাতে লাঠি। পায়ে খড়ম।

পীরবাবা খড়মে খট-খট শব্দ তুলে ক্রমে গাছটির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁকে গাছের দিকে এগোতে দেখে ভয়ে তেনাদের মুখ শুকিয়ে চুন। ভদ্রলোক গিন্নির উদ্দেশে বললেন, "বাঁচতে যদি চাও তো এই বেলা পালাও গিন্নি। ধরা পড়লে পীরবাবা আবার বোতল বন্দী করবেন।" কথা শেষ, দু'জনেই কর্পূরের মতো কোথায় যে উবে গেল তা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না।

এদিকে পীরবাবা হাঁটতে হাঁটতে একেবারে গাছের কাছে এসে আমার দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে জিগ্যেস করেলন, "কে রে তুই? রাত দুপুরে গাছের মাথায় কেন?"

উত্তরে আমি কেঁদেকেটে তাঁকে সব বললাম। তিনি আমার কথা শুনে স্মিত হেসে বললেন, "খরবিশের (ভূতের) পাল্লায় পড়েছিলে। অল্পের জন্য খুব বাঁচান বেঁচে গেছ। নিচে নেমে এসো।"

"কিন্তু...." আমি ইতস্তত করে বললাম।

"ঐ খরবিশের কথা ভাবছ?" তিনি আমায় অভয় দিয়ে বললেন, "ওরা পালিয়ে বেঁচেছে। আলতাফ আফগানীকে ডরায় না, এমন জিন, ভূত এ তল্লাটে নেই!"

"ন্ না, মানে..." আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "এই তিনতলা সমান নারকেল গাছ থেকে নামি কি করে বলুন তো? এ গাছে ওঠা-নামার নিয়ম তো আমি কিছুই জানিনে হুজুর। ঝাঁপ দিলে যে বেঘোরে মারা পড়ব!"

আমার কথা শুনে দরাজ গলায় তিনি হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, "বোকা ছেলের কথা শোনো। তিনতলা সমান উঁচু গাছ! আরে, ওটা তো একটা চারা নারকেল গাছ! চোখ খুলে একবার ভালভাবে তাকিয়েই দেখ না।"

তাঁর কথা শুনে তাকিয়ে দেখি, সত্যি তো! তিন-চার ফুটের একটা চারা নারকেল গাছ আর তারই মাথায় আমি বসে রয়েছি।

গাছ থেকে নেমে আমি পীরবাবার পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। তিনি আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে লাগলেন। কলমা পড়ে সারা গায়ে ফুঁ দিতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে আমার মনের আকাশে জমা দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল। দেহ মন ভরে গেল এক আশ্চর্য প্রশান্তিতে। আর.....আর আমার দুই চোখে নামল ঘুমের ঢল। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।'

'তার পর?' সমস্বরে উৎসুক গ্রামবাসী জিগ্যেস করল।

'তারপর যখন আমার ঘুম ভাঙল, ঘোর কাটল, তখন চোখ মেলে দেখি, কোথায় পীরবাবা! কোথায় কে? বাড়ির উঠোনে আমি শুয়ে রয়েছি। ঘামে সারা শরীর সপসপ করছে। আর উৎকণ্ঠায় আমার দিকে সজল চোখে চেয়ে রয়েছে আমার বউ, ছেলে-মেয়ে আর পাড়াপড়শিরা।'

চুপ করল পরাণ মণ্ডল। ভক্তি-শ্রদ্ধায় মাথা নত করে চোখ বুজে বসে রইল। হাজিসাহেবের বৈঠকখানায় তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। সবাই নির্বাক, অনড়। হাজিসাহেহের দু'গাল বেয়ে গড়াচ্ছে আনন্দাশ্রু। সমস্ত সন্দেহ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ—সব আজ ধুয়ে মুছে গেল। হাজিসাহেব অস্ফুটে বললেন, 'উনি ছিলেন আমার প্রপিতামহ। মসজিদের ডান পাশে যে ভাঙা সমাধিটা দেখছ, ওটাই ওঁর। আজ ওঁর একশো তেত্রিশতম জন্মবার্ষিকী!'

আষাঢ় ১৪০১

অতৃপ্ত আত্মা

চকিতা চট্টোপাধ্যায়

নতুন ইস্কুলে আজ দিন কুড়ি হলো ভর্তি হয়েছে টুয়া। বন্ধু খুব বেশি কেউ হয়নি। একমাত্র পিঙ্কি বলে একটি মেয়ে ছাড়া।

এমনিতে টুয়া একটু চুপচাপ প্রকৃতির। বেশি হইচই করা তার ধাতে নেই। সে একটু নিজের মনে থাকতে ভালবাসে। তার শখ হলো বই পড়া। তার বাবা হঠাৎই বদলি হয়ে এসেছেন এই শহরে। ফলে টুয়াকে ভর্তি হতে হয়েছে স্কুলের সেশনের ঠিক মাঝামাঝি, ক্লাস সিক্সে।

বাড়িতে বাবা, মা আর টুয়া। বই পড়তে ভালবাসে বলে পিসিরা, মামারা, মাসিরা সবাই তাকে প্রচুর সায়েন্স ফিকশান কিনে দিয়েছেন। তাদের বাড়ির সবাই চিরকাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তাই সবাইয়ের ইচ্ছে বড় হয়ে টুয়াও সায়েন্স নিয়ে পড়বে। একমাত্র ব্যতিক্রম টুয়ার মা। উনি কিন্তু টুয়াকে নানা ধরনের রূপকথা, ভূতের আর অলৌকিক বই কিনে দেন। একদিন বড়মাসিকে এই নিয়ে মাকে বকতেও শুনেছিল টুয়া।

'কেন গুচ্ছের আজগুবি বই মেয়েটাকে কিনে দিচ্ছিস? যা নেই তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে শুরু করবে আর মাথার মধ্যে যত রাজ্যের গাঁজাখুরি ভূতের গপ্পের চাষ হবে।' মা কিন্তু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'সব রকমই পড়া ভাল বড়দি। এতে মনটা অনেক সতেজ থাকে।'

টুয়ার কিন্তু সায়েন্সের বইয়ের চেয়ে এই সব বই পড়তে অনেক বেশি ভাল লাগে। তার মনটা কেমন যেন বিশ্বাস করতে চায় বইয়ের প্রত্যেকটি ঘটনাকে। কখনো মনে হয় না এটা আজগুবি—মিথ্যে। ছুটির দিনে তার একপাশে পড়ে থাকে দামী দামী সায়েন্টিফিক খেলনা, যা তার বড়মামা, বড়মাসি, ছোটপিসিরা এনে দিয়েছেন। বদলে তার দৃষ্টি চলে যায় জানলার বাইরে, যেখানে সার দেওয়া দেবদারু গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। টুয়ার কেমন যেন মনে হয় হঠাৎ কোনোদিন হয়তো তার জীবনেই ঘটবে কোনো অলৌকিক ঘটনা!

'কিরে টুয়া? তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস?'

টুয়া চমকে তাকাল, দেখল পিঙ্কি। টুয়ার ভাল নাম যদিও রচিতা আর পিঙ্কির ভাল নাম শ্রীমতী, তবু ওরা প্রথম দিনই ঠিক করেছিল যে দুজনে দুজনকে ডাকনামেই ডাকবে। স্কুলে ভর্তি হওয়া অবধি পিঙ্কি টুয়াকে ঘুরে ঘুরে স্কুলের সমস্ত কিছু চিনিয়েছে। স্কুল হল, ক্যান্টিন, লাইব্রেরি, সিকরুম, জিমন্যাসিয়াম, সাইকেল রাখবার গ্যারেজ, প্রিন্সিপাল মিঃ ফ্লিনের কোয়ার্টার, অন্যান্য টিচারদের কোয়ার্টার সব।

টুয়া হেসে বলল, 'কিরে পিঙ্কি? আজ আর নতুন কিছু দেখাবি না? সব দেখানো হয়ে গেছে?' পিঙ্কি একুট ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, সবই তো দেখিয়েছি।' টুয়া বলল, 'না, একটা জিনিস তুই ভুলে গেছিস দেখাতে।' পিঙ্কি ভ্রূ কোঁচকালো। বলল, 'কি বল তো?' টুয়া হাত তুলে দূরে টিচার্স কোয়ার্টারের পেছন দিকে যে তিনটে নারকেল গাছ পরপর দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে দেখাল। বলল, 'ওই দূরে নারকেল গাছগুলোর পেছনে যে একটা ভাঙা বিল্ডিং আছে, ওদিকটায় তো কখনো নিয়ে যাসনি?'

কথাটা শেষ করে টুয়া তাকাল পিঙ্কির মুখের দিকে। কিন্তু পিঙ্কির মুখটা হঠাৎ কেমন যেন শুকিয়ে গেল। টুয়া অবাক হলো। বলল, 'কি হলো পিঙ্কি?' পিঙ্কি কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তক্ষুণি লাঞ্চব্রেক শেষ হওয়ার বেল পড়ে গেল। পিঙ্কি তাড়াতাড়ি টুয়ার হাত টেনে ধরে বলল, 'চল, ক্লাসে চল।'

পিঙ্কির এই অদ্ভুত ব্যবহারে টুয়ার মনের মধ্যে কিন্তু খচখচ করতে লাগল। সে ক্লাসের ফাঁকে পিঙ্কিকে ফিসফিস করে একবার জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার পিঙ্কি?' পিঙ্কি চাপা গলায় বলল, 'কিছু না, পরে বলব।'

ছুটির পর টুয়া চেপে ধরল পিঙ্কিকে। কেন যেন টুয়ার মনে হচ্ছিল পিঙ্কি তার কাছে কিছু চেপে যাচ্ছে। অনেক জোরাজুরির পর পিঙ্কি বলল, 'টুয়া, ওইদিকটা আমি কোনোদিন তোকে দেখাতে পারব না।' টুয়া অবাক হয়ে বলল, 'কেন? কি আছে ওখানে?' পিঙ্কির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দু'বার ঢোঁক গিলল ও। সতর্কভাবে একবার দূরে নারকেল গাছগুলোর দিকে চোখ ফেরাল। বেলা সাড়ে চারটে বেজে গেছে। দলে দলে ছেলে-মেয়ে বাড়ি যাচ্ছে। পিঙ্কি টুায়র কনুইয়ের কাছটা খামচে ধরল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'টুয়া, আমাদের ওদিকটা যাওয়া মানা। গেলে স্যারেরা, মিসেরা খুব রাগ করেন। ওটা একটা ভাঙা বিল্ডিং। কেউ থাকে না ওখানে। তুই কিন্তু ওদিকে খবরদার কোনোদিনও যাস না।' টুয়া অবাক হয়ে বলল, 'ভাঙা বিল্ডিং যে, সে তো আমিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আগে ওটা কি ছিল, কেনই বা আর ব্যবহার হয় না সেটা বলবি তো?' পিঙ্কি বলল, 'আমি তো এই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ছি। তখন থেকেই দেখছি ওটা ওইরকম। ওদিকটা কেউ যায় না।' টুায় আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল মা আসছেন তাকে নিতে। পিঙ্কি তাড়াতাড়ি বলল, 'আন্টিকে যেন এসব বলিস না।'

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না টুয়ার অনেক রাত পর্যন্ত। তার কেবলি মনে হচ্ছিল পিঙ্কি যেন কি একটা বলতে গিয়েও বলল না। কিন্তু কি সেটা?

সেদিনটা ছিল শুক্রবার। পরদিন শনিবার তাদের ছুটি থাকে। সারাটা দিন টুয়ার একলা-একলা কাটল। পিঙ্কি আজ আসেনি। আগের দিনই স্কুল ছুটি হওয়ার সময় তার জ্বর এসেছিল। নির্ঘাৎ জ্বরটা বেড়েছে।

ছুটির বেল পড়ল। টুায় একা-একাই ক্লাস থেকে বেরোল। কিন্তু বাইরে এসে দেখল মা তখনো আসেননি।

ছেলে-মেয়ের দল একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। টুয়া অন্যমনস্কের মতো চেয়ে রইল। দু'একজন ক্লাসমেট জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি যাবে না?' টুয়া মৃদু হেসে জানাল যে, তার মা আসবেন নিতে।

জন্মদিনে মামার দেওয়া ঘড়িটার দিকে চোখ দিল টুায়। এই বছরেই সে প্রথম ঘড়ি পরছে। তাই একটু বেশিই ঘড়ি দেখার অভ্যাস হয়ে গেছে। পৌনে পাঁচটা বাজে। মা আজ যেন একটু দেরি করছেন। স্কুল প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। টুয়ার নিজের অজান্তেই চোখ চলে যায় দূরে নারকেল গাছগুলোর দিকে। ভগ্নপ্রায় বিল্ডিংটা দেখতে পায়। পিঙ্কির কথাগুলো কানে বেজে ওঠে—'তুই কিন্তু ওদিকে খবরদার কোনোদিনও যাস না!' কথাগুলো বলবার সময় পিঙ্কির মুখে-চোখে একটা চাপা ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছিল। কেন সেদিন অত ভয় পেয়েছিল পিঙ্কি? কেমন যেন একাট অদম্য টান অনুভব করে টুয়া। বিল্ডিংটা যেন তাকে টানছে। টুয়া গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যায় সেদিকে। বেলা পড়ে আসছে।

দারোয়ানের লাল নেড়ী কুকুরটাকে দেখতে পায় টুয়া কান খাড়া করে সেই দিকেই চেয়ে আছে। টুয়ার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। পায়ে পায়ে টুয়া এগিয়ে যায়।

টিচার্স কোয়ার্টারের ঠিক পেছন কি এটা? নারকেল গাছগুলোর কাছ বরাবর এসে থমকে দাঁড়াল টুয়া। চেয়ে দেখল একাট ছোট দোতলা কাঠের বাড়ি। বাড়িটার দরজা-জানলা বলে কিছু নেই। সেই জায়গায় কয়েকটা গহ্বর হাঁ হাঁ করছে। কাঠের ঝুল বারান্দাটা একদিকে ঝুলে পড়েছে। টুয়া কি করবে ভেবে উঠতে পারল না। হঠাৎ দেখতে পেল জানলার একটা ফাঁদলে একটা মুখ! ধক করে উঠল টুয়ার বুকটা! এবার দেখল মুখটা একটা বছর দশেকের ছেলের। সে দোতলার জানলার ফাঁদল দিয়ে টুয়ার দিকেই চেয়ে আছে। টুয়া অবাক হয়ে গেল। তবে যে পিঙ্কি বলেছিল ওই বাড়িটায় কেউ থাকে না? টুয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ছেলেটার। ছেলেটা টুয়াকে ইশারায় কি যেন বলে, টুয়া বুঝতে পারে না। এবার জানলা থেকে সরে যায় ছেলেটার মুখ। পরক্ষণেই টুয়া দেখে হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে টুয়ার দিকেই চেয়ে আছে ছেলেটা।

এবার একটু-একটু সাহস ফিরে আসে টুয়ার। সে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' রিনরিনে গলায় ছেলেটি বলে, 'আমি মাইকেল।' টুয় বলে, 'তুমি ওপরে কি করছিলে?' ছেলেটি টুয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, 'আমি ওখানেই থাকি।' টুয়া এবার ভীষণ অবাক হয়ে যায়। বলে, 'সেকি! ওখানে তো কেউ থাকে না!' মাইকেল একই সুরে বলে, 'আমি থাকি।' টুয়া জিজ্ঞেস করে, 'তুমি ইশারায় আমাকে কি বলছিলে?' মাইকেল বলে, 'আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে—তোমার কাছে খাবার আছে?'

টুয়া ব্যাগ থেকে টিফিনবক্সটা বার করে। আজ পিঙ্কি আসেনি বলে একা-একা সবটা টিফিন খায়নি সে। মাইকেল এগিয়ে এসে টিফিনবক্স থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলল। টুয়ার মনে হলো মাইকেল যেন কতদিন কিছু খায়নি। খাওয়া শেষ করে মাইকেল একই সুরে শুধু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ!' টুয়ার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভয় করে না ওখানে থাকতে?' মাইকেল অদ্ভুত চোখে তাকাল কথাটা শুনে। যেন কি ভীষণ অবাস্তব কথা বলে ফেলেছে টুয়া। হঠাৎ মাইকেল বলল, 'তুমি যাবে?' টুয়া অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?' মাইকেল বলল, 'বাড়ির ভেতর।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না মাইকেল। চলতে শুরু করল। টুয়াও কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলতে শুরু করল তার পেছন-পেছন।

কাঠের বাড়িটার ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মাইকেল। দিনের আলো কমে এসেছে। সিঁড়ির ভেতরটা জমাট অন্ধকার। টুয়া দু'বার হোঁচট খেতে খেতে সামলে নিল। দেখল মাইকেল কিন্তু স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে টুয়া শুনল কাঠের সিঁড়িতে শুধু তার নিজের পায়ের শব্দই শোনা যাচ্ছে!

টুয়া দোতলায় উঠে আসবার আগেই মাইকেল পৌঁছে গেছে দোতলায়। টুয়া দোতলায় পৌঁছে কিন্তু মাইকেলকে দেখতে পেল না। কোথায় গেল মাইকেল?

ফোঁকর দিয়ে আসা আবছা আলোয় টুয়া দেখল কাঠের কয়েকটা ঘর, কিন্তু চারিদিকে ধুলোর আস্তরণ আর মাকড়সার জাল। এখানে মাইকেল থাকে কি করে? টুয়া চেঁচিয়ে ডাকল, 'মাইকেল! মাইকেল!'

হঠাৎ জোরে জল পড়ার শব্দে চমকে উঠল টুয়া। টুয়ার ঠিক পেছন দিক থেকে আসছিল শব্দটা। খুব জোরে কল খুললে যেমন শব্দ হয় তেমন। টুয় ভাবল মাইকেল বোধহয় বাথরুমে গেছে। একটু পরেই হঠাৎ আবার শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। টুয়া এদিক-ওদিক তাকাল। এবার তার চোখে পড়ল তার ঠিক পেছন দিকেই একটা বাথরুম। কিন্তু একফোঁটা জলের চিহ্নমাত্র নেই! আর ঠিক তখুনি টুয়ার মাথার ওপর দিয়ে একটা বাদুড় ঝপটা মেরে উড়ে গেল। এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে এল টুয়ার। সে যে পরিত্যক্ত বাড়িটার ভেতর একলা দাঁড়িয়ে আছে, এটা এতক্ষণে যেন তার মাথায় ঢুকল। আতঙ্কে টুয়া নিচে নামার সিঁড়িটা খুঁজতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে

গেছে। টুায় কিছুতেই খুঁজে পেল না সিঁড়িটা, যেটা দিয়ে একটু আগে সে আর মাইকেল উঠে এসেছে।

প্রচণ্ড আতঙ্কে টুয়া চিৎকার করে উঠল মাইকেলের নাম ধরে। প্রত্যুত্তরে শুনতে পেল একটা রিনরিনে গলার হাসি। টুয়া বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল অন্ধকার ঘরের একটা কোণে মাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। টুয়া 'মাইকেল!' বলে তার দিকে এগোতে যেতেই দেখল আস্তে আস্তে মাইকেলের হাতদুটো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সেই জায়গায় ঝুলতে লাগল দুটো হাড়! টুয়া ভয়ে পাথর হয়ে গেল। মাইকেল টুয়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ক্রমাগত হেসে চলল আর হতবাক টুয়ার চোখের সামনে আস্তে আস্তে মাইকেলের পুরো শরীরটাই পরিণত হলো একটা নরকঙ্কালে! শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে টুয়া শুধু একটা আর্ত-চিৎকার করে উঠল।

তিনদিন পর টুয়ার জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল সবাই তাকে ঘিরে বসে আছেন। মা, বাবা, মাসি, পিসি, মামারা, মিঃ ফ্লিন, ডাক্তার আঙ্কল আর পিঙ্কি। সে চোখ মেলে তাকাতেই সবার মুখে হাসি ফুটল। টুয়া উঠে বসার চেষ্টা করতেই সবাই বাধা দিয়ে উঠলেন। ডাক্তার আঙ্কলের দেওয়ায় ওষুধ আর গরম দুধ খেয়ে টুয়া এবার কিছুটা ধাতস্থ হবার পর আস্তে আস্তে উদঘাটিত হলো আসল রহস্য।

টুায়র মা ঝর্ণাদেবী সেদিন একটু দেরিতেই এসে পৌঁছেছিলেন টুয়াকে নিতে। কিন্তু এসে দেখেন স্কুল ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান মেইন গেটের কাছে ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল যে টুয়াকে তো সে বেরোতে দেখেনি। ঝর্ণাদেবী কি করবেন বুঝতে পারেননি। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর হঠাৎ মনে হয় নিশ্চয়ই টুয়া পিঙ্কির সঙ্গে পিঙ্কিদের বাড়ি চলে গেছে।

ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল মিঃ ফ্লিন বেরিয়ে আসেন তাঁর কোয়ার্টার থেকে। ঝর্ণাদেবী মিঃ ফ্লিনের কোয়ার্টার থেকেই ফোন করেন পিঙ্কিদের বাড়ি। লাকিলি ফোনটা ধরে পিঙ্কিই। সে জানায় যে তার জ্বর হয়েছে বলে সে আজ স্কুলেই যায়নি। ঝর্ণাদেবী পিঙ্কিকে জানান টুয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। কথাটা শুনেই হঠাৎ পিঙ্কি ফোনের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে। বলে, 'আন্টি! শীগ্‌গির একবার তোমরা টিচার্স কোয়ার্টারের পেছন দিকে যে ভাঙা বিল্ডিংটা আছে, ওখানে খুঁজে দেখো। আমার মনে হয় টুয়া ওদিকেই কোথাও আছে।'

ফোন রেখেই সবাই ছুটে যান বিল্ডিংটার কাছে। দেখেন দারোয়ানের কুকুরটা বিল্ডিংটার দিকে চেয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

আর সময় নষ্ট না করে মিঃ ফ্লিন একটা বড় টর্চ নিয়ে ঢুকে পড়েন বিল্ডিংটার মধ্যে। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন টিচার মিঃ গোম্‌স্ আর মিঃ ক্ল্যারেন্সও যান। ঝর্ণাদেবী নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন নিচে। কিছুক্ষণ পরে ওঁরা বেরিয়ে আসেন টুয়ার অচৈতন্য দেহটা নিয়ে।

'তাহলে মাইকেল কে?' বিস্মিত টুয়া বলে উঠল। মিঃ ফ্লিন তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'সে অনেক কথা। মাইকেল আমাদেরই স্কুলের স্টুডেন্ট ছিল। ওই পরিত্যক্ত বিল্ডিংটা আসলে ছিল স্টুডেন্টস হোস্টেল। কিন্তু বারো বছর আগে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল এখানে। বিল্ডিংটার একাংশ ভেঙে পড়ে। যারা যারা ভেতরে ছিল তারা সবাই ছুটে বেরিয়ে আসে। বেরোতে পারেনি শুধু একজন। সে হলো মাইকেল। সে ছিল বাথরুমে। দুর্যোগের মধ্যে সবাই যখন ছুটোছুটি করছে প্রাণভয়ে, সে যে আটকা পড়েছে এটা কারো খেয়াল হয়নি তখন। পরে তার গলিত মৃতদেহ পাওয়া যায়।

'তারপর থেকে এই বিল্ডিং ছেড়ে তার আত্মা যায়নি। সুযোগ পেলেই সে কোনো না কোনো

বাচ্চাকে নিয়ে যায় আর আটকা পড়ে তার যে রকম অবস্থা হয়েছিল, ভয় দেখিয়ে সেই বাচ্চাটির ওপর সেই প্রতিশোধ তোলে। তাই আমরা ওদিকে কোনো বাচ্চাকে যেতে দিই না। আমরা স্টুডেন্টস হোস্টেল তুলে দিয়েছি। কিন্তু যতবারই ওই বিল্ডিংটা রিপেয়ার করে অন্য কিছু ভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছি, ততবারই একটা না একটা বিপত্তি ঘটেছে। কখনো হঠাৎই সিলিং ভেঙে পড়েছে মিস্ত্রির ওপর, নয়তো কারো হাত-পা ভেঙেছে। এই রকম কয়েকবার ঘটবার পর আর কোনো মিস্ত্রি ওখানে কাজ করতে চায়নি। আমরাও কি করব ভেবে উঠতে পারিনি। ওটা ওইরকমই পড়ে আছে।'

টুয়ার মামা-মাসিরা বিস্মিত হয়ে শুধু অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! এমন ঘটনা এই বিজ্ঞানের যুগেও ঘটে!'

ঝর্ণাদেবী বললেন, 'কিন্তু আপনারা যদি একাট কিছু ব্যবস্থা না করেন তাহলে তো বিপদ! আমার মেয়ে বেঁচে গেছে বলে যে সবাই বাঁচবে তার কি মানে আছে?'

টুয়া হঠাৎ বলে ওঠে, 'তাহলে স্যার বিল্ডিংটা পুড়িয়ে দিন না। যতদিন ওই বিল্ডিংটা থাকবে, ততদিন মাইকেলও যে মুক্তি পাবে না!'

মিঃ ফ্লিন টুয়ার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড! হয়তো ঈশ্বরই তোমার মুখ দিয়ে আমাদের পথ বলে দিচ্ছেন।'

পরদিন দমকলের লোকজনের উপস্থিতিতে গ্যালন গ্যালন পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হলো বিল্ডিংটা। সবাই কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখল দাউ দাউ অগ্নিশিখা আস্তে আস্তে গ্রাস করে ফেলল বিল্ডিংটা।

কিছুটা দূরে পিঙ্কি আর টুয়াও দাঁড়িয়েছিল। পিঙ্কি টুয়ার হাতটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'এতদিনে মাইকেল নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে, কি বল?' পিঙ্কির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে টুয়া বলল, 'নিশ্চয়ই। দেখিস ও আর কোনোদিনও দেখা দিতে আসবে না।'

মাঘ ১৪০৪

কাঠবাবুর খাট

লোকেন রায়

আপনার কোনো চিন্তা নেই রায়বাবু। আমি থাকি বা না থাকি আপনার অসুবিধা হলেই সুবোধকে বলবেন। একমাত্র বাঘের দুধ ছাড়া সব কিছুই ও যোগান দিয়ে দেবে। বলে অমায়িক হাসি হাসলেন কাঠবাবু।

না-না, আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। প্রথম প্রথম দুই-একদিন হয়তো অসুবিধা হবে তারপর চেনাজানা হয়ে গেলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

বুইঝলেন মশায়, এ ব্যবসা আমার আর ভাল্লাগে না। তবে ছাড়তেও ইচ্ছা করে না। খুব কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছি। কাঠের এই ব্যবসা বজ্জ খারাপ। গাছ কাটা। অনর্থক প্রাণ নেওয়া। বুঝি সব কিন্তু সে রকম সুযোগও পাচ্ছি না যে ব্যবসাটা তুলে দেব। বাজারে বহু টাকা পড়ে রয়েছে।

দোহারা চেহারা, মাথায় অল্প টাক, চোখে পাওয়ারফুল চশমা। একসময় রঙ ভালো ফর্সা ছিল—রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। পুরো নাম রসময় দাম। আদি বাড়ি খুলনা। কাঠের ব্যবসা করতে করতে লোকজনের কাছে রসময় দাম এখন পরিচিত কাঠবাবু হিসাবে। কাঁটাবাগানে তিন-তিনটে কাঠ চেরাই কল—বিশাল কাঠের ব্যবসা। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জন্যে ঘুরছি সে সময়ই চোখে পড়ে বিজ্ঞাপনটা। কাঠবাবু তাঁর স মিলের জন্য অল্পবয়স্ক ম্যানেজার চাইছেন। হঠাৎ কী মনে হলো সরাসরি একদিন গিয়ে হাজির কাঁটাবাগানে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর কাঠবাবু আমাকে মনোনীত করলেন ম্যানেজার হিসাবে।

কাঠবাবুর শুধু একটাই কথা—মাইনের ব্যাপারে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আপনি ভাই ব্যবসাটা একটু দেখবেন। সব চোর। চুরি করে কাঠ বিক্রি করে দেয়। আর সব সময় খদ্দের ঠকানোর চেষ্টা। এ জিনিসটা আমি বড্ড অপছন্দ করি। পয়সা নেব সঠিক জিনিস দেব। তঞ্চকতা করা আমার ধাতে সয় না।

প্রায় পাঁ বিঘে জমির ওপর তিনটে স'মিল, বিশাল বাগান আর কাঠবাবুর দোতলা বাড়ি। বিশাল বাড়িতে অগুনতি ঘর। বেশিরভাগ ঘর তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। বাকি ঘরগুলিতে লেবাররা এবং কর্মচারীরা থাকে।

দোতলায় দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে সুবোধ আমার থাকার জায়গা করে দিল। বেশ প্রশস্ত ঘর। ঘরে আসবাব বলতে একটা খাট, দুটো চেয়ার আর একটি টেবিল। এরকম খাট আজকাল আর দেখা যায় না। বাঘনখওয়ালা পা, দু'দিকে কারুকার্য করা আর তেলাপোকা রংয়ের পালিশ। বড় বড় জমিদার বাড়িতে এবং সিনেমায় এই খাট দেখা যায়। ঘরটায় আলো-হাওয়ায় বেশ। এ ধরনের ঘর আমার পছন্দ।

জামা-কাপড় ছাড়ছি এমন সময় কাঠবাবু ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে এক মহিলা।

কাঠবাবু বললেন, রায়বাবু, এ হলো হারুর মা। আপনার রান্নাবান্না কাচাকুচি ওই করে দেবে। খুব ভালো মেয়ে। বলে হারুর মার দিকে ফিরলেন।—শোনো হারুর মা, বাবুর দিকে খেয়াল রেখো, যা বলবে তাই শুনো। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে শেষে আমাকে বললেন, তাহলে আমি আসি রায়বাবু। ওদিকে গাঙ্গুলীদের বাগানে কিছু গাছ দেখতে যাওয়ার কথা আছে। দেরি হয়ে যাবে।

কাঠবাবু নিচে নেমে গেলেন। ওপরে দাঁড়িয়ে দেখলাম ল্যাজঝেড়ে সাইকেল নিয়ে কাঠবাবু

চোখের আড়ালে চলে গেলেন। হারুর মা ঘরের জিনিসপত্র গুছিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল।

কয়েকজন কর্মচারী বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই খুব ভালো। যা বলি তাই শোনে। কাঠের ব্যাপারটা ভালো বুঝি নে। কার্তিক বলে একজন কর্মচারী আছে, অল্পবয়সী ছেলে, প্রত্যেকটা ব্যাপারে সাহায্য করে। ফাঁকি দেওয়র জো নেই। আর কোনো অসুবিধা হলেই সুবোধকে ডাকলেই ভূতের মতো এসে হাজির হয়। কাঠবাবুকে সারাদিন খুঁজে পাওয়ায় যায় না। হয়তো বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে গাছ দেখে বেড়ান, না হলে কোনো কীর্তনের আসরে কাটিয়ে দিলেন। এরকম অদ্ভুত লোক দেখিনি। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজনের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছেন। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যাবেলায় হিসাব নিয়ে বসি। কাঠবাবুকে সন্ধ্যেবেলায় ডেকে টাকা হাতে তুলে দিই, আবার টাকার প্রয়োজন হলে কাঠবাবুর কাছে চেয়ে নিই।

একদিন সকালবেলা হঠাৎ দেখি একাট বড়সড় লোহার সিন্দুক রেখে গেলেন আমরা ঘরে। সিন্দুক কী হবে জিজ্ঞাসা করতেই কাঠবাবু বললেন, সিন্দুকটা আপনার কাছেই রাখুন। রোজ রোজ ও ঝামেলা আমার আর ভালো লাগে না। টাকা-পয়সা আপনার কাছেই রাখবেন রায়বাবু। আমি মাসের শেষে একবার হিসাবটা দেখে নেব।

টাকা-পয়সার ব্যাপারটা আমার বরাবরের অপছন্দ। দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল। চাবির গোছাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কাঠবাবু বললেন, আরে চিন্তার কিছু নেই, আমি তো আছি। বলেই সেই মন-ভুলানো হাসি।

বেকার জীবন থেকে সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন। কোনো অসুবিধা নেই, আস্তে আস্তে সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছি। হারুর মায়ের সে লজ্জাভাব আর নেই। কার্তিক আর সুবোধ যেন ভাইয়ের মতো হয়ে গেছে। কার্তিক আর সুবোধ নিচে থাকে। কাঠবাবু ওপরেই থাকেন তবে আমার ঘর থেকে তিন-চারটি ঘর পরে। মাঝে মাধ্যে রাত্তিরে এসে কাঠবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কি রায়বাবু, কোনো অসুবিধে নেই তো? হলেই বলবেন।

শীত ক্রমশ জাঁকিয়ে পড়ছে। সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে মিল বন্ধ হয়ে যায়। লেবাররা সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমি আর কি করি। ঘরে ঢুকে খাতাপত্রের হিসাব মিলিয়ে সটান লেপের তলায়। দরজা ভেজানো থাকলে কাঠবাবু ঘরে এসে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করেন আর বন্ধ দেখলে আমাকে আর ডাকেন না। সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লে এক অশান্তি। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসতে চায় না। শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কী করা যাবে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে হয়।

সেদিন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু সকাল সকালই শুয়ে পড়েছি। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তার ঠিক নেই। আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই দেখি খাটটা দুলছে। আস্তে নয় বেশ জোরেই। বুঝলাম ভূমিকম্প। এবং ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশ। তীব্রতা বেশি না হলে খাট অত দোলে কী করে? লেপ সরিয়ে লাফ মেরে খাট থেকে নামলাম। দরজা খুলে নিচে নামতে হবে নইলে যে কোনো মুহূর্তে ঘরটা মাথার ওপর ভেঙে পড়তে পারে। মেঝেতে পা দিয়ে দেখি ভূমিকম্প থেমে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। মনে মনে ভাবছি বেঁচে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে সুবোধকে বললাম, কাল রাতে কি রকম ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়েছে বলো তো? মনে হলো যেন পুরো বাড়ি ভেঙে পড়বে।

সুবোধ আকাশ থেকে পড়ল।—ভূমিকম্প? কি যে বলেন!

অতক্ষণ ধরে বাড়িটা দুলছিল, কাঁপছিল, টের পাওনি? সত্যি ঘুম বটে তোমার!

সত্যি বলছেন ভূমিকম্প?

না তো মিথ্যে বলছি?

হতে পারে ঘুমিয়ে ছিলাম। সুবোধের বিশ্বাসের মধ্যে যেন একটা কিন্তু রয়ে গেল।

মজার ব্যাপার কাঠগোলার যাকেই ভূমিকম্পের কথা বলি সেই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন ভূমিকম্প হয়নি। মুখেও তারা ওই একই কথা বলে। সকলের কাছে শুনে আমার মনেও কিরকম কিন্তু ঢুকে গেল। তাহলে কি গতরাতে ভূমিকম্প হয়নি? পুরোটাই স্বপ্নবিভ্রম? কিন্তু আমার যে পরিষ্কার মনে আছে খাটটা প্রচণ্ড দুলছিল আর খাট থেকে মেঝেতে লাফ মারার পর ভূমিকম্প থেমে যায়। সবটাই ঘটেছে সজ্ঞানে। সেদিনের রাতের ঘটনাটা আমার মনে একটা খটকা ধরিয়ে দিল।

এর মধ্যে আর কোনো ভূমিকম্প হয়নি। কিন্তু সেদিন রাতে যা ঘটে গেল তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না।

এমনিতেই আমরা ঘুম বরাবরই পাতলা। সেদিন খুট করে আওয়াজ হতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। আর ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই দেখি এক ছায়ামূর্তি মাথার কাছ থেকে সরে গিয়ে সিন্দুকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারের মধ্যে পরিষ্কার বুঝতে পারছি একটা মানুষ। ভয়ে গা শিউরে উঠল। ঐ সিন্দুকে কাঠগোলার পুরো টাকা। তা হলে কি কেউ টাকা হাতাতে এসেছে? ভয়ে পা ভারী হয়ে আসছে। পরক্ষণেই মনে হলো ঘরের দরজা তো বন্ধ। ভিতর থেকে খিল দেওয়া। তাহলে ঘরে লোক ঢুকল কি করে? আমি যতক্ষণ জেগে ছিলাম ততক্ষণ কেউ ঘরে ঢোকেনি। তাহলে কি আগে থেকে কেউ ঢুকে খাটের তলায় চুপ করে বসেছিল? আমি ঘুমানোর পর সিন্দুক খোলার চেষ্টা করছিল? আস্তে আস্তে ছায়ামূর্তি সরে যাচ্ছে পুব দিকের জানালার পাশে। বুঝতে পারছি না ওর কাছে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা। তবুও সাহস করে বেডসুইচ টিপে দিলাম, লোকটিকে তো চেনা যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার, ঘরে আলো জ্বলতেই দেখা গেল কেউ নেই। তবে কি ভুল দেখলাম? ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। যদি ঘরে লোকই থাকবে তাহলে বন্ধ ঘর থেকে কিভাবে লোকটি বেরিয়ে যাবে? টর্চ মেরে খাটের তলায় দেখলাম। কেউ নেই, ফাঁকা। সাহস করে দরজা খুললাম, চারদিক শুনশান। এগিয়ে গিয়ে কাঠবাবুর দরজায় টোকা মারলাম। কাঠবাবুকে অন্তত ঘটনাটা জানানোর দরকার। নইলে কিছু একটা অঘটন ঘটে গেলে কাঠবাবুর মতো সজ্জন লোকের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। বেশ কয়েকবার টোকা মারার পর কাঠবাবু দরজা খুলে দিলেন। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন। বললেন, কি খবর রায়বাবু, এত রাতে?

কাঠবাবুকে সমস্ত ঘটনাটা জানালাম। হো হো করে হেসে উঠলেন কাঠবাবু।—রায়বাবু, আপনি হয়তো স্বপ্ন দেখছিলেন। অনেক সময় এরকম হয়। যান শুয়ে পড়ুন।

আমার দোনামোনা ভাব দেখে কাঠবাবু বললেন—চলুন আপনার ঘরে না হয় আমি শুচ্ছি। কাঠবাবু এসে আমরা পাশে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালবেলা কাঠবাবু বললেন, রায়বাবু, আজ থেকে ধনিয়া আপনার ঘরের সামনে শোবে। গায়ে অসুরের মতো শক্তি ওর। রাতে কিছু হলে ওকে ডাকবেন।

কাঁটাবাগানে কাঠবাবুর কাঠগোলায় সেদিনই ছিল আমার শেষ দিন আর সেই ভয়ংকর রাতের কথা আমি জীবনে ভুলব না। অত শীতের মধ্যে ধনিয়া ঘরের বাইরে দরজার কাছে শুয়ে থাকবে আর আমি ঘরের মধ্যে শোব এটা মন থেকে সায় দেয়নি।

ধনিয়াকে বললাম, তুমি ভাই ভেতরে শোও। ধনিয়া প্রথমে একটু আপত্তি করেছিল, আমার পীড়াপীড়িতে ভিতরেই মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে পড়ল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, চাপা গোঙানির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি সেই ছায়ামূর্তি। তবে গতকালের তুলনায় ছায়ামূর্তি আজ স্পষ্ট। পরিষ্কার একটি নারীমূর্তি। সিন্দুকের কাছে দাঁড়িয়ে। তবে গোঙানিটা আসছে অন্য দিক থেকে। তাকিয়ে দেখি ধনিয়াও উঠে পড়েছে। বসে তাকিয়ে আছে ছায়ামূর্তির দিকে। কোনো কিছু বলার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। ধনিয়া বাঘের ক্ষিপ্রতায় গিয়ে ছায়ামূর্তিকে চেপে ধরল। তারপরই ধস্তাধস্তি। আমি বিমূঢ় হয়ে খাটের ওপর বসে। হঠাৎ আমার মনে হলো খাটটা দুলছে। প্রথমে আস্তে

তারপর ভীষণ জোরে। মাটি ছেড়ে খাটটা ক্রমশ শূন্যে উঠছে। ওদিকে ধনিয়ার সঙ্গে ছায়ামূর্তির প্রচণ্ড লড়াই। খাটটা একবার শূন্যে উঠছে আবার নিচে নামছে। এরপরই মনে হলো কে যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে খাট থেকে ফেলে দিল আমাকে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরদিন জ্ঞান ফিরলে দেখি কাঠবাবুর ঘরে। আমাকে ঘিরে স মিলের সবাই। ঘাড়ের কাছে যন্ত্রণা করছে এছাড়া আর কোনো অসুবিধে নেই।

কাঠবাবু বললেন, রায়বাবু, এখন কেমন লাগছে? বললাম, ভালো। ওঠার চেষ্টা করতেই কাঠবাবু বললেন, উঠবেন না, উঠবেন না। তবু উঠে বসলুম। বললাম, ধনিয়া কোথায়? ওর কিছু হয়নি তো? লক্ষ্য করে দেখলাম ঘরে উপস্থিত সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

খাট থেকে নেমে বললাম, সুবোধ, ধনিয়া কোথায়? সুবোধ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুঝলাম কোনো অঘটন ঘটেছে। বাইরে বেরিয়েই দেখি ছোট-খাটো একটা জটলা। কিছু একটা ঘিরে জটলাটা বৃত্তের আকার নিয়েছে। বৃত্তের কাছে ছুটে যেতেই সবাই আমার দিকে তাকাল। আমার পেছনে সবাই দৌড়োচ্ছে। গলা বাড়িয়ে দেখি ধনিয়া শুয়ে আছে। জিভটা কে যেন টেনে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করেছে। মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। আর গলায় দশ আঙুলের দাগ। অর্থাৎ শ্বাসরোধ করে ধনিয়াকে মারা হয়েছে। কিন্তু কে মারল ধনিয়াকে? ঘরে আমি ও ধনিয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না। ছিল ছায়াশরীর। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেখেছিলাম ধনিয়া ছায়াশরীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে ধনিয়ার মৃতদেহ নিয়ে গেল। ওসি বললেন, রায়বাবু, আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে। আমি আর কাঠবাবু জিপে চড়ে বসলাম। কাঠবাবু দু'হাত মাথায় দিয়ে ঝুঁকে বসে আছেন। কথা বলছেন না।

থানায় ওসি আমাকে জেরা করতে লাগলেন। রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। ওসি আঁতকে উঠলেন, স্ট্রেঞ্জ, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি তিন-তিনবার!

ওসির মুখে তিন-তিনবার কথাটি শুনেই চমকে উঠলাম। তাহলে এর আগেও দু'টি ঘটনা ঘটেছে এবং কাঠবাবু ও স মিলের সবাই সেটা বেমালুম চেপে গিয়েছে।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন কাঠবাবু।—স্যার, আমিই এর জন্য দায়ী। আমাকে শাস্তি দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এ তিনটে মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী।

জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার কাঠবাবু আমাকে খুলে বলুন। কাঠবাবু যা বললেন তার ইতিহাস এইরকম ঃ যে কাঠ দিয়ে ঐ খাট তৈরি সেই গাছে একজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। একরকম জেদ করেই কাঠবাবু ঐ কাঠ দিয়ে খাট বানিয়েছিলেন। কিন্তু খাট বানানোর পরেও ঐ ব্যক্তির অতৃপ্ত আত্মা ঐ কাঠ ছেড়ে যায়নি। এর আগেও স মিলের এক ম্যানেজার এবং কারখানার এক কর্মীকে ঐ অতৃপ্ত আত্মা মেরে ফেলে। কাঠবাবু ঐ ঘরে কাউকে সাধারণত যেতে দেন না এবং খাটও ব্যবহার করতে দেন না। কিন্তু ভেবেছিলেন আমাকে দিয়ে ব্যাপারটা আর একবার পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে এবারে ধনিয়ার মৃত্যু।

ওসি বললেন, যত সব কুসংস্কার। চলুন খাটটাকে ডেস্ট্রয় করে ফেলি।

ঘর থেকে খাটটি বের করে এনে কেরোসিন ঢেলে দিয়ে ওসি নিজের হাতে আগুন দিলেন।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। কেউ বিশ্বাস করবে—না—আগুন নিবে যাওয়ার পর দেখা গেল খাটটা অবিকৃত রয়েছে। ওসি বললেন, মিসটিরিয়াস। কাঠবাবু বললেন, আত্মা অবিনশ্বর। এর ক্ষয় নেই।

আর এখানে থাকা চলে না। ঘরে উঠে গেলাম। জামা-কাপড়, জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।

মাঘ ১৪০৯

কুহেলী মায়ায়

সঞ্জীব কুমার দে

গেটের ভিড় ঠেলে কোনোরকমে অনুতোষ ট্রেন থেকে নামল বটে, কিন্তু মোক্ষম এক হোঁচট খেয়ে প্লাটফরমের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। এসব ঘটনায় বেদনার থেকে লজ্জাতেই মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনুতোষের ক্ষেত্রেও সেটাই হল। হাতে ভর দিয়ে অনুতোষ দ্রুত উঠে দাঁড়াল। আর তখনই সে আবিষ্কার করল—তার ডান পায়ের চপ্পলটি বিশ্রী ভাবে ছিঁড়ে গেছে। এমন ভাবে ছিঁড়েছে যে দু'পা এগোনোও কষ্টকর।

অনুতোষ অপ্রস্তুত। তার কাছে অচেনা-অজানা স্টেশন এই নারায়ণগড়। এখানেই তাকে নামতে বলেছিল তথাগত। অপেক্ষা করতে বলেছিল তারা এসে পৌঁছনো পর্যন্ত। তথাগত-সহ বাকি বন্ধুরা খড়্গাপুর থেকে গাড়ি বদলে এসে পৌঁছবে আরো মিনিট চল্লিশ পর। তারপর সকলে মিলে একত্র হয়ে বাস ধরে অথবা কোনো গাড়ি ঠিক করে রওনা হবে বন্ধু পীতবসনের গ্রামে—কেশিয়াড়ির কুলটিকুরিতে। আজ শনিবার, অঘ্রানের অমাবস্যা রাতে পীতবসনের দেশের বাড়িতে ধুমধাম করে কালীপুজো।

সেই উপলক্ষেই নিমন্ত্রণ করেছে পীতবসন। অনেক করে যেতে বলেছে বন্ধুদের। অনুতোষ সরাসরি আসছে হাওরা স্টেশন থেকে বেলদাগামী ট্রেনে। যেহেতু এখন কলেজের ছুটি, সব বন্ধুরা-ই আসছে যে যার বাড়ি থেকে, বিভিন্ন স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে খড়্গাপুরে। সেখান থেকে সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার কথা তথাগতের। কারণ সে এর আগেও কয়েকবার পীতবসনের গ্রামে এসেছে। এখানকার সমস্ত পথ-ঘাট নাকি তার নখদর্পণে। শুধু তা-ই নয়, এই সব অঞ্চলের বহু মানুষজনের সঙ্গে তার নাকি নিবিড় যোগাযোগও রয়েছে।

গাড়ির ভিড় থেকে নামতেই বেশ শীত শীত অনুভূত হল অনুতোষের। সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। হালকা কুয়াশার আচ্ছাদনে স্টেশনের আলোগুলোও যেন ম্লান।

যে দু'চারজন যাত্রী নেমেছিল ট্রেন থেকে তাদেরই একজনকে পাকড়াও করল অনুতোষ, 'দাদা, এখানে মুচি কোথায় পাওয়া যাবে?'

'মুচি। প্লাটফরমের ওপরেই তো বসে একজন। ওই দিকটায়—' আঙুল নির্দেশ করে দেখালেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু এখন কি আর পাবেন তাকে? সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখুন গিয়ে!'

পা টেনে টেনে সেদিকটায় গেল অনুতোষ। বাঁধানো প্লাটফরমের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নজর করল। না, জুতো সারানোর লোক চোখে পড়ল না।

একটা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসে কথাবার্তা বলছিল দু'জন হকার। তাদেরও একই প্রশ্ন করল সে।

'এখন তো এখানে মুচি পাবেন না ভাই। একবার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখতে পারেন। ওখানে বসে একজন, সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত।'

'দয়া করে বলবেন বাসস্ট্যান্ডটা কোন দিকে?'

লোকটি বাসস্ট্যান্ডে যাবার পথ ভালো করেই বুঝিয়ে দিল অনুতোষকে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকেই এগোতে লাগল অনুতোষ।

দোকানপাট, রিকশা স্ট্যান্ড, মানুষজন, স্টেশন চত্বর বেশ জমজমাট। একটু এগিয়ে বাসস্ট্যান্ড। এদিক-ওদিক ঘুরে দেখেও কোথাও জুতো সারাইয়ের লোকের দেখা মিলল না। জুতো পালিশের ছেলে ছিল একজন। জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'হ্যাঁ, মুচি তো এখানেই ছিল! এই কিছুক্ষণ আগে উঠে গেল। আজ আর পাবেন না।'

সঙ্কটে পড়ে গেল অনুতোষ। কী করবে তবে? এটা ফেলে দিয়ে নতুন চপ্পল কিনে নেবে একজোড়া? জুতোর দোকান তো রয়েছে কাছেই! নাকি আর একটু দেখবে কাছে-পিঠে ঘুরে! যদি মুচি পাওয়া যায়!

হাঁটতে হাঁটতে স্টেশন থেকে অনেকটা দূরেই চলে এল অনুতোষ। একটা তিন রাস্তার মোড়। টিমটিম করে জ্বলছে পোস্টের আলো। হালকা কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পথ। হঠাৎ একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের তলায় আধো আলোছায়ায় একজন মুচিকে পেয়ে গেল অনুতোষ।

হাতের কাজ রেখে দিয়ে অনুতোষের চপ্পল পরীক্ষা করে দেখল সে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'একদম পালিশ ভি করে দিবো?'

'তবে তো ভালো-ই হয়!' সম্মতি জানায় অনতোষ।

'খোলেন তবে। এই লিন, এই চপ্পলজোড়া পরে লিন।' বলে এক জোড়া চটি অনুতোষের দিকে এগিয়ে দিল লোকটি। যেমন সব মুচিরা-ই দেয়!

'বাবু তো ইখানকার লোক বলে মনে হচ্ছে না!'

'না, আমি এখানে থাকি না।' কথা বলতে বলতে অনুতোষের দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে-ওদিকে। নতুন জায়গা পর্যবেক্ষণের আগ্রহে।

'আপনার জুতা সারাই করে পালিশ করে দিতে আমার তো পনরো-বিশ মিনিট টাইম লাগবেই। ততক্ষণ চারদিকটা একটু ঘুরে দেখে লিন না!'

পরামর্শটা মন্দ বলে মনে হল না অনুতোষের। সে ওখান থেকে এক পা, দু'-পা করে আরো সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। স্টেশন পেছনে ফেলে রেখে অনুতোষ এগোতে থাকল অন্যদিকে। অন্যপথে। কিন্তু কোথায়?

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল তার চলার গতি। বাড়তে লাগল স্টেশনের সঙ্গে তার দূরত্বও। একসময় পথ ধরে রেল-লাইনও টপকে গেল অনুতোষ। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে হাঁটতে থাকল সোজা। অচেনা-অজানা পথে এগিয়ে যেতে থাকল অনুতোষ।

ধীরে ধীরে হালকা হয়ে আসছে জনবসতি। আলোকিত পথ ক্রমশ প্রবেশ করছে অন্ধকারে। অনুতোষ থামছে না। পেছন ফিরেও দেখছে না। কী যেন একটা ঘোরে পথ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

লোকালয় শেষ হয়ে দু'দিকে বিস্তৃত চাষের জমি। ফসল কেটে ঘরে তোলার পর শূন্য ধু ধু মাঠ। কুয়াশা আবৃত অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন আকাশ। কিন্তু অনুতোষ হেঁটে যাচ্ছে অবলীলায়।

একসময় শেষ হয়ে যায় ফসলের জমি। পিচ বাঁধানো রাস্তাও ফুরিয়ে আসে একসময়। পায়ে হাঁটা শক্ত লাল কাঁকুড়ে মাটির সঙ্কীর্ণ পথ শুরু হয়। শুরু হয় জঙ্গলের পথ। নারায়ণগড়ের ঘন জঙ্গল। বুঝতেই পারে না অনুতোষ।

জঙ্গলের নিকষ কালো অন্ধকারে পায়ে কী একটা ঠোক্কর লাগতেই চেতনা ফেরে তার। একী! এ কোথায় এসে পড়েছে সে? কীভাবেই বা এল এখানে? ভীষণ রকম ঘাবড়ে গেল সে। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা চালাল অনুতোষ।

হ্যাঁ, মুচির কাছে চপ্পল সারাই করতে দিয়ে সে তো পায়ে পায়ে নারায়ণগড়ের দোকানপাট, বাজার এইসব ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যে হাঁটছিল। কে নিয়ে এল তাকে এই পথে?

পেছন ফিরতে গিয়ে বাধা পেল অনুতোষ। কে যেন মোচড় দিয়ে আবার ঘুরিয়ে দিল তাকে! ফিরতে দেবে না কিছুতেই। সামনের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল আবার।

এবার এগোতে চাইছে না অনুতোষ। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। পারছে না। তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে কেউ। কে?—

প্রশ্ন করে নিজেই বুঝতে পারে অনুতোষ, তার-ই পা দু'টো! না না পা ঠিক নয়, দু'টো চপ্পল! চপ্পল দু'টোই দৃঢ় হয়ে চেপে ধরেছে তার পা দু'টিকে! আর বাধ্য করছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে।

পা ঝাঁকিয়ে চপ্পল দু'টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল অনুতোষ। প্রথমে ডান পা। পরে বাম পা। পারল না। সেগুলো যেন আরো আঁট করে ধরে রাখল পা দু'টিকে।

থামতে পারছে না অনুতোষ। পারছে না কিছুতেই।

এই সময়-ই জঙ্গলের গভীর থেকে কার যেন এক মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অনুতোষ, 'আয়। আয়।'

কাকে ডাকছে ওই কণ্ঠ? অনুতোষ পা দু'টিকে আরও শক্ত করে মাটিতে চেপে রাখতে চাইল। বিফল হল। চপ্পল দু'টি ওই কণ্ঠের আহ্বানে যেন আরো শক্তি পেল।

অনুতোষ আরও এগিয়ে যায়। ভয়ার্ত হয়। ঘামে। কিন্তু সে নিরুপায়। এভাবে চপ্পল দু'টির সঙ্গে পায়ের অসম লড়াই চালাতে চালাতেও তাকে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানে না, হঠাৎ সুরেলা শব্দে পকেটের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই অনুতোষ সম্বিৎ ফিরে পায়। ফোন বাজে। বাজতেই থাকে। ধাতস্থ হতে তার সময় লাগে। একসময় পকেট থেকে বের করে ফোন ধরে সে।

'অনুতোষ, তুই কোথায়?' তথাগতের কণ্ঠস্বর, 'আমরা এসে পড়েছি, কিন্তু তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? কী ব্যাপার!'

'আমিও তো অনেক আগেই এসে গেছি।' অনুতোষ জানায়, 'কিন্তু আমি জানি না আমি কোথায়!'

'মানে! কি হেঁয়ালি করছিস? পরিষ্কার করে বল কোথায় তুই!'

উত্তর দেওয়ার আগেই ফোনের সংযোগ কেটে যায়।

আবার সামনে চলার টান। অনুতোষ এগিয়ে যায়।

মুহূর্তে আবার ফোন বেজে ওঠে, 'ফাজলামো করিস না অনুতোষ। বাসে ঘণ্টাখানেক পথ যেতে হবে আমাদের। তারপরও ভ্যান-রিকশা, আবারও হাঁটা পথ। পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আয়, টিকিট-ঘরের কাছটায় চলে আয়।'

'আমি মোটেও ফাজলামো করছি না তথাগত! সিরিয়াসলি আমার কথা শোন! আমি বিপদে, ভীষণ বিপদে!' একটুও সময় নষ্ট না করে অনুতোষ বলে যায়। যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করে যায়।

বলতে বলতে আবার সংযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তৎক্ষণাৎ আবার এগিয়ে চলা।

একটু পরে আবার ফোন বেজে ওঠা। আর তখনই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যেও অনুতোষ বুঝতে পারে ফোনে রিং হলেই কিংবা কথোপকথন চলতে থাকলেই শিথিল হয়ে পড়ছে চপ্পল জোড়ার আকর্ষণ। সংযোগ ছিন্ন হওয়া মাত্র-ই আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে তারা।

এবারের কথোপকথনে ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণ করে অনুতোষ। সেই সঙ্গে সে কোথায় রয়েছে তারও একাট মোটামুটি বর্ণনা দেয়।

সংযোগ আবার ছিন্ন হয়ে যায়।

অনুতোষকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে থাকল চপ্পল দু'টো। অনুতোশ যে নিজের ফোন থেকে কাউকে ডায়াল করবে, সে সুযোগ-ই পাচ্ছে না। সতর্ক থেকে পথের ওপর দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে তাকে। না হলে যে কোনো মুহূর্তে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার ভয়। নিজের মোবাইলে চোখ রাখার তার অবকাশ কোথায়?

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একাট নদী দেখতে পেল অনুতোষ। কুয়াশাচ্ছন্ন নদীতট। তবুও জলরাশির জন্য হালকা আলোয় অনেকটা পর্যন্ত দৃশ্যমান। উচ্ছল তরঙ্গ আর বিস্তীর্ণ পরিসর দেখে সে বুঝতে পারল এটা নদী-ই। খাল নয়।

দুর্বার এক আকর্ষণ অনুতোষকে টেনে নিয়ে চলেছে নদীর দিকে। তার মন চাইছে না। শরীর প্রতিরোধ গড়তে চাইছে। কিন্তু পারছে না। চটি দু'টোর কী অসীম শক্তি!

এদিকে পথ তো শেষ! তবুও তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে এরা? তবে কি নদীতে ডুবিয়ে মারবে তাকে? সে যে সাঁতার জানে না।

মরিয়া হয়ে এবার নিজের মোবাইল ডায়াল করতে গেল অনুতোষ। তার মাথা ঠিক কাজ করছে না। শকীরকেও স্থির রাখা যাচ্ছে না। সম্মোহিতের মতো এগিয়ে যাচ্ছে শুধু। তবুও চেষ্টা করছে কাউকে না কাউকে ফোনে ধরতে। যাকে হোক। কিন্তু পারছে না। হাত কাঁপছে। মস্তিষ্ক কাজ করছে না।

অনেকক্ষণ কারও ফোনও আসছে না তার মোবাইলে।

হঠাৎ কোথা থেকে বেশ বড় একটা নৌকা এসে ভিড়ল তীরে। একেবারে নিঃশব্দে। নৌকার উপর বেশ কয়েকটি ছায়ামূর্তি। দু'জন দাঁড়ে, একজন হালে। লগি ঠেলছিল একজন। লগি ছেড়ে একটা লম্বা কাঠের পাটাতন নৌকা থেকে তীর পর্যন্ত পেতে দিল সে। অনুতোষ শুনতে পেল রক্ত হিম করে দেওয়া এক জলদ-গম্ভীর আহ্বান, 'আয়, উঠে আয়!'

জলরাশির ওপর ছড়িয়ে থাকা আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেল অনুতোষ—আহ্বানকারী এক দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষ। মাথায় ঝাঁকড়া বাবরি কেশরাশি। শ্মশ্রুমণ্ডিত চিবুক। আদুড় গায়ে অবহেলায় জড়ানো এক খণ্ড উড়নি। আহ্বান জানাচ্ছে অনুতোষকে সে-ই, 'আয়, আয়, পা চালিয়ে আয়। মা দীর্ঘকাল তৃষ্ণার্ত। মায়ের যে রক্ত চাই!'

অনুতোষ কী বুঝল কে জানে! সে যে ভয় পাবে—সেই অনুভূতিও তার অবশিষ্ট নেই। সে এগোতে থাকে। আহ্বানকারীর কণ্ঠস্বর গমগম করে বাজতে থাকে, 'এমন যোগ বহুদিন আসেনি। তুই ভাগ্যবান, মহা ভাগ্যবান! দেরি করিস না, ঝটপট নৌকায় উঠে আয়।'

এই সময়-ই হঠাৎ আবার বেজে উঠল অনুতোষের মোবাইল। থমকে গেল অনুতোষ। রিসিভ করতেই ভেসে এল পীতবসনের কণ্ঠস্বর, যার বাড়ির কালীপুজোয় আজ তাদের যাওয়ার কথা। পীতবসন উত্তেজিত, 'তথাগতর মুখে সব শুনেছি। তুই এখন কোথায় আছিস, কী পরিস্থিতিতে, তাই বল!'

আবার চেতনা ফিরে পেয়েছে অনুতোষ। চপ্পল-জোড়ার প্রভাব থেকে সাময়িক ভাবে মুক্তও সে এখন। তাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল একরকম। সামনে যা ঘটছে তা-ই জানাল ফোনে।

'বুঝেছি! তুই এখন কেলেঘাই নদীর তীরে, আর যে লোকটা তোকে নৌকায় ওঠার জন্য ডাকছে—সে ভৈরব কাপালিক! শোন অনুতোষ—পীতবসনের কণ্ঠ উত্তেজিত হলেও খুব সংযত। সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুতোষকে কতগুলো প্রয়োজনীয় কথা শোনায়, 'ওই জঙ্গলের কাছাকাছির লোকালয় থেকে বেশ কিছু লোক বেরিয়ে পড়েছে তোকে খুঁজতে। তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই তোর কাছে পৌঁছে যাবে। তথাগতরাও স্থানীয় লোকজন নিয়ে স্টেশন থেকে রওনা

দিয়েছে একটা ম্যাজিক গাড়িতে। তোর ভয় নেই! তুই শুধু নৌকায় উঠবি না! মনে রাখ, কিছুতেই না!'

অনুতোষ কথোপকথনের মধ্যেই বুঝে নিল চটিজোড়া এখন শিথিল। আর নৌকার লোকগুলোও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তৎক্ষণাৎ সে তার কী করা উচিত, ঠিক করে ফেলল। সে পীতবসনকে অনুরোধ করল, 'তুই লাইনটা ছাড়িস না বসন। কথা বলে যা। আমি আগে চটি দু'টোকে বিদায় করি!'

মুহূর্তে ডানহাত ব্যবহার করে শরীর সামান্য ঝুঁকিয়ে ডান-পা থেকে সে খুলে নিল সেই পায়ের চপ্পলটি। কী একটু ভেবে সেটি ছুঁড়ে দিল নদীর জলে। ঝপাস করে শব্দ হল জলের। নৌকাটা-ও দুলে উঠল যেন। এরপর বাঁ-পায়ের চপ্পলটিও ওইভাবে খুলে ছুঁড়ে ফেলল সে। জলে না পড়ে চপ্পলটি গিয়ে পড়ল নৌকার ওপর।

নিমেষে ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল পাঁচ আরোহীসহ গোটা নৌকাটি! কোথায় কী?

এইবার ভয় পেয়ে গেল অনুতোষ। ভীষণ শীত করতে লাগল তার। কাঁপা কাঁপা গলায় ফোনে সে কিন্তু সবই জানিয়ে যাচ্ছে পীতবসনকে।

পীতবসন বলল, 'এবার উলটো পথ ধর অনুতোষ। ঘুরে পড়। যতটা সম্ভব ফিরতে থাক।'

অভিমুখ বদলে অনুতোষ তেমনটাই করতে চেষ্টা করল। পারছে সে, পারছে। অতিক্রম করে আসা পথ চিনতেও পারছে।

অনুতোষ ফিরতে থাকল।

পিপ্, পিপ্, শব্দ করে একাট ফোন ঢুকতে চাইছে লাইনে। সম্ভবত তথাগত। ওর সঙ্গে কথা বলাটাও জরুরি। কিন্তু অনুতোষ পীতবসনের লাইনটা কাটতে চাইছে না কিছুতেই। সে বার বার একই কথা বলে যাচ্ছে পীতবসনকে, 'তুই লাইনটা কাটিস না বসন।'

'না, আমি কাটছি না। তুই ফিরতে থাক—আর কথা বলে যা। ভয় করিস না।'

'খালি পায়ে চলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বসন। কিন্তু আমি ফিরছি। আমি পারছি। এই রাস্তা দিয়েই হেঁটে এসেছি আমি। চিনতে পারছি। মোরাম পথ শেষ হল এই। এবার পিচের রাস্তা। এবার দেখতে পাচ্ছি চাষের ক্ষেত।'

এভাবে আরও মিনিট ছয়-সাত কথা চলতে চলতে হঠাৎ করে লাইনটা কেটে যায়।

লাইন কেটে যেতেই ভীষণ রকম ঘাবড়ে গেল অনুতোষ। কিন্তু ঘাবড়ে গিয়েও বুঝতে পারল সে ফিরতে পারছে। কোনো টান বা পিছুটান অনুভব করছে না। নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণেই রাখতে পারছে সে। তাই খুশি মনে হাঁটতে থাকল অনুতোষ।

আরও সাহস সঞ্চয় করতে গুনগুন করে গান ধরল সে।

কিছুটা আরও পথ হেঁটে আসতেই দূর থেকে বেশ কিছু মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল অনুতোষ। আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট ও জোরে হতে শুনে বুঝল মানুষগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে। কুয়াশা ভেদ করেও বেশ কয়েকটা টর্চের আলোর আভাস লক্ষ করল সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের আলোগুলো এসে পড়ল তার শরীরের ওপর। প্রায় আঠের-বিশজন লোক। সকলের হাতেই কিছু না কিছু হাতিয়ার। হয় লাঠি, নয় বর্শা। সঙ্গে কারো কারো হাতে টর্চ। মানুষগুলো আসছিল ছুটতে ছুটতে। সে কারণেই দ্রুত চলছিল তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস।

হাঁফাতে হাঁফাতেই তাকে প্রশ্ন করল তাদের একজন, 'আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ'। উত্তর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ফেলল সকলে।

'আপনি ঠিক আছেন তো?' আবার প্রশ করল সেই লোকটি, 'মানে, আপনার কিছু হয়নি তো?'

তাদের আশ্বস্ত করল অনুতোষ, 'না না, আমি ঠিক আছি।'

মানুষগুলো অনুতোষের চলার সঙ্গী হল। হাঁটতে হাঁটতে কৌতূহল নিরসনে তাদের ঘটনাটার বিবরণ দিতে হচ্ছিল অনুতোষকে।

এই সময়েই দূরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। এদিকেই ধেয়ে আসছে সে শব্দ।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই উলটো দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইটের আলো এসে পড়ল তাদের ওপর। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল তথাগত, অপূর্ব, বিজন। সঙ্গে অচেনা আরও তিন-চারজন। সম্ভবত এরা স্থানীয়, তথাগত বা পীতবসনদের পরিচিত জন।

গাড়িতে ফিরতে ফিরতে এদেরই একজনের মুখ থেকে যে কাহিনি বিস্তৃত শুনল অনুতোষ, তাতে বুঝতে পারল কী ভয়ঙ্কর বিপদের কবল থেকে সে বেঁচে ফিরেছে!

অমাবস্যার শনিবার। ভৈরব কাপালিক তার অনুচরদের মাধ্যমে ওইভাবে ধরে নিয়ে যেত শিকার। জঙ্গল তখন ছিল আরও গভীর, আরও বিস্তৃত। নদীর ওপারে গহন জঙ্গলে ছিল তার সাধনক্ষেত্র দেবী কালিকার মন্দির। সেখানে এমন বিশেষ দিনে, বিশেষ যোগে নরবলি দিত সে।

শেষ পর্যন্ত এক দুর্যোগের রাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে গিয়ে অনেক সঙ্গী-সাথী সহ নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু হয়।

এসব বহু বছর আগেকার কথা। অন্তত ত্রিশ-বত্রিশ বছর তো হবেই।

আজ অতীতের সেই কোনো একটা অমাবস্যার রাতেরই ভৌতিক পুনরাবৃত্তি।

এর আগেও নাকি কয়েকবার এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কখনো-সখনো। সেক্ষেত্রে কেলেঘাই নদীর জলে ডুবে প্রাণ দিয়েছে সম্মোহিত মানুষ।

কিন্তু আজকের ঘটনায় অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরেছে অনুতোষ। হয়তো তা অনুতোষের মানসিক দৃঢ়তার জন্য, অথবা টেলিতরঙ্গের কৃপায়!

প্রবীণ মানুষেরা পুরোনো এসব ঘটনার কথা জানেন। নবীনেরা জানে না। তাদের জানার কথা নয়। কারণ আজকের এই ঘটনা ঘটেছে বহু বছর পর।

কাপালিকের অন্যতম শাগরেদ সেই মুচিকেও তো দেখা যায়নি বহু বছর!

ফেরার পথে দূর থেকেই সেই ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছটাকে চিহ্নিত করে গাড়ি থামাতে বলল অনুতোষ। সকলে নেমে এল গাড়ি থেকে।

'ওই তো! ওখানেই ছিল সে!' অনুতোষ আঙুল দিয়ে দেখাল জায়গাটা।

রাত প্রায় দশটা। জনহীন পথ। নেই জুতো সারাইয়ের লোকটা। সে যে ওখানে ছিল—নেই তার চিহ্নও!

শুধু খুঁজে পাওয়া গেল অনুতোষের ছেঁড়া চপ্পল জোড়া। যেভাবে সে পা থেকে খুলে দিয়েছিল—পড়ে আছে সেভাবেই!

কার্ত্তিক ১৪২০

চন্দ্রবিন্দুর চমক

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

ঘেমেনেয়ে রামহরি সরখেলের হাত থরথরিয়ে কাঁপছে। তবু শক্ত মুঠোয় গেলাসটা ধরে দু'চোখ বন্ধ করে ঠোঁটে ঠেকালেন। আর তখনই গেলাসটা ছিনিয়ে নিয়ে কে বলে উঠল, আরে, ছি-ছি, এ কি করছেন!

হতবুদ্ধি সরখেল, চমকের ঘোর কাটিয়ে চোখ খুলতে একুট সময় লাগল। দেখলেন, একেবারে গা ঘেঁষে সামনেই দাঁড়িয়ে এক অচেনা মূর্তি। রোগা লম্বা ফর্সা হাসিমুখ মানুষটি বলল, আত্মঘাতী হতে যাচ্ছিলেন কোন দুঃখে শুনি!

অবাক চোখে তাকিয়ে সরখেল বললেন, আপনি, আপনাকে তো আমি চিনি না। কে আপনি? এই বন্ধ ঘরে ঢুকলেন কি করে?

আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেবার জন—আগন্তুক হাসিমুখে বলল, আমি ক'টা প্রশ্ন করব, কোনোরকম দ্বিধা-সংকোচ না করে জবাব দিন। বলুন তো, আজ বিকেলে আপনি 'বঙ্গ-ভাষা উন্নয়ন সমিতি'র অনুষ্ঠানে গেছলেন?

গেছলাম। সরখেল ম্লানমুখে বললেন, ওই সভায় 'কিশোর সাহিত্য বিভাগে' সভাপতিত্বের ভার আপনার ওপর ছিল যে।

কিন্তু, আপনি জানতেন ওই সভায় যৎপরোনাস্তি অপমানিত হবেন?

আপনি সভায় ছিলেন নিশ্চয়ই। রামহরি সরখেল উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন, মূল সভাপতি করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলালের ভাষণ শুনেছেন তো? আপনিই বলুন, ওর ক্ষমতা আছে বলেই যা-নয়-তাই বলে আমাকে হেনস্থা করবে? কেন? আমার লেখার বিষয় নাকি সরলমতি শিশুদের প্রচণ্ড ক্ষতির কারণ। অশিক্ষার অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছি আমি তাদের মনে।

আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দারুণ গুরুতরই বটে! কিন্তু ব্যাপারটা অর্থাৎ, অন্ধকারটা কি আপনি লেখার মাধ্যমেই ছড়িয়ে দেন? আগন্তুকের মুখে মজা পাওয়া ভাবের ছোঁয়া, কেমন ধরনের লেখা সে সব?

বোধ-বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু বিচার করা যায় না, তা-ই আমরা আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে চাই। কিন্তু কেন? সরখেল রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, দেব-দেবীদের চোখে না দেখেও তাঁদের আমরা স্বীকার করি, মান্য করি, প্রণাম করি, পুজো করি। আর, অপদেবতাদের বেলায় তার উলটো নিয়ম কেন? বলুন তো মশাই, ভূতের গল্প মানেই মনগড়া মিথ্যে গাঁজাখুরি গল্প! দেশি-বিদেশি বিশ্বখ্যাত বহু লেখকের কলমে সৃষ্টি হয়েছে অবিস্মরণীয় সব অলৌকিক কাহিনী। আর আমি অখ্যাত, নগণ্য বলেই কাঞ্জিলাল যাচ্ছেতাই করে অত লোকজনের সামনে আমাকে নাস্তানাবুদ করল।

লোকটা অজ্ঞ, অহংকারী আর হামবড়া স্বভাবের। ভুঁইফোঁড় আগন্তুক সহানুভূতির স্বরে বলতে থাকে, তা ছাড়া, আপনার ওপর সেই কলেজী জীবন থেকেই ওর প্রচণ্ড আক্রোশ আছে, তাই না?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক বলেছেন। ওর নেতাগিরিতে ছাত্র ইউনিয়নের মিটিং-মিছিলে যোগ

না দিয়ে পড়াশুনো নিয়েই থাকতুম তো—অভিযোগের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে বলতে সরখেল থামলেন। অবাক চোখ-মুখ করে বললেন, কিন্তু, এত খবর আপনি জানলেন কি করে?

কেমন করে জানলাম? আগন্তুক চোখ পিট-পিট করে বলল, অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মঘাতী হতে যাবেন জেনে আপনার বন্ধ ঘরে যেমন ঢুকে পড়েছি আপনাকে বাঁচানোর জন্যে, তেমনিই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, সবকিছু ছবির মতো আমরা দেখতে পাই। এখন আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন তো, আমি কে আর কেমন করে দরজা-বন্ধ ঘরে হাজির হলাম!

কথা শেষ হওয়ার পরই বক্তা বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সরখেলের দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে পড়ার অবস্থা। ঠকঠকিয়ে কাঁপুনি শুরু হলো।

আরে মশাই, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন! মিষ্টি হাসি-মাখা মুখ করে আগন্তুক আবার আবির্ভূত হলো। আমাদের, মানে ভূতেদের নিয়ে আপনি গল্প লেখেন, তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। সেইজন্যই তো আপনার মতো ভক্তজনের প্রয়োজনের সময় আমার আছি আপনাদের পাশে।

এক মুহূর্তের বিরতি দিয়ে কাঠের পুতুল হওয়া সরখেলকে দেখে নিয়ে বক্তা বলে চলল, 'চন্দ্রবিন্দু মহাসভা'র প্রধান কর্তা ব্রেহ্মদাদু আর মামদো মামু দুনিয়ার সব খবরই রাখেন। কাঞ্জিলাল আপনাকে ল্যাজে-গোবরে করবে, আর সেই দুঃখে ঘুমের বড়ি খেয়ে সব জ্বালা জুড়োনের মতলব করবেন আপনি, ওনাদের কিছুই অজানা নয়। তাই আপনার মতো ভূত-ভক্তকে রক্ষা করা আর ভূত-নিন্দুক করঞ্জাক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ব্রেহ্মদাদু আমাকে বললেন, ছিদাম, তুই গিয়ে সরখেলকে সামলাবি আর ভোঁটকা তুই কাঞ্জিলালের বিষদাঁত গুঁড়িয়ে ছাতু করে দিবি। ভোঁটকা বদমেজাজী স্বভাবের বলে, মামদো মামু তাকে সাবধান করে দিয়েছে, লোকটার হাই-প্রেশার আছে, দেখিস এমন-কিছু করিস না যাতে ভয়ে হার্টফেল করে মরে-টরে যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে যা করার করবি। এখন বলুন সরখেল মশাই, খুশি হয়েছেন তো?

রামহরি সরখেলের কাঁপুনি কখন থেমে গেছে; চোখে-মুখে গদগদ ভক্তি-ভাব ফুটে উঠেছে। জোড় হাত করে বললেন, আমি....আমি ভাবতেই পারছি না, এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটবে আমার জীবনে। স্বপ্নেও ভাবিনি আপনার দর্শন-লাভ করব। আপনাদের কৃপায় আমার নব-জন্ম লাভ হলো। আত্মঘাতী হওয়ার মহাপাপ থেকে আমায় রক্ষা করেছেন আপনি।

ছিদাম খুশির গলায় বলল, আপনি প্রাণভরে ভূত-মাহাত্ম্য প্রচার করে যান। আপনার এলেম আছে, অবশ্যই বিশ্বখ্যাত হয়ে যাবেন, এই বলে দিলুম।

সরখেল বেজায় কৌতূহলী হয়ে শুধান, আচ্ছা, ভোঁটকাবাবু ওই কাঞ্জিলালকে—

উঁ-হুঁ-হুঁ, ও কথা থাক এখন। ভোঁটকা যা করার ঠিকঠাকই করবে, কালই তার ফলাফল টের পাবেন। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি চললাম। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ছিদাম বায়ু-লীন হলো।

রামহরি সরখেল কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে ভক্তিতে গদগদ ভাবে বললেন, হে অপদেবদেবীগণ, আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করুন।

করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল ভারতসেরা ইংরেজি দৈনিকের জাঁদরেল সম্পাদক। পালোয়ানী ধাঁচের চেহারা, পুরুষ্টু চক্ষু, বেজায় রাশভারী, কণ্ঠস্বর যেন মেঘ-ডম্বরুর ধ্বনি ছড়ায়।

আজ ওঁর মেজাজ-খুশ ভাব একটু বেশি বলেই খটোমটো, গুরুগম্ভীর ইংরেজি কেতাব না পড়ে, রামহরি সরখেলের দেখা 'ভূতের ভেংচি' বইটায় চোখ বুলোচ্ছেন। এই ধরনের জঞ্জালের আমদানি আর যাতে না করতে পারে ওই লোকটা, কচি-কাঁচার মাথাগুলো চিবিয়ে খেতে না পারে, সেইজন্যেই আজ সন্ধ্যের সাহিত্য সভায় সরখেলের মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, কিল মেরে দাঁত ভেঙে দিয়েছেন কাঞ্জিলাল।

একটু আগে আপিসের পিওন নিধিরাম এসেছিল 'প্রুফ' নিয়ে, উনি দেখে যদি অদল-বদল কিছু করেন তা জানতে।

নিধিরাম চলে যাওয়ার পর একটা চুরোট ধরিয়ে কাঞ্জিলাল মৌজী টান দিচ্ছিলেন। হালকা নীলাভ ধোঁয়া কুণ্ডুলী পাকিয়ে বায়ুসমুদ্রে ঘুরপাক খাচ্ছিল। মুখের কেমন বিদকুটে ভঙ্গি করে কাঞ্জিলাল 'ভূতের ভেংচি'র শেষ গল্পের নাম পড়লেন ঃ 'কংকালের করুণ কান্না'। পড়ার পর দাঁতে চিবিয়ে বললেন, সত্যিকারের করুণতর কান্নাটা কেমন, আগামী সকালেই তা টের পাবে হে গবেটরাম!

কোন গবেটরামের কথা বলছেন স্যার?

প্রশ্নের সঙ্গে খিক খিক চাপা হাসি শুনে কাঞ্জিলাল সচমক বিস্ময়ে টেবিলের গা ঘেঁষে দণ্ডায়মান এক অদ্ভুত মূর্তি দেখতে পেলেন। আলকাতরার পোঁছ বুলোনো পিপের মতো বপুর অধিকারীটি ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসছে। ভয়ের শীতল শিহরনে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল—এত রাতে নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকেছে এই লোকটা কে, চোর....ডাকাত? আগলাবার জন্য পোষা দুটি বুলডগ—টাইগার আর লায়ন আছে। একতলা, দোতলায় একটা ইঁদুর কিংবা আরশোলাও ঘুরে বেড়াতে পারে না। তাহলে এই বদখত-দর্শন হোঁদল কুতকুতটি দোতলায় এল কেমন করে? ওই ভয়াল সারমেয় দুটি নিঃশব্দে, নির্বিবাদে ওকে ছাড়পত্র দিল—এ যে অভাবিত কাণ্ড! এত রাতে চুপি চুপি এই লোকটা ঘরে ঢুকেছে কোন সাধু মতলবে? হঠাৎ কাঞ্জিলালের মনে হলো, ওই ভুতুড়ে গল্প-লেখক সরখেল কি অপমানের প্রতিশোধ নিতে ভাড়াটে-খুনী পাঠিয়েছে?

কি সব যা তা ভাবছেন স্যার! কতই যেন ক্ষুব্ধভাবে লোকটি বলল, আমি কারুর টাকা খেয়ে হামলা করতে আসিনি। আপনার সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতাই নেই। এর আগে কি আমরা মুখোমুখি হয়েছি কখনো?

করঞ্জাক্ষ দারুণ অবাক হলেন। লোকটি প্রচণ্ড ধুরন্ধর তো! মুখ দেখেই মনের কথা দিব্যি টের পায়!

তুমি—মানে, আপনি এ ঘরে এই সময়ে এলেন কি করে? কাঞ্জিলালের বিস্মিত জিজ্ঞাসা, কি এমন জরুরি দরকার আমার কাছে?

আপনার আগাম অনুমতি না যোগাড় করে, কেউ আপনার দর্শন-লাভ করতে পারে না—তা অবশ্যই জানি। এখন, যদি ভরসা দেন তো আমার আগমনের কারণটা বলে ফেলি।

বলে ফেলুন।

কূপের ভেকের দশা থেকে আপনাকে উদ্ধার করতে চাই।

কাঞ্জিলাল প্রচণ্ড রাগে বিকট হুংকার করতে গিয়েও চেপে গেলেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রাতের রাহীর আগাপাস্তলা জরিপ করতে বুঝতে চেষ্টা করলেন, লোকটা পাগলা-গারদ-পালানো কোনো বদ্ধ উন্মাদ নাকি! ওঁকে বলছে কুয়োর ব্যাঙের দশা থেকে উদ্ধার করবে! কী দুঃসাহস!

আমায় পাগল-ছাগল ভাববেন না স্যার। লোকটি আপত্তি জানাল, আর আপনার তুলনায় দুঃসাহসী কোনোকালেই আমি নই।

আপনি ম্যাজিশিয়ান নাকি! হতভম্ব কাঞ্জিলাল বললেন, আমি দুঃসাহসীর মতো কি করেছি জানি না তো।

না জানার ভান করলেই আমি ভুলছি না কাঞ্জিবাবু। আজই সন্ধ্যেবেলা সাহিত্য সভায় সরখেল মশাইকে ল্যাজে-গোবরে করেননি অতো লোকজনের সামনে? কতো দুঃসাহস থাকলে তবেই না অমন গা-জোয়ারী কাণ্ডকারখানা করা যায়। নির্বিরোধী, গো-বেচারা মানুষটাকে কোন দোষে অমন করে চরম হেনস্থা করলেন, বলুন তো?

নিজের অমন সুন্দর নামটার ল্যাজা-মুড়ো ছাঁটাই হওয়ায় করঞ্জাক্ষ বেজায় অখুশি হলেও হজম করলেন। বললেন, ওই লোকটা যতরাজ্যের উদ্ভট—মানে, বিচ্ছিরি ধরনের ভূতের গল্প লিখে, দেশের ভবিষ্যতের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেই চলেছে। দিনের পর দিন এই উৎপাত মুখ বুজে সহ্য করা যায়? কাঞ্জিলাল অভিযোগের অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, আমি সমাজ-সচেতন, সৎ সাংবাদিক বলেই দেশের আগামী দিনের নাগরিক অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের কল্যাণ কামনায়, ওই অপদার্থটাকে তার দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি—এটা দোষণীয় নয় নিশ্চয়ই।

আপনার বৃত্তিগত সততা আর সরখেলের অপ-সাহিত্যের অসারতার কথা এখন থাক। আপনার বাক্যবাণের যন্ত্রণা না সইতে পেরে, সরখেল মশাই যে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল তা কি জানেন?

করঞ্জাক্ষের মন চাইছিল, অট্টহেসে বলেন—জঞ্জাল সাফাই হলেই দেশের মঙ্গল, কিন্তু সেটা দৃষ্টিকটু ব্যাপার হবে বলে শুধু বললেন, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। কিন্তু মরতে পারেনি।

পারেনি? না পারারই কথা। ও মড়া নিয়ে মন-গড়া গা-ছমছম গপ্পো ফাঁদে বটে, কিন্তু ওর সাহসের ছিটেফোঁটা নেই।

কথাটা—মানে, আপনার ধারণাটা ঠিক নয় স্যার। লোকটি বলল, সাহসের অভাবের জন্য নয়, সরখেলকে মরতে দেওয়া হয়নি। ওর হাত থেকে ঘুমের ওষুধ মেশানো গেলাস কেড়ে নিয়েছিল—

কেড়ে নিয়েছিল? কে? কোন মাথা-মোটার মাথা ব্যথা হলো?

আজ্ঞে স্যার, ওই যাদের অস্তিত্বই নেই, অর্থাৎ যাদের নিয়ে গল্প লেখার জন্য সরখেলকে হাজার কু-কথায় বাণবিদ্ধ করেছেন, নিশি-অতিথি কেমন আহ্লাদে স্বরে বলতে থাকে, সেই ভূতেদেরই একজন ঠিক সময়ে পৌঁছে ওর হাত থেকে গেলাসটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে। 'চন্দ্রবিন্দু মহাসভা' থেকে তাকে পাঠানো হয়েছিল ভূতভক্ত লেখকটিকে বাঁচানোর জন্য। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না তো?

করঞ্জাক্ষ কাঞ্জিলাল চোখ কপালে তুলে দেখলেন, রাত দুপুরের উটকো আগন্তুক গ্যাস বেলুনের মতো শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে সমস্ত ঘর জুড়ে। জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছেন নাকি!

আমাদের 'চন্দ্রবিন্দু মহাসভা'র সব্বোময় কত্তা ব্রেহ্মদাদু ছিদামকে পাঠিয়েছেন সরখেলকে রক্ষা করতে। আর, আমায়—বলা থামিয়ে গ্যাস বেলুন কাঞ্জিলালের সামনে দাঁড়াল ঝকঝকে কংকালটি হয়ে। কী ভয়াবহ দৃশ্য!'

করঞ্জাক্ষ দারুমূর্তি হয়ে গেছেন। পরক্ষণে কংকালটা অদৃশ্য হয়ে একটা মস্তবড় মিশমিশে কালো বিড়াল লাফ দিয়ে টেবিলে উঠে ওঁর মুখোমুখি বসে, বিশ্রী কর্কশ স্বরে ডাক ছাড়ল, ম্যা-য়্যা-য়্যা-ওঁ। হাঁ-করা মুখের ভেতরটা টকটকে লাল—জিভটাও। চোখের পলকে মার্জার মিলিয়ে গিয়ে আবার সেই বিকটদর্শন পিপের আবির্ভাব।

স্যার, আর কিছু নমুনা দেখাব?

চোখের সামনে এইসব বীভৎস ব্যাপার ঘটলে মানুষ হার্টফেল করে বসে। সেটা না হলেও ঘেমেনেয়ে একাকার স্যার মাথা নেড়ে নিঃশব্দে 'না' বললেন। হাত বাড়িয়ে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখা জলের গেলাসটা নিয়ে ঢকঢকিয়ে খালি করে ফেললেন।

স্যার, আমার নাম ভোঁটকা। আমি যা বলব তা করতে রাজী হবেন তো?

আজ্ঞে, হবো। অবশ্যই হবো।

আমরা, মানে, চন্দ্রবিন্দুরা যে আছি স্বীকার করছেন তো?

ভোঁটকাবাবু আমায় ক্ষমা করুন। আমার অজ্ঞানতা আপনি ঘুচিয়েছেন। অ্যাদ্দিন আমি অন্ধ ছিলাম। সত্যি-সত্যিই কুয়োর ব্যাঙ হয়ে ছিলাম।

তাহলে, ওই সরখেলের ব্যাপারে—

কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক হতে রামহরি সরখেল মশায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য আমি করব। ওঁর মতো সাহিত্যিকের কদর নেই আমাদের দেশে—এই অবিচার আমি সহ্য করব না। আপনাকে আমি কথা দিলাম।

এ কথার কখনও নড়চড় হবে না তো?

আমার ঘাড়ের ওপর একটাই মাথা আছে ভোঁটকাবাবু। করঞ্জাক্ষ তোষামুদে হাসিমুখ করলেন, আপনি বাঁচলে বাপের নাম—একথা কখনো ভুলবো না।

আজকের সাহিত্য সভার যে বিবরণ—ভোঁটকার কথার মধ্যেই কাঞ্জিলাল ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, ওসব ছাইপাঁশ লেখা ছাপা হবে না। এখুনি প্রেসে ফোন করে বারণ করে দিচ্ছি। 'ভূতের ভেংচি'র লেখকের ছবি দিয়ে আর রীতিমতো প্রশস্তি করে পুরো এক কলম লিখতে বলে দিচ্ছি নিউজ এডিটরকে। কিন্তু অন্য যে সব কাগজের রিপোর্টার এসেছিল, তাদের লেখার ব্যাপারটা—

ওসব ঝুট-ছামেলা সামলাতে সমস্ত ছাপাখানাতেই ভূত আছে, নিশ্চিন্ত থাকুন। ভোঁটকা বরাভয় দেওয়ার ধরনে হাত নেড়ে বলল, দেবতা আর অপদেবতার দর্শন-লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না। তাই কি না?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যি থাকা চাই। করঞ্জাক্ষ হাত কচলে বললেন, আমি জানি সরখেল মিষ্টি খেতে দারুণ ভালোবাসে। ওর জন্যে এক হাঁড়ি ইয়া বড় বড় রাজভোগ আর এক বাক্স কড়াপাক সন্দেশ নিয়ে সকালেই হাজির হবো। ব্যাপারটা খুব মধুর আর মিলনান্তক হবে, না?

এই সুবুদ্ধিটা বজায় থাকে যেন। বলে, একটু থেমে, আঁমরাঁও যেঁন মিষ্টান্নেঁর ভাঁগ পাঁই। ভোঁটকা এই প্রথম নাকী সুরে কথাগুলো বলে খিক-খিক শব্দে হাসল। তারপর বাতাসে মিলিয়ে গেল।

ফাল্গুন ১৪০৭

রাতের মেকানিক

বসন্ত ভট্টাচার্য

একটা বিচিত্র শব্দ করে সন্তোষবাবুর গাড়িটা থেমে গেল। এধার-ওধার অনেক চাপাচাপি করেও গাড়ি আর স্টার্ট নিতে চাইল না। সঙ্গে দশ বছরের নাতি সুজয় বললে, গাড়ি আর যাবে না দাদু?

যাবে, এক্ষুনি যাবে, সোনা। তুমি বোসো।

কথার শেষে নিজে এসে গাড়ির বনেট তুলে দেখতে চাইলেন। কিন্তু দেখবেন কী? রাতের অন্ধকারে ভেতরের কোনো কলকবজাই দেখা গেল না। পকেট থেকে লাইটার বের করে যতটুকু দেখা যায় দেখলেন। সবই ঠিক আছে, অথচ গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। কিন্তু কেন?

ভাবনায় পড়লেন বেশ।

ভাবনাটা অবিশ্যি নিজের জন্য নয়। সুজয়ের জন্য।

কাল থেকে গরমের ছুটি পড়বে, তাই আজকেই ওকে হোস্টেল থেকে বাড়ি নিতে এসেছিলেন সন্তোষবাবু। ড্রাইভারকে একদিনের ছুটি দিয়ে সোজা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছেন বাঁকুড়ার এই হোস্টেলটাতে। পথের ব্যাপারটা এতটুকুও ভাবেননি তিনি।

আর ভাববেনই বা কেন?

দু'পাশে ঘন জঙ্গল চিরে তার মাঝখান দিয়ে এই যে মাইলের পর মাইল পথটা চলে গেছে, এটা তো তাঁর নিজের হাতেই তৈরি। সরকারি বড়ো ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ওঁর তদারকিতেই জঙ্গল চিরে পথটা বানানো হয়েছিল। মসৃণ পাকা রাস্তা যেন জঙ্গলের এক বন্ধুজন।

এখানকার পথ-ঘাট, দোকানপাট, ছোট-বড়ো টিলা বাড়ি সবই ওঁর নখদর্পণে। দিনের আলোয় হলে ওসব নিয়ে এতটুকু তাঁকে ভাবতে হত না। কিন্তু এ যে গভীর রাত। নিজে একা থাকলেও অতটা দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। যত ভাবনা-চিন্তা এখন ওই শিশু নাতি সুজয়ের জন্যে।

এখন তাঁর করণীয় কী ভাবতে ভাবতে একটা সিগারেট ধরালেন সন্তোষবাবু। ধোঁয়া ছেড়ে সামনে তাকাতেই দেখেন, একজন গ্রাম্যলোক হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে যতটুকু জ্যোৎস্নার আলো এসে সেখানে পড়েছে, তাতে লোকটার সাধারণ বেশভূষা ছাড়া অন্য কিছু তেমন নজরে আসে না।

কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে সন্তোষবাবু বললেন, কী চাই? রাতেও ভিক্ষে চাইতে আস?

জবাবে বিনীতভাবে সে হাতজোড় করে বললে, না সাহেব, ভিক্ষে চাইতে আসিনি। আমি মোটর মেকানিক। যদি গাড়ি সারান, তাই এলাম।

অবাক হন সন্তোষবাবু। এ যে মেঘ না চাইতে জল! তবুও প্রশ্ন করেন, জানলে কী করে আমার গাড়ি খারাপ হয়েছে?

আধো অন্ধকারেও বোঝা গেল সন্তোষবাবুর কথায় লোকটা সবজান্তার মতো হাসছে। বললে, হাই রোডে আমাদের নজর থাকে, স্যার! এখানে তো হরদম গাড়ি খারাপ হয়।

সেকি? অবাক হন সন্তোষবাবু। ব্যাপারটা কী বলো তো। এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি।

লোকটা বোধহয় আবারও হাসে। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা না গেলেও ও যে হাসছে তা বেশ বুঝতে পারা যায়।

মনে মনে বিরক্ত হন সন্তোষবাবু। মুখে কিছু না বলে সবটাই সহ্য করেন। যাক গে, মাঝরাতে তবু যে একজন মেকানিক মিলেছে এটাই ঢের! নয়তো রাতভর এখানেই পড়ে থাকতে হত।

ব্যাপারটাকে এবার সোজাভাবে নিয়ে বললেন, যাক গে, তুমি হাত লাগাও। আমি টর্চ ধরছি।

এবার যেন আর্তনাদ করে ওঠে সে। না-না স্যার, টর্চ জ্বালাবেন না। আলো লাগবে না।

অন্ধকারে সারাবে কী করে?

এবার বিজ্ঞের মতো জবাব দেয় লোকটা। বলে, মা-জননীরা অন্ধকারে ভাত টিপে দেখে হল কিনা। আমরাও আঙুল বুলিয়ে বুঝতে পারি গোলমালটা কোথায়, স্যার।

এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে না। উঁকি মেরে গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখেন সন্তোষবাবু, সুজয় সিটে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভালোই হল। জেগে থাকলে খুবই অসুবিধা হত।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

সন্তোষবাবু তাকিয়ে দেখেন গাড়ির বনেট তুলে দিয়ে লোকটা দিব্যি গাড়ির তলায় ঢুকে শুয়ে শুয়ে কী সব নাড়াচাড়া করছে। তার ঠুকঠাক শব্দও শোনা যাচ্ছে।

কোনো কথা না বলে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সামান্য দূরে খণ্ড খণ্ড আলোয় ঢাকা একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ান। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দেন, অসময়ে লোকটাকে পাবার জন্যে। এখন ভালোয় ভালোয় গাড়িটা তাড়াতাড়ি সারানো হয়ে গেলে বাঁচা যায়। সুজয়কে নিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারবেন।

দেখতে দেখতে পর পর বেশ ক'টা সিগারটে শেষ হল।

এবার আর যেন ধৈর্য রাখতে পারছেন না সন্তোষবাবু। হাঁক দিয়ে বলেন, কতদূর হল গো? রাত যে কাবার হতে চলল।

গাড়ির তলা থেকে জবাব এল, আর একটু, স্যার।

দূর থেকে উজ্জ্বল হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা লরি আসছে। রাতের অন্ধকারকে এক নিমেষে যেন দিনের আলোয় মুড়ে দিয়ে সেটা বেরিয়েও যায়। সেই আলোতে গাড়ির তলায় শুয়ে থাকা মেকানিকের পায়ের অংশটাই শুধু নজরে আসে সন্তোষবাবুর। কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো ভাঙাচোরা দুটো পা এপাশ-ওপাশ করছে।

কিছু বলার আগেই গাড়ির তলা থেকে মেকানিকের কথা ভেসে আসে। গাড়িতে বসুন, স্যার। স্টার্ট দিন। দেখতে হবে আর কোনো ঝামেলা আছে কিনা।

মেকানিকের কথা মতো সন্তোষবাবু চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। শব্দ করে চালু হল গাড়িটা। মেকানিক বললে, এগিয়ে যান, স্যার। টেস্ট করে দেখুন।

হুঁশ হল সন্তোষবাবুর, এগোবেন কী! গাড়ির নীচে যে মেকানিক শুয়ে আছে। চাপা পড়ে যাবে। বললেন, আগে তুমি বেরিয়ে এসো। তারপর স্টার্ট দেব।

দূরে একটা গাছের তলা থেকে মেকানিক বলে ওঠে, এই তো স্যার, বেরিয়ে এসেছি। অনেকক্ষণ। আপনি আসুন, স্যার।

অবাক হন সন্তোষবাবু। গাড়ির তলা থেকে ও কখনই বা বেরুল আর কখনই বা অত দূরে গাছের তলায় চলে গেল!

কিছু ভাববার আগেই মাথার উপর দিয়ে এক নিশাচর প্রাণী বিচিত্র ডাক ডেকে দূরের জঙ্গলে মিলিয়ে গেল।

গাড়িটাকে গুটি গুটি এগিয়ে গাছের কাছে আসতে চান সন্তোষবাবু। কিন্তু একি? সামনের গাছ যেন ক্রমশই পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই মেকানিক যে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে যেতে পারছেন না। এভাবে কতক্ষণ চলেছিলেন খেয়াল নেই সন্তোষবাবুর।

একসময় দেখলেন, একদা যে ব্রিজটা তিনি বানিয়েছিলেন, গাড়ি তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ভোরের আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে।

মেকানিক এবার চাদর চাপা মুখ নিয়ে এসে গাড়ির সামনে দাঁড়াল বললে, এবার চলে যান, স্যার। আর গোলমাল হবে না। গোলমাল হলে এখানে খবর দেবেন। চলে আসব। কথার শেষে একটা কাগজ ধরিয়ে দেয় মেকানিক। তারপর আর সে নেই। সকাল হতে শুরু করেছে। আলো ফুটছে।

কাগজখানা খুলে অবাক হন সন্তোষবাবু। এ যে একটা ডেথ সার্টিফিকেট। সঙ্গে আর একটা সরকারি চিঠি।

ব্রিজের পাশেই পর পর দোকানের সারি। একটুখানি চালিয়ে নিয়ে এসে একটা দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করান সন্তোষবাবু। দোকানের ভেতর থেকে একজন বেরিয়ে এসে বলে, চা দেব, স্যার? গরম চা?

বেশ আলোকিত চারপাশ। সন্তোষবাবু বলেন, দাও।

সূর্য বেশ খানিকটা উপরে উঠে গেছে। দোকানি চা নিয়ে এসে দেয়। গরম চা ধোঁয়া ছড়াচ্ছে। চায়ে চুমুক দিয়ে যেন সমস্ত ক্লান্তি চলে যায় সন্তোষবাবুর।

এবার মেকানিকের দেওয়া কাগজ দুটোতে নজর দেন তিনি। ডেথ সার্টিফিকেটে নাম দেখেন শঙ্কর বিশ্বাস! সঙ্গের চিঠিটাতে চোখ বোলাতেই চমকে ওঠেন তিনি। এ যে তাঁরই সই করা এক সরকারি চিঠি। ক্রেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য টাকা নেবার জন্যে শঙ্কর বিশ্বাসের পরিবারকে লেখা নিজের সই করা চিঠির জেরক্স কপি।

মুহূর্তেই ঘটনাটা মনে পড়ে যায় তাঁর।

পাশের ব্রিজটা তৈরির সময় ক্রেন ছিঁড়ে দু'পা পিষে গিয়েছিল একজন মেকানিকের। সেই শঙ্কর বিশ্বাসই তাঁর গাড়ি সারিয়ে দিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। আশ্চর্য ব্যাপার!

ওর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে অনেক লেখালেখি করে টাকা আদায় করে দিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। বোধহয় সেই কৃতজ্ঞতায় আজ সে গাড়ি সারিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

আষাঢ় ১৪১৯

কাটা মুণ্ডু রহস্য

প্রবোধ নাথ

টিঙটিঙে লোকটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে তাজ্জব রণতোষ। পঞ্চাশ টাকা 'পাস'-এর পুকুরে কেউ বিকেল পাঁচটায় ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে আসে? আর সারা পুকুর চক্কর মেরে বসলো কিনা এমন এক জায়গায়, যেখানটা পকুরে জনা পঞ্চাশ মাছ ধরতে আসা মানুষের একজনেরও পছন্দ হয়নি। রাজ্যের জঞ্জালের ডাঁই জমা করা ওখানে। তা ছাড়া ওইখানটায় পড়ে ছিল মুণ্ডুহীন আস্ত একখানা মাছের কাঁটা, চিল-শকুনেই হয়তো এনে ফেলেছে। আর পুকুরপাড়ে মাছের কাঁটা পড়ে থাকা মাছধরিয়েদের সংস্কারে এক নম্বরের শত্রু। অমন অলক্ষুণে জায়গায় ছিপে মাছ ওঠার কোনো কথাই নয়, অথচ তাজ্জব-কি-বাত, ছিপ ফেলার দশ মিনিটের মধ্যে দু'খানা পেল্লাই সাইজের মাছ গাঁথলো লোকটা।

রণতোষ সকাল ন'টায় ঢুকে খেলানো 'চার' ফেলে বসেছিল হা-পিত্যেশ করে। প্রায় পাঁচটা। ছিপ হাতে টিঙটিঙে লোকাট ঢুকলো। সারা পুকুরটা একবার চক্কর দিল। ওর বাঁ দিকে যেখানে পেল্লায় মাছের মুণ্ডুহীন কাঁটাটা পড়েছিল, হেলায় তুলে কাঁটাখানা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে জলে ছিপ নামালো। আর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে কিলো তিনেক সাইজের দুটো রুই তুলে লাল শালুতে বেঁধে সাদামাঠা মুখে বেরিয়ে গেল পুকুর থেকে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব! যেখানে রণতোষের মতো পাকা মেছুরে সারা দিনে চারটে একশো গ্রামের রুই-চারা ছাড়া অন্য কিছু গাঁথতে পারেনি, সেখানে অমন বেঢপ জায়গায় 'চার' ছাড়া বসে দশ মিনিটেই দুটো তিন কিলোর রুই! নাঃ! ব্যাপারটা ভাবতে হচ্ছে, লোকটার সম্বন্ধে খোঁজখবরও নিতে হচ্ছে। তবে রণতোষ পাড়ায়-বেপাড়ায় এত যে 'পাস'-এর পুকুরে মাছ ধরে বেড়ায়, কোথাও লোকটাকে দেখেছে বলে মনে হল না। লোকাট কি মাছ ধরার কোনো বশীকরণ মন্ত্র-তন্ত্র জানে নাকি?

পরের দিনও একই ঘটনা। তবে আজ জায়গা পাল্টেছে। আজ যে জায়গায় বসেছে, রণতোষের বিশ বছরের অভিজ্ঞতা বলছে, মাছ সেখানে থাকতেই পারে না। রণতোষ জানে, পুকুরের যেখানে কাঁকড়া থাকে, বড় মাছ তার কাছাকাছি ঘেঁষে না। সকালে রণতোষ ওই জায়গায় বেশ কিছু কাঁকড়াকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছে। আজও লোকটা ঢুকলো পাঁচটার ঠিক মিনিট দশেক আগে। সারা পুকুর একবার চক্কর দিয়ে পছন্দ করলো ঠিক সেই জায়গাটা, যেখানে রণতোষ এক ঝাঁক কাঁকড়া ভাসতে দেখেছে। আর ওখানেই, পুকরধারে পড়েছিল পেল্লায় সাইজের মুণ্ডুহীন মাছের কাঁটা। আর কাঁটাটাও অদ্ভুত! একেবারে টাটকা। যেন সদ্য কেউ কাঁটার গা থেকে মাছের অংশ পরিষ্কার করে খেয়ে কাঁটাটা ছুঁড়ে ফেলেছে এখানে। মুণ্ডুহীন প্রায় তিন কিলো সাইজের মাছের টাটকা কাঁটা। চিল-শকুনে ওখানে এনে ফেলেছে বলে মনে হয় না। কারণ ওরা কাঁটাও খায়। আজও সেই কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দশ মিনিটের মধ্যে দুটো প্রায় তিন কিলো ওজনের মাছ ধরে লাল শালুতে বেঁধে লোকটা পুকুর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সাদামাঠা মুখে।

হুইল গোটাতে গোটাতে রণতোষ ভাবলো এটা কী করে হয়। বেশ, লোকটা যদি মাছ ধরার কোনো মন্ত্র-তন্ত্র জেনেই থাকে তবে তো যে কোনো দিন সকাল নটায় পুকুরের গেট খোলার সময় এসে, সারা দিনে পুকুরের বড়ো বড়ো সব মাছ ধরে নিয়ে যেতে পারে! কিন্তু তা তো করে না

লোকটা। আসে ঠিক পাঁচটার মিনিট দশেক আগে। সারা পুকুর চক্কর মেরে বসে এমন জায়গায় যে জায়গাটা সকলের না-পসন্দ, কাজেই জায়গাটাও ফাঁকাই থাকে। তবে সেই জায়গাটায় একটা বড় সাইজের মাছের কাঁটা পড়ে থাকে। ছিপ ফেলে মিনিট দশেকের মধ্যে দুটো মাছ ধরে। যেন দুটো মাছই ওর বরাদ্দ। মাছ দুটো ধরার পর আর ও দেরি করে না। লাল শালুতে মাছ দুটো জড়িয়ে বেরিয়ে যায়। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলো রণতোষ। কিন্তু রহস্যটা যে কী তা বুঝতে পারলো না। তবে ওর মনে হল মাছের কাঁটাটা পড়ে থাকার মধ্যে কোনো রহস্য থাকতে পারে।

পরদিন নিজের চার করে রাখা জায়গায় বসার আগে সারা পুকুরটা একবার ভালো করে চক্কর মেরে দেখে এলো। নাঃ! কোথায়ও মাছের কাঁটা দেখতে পেল না। রণতোষ ভাবলো, ভালোই হয়েছে, দেখা যাক আজ লোকটা কী করে! আজ রণতোষের মাছ ধরার দিকে মন নেই। বারবার লোকটার কথাই মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

আজও লোকটা এলো পাঁচটা বাজার মিনিট দশেক আগে। সারা পুকুরটা চরকিপাক দিয়ে দাঁড়ালো রণতোষের পশ্চিমে হাত পঁচিশ দূরে। ওখানে অনেকটা জায়গাই ফাঁকা, কেউ বসেনি। আর আশ্চর্য! ওখান থেকেই একটা মাছের কাঁটা তুলে ছুঁড়ে দিল পুকুরের জলে। কিন্তু রণতোষ যখন সকালে পুকুরের চারধারে ঘুরে এসেছিল তখন কোনো মাছের কাঁটা দেখতে পায়নি। আর আজও সেই আগের দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দশ মিনিটেই দুটো মাছ ধরে বেরিয়ে গেল পুকুর থেকে। রণতোষ অবশ্য আজ তৈরিই ছিল। সবকিছু ও আগেই গুছিয়ে নিয়েছিল। লোকটার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে ডাকলো—এই যে দাদা শুনছেন?

লোকটা ফিরেও তাকালো না।

—এই যে দাদা, আমি ডাকছি।

লোকটা একবার পিছন ফিরে তাকালো। নাকের বাঁশিতে ফুঁ-ফুঁ তাচ্ছিল্যের আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে। এরকম যে হতে পারে, রণতোষ সেটা ভেবেই রেখেছিল। আর এটাও ঠিক করে রেখেছিল, লোকটাকে ফলো করে আজ জানবে এখান থেকে লোকটা কোথায় যায়, কোথায় থাকে আর পরিচয়টাই বা কী? যথেষ্ট আড়ালে থেকে রণতোষ লোকটাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

পুকুর থেকে বেরিয়ে লোকটা যে রাস্তা ধরেছে, সে রাস্তাটা বনবিবিতলার মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যাবাজার ছুঁয়ে চলে গেছে রেলস্টেশনের দিকে। বনবিবিতলার আগে ও পরে দুটো ছোট বসতি আছে বটে, কিন্তু লোকটা সেখানকার নয়। হলে রণতোষ চিনতো। হতে পারে রেললাইনের ধারের নতুন বসতির কেউ। ওপার বাংলার বহু মানুষ ওখানে বসবাস শুরু করেছে কিছুদিন হল।

রণতোষের ধারণা, লোকটা এখন সন্ধ্যাবাজারে যাবে। কারণ কোনো মানুষেরই নিত্যদিন অত মাছ লাগতে পারে না। মাছ ওকে বিক্রি করতেই হবে। মাছ বিক্রির আদর্শ জায়গা সন্ধ্যাবাজার।

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছন ফিরে তাকালো। লোকটা কি রণতোষকে দেখে ফেলেছে? রণতোষ সাবধান হল। এখান থেকে সন্ধ্যাবাজারে যাওয়ার আর একটা রাস্তা আছে। ওই রাস্তাটা পাকা এবং বিজলি বাতি আছে, তবে একটু বেশি হাঁটতে হয়। বনবিবিতলার রাস্তাটা বেশ নির্জন, আলো নেই, বিশাল বিশাল গাছ। ওই রাস্তাটার বদনাম আছে বলে সন্ধের পর সাধারণত কেউ বনবিবিতলার পথ মাড়ায় না। লোকটা সন্ধ্যাবাজারে যাওয়ার জন্যে বনবিবিতলার শর্টকাট রাস্তা ধরলো। বাব্বাঃ! সাহস আছে বটে লোকটার!

রণতোষ পাকা রাস্তা ধরে দ্রুত হেঁটে সন্ধ্যাবাজারে পৌঁছে দেখে, লোকটা একটা মাছের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লাল শালু থেকে মাছ বার করে এবার চাপালো দোকানদারের দাঁড়ি-পাল্লায়।

একি! দুটো মাছ কোথায়! রণতোষ দেখলো, পাল্লায় চাপানো আছে কিলো তিনেক সাইজের একটা আস্ত রুই মাছ আর একটা ওই রকম মাপের মাছের শুধু মুড়ো। লোকটা ধরেছিল দুটো মাছ। একটা মাছ ঠিক আছে, কিন্তু অন্য মাছটার শুধু মুড়ো কেন? তা হলে মাছের শরীরটা কী হল? শুনল দোকানদার বলছে—

—রোজ রোজ এ রকম আলাদা একখানা মুড়ো নিতে আমার অসুবিধে হয়।

—তা বলে আমি তো আর বাড়ির মানুষদের মাছ খাওয়া বন্ধ করে সেই মাছ আপনার কাছে বেচতে পারি না। আপনার পোষায় নেবেন নয়তো অন্য কারও কাছে বেচবো। এই বাজারে তো দোকানের অভাব নেই।

—আরে না-না!—লোকটা ব্যস্ত হয়ে বললো—ঠিকই তো! আপনি আপনার বাড়ির লোকের জন্যে মাছ রেখেই তো বিক্রি করবেন। আর রোজ রোজ অত বড় মাছের মাথা খেতে কারইবা ভালো লাগে! না দাদা, মাছ আমিই নেব। ওটা একটা কথার কথা। এই নিন আপনার মাছের দাম।

টিঙটিঙে লোকটা হাত পেতে টাকা নিল। রণতোষ ঠিক করলো লোকটা কোথায় থাকে সেটা দেখতে হবে। লোকটা বাজার থেকে বেরোনোর মুখে এমন একাট কাণ্ড করলো যা দেখে ওর আক্কেল গুড়ুম। মাছের বাজারের বাইরে রাস্তার ধারের একটা মাছের দোকান থেকে দুশো কাটা মাছ টুকরো করে কেটে প্যাকেটে ঝুলিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটা ধরলো। রণতোষ ব্যাপার দেখে একেবারে ভ্যাবলা। এমন কি লোকটাকে ফলো করতেও কোনো উৎসাহ পেল না।

বাড়ি ফিরে সমস্ত ঘটনা পর পর সাজিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলো। লোকাট দোকানদারকে বলেছে, মাছ সে বাড়ির লোকেদের জন্য রেখে তার মুড়োটা বেচার জন্যে নিয়ে এসেছে। আলাদা আস্ত একটা মাছ অবশ্য আছে। মুণ্ডু কেটে এনে মাছ যে বাড়িতে রেখে আসার কথা বলেছে টিঙটিঙে লোকটা, সেটা ডাহা মিথ্যে কথা। কারণ যে অল্প সময়ের মধ্যে ও বনবিবিতলা দিয়ে হেঁটে সন্ধ্যাবাজারে এসেছে, ওই সময়ে অত কিছু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া লোকটা তো ওদিকে থাকে না। তার চেয়ে বড় কথা, মাছ বিক্রি করার পর সে দুশো কাটা মাছ কিনে বাড়ির দিকে হাঁটা দেবে কেন? লোকটার সংসারের অবস্থা ভালো নয়, তা বোঝা যায় দুশো গ্রাম মাছকে আট টুকরো করা দেখেই। হয়তো মাছ বিক্রির টাকায় ওর সংসার চলে। সে নয় ঠিক আছে। কিন্তু কাটা মুণ্ডুর রহস্য কী? আর পুকুরধারে অত বড় মুণ্ডুহীন মাছের কাঁটা পড়ে থাকার রহস্য কী? নানা ভাবে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলো রণতোষ। ঠিক করলো আগামী কাল এ রহস্যের কিনারা করতেই হবে।

পরদিন সাড়ে চারটে বাজতে পুকুরে মাছ ধরতে ঢুকলো রণতোষ। রণতোষের ধারণা মাছের কাঁটাটা সকালের দিকে থাকে না। থাকলে কাক বা কুকুরে খেয়ে নিত। কাজেই মাছের কাঁটাটা যেকরেই হোক পুকুরপাড়ে আসে বিকেলের দিকে, টিঙটিঙে লোকটা পুকুরে ঢোকার কিছুক্ষণ আগে। রণতোষ প্রথম চক্কর মারার সময় পুকুরের পাড়ে কোথাও মাছের কাঁটা দেখতে পেল না। কিন্তু দ্বিতীয় চক্কর মারার সময় একটা বিচ্ছিরি জায়গায় বিশাল একটা মুণ্ডুহীন মাছের কাঁটা দেখতে পেল। আর তখনই দেখলো বিশাল পুকুরের উত্তরদিকের গেট দিয়ে সেই টিঙটিঙে লোকটা মাথা নিচু করে ঢুকছে। রণতোষ ততক্ষণে মাছের কাঁটাটা জলে ফেলে ছিপ নামিয়েছে। লোকটা চক্কর দিতে দিতে রণতোষের পিছন দিয়ে কী খুঁজতে খুঁজতে আবার এগিয়ে গেল উত্তর দিকে। লোকটা আর এক চক্কর মারার আগেই দুটো তিন কিলো সাইজের রুইমাছ তুলে লাল শালুতে চড়িয়ে নিয়েছে রণতোষ। মাছ ধরার 'হুইল-ছিপ'-টাকে খুলে ছোট করে নিল। এবার ডান হাতে 'হুইল-ছিপ', বাঁ-হাতে লাল শালুতে বাঁধা জোড়া মাছ নিয়ে পুকুর থেকে বেরিয়ে এল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো টিঙটিঙে লোকটা তখনও সারা পুকুরপাড়ে কী যেন খুঁজছে।

পুকুর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলতে চলতে আনন্দে আর শঙ্কায় বুকটা উদ্বেল হয়ে উঠলো

রণতোষের। কিন্তু এত বড় ঘটনাটা ঘটলো কীভাবে? ঘটনাটা অলৌকিক না ভৌতিক? সামনে জগার চায়ের দোকানে বসে এক কাপ চা নিয়ে এই সবই ভাবতে লাগলো রণতোষ। বিকেল শেষ হয়ে গেল। এবার সন্ধ্যা নামবে। রণতোষ উঠে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

রণতোষ ভাবনায় বিভোর হয়ে হাঁটছিল বলে খেয়াল করেনি, নিজের অজান্তেই কখন বাড়ির রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে একেবারে বিপরীত রাস্তায়—যে রাস্তা সোজা চলে গেছে বনবিবিতলা ছুঁয়ে, সন্ধ্যাবাজার হয়ে স্টেশনের দিকে। অনেকটাই এসে পড়েছে রণতোষ। সামনে বড় বড় গাছ। সে গাছের গোড়া থেকে অন্ধকার উঠে যেন গাছগুলোকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। সামনে আর কিছুটা গেলেই বনবিবির মন্দির। খুব প্রয়োজন না পড়লে সহজে কেউ সন্ধের পরে এ রাস্তায় আসে না। একটু দাঁড়ালো রণতোষ, পরে বাড়ি ফেরার জন্যে পা বাড়ালো। আর তখনই শুনল কে যেন খস্‌খসে গলায় বলছে—দাঁড়া। এতটা এসে আবার যাচ্ছিস কোথায়?

চারদিকে তাকালো রণতোষ। কাউকে দেখতে পেল না।—তুই তো খুব চালাক ছোকরা রে। এত সব বুঝলি কী করে? আর ওই টিঙটিঙেটা তো একেবারেই মাথা মোটা। মাথা মোটা আর কিপ্‌টে। এত যে বড়ো বড়ো মাছ ধরে, কোনো দিন একটা বাড়ি নিয়ে গেল না। সব বেচে ওই দুশো গ্রাম কাটা পোনা। কোথায় একটা জুটমিলে কাজ করতো, মাছের লাইন পাওয়ার পর চাকরিটাও ছেড়েছে। সারা দিন পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আর বিকেলে মাছ ধরে তা বিক্রি করে সংসার চালায়। তুই তো মাস্টারি করিস—হাইস্কুলে? ভালোই পড়াস, সুনাম আছে। বুদ্ধিও খুব। এবার আমি তোর বুদ্ধির পরীক্ষা নেব। যদি পাশ করতে পারিস তবে এখানে যতদিন আছি মাছের লাইনটা তোকেই ধরাবো। দে, তার আগে আমার পাওনাটা দে।

পাওনা! মনে মনে হিসেব করে নিল রণতোষ। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ডান কাঁধে ঝোলানো মাছ ধরার সরঞ্জামের ব্যাগে এক বড় ছুরি আছে। লাল শালু থেকে একটা মাছ বার করে ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটা কেটে শুধু মাছের ধরটা দু'হাতে তুলে ধরলো শূন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাতটা ফাঁকা হয়ে গেল।—বাঃ! এই না হলে বুদ্ধি? প্রথম পরীক্ষায় পাশ করেছিস। তবে পুকুরপাড়ে মুণ্ডুছাড়া মাছের কাঁটা দেখে, টিঙটিঙেকে সন্ধেবেলায় এখানে আসতে দেখে কি মাছের দোকানে মুণ্ডুহীন মাছ বিক্রি করতে দেখে, তুই বুদ্ধি খাটিয়ে বার করেছিস আমাকে কী পাওনা দিতে হবে। এটাও কম নয়। এতে আমি খুশি, কিন্তু আমি তোর আরও একটা পরীক্ষা নেব। দেখ, বেঁচে থাকতে আমিও ছিলাম পাকা মেছুরে। এমন এমন মাছের চার জানি যা অনেক বাঘা বাঘা মেছুরেরাও জানে না। যদি পরের পরীক্ষায় পাশ করতে পারিস তবে সেই সব মাছের চার তোকে শিখিয়ে যাব। আর আমি তো বনবিবিতলায় বেশিদিন থাকবো না। আমারও যাওয়ার সময় হয়েছে। এবার বল, মুণ্ডুসহ মাছ আমি খাই না কেন? অবশ্য খাই যদি জালে ধরা হয়। কিন্তু ছিপে ধরা কখনই নয়।

—ভয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল রণতোষ।

—হ্যাঁ। ভয়ে। ঠিকই বলেছিস—ভয়ে। কিন্তু কিসের ভয়, কেন ভয় তা তো বলতে হবে।

রণতোষের মাথা এখন পরিষ্কার। চিন্তা করতেই উত্তরটা যেন একেবারে সাজানো হয়ে গেল, বলল—লোহার ভয়ে।

—হ্যাঁ এটাও ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা ভেঙে বল।

—আমরা জানি রামনাম আর লোহা—দুটোই আপনারা এড়িয়ে চলেন। আজও শ্মশানযাত্রীরা শ্মশান থেকে ফিরলে বাড়ির লোক লোহাস্পর্শ করিয়ে দোষ কাটায়। শুনেছি পাড়াগ্রামে আপনাদের ভয়ে অনেকে পকেটে লোহা নিয়ে ঘোরে। তাই তো?

—বেশ তারপর?

—ততো আগে আপনি সব মাছই মুড়ো সহ খেতেন, আজকাল ছিপে ধরা মাছের মুড়ো বাদ

দিয়ে খান, কারণ কোনো একদিন হয়তো ছিপে ধরা মাছের মুড়ো খেতে গিয়ে মুড়োর মধ্যে বঁড়শি পেয়েছিলেন। এরকম হয়। আমিই কতবার পেয়েছি।

—ওঃ! একেবারে ঠিক। বলিহারি তোর বুদ্ধি। শোন তখন আমি অন্য জায়গায় থাকি। হারান বলে একজন আমাকে মাছ যোগান দিত। একদিন পেল্লায় মাপের একাট রুইমাছ এনে দিল। মাছটা পছন্দের মাছ। তা যেমনি মুড়োটায় দাঁত বসিয়েছি অমনি সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। যাকে বলে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। অনেক কষ্টে সে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি। সেই থেকে ছিপে ধরা মাছের আমি মুড়ো খাই না। যাক, তুই পরীক্ষায় একশোতে একশো পেয়েছিস। তুই গোয়েন্দা হলে বড়ো গোয়েন্দা হতে পারতিস। সে যাক, এই পাসের পুকুরে মাছ ধরা তো কালকেই শেষ। এরপরে পাস দিচ্ছে পোদ্দারদের পুকুরে। ওখানে বড় বড় কাতলা আছে। তুই ওখানে টিকিট কাট।

—বলছেন?

—হ্যাঁ। ওখানে আমার হয়ে তুইই কাজ করবি। ওখানে 'মাছের কাঁটা' নয়, অন্য ভাবে সাজাবো। সে আমি সময় মতো বলে দেব।

—আমাকে যে মাছের চার শেখাবেন বলেছিলেন?

—শেখাবো, যাবার আগে শিখিয়ে যাব। এমন চার শেখাবো যে সারা পুকুরের লোক তোর মাছ ধরা দেখে অবাক হয়ে যাবে। আর তুই-ও বাকি জীবন মাস্টারি আর মাছধরা নিয়ে আনন্দে, সুখে কাটিয়ে দিতে পারবি। যা, এবার বাড়ি যা। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামতে চলেছে।

অগ্রহায়ণ ১৪১২

ডাকবাংলোর রহস্য

জয়ন্ত বসু

রোববার সকালে আড্ডাটা জমে উঠেছে। একথা, সেকথার পর সুপ্রিয় হঠাৎ বলল, ক'দিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে আসলে কেমন হয়? শুনেই সুবীর আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আমি বললাম, কোথায়? পুরী!

না কাছাকাছি কোথাও। গাড়িতে যাব। বনমালীকে বলবো, ও একটা ভালো জায়গা দেখে নিয়ে যাবে।

বনমালী হচ্ছে সুপ্রিয়দের বহুদিনের পুরনো ড্রাইভার। আমি, অজিত আর সুবীর তিনজনেই রাজী হয়ে গেলাম। সুপ্রিয় বলল, তাহলে পরশু ভোরেই আমরা স্টার্ট করব।

ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ছুটে চলেছে আমাদের অ্যাম্বাসাডার। দলের সদস্য সংখ্যা আমরা চার বন্ধু আর ড্রাইভার বনমালীকে নিয়ে পাঁচ। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। সুপ্রিয় গান গাইছে, ওর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও গাইছি। বেলা ৮-৩০ মিনিটে পৌঁছলাম বারকোটে। ওখানে একটা ধাবায় টিফিন পর্ব সেরে আবার বেরিয়ে পড়লাম।

ছয় নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে দিয়ে, ডান দিকের একটা রাস্তা ধরল বনমালী। রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় দেড়ঘণ্টা যাওয়ার পর একটা ডাকবাংলোর সামনে এসে বনমালী গাড়ি থামাল। আমরা নেমে পড়লাম।

ডাকবাংলোর গেটে ছোট একটা তালা ঝুলছে। ধারে কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা চারপাশটা দেখতে লাগলাম। লনটা যত্নের অভাবে ঘাসের জঙ্গল হয়ে আছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছেঁড়া কাগজ, প্লাস্টিক আর ভাঙা কাচের টুকরো। বাংলোটা পরিত্যক্ত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। তিনদিকে পাহাড় আর বনজঙ্গল। সামনে ব্রাহ্মণী নদী। রেঙ্গালী ড্যামের জলাধার। তাকে ঘিরে কয়েকটা সবুজ পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উন্মুক্ত নীল আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা উড়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে। একদল পাখি ডাঙায় বসে রোদ্দুরে গা শুকোচ্ছে। দেখলে মনে হবে যেন পাখিদের মেলা বসেছে। অজিত তাড়াতাড়ি কয়েকটা ছবি তুলে নিল। সুবীর চিৎকার করে বলে উঠল, ফ্যানটাস্টিক।

বনমালী গাড়ির কাছে আছে। নদীর পাড়ে বসে আমরা গল্প করছি। এমন সময় বনমালী চেঁচিয়ে বলল, ছোটবাবু, চৌকিদার এসেছে। আমরা উঠে এলাম।

চৌকিদারের বয়স বেশি নয়, বাইশ-তেইশ হবে বড় জোর। কালো, রোগা, মাথার চুল কদমছাঁট। ছোটখাটো চেহারা। সাইকেলটা একপাশে রেখে আমাদের হাতজোড় করে নমস্কার জানাল। বলল, আমার নাম শংকর মুণ্ডা। আপনারা কোথা....। ওর মুখের কথা শেষ হতে পারেনি, তার আগেই বনমালী বলল, আমরা সম্বলপুর থেকে আসছি। এখানে কয়েকদিন থাকব। বনমালীর কথায় শংকর মুণ্ডা ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকাল। আমি বললাম, তোমাদের এই ডাকবাংলোটা দেখে মনে হচ্ছে কস্মিনকালেও এখানে কেউ আসে না।

আগে অনেকে আসতেন বাবু, দিনের পর দিন থাকতেন। এখন অবশ্য বিশেষ কেউ আসেন না। যদিও আসেন সন্ধের আগেই চলে যান।

তালা-টালা খুলে সব ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে করতে শংকর মুণ্ডা বলল, আমি কিন্তু রাত্তিরবেলায় থাকব না। সন্ধের আগেই গাঁয়ে ফিরে যাব। আমি একটু ভিতু প্রকৃতির, তাই জিজ্ঞেস করলাম, কেন? রাত্তিরবেলায় এখানে কোনো অলৌকিক ঘটনা-টটনা ঘটে নাকি? আমার কথা শুনে সুবীর গলা চড়িয়ে বলল, ডেন্ট কেয়ার! ও না থাকে, তাতে কি হয়েছে। আমরা তো আছি। ভয় কিসের! শংকর রাত্তিরবেলায় কেন থাকবে না, তা আর জানা হলো না।

বেলা হয়েছে। আমরা নদীতে স্নান করতে গেলাম। সাঁতার কেটে দাপিয়ে স্নান করে ফিরে এলাম। ঘর থেকে পাঁউরুটি, ডিমসিদ্ধ, কলা আর মিষ্টি আনা হয়েছে। ওই দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম, রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা বনমালী করবে। শংকর মুণ্ডা দুটো মুরগি কিনে নিয়ে এল ওদের গ্রাম থেকে।

আমরা পাশের জঙ্গলের ভেতর ঢুকলাম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম। গাছে গাছে পাখিরা গান গাইছে। বেশ কিছুটা যেতেই সুন্দর একটা ঝরনা দেখতে পেলাম। প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের ওপর।

নদীর ঘাটে কয়েকটা নৌকো দাঁড়িয়েছিল। তারমধ্যে একটা নৌকো ভাড়া করে, বেশ কিছুক্ষণ নৌবিহার করে ঘাটে ফিরলাম। অজিত এর মধ্যে টেলিলেন্স লাগিয়ে দূরের কয়েকটা ছবি তুলে নিল। ধীরে ধীরে দিনের আলো কমে আসছে। পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলাধারের ওপর। অজিত তাড়াতাড়ি সূর্যাস্তের কতগুলো ছবি তুলল।

সূর্য পুরোপুরি ডুবে যেতে আমরা ডাকবাংলোয় ফিরলাম। সন্ধের আগেই শংকর মুণ্ডা তার গাঁয়ে চলে গেছে। ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল চারদিক। দূরে ড্যামের ওপর সারি সারি হ্যালোজেন বাতিগুলো জ্বলে উঠল।

রাত ন'টার মধ্যেই রান্না হয়ে গেল। বনমালী একলাই সব করেছে। গরম গরম মুরগির মাংস আর ভাত খেয়ে, আমরা শুয়ে পড়লাম। বনমালীর রান্নার হাত ভালই। ক্লান্ত লাগছিল, তাই শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত তখন কত জানি না হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখি পাশে সুবীর নেই। ও আমরা পাশেই শুয়ে ছিল। গেল কোথায়? হ্যারিকেনের অল্প আলোতে দেখি দরজা হাট করে খোলা। আমার ভয় লাগল। তাড়াতাড়ি সুপ্রিয় আর অজিতকে ডাকলাম। বনমালী পাশের ছোট ঘরটাতে শুয়েছিল। অঘোরে ঘুমচ্ছিল। অনেক ডাকাডাকির পর ওর ঘুম ভাঙল। শুনে বনমালী অবাক। টর্চের আলো ফেলে ডাইনিং, কিচেন, সিঁড়ির ঘর, ছাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সুবীরের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। লনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওকে ডাকতে লাগলাম। তিনজনের ব্যাকুল গলা পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সুবীর...সুবীর...সুবীর...।

নিরুপায় হয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকলাম। অন্ধকার এতই গাঢ় যে, টর্চের আলো বেশিদূর পর্যন্ত যাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে অনেকটা ভেতরে চলে এলাম। রাত তখন থমথম করছে। নিশাচর পাখিদের চিৎকার হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। আর বেশিদূর পর্যন্ত যাওয়ার সাহস হলো না, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে, নদীর ঘাটে টর্চের আলো ফেলে ভালো ভাবে চারদিক দেখতে লাগলাম। কারুর মুখে কোনো কথা নেই, ভয়ে আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেছে। দরদর করে ঘামতে লাগলাম। জানি সাহসী বলে সুবীরের নাম আছে। শুধু সাহসী নয় দুঃসাহসী। একবার তো আমার সঙ্গে মোগলাই পরোটা আর কষা-মাংসর বাজি ধরে ও একটা ভুতুড়ে বাড়িতে সারা রাত কাটিয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চললাম। কিছুটা আসতেই হঠাৎ চোখ

পড়ল মস্ত এক তেঁতুল গাছের তলায় কে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। রাতের অন্ধকারে টর্চের আলোয় চিনতে এতটুকু ভুল হলো না।

তেঁতুল গাছের কাছে আসতেই একাট চাপা গোঙানির শব্দ বাতাসে মিশে গেল। সুবীর লুটিয়ে পড়ে আছে মাটির ওপর। ওকে তুলে নিয়ে আসা হলো। বনমালী জল এনে, ওর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলল সুবীর। ওর জ্ঞান ফিরেছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

এর মধ্যে কখন ভোর হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। ধীরে ধীরে সূর্য উঠতে লাগল। শংকর মুণ্ডা এসে অবাক দৃষ্টিতে দেখছে সুবীরকে। গত রাতের ঘটনা শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে সে বলল, ভগবানের অনেক কৃপা যে বাবুকে জীবিত পেয়েছেন।

কেন, এর আগে এ রকম কিছু ঘটনা ঘটেছিল কি? উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

শংকর মুণ্ডা একটু সময় চুপ করে থেকে, তারপর বলল, হয়েছিল বইকি! তখন নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার কাজ চলছিল। দূর-দূরান্ত থেকে বড় বড় সব ঠিকাদাররা এসেছিল। মেন ক্যানেলের ঠিকাদার এই বাংলোতে থাকতো। তখন বাবা এই ডাকবাংলোতে কাজ করতেন। দিন-রাত ক্যানেলের কাজ চলছে। ডাকবাংলোয় সব সময় ভিড় থাকত।

যেখানে ক্যানেলের গেটগুলো বসানো হয়েছিল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেখানে কংক্রিট ফেটে গিয়ে বড় বড় ফাটল ধরে তারপর ধসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিকাদার ফাটলগুলো মেরামত করতে লাগল। কিন্তু ফাটল আর বন্ধ করা যাচ্ছে না। এপাশের ফাটল মেরামত করতে গিয়ে দেখা গেল, ওপাশে ফাটল ধরে ধসে যাচ্ছে। ইঞ্জিনিয়ারবাবুরাও সব দেখেশুনে ঠিক বুঝতে পারছেন না, ফাটল ধরার কারণ কী? ক্যানেলের কাজ বন্ধ রেখে, হঠাৎ ঠিকাদার কোথায় চলে যায়।

প্রায় পঁচিশ দিন পরে ঠিকাদার ফিরে এলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাজ আর আরম্ভ করল না। বড়দের মুখে শোনা কথা, অমাবস্যার রাতে ঠিকাদার নাকি ওখানে নরবলি দিয়ে মহাপুজো করেছিল। সে যাই হোক, কিছুদিন পর থেকে ঠিকাদার আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ করল। আগের মতো কাজ চলতে লাগল। ফাটল মেরামত হলো। নতুন করে আর ফাটল ধরল না।

এইসব ঘটনার একমাস পরের কথা। লোকের মুখে মুখে খবর পেয়ে, অনেক দূরের কোনো এক গ্রাম থেকে এক বুড়ো এল। ঠিকাদারের কাছে গিয়ে বুড়ো অনুনয় করে বলল, বাবু, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। ঠিকাদার বিস্মিত হয়ে বলল, তোর ছেলে এখানে কোথায়? ঠিকাদারের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বুড়ো বলল, তোমার লোকরা আমার ছেলেকে চুরি করে এনেছে। আমার সোনার টুকরো ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। ঠিকাদার চড়া গলায় বলল, পাগল কোথাকার! এখানে তোর ছেলে কোথায়! তোর ছেলে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি শুনেছি বাবু, তোমার লোকরা আমার সোনার টুকরো ছেলেকে চুরি করে—

ওর মুখের কথা শেষ হতে পারেনি, ঠিকাদার রেগে গিয়ে বলল, এই কে আছিস! এই পাগল বুড়োটাকে মারতে মারতে এখান থেকে তাড়িয়ে দে। আর যেন এদিকে না আসে। বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবু, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। বুড়োকে ধাক্কা মারতে মারতে ওখান থেকে তাড়িয়ে দিল। বুড়ো যেতে যেতে বলতে লাগল, ঠিকাদার, তুই আমার ছেলেকে চুরি করেছিস। তোকে আমি ছাড়বো না....ছাড়বো না.......ছাড়বো না।

কিছুদিন পর বুড়োকে আবার দেখা গেল ডাকবাংলোর সামনে। ও আর নিজের গ্রামে ফিরে যায়নি। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে ও পাগল হয়ে যায়। যাকেই দ্যাখে, তাকেই বলে, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। গ্রামবাসীরা বলতে লাগল, ঠিকাদার নিশ্চয় ওই বুড়োর ছেলেকে চুরি করে এনে,

বলি দিয়ে মহাপুজো করেছিল। তাই ছেলের শোকে বুড়ো পাগল হয়ে গেছে। কিছুদিন পরে দেখা গেল বুড়োটা ওই তেঁতুল গাছের তলায় মরে পড়ে আছে।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরের কথা। একদিন সকালে দেখা গেল, তেঁতুল গাছের তলায় ঠিকাদার মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ঠিকাদার মারা যায়। ডাকবাংলো অনেকদিন খালি পড়ে ছিল। একদিন দুপুরে এক ইঞ্জিনিয়ারবাবু এলেন। তিনি এখানে থেকেই কাজ দেখাশুনা করতে লাগলেন। তখন আমি রোজ সকালে ডাকবাংলোয় এসে বাবার সঙ্গে কাজ করতাম। আবার সন্ধের আগেই গাঁয়ে ফিরে যেতাম। রোজকার মতো সেদিন সকালেও ডাকবাংলোয় আসছিলাম। তেঁতুল গাছের তলায় ভিড় দেখে, আমি সাইকেল থেকে নেমে দেখলাম, ইঞ্জিনিয়ারবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারবাবুকে। এরপর ওই বাবুর কী হয়েছিল জানি না।

এরপর থেকে সকলে বলতে শুরু করল, ওই তেঁতুল গাছে বুড়োর আত্মা আছে। কেউ বলল, রাত্তিরবেলায় ওই তেঁতুল গাছের ডালে বুড়ো বসে থাকে। ওই সময় যে ওই গাছের তলা দিয়ে যাবে, অমনি বুড়ো তার রক্ত চুষে খাবে। আবার কেউ বলল, সন্ধের পর নাকি ওই তেঁতুল গাছের তলায় বুড়োর ভূত বসে থাকে। কাছ দিয়ে কেউ গেলে অমনি বুড়ো ভূতটা তার ঘাড় মটকে দেয়। এমন অনেক কথা রটে গেল চতুর্দিকে। সন্ধের পর আর কেউ এদিকে আসে না।

আট মাস পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে আর কোনো অঘটন ঘটেনি। সেদিন রাত্তিরবেলায় ডাকবাংলোতে অফিসার বাবুদের পার্টি হচ্ছিল। পার্টির শেষে কাজ-টাজ সেরে বাবা যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন ওই শয়তান বুড়োটা বাবার ঘাড় মটকে দেয়। খবর পেয়েই আমরা ছুটে গেলাম তেঁতুল গাছের তলায়। গিয়ে দেখি বাবা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে তুলে নিয়ে গেলাম গাঁয়ে। বাবা মারা গেল। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা এলাকায়। শোকে-দুঃখে আমরা ভেঙে পড়লাম।

বাবার মৃত্যুর পর বিশেষ কেউ আর ডাকবাংলোতে আসতেন না। যদিও কেউ আসেন, সন্ধের আগেই বাংলো ছেড়ে চলে যান। এ বাবুর ভাগ্যের অনেক তেজ আছে। তাই প্রাণে বেঁচে এসেছেন। আজ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসতে পারেনি প্রাণ নিয়ে।

সব শুনে সুপ্রিয় বলল, আর এক মিনিটও এখানে নয়। সঙ্গে সঙ্গে মালপত্র গুছিয়ে গাড়িতে তুলে আমরা রওনা দিলাম। কারুর মুখে কথা নেই। সুবীর আচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের সৌভাগ্য যে ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম বলেই আজ সুবীরকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পেরেছি। এই ঘটনার পেছনে কোনো অদৃশ্য শক্তির হাত? এ প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।

চৈত্র ১৪১০

অহল্যা মঞ্জিলের সেই রাত

দূর্বা বাগচী

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের রাত। ঝড়ো বাতাস প্রচণ্ড বেগে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষণ। মুহুর্মুহু বিদ্যুতের আলো আর বজ্রের কড়-কড়-কড়াৎ শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দেয়। মনে হয় এক অসীম শক্তিধর দৈত্য যেন ধ্বংসের খেলায় মেতেছে। রূপসী পৃথিবীকে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে শেষ না করে যেন তার তৃপ্তি হবে না। এইরকম ভয়ঙ্কর দুর্যোগ মাথায় নিয়ে একরকম মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে জনমানবহীন সড়কপথ ধরে চলেছে একটি মারুতি সুজুকি।

বাংলার বিখ্যাত তরুণ সঙ্গীতশিল্পী অনুরাগ ভট্টাচার্য গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল হৃদয়পুর গ্রাম আর কতদূর কে জানে? ডাকবাংলোর চৌকিদার বলেছিল, গাড়িতে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যেই গ্রামে পৌঁছে যাবেন আর সেখানে গেলে কোনো না কোনো বাড়িতে ঠিক আশ্রয় মিলবে। কোনোমতেই ডাকবাংলোতে আশ্রয় না পেয়ে সেই ভরসাতেই এদিকে আসা অনুরাগের। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা হতে চলল কোনো ঘরবাড়ি তো নজরে এল না। তবে কি পথ ভুল করল? হতেও পারে। যা দুর্যোগ চলছে। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে হৃদয়পুর গ্রামে সে পৌঁছাতে পারবে কি? আর যদি পৌঁছাতেও পারে, কেউ কি এই দুর্যোগের রাতে তাকে আশ্রয় দেবে? বোধহয় না। তবুও চেষ্টা একবার করতেই হবে। না হলে এই সময় সে যাবে কোথায়?

নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে অনুরাগের। কী দরকার ছিল ডাকবাংলোয় রিজারভেশন না করে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একা একা বেড়াতে চলে আসবার! এখন বেড়ানো তো দূর, একটি রাতের মতো মাথা গোঁজার জায়গা যোগাড় করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। চমকে উঠে স্টিয়ারিং থেকে হাত খসে পড়ে অনুরাগের। অবশ্য কোনো অঘটন ঘটবার আগেই কোনোরকমে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দেয়।থরথর করে ওর সারা শরীর কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ স্টিয়ারিংয়ে মাথা লাগিয়ে চুপচাপ বসে রইল অনুরাগ। শরীরের কাঁপুনি কমে এলে সে বাইরে তাকায়। উঃ! কী অন্ধকার! তার ওপর এমন সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টি। নাঃ, গাড়ি চালিয়ে আর কোনো লাভ নেই। নিশ্চয়ই সে পথ ভুল করে অন্য কোথাও চলে এসেছে। অতএব গাড়ির ভেতরেই রাতটা কাটানো ছাড়া উপায় নেই। গাড়ির চারপাশের কাচ তোলাই ছিল তবুও পেছনের দরজার কাচ পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল অনুরাগ। বিদ্যুতের আলোয় চকিতে দেখা গেল গাড়ির থেকে কিছু দূরে একটা বড় বাড়ি। প্রথমটা মনে হয়েছিল চোখের ভুল কিন্তু পর পর তিন-চারবার বিদ্যুতের আলোয় বাড়িটা ভালো করে দেখবার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় অনুরাগ। যাক বাবা, রাতটা তাহলে আর গাড়িতে কাটাতে হবে না।

গাড়িটাকে সাবধানে পিছিয়ে নিয়ে বড় বাড়িটার সামনে এনে দাঁড় করাল অনুরাগ। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ভিজে একশা। তবু সেই বৃষ্টি মাথায় করেই টর্চ আর ছোট ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির দরজা লক করে বাড়ির সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল অনুরাগ। বিশাল আকারের সিংহদরজার দু'পাশে দুটো পাথরের সিংহ থাবা উঁচিয়ে বসে রয়েছে। সিংহদরজার পর অনেকটা জায়গা জুড়ে ফল-ফুলের বাগান। বাগানের পর বিশাল প্রাসাদতুল্য বাড়িটা অন্ধকারেই যতটা পারা যায় দেখবার

চেষ্টা করল অনুরাগ। আর তখনই ওর চোখে পড়ল সিংহদরজার গায়ের শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'অহল্যা মঞ্জিল'।

নামটা যেন শোনা শোনা মনে হয় অনুরাগের। কিন্তু তা কী করে হবে? এদিকে সে এর আগে কোনোদিনও আসেনি। তাছাড়া ডাকবাংলোর চৌকিদার বলেছিল একমাত্র হৃদয়পুর গ্রামে কুড়ি-বাইশটি পরিবার ছাড়া আশেপাশে মাইল পাঁচেকের মধ্যে কোনো জনবসতি নেই। অথচ রাস্তার ধারে এতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়িটার খবর চৌকিদার জানে না! না কি এই বাড়িতে কেউ বাস করে না! একরাশ প্রশ্ন মাথায় নিয়ে সিংহদরজা পেরিয়ে বাগানে পা রাখতেই গা ছমছম করে ওঠে অনুরাগের। মনে হয় অহল্যা মঞ্জিলের কোনায় কোনায় যেন পাষাণী অহল্যার দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে। থম-থম করছে চারদিক। এদিকে ঝড়ের দাপট কমে এলেও বৃষ্টি সমানেই চলছে।

ভেতরে যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে অনুরাগ বাগানের নুড়ি বিছানো পথ ধরে গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশে আবারও ভালো করে দেখে। না, জনপ্রাণীর সাড়া নেই। চারপাশে সূচীভেদ্য অন্ধকার। টর্চ জ্বালিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে বন্ধ দরজার কড়া নাড়ে।

বেশ কয়েকবার কড়া নাড়া সত্ত্বেও ভেতরে কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তবে কি এই বাড়িতে কেউ থাকে না! আরও কয়েকবার কড়া নাড়ার পর বন্ধ দরজার গায়ে একটু ঠেলা দিতেই ক্যাঁ-এ-এ-এ-চ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। চমকে উঠে দু' ধাপ পিছিয়ে গেল অনুরাগ। খোলা দরজার ঠিক সামনেই আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের হাতে একটা লণ্ঠন।

অনুরাগকে দেখে বৃদ্ধ কফ-জমা ঘড়ঘড়ে গলায় বলে ওঠেন, আপনি?

অনুরাগ বৃদ্ধকে তার বিপদের কথা খুলে বলে। বৃদ্ধ নীরবে সব কথা শুনে যান। কথা শেষ করে অনুরাগ বলে, আজকের রাতটা যদি এখানে থাকতে দেন তাহলে খুব উপকার হয়।

অনুরাগের কথা শুনেও বৃদ্ধ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, কোনো কথা বলেন না। বৃদ্ধকে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনুরাগ বেশ ঘাবড়ে যায়। চারপাশে কেমন যেন একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ। বাইরে এত হাওয়ার মাতামাতি কিন্তু এখানে এক ফোঁটা হাওয়ারও যেন প্রবেশ নিষেধ। বৃদ্ধের হাতের লণ্ঠনটার চিমনিতে এত কালি যে তা ভেদ করে সামান্য যেটুকু আলো বাইরে বার হতে পারছে তাতে আলো হওয়া তো দূরের কথা অন্ধকারই যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে। অনুরাগ একবার ভাবে ফিরে গিয়ে গাড়িতেই রাতটা কাটানো যাক। আবার ভাবে যখন এসেই পড়েছে তখন আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। হয়তো বৃদ্ধ কানে ঠিকমতো শুনতে পান না। তাই এবার বেশ উঁচু গলায় বৃদ্ধকে বলে, এখানে আজকের রাতটা থাকা যাবে?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলেন, না।

তাহলে কি আমি ফিরে যাব?

হ্যাঁ। এখানে বাইরের কোনো লোক থাকলে অহল্যাবাঈয়ের অসুবিধা হয়।

অনুরাগ ফিরে আসবার জন্য সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যায়, বসির মিঞা! ডাক শুনে বৃদ্ধ তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো ছুটে ভেতরে চলে যান। পরক্ষণেই ফিরে এসে বলেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

বসির মিঞার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করেই কেমন যেন গা ভারী হয়ে আসে অনুরাগের। সুন্দর করে সাজানো প্রকাণ্ড হলঘরের ভিতর দিয়ে শ্বেতপাথরের চওড়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। বসির মিঞাকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়িতে পা রাখবার আগেই হলঘরের ডানদিকের একটা ঘর থেকে জমকালো সালোয়ার কুর্তা পরা একজন মহিলা ও এক ভদ্রলোক অনুরাগের সামনে এসে দাঁড়ান। মহিলার সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের জৌলুস দেখে অনুরাগ বুঝতে পারে উনিই এই

বাড়ির মালকিন। তাই কোনো প্রশ্ন করার আগেই নিজের বিপদের কথা বলে। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক নীরবে সব কথা শোনেন। তারপর ভদ্রমহিলা বলেন, আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন সেজন্য আমরা আনন্দিত। তবে এত রাত্রে হঠাৎ করে আপনি এসেছেন তাই অতিথির যোগ্য সেবা হয়তো আমরা করতে পারব না।

না-না, এসব আপনি কী বলছেন? এইরকম দুর্যোগের রাতে আপনারা যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাই যথেষ্ট।

আপনি কিছু খাবেন?

না। আমি ডাকবাংলোর চৌকিদারকে টাকা দিয়ে কিছু খাবার আনিয়ে খেয়েই বেরিয়েছি। এখন একটু ঘুমোতে পারলেই হয়।

ঠিক আছে। বসির ওঁকে ওপরে নিয়ে যাও। আপনার কোনো কিছু দরকার পড়লে বসিরকে ডাকবেন।

অনুরাগ বলে, আমি তাহলে ওপরে যাচ্ছি। শুভরাত্রি। মহিলাটি প্রত্যুত্তরে শুভরাত্রি বললেও তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে হাসলেন। ভদ্রলোকের মুখের হাসি দেখে আবার চমকে উঠল অনুরাগ। মেরুদণ্ড বেয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল। ভদ্রলোকের সাদা ঝকঝকে দাঁতের পাটির ভিতর থেকে দুটো বড় বড় দাঁত দেখা গেল। অবশ্য সেটা অনুরাগ মাত্র একঝলকই দেখতে পেল। এই বিষয়ে বেশি কিছু চিন্তা করবার আগেই পেছন থেকে বসির ডাকলেন, আসুন।

মোহগ্রস্তের মতো বসির মিঞার পেছন পেছন ওপরে উঠে গেল অনুরাগ। দোতলার সিঁড়ির মুখ থেকে দুটো বারান্দা উত্তর ও দক্ষিণ দু'দিকে চলে গেছে। বসির মিঞাকে অনুসরণ করে দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে কোণের দিকে একটি ঘরে প্রবেশ করল অনুরাগ।

এই ঘরে বেশ বড় একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলায় চারপাশ বেশ পরিষ্কার নজরে আসে অনুরাগের। সুন্দর করে সাজানো ঘর। ঘরের ঠিক মাঝখানে উঁচু পুরনো আমলের বিশাল পালঙ্কের ওপর ধবধবে বিছানা পাতা। ঘরের সব আসবাবপত্র খুব দামি এবং সুন্দর করে সাজানো। অ্যাটাচড বাথরুম। সবকিছু ঝকঝকে পরিষ্কার। মনে মনে গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করে অনুরাগ।

বসির মিঞা বলেন, আমি আপনার খাবার জল নিয়ে আসছি। বসির মিঞা চলে গেলে অনুরাগ তার ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি বার করে ভিজে পোশাক পাল্টে নিল। তারপর বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এসে বসির মিঞার রেখে যাওয়া জল খেয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে এখনো বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে শুয়ে সে শব্দ শুনতে শুনতে একসময় তার কণ্ঠে বেজে ওঠে সঙ্গীতের সুর। বেশ কিছুক্ষণ রাগসঙ্গীতের সরোবরে সন্তরণ করার পর হঠাৎ গান বন্ধ করে অনুরাগ একরকম লাফ দিয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে। ঘরের দরজায় কে যেন ঠক্-ঠক্ করে টোকা দিচ্ছে আর বলছে, দরজা খোলো, দরজা খোলো, দরজা খোলো। সারা ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ। গান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা বন্ধ হয়ে যায়। পরমুহূর্তে ঝুম-ঝুম-ঝুম নূপুরের শব্দ তুলে কে যেন বারান্দা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ফুলের মিষ্টি গন্ধটাও যেন একটু একটু করে দূরে সরে যেতে থাকে। কৌতূহলী হয়ে অনুরাগ দরজা খুলে পরদা সরিয়ে বাইরে উঁকি দেয়। বারান্দায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই নজরে আসে না। নূপুরের শব্দটা তখন বারান্দার অন্য প্রান্তে সরে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের দরজা ভেজিয়ে খাটে এসে বসবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে প্রবেশ করেন বসির মিঞা ও একতলায় দেখা সেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা।

বসির মিঞা বলেন, মীনাবাঈ আর রমজান সাব আপনাকে কিছু বলতে এসেছেন।

মীনাবাঈ বলেন, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত কিন্তু খুব জরুরি প্রয়োজনে না এসে পারলাম না।

অনুরাগ কিছুটা অবাক হয়ে যায়। কী এমন ব্যাপার ঘটল যার জন্য বসির মিঞাকে না পাঠিয়ে মালিক ও মালকিন দুজনেই এত রাতে তার ঘরে এসেছেন!

মীনাবাঈ-এর সঙ্গী রমজান নামক ভদ্রলোকটি এই প্রথম মুখ খুললেন, আপনি একটু আগে গান গাইছিলেন?

হ্যাঁ।

এ বাড়িতে থাকতে হলে আপনাকে আমাদের কথা শুনতে হবে। আমরা চাই না আপনি গান করেন। আর যেন আপনাকে গান গাইতে না শুনি।

অনুরাগ অবাক হয়ে বলে, কেন, গান গাওয়া কি অপরাধ?

ভদ্রলোক প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলেন, হ্যাঁ, অপরাধ। এই বাড়িতে গান গাওয়া অপরাধ। আমাদের কথা না শুনলে আপনাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

অনুরাগ কিছু বলবার আগেই মীনাবাঈ ধমকে উঠে বলেন, চুপ করো রমজান আলি। মনে রেখো উনি আমাদের অতিথি। অতিথির কোনো অপমান আমি সহ্য করব না। যাও তুমি, নীচে চলে যাও।

মীনাবাঈয়ের কথায় রমজান আলি ফুটো বেলুনের মতো মুহূর্তেই চুপসে যান। কোনো কথা না বলে তিনি ঘর থেকে বের হয়ে যান।

রমজান আলি ঘর থেকে বার হয়ে যাবার পর মীনাবাঈ অনুরাগকে বলেন, দেখুন, আমাদের এই বাড়িতে কেউ কোনোদিন গান গায় না। এটা এই বাড়ির একটা পুরনো সংস্কার। এই বাড়ির লোকেরা বিশ্বাস করে যে, এই বাড়িতে কেউ গান গাইলে এখানে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটবে। বলতে পারেন এটাই এই বাড়ির অভিশাপ।

মীনাবাঈয়ের কথা শুনে অনুরাগ লজ্জিত হয়ে বলে, আমি না জেনে অপরাধ করে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করুন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এই বাড়ির ত্রি-সীমানায় থাকাকালীন আমি আর গান গাইব না।

ধন্যবাদ। আপনার কথা শুনে খুশি হলাম। আর একটা কথা, রাত্রে অস্বাভাবিক কিছু শুনলে বা কেউ আপনাকে ডাকলেও আপনি কোনোমতেই দোতলার উত্তর দিকের বারান্দায় যাবেন না। আমরা তিনজন ছাড়া এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না। তাই আমরা ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে আপনি কিছুতেই দরজা খুলবেন না। বলে অল্প হেসে মীনাবাঈ বলে চলেন, বুঝতেই পারছেন পুরনো বাড়ি। এখানে মানে দোতলার উত্তর দিকের অংশে এমন অনেক কিছু ঘটে যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। কথা শেষ করে অনুরাগকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই মীনাবাঈ ও বসির মিঞা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

ওঁরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনুরাগ। নীচের স্বল্প আলোয় মনে হয়েছিল চোখের ভুল। কিন্তু এই ঘরের উজ্জ্বল আলোয় সে এবার পরিষ্কার দেখেছে মীনাবাঈয়ের ওপরের ঝকঝকে দাঁতের পাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা দুটো বড় বড় দাঁত। তাছাড়া মীনাবাঈয়ের মুখ যেন অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে ফোলা ফোলা। কণ্ঠস্বর কেমন নাকি নাকি ফ্যাঁসফ্যাঁসে। চোখের মণি দুটো মরা মাছের মতো স্থির। এক অজানা আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় অনুরাগের। মনে হয় একছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু পারে না। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। ঘামে ভেজা দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে অনুরাগ।

।। ২।।

তীব্র একটা সুমিষ্ট গন্ধ নাকে যেতেই চোখ মেলে তাকায় অনুরাগ। অন্ধকার ঘরে প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না। কে যেন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব চাপা স্বরে বলে ওঠে—চলে যান। আপনি যেই হোন না কেন এই অভিশপ্ত বাড়ি থেকে এক্ষুনি পালিয়ে যান। না হলে ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে।

কথাগুলো শোনবার সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগের গা শিউরে ওঠে। ততক্ষণে অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে। অনুরাগ দেখতে পায় একটা ছায়ামূর্তি তার ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তি দরজার বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় আঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ চিৎকার ও তার সঙ্গে রক্ত-জল-করা হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ হাসি। সারা বাড়িটা যেন ঝনঝন করে কেঁপে ওঠে। অনুরাগের মনে হয় ভয়ে আতঙ্কে দুর্ভাবনায় সে পাগল হয়ে যাবে। ল্যাম্পটা যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে ঘরটাকে আলোকিত করে তোলে। না, কোথাও কিছু নেই। সারা বাড়িটা আবার পাষাণ-পুরীর মতোই নীরব।

অনুরাগ বরাবরই একটু ডাকাবুকো স্বভাবের। ভয় কাকে বলে সে জানে না। তাই সাময়িকভাবে ভয় পেলেও পরক্ষণেই সে তার মনকে শক্ত করে। ভয়! কিসের ভয়? ভয়কে যে জয় করতে পারে না সে আবার মানুষ নাকি? মন থেকে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মুছে ফেলে দিয়ে ল্যাম্প হাতে করে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তারপর বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকে। কই, কেউ তো কোথাও নেই! দক্ষিণের বারান্দায় বার কয়েক পায়চারি করে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ায় অনুরাগ। এখান থেকেই দোতলার উত্তর আর দক্ষিণ দুই দিকের টানা লম্বা বারান্দা চলে গেছে যার সঙ্গে লাগানো সার সার ঘর। এই উত্তর দিকের বারান্দায় আসতেই তাকে নিষেধ করেছেন মীনাবাঈ। এখানেই নাকি নানা ধরনের অসম্ভব কাণ্ড ঘটে। অন্য কোনো লোক হলে হয়তো এদিক মাড়াতে সাহস পেত না কিন্তু অনুরাগ অন্য ধাতের মানুষ। উত্তরের ঐ বারান্দা আর ঘরগুলোতে কেন যেতে নিষেধ করেছেন মীনাবাঈ? কী আছে ওখানে? অনুরাগের কৌতূহলী মন তা জানবার জন্য ছটফট করে ওঠে। আর সময় নষ্ট না করে ল্যাম্প হাতে নিয়ে উত্তরের বারান্দায় পা রেখেই এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় অনুরাগ। ল্যাম্প তুলে যতটা সম্ভব চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে বারান্দা ধরে সামনে এগোতে থাকে। উত্তরের বারান্দার ধার ঘেঁষে সার সার বন্ধ ঘর। বেশ কয়েকটা ঘরের পর একটা ঘরের ভেতর আলো দেখে এগিয়ে যায় অনুরাগ? ঘরের ভেতর প্রবেশ করেই এক অদ্ভুত বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায়। বিশাল হলঘর ঝাড়বাতির আলোয় ঝলমল করছে। হলঘরের মেঝেতে পুরু রঙিন গালিচা পাতা, তার ওপর হারমোনিয়াম, বেহালা, তানপুরা, সেতার, তবলা-ডুগি সাজানো। যেন এক্ষুনি এখানে কোনো গানের আসর বসবে। অবশ্য ঘর জনমানবশূন্য। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে, জানলার কাচের পাল্লার ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। অনুরাগ বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, গান তার রক্তে। তাই এইরকম নির্জন গৃহে বর্ষা মুখরিত রাতে বাদ্যযন্ত্র দিয়ে সাজানো আসরে দাঁড়িয়ে অনুরাগের মন ভেসে যায় কোন অজানা সুরের জগতে। অনুরাগ ভুলে যায় রমজান আলির সতর্কবাণী, মীনাবাঈয়ের কাছে গান না গাওয়ার অঙ্গীকার। একরকম মোহগ্রস্তের মতো পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ল্যাম্পটা ঘরের একপাশে রেখে গালিচার ওপর বসে সঙ্গীতের দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করে তানপুরা হাতে তুলে নেয়। বাইরে একটানা বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ তার কণ্ঠে এনে দেয় সুর। মেঘমল্লার রাগে আলাপ শুরু করে অনুরাগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ডুবে যায় সুরের মায়াজালে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ শুরু হলে অনুরাগ বিরক্ত হয়ে চোখ খুলেই দেখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। স্তব্ধ হয়ে যায় তার কণ্ঠ। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। অনুরাগের ঠিক সামনের দেওয়ালে চুনবালি খসে গেছে। দেওয়ালের ভেতর থেকে কিছু একটা যেন প্রচণ্ড শক্তিতে দেওয়াল ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড শব্দ করে দেওয়াল থেকে ইঁট খসে পড়তে লাগল। অনুরাগের চোখের সামনে দেওয়াল ভেঙে ফাটল বড় হচ্ছে।

এমন সময় পিঠে বরফের মতো ঠান্ডা স্পর্শ পেয়ে মাথাটা ঘোরাতেই অনুরাগের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হল। মীনাবাঈয়ের দুটো হাত তার গলার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই হাতে একটুও চামড়া বা মাংস নেই। মুখের দু'পাশ থেকে দুটো রক্তমাখা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে মীনাবাঈয়ের হাত দুটো আরও এগিয়ে আসে...আরও....আরও। এই সময় হাড় হিম করা হাসি হাসতে হাসতে রমজান আলিও তার দু'হাত বাড়িয়ে অনুরাগের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অনুরাগ বুঝতে পারে তার আর রক্ষা নেই। ভয়ে আতঙ্কে সে দু' চোখ বুজে ফেলে। ঠিক সেই মুহূর্তে কার যেন আর্তনাদ শোনা যায়, "গাঁও কুঁমার নাঁরায়ণ, গাঁও; তোঁমার অঁহল্যার খুঁম ভাঁঙিয়ে আঁমায় মুঁক্তি দাঁও।"

সেই আর্তনাদে কি জাদু ছিল কে জানে, অনুরাগ আবার শুরু করে মল্লার রাগে আলাপ। তার কণ্ঠে গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার করে মীনাবাঈ কিছুটা দূরে সরে যায়। সেখান থেকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে নাকি গলায় চিৎকার করতে থাকে—বঁন্ধ কঁরো, গাঁন বঁন্ধ কঁরো, নাঁ হঁলে এঁক্ষুনি সঁব রঁক্ত চুঁষে ছিঁবড়ে কঁরে ফেঁলব।

ততক্ষণে দেওয়াল ভেঙে নারীমুর্তিটি প্রায় বেরিয়ে এসেছে। সেও সমানে করুণ কণ্ঠে অনুরোধ করতে থাকে, গাঁও কুঁমার নাঁরায়ণ, গাঁও; আঁমায় মুঁক্তি দাঁও।

এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অনুরাগ প্রায় আধমারা হয়ে যায়। তার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে তবুও সে তার গান থামায় না। একসময় দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র সুমিষ্ট গন্ধে ঘর ভরে যায়। মেয়েটি বেরিয়ে আসতেই নাঁ-আঁ-আঁ-আঁ চিৎকার করে মীনাবাঈ ও তার সঙ্গী রমজান আলি বারান্দার দিকে ছুটে পালায়। মেয়েটিও ওদের পেছন পেছন ছুটে যায়। পরক্ষণেই বারান্দা থেকে ভেসে আসে নারী ও পুরুষ কণ্ঠের আঁ-আঁ-আঁ-আঁ-আঁ মরণ চিৎকার। সারা অহল্যা মঞ্জিল থরথর করে কেঁপে ওঠে সেই চিৎকারে। একটু পরে নূপুরের শব্দ তুলে সুন্দরী মেয়েটি ঘরে এসে ঢোকে। অনুরাগ আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। উঠে পড়ে এক লাফে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটতে থাকে। পেছন পেছন ছুটে আসে মেয়েটি। সিঁড়ির মুখে এসে অনুরাগের পথ আটকে দাঁড়ায় তারপর বলে, ভয় পেও না, তুমি আজ তোমার গানের মধ্যে দিয়ে পাষাণী অহল্যার ঘুম ভাঙিয়েছ। আর তোমার কোনো ভয় নেই।

একুট চুপ করে থেকে মেয়েটি বলতে থাকে, যদিও তুমি কুমার নারায়ণ নও; তবুও তোমার মতো এইরকম বিশুদ্ধ মল্লার রাগের সুরমূর্ছনায় কুমার নারায়ণ একসময় এই বাড়ি ভরিয়ে রাখত। যে রাতে ওরা আমাকে মেরে ফেলল সেই রাতও ছিল এই রকম ঝড়জলের রাত। এই রকম রাতে কুমার নারায়ণ মল্লার রাগ গাইত আর আমি নাচতাম। সেদিনও আমি কুমার নারায়ণের অপেক্ষায় এই ঘরে বসে ছিলাম। সেই সময় জমিদার কুমার নারায়ণের পিতা দুর্লভ নারায়ণের কথায় ঐ শয়তান মীনাবাঈ আর তার দুই সঙ্গী রমজান আলি, বসির মিঞা আমাকে মেরে দেওয়ালে গেঁথে রেখেছিল। সেই দিন থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি মল্লার রাগ শুনবার জন্য। আমার অতৃপ্ত আত্মা মুক্তি পায়নি। দুর্লভ নারায়ণ মীনাবাঈদের মুখ বন্ধ করবার জন্য ওদেরও মেরে ফেলেছিল। কিন্তু ওরা তিনজন ওদের পাপের ফলে মুক্তি পায়নি, রক্তচোষা হয়েছিল। আজ ভোর রাতেই ওরা তোমাকে মেরে রক্ত চুষে খেত। আমি ওদের ধ্বংস করেছি। আজ তুমি বিশুদ্ধ মল্লার রাগ গেয়ে আমাকে মুক্তি দিয়েছ তাই এখান থেকে চলে যাবার আগে আমি তোমাকে কুমার নারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় তানপুরাটা দিতে চাই। এই তানপুরাতে রেওয়াজ করলে তুমি একদিন সারা পৃথিবী জোড়া খ্যাতি লাভ করবে। এসো, তানপুরাটা নিয়ে যাও। বলতে বলতে মেয়েটি একটু অন্যমনস্ক হতেই অনুরাগ তার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একছুটে বাগান পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। গাড়ির চাবি তার পাজামার পকেটে ছিল তাই দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠেই গাড়ি চালিয়ে দিল। যেমন করে হোক এখান থেকে পালাতে হবে দূরে—দূরে—বহু দূরে।

॥ ৩॥

বাবু—এ বাবু—অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত আওয়াজে অনুরাগের ঘুম ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখে তার গাড়ির চারপাশে অনেক লোকের ভিড়। কোনো কিছু ভালো করে বোঝবার আগেই ডাকবাংলোর চৌকিদার এগিয়ে আসে, বাবু কেয়া আপ হৃদয়পুর নহি গয়ে হ্যায়?

চৌকিদারের কথায় অনুরাগের চেতনা ফেরে। সকাল হয়েছে। ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সূর্য দেখা যাচ্ছে। তবে চারদিকেই ঝড় তার সাক্ষ্য রেখে গেছে। অনেক বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে গেছে, পাতা ছড়িয়ে আছে সব জায়গায়।

অনুরাগের মনে পড়ে কাল রাতে ঐ অভিশপ্ত বাড়ি থেকে বার হয়ে অজানা-অচেনা রাস্তায় পাগলের মতো কোনো দিকের কথা না ভেবেই গাড়ি চালিয়েছিল অনুরাগ। কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে যাচ্ছে সেসব ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না। একসময় গাড়ির তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় আপনা থেকেই গাড়ি থেমে গিয়েছিল। অন্ধকার দুর্যোগপূর্ণ রাতে গাড়ি কোথায় এসে থেমেছে জানবার উপায় ছিল না। তারপর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই জানে না।

অনুরাগকে চুপ করে থাকতে দেখে চৌকিদার বলে, কিঁউ আপ বাংলোকি ইতনা নজদিকমে রাত গুজারা? আগর গাড়িমে হি রহনা থা তো ইধারই রহ সকতা।

কী করব, তুমি তো কাল কিছুতেই আমাকে বাংলোয় জায়গা দিলে না—অনুরাগ বলে।

মাফ কিজিয়েগা বাবু। কাল সব ঘর বুকড থা। লেকিন আজ সুবা ফোন আয়া কি ও বড়াবাবু নেই আয়েগা। চলিয়ে, ও ঘর আপকো দে দেঙ্গে।

চল তাহলে, বলে গাড়ি থেকে নামতে নামতে অনুরাগ চৌকিদারকে প্রশ্ন করে, চৌকিদার, তুমি অহল্যা মঞ্জিল চেন?

অহল্যা মঞ্জিলের নাম শুনেই চৌকিদারের মুখ শুকিয়ে যায়। অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ অনুরাগের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চৌকিদারকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে অনুরাগ বলে, কী হল, কথা বলছ না যে? তুমি অহল্যা মঞ্জিল চেন? ঐ বাড়িতে কারা থাকে জান? গেছ কখনো ঐ বাড়িতে?

অনুরাগের কথা শুনে শিউরে উঠে ডাকবাংলোর চৌকিদার বলে, উস্ মঞ্জিল কি বাত হামসে মত কহিয়ে। কিঁউ কি উস্ মঞ্জিল মে বহুত প্রেত আত্মা রহিতি হ্যায়; উস্ মঞ্জিল কে পাস কোঈ নেহি যাতা। আচনক কোঈ চলা গয়া তো উস্ প্রেত আত্মা উসকো খুন চুস চুস কর মার ডালতা হ্যায়। কথা শেষ করেই চৌকিদার ডাকবাংলোর দিকে হাঁটতে শুরু করে।

অনুরাগ গাড়ির পেছনের সিটে নিজের সুটকেস ও অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাতের অন্ধকারে নয়; দিনের আলোয় এত লোকের মাঝে প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়েও অনুরাগের মনে হয় সে বোধহয় এখনও স্বপ্ন দেখছে। এ কী করে সম্ভব'! তবে কি কাল রাতের সব ঘটনা সত্যি! সে কি তার গানের মধ্য দিয়ে মুক্তি দিয়েছে পাষাণী অহল্যাকে! যদি তা না হয় তবে এটা কী? গাড়ির পেছনের সিটে শোয়ানো অহল্যাবাঈয়ের উপহার, কালকের সেই অপূর্ব কারুকার্য খচিত তানপুরা যা সে কাল রাতে বাজিয়েছিল গানের সঙ্গে। শুধু তাই নয় অহল্যা মঞ্জিলের দোতলার ঘরে ফেলে আসা তার ব্যাগ, টর্চ সব রাখা আছে গাড়ির ভেতর। কে কখন রাখল এ সব? এক বুক বিস্ময় নিয়ে অনুরাগ বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখে তানপুরাটাকে। তারপর সেই অতৃপ্ত শিল্পী আত্মাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে দু'হাত দিয়ে পরম মমতায় তানপুরাটা বুকে চেপে ধরে বাংলোর দিকে হাঁটতে থাকে অনুরাগ। বৃষ্টিধোয়া সূর্যের আলোর ঝিকিমিকি ঝিলমিল ঝরনা যেন তখন সুরজগতের স্বপ্নিল আনন্দের আশীর্বাদ বর্ষণ করে চলেছে তমসামুক্ত ধরিত্রীর বুকে।

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩

নখদর্পণ

সুনীত কুমার রায়

মাস্টারমশাই, আপনাদের নাকি চুরি হয়েছে?—আমি চেয়ারে বসতে না বসতে প্রশান্ত আমাকে জিজ্ঞেস করল।

কাল আমাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে। সোনা-দানা বা টাকাপয়সা না নিলেও যা নিয়েছে আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কাছে তার মূল্য অনেক। সেই সঙ্গে আমাকেও খোঁড়া করে দিয়ে গেছে। আমার সাইকেলটাও নিয়ে গেছে। বড় সাধের সাইকেল ছিল ওটা। ক্লাস নাইন থেকে টেনে ফার্স্ট হয়ে উঠতে বাবা ওটা কিনে দিয়েছিলেন। পুরনো আমলের র‍্যালে সাইকেল। বেশ মজবুত। যে দেখত সেই বলত যদি রঙ করিয়ে নেওয়া যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু তা আর হলো না। রঙ করে সুন্দর করে তোলার আগেই হারাতে হলো। ছাত্রছাত্রীদের বললাম সব। ওদের প্রশ্ন আর শেষ হতে চায় না। পড়া ভুলে ওরা চুরির গল্প শুনতে চায়।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, পুলিশে খবর দেবেন না স্যার?

আমি হেসে বললাম, পুলিশে খবর দিয়ে কী হবে, বরং তাতে ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না। তাছাড়া আমার একার দ্বারা সব দিকে দৌড়ান সম্ভব নয়।

কথাটা মিথ্যে নয়। গত রাতেই আমরা চুরি হয়েছে বুঝতে পেরেছিলাম। রাত তিনটের সময় বাবা বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখে ভাঁড়ার ঘরের দরজা খোলা, চিৎকার করে সবাইকে ডেকেছিল, আমরা চোরের সন্ধানে বৃথাই টর্চ হাতে ছোটাছুটি করেছিলাম। পরদিন বিভিন্ন সাইকেলের দোকানে খোঁজ করেছিলাম যদি আমার সাইকেলটা কেউ বিক্রি করে যায়, তাহলে অন্তত দোকানীকে কিছু দিয়ে উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু যারা বিক্রি করে তারা তো চালাকই, যারা কেনে তারা আরও চালাক। সুতরাং ঘোরাঘুরিই সার। তাছাড়া নানান জনের নানা প্রশ্ন। কেউ কেউ আবার কাকে সন্দেহ হয় জিজ্ঞেস করল। আসলে উল্টে আমাদেরই বিপদে ফেলার মতলব। তাই মনের ঝাল মনেই রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাছাড়া এরকম চুরি শুধু আমাদের নয়, অনেকেরই হচ্ছে বা হয়। তাই নিজের ক্ষতিকে বড় করে দেখা উচিত নয়। ছাত্রছাত্রীদের বললাম একথা।

মুকুল বলল, থানা-পুলিশ নাই যদি করেন তবে একটা জিনিস করে দেখতে পারেন। অবশ্য আপনি আবার বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না।

আমি বললাম, কী বলতো?

মুকুল বললে, আমার মেসো ভাল গুণিন। নখদর্পণ জানে....।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি হেসে বললাম, ওসব নখদর্পণ-টর্পণ সব বাজে। যদি সত্যিই হত তাহলে লোকে থানা-পুলিশ না করে ওদের কাছেই ছুটত আর ওরা মোটা টাকা কমিয়ে বড়লোক হয়ে যেত।

মুকুল একটু আহত হয়ে বলল, সেরকম লোক কি আছে? অনেকে গুণিন সেজে টাকা রোজগারের ধান্দায় থাকে, সেইজন্য লোকের বিশ্বাস চলে যায়। আসল গুণিনরা টাকার জন্য দরদস্তুর করে না।

আমি হেসে বললাম, তা তোমার মেসো কি আসল গুণিন?

আমার কথায় অন্যরা খুকখুক করে হেসে উঠল। মুকুল তাতে আরে রেগে গিয়ে বলল, আসল কি নকল জানি না, আমার মেসো কারও বাড়িতে যেচে যায় না।

আমি হাসি চেপে বললাম, আহা, তুমি অত রাগ করছ কেন? আমি কি তাই বলছি? তারপর কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললাম, আচ্ছা, তুমি কখনও নখদর্পণ দেখেছ?

মুকুলের রাগ তখনও যায়নি। সে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, দেখেছি বই কি। না দেখলে বলব কেন!

মুকুল ছেলেটা অন্যদের মত নয়। বয়স অনুপাতে একটু গম্ভীর প্রকৃতির। পড়তে বসে নিজের কাজ করে যায়। বেশি কথা বলে না কারো সঙ্গে। ওর কথায় জোর দেখে কৌতূহলে বললাম, তাহলে তুমি বলতে চাও আমাদের চুরিটাও নখদর্পণের সাহায্যে হদিস করা যাবে।

চুরির হদিস করা যাবে কিনা জানি না, তবে আপনি নিজের চোখে সব দেখতে পাবেন, কীভাবে চুরি হলো বা কে চুরি করল।

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে বলে উঠল, হ্যাঁ, মাস্টারমশাই, একবার করে দেখুন না।

আমি ভাবলাম, এত করে বলছে যখন তখন দেখলে হয়, তাছাড়া টাকা-পয়সা বেশি লাগবে না বা বেশি ঝামেলাও পোয়াতে হবে না। যদি সাইকেলটা পাওয়া যায়.....। মুকুলকে বললাম, আমি রাজি, তুমি তোমার মেসোকে আনতে পার। তা উনি কী রকম কী নেবেন আমাকে আগে থেকে জানাবে।

মুকুল বলল, টাকা-পয়সা আপনি যা ইচ্ছে দেবেন, তবে মেসো কিন্তু সেদিন আপনাদের বাড়িতে খাবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, ওতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার মেসো কবে আসছেন আমাকে জানিয়ে দিও।

অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা আবদার করল ওরাও সেদিন দেখতে আসবে কেমন করে নখদর্পণ হয়। আমি ওদের বললাম, যেন ওরা কাউকে না বলে, কারণ লোক জানাজানি হলেই ভিড় জমে যাবে বাড়িতে। মুকুল ওর মেসোর সঙ্গে কথা বলে আমাকে জানাবে বলল পরদিন।

ওরা চলে যেতে মাকে বললাম সব। মা শুনে বলল, বেশ তো, যদি জিনিসগুলো উদ্ধার করা যায়, অন্তত তোর সাইকেলটা যদি পাওয়া যায়......

মুকুল কিন্তু পরদিন এসে বলল, ওর মেসোর শরীর খুব খারাপ। সেইজন্য এখন আসা সম্ভব নয়, ও মেসোকে সব বলেছিল। কিন্তু শরীর খারাপের জন্য এখন আসতে পারবে না। সুস্থ হয়ে করতে বেশ কয়েকদিন লাগবে, তখন হয়ত কিছু করা যাবে না।

আমি মনে মনে খুব বিরক্ত হলাম। কিন্তু মুকুল দুঃখ পাবে, সেই জন্য মুখে কিছু বললাম না।

একদিন দুপুরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সাইকেলটা যেন আমার সামনেই পড়ে আছে অথচ আমি নিতে পারছি না। ঘুম ভেঙে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মন খারাপ হলে আমি নদীর ধারে নির্জনে একা বসে থাকি। ওটা আমার স্বভাব। এতে শরীরটা বেশ ভাল লাগে। সেদিনও নদীর ধারে গিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে আধময়লা ধুতি আর গেঞ্জি। মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাড়ি। লোকটাকে দেখে মনে হলো, শরীর খুবই অসুস্থ। না হয় সদ্য বেশ ভারি রকমের অসুখ থেকে উঠেছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে লোকটা কাঁচুমাচু করে বলল, আমি মুকুলের মেসো। মুকুল আমাকে আপনাদের চুরির কথা বলেছিল। শরীর খারাপ বলে আসতে পারিনি। আজকে যদি আপনার অসুবিধে না থাকে....

আমি থতমত খেয়ে বললাম, আজকে....মানে.....এখানেই?

লোকটা হেসে বলল, এখানে হলে ক্ষতি কী? বেশিক্ষণ তো সময় লাগবে না।

মনে মনে ভাবছিলাম আমি যে এখানে আছি কী করে লোকটা জানল? হয়ত বাড়িতে মাকে জিজ্ঞেস করে এখানে এসেছে। লোকটা আমার পাশে বসে পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বার করল। শিশিটাতে তেলের মত কী একটা পদার্থ ছিল। তারপর বলল, আপনার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখি। আঙুলটা দেখাতে বলল, বাঃ, বেশ সুন্দর আঙুল, নখও সুন্দর, নখদর্পণের উপযুক্ত।

ইতিমধ্যে লোকটা শিশি থেকে আঙুলে করে একটু তরল পদার্থ নিয়ে আমার বুড়ো আঙুলের নখে ঘষতে লাগল আর বিড়বিড় করে কী সব মন্ত্র পড়তে লাগল। মিনিট পাঁচেক পরে আমাকে বলল, দেখুন তো কিছু দেখতে পান কিনা। আঙুলের দিকে চাইতে আমার চক্ষুস্থির। এ কী! এ যে দেখছি ম্যাজিক! আমাদের ভাঁড়ার ঘরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বন্ধ দরজার সামনে চারজন লোক দাঁড়িয়ে। ভাঁড়ার ঘরের পাশেই খিড়কির দরজাটা খোলা। একজনের হাতে কী একটা যন্ত্র। সেটা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তালাটা খুলে ফেলল। দুজন সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেল। অল্পক্ষণ পরে একজন সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এলো তারপর সাবধানে ওটাকে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে অপর জন একটা থলেতে করে কী সব নিয়ে বেরিয়ে এলো, হয়ত বাসনপত্রগুলো হবে। সমস্ত ঘটনাটা ঘটাতে মিনিট চার-পাঁচ সময় লাগল। দ্বিতীয় লোকটা বেরিয়ে আসতে সবাই চলতে শুরু করল। বাড়ির পিছন দিকে ফাঁকা মাঠ। লোকগুলো ফাঁকা মাঠে নেমে পড়ল। একজন সাইকেলটাকে ঘাড়ে করে হাঁটছিল, পাছে মাটিতে চাকার দাগ পড়ে। কিছুদূর যাবার পর একটা ছোট ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে লোকগুলো কী সব বলাবলি করল, তারপর যে লোকটা সাইকেলটা বইছিল, সে ডোবাতে সাইকেলটাকে ডুবিয়ে রাখল। এরপর আর কিছু দেখতে পেলাম না। আমি মুখ তুলে বললাম, কী হলো আর তো কিছু দেখছি না।

মুকুলের মেসো বলল, আপনি যার জন্য বেশি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন খালি সেটাকেই দেখতে পাবেন। তা কী দেখলেন?

আমি সমস্ত বললাম।

লোকটা সব শুনে বলল, তা হলে হয়ত সাইকেলটা এখনও ডোবার মধ্যে আছে, খুঁজে দেখতে পারেন।

আমার আর তর সইছিল না। লোকটাকে একটা ধন্যবাদও না দিয়ে বাড়ির দিকে পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। বাড়িতে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে মাকে বললাম, মা, সাইকেলটা পেয়ে গেছি।

মা বলল, কোথায় রে? কী করে পেলি?

আমার তখন উত্তর দেবার মত অবস্থা ছিল না। বললাম, শীগগির এসো, না হলে...

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা ছুটে এসেছিল। সবাই আমার পেছনে ছুটল। ডোবার ধারে পৌঁছে বললাম, সাইকেলটা জলের মধ্যে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দুজন নেমে পড়ল। আর একটু পরেই হাসিমুখে সাইকেল সমেত উঠে এলো।

এর পরের ঘটনা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। সবার মুখে এক কথা—কী করে বুঝতে পারলি?

নখদর্পণের কথা বেমালুম চেপে গিয়ে একটা বানিয়ে বলে দিলাম। সবাই চলে যেতে মাকে চুপিচুপি সব বললাম।

মা শুনে বলল, কই, কেউ তো আমার কাছে আসেনি।

আমি বললাম, তাহলে লোকটা আমার কাছে কাছে গেল কী করে?

মা বলল, কী জানি বাবা, কিছু বুঝতে পারছি না। একবার মুকুলের বাড়ি যা দেখি।

কথাটা মনে ধরল। ছুটলাম মুকুলের বাড়ি। ওর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, ওর মেসোর খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। সেইজন্য ও ওর মাকে নিয়ে মেসোর বাড়ি গেছে।

মেসোর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে একটা সাইকেল যোগাড় করে আবার ছুটলাম। সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম ওর মেসোর তো খুব বাড়াবাড়ি অসুখ, তাহলে ঐ লোকটা কে? কয়েকটা গ্রাম পরেই মুকুলের মেসোর গ্রাম। আধঘণ্টাটাক পরে যখন ওদের গ্রামে ঢুকলাম তখন দেখি একটা বাড়ির সামনে খুব ভিড়। উঠোনে কিছু লোক জড় হয়ে দাঁড়িয়ে চাপাস্বরে কী যেন বলাবলি করছে। ওরই ভেতরে মুকুলকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলাম। তাহলে কি এটাই মুকুলের মেসোর বাড়ি? কিন্তু এত ভিড় কেন? তবে কী—

কাছে যেতেই মুকুল হঠাৎ আমাকে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি? আপনি এখানে?

আমি উদভ্রান্তের মতো বললাম, মুকুল, তোমার মেসোর সঙ্গে দেখা হবে? একবার দেখা করতে চাই।

মুহূর্তেই মুখটা ম্লান হয়ে গেল মুকুলের। বলল, মেসো তো নেই স্যার। ঘণ্টা দুই আগে তিনি মারা গেছেন। ওই তো ওই শুয়ে আছেন তিনি—বলে উঠোনের ভিড়ের মাঝখানে খাটিয়ার দিকে আঙুল তুলে দেখাল মুকুল।

ছুটে গেলাম। চোখের পাতায় তুলসী পাতা দেওয়া। কিন্তু তবুও মুখটা চিনতে আমার অসুবিধে হলো না। হ্যাঁ, এই তো, এই তো সেই তিনি, একটু আগে যিনি নির্জন নদীর পাড়ে আমাকে নখদর্পণ দেখিয়েছিলেন। তাহলে?

কার্ত্তিক ১৩৯১

মৃতের মৃত্যু

সুমিত কুমার বর্ধন

ইতালির আল্পস পর্বতের পাদদেশে একটা হ্রদ। নাম লাগো ডি গার্ভা। চারদিকে ঘিরে মনোরম দ্রাক্ষাকুঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটো ছোটো পাহাড়। তাদের ছায়া পড়ে হ্রদের সুনীল জলরাশির বুকে। মৃদুমন্দ বাতাস কখনো বা শিশুর হাসির মতো জলের গায়ে ছোটো ছোটো টোল ফেলে ছুটে যায় হ্রদের বুকের ওপর দিয়ে। চারপাশের প্রকৃতির স্নিগ্ধ শান্ত রূপ মনে এনে দেয় এক নিবিড় প্রশান্তি।

তাই বোধহয় দলে দলে লোক প্রায়ই ওখানে ছুটে আসে অবসর বিনোদনের লোভে, এই অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য।

হ্রদের একধারে ছোট্ট শহর রিভা। অধিবাসীরা শ্রমপটু। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেতে তাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। অতিথিপরায়ণ বলেও তাদের যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে।

গল্পের শুরু এই রিভাতেই। ১৯৫৪ সালে। গ্রীষ্মকালে।

একদল শ্রমিক গাঁইতি কোদাল চালাচ্ছে শহরের বাইরের মাটির ওপর। একটা খানা খোঁড়া হবে এখানে। ধপাধপ শব্দে তাই কোদালগুলো উঠছে নামছে। সহসা একজন শ্রমিকের বেলচা ঠক করে কি একটা শক্ত জিনিসে আঘাত করল।

অন্য কেউ হলে হয়ত জিনিসটাকে পাথর ভেবে আবার বেলচা চালাত কিন্তু ইতালির এ অঞ্চলের শ্রমিকরা অতটা নির্বোধ নয়। তারা জানে রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু এই ইতালির মাটিতে এখনো লুকিয়ে আছে বহু পুরাকীর্তি। তাছাড়া আগের বছরই রিভা থেকে পাওয়া গেছে কিছু রোমান আমলের মুদ্রা আর পাত্র।

সুতরাং মাটির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা জিনিসটার ওপর বেলচা দিয়ে আঘাত না করে ধীরে ধীরে মাটি সরাতে লাগল শ্রমিকটি। ধৈর্য নিয়ে খানিকক্ষণ কাজ করার পর দৃষ্টিগোচর হলো বস্তুটি। সহকর্মীদের ডেকে আনল সে জিনিসটা দেখানোর জন্যে।

জিনিসটার ওপরটুকু দেখা যাচ্ছে। নানা রকম কারুকাজ তাতে। পাথরের তৈরি বলেই মনে হয়।

রোমান আমলের বলে মনে হচ্ছে না? মন্তব্য করল একজন শ্রমিক।

অন্যেরা নিচু হয়ে মনোযোগ দিল মাটি সরিয়ে জিনিসটাকে মুক্ত করার জন্যে।

মিনিট দশেক পরিশ্রম করার পর বেরিয়ে এল বস্তুটি—ফুট ছয়েক লম্বা একটি পাথরের তৈরি শবাধার।

সন্তর্পণে শবাধারের ঢাকনাটা টেনে দেখল প্রথম শ্রমিকটি। কিন্তু বহু শতাব্দীর ধুলো-কাদা ঢাকনার জোড়ের মুখ বুজিয়ে তাকে একেবারে আটকে ফেলেছে। এতটুকু নড়ল না সেটা।

নিরাশ হলো না তবু শ্রমিকটি। বেলচার কানা দিয়ে জোড়ের মুখ থেকে ধীরে ধীরে চেঁচে ফেলল সবটুকু কাদা মাটি। এবার আলগা হলো ঢাকনা। অন্য একজন শ্রমিক ধরল ঢাকনার অন্য দিকটা। তারপর দুজনে মিলে ধরাধরি করে খুলে ফেলল সেটিকে।

বহু বহু শতাব্দী পরে আবার সূর্যালোক স্পর্শ করল শবধারের অভ্যন্তর। শ্রমিকেরা সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ল তা ভালভাবে দেখার জন্য।

এ ধরনের পুরনো কোনো শবাধারের মধ্যে মানুষ যা দেখবে বলে আশা করতে পারে তাই ছিল। অস্থি-সর্বস্ব একটি নরকঙ্কাল। তা দেখে আদৌ কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না শ্রমিকদের মনে। কিন্তু প্রত্যেকেই বিস্ময়ে হতবাক অন্য একটা ব্যাপারে।

কঙ্কালটি মস্তকহীন। শবাধারের মধ্যেও কোনো চিহ্ন নেই লুপ্ত মাথাটির!

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল শ্রমিকেরা। কফিনটা রোমান যুবকের বলেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকটার মাথাটা গেল কোথায়? এরকম একটা খাপছাড়া জায়গাতেই বা কেন কবর দেওয়া হয়েছিল লোকটাকে?

টেলিফোনে খবর গেল কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে রিভার মিউজিয়াম থেকে লোক এসে সাবধানে তুলে নিয়ে গেল কফিন আর কঙ্কালটিকে।

সেদিন রাতের মধ্যে সারা শহরে ছড়িয়ে গেল এই অদ্ভুত আবিষ্কারের খবর। শহরের প্রত্যেকটি লোকের মনে জাগল সেই একই প্রশ্ন—শবদেহের মাথা কোথায় গেল? প্রত্যেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল কোনো বিশেষজ্ঞের মতামতের জন্য।

স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলেন যে শবাধারটি নিশ্চিতভাবে রোমান আমলের এবং কম করে হাজার দুয়েক বছরের পুরনো।

কিন্তু হারানো মাথার রহস্য ভেদ করতে তাঁদের যথেষ্ট বেগ পেতে হলো।

কফিনের চেহারা দেখে এ-কথা মনে হয় না যে কোনো কালে কোনো দুষ্টলোক কফিন খুলে মুণ্ডুটা চুরি করেছে। বরং এমনই জরাজীর্ণ রূপ সেই কফিনের যে মনে হওয়া স্বাভাবিক হাজার দুয়েক বছরের মধ্যে তাতে আর কখনও মানুষের হাত পড়েনি।

তবে? অনেক ভেবেচিন্তে সমাধানের একটা সূত্র বের করলেন ঐতিহাসিকেরা।

সেকালে কোনো রোমান সৈন্য কোনো গুরুতর অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেবার একটা অদ্ভুত প্রথা ছিল। প্রথমে অপরাধীর মুণ্ডুচ্ছেদ করা হতো। তরপর মুণ্ডুহীন দেহটিকে কবর দিয়ে মুণ্ডুটিকে খুঁটিতে পুঁতে রাখা হতো কোনো প্রকাশ্য জায়গায়। সবার চোখের সামনে—একটু একটু করে পচে ক্রমে বীভৎস রূপ ধারণ করত সেটি—যেন নীরবে হুঁশিয়ার করত সবাইকে, ওহে বাড়াবাড়ি করো না, তাহলে তোমারও এই দশা হবে।

ঐতিহাসিকরা বললেন আবিষ্কৃত কঙ্কালটিও বোধহয় এই রকম কোনো হতভাগ্যের।

সমাধান হলো রহস্যের। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এবার ঠিক করলেন শবাধার আর কঙ্কাল রাখা হবে মিউজিয়ামে। দর্শকদের দৃষ্টির সামনে।

ধীরে ধীরে সযত্নে পরিষ্কার করা হলো শবাধারটিকে। গা থেকে চেঁচে ফেলা হলো মাটির শেষ চিহ্নটুকু। অস্থিগুলি একসঙ্গে ভালোভাবে জোড়া হলো তার দিয়ে।

এরপর কঙ্কালটি রাখা হলো মিউজিয়ামের প্রধান হলঘরে। খালি শবাধারটির ঢাকনা বন্ধ করে রাখা হলো কঙ্কালের পাশেই।

কয়েকদিন ধরে টুরিস্টরা তো বটেই, এমনকি স্থানীয় অধিবাসীরাও ভিড় জমাতে লাগল এই অভিনব প্রদর্শনী দেখার জন্যে।

ইতালির বহু পত্রিকা আর সংবাদপত্রেও ছাপা হলো অদ্ভুত সব ঘটনা।

মিউজিয়ামের কিউরেটর বেশ দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। রোজ সকালে অন্যরা আসার আগেই মিউজিয়ামে চলে আসেন। তালা-টালা খোলেন, সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নেন। কাছেই থাকেন, সকাল সকাল আসতে কোনো অসুবিধে হয় না।

সেদিন সকালেও তিনি সবার আগেই এসেছেন। তালা খুলেছেন। কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে হলঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময়ে আর আতঙ্কে তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

কঙ্কালের পাশে রাখা শবাধারটির ঢাকনা খোলা।

ত্রস্ত পদে এগিয়ে গেলেন ঘরের ভেতর। যা দেখলেন তাতে বিস্ময় বাড়ল বই কমল না। একেবারে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা। ঘরময় ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে টুকিটাকি জিনিসপত্র। মৃৎপাত্রগুলো কে যেন তাদের স্ট্যাণ্ড থেকে এদিক ওদিক-সরিয়ে রেখেছে। দেওয়ালে ঝোলানো অস্ত্রশস্ত্রগুলোকেও কে যেন মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। লোহার ফ্রেমে ভর দিয়ে কঙ্কালটা তখনও দাঁড়িয়ে। সেটা যেন সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে।

ঘাবড়ালেন না ভদ্রলোক। এ হেন রক্ত জমানো পরিস্থিতিতেও ঠাণ্ডা রাখলেন মাথা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন কিছু খোয়া গেছে কিনা। না, কিছু হারায়নি বলেই মনে হচ্ছে। অতঃপর পা চালালেন তিনি দ্বাররক্ষীটির উদ্দেশে, যে সারারাত মিউজিয়াম পাহারা দেয়। জিজ্ঞেস করলেন তাকে—রাতে কিছু আওয়াজ-টাওয়াজ শুনেছিলে?

অবাক হলো রক্ষীটি, আওয়াজ! কই না। তেমন কিছু তো শুনিনি! যেমন রোজ করি, তেমন নিয়ম করে কালও তো খানিকটা পর পর চারদিকে একবার করে টহল দিয়েছি। কিন্তু সেরকম কোনো শব্দ-টব্দ তো কানে আসেনি।

হুঁ! ঘাড় নাড়লেন কিউরেটর। তার মানে এই সব অপকীর্তি ঘটেছে তোমার শেষ টহল আর আমার আসার সময়টুকুর মধ্যে।

সঙ্গে করে রক্ষীটিকে ওপরে নিয়ে গেলেন কিউরেটর কী ঘটেছে দেখানোর জন্যে।

ঘরের অগোছাল চেহারা দেখে আশ্চর্য হলো দ্বাররক্ষী। কাল রাতে এত কাণ্ড ঘটে গেছে আর সে কিচ্ছু টের পায়নি। বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে ঘর থেকে বিদায় নিল সে।

খানিক বাদে মিউজিয়ামের অন্যান্য কর্মচারীরাও এল। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে তারাও কম অবাক হলো না। হয়ত এই নিয়েই সারাদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা চালাত তারা, কিন্তু কিউরেটর ভদ্রলোকটি বেশ তৎপর মানুষ, ব্যাপারটাকে বেশি বাড়তে দিলেন না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলতে। বাকিদের পাঠালেন গোটা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

খানিক বাদে বিফল হয়ে ফিরে এল তারা। না, সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি। সব দরজা-জানলা বন্ধই আছে, কোনো তালাটালাও ভাঙা নেই। রাত্রে কেউ ঢোকেনি বলেই মনে হয়।

চিন্তা বেড়ে গেল কিউরেটরের। চিহ্ন না রেখে গেলেই বা, কেউ যে এখানে ঢুকেছিল তাতে তো সন্দেহ নেই। যে পথে ঢুকেছিল সে পথে যদি আবার ঢোকে! সারা মিউজিয়াম তো দামী দামী জিনিসে ভর্তি। ঝুঁকি নিতে রাজি হলেন না তিনি। ঠিক করলেন মিউজিয়ামের সব তালা বদলে ফেলবেন।

মিউজিয়াম কর্মীদের তৎপরতায় সেদিনের মধ্যেই হতশ্রী হলঘরটা আবার আগের রূপ ফিরে পেল। মাটিতে ছড়ানো জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখা হলো, সামনে ঝুঁকে থাকা কঙ্কাল আবার আগের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল, শবাধারের ঢাকাও আবার নিজের জায়গায় চড়ে বসল।

সবই ঠিক হলো, কিন্তু পরের দিন সকালে গিয়ে কী দেখবে এই উৎকণ্ঠায় সে রাত্রে মিউজিয়াম কর্মীদের কারোর ভালো করে ঘুমই হলো না। দ্বাররক্ষীটিও রাতের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিল হলঘরে পায়চারি করে।

কিউরেটরেরও রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তাই ভোর হতে না হতেই তিনি এসে হাজির হলেন। তালা খুলে তড়িঘড়ি হাজির হলেন হলঘরে।

না, এবার আর কিচ্ছু ওলটপালট হয়নি। সব আগের মতই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কিউরেটর। যাক বাবা, বাঁচা গেছে!

পর পর দুটি সপ্তাহ কেটে গেল। সেদিনকার ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটল না। কিউরেটরের মন থেকেও প্রায় মুছেই এল সেদিনের গা ছম-ছম করা ঘটনার কথা।

কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহের সোমবার সকালে মিউজিয়ামে ঢুকে প্রথমবারের মতোই শিউরে উঠলেন।

ঠিক আগের বারের মতোই ঘরের লণ্ডভণ্ড অবস্থা! শবাধারের ঢাকনা খুলে নিচে নামানো কঙ্কালটি সামনে ঝুঁকে রয়েছে। ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো।

এ ছাড়াও আর একটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল তাঁর। কঙ্কালটির পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে প্রাচীন একটি রোমান লম্প।

বিস্মিত হলেন তিনি। এ ধরনের লম্প বহু বহু যুগ আগে প্রাচীন রোমের চোর-ডাকাতেরা ব্যবহার করত। এ জিনিস এখানে এল কোত্থেকে! মিউজিয়ামে তো ছিল না!

কিন্তু অবাক হতে তখনো বোধহয় একটু বাকি ছিল। লম্প থেকে চোখ তুলতেই তাঁর নজর পড়ল এক কোণে রাখা একটা রোমান বেদীর ওপর। সেখানেও কারুর হস্তক্ষেপ ঘটেছে।

বেদীটি রোমান বজ্রবিদ্যুতের দেবতা জুপিটারের। কিউরেটরের চোখে পড়ল সেই বেদীর নিচে পড়ে আছে বেশ কিছু ছাই। যেন দেবরাজের উদ্দেশে কেউ আগের রাত্রে হোম করেছে।

ক্রমে জানতে পেরে কর্মচারীরা এল। আগের মতো সারা মিউজিয়াম তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। এবং ঠিক আগের মতোই কর্মচারীরা চোরের আগমনের কোনো প্রমাণ খুঁজে পেল না।

রহস্যের জট ক্রমে বেড়েই চলল।

ফলে যা হওয়ার তাই হলো। শহরের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল এইসব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডকারখানার কথা। গল্পের আসর আরও সরগরম হয়ে উঠল। গুজব আর আলোচনার তুফান ছুটল। বিজ্ঞের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধেরা বলল—হুঁ, হুঁ বাবা! হবে না কেন? কবেকার পুরনো মড়া তারপর কোন বজ্জাত লোকের তার ঠিক নেই। তাকে তুলে এনে ঘরে রাখলে হবে না এইসব কাণ্ড! কারুর গলা টিপে যে মারেনি এই রক্ষে!

শহরের কর্তৃপক্ষ অবশ্য বুড়োদের মতো অত কুসংস্কারগ্রস্ত নন। তাঁরা ব্যাপারটাকে চালাতে চেষ্টা করলেন স্রেফ কোনো চোরের কাজ বলে। কিন্তু একটা ব্যাপারের ব্যাখ্যা তাঁরা কিছুতেই দিতে পারলেন না—দু'বারই কিছু চুরি যায়নি। এমন বোকা কোনো চোর নেই যে দু'দুবার কোনো চিহ্ন না রেখে চুরি করতে ঢুকেও কিছু না নিয়ে পিটটান দেবে। বিশেষত যখন মিউজিয়ামে যেসব জিনিসপত্র আছে তার দাম বহু লক্ষ টাকা।

এদিকে মিউজিয়ামের আর অন্যান্য কর্মচারীদের উৎকণ্ঠার চোটে আহার-নিদ্রা লোপ পাবার যোগাড়। তাদের সবার মাথায় তখন সেই এক চিন্তা—আবার যদি কিছু হয়?

কিছু হবার জন্য অবশ্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না।

এই ঘটনার চার দিন বাদে কিউরেটর মিউজিয়ামে ঢুকতেই রক্ষীটি এসে সামনে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টিতে কিউরেটর লক্ষ্য করলেন চেহারা তার অস্বাভাবিক রকমের পাণ্ডুর, ফ্যাকাসে। ভয়ে সে কাঁপছে থরথর করে।

কী, কী হয়েছে? ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কিউরেটর। উত্তর দিতে পারল না রক্ষীটি। বাক্‌রোধ হয়ে এল তার। কোনোমতে আঙুল তুলে দেখাল প্রধান হলঘরটার দিকে।

বুকের ভেতর মাথা চাড়া দেওয়া ভয়টাকে জোর করে দমিয়ে রেখে সেই দিকে পা চালালেন কিউরেটর। রক্ষীর ভয়ের উৎসটা দেখা দরকার।

হলঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল ঘরের লণ্ডভণ্ড চেহারা। এবারের অবস্থা আগের দুদিনের চেয়ে আরও খারাপ। অন্যান্য বারের মতো মেঝেতে জিনিসপত্র তো ছড়ানো রয়েছেই তাছাড়াও স্ট্যাণ্ডগুলো সব ওল্টানো। শোকেস সমস্ত ভাঙা। দেওয়াল থেকে নানা জ্ঞাতব্য তথ্য লেখা লেবেলগুলোকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। নোটিশ বোর্ড ভেঙে ফেলা হয়েছে। দামী দামী সব পুরাকীর্তি জঞ্জালের মতো স্তূপাকার করে রাখা। সার ঘরময় ছড়ানো রয়েছে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। রোমন ছোরা-তরোয়াল তো বটেই, এমনকি বন্দুক-পিস্তল পর্যন্ত।

ঘরের যা চেহারা তাতে তো মনে হচ্ছে যেন ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধই হয়ে গেছে। কিন্তু রাতদুপুরে মিউজিয়ামে ঢুকে কেই বা মারামারি করবে? তাছাড়া রক্ষীটি ভয়ই বা পেল কিসে?

ভয় কিসে পেল তা দেখার জন্যে কিউরেটরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। দু' পা এগোতেই তাঁর চোখে যে দৃশ্য পড়ল তাতে তাঁর নিজেরও শরীর হিম হয়ে এল।

কঙ্কালটি আর স্ট্যাণ্ডে নেই, পড়ে আছে মাটিতে। পাগুলো এদিক-ওদিক বেঁকে রয়েছে অদ্ভুত ভাবে। একটা হাত চাপানো বুকের ওপর। অন্যটা আড়াআড়ি ভাবে ছড়ানো মেঝেতে।

আর তার পাঁজরের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে মাটিতে গেঁথে রয়েছে একটা প্রাচীন রোমান ছুরি!

দুরু দুরু বক্ষে নিচু হয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলেন কিউরেটর। হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই। মানুষের যেরকম জায়গায় হৃৎপিণ্ড থাকে সেরকম জায়গাতেই ছুরিকাহত হয়েছে কঙ্কালটি।

রহস্য কিন্তু রহস্যেই থেকে গেছে। আজও সমাধান হয়নি। কে লণ্ডভণ্ড করত সারা ঘর? কঙ্কালটা? কেন করত, কিসের খোঁজে? নিজের হারানো মাথাটার? কিন্তু কেই বা ছুরি মারল তাকে?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি, হয়ত যাবেও না। তবে আশ্চর্য ব্যাপার কঙ্কালটা সেদিন ছুরিবিদ্ধ হওয়ার পর আর কোনোদিন জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে কাউকে জ্বালাতে আসেনি। মৃত্যুর দু'হাজার বছর পরে আরও একবার বোধহয় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাকে।

অগ্রহায়ণ ১৯৯১

সন্দেহজনক বাড়ি

অশোক কুমার সেনগুপ্ত

'ভূতের ভয় আর দেখাবেন না মশাই, নিজেই ভূত হয়ে গিয়েছি। নইলে মাঘ মাসের বৃষ্টিবাদলায় কনকনে এমন শীতে চাদর মুড়ি দিয়ে আপনার কাছে আসি বাড়ির খবর নিতে!'

রাস্তার ধারে ঝুপসি চায়ের দোকানে কালচে বেঞ্চিতে বসে শম্ভু চাটুজ্জে রাগ রাগ মুখ করে। মাফলারের পাকে মাথা ঘিরে কান এবং গালের অনেকখানি ঢাকা, গায়ে শাল, কালচে প্যান্টের সঙ্গে পায়ে কালো মোজা, বুট জুতো, হাত বরাবর কালো সোয়েটার। গ্লাসের গরম চা ভাপ তুলছে। শম্ভু ঘনঘন চুমুক দিয়ে বুঝি উষ্ণতা কুড়োয়।

মানুষটা শীতকাতুরে বটে। অল্পেই হি-হি করে। কত আর বয়স। এই তো পঞ্চান্ন। মাঝারি স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ শ্যামলা। গড়নে লম্বাপনা ভাব আছে। নেহাতই বাস্তুসংগ্রহের ব্যাপার, তাই এমন বাদলা শীতসন্ধ্যায় বাইরে এসেছে। নইলে তার মতো মানুষের এখন ঘরের বিছানায় আরাম করে বসে থাকার কথা।

জমি, বাড়িঘর কেনাবেচার দালালি করে পরেশ পাত্র। রোগাটে চেহারা, ছোটখাট মুখ। গলার স্বর মিনমিনে। সহজে রাগতে জানে না। খদ্দের সন্তুষ্টির জন্যে তালে তাল দিতে ওস্তাদ। পাজামা-শার্টের উপর একটা নীল সোয়েটার। শীতের তোয়াক্কা নেই। কর্পোরেশনের পিয়ন। জমি লেনদেনের কারবার করে দু'পয়সা করেছে।

পরেশ বলল, 'যা বলেছেন। আমিও তো ভূত। নইলে টাইম দিয়েছি বলে এমন জলবাদলায় খবরটা দিতে আসি! টাইম দিয়েও তো ফেল করা লোকের স্বভাব।'

'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু এটাকে খবর বলছেন কী করে! আমার তো মনে হচ্ছে এটা খবরের অপমান। এসে বলছেন—'

'পুরনো বাড়ি। চারখানা রুম, বারান্দা, রান্নাঘর, খানিকটা বাগানও আছে। তবে ভূতের—।'

'দু'বার বলেছেন। আর রিপিটের কোনো দরকার নেই।'

'আহা আপনার কাছে তো গোপন করতে পারি না।'

'মালিক তো ভূত নিয়েই বাস করছেন। পোড়োবাড়ি তো নয়।'

'যথার্থ বলেছেন। মালিক মানিক চক্রবর্তী একা থাকেন। থাকার মতো আছেই বা কে। একটা মেয়ে ছিল। দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে মেয়ে-জামাই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়।'

'তাহলে মানিক চক্রবর্তীর পর সম্পত্তি ভোগ করার কেউ নেই?

'ঠিক ধরেছেন। বিক্রি করে ভদ্রলোক ভারত ভ্রমণ করে বেড়াবেন।'

'যা খুশি করুন। উনি নিজে ভূতের কথা বলেছেন?'

পরেশ পাত্র বলল, 'কী যে বলেন, উনি কেন বলবেন! এটা পাড়ার লোকের কথা। মিথ্যেও হতে পারে। ও বাড়িতে নাকি রাত্রিবেলায় শব্দ হয়, অনেক লোকের গলা শোনা যায়। কী জানেন আপনি নিরঞ্জনবাবুর লোক, আপনার সঙ্গে কাজ-কারবার এক্কোবারে ফ্রেশ রাখতে চাই, পরে দোষ যাতে পেতে না হয়। আপনি যাতে না কিছু বলতে পারেন।'

'আপনাকে যে বলব তার সুযোগই তো দিচ্ছেন না মশাই। এখনও একটা বাড়ি দেখে দিতে পারলেন না। যদিও দিচ্ছেন তাও—'

'কী করে দিই! আপনার দু'লাখের মধ্যে চাই। ভেরী হার্ড। শিবপুরে তো—'

শম্ভু চাটুজ্জে বাক্য শেষ করে দেয়, 'সাড়ে চার লাখ দাম। ওটা অনেকবার বলেছেন। আমার ধাড়সাই ভাল। যেমন মুরোদ। খানিকটা হেঁটে তো রামরাজাতলা।'

'আবার ওদিক দিয়ে গেলে বালটিকুরি।'

'আচ্ছা পরেশবাবু, আপনি কী ভূতে বিশ্বাস করেন?'

পরেশ একটুক্ষণ নীরব থেকে বলল, 'নাও বলতে পারছি না, আর হ্যাঁও না। নিজে তো কোনোদিন দেখিনি। তবে শুনেছি।'

'সবাই শোনে। কিংবা গল্পে পড়ে। চাক্ষুষ করা লোক আমার জানা নেই।'

পরেশ স্বভাববশত বলল, ঠিক কথা। 'আমারও জানা নেই।'

শম্ভু চাটুজ্জে বলল, 'তাহলে কথাটা বলে আপনি আমাকে অযথা ভয় ধরাচ্ছেন কেন?'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন।'

'কী আশ্চর্য রাগের কথায় রাগব না! আমার রাগ কী অন্যায়? আমি কী মানুষ নই?'

পরেশ নিরুত্তর থাকে অল্পক্ষণ। তারপর বলে, 'ওই বাড়িটাই তাহলে নিয়ে নিন। আপনার দামেই পড়বে।'

বৃষ্টি পড়ছে অন্ধকারে। হিম বাতাসের তরঙ্গ শরীরের খোলা জায়গাগুলো চেটে নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সামনের রাস্তা ধরে শব্দ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। মানুষ চলাচল করছে খুবই কম। আটটাও বাজেনি। দোকানে খদ্দের নেই। ওদিকে ঝিমিয়ে বসে আছে দোকানদার। তাদের কথা শুনছে। কিন্তু কোনো মন্তব্য করছে না। সিগারেট কেনার একটা খদ্দের আসতে লোকটা নড়াচড়া করল, তারপর যেমনকার তেমন।

শম্ভু চাটুজ্জে বলল, 'তাই নেব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'সামনের রবিবার চলুন, দেখে নেবেন বাড়িটা।'

'কেন কাল-পরশু হয় না?'

'আমি কালই কোলাঘাট যাচ্ছি। দাদার শরীর খারাপ। ফিরতে দু'তিন দিন তো লাগবে। আপনি তো জায়গাটা চেনেন। বাড়ি খোঁজাও কঠিন নয়। দেখে নিতে পারেন এর মধ্যে। তারপর ফিরলে আবার সঙ্গে যাবেন।'

'মন্দ বলেননি। দেখি যদি পারি। তাহলে ওই কথা রইল।'

চায়ের দোকানের পয়সা মিটিয়ে দু'জনেই উঠে পড়ল। পরেশ পাত্রের কাছাকাছি বাড়ি। শম্ভু চাটুজ্জেকে সে বাসে তুলে দিল মোড়ে এনে।

শম্ভু চাটুজ্জে দিব্যি ভাড়া বাড়িতে ছিল। বাড়িওয়ালা সাহাবাবুর সঙ্গে ভাবসাবও ছিল। ভদ্রলোকের ছেলে নেই, একটি মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। সাহাবাবু মারা যেতে মালিকানা বর্তাল মেয়ে-জামাইয়ের উপর। জামাইয়ের ব্যবহার সুবিধের নয়। তাকে তুলে বিক্রির মতলব আছে। তোলা অবশ্য সহজ নয়। ছেলেরা বাড়ি ছাড়তে চায় না। ভাড়াটের অধিকারের জোর প্রয়োগ করতে চায়। উঠতে হলে কিছু টাকা আদায় করবে। তবে শম্ভুর ওসব মতলব নেই। মানে মানে সরে পড়তে চায়। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। কোনো ঘোরপ্যাঁচে যায় না। সরকারী চাকরি আর সংসার নিয়ে জীবন পার করে দিল। বড় ছেলে প্রদীপ এখনও চাকরি পায়নি। বি এ পাস করে শর্টহ্যান্ড-টাইপ রাইটিং শিখে চেষ্টা চালাচ্ছে। ছোটটি সায়েন্স নিয়ে পড়ছে, সামনের বারে পার্ট টু পরীক্ষা। শম্ভুর আর বছর তিনেক চাকরি। শহরে থাকতেই হবে।

শম্ভু চাটুজ্জের দেশগাঁ বাঁকুড়া। সামান্য জমিজায়গা, ছোটখাট একটা বাড়িও আছে। দেখাশোনা করে খুড়তুতো ভাই। শম্ভুর তো মতলব ছিল অবসরের পর গাঁয়ে চলে যাবে। কিন্তু কী করে যাওয়া যায়! ছেলে দুটির ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। গাঁয়ে গিয়ে তারা তো কিছুই করতে পারবে না। মধ্য হাওড়ায় বড় হলো—ছাড়তে চায় না শহর। এদিকে তাকেও অন্তত তিন বছর শহরে থাকতে হবে। জামাইয়ের সঙ্গে তিক্ত ব্যবহার করে কাঁহাতক টেকা যায়। অন্য বাড়ি ভাড়া পাওয়া কঠিন, পেলেও ভাড়া কয়েকগুণ বাড়বে। বাড়িওয়ালার ব্যবহার মধুর হবে, এমন সম্ভাবনাও নেই। ঢের ভাল একটা ছোটখাট বাড়ি কেনা কিংবা সওয়া কাঠা-দেড় কাঠা জমি কিনে ছোটখাট বাড়ি বানানো। তার জন্যেই নিরঞ্জনবাবুর মাধ্যমে পরেশ পাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ।

শম্ভু ধাড়সার চক্রবর্তীদের বাড়িতে ভূতের বদনাম আছে বাড়িতে বলল না। ওরা আপত্তি করতে পারে। প্রদীপের মা তো করবেই। ভূত না হাতি। একটা মানুষ থাকে ও বাড়িতে, ভূত থাকলে কী বাস করতে পারত!

যাই হোক, শনিবারের ধৈর্য থাকল না শম্ভুর। বাড়িটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। খদ্দেরের অভাব নেই। এখন ভূতকে মানুষ ভয় করে না। ভূতই করে। পরদিনই অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে ধাড়সা যাত্রা করল সে। রামরাজাতলা স্টেশন থেকে রিকশা।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টিবাদলার পর বিকেল থেকে আকাশ স্বচ্ছ হলেও তেড়ে শীত নেমেছে। শালমুড়িকেও তোয়াক্কা করছে না হিমেল হাওয়া। রিকশাওয়ালা চক্রবর্তী বাড়ি দেখিয়ে দিল। বলল, 'এই তো, হেঁটে যান। আর রিকশা যাবে না।'

এ সব জায়গা ধানী মাঠ, পুকুর-ডোবা, জঙ্গল ছিল একদিন। হাওড়া শহর বেড়ে ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছে। নতুন বাড়ি, নতুন দোকান গড়ে উঠছে। ডোবা-পুকুর বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। আগে ছিল গ্রামপঞ্চায়েত। এখন কর্পোরেশনের আওতায় পড়েছে। এবড়োখেবড়ো পথ। একতলা বাড়ি, নারকেল গাছ। আলো এখানে-ওখানে ছিটিয়ে থেকে অন্ধকারকে ভেঙে দিয়েছে।

সরু গলি। আলো-অন্ধকারের আবছায়ায় শম্ভুর চোখে পড়ল বাঁদিকে একটা টিউবওয়েল, ডাইনে মাঝারি সাইজের ক'টা নারকেল গাছ। একটা লোক হেঁটে আসছে মাফলার-কোট-প্যান্টে। জিজ্ঞাসা করতেই দরজা দেখিয়ে দিল। কালো দরজা। কড়া নাড়ার পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল চক্রবর্তী। অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না। শীত রুখতে সর্বাঙ্গ ঢাকা। দরজার কপাটের পাল্লা সরতে শম্ভু বারান্দা দেখতে পাচ্ছিল। মিটমিট করছে ষাট পাওয়ারের আলো। সামনের জায়গাটায় তরল আঁধার যেন ভিজিয়ে রেখেছে।

'এটা তো চক্রবর্তী, মানে—'

'হ্যাঁ। আসুন। আসুন।'

ভেতরে ঢোকার পর শম্ভু দেখল, না, আলোর ঢের উজ্জ্বলতা। সামনের ঘরটা সাজান-গোছান। খাট-আলমারি-চেয়ার-টেবিল। দেওয়ালের নীলাভ বর্ণটিও যথেষ্ট ঝকঝকে। চক্রবর্তীর ধবধবে সাদা চুল, গায়ের রঙও ফরসা, দু'ভাঁজ ধুতির উপর কালো নকশাদার শাল, মাথায় হনুমান টুপি।

'এই যে চেয়ার। বসুন।'

'আমি এসেছিলাম—'

'জানি। আপনার খবর আমি পেয়েছি।'

'আমার শনিবার আসার কথা ছিল।'

চক্রবর্তী সাদা দাঁতে হাসল, 'আগে এসে পড়েছেন। তাতে কী হয়েছে! তবে সন্ধ্যেবেলায় এলেন, দিনের বেলা হলে ঘর, ওদিকের বাগান ভাল করে দেখতে পেতেন। তবে দিনের বেলা আমার সঙ্গে—' চক্রবর্তী কথা শেষ করে না।

'আবার তো আসছি।'

'আসবেন বৈকি। নিশ্চয়ই আসবেন।'

'আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রি করে নিতে চাই। কাগজপত্র দেখাশোনা করতে যা সময় লাগে।'

'সব ক্লিয়ার। কোনো জটিলতা নেই। আমরা পুরোনো বাসিন্দা। সাত পুরুষের বাস। ষোড়শী চক্রবর্তী বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে আসেন। আমাদের বংশের যে এ দশা হবে কে জানত! এলাকাটাই তো আমাদের ছিল। এ বাড়ি যে দেখছেন এর বয়স খুবই কম। বড়জোর একশ বছর। আদি বাড়ি ছিল পিছনের দিকে। এখনও ইঁটের স্তূপ রয়েছে। শরিকরা সব বিক্রিবাটা করে সরে পড়েছে। ভাবা যায় না মশাই। পুরোনো কথা বলতে গেলে বুক হু-হু করে ওঠে। আপনার কথা বলুন।'

'পরেশ পাত্র বলেনি?'

'পরেশ পাত্র! সে আবার কে?'

শম্ভু চাটুজ্জে অবাক হয়, 'আপনার এ বাড়ি তো বিক্রি করবেন?'

'হ্যাঁ। সে কথাই তো হচ্ছে। তার জন্যেই তো আপনি এসেছেন।'

শম্ভু চুপ। ভাবে পরেশ পাত্র ছাড়া তার কথা আর কে বলেছে? উঁহু, তার কথা নয়। হয়তো অন্য খদ্দের আসার কথা ছিল। ভদ্রলোক ভুল করে তাকেই ধরেছেন।

'দেখুন আমি শম্ভু চাটুজ্জে।'

'জানি। ঘোষ লেনে থাকেন। সাহাবাবু সব বলেছে। আপনার বাড়িওয়ালা। সাধন সাহা। আপনার প্রশংসা করছিলেন। জামাই নাকি সুবিধের নয়।'

বাড়িওয়ালা সাধন সাহার কথা বলছে। কী আশ্চর্য! তাহলে মরে ভূত হয়ে তার উপকার করতে এসেছিল। ভালবাসত লোকটা। তা বলে! শম্ভু বলল, 'তিনি তো—'

'কেন তাঁর কী হয়েছে?'

'মারা গিয়েছেন সাহাবাবু।'

'বলেন কী! কবে মারা গেলেন?'

'প্রায় ছ'মাস হতে চলল।'

'কী যে বলেন, উনি শনিবারই এসেছিলেন।'

'তার মানে সাহাবাবু ভূত হয়ে—'

চক্রবর্তী কথা শেষ করতে দেয় না, 'তাতে কী। ভূত আর মানুষ তো মেশামেশি। কে ভূত কে মানুষ চেনা কী সোজা! যত লোক দেখেন, সবাই মানুষ হলপ করে বলতে পারেন! আপনি-আমি, আমাদের মধ্যে যে কেউ ভূত হতেই পারে।'

সাহাবাবুর ভূত, তারপর এঁর ভূতকে সার্টিফিকেট দেওয়া, নিজেকে ভূত বলা শম্ভু চাটুজ্জের বুক কাঁপিয়ে দেয়, 'আপনি—আপনি—'

'আরে আপনি যে ভয় পেয়ে গেলেন! দূর মশাই, কথাতেই এমন ভূত চিনতে পারলে তো ভিরমি খাবেন বাজারে দোকানে বাসে ট্রেনে।' চক্রবর্তী হাসতে থাকল।

চক্রবর্তীর কথা শুনে শম্ভু চাটুজ্জে ভাবল, ঠিক কথা। ভূতের বদনাম এ বাড়িটার আছে। এর ভূতের সঙ্গে থেকে ভূতভয় কেটে গিয়েছে।

'চলুন, ঘরগুলো দেখবেন।'

'হ্যাঁ চলুন।'

শম্ভু চাটুজ্জে দেখল ঘরগুলো খুব পুরোনো নয়। সব ঘরেই জিনিসপত্র রয়েছে। মনে হচ্ছে

চক্রবর্তী একা নয়, আরও মানুষ বাস করে। বাগানটাও পরিষ্কার। কিনেই তাকে খরচা করে সারাতে হবে না। বাস করা যাবে স্বচ্ছন্দে।

'কী, পছন্দ হয়েছে?' চক্রবর্তী প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।'

'আপনি তো চলে যাবেন।'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই।' দীর্ঘশ্বাস পড়ে চক্রবর্তীর।

চক্রবর্তী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। শম্ভু চাটুজ্জের কাছে সমগ্র ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময় ঠেকছিল। রিকশা ধরতে খানিকটা হাঁটতে হলো তাকে। ভাবল, সাহাবাবুর ভূত হয়ে আসাটা অবিশ্বাস্য। পরেশ পাত্র আর সাধন সাহা নামের গোলমালে একজনকে আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে ফেলে চক্রবর্তী। বয়স তো হয়েছে। এমন ভুল হতেই পারে। শম্ভু নিশ্চিন্ত বোধ করল। বাড়ি ফিরে কথাটা বলার জন্য মন উসখুস করলেও তুলল না।

বৌ জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা গিয়েছিলে?'

'ওই যে বলে গেলাম ধাড়সার বাড়িটার কথা। খরচা করতে হবে না। ভাঙাচোরা বাড়ি নয়, গিয়ে বাস করা যাবে।'

'ছেলেরা তো যেতে চাইছে না।' বৌ বলল, 'এখান থেকে যেতে পারলে আমি কিন্তু বাঁচি।'

'যাবে। নিজেদের বাড়ি হলে ছেলেরা আহ্লাদে যাবে। ভাড়ার বাড়ি পরের বাড়ি।'

শনিবার সকালবেলা পরেশ পাত্র নিজেই এল। বলল, 'চলুন, দেখে আসবেন।'

'বাড়ি আমি দেখে এসেছি—পরশু সন্ধ্যেবেলা।'

'সে কী! পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তবে কথা হয়নি। আপনি না থাকলে কথা কী করে হবে। চলুন দু'জনে ফাইন্যাল করে নেব আজ। বায়না দিতে হয় দিয়ে আসব।'

'সন্ধ্যের আগে তো মানিক চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখাই হবে না। লোকটা সারাদিনই ঘুরে বেড়ায়। তাহলে সন্ধ্যেতে আসব। আপনাকে বলতে এসেছিলাম। এখন উঠি। রামতলা বাসস্ট্যান্ডে পাঁচটায় আসুন।'

'আরে বসুন। চা খেয়ে যাবেন।' শম্ভু চাটুজ্জে বলে, 'আচ্ছা বাড়িটায় অন্য খদ্দেরও লেগেছে নাকি!'

'বাড়ি থাকলেই খদ্দের লাগবেই। মানে বিক্রির বাড়ি আর কী। তবে আপনিই পাচ্ছেন। আমি ওটা ধরেছি। মানিকবাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে। আমাকে ছাড়া সেল করবে না। তবে হ্যাঁ দামদর করতে যাবেন না। আমার কথাই আছে।'

চা খেয়ে পরেশ পাত্র চলে গেল। তারপরই মনে পড়ল শম্ভুর, ইস্ জিজ্ঞাসা করা হলো না মানিক চক্রবর্তীর সঙ্গে পরশু সন্ধ্যেবেলায় কথা বলার রহস্যটার কথা। লোকটা তো পরেশকে চিনতেই পারেনি। তারপর সাহাবাবুর ভূত আমদানি করেছিল। যাক্ বিকেলেই জিজ্ঞাসা করা যাবে।

পাঁচটায় রামরাজাতলা বাসস্ট্যান্ডে দেখা হতে রিকশা করার আগে শম্ভু জিজ্ঞাসা করতে পরেশ পাত্র অবাক হলো, 'সে কী! আমি তো আপনার কোনো কথাই ওকে বলিনি! ও জানল কী করে? অবাক করলেন মশাই! আপনার বাড়িওয়ালার নামই বা জানল কী করে?'

'সাহাবাবু তো নিজেই গিয়েছিলেন। মানে সাহাবাবুর ভূত।'

'বলেন কী! ভূতের বাড়ি বদনাম আছে বলে আপনার বাড়িওয়ালাও ভূত হয়ে ওখানে গিয়েছে!'

'সেরকমই তো শুনলাম। আপনার নাম শুনে চক্রবর্তী চিনতেই পারল না।'

পরেশ পাত্র এবার অবাক হলো, 'বাড়িটা ঠিক চিনেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ, ভুল বাড়ি হলে ওসব কথা হয়!'

'বাড়িটা নোনাধরা, ভাঙাচোরা, ঘরে ভাঙা চেয়ার, একটা তক্তাপোশ, পলেস্তরা খসা দেওয়াল, একটা কাঠের আলমারি—।'

শম্ভু চাটুজ্জে বলে উঠল, 'না। না। বেশ ভাল ঘর দেখেছিলাম।'

'তার মানে ভুল বাড়ি।' পরেশ নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি মেরেছে। ভূতের বাড়ি বদনাম দিয়ে ওটা কব্জা করতে চায় অনেকে জলের দামে।'

'কিন্তু সাহাবাবু!'

'আরে মশাই জমির দালালি করি। আমার অনেক শত্রু। আপনাকে পার্টি করেছি শুনে হটানোর মতলব করতেই পারে। শিক্ষিত মানুষ, এটা বোঝেন না! কিন্তু ছাড়ার পাত্র আমি নই। বুঝলেন আমাদের লাইনটাই বাজে।'

রিকশায় দু'জনে চক্রবর্তীবাড়ির কাছাকাছি মোড়ে নামল। শীতের সন্ধ্যে নেমেছে। তারপর লোডশেডিং। হ্যারিকেন-লম্ফ জ্বলছে মোড়ের দোকানে। শীতে জানলা-দরজা বন্ধ বলে কোনো ঘরের আলোই এসে পড়ছে না পথের উপর। নারকেল কী অন্য গাছ, বাড়ি যেন কালিঝুলি মেখে একাকার হয়ে গিয়েছে।

পরেশ পাত্র নেমে বলল, 'আমার সব চেনা, পিছন পিছন আসুন।'

অন্ধকার হলেও শম্ভু চাটুজ্জে বুঝতে পারছিল এ পথেই সে এসেছে। এমনকী বাড়িটার দরজায় আসতেও সে টের পেল এই সেই দরজা। ওদিকের ঘরের সামান্য আলো এসে পড়েছে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল সেই মানুষটি, 'আপনারা! আসুন। আসুন।'

শম্ভু চাটুজ্জে স্বরে চিনল। পরেশ পাত্র বলল, 'আপনি! মানিকবাবু নেই?'

'না, নেই। ভেতরে আসুন।'

'আপনি তাহলে কে?'

'কেন এ বাড়ির মালিক। মানিকের বাবা প্রতাপ চক্রবর্তী।'

পরেশ পাত্র বলল, 'তিনি তো—'

'পরলোকে। ঠিক কথা। কিন্তু পরলোক থেকে কী আসা যায় না! এই তো এসেছি। মানিক মেয়ে-জামাইকে আনতে গিয়েছে, ওরা দার্জিলিং গিয়েছিল—।'

শম্ভু চাটুজ্জে আর দাঁড়ায়! প্রায় ছুটেই যায় অন্ধকারে। পড়তে পড়তে বাঁচে।

ওদিকে হাঁক পাড়ে চক্রবর্তী, 'আরে আসুন। আপনার সাহাবাবুও ভেতরে আছেন।'

মোড়ে আসতে দেখে পরেশ পাত্রও পিছনে এসেছে। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। কী সাঙ্ঘাতিক!

পরেশ পাত্র হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনি কী! দাঁড়াবেন তো।'

'আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন না কেন?'

'আপনার জন্যে। বুঝলেন এর মধ্যে রহস্য আছে। বাড়িটা আমার হাতছাড়া করার জন্যে—। চায়ের দোকানের জগদীশ দালালি করে। লোকটা বড়ই সন্দেহজনক।'

শম্ভু চাটুজ্জে বলল, 'লোকটোক জানি না। বাড়িটাও সন্দেহজনক। আপনি মশাই অন্য বাড়ি দেখুন।'

কার্ত্তিক ১৪০৪

বাংলো লা-বিজু

অসীম চৌধুরী

জেনারেল শর্মা বলেছিলেন, খুব সম্ভব কেন, ধরেই নাও আমি তোমাদের রিসিভ করতে বাসস্ট্যান্ডে যেতে পারব না। কিন্তু তার জন্য চিন্তা নেই, ভাওয়ালিতে আসতে কোনো অসুবিধে হবে না তোমাদের। আমি যা বলছি শুধু খাতায় নোট করে নাও।

শুভ্রা খাতা ডটপেন এনে বলল, বলুন।

লেখ, নৈনিতাল এক্সপ্রেসে চেপে হলদিয়ানিতে নামবে। মনে রেখো কাঠগুদাম নয়। কাঠগুদাম হলদিয়ানির আগের স্টেশন। সন্ধ্যেবেলা সেখানে পৌঁছে একটা হোটেলে রাতটুকু বিশ্রাম নেবে। অনেক হোটেল আছে। ওরা সকলেই আমাকে চেনে। হলদিয়ানি থেকে সকাল সাড়ে সাতটা বা আটটার সময় গোয়ালদাম যাবার বাস ছাড়ে। বাস ভাওয়ালি, গরমপানি, আলমোড়া, কৌশানি, গরুর, বৈজনাথ হয়ে গোয়ালদাম পৌঁছায় বিকেলে। তোমরা যখন ভাওয়ালি আসছ, তখন ভাওয়ালিতে নামবে। বাসস্ট্যান্ডে থাকবে আমার সাদা রং-এর জিপটা। নম্বর ডি ডি ১৪৫০। নো প্রবলেম!

বৈশাখী একটু ভীতু মেয়ে। বি. এ. ফাইনাল দিচ্ছে। দেখতে শুনতে ভালো। লেখাপড়ায় চৌখস, গান গাইতে, নাচতে পারে, দোষের মধ্যে শুধু ভয়কাতুরে। তাই শুভ্রা, কাবেরী, সুমন্ত্র আর বিক্রম ওকে দলে নিতে চায়নি। বেচারি রাত্রি হলে একা অন্ধকার ঘরে ঢোকে না, সারারাত ঘরে আলো জ্বেলে ঘুমোয়। বাঘের চেয়ে ওর ভূতের ভয় বেশি। কিন্তু তাকে না নিয়েও উপায় নেই। কারণ এই ছিপছিপে, সুন্দরী মেয়েটি যদি জেনারেল হরগোবিন্দ শর্মার বাংলোর সামনে জিপ থেকে না নামে তাদের সঙ্গে, তবে তিনি রাগবেন না হয়তো, শুধু মুখের হাসিটি মিলিয়ে যাবে।

আসলে জেনারেল শর্মার সঙ্গে তাদের পরিচয় তো ওই বৈশাখীর সূত্রেই। বৈশাখীর দাদু আর জেনারেল শর্মা একই রেজিমেন্টে ছিলেন। তার ওপর বৈশাখীর দিদিমা ছিলেন জেনারেল শর্মার দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাই বৈশাখীকে একটু বেশিই স্নেহ করেন জেনারেল। অগত্যা বৈশাখীর খুড়তুতো দিদি কাবেরী, জামাইবাবু সুমন্ত্র আর তাদের বন্ধু দম্পতি শুভ্রা ও বিক্রমকে রাজী হতেই হলো।

আর্মি থেকে অবসর নেওয়ার পর জেনারেল শর্মা থাকেন ভাওয়ালিতে। তবে ঠিক শহরে নয়। গ্রাম-শহর থেকে একটু দূরে তাঁর বাংলো। কাছেপিঠে বসতি নেই। বাংলোর বারান্দায় দাঁড়ালে শুধু চোখ পড়বে গগনচুম্বী বড় বড় গাছ, উঁচুনিচু পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়ক আর বরফঢাকা হিমালয়শিখর।

বাংলোতে থাকেন জেনারেল শর্মা আর তাঁর বহু পুরাতন ভৃত্য রাম সিং। শর্মাজী ডাকেন রামভাইয়া বলে।

বৈশাখী যখন জিপ থেকে তড়াক করে নেমে ছবির মতো বাংলো-বাড়িটা দেখে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল তখন হাসিতে মুখ ভরিয়ে এগিয়ে এলেন জেনারেল শর্মা। হাত বাড়িয়ে বললেন, ওয়েলকাম মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস!

বৈশাখী আর্তনাদ করে উঠল, ছাড়ুন ছাড়ুন জেনারেল, হাত ভেঙে যাবে যে! আমি কি আপনার রেজিমেন্টের কোনো গাড়োয়ালী নাকি?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে জেনারেল ডাক দিলেন, রামভাইয়া, ওদের সামান নামাও। তারপর সবাইকে নিয়ে চলে এলেন বাংলোর ভেতরে।

কাবেরী হাতের ব্যাগটা ডাইনিং টেবিলে নামিয়ে বলল, এবারে আর গুলতাপ্পি নয়, সত্যিকারের ভূতের গল্প বলতে হবে। যারা ভূতের ভয় পায় তারা লেপের তলায় থেকে 'সীতারাম' 'সীতারাম' জপ করতে পারে। কাবেরী আড়চোখে বৈশাখীর দিকে তাকাল।

জেনারেল শর্মা ডাইনিং রুমে সদর দরজার লিন্টালের ঠিক উপরে দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন যে যার বেডরুম বেছে নিয়ে স্নান-টান সেরে ফেল, তারপর লাঞ্চ সেরে ঘুমিয়ে নাও। দেন....রাত্রে ডিনার খেতে খেতে বা খাবার পর গল্প হবে।

জেনারেল শর্মার বাংলোর ডাইনিং রুমটা গোল। তাকে ঘিরে ঘর। চার-পাঁচটা বেডরুম, কিচেন, প্যানট্রি, ড্রেসিং রুম, রিডিং রুম। ডাইনিং রুম থেকেই ইবোনাইটের ব্যানিস্টারওলা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার ছাতে। ছাতেও একটা বড় গোছের বেডরুম। কোনো ঘরই ফাঁকা নয়। যেখানে সেটি প্রয়োজন তাই দিয়ে সাজানো। সবই ঝকঝকে।

কাবেরী-সুমন্ত্র, শুভ্রা-বিক্রম বাগানের দিকে দুটো বেডরুম বেছে নিলো। মুখ ভার করল বৈশাখী, বাঃ রে! সবাই বেশ ভাল ভাল ঘর বেছে নিলে আর আমারটা রান্নাঘরের পাশে? ক্ষুণ্ণ মনে বৈশাখী চলে এল নিজের ঘরে। ঢুকতে গিয়েই চোখে পড়ল ঠিক দরজার উপর টাঙানো একটা ফটোর দিকে। ফটোটা সুন্দরী এক ইংরেজ কিশোরীর। একমাথা কোঁকড়া চুল দুলিয়ে যেন হাসছে। বহু বছর আগেকার ফটো সন্দেহ নেই। কিন্তু অসম্ভব রকম জীবন্ত। বৈশাখী ফটো ফ্রেমের এক কোণে টাইপ করা লেখা পড়ল : ক্যাথরিন ক্লিন্টন। বর্ন ঃ ১৮৫০, ডায়েড ঃ ১৮৬৬।

মেয়েটির মৃত্যু তাহলে মাত্র ১৬ বছর বয়সে! বৈশাখী যেন চোখ ফেরাতে পারে না। তন্ময় হয়ে সেই ভুবনভোলানো হাসির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো মেয়েটির মুখটা একটু যেন নড়ে উঠল! হয়তো দেখার ভুল! অন্যমনস্ক বৈশাখীর চমক ভাঙল কার পায়ের শব্দে। পিছন ফিরে দেখল জেনারেল শর্মা!

ছবিটা কার জেনারেল সাহেব? বৈশাখী আঙুল তুলে ফটো দেখিয়ে বলল।

এই বাড়িটা গোড়ায় যাদের ছিল সেই ফ্যামিলির একটি মেয়ের। জেনারেল শর্মা বললেন, একটা নয়, দেখবে সারা বাড়িতে ক্লিন্টন ফ্যামিলির অনেক ফটো। এখানে যা যা ফার্নিচার, রান্নাঘরের কাচের বাসনপত্র দেখবে সবই সেই ক্লিন্টন ফ্যামিলির। আমার ঘরে মিসেস রোজা ক্লিন্টনের পিয়ানো আছে আর তোমার ঘরে রাখা আছে ক্যাথারিন ক্লিন্টনের অর্গানটা।....এনিওয়ে পরে সব কথা হবে। এখন তোমরা স্নান-টান সেরে নাও। লাঞ্চের সময় রামভাইয়া কলিং বেল বাজাবে। চটপট চলে আসবে।

যে যার পছন্দ করা ঘরে চলে গেল। ঘরে ঢুকে বৈশাখীর মন খুশিতে ভরে গেল। বড় বড় তিনটে জানালা। কাচের পাল্লা। ঘরজোড়া কার্পেট, মেঝে পর্যন্ত লুটোনো দামী কাপড়ের পর্দা। দেওয়াল ভর্তি সিপিয়া রং হয়ে যাওয়া বিদেশী ফটো। নেপালী ডিজাইনের একানে খাটের একধারে সেই ক্যাথারিন ক্লিন্টনেরই একটা ফুল সাইজ ফটো। পাশে এক বৃদ্ধা। মুখের মিল আছে ক্যাথারিনের সঙ্গে। ফটোটার তলায় মোটা নিব দিয়ে চাইনিজ ইংকে লেখা ঃ ও মাই ডিয়ারেস্ট গ্র্যানী.......হোয়্যার আর ইউ? ফটোটা দেখতে দেখতে বৈশাখীর মনে হলো ক্যাথারিন যেন কাঁদছে। বড় বড় দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বৈশাখীর সারা দেহ শিরশির করে উঠল। মনে হলো মেয়েটি যেন হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে। ডান হাতটা ফটো থেকে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। কানের কাছে শুনতে পেল একটি কিশোরী মেয়ের মিষ্টি গলা, গ্র্যানী...ও গ্র্যানী...আই লাভ ইউ...আই কান্ট লীভ উইদাউট ইউ।

বৈশাখীর বুকের ভেতরটা কাঁপছে। না পারছে এগোতে, না পারছে পেছোতে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ, কাবেরীদি, শুভ্রাদি, সুমন্ত্রদা, বিক্রমদা এরা যেন কেউ নেই। নিস্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে কানে আসে জেনারেল শর্মার টুংটাং পিয়ানোর সুর! বৈশাখী ভীতু হলেও দিনের বেলা ভয় পায় না। ভয় পায় রাতে। রাতের গভীরতা, নিস্তব্ধতা ওকে যেন এক অন্য জগতে নিয়ে যায়।

বৈশাখী মাথা ঝাঁকুনি দিলো। আশ্চর্য, দিনে-দুপুরে কী সব আবোল-তাবোল দেখছে! আসলে ফটোটা এত জীবন্ত যে ওর মনের আজগুবি চিন্তাগুলো গ্র্যানী আর ক্যাথারিনের অস্বাভাবিক আচরণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু কানের কাছে কে সুরেলা গালয় ফিসফিস করে বললে, আই কান্ট লীভ উইদাউট ইউ! ওর নিজেরই মনের কথাই কি?

বৈশাখী ঘরের দরজা খুলে রেখেই বাথরুমে ঢুকল। গিজারের গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। তারপর তোয়ালেতে ভিজে চুল মুছতে মুছতে ঘরে এসে দেখে ওর খাটের উপর একটা রক্তগোলাপের কুঁড়ি। ভারি আশ্চর্য হলো বৈশাখী। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল। নিশ্চয় শর্মাদাদু কোনো সময়ে ঘরে এসে রেখে গেছেন। বৈশাখী জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা টেনে সরাল। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই। বৈশাখী জানালার কাচে নাক লাগিয়ে বাইরে তাকাল। বাংলোর পিছন দিক এটা। বিস্তীর্ণ আপেল, চেরী ফলের বাগান পাহাড়ের কোলে মিশে গেছে। ঝকঝকে-তকতকে বাগান। গাছের ডালে কয়েকটি পাখি বসে রয়েছে। এধার-ওধার তাকাতে বিরাট ওক গাছের তলায় চোখে পড়ল একটা সমাধি। শ্বেতপাথরের বাঁধানো সমাধিতে একটা ফলকও রয়েছে। কিন্তু দূর থেকে ফলকের লেখা পড়তে পারল না।

কবর, শ্মশান এসবে বৈশাখীর দারুণ ভয়। দেখলেই ওর মনে হয় যারা চলে গেছে তারা যেন আবার ফিরে আসতে চায়। আশায় আশায় চারপাশে ঘোরে। বৈশাখী সজোরে জানালাটা বন্ধ করে ভারী পর্দাটা টেনে দিল।

ঘরের এককোণে রাখা মেহগিনি কাঠের সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিলটার সামনে চুল আঁচড়াবার জন্যে দাঁড়াতেই বৈশাখীর বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নায় কার প্রতিবিম্ব? ওর মুখের পরিবর্তে এ যে ফটোতে দেখা মিষ্টি কিশোরী মেয়েটির ছায়া! বৈশাখী হাত-পা নাড়াতে পারছে না, চোখের পলক ফেলতে পারছে না। পৃথিবী থেকে যেন বহুদূরে চলে গেছে। সবুজ প্রান্তর, পাহাড় থেকে নেমে আসছে রিমঝিম শব্দে জলস্রোত। তৃণপ্রান্তরে নানা রঙের শত শত নাম-না-জানা পাখি। নীল আকাশের নিচে ওরা উড়ছে, গান গাইছে। সেই সুন্দর জায়গায় বৈশাখী একা।

হঠাৎ পিঠে হাত পড়তে বৈশাখী চমকে উঠল। আয়নাতে দেখল পিছনে স্মিত মুখে জেনারেল শর্মা। তোমার জন্য আমরা বসে রয়েছি। লাঞ্চ খাবে না?

বৈশাখী যা দেখেছে জেনারেল শর্মাকে বলতে গিয়েও পারল না। একবার জানাজানি হয়ে গেলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। সে জেনারেল শর্মার হাত ধরে বলল, চলুন। যেতে যেতে বৈশাখী দেওয়ালে টাঙানো কিশোরী মেয়েটির দিকে আর একবার তাকাল। একটা সুন্দর ফটো....গ্র্যানী আই কান্ট লীভ উইদাউট ইউ! কে গ্র্যানী? কে ক্যাথরিন ক্লিন্টন....প্রায় দেড়শো বছর আগেকার ফটো, তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, আসবাব জেনারেল শর্মা কেন জমিয়ে রেখেছেন? বাংলোটা কবেকার? পাহাড়ের পাদদেশে ওক গাছের তলায় কার কবর?....ক্যাথারিনের দিকে তাকালে ও হাসে কেন? কাবেরীদি, শুভ্রাদি, সুমন্ত্রদা, বিক্রমদা, ওদের দিকে তাকিয়ে কি ক্যাথারিন হাসে? কানের কাছে কে মিষ্টি সুরে কথা বলল?

ভাবতে ভাবতে বৈশাখী গোল ডাইনিং টেবিলের একধারে চেয়ারে বসল। চাইনিজ ডিজাইন আঁকা পুরনো দিনের বাসনপত্রে ওর প্রিয় খাবারগুলো দেখে ও ভয়-অস্বস্তি সব ভুলে গেল।

বিকেলে সূর্য পাহাড়ে মুখ লুকোবার আগেই বৈশাখী একা একা গিয়ে দাঁড়াল বিরাট ওক গাছের তলায় শ্বেতপাথরের কবরের কাছে। উত্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, বেশ শীত শীত করছে। বৈশাখী গায়ের চাদরটা ভাল করে ঢেকে নিল।

দুপুরে কবরের উপর এপিটাফে কি লেখা পড়তে পারেনি। এখন হেঁট হয়ে পড়ল ঃ হিয়ার লাইজ মেরী ক্লিন্টন, ওয়াইফ অফ ডেভিড ক্লিন্টন আফ সাসেক্স। তলায় : বর্ন : ১৭৯৪, ডায়েড : ১৮৬৩।...শী ইজ স্লিপিং—ডোন্ট ডিস্টার্ব হার পিস্।

বৈশাখী ঘুরে ঘুরে বাগানটা দেখল। আশ্চর্য! একটুও ভয় করছে না। সে এসে বসে পড়ল সমাধির পাশে। চুপ করে ক্লিন্টন ফ্যামিলির কথা ভাবছে, এমন সময় কানে এল কাবেরীর গলা, এই বৈশাখী, কোথায় গেলি তুই? আমারা সবাই রেডি।

ঘড়িতে দেখল প্রায় পাঁচটা বাজে। বৈশাখী উঠতে যাচ্ছে এমন সময় কানের কাছে কে যেন বলল, কোথায় যাচ্ছ? একটু বসো...। কথাগুলো ইংরেজিতে তবে অগের শোনা মিষ্টি সুরেলা গলা নয়। ভাঙা ভাঙা বৃদ্ধার।

বৈশাখী বসে পড়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, কে, কে? কে তুমি?

চতুর্দিক জনমানবহীন। শুধু গাছপালা, ফল-ফুলের গাছ। পাহাড়ে সূর্য লুকিয়েছে, বরফঢাকা সাদা পাহাড় আর সাদা নয়, রামধনুর সাত রঙ!

বৈশাখী আবার উঠতে যেতেই আটকা পড়ল। শাড়ির আঁচলটা অদৃশ্য এক হাত ধরে রেখেছে। আশ্চর্য! সর্বদা ভূতের ভয়ে কাতর বৈশাখী একটুও ভয় পেল না।

তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে। আমার ক্যাথারিন ওই...ওই যে বড় বড় দেবদারু গাছ দেখছ...গেলেই দেখবে একটা খাদ, সেখানেই শুয়ে রয়েছে। কত বছর হয়ে গেল তবু ওকে কেউ খুঁজে পেল না। আদর করে কোলে তুলল না।... তোমাকে ওর বড় ভাল লেগেছে। তুমি এখানে থাকবে?

স্বপ্নের জগৎ থেকে বৈশাখী বেঁচে থাকার জগতে ফিরে এল। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। চতুর্দিকে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসেছে। বাংলোর দিকে তাকাল। সব ঘরে, বাইরের বারান্দায় তীব্র আলো জ্বলছে। বৈশাখী দৌড়তে দৌড়তে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে টানা বারান্দায় উঠে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল। বুকের ভিতর কাঁপুনি তখনও কমেনি।

কাবেরী ওকে দেখে একটু রাগ রাগ স্বরে বলল, একা একা কোথায় গিয়েছিলি? আমরা ভেবে মরি। এটা তোর নিউ আলিপুর পেয়েছিস?

বৈশাখী চুপ করে রইল। অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখার, কণ্ঠস্বর শোনার কথা কাউকে বলতে পারল না।

জেনারেল শর্মা হাসতে হাসতে চুরুটে টান দিয়ে বললেন, লেট হার এনজয় গার্লস। একা একা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার আলাদা এক চার্ম আছে। কথাটা বলে সামান্য গম্ভীর হয়ে বললেন, এনিওয়ে ওদিকে একা একা আর যেও না।

(২)

রাত্রে ডিনার খাবার সময় কাবেরী বলল, জেনারেল সাহেব, ইলেকট্রিক আলো বন্ধ করে ক্যান্ডেল জ্বেলে ভূতের গল্প বলবেন বলেছিলেন কিন্তু।

জেনারেল শর্মা আড়চোখে বৈশাখীর দিকে তাকালেন, বৈশাখী তখন অপলক দৃষ্টিতে ক্যাথারিনের ফটোর দিকে তাকিয়ে। ক্যান্ডেলের কথা কানে আসতেই বলল, না না, ভূতের গল্প নয়, বিশ্বযুদ্ধের গল্প বলুন।

শুভ্রা বলল, তুই কানে তুলো গুঁজে থাক।

কিংবা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমো। কাবেরী কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল।

জেনারেল শর্মা কফি পট থেকে সবাইকে কফি পরিবেশন করতে করতে বললেন, অলরাইট। তোমাদের আজ আমি এই বাংলো, যার নাম Le Bijoue....এর অতীতের মালিক ক্লিন্টন পরিবারের গল্প বলব। যা বলছি সবই সত্যি, কিছু ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে আমি নিজে পরিচিত।

সে তো একশো বছর আগের কথা। আপনি পরিচিত হলেন কেমন করে? বিক্রম কফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

জেনারেল শর্মা বললেন, লেট মি সে। শোনার সময় কেন, কবে, কোথায়, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করবে না। বাংলোটা কেনার সময় আমার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার মুখার্জি বলেছিল। মুখার্জি যা বলেছিল তাই বলছি।

জেনারেল শর্মা শুরু করলেন, Le Bijoue অর্থাৎ দি জুয়েল। সত্যিই এককালে জুয়েল ছিল বাংলোটা। আজকের মতো এইরকম একটেরে জনমানবশূন্য ছিল না। আশেপাশে অনেক লোকের বাস ছিল। দেশী-বিদেশীদের ছবির মতো বাংলো বাড়ি। কোনো এক সময় ভীষণ জল-ঝড়-ভূমিকম্প হয়, তখন গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু পড়ে থাকে ডেভিড ক্লিন্টনের শখের এই Le Bijoue। সে তো অনেক বছর আগেকার কথা। তখন পাহাড়ে বাড়ি তৈরি করত বিদেশীরা। কিছু কিছু দেশীয় রাজ্যের রাজা ও জমিদারেরা। নাউ লেট আস গো ব্যাক টু ১৯৫০। যুদ্ধ শেষের পর আমি নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আলমোড়া থেকে কাঠগুদাম ফেরার সময় ভাওয়ালিতে এসে এই বাংলোটা দেখে বড় ভাল লেগে গেল। বন্ধু ব্রিগেডিয়ার মুখার্জিকে বললাম, এই বাংলোটা আমি কিনব...মালিক যদি বিক্রি করে।

কেন জানি না মুখার্জি বলল, এটা ছাড়াও তো অনেক বাংলো আছে। বৃদ্ধ বয়সে এখানে একা থাকবে কেমন করে? লোকে বলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বাড়িটার চারপাশে জঙ্গল হয়ে পড়েছিল। কেউ যেতে সাহস পেত না। এক স্কটিশ সাহেব বাংলোটা কিনেছিলেন। সাহেব জঙ্গল-টঙ্গল সাফ করিয়ে বাংলোর ভেতরে এসে দেখলেন সব কিছু ইনট্যাক্ট। এখানে বর্তমানে যা কিছু দেখছ সবই ক্লিন্টন পরিবারের। সাহেব যেমন ছিল তেমনই রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কেনার পর আমিও তেমনই রেখেছি। বলতে পারো সবই অ্যান্টিক।

কেনার সময় অনেকে উপদেশ দিয়েছিল না কিনতে। বলেছিল বাড়িটা অপয়া, আরও অনেক কিছু। আমি আর্মিতে ছিলাম, মৃত্যু অনেক দেখেছি। মৃত্যুর পর কী হয় না-হয় তা নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। তাই কিনে ফেললাম। বছরে ছ'মাস এখানে থাকি। একাই....রামভাইয়া রাত্রে থাকে না।

পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া প্রেডিক্ট করা শক্ত। হঠাৎ যাকে বলে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি তাই শুরু হলো। ঘরের সব বাতি নিভে গেল। প্রবল হাওয়াতে কাচের জানালাগুলো যেন খুলে ভেঙে ছিটকে পড়বে। যেমনি প্রবল বৃষ্টি তেমনি বিদ্যুৎ আর মেঘের গর্জন। জেনারেল বললেন, মনে হয় বিজলী আসার চান্স নেই। তোমাদের মনস্কামনাই পূর্ণ হবে। উঠে পড়লেন তিনি টেবিল থেকে। চার-পাঁচটা মোমবাতি জ্বালিয়ে এনে রাখলেন টেবিলের ওপর।

বৈশাখী ভীতু ভীতু চোখে তাকাল দরজার উপরে ক্যাথারিনের ফটোর দিকে। মনে হলো মেয়েটার মুখে হাসি নেই। বড় বড় চোখ দুটো জলে পরিপূর্ণ।

হঠাৎ কোথা থেকে দমকা হাওয়ায় টেবিলের উপরে রাখা মোটা-মোটা মোমবাতিগুলো একসঙ্গে নিভে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাজ পড়ার শব্দ! ভাইব্রেশনে ঘরের সব কিছু ঝনঝন করে উঠল।

জেনারেল শর্মা বললেন, এখানে এই রকমই হয়। মোমবাতি জ্বেলে দিই।

অন্ধকার যে এত তীব্র হয় বৈশাখী এর আগে দেখেনি।

কাবেরী বলল, না না, জেনারেল সাহেব। খাওয়া তো আমাদের শেষ। অন্ধকারই ভালো।

বেশ, তাই। তবে আমার সুইট বন্ধুটি যে ভয় পাচ্ছে মনে হয়।

ভয় না আরও কিছু! পাঁচ-পাঁচজন জীবন্ত মানুষ রয়েছে তবু ভূত ওকেই গিলে ফেলবে টপ করে!

কাবেরীর কথা বৈশাখীর কানে গেল না। সে শুনতে পেল মিষ্টি এক গলা—আই লাভ ইউ বৈশাখী। তোমাকে যে আমার বড় ভাল লেগে গেছে। কথার সঙ্গে নাকে এল মিষ্টি গন্ধ, ফ্রকের খসখস শব্দ, নিশ্বাস....নিশ্বাস লাগছে ঘাড়ে। কে যেন ওর পেছনে দাঁড়িয়েছে।

বিলীভ মি, আই লাভ ইউ সুইট বৈশাখী। প্লিজ, তুমি আমার কথা শোনো। কথাটা বলেই পিছনে দাঁড়ানো অদৃশ্য মেয়েটি বৈশাখীর কাঁধে ওর বরফের মতো ঠাণ্ডা থুতনিটা রাখল। ওর মিষ্টি গন্ধের চুল বৈশাখীর গালে লাগল।

কে, কে তুমি? বৈশাখী চিৎকার করে উঠল।

আশ্চর্য! কেউ বৈশাখীর কথা শুনতে পেল না। অন্ধকারের মধ্যে ও দেখতে পেল তিনটে আগুন বেড়ালের চোখের মতো দপদপ করে জ্বলছে। সুমন্ত্রদা, বিক্রমদা আর জেনারেল শর্মা সিগারেট ও চুরুট টানছে।

জেনারেল শর্মা বলে চললেন, ডক্টর হার্বার্ট ১৮৬০ সালে লন্ডন থেকে এখানে প্র্যাকটিস করতে এসেছিলেন। তখন এখানের অনেক বাসিন্দাই ইংরেজ। সবাই বেশ অবস্থাপন্ন। হার্বার্টের পিতৃবন্ধু ডক্টর স্টিফেন ওঁকে একটা বাঁধানো রেজিস্টার দিয়ে বললেন, এতে সব পরিবারের নাম-ধাম-পেশা, অসুখের হিস্ট্রি সব রেকর্ডেড। তুমি সময় পেলে সকলের সঙ্গে পরিচিত হবে। ওদের সম্বন্ধে ডিটেলস পড়ে অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে জানতে পারবে। ডায়গনোসিস করতে সুবিধে হবে।

ডাঃ স্টিফেন চলে যাবার পর হার্বার্ট নিজ পেশা আর ইয়োরোপীয়ান সৌজন্যের খাতিরে যতটা সম্ভব হলো সকলের বাড়ি গেলেন, অনেকে নিজেরাও এলেন, কিন্তু Le Bijoue থেকে কেউ এলেন না। রেজিস্টারে হার্বার্ট দেখলেন পাঁচজনের নাম। মিঃ ডেভিড ক্লিন্টন ডায়েড অন ১৮৫৯। মিসেস ডেভিড, বয়স এবাউট ৭০, স্বাস্থ্য খারাপ। হামেশাই ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন। মিস্টার স্টিফেন ক্লিন্টন, বয়স ৪০, ভাল স্বাস্থ্য। চেম্বারে আসেন না। কাঠের ব্যবসা। মিসেস লিলি ক্লিন্টন, বয়স ৩৫ সিকলি চেহারা। সর্বদাই অসুখের ভয়। তবে খুবই স্নেহপরায়ণ ও শান্ত, ভদ্র। কুমারী ক্যাথারিন ক্লিন্টন, বয়স ১৬, স্থানীয় ব্রিটিশ স্কুলের ছাত্রী। অসুখের কোনো রেকর্ড নেই।

একদিন ডক্টর হার্বার্ট লাঞ্চের একটু আগে চেম্বার বন্ধ করে বাড়ি ফেরার আগে ভাবলেন, Le Bijoue-তে ঢুঁ মেরে ক্লিন্টন পরিবারের সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়। ডক্টর স্টিফেনের রেজিস্টারটা হয়তো আপ-টু-ডেট নয়। হয়তো ওঁরা ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। তবু একবার দেখে আসতে হয়।

গুড আফটারনুন ডক্টর।

ডাক্তার হার্বার্ট মুখ তুললেন। দেখলেন রোগা ছিপছিপে সুন্দরী এক মহিলা। বয়স ৩৫ হবে। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। চেম্বারে আসার সময় ঘরে পরার ড্রেসটাও বদলাতে পারেননি।

হার্বার্ট প্রত্যভিবাদন করার পর মহিলা বললেন, আমার নাম লিলি ক্লিন্টন। মিস্টার স্টিফেন ক্লিন্টনের স্ত্রী। থাকি Le Bijoue তে। আমার মাদার-ইন-লর খুব সর্দি-কাশি, বুকে বেদনা, দয়া করে একবার ভিজিট করবেন?

হার্বার্ট লক্ষ্য করলেন লিলি ক্লিন্টন যেন নিদারুণ এক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। শাশুড়ির অসুখ ছাড়াও অন্য কিছু উদ্‌বেগ।

ডক্টর হার্বার্ট লিলি ক্লিন্টনের সঙ্গে Le Bijoue-তে এসে দোতলায় মিসেস ডেভিড ক্লিন্টনের ঘরে গেলেন। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে এক মহিলার গলার স্বর।...ওই যে সিঁড়িটা...সিঁড়িটা শেষ হলেই বিরাট ল্যান্ডিং। তারপরই ওর ঘর। কাল তোমাদের দেখাব। নেই শুধু মিঃ ডেভিড ক্লিন্টন।

ডক্টর হার্বার্ট ঘরে ঢুকে দেখলেন এক বৃদ্ধা বুক পর্যন্ত চাদর ঢেকে খাটে শুয়ে আপন মনে হাসছেন। হাসিটা এমন যেন এখনই কারও পরিহাস শুনলেন।

ডক্টর দেখলেন বৃদ্ধা অতিশয় মার্জিত চেহারার। এককালে সুন্দরী ছিলেন সন্দেহ নেই। মাথার চুল ছোট করে কাটা। অত্যন্ত মূল্যবান বিছানা আর ঘরের আসবাবপত্র।

মিসেস ডেভিড নিজের চিন্তায় এত নিমগ্ন যে ডক্টর হার্বার্ট ও লিলি ঘরে ঢুকেছেন টের পাননি। লিলি বললেন, মা, ডক্টর হার্বার্ট এসেছেন আপনাকে পরীক্ষা করতে।

মিসেস ডেভিড উঠে বসে বললেন, অত্যন্ত দুঃখিত ডক্টর। আমার গত রাতে সামান্য সর্দিতে একটু কাশি হয়েছিল। সেই ভয়ে লিলি আপনাকে ডেকে এনে কষ্ট দিল। এমন আমার প্রায় হয়।

ডক্টর হার্বার্ট পরীক্ষা করে দেখলেন বুকে কফ জমেছে। সামান্য গা গরম। প্যাডে প্রেসক্রিপশন লিখে বললেন, একটা ঘুমের ওষুধও লিখে দিয়েছি তবে ওটা বেশ কড়া। রোজ রাতে শোবার সময় একটা করে খাবেন।

লিলি ক্লিন্টন ডক্টর হার্বার্টের সঙ্গে দরজার গোড়ায় এসে পার্স খুলে তাঁকে ফিস দিতে দিতে বললেন, ডক্টর, আমার মনে হয় অসুখটা অন্য ধরনের।

অন্য ধরনের! অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন হার্বার্ট।

চলুন, বলছি।

দুজনে বাড়ি ছেড়ে বাগানে এলেন। লিলি বললেন, গত বছর আমার শ্বশুর হঠাৎ মারা যাবার পর অসুখটা হয়েছে। সকলকে বলেন স্টিফেনের বাবা মারা যাননি। এই বাড়িতে আছেন। তোমরা তাঁকে দেখতে পাও না; কিন্তু আমি রোজই দেখি। আমার খোঁজ নেন, হাসির কথা বলেন, আমিও হাসি।

কথাটা বলতে বলতে গেট পর্যন্ত এসে লিলি বললেন, ক্যাথারিন মানে আমার মেয়ে স্কুল থেকে এলেই শাশুড়ি তাকে ডেকে পাঠাবেন। মেয়েটাও লাফাতে লাফাতে ঠাকুমার ঘরে গিয়ে হো হো করে হাসবে। একজন নয়, তার সঙ্গে আরো দুজনের হাসাহাসি কথাবার্তা শুনতে পাই আমি। ভয়ে-ভাবনায় আমি অর্ধেক হয়ে যাচ্ছি। আমার ওই একটাই মেয়ে, তাকে শেষ পর্যন্ত আমার শাশুড়ি পাগল করে দেবেন! আড়াল থেকে আমি ওদের কথা শুনেছি, বলতে বলতে লিলি ক্লিন্টন শিউরে উঠলেন। আমার মেয়েকে পাগলের হাত থেকে বাঁচান ডক্টর। ভাবনায় ভাবনায় আমি খেতে পারি না, শুতে পারি না। আমার স্বামী স্টিফেনকে বলেছি। সে শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা।

ডক্টর হার্বার্ট বললেন, আসলে মিসেস ডেভিড ওঁর স্বামীকে খুব ভালবাসতেন, তাই স্বামীর মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছেন না। একটু একটু করে ঠিক হয়ে যাবে, ভাববেন না।

লিলি বললেন, আমার শ্বশুর-শাশুড়ি দার্জিলিং-এ ছিলেন। শ্বশুর হঠাৎ মারা যাবার পর ওখানে একা হয়ে পড়লেন, দেখার কেউ নেই, তাই এখানে নিয়ে এসেছে স্টিফেন। বেশি বললে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকবেন। স্টিফেনকে বলবেন, সেন্ড মি ব্যাক টু দার্জিলিং।

ডক্টর হার্বার্ট বললেন, ঘুমের ওষুধটা খেতে বলবেন। একমাত্র সময়ই মিসেস ডেভিডকে নর্মাল করে দেবে।

ঠিক সেই সময় ডক্টর হার্বার্ট দেখলেন বছর ১৫-১৬ বছরের একটি মেয়ে স্কুলের ব্যাগ কাঁধে গেট ঠেলে বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে দোতলায় তাকিয়ে বলল, ওয়েট ওয়েট গ্র্যানি, তুমি একাই দাদুর সঙ্গে গল্প করবে নাকি? আমিও আসছি।

ডক্টর হার্বার্টকে দেখে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল।

হার্বার্ট ক্যাথারিনকে দেখে খুব খুশি হলেন। বহুদিন এমন সুন্দর জলি মেয়ে দেখেননি। সবচেয়ে সুন্দর ওর হাসি।

ডক্টর হার্বার্ট, লিলি পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ক্যাথারিন ভুরু কুঁচকে বলল, ডক্টর কেন?

তোমার গ্র্যানী অসুস্থ, তাই।

হতেই পারে না। গেট খুলেই তো আমি গ্র্যানীর সঙ্গে কথা বললাম। গ্র্যানী তো দাদুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বলে ক্যাথারিন হাতের বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল।

লিলি হতাশায় ভেঙে পড়ে বললেন, ডক্টর...।

ওরিড হবেন না। সবই ছেলেমানুষ মেয়ের কল্পনা।

এই ঘটনার প্রায় দিন দশ পর লিলি একদিন ডক্টর হার্বার্টের চেম্বারে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। উত্তেজনায় মুখ লাল, কথা কইতে পারছেন না।

ডক্টর হার্বার্ট লিলি ক্লিন্টনকে ধরে চেয়ারে বসালেন। তাঁকে শান্ত হতে বললেন।

লিলি বললেন, ডক্টর, আমার মেয়েকে বাঁচান। যা দেখেছেন, শুনেছেন, কমা তো দূরের কথা, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। গতকাল ওপরে উঠে দেখলাম দরজা বন্ধ। শুনতে পেলাম ক্যাথারিন আর আমার শাশুড়ির কথাবার্তা। শাশুড়ি বলছেন, ভয় নেই রে। মৃত্যু বড় সুন্দর। প্রথমে অন্ধকার, তারপর পরম শান্তি। চতুর্দিকে ঝলমলে আলো...ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া...সবুজ তৃণভূমি....পাখির গান। হ্যাঁ তোর দাদু বলেছে। ভয় পাস নে আমর ক্যাথারিন সোনা।

তারপরই হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। সামনেই ক্যাথারিন। ক্যাথারিন আমাকে দেখে অসম্ভব রেগে বলল, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছ কেন? বুঝতে পারছি না দরজা বন্ধ থাকার পরও ক্যাথারিন আমাকে দেখল কেমন করে?

ডক্টর হার্বার্ট বললেন, পিল ঠিকমতো দিচ্ছেন তো?

রোজই শোবার আগে শিশি থেকে একটা করে দিই।

মেয়েকে বকবেন না। ঠাকুমার অসুখ কন্ট্রোলে এলে ক্যাথারিন ঠিক হয়ে যাবে।

দু-তিন দিন পরে হঠাৎ একদিন সকালবেলা লিলি ক্লিন্টন ডক্টর হার্বার্টের বাড়ি এসে বললেন, মিসেস ডেভিড বিছানা থেকে উঠছেন না। বড় বড় চোখ করে তাঁর স্বামীর ফটোর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

হার্বার্ট তাড়াতাড়ি Le Bijoue-তে গিয়ে মিসেস ডেভিডকে পরীক্ষা করলেন। ঘুম থেকে ওঠার প্রশ্ন আসে না। মিসেস ডেভিডের মাথার বালিশের তলা থেকে শূন্য স্লিপিং পিলের শিশিটা পাওয়া গেল।

ঠিক সেই সময় ক্যাথারিন অসময়ে স্কুল থেকে ফিরে মিসেস ডেভিডের ঘরে ঢুকে গ্র্যানীর প্রাণহীন দেহটা দু-হাতে চেপে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আশ্চর্য! ক্যাথারিন মৃত্যুর খবর পেল কেমন করে?

সেই রাত্রে মিস্টার স্টিফেন ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন ক্যাথারিন ওর ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুলে একগাদা পিল হাতে নিয়ে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অনেক বকুনি, ভাল কথা ইত্যাদির পর ক্যাথারিন বলল, গ্র্যানী তাকে ওগুলো দিয়েছিলেন। পিলগুলো ভাগ করে খেয়ে দুজনে দাদুর কাছে যাবে ঠিক হয়। কিন্তু মৃত্যুভয়ে ক্যাথারিন খেতে পারেনি।

স্টিফেন ক্যাথারিনকে প্রচুর ধমকালেন। বললেন, এই তুমি গ্র্যানীকে ভালবাসতে?

তারপর থেকেই ক্যাথারিন অসম্ভব গুম মেরে গেল। স্কুলে যায় না, খায় না, সর্বদা তার গ্র্যানীর ঘরে গিয়ে কাঁদে আর বলে, গ্র্যানী আই হ্যাভ কিলড ইউ।

কখনও কখনও গভীর রাতে ওকে ঘরে পাওয়া যায় না। খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া যায় মিসেস ডেভিডের কবরের পাশে। বসে বসে কাঁদছে আর বলছে, ওয়েট গ্র্যানী, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

একমাসের মধ্যে ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটা রোগা, কালো হয়ে গেল। রোজই জ্বর। অসুখ সারে না। ডক্টর হার্বার্ট বললেন, ওকে অন্য কোথাও নিয়ে যান। বছর খানেক বাইরে থাকলে ভুলে যাবে। স্টিফেন বন্ধুর হাতে কাঠের ব্যবসা সঁপে লিলি আর ক্যাথারিনকে নিয়ে ডালহৌসি চলে গেলেন। বছর খানেক ওখানে থেকে ক্যাথারিন ঠিক হয়ে গেল। আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেল। মৃতা গ্র্যানীর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করল। তারপর একদিন বলল, মা, আমরা বাড়ি যাব, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে।

ওঁরা হার্বার্টকে চিঠি লিখলেন। হার্বার্ট চিঠি পেয়ে ওঁর ফিটনটা নিয়ে কাঠগুদাম গেলেন। কাঠগুদাম থেকে একসঙ্গে আসবেন।

সবই ঠিক। ক্যাথারিন নর্মাল। হাসছে, কথা বলছে। হার্বার্ট, স্টিফেন, লিলি খুব খুশি। যাক, মেয়েটার মাথা থেকে ভূত নেমেছে।

ফিটনে চেপে আসতে আসতে প্রায় এখান থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে একটা গাছের তলায় ফিটনটা দাঁড় করিয়ে ওঁরা কিছু খেয়ে নেবেন ভাবছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন ভীষণ শব্দ। অসংখ্য কাক আর ক্ষিপ্ত কুকুরের ডাক। সেই সঙ্গে তুমুল ঝড়ের শব্দ আর এক বৃদ্ধা নারীর আর্তনাদ! তিনজনেই হকচকিয়ে গেলেন। কোথা থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ? চতুর্দিক তো শান্ত, তবে ঝড় বইছে কোথায়?

আচমকা ক্যাথারিন ফিটন থেকে রাস্তায় লাফিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল চিৎকার করতে করতে, গ্র্যানী, ওয়েট...ওয়েট....আমি আসছি।

সহিস ঘোড়া দুটোকে চাবুকের পর চাবুক মারতে লাগল। কালো অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া দুটো একটুকুও না এগিয়ে সামনের দুটো পা তুলে প্রাণান্তকর চিঁহি রব তুলল। অগত্যা ওঁরা ফিটন থেকে নেমে ছুটলেন ক্যাথারিনের পিছু পিছু। কিন্তু কোথায় ক্যাথারিন? ক্যাথারিনকে আর পাওয়া গেল না। সে যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। অন্তত এক মাইল এধার-ওধার খুঁজে লোক লাগিয়ে....কোনো জায়গাতেই ক্যাথারিনকে পাওয়া গেল না।

তারপর একদিন মিস্টার আর মিসেস ক্লিন্টন সাসেক্স চলে গেলেন। Le Bijoue পড়ে রইল স্টিফেনের বন্ধুর তত্ত্বাবধানে।

চতুর্দিক অন্ধকার। ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব বেড়েই চলছে। এমন প্রচণ্ড ঝড় আর শন শন শব্দ ওরা আগে কোনোদিন দেখেনি, শোনেওনি। তারই মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সহস্র কামানের গর্জন।

জেনারেল শর্মা নিভন্ত চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন, এই সেই বাংলো।.....রামভাইয়া বলে ও নাকি শুনেছে এক মেয়ের কান্না। বেশির ভাগ গভীর রাতে। মাঝে মাঝে বাগানের শেষে মিসেস

ডেভিডের কবরে একটি কিশোরী ইংরেজ মেয়েকে বসে থাকতে দেখে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি মাঝে মাঝে কারও হাসি শুনি, উপস্থিতি টের পাই; কিন্তু কোনো দিন কিছু দেখিনি। তবে আশ্চর্য লাগে ক্যাথারিনের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

সকলেই চুপ। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জেনারেল শর্মা বললেন, ওয়েট....মনে হয় আজ আর কারেন্ট আসবে না। যাই মোমবাতি নিয়ে আসি।

শর্মা উঠতে যাচ্ছিলেন, বৈশাখী ওঁর হাতটা চেপে ধরে বলল, আমায় একলা ফেলে যাবেন না।....ক্যাথারিনের দুটো হাত আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

কাবেরী ঠেলা দিয়ে বলল, অনেক ন্যাকামি করেছিস বৈশাখী, আর করিস না। বুঝতে পারছিস না জেনারেল সাহেব আমাদের মনগড়া ভূত-প্রেত-আত্মার গল্প বললেন?

মোমবাতি হাতে নিয়ে যে যার ঘরে শুতে গেল। জেনারেল শর্মা বৈশাখীর পিঠ চাপড়ে বললেন, ভয় পেও না, যাও শুয়ে পড়ো। কাবেরী ঠিকই বলেছে, মনগড়া ভূত-প্রেতের গল্প। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তি আর কখনই ফিরে আসে না।

বৈশাখী কেমন করে বলবে জেনারেলের গল্প একবর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু আর কাউকে নয়, শুধুই ওকেই বা ক্যাথারিন ডাকে কেন?

সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, জেগে শুধু বৈশাখী। পাশের ঘর থেকে জেনারেল শর্মার নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। এমন সময় ওর ঘরের পিছনের বাগানের দিকের বড় জানালাটা খুলে গেল। কে যেন বড় পর্দাটা সরিয়ে দিল। বৈশাখী আবছা আলোতে দেখল ফটোতে দেখা সেই কিশোরী মেয়ে জানালার কোলে বসে হাসতে হাসতে হাতছানি দিয়ে বলছে, এসো, এসো, আমার কাছে এসো। বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক সুন্দর। প্রথমে অন্ধকার, তারপর...।

পরের দিন ভোরবেলা বেড়াতে যাবার জন্য সবাইকে তৈরি হতে বলতে জেনারেল শর্মা ঘরে ঘরে টোকা দিলেন। বৈশাখীর ঘর বন্ধ। অনেকবার টোকা দেওয়ার পরও বৈশাখী দরজা খুলল না। অগত্যা দরজা ভেঙে ঢুকলেন জেনারেল শর্মা। কিন্তু কোথায় বৈশাখী? বৈশাখীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্লিন্টন ফ্যামিলির মতো জেনারেল শর্মা, কাবেরী, শুভ্রা, বিক্রম, সুমন্ত্র, রাম সিং, আরও অনেকে সাতদিন ধরে Le Bijoue-র আশেপাশে অনেক খুঁজল। কিন্তু বৈশাখীর বডি বা বৈশাখীকে পাওয়া গেল না। সবাই ধরে নিল মুডি মেয়ে হয়তো ভোরবেলা কাউকে না জানিয়ে একাই ফিরে গেছে কলকাতা। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় খবর নেওয়া হলো। জবাব এল বৈশাখী আসেনি।

তবে কোথায় গেল বৈশাখী?

এক অদ্ভুত দৃশ্য জেনারেল শর্মা দেখেছেন; কিন্তু জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার হয়ে কেমন করে সে কথা সকলকে বলবেন? দৃশ্যটা শুধু অদ্ভুত নয়, অসম্ভব।

ওরা সকলে কলকাতায় চলে যাবার পর হঠাৎ একদিন রাত্রে কার যেন স্পর্শে জেনারেল শর্মার ঘুম ভেঙে গেল। পর্দা সরানো কাচে ঢাকা খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন চাঁদের আলোতে ফেটে পড়ছে পিছনের বাগান। যে বাগানে রয়েছে শ্বেতপাথরের সমাধি। সমাধির উপর কারা বসে রয়েছে? গভীর রাতে এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলা আর তার দুই পাশে দুটি মেয়ে! একজন ফ্রক, অন্যজন শাড়ি পরা। ঠিক যেন বরফে তৈরি। জেনারেল শর্মা চোখে চশমা লাগিয়ে ধীরে ধীরে দরজা খুলে বারান্দা ধরে বাংলোর পিছনে এলেন। ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ওরা হাসছে। হাসিটা কেমন কেমন। জীবন্ত মানুষের হাসি তো এমন হয় না। আর একটু এগোলেন। মেয়ে দুটির

মুখ বড় চেনা চেনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন তো ক্যাথারিন ক্লিন্টন যার ফটো রোজই দেখেন। অন্যজন যে আরও বেশি চেনা। ওকে যে বড় ভালবাসতেন জেনারেল শর্মা।

জেনারেল শর্মা মিলিটারি স্বরে চিৎকার করে উঠলেন, হু ইজ দেয়ার!

কবরের উপর বসে থাকা স্বচ্ছ কাচের মতো বৈশাখী হাসতে হাসতে জেনারেল শর্মার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। হাত বাড়িয়ে বলল, কাম কাম, শর্মা দাদু। আপনি জানেন না মৃত্যুর পর জীবন বড় সুন্দর!

বৈশাখী মিলিয়ে গেলো।

জেনারেল শর্মা বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাংলো লা-বিজু দেখলেন। বাংলোর ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কোনোটা লাল, কোনোটা সবুজ, অদ্ভুত অদ্ভুত সব রং, যা জীবনে দেখেননি। হঠাৎ সব আলো নিভে গেল। জ্যোৎস্নাপ্লুত রাতে বাংলোটাকে মনে হলো যেন পিছু হটে চলেছে।

কার্ত্তিক ১৪০৪

অজানা আতঙ্ক

অশোক সী

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেনটা হুইশিল বাজিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল সামনের সিধে রেললাইনটা ধরে। মিলিয়ে গেল চাপ চাপ অন্ধকারের মাঝে।

দু'হাতের দুটো ঢাউস ব্যাগ সামলে খুব সন্তর্পণে উঁচু প্ল্যাটফর্মের সিঁড়ি বেয়ে নামলেন অপরেশবাবু। ট্রেনটা খুবই দেরিতে চলছিল। না হলে তাঁর এই স্টেশনে পৌঁছাবার কথা সন্ধের আগে।

দু'একটা টিমটিমে আলো জ্বলা অখ্যাত স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে বেরিয়েই তিনি বুঝতে পারলেন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে।

শীতের রাত। কুয়াশার ঘেরাটোপে মুখ লুকিয়েছে স্টেশন সংলগ্ন দু'চারটি অস্থায়ী দোকানঘর। দূরের মাঠঘাট আর গাছগাছালি কেমন যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে এই শীত-কনকনে ঝিমধরা কুয়াশার মাঝে।

অপরেশবাবুর সঙ্গে গাড়ি থেকে যে দু'চার জন যাত্রী নেমেছিলেন, তাঁরা কখন এক ফাঁকে যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছেন সামনের ওই কাঁচা রাস্তাটার এদিকে-ওদিকে।

এখন শুধু অপরেশবাবুকে ঘিরে কেরোসিন ডিবার আলোজ্বলা ক'টি চায়ের দোকান শীত-রাতের আবছা আলোছায়ায় কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

অপরেশবাবু তাঁর সামনের এক দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো রিকসা দেখছি না, কী ব্যাপার?

দোকানি উল্টে প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন?

আপরেশবাবু বললেন, যাব ধুতরোডাঙা।

ও, তা বেশিদূর নয়। কৌতূহলী দোকানি ফের প্রশ্ন শুধাল, তা মশাইয়ের কাদের বাড়ি যাওয়া হবে?

বেয়াইবাড়ি। আমার বেয়াইমশাই বৃটকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ি।

ছোকরা দোকানি একমুখ হেসে বলল, ও বটকেষ্টবাবুর বাড়ি, যিনি নতুন বাড়ি করে এয়েচেন?

হুঁ!

তাই বলুন। সে জন্যই মশাইকে নতুন নতুন লাগচে বটে। তা বটকেষ্টবাবুর কোন ছেলে আপনার জামাই?

বড় ছেলে শশাঙ্ক, শুকু। শুকুই আমার জামাই। এখানে নতুন বাড়ি করে ওরা উঠে এল। আমাকে প্রায়ই আসতে বলেন বেয়াইমশাই। সময়ই আর করে উঠতে পারি না। চাষের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তো—

মশাইয়ের থাকা হয় কোথায়?

গড় নসিবপুরে।

ওঃ! সে তো অনেক দূর এখান থেকে শুনেচি।

হ্যাঁ, দূর একটু বটে, সেই জন্যেই তো আসব আসব করেও এতদিন আসা হয়ে ওঠেনি। শেষে

মেয়েটার কথা মনে করে দুকুরবেলা বেরিয়ে পড়নু 'দুগ্গা' বলে। কিন্তু ওই যে বলে কপালের গেরো, গাড়িটা আজই বড্ড দেরি করে ইস্টিশন থেকে ছাড়ল।

ছোকরা দোকানি গম্ভীর হয়ে বলল, হ্যাঁ গাড়িটা আজ বড্ড দেরিতে পৌঁচেছে এখেনে। তা মেসোমশাই আপনি আজই এলেন এখানে?

কেন বাবা? সচমকে চিন্তিত অপরেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে? কোনো—

দোকানি তড়িঘড়ি বলে উঠল, না না, ওসব কিছু নয়। তবে আজ এখেনে রিকশাওলারা ধম্মোঘট করেচে সকাল থেকে—

দোকানির কথা শুনে অপরেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে হতাশ স্বরে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, তা হলে উপায়? বেয়াইমশাই যে বলে দিয়েছিলেন, ইস্টিশন থেকে রিকশা ধরে ওনাদের বাড়ি যেতে। হ্যাঁ হে বাবা, আর কোনো ব্যবস্থা-ট্যবস্থা নেই ওখানে যাবার?

দোকানি বলল, রিকশা ছাড়া আর তো কিছু গাড়ি-ফাড়ি নেই, মেসোমশাই।

অপরেশবাবু হতাশ স্বরে বললেন, তা হলে এই রাতে, নতুন জায়গায় রাস্তা চিনে ধুতরোডাঙা যাই কী করে? একটু থেমে নিজের মনেই আবার বললেন, তা হলে আজ আর মেয়ের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। পরের গাড়িতেই ফিরে যাই।

দোকানি অপরেশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ফেরার আর তো কোনো গাড়ি নেই, মেসোমশাই।

অপরেশবাবু ক্ষুণ্নস্বরে বললেন, সেকি! এটা জানতাম না তো। তাহলে কি হেঁটেই বেয়াইবাড়ি যেতে হবে! তা, হ্যাঁ হে, কতখানি রাস্তা ভাঙতে হবে বলো তো?

বেশি নয়, মাত্র পাঁচ পো রাস্তা। ও চোখ ফেলতেই উড়ে যাবে। দোকানি আশ্বাসের ভঙ্গিতে অপরেশবাবুকে বলল, কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না মেসোমশাই। রাস্তা আপনাকে বাতলে দোবো। সোজা রাস্তা। দেখবেন কোনো কষ্টই লাগবে না আপনার গায়ে।

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়লেন অপরেশবাবু দোকানির কথায়। বললেন, তা হলে আর রাত করে কাজ নেই। আমায় রাস্তাটাই দেখিয়ে দাও।

দোকানের কাঠের তাকের ওপর রাখা একটা মান্ধাতা আমলের টাইমপিস ঘড়ির দিকে চকিতে তাকিয়ে দোকানি বলল, কিচ্ছু তাড়া নেই মেসোমশাই। দশ-বারো মিনিটের এদিক-ওদিক—সবে আটটা বেজেচে। নিন, দোকানে উঠে এসে বসুন। একটু চা খেয়ে যান।

না না, চা-টা আমি খাই না। দোকানির দিকে তাকিয়ে অপরেশবাবু বললেন, তবে না হয় এক গ্লাস জলই দাও বাবা, তেষ্টা পেয়েছে সেই কখন থেকে।

জল দিয়ে, দোকানি ছেলেটি বাইরে এসে হাত তুলে রাস্তা দেখিয়ে বলল, ওই যে দেখচেন, কাঁচা রাস্তাটা সিধে চলে গেচে উত্তরমুখো, ওই ধরে যাবেন। খানিক এগিয়ে দেখবেন একটা তেমাথার মোড়। আপনি সিধেই চলবেন। ওই রাস্তায় গেলে ধুতরোডাঙা পৌঁছতে কিছু সময় লাগবে। আরও একটা রাস্তা আচে বটে শটকাট ওই তেমাথার মোড় থেকে বাঁ-হাতি। বুড়ো বটতলা দিয়ে। ত-বে জায়গাটা—! এই বলে দোকানি কী যেন বলতে গিয়েও না বলে তাড়াতাড়ি অপরেশবাবুকে বলল, না মেসোমশাই আপনি ওই সিধে রাস্তাটা দিয়েই যান। কত আর সময় লাগবে?

আকাশে চাঁদ ওঠেনি। চারিদিক নিঝুম অন্ধকারে ঢাকা। চাপ চাপ কুয়াশাগুলো সেই অন্ধকারের বুকে জবুথবু বুড়ির মাথার সাদা সাদা চুলের গোছার মতো, দামাল উত্তুরে বাতাসে কখনো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো কোথাও বা অন্ধকারে আঁকা আবছা গাছের মাথায় মাথায় সাদা উড়ুনির মতো জড়িয়ে রয়েছে।

আজ শীতটা বেশ ভালোই পড়েছে। অপরেশবাবু গরম চাদরটা সারা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। কাপড়টা মালকোঁচা করে পরে নিয়ে, দোকানি ছেলেটিকে বললেন, ঠিক আছে বাবা, তোমার নিশানা মতো আমি ঠিক যেতে পারব। এই বলে দু' হাতে ব্যাগ দুটো উঠিয়ে নিলেন তিনি। তারপরে অন্ধকারের মাঝে আবছা হয়ে দূরে হারিয়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড সরীসৃপের মতো সেই আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চললেন।

কতক্ষণ হেঁটেছেন ঠিক মনে নেই। পায়ে পায়ে চলে এসেছেন বেশ কিছুটা পথ। হাঁটতে তাঁর ভালোই লাগছে। ব্যাগ দুটো ওজনে বেশ ভারী হলেও, ঠান্ডার জন্যেই বইতে তাঁর কোনো কষ্ট হচ্ছে না।

তাছাড়া ওসবের অভ্যাস আছে তাঁর। রাস্তার দু'ধারের বড় বড় খেত আর তারও ওপাশের দূরের আবছা গ্রামগুলির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে তাকাতে তিনি চলেছেন বেশ জোর কদমেই।

ছোটবেলা থেকেই মনে ভয়ডরের বিশেষ বালাই নেই। কোনো কিছুতে সহজে ভয় পান না তিনি। তাই এখন এই অন্ধকার শীতের রাতে গ্রামের জনমানবশূন্য পথে একা চলতে তাঁর কোনোই অসুবিধে হচ্ছে না।

আগাম না জানিয়ে হঠাৎ এই রাতে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি হাজির হলে, তারা কত খুশিই না হবে তাঁকে দেখে! মেয়ের সেই হাসি হাসি ভরা মুখখানির কথা ভেবে অপরেশবাবুর মন ভরে উঠল আনন্দে।

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে পথ হাঁটতে হাঁটতে কখন যে চলে এসেছেন সেই তেমাথার মোড়ে তা তিনি মোটেই বুঝতে পারেননি।

হঠাৎই তাঁর সামনে জমাট অন্ধকারে লেপটে থাকা কি একটা বিশাল গাছের মাথায় বসে থাকা প্যাঁচার সুতীক্ষ্ণ ডাকে চমকে উঠলেন। শব্দটা নির্জন বাতাসের বুকে আছাড়ি-পিছাড়ি করে দূরে মিলিয়ে গেল। অপরেশবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেই দিকে তাকিয়ে।

এই তো সেই তেমাথার মোড়। দোকানি ছেলেটি যেমন বলে দিয়েছিল তেমনিই। রাস্তাটা এখানে এসে দু'ভাগে ভাগ হয়ে এক অংশ চলে গেছে বাঁ দিকে। সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে অপরেশবাবু হাতের ব্যাগ দুটো পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে রেখে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। অনেকখানি রাস্তা তা হলে পেরিয়ে এসেছেন। এতখানি রাস্তা একদমে এসে তিনি কিছুটা বে-দমই হয়ে পড়েছেন। বয়স হচ্ছে তো!

সেইখানে দাঁড়িয়ে তিনি রাস্তাটার দুটি অংশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনকেই প্রশ্ন করলেন, কোন দিকে যাওয়া যায়? দোকানি তাঁকে সোজা রাস্তাটা ধরেই যেতে বলেছে। বাঁ দিকেরটায় নাকি আরও কম সময় লাগে। অথচ বাঁ দিকের রাস্তাটা দিয়ে যাবার কথা দোকানি একবারও তাঁকে বলেনি। কেন? আচ্ছা জ্বালাতন তো? কাউকেও দেখতে তো পাচ্ছেন না তিনি।

এতক্ষণে যে প্রশ্নটা তাঁর মনের গভীরে বুজকুড়ি কাটছিল, সেটা ভুস করে ভেসে উঠল ওপরে। সত্যিই তো, এতখানকি রাস্তা তিনি পেরিয়ে এলেন অথচ কোনো গ্রাম তো চোখে পড়ল না পথের মাঝে! আর সেই যে তিনি ক'টি লোক দেখেছিলেন স্টেশনে, ব্যস ওই পর্যন্তই, আর একজনের সঙ্গেও তো দেখা হল না এতখানি রাস্তা আসতে। তা হলে তিনিই কি একমাত্র মানুষ এই জায়গায়? মনটা কেমন যেন খুঁতখুঁত করে উঠল অপরেশবাবুর।

প্যাঁচাটার আওয়াজ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। চারিদিক কী নিঝুম নিস্তব্ধ। শুধু উত্তরের হিমেল বাতাসে গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় অস্ফুট শব্দ উঠছে খ-স, খ-স-স-স!

রাত এখন কত হল কে জানে? না, আর দাঁড়িয়ে কাজ নেই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যেতে হবে

আরও বেশ অনেকটা রাস্তা। অপরেশবাবু গায়ের চাদরটা ভালোভাবে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে, কিছুক্ষণ দুটো রাস্তাকেই লক্ষ করলেন। তারপর সোজা সিধে রাস্তাটা দিয়ে যাওয়াটাই মনস্থির করে দু'হাতে ব্যাগ দুটো তুলে নিয়ে সেই দিকে পা বাড়ালেন।

ও মোশাই, শুনচেন? ও মোশাই! ঠিক কানের পাশে একটা গম্ভীর গলার শব্দে থমকে পড়লেন অপরেশবাবু। ঘাড় ঘুরিয়ে চমকে উঠলেন, আরে, একজন লোক! ঙঅন্ধকার ফুঁড়ে কখন তাঁর পাশে হাজির হয়েছে আভাসই পাননি তার কণামাত্র। আশ্চর্য.....লোকটিকে দেখে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন অপরেশবাবু।

রোগা সিড়িংগে চেহারা। খুবই নিম্নশ্রেণির লোক দেখলেই বোঝা যায়। এই শীতের রাতে একখানা মাত্র হাফশার্ট গায়ে দিয়ে দিব্যি রয়েছে। একটুও শীত লাগছে না ওই লোকটির? অপরেশবাবু সত্যি সত্যিই অবাক হলেন এই রকম উদ্ভট লোকটিকে হঠাৎই তাঁর পাশে আবিষ্কার করে।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, আমায় কিছু বলছ?

অন্ধকারের মাঝে লোকটির স্বর ভেসে এল, অপরেশবাবুর কানে শোনাল যেন বহুদূর থেকে তা ভেসে আসছে, বাবু চললেন কোতা। কোতায় যেতে হবে আপনাকে?

অপরেশবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, যাচ্ছি বেয়াইবাড়ি ধুতরোডাঙা।

ধুতরোডাঙা! তা ভালো! লোকটির চাপা হাসির শব্দ অপরেশবাবুর কানে বাজল। লোকটি ফের বলল, তা আমিও তো ওদিকে যাচ্ছি আজ্ঞে। চলুন না, একসঙ্গে যাওয়া যাক?

অপরেশবাবু এতক্ষণে সহজ হলেন। দিনকাল ভালো নয়। তাই লোকটিকে দেখে প্রথমে কিছুটা তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এখন লোকটির কথাবার্তা শুনে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁফ ছাড়লেন, যাক বাবা, তা হলে তিনি একমাত্র মানুষ নন এই জায়গায়। আরও একজনকে পাওয়া গেল। ভালোই হল, বাকি রাস্তাটা ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যাওয়া যাবে। এই ভেবে অপরেশবাবু বললেন, আমি এদিকে নতুন, রাস্তাঘাট চিনি না। তা ভালোই তো। চলো, তোমার সঙ্গেই যাওয়া যাক।

কথা শুনেই লোকটি বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হনহন করে চলতে শুরু করল। তাই দেখে অপরেশবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, ওই রাস্তা ধরছ কেন? সিধেই চলো না?

লোকটি থমকে পড়ল, তারপর কেমন যেন ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেন বাবু? এই রাস্তায় গেলে কী হয়?

লোকটির প্রশ্নের জবাব অপরেশবাবু দিতে পারলেন না। কিন্তু কিন্তু করে বলে উঠলেন, না, কিছু নয়। তবে—

লোকটি ফের প্রশ্ন করল, তবে কী?

অপরেশবাবু বললেন, না, তেমন কিছুই নয়, তবে এখানে আসবার সময় ইস্টিশনের একজন দোকানি আমায় বারণ করেছিল বাঁ দিকের ওই রাস্তাটা দিয়ে যেতে।

খনখনে গলায় হেসে উঠল লোকটি। সেই হাসির শব্দে শিউরে উঠলেন অপরেশবাবু। কোনো লোক কি এমনি গা শিউরনো হাসি হাসতে পারে? কিন্তু অপরেশবাবুকে কোনো চিন্তা-ভাবনার অবসর না দিয়ে লোকটি বলল, তা ও রাস্তা দিয়ে যেতে বারণ করেচে কেন বাবু? ওখানে বাঘ আচে না ভাল্লুক আচে? হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ। চলুন বাবু চলুন, কম সময়ে পৌঁচে যাব ঠিক ধুতরোডাঙা। আসুন পা চালিয়ে।

অপরেশবাবুকে কোনো কথা বলার ফুরসত না দিয়ে লোকটি ওই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল জোর পায়ে। অগত্যা অপরেশবাবু আর বিশেষ ভাবনা-চিন্তা না করে তাকে অনুসরণ করলেন।

দু'জনেই চুপচাপ বেশ কিছুটা রাস্তা পার হয়ে এলেন। অপরেশবাবু লক্ষ করলেন এই রাস্তাটা আগের রাস্তাটার চেয়ে বেশ সংকীর্ণ। তাছাড়া সেটার মতো অত ফাঁকা নয় এটা। দু'ধারে বড় বড় গাছের সারি রাতের অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে তুলেছে।

অন্ধকারের মাঝে কয়েক হাত আগে চলেছে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো লোকটি। অপরেশবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে নির্জনতা ভেঙে একসময় বললেন, কই হে, এত চুপচাপ কেন? কিছু বলছ না যে? তোমার নাম কী? থাকা হয় কোথায়?

নাম? নাম একটা চিলো বাবু এক সময়। এখন আর তার দরকার হয় না।

অপরেশবাবু ভীষণ চমকে উঠলেন। লোকটা বলছে কী? পাগল-টাগল নাকি! অপরেশবাবুর অজান্তেই তাঁর চলার গতি হঠাৎ কমে আসে।

একটা খনখনে হাসির সঙ্গে লোকটির কথা ভেসে এল, না বাবু, আপনি যা ভাবচেন আমি তা নই।

শিউরে উঠলেন অপরেশবাবু। নিজের কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না! কথাগুলো এল পিছন দিক থেকে আর যা ভাবছিলেন তাই-ই বলল লোকটি। তা হলে এ কার পাল্লায় পড়েছেন তিনি!

চলতে চলতেই ভয়ে ভয়ে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, ওই তো মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে অস্পষ্ট ছায়ার মতো লোকটি তাঁর ঠিক পিছনে পিছনে আস্তে হেঁটে আসছে। না না, নিজের মনের আর চোখের ভুল। মনকে প্রবোধ দিলেন অপরেশবাবু। সাহস সঞ্চয় করেন এই ভেবে অন্ধকারের জন্যেই হয়তো দেখতে পাননি লোকটিকে, কখন পাশ কাটিয়ে তিনিই এগিয়ে গেছেন নিজে। আর ও যা বলল, তা হয়তো নিছক একটা কাকতালীয় ব্যাপার।

মনটাকে সহজ করার চেষ্টা করছেন ঠিক এমনি সময় একটা অপার্থিব দৃশ্যে তাঁর পা আটকে গেল মাটিতে। ঘাড় ঘোরানো অবস্থাতেই তিনি থমকে গেলেন।

ভয়-বিস্ফারিত চোখে দেখলেন, লোকটির মাথা ধড় থেকে ছিটকে গেল শূন্যে। হাত-পাগুলো এলোমেলো হয়ে এদিক-ওদিক ঠিকরে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, পরক্ষণেই শরীরের অংশগুলি যে যার জায়গায় বসে গেল আবার।

অসহ্য ভয়ে জমে পাথর হয়ে গেলেন অপরেশবাবু। বরফ-জমাট আতঙ্কে তিনি বোধশক্তি হারিয়ে ফেললেন।

সহসা খনখনে হাসির শব্দে রাতের অন্ধকার যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। সেই শব্দে অপরেশবাবু সম্বিৎ ফিরে পেলেন। দু'হাত থেকে ব্যাগ দুটো খসে পড়ল মাটিতে। একটা বিকট 'আঁ-া-া' শব্দ তাঁর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এল। তিনি সামনের দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন। মনে একটাই চিন্তা—পালাতে হবে। পালাতে হবে যত জোরে, যত দূরে ওই বিভীষিকার হাত থেকে বাঁচতে।

সাহস তাঁর মন থেকে উবে গেছে কর্পূরের মতো। প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন অপরেশবাবু। শরীরের সব শক্তিকে এক করে তিনি ছুটছেন তখন অন্ধের মতো।

কখনো ধাক্কা লাগছে গাছের গুঁড়িতে, কখনো বা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার খানাখন্দে পড়ে যাচ্ছেন উল্টে। মাথা ছড়ে যাচ্ছে, হাত-পা-কনুই ক্ষতবিক্ষত, তবু প্রাণপণে ছুটছেন অপরেশবাবু পিছনের ওই অজানা আতঙ্ক থেকে বাঁচতে। ওই অজানা আতঙ্ক পিছন থেকে তাঁকে তাড়া করে আসছে.......আর আসছে!

কতক্ষণ ছুটেছেন মনে নেই। সহসা তাঁর নজরে এল সামনের একটা মাটির বাড়িতে আলো জ্বলছে।

বাঁচাও, কে আছ, বাঁচাও! আর্ত চিৎকার তুলে অপরেশবাবু বাড়ির উঠানে কোনোমতে পৌঁছে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

কতক্ষণ, ঠিক কতক্ষণ পরে বলা যায় না অপরেশবাবু জ্ঞান ফিরে পেলেন ধীরে। আস্তে দু'চোখ খুলে বোবা দৃষ্টিতে দেখলেন—একটা অপরিচিত ঘরে শুয়ে আছেন তিনি। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু লোকজনের উদ্বিগ্ন কৌতূহলী মুখ। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অপরেশবাবুর মনে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো জেগে উঠল ঘটে যাওয়া সেই বিভীষিকাময় ঘটনাগুলি। অস্ফুট আর্তনাদ করে তিনি উঠে বসতে গেলেন।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি তাঁকে উঠতে নিষেধ করে, অভয় দিয়ে তাঁর কী হয়েছে জানতে চাইলেন। মনে হয় এই লোকটিই এই বাড়ির কর্তা। অপরেশবাবু ধীরে ধীরে তাঁর সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতার কথা জানালেন তাঁদের কাছে।

সব শুনে বাড়ির কর্তা গম্ভীর হয়ে বললেন, কপালজোরে আপনি খুব বেঁচে গেছেন। যেখানকার কথা বলছেন, ওখানটায় আগে শ্মশান ছিল। এখনও মাঝে মাঝে ওখানে কেউ কেউ রাত-বিরেতে ওই রকম নানান বিভীষিকা দেখতে পায়। ভয়ে আতঙ্কে আমাদের গ্রামের মানুষ-জন রাতের অন্ধকারে পারতপক্ষে একা ওই রাস্তায় চলাফেরা করে না। এই বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফের বললেন, কি জানেন, এই পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা হঠাৎই ঘটে যায়, যাকে কোনো কিছু দিয়েই বোঝা যায় না মানুষের বিচারে।

সেদিন বেশ অনেক রাতে ওঁদেরই সাহায্যে অপরেশবাবু মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ি পৌঁছেছিলেন।

ফাল্গুন ১৪১১

সেই অদ্ভুত বাড়িটা

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

গরমের ছুটি পড়ে গেলেই মনটা আইঢাই করে। কিন্তু এই উদ্ভট গরমে কোথায় বা যাওয়া যায়? দার্জিলিং বা সিমলা ঘুরে এলে কেমন হয়? কিন্তু সে যে বড্ড দূর! তাহলে ঘরের কাছে দীঘার সৈকতই বা মন্দ কি?

সোমেনকে বলতেই সে হৈ হৈ করে উঠলো, কেন, আমার মামারই তো দীঘাতে একটা বাড়ি আছে। চল না, ওখানে গিয়ে উঠি। মামারা তো গরমের ছুটিতে মুম্বাই যাচ্ছে।

তাই নাকি? একরকম লাফিয়ে উঠলাম। বলবি তো? এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?

সোমেন মিটমিটিয়ে হাসছে। কিন্তু কি করে প্রোগ্রামটা সেট করি বল তো?

কেন, মামার ফোন নম্বর তোর কাছে নেই?

তা অবিশ্যি আছে।

তুই একটা কাজ কর। ইমিডিয়েট মামাকে চিঠি লিখে দে। বল যে আমরা দু'জন গরমের ছুটিতে দু'তিন দিন দীঘা ঘুরে আসতে চাই। সঙ্গে যাবে বাবা ও মা। তোমরা কবে মুম্বাই রওয়ানা হচ্ছ এবং ক'দিন পরে ফিরবে জানাবে। আমাদের স্কুলে আগামী ২২ মে গরমের ছুটি পড়ছে। আমরা ২৪ তারিখে দুপুর নাগাদ দীঘায় পৌঁছাতে পারি।

সোমেন খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে।

এতে হাসির কি হলো? অবাক চোখে আমি বলি। সোমেন বলে, বাবাকে তো বলা হয়নি। পারমিশন পাবো তো? আর বাবা-মা এই গরমে বাড়ি থেকে বেরুতে চাইবে বলে তো মনে হয় না।

চিন্তায় পড়লাম। হ্যাঁ, বাধা দেওয়াই তো বাবাদের চিরকালের স্বভাব। আমার বাবা আবার কি বলে? পরক্ষণেই ফের চিন্তামুক্ত হলাম। নিশ্চয়ই না করবে না, সোমেনের মা-বাবা যদি যান। আর ওর মামাবাড়িতে থেকে দীঘার ঝাউবন ঘুরে ঘুরে বেশ মজা করা যাবে। সাহস দিয়ে কবুল করলাম, আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ। অবনকাকুকে বোঝানোর দায়িত্ব আমি নিলাম। তুই কাকীমাকে রাজী করা তো। কাকীমাও বোধহয় রাজী হয়ে যাবেন।

সর্বাগ্রে সোমেনের মা রুমা কাকীমার কাছেই আর্জি পেশ করলাম। কাকীমা শুনে তো থ। মামা তো বড় একটা ঐ বাড়িতে থাকে না। তাছাড়া পুরনো কেনা বাড়ি। কবেকার কোন আমলের....বলতে বলতে হঠাৎ যেন থেমে গেলেন কাকীমা।

সোমেন দ্রুত বলে উঠলো, পুরনো তো কি হয়েছে? তুমি সেদিন বললে না, তাপু দীঘায় একটা বাড়ি কিনেছে। লজ করবে। অবসর সময়ে থাকবেও ওখানে। তবে কি মামীমা, পিক্‌লুরা ওখানে যায়নি?

রুমা কাকীমাকে কেমন আনমনা লাগলো। বললেন, বলে তো ছিল। কিন্তু এখন ফের শুনছি বেচে দেবে।

বেচে দেবে? আকাশ থেকে ছিটকে যেন মাটিতে পড়লো সোমেন। কেন মা? কিনলো তবে কেন?

অস্পষ্ট হাসি হাসলেন, রুমা কাকীমা। তোর তাপু মামা বদলি হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রকোনা। কাঁথিতে তো থাকছে না। তা...ই...

তো একটা বিশ্বস্ত লোকের হাতে ছেড়ে গেলেই পারে। দীঘার মতো জায়গায় একটা বাড়ি। ক'জনেই বা পায়? লজ কিংবা হলিডে হোম দারুণ চলবে। তুমি না করে দাও না মা?

সোমেনের আজব কথায় রুমা কাকীমা হেসে কুটিপাটি। আরে বোকা, আমি না বললে তোর মামা রাখবে? কেনার সময় কই কিছুই তো বলেনি?

তবু সোমেনের আবদার কমে না। মা, তুমি একটা চিঠি লিখে দাও না মামাকে? বেচে দেওয়ার আগে একবার ঘুরে আসি। রমেনও যাবে বলছে।

রুমা কাকীমা আমার দিকে হাসিমুখে তাকান। ভালোই তো। তোরাই না হয় যা না। চিঠি একটা লিখে আগাম জানিয়ে দে। ওরা মুম্বাই যাওয়ার আগে একটা ব্যবস্থা করে যাবে।

যেমনি চাওয়া, তেমনি পাওয়া। সোনায় সোহাগা। মা-বাবা দু'জনের কেউই যেতে রাজী হলেন না। গরমের ছুটিতে মামার নির্দেশমতো সোমেন আর আমি গিয়ে হাজির হলাম দীঘার বাড়িতে। দীঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে মাত্র মিনিট দশেকের হাঁটা পথ। সোমনের মামা ম্যাপ এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ঐ ম্যাপ ধরেই একটা বাড়ির সামনে থামলাম। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পোড়ো বাড়ি। তবে পেল্লাই সাইজের। চারপাশে পাঁচিল। জায়গায় জায়গায় ভাঙা। নোনাধরা ইঁট ক্ষয়া দাঁতে হা-হা করছে। পুরনো একটা লোহার রেলিং দেওয়া গেট। ভেতর থেকে বন্ধ। গেটের দু'পাশে দুটো নোনাধরা থাম। তারই একটাতে শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা বাড়ির নাম। সোমেনের চোখ পড়তেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, বাহ্, ভারী অদ্ভুত নাম তো—'সাগর সোনা' !

আমি বললাম, 'সাগরমানিক' রাখতে পারতো! না হয় 'স্বর্ণলঙ্কা'!

মামাকে 'দশানন' করার তালে আছিস, তাই না? সোমেনের সপাট জবাব।

কিছুক্ষণ রেলিং-এ শব্দ তুলে ডাকাডাকির পর একজন বুড়ো গোছের লোক বেরিয়ে এলো। লোকটা কুঁজো, নিচু হয়ে হাঁটে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কোথা থেকে আসছেন বাবু?

সোমেন বললো, আমি তাপসবাবুর ভাগ্নে। ঝাড়গ্রাম থেকে আসছি।

ওহ, আপনি সোমেনবাবু আছেন তো!

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হুঁ, বাবু বলছিল। ইনি আপনার বন্ধু? বুড়ো আমার দিকে ভ্রূ তুলে একবার তাকালো।

হ্যাঁ, এ আমার বন্ধু রমেন বোস, মান রমেনবাবু। আর তুমি রামশরণ সিং, তাই তো?

রামশরণ অদ্ভুত সংকুচিত এক হাসি হাসলো। তারপর গেটের দরজা মেলে ধরতেই আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

।। দুই ।।

আচ্ছা, মামা-মামীমা তো গত পরশু বেরিয়ে গেছে, তাই না?

হ্যাঁ, বাবু। উনারা তো সেদিন রাতভোরেই গেল। খড়্গাপুরে টিরেনে চাপবে তো? আসেন আসেন, অন্দরে আসেন।

আমরা চারদিক দু'চোখে গিলতে গিলতেই এগোলাম। স্পষ্ট বোঝা যায়, এককালে বাড়িটা ছিল ছাইরঙের। বেশ কয়েকটা জানলার গরাদ ক্ষয়ে যাওয়া কিংবা ভাঙা। সামনেই বাগান। আম, জাম, নারকেল, জামরুলের গাছ। আগাছা জঙ্গলে ভর্তি। বোঝা যায়, অনেকদিন যত্ন নেই।

আচ্ছা, এ বাড়িতে মালী নেই?

আছে বাবু, তবে ও তো ইখানে থাকে না। তাছাড়া বুড়াহাবড়া মানুষ। গতর গেইছে। তাপসবাবু বাড়ি নেওয়ার পর দু'একবার এসছিল। বাবু ডেকে পাঠালে আসে।

তা, তুমি এ বাড়িতে কতদিন কাজ করছো?

বৃদ্ধ রামশরণ কপালে ভাঁজ তোলে। হামি সেই কুড়ি বছর বয়স থেকে আছি বাবু। কলকাত্তার গাঙ্গুলিবাবু আমাকে কাজটা দিয়েছিল। ঐ বাবুরই বাড়ি। কিছু খানদানী ছিল বাবু। কলকাতা থেকে কত লোকজন আসতো। নাচ-গান-খানাপিনা হতো। সরগরম হয়ে যেতো বাড়িটা। সেসব দিন গেছে বাবু।

রামশরণের কথা শুনতে শুনতে আমরা কখন সিঁড়ির ধাপ ক'টা পেরিয়ে এসেছি বুঝতে পারিনি। বাড়িটার গঠনশৈলী ও সৌন্দর্য বিষয়ে রামশরণের কথার সত্যতা যাচাই করতে করতে দোতলার বারান্দায় হাঁটছি। পুরনো গথিক শৈলীর খিলান। নকশাকাটা বহু কিনারযুক্ত স্তম্ভ। ঢালাও বারান্দা। নির্জন ধ্যানমগ্ন বাড়িটা। দু'চারটে চামচিকে ও কালো পাখি এদিক-সেদিক উড়ে নৈঃশব্দ্য ভাঙছিল। বাগানটার জন্যে ওপাশের বাড়িঘর তেমন দেখা যায় না। পাঁচিল পেরিয়ে কয়েক গজ দূরে একটা বস্তি। জেলে-পাড়াই হবে। ছাদ থেকে দেখা যায়, জাল শুকোচ্ছে।

রামশরণ দোতলার একটা ঘর খুলে দিল। প্যানেল-করা সেগুন কাঠের দরজা। মিহি কারুকাজ দেখে অবাক হতে হয়। মোজাইক করা মেঝে। যত্রতত্র তেলচিটে কালো দাগ। অনেকদিন ব্যবহারই হয়নি। ব্যাগপত্র ঝোলাঝুলি রেখে আমরা হাঁফ ছাড়লাম।

পেল্লাই মাপের একখানা পালঙ্ক। ঢাউস বিছানা। পাশেই পাতা সোফা-কাম-বেড। সোমেন ওটাতেই বসে গা এলিয়ে দিল। পুবের কোনায় জানলার ধারে একটি টেবিল পাতা। তাতে মামার কয়েকটা বইপত্র। দু'পাশে দুটো বেতের চেয়ার। খানিক ভাঙাচোরা। ওগুলো সবই বাড়ির আদি মালিকের। রামশরণের কথায় জান গেল, তাপুমামা নাকি বেডশিট কভার সবই নতুন লাগিয়েছে। ভেতরটাও নতুন করে হোয়াইট ওয়াশ করিয়েছে। জামা-প্যান্ট ছেড়ে চোখমুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে বসেছি, দরজার দিকে তাকাতেই দেখি, রামশরণ মিটমিটি হাসছে, বাবু—চা?

আমি তো একরকম চমকেই গেলাম। ধন্যবাদ দিতে হয় এই হিন্দুস্থানী বুড়োটাকে। মনটাও চা-চা করছিল।

সোমেন জিগ্যেস করলো, কতদূর চায়ের দোকান?

ঐ তো বাবু। রাস্তার মোড়েই।

যাও পয়সাটা দিয়ে এসো গে। বলে আমি ওর হাতে দু'টাকার একটা নোট গুঁজে দিই।

ও নির্লিপ্তের ঢঙে বলে, পয়সা দিয়েছি বাবু।

সোমেন বলে, অ্যাই দেখ, তুমি কেন দেবে?

রামশরণ একটু হেসে বলে, কেন, গরীব বলে কি এটুকু করতে পারি না? আপনারা এসেছেন! তাছাড়া ক'টাই বা পয়সা?

আমি কিছু বললাম না।

প্রসঙ্গ পাল্টালো রামশরণ, বাবু, দুপুরের রান্না?

না-না-না। ও আমরা হোটেলেই খেয়ে নেবো। অযথা তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? তাপুমামাকে সেকথা আমরা লিখে জানিয়েছি।

ঘাড় কাত করে শুনছিল রামশরণ। বললো, না বাবু। কষ্ট কি? কত খুশি করে আসছেন। হোটেলের ঝালঝোল খাবেন? বাবু শুনলে বকবে না?

না হে না, বাবু তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

তবু রামশরণ কি শোনে! শেষে অনেক করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাকে থামানো গেল। রামশরণ

আমাদের জন্য দোতলার বারান্দার কোণে একটা কুঁজোতে জল এনে রাখলো। তারপর ঘরের চাবির গোছা আমাদের ধরিয়ে দিয়ে বললো, সিঁড়ির নিচের ঘরটাতে আছি। দরকার হলেই ডাকবেন কেমন।

আমাদের পাশের ঘরটি সেই বিখ্যাত নাচঘর। রামশরণের কথা শুনে অবধি ওটি দেখার জন্যে আমরা ছটফট করছি। তাই ওকে পিছন ফিরতে দেখে সোমেন বলে বসলো, আচ্ছা, ঐ ঘরের চাবিটাও কি এর সঙ্গে আছে?

উঠে এলো রামশরণ। হাঁ। ওঃ! বাবুদের তো ঐ ঘরটা দেখানো হয়নি। বলেই আমার হাত থেকে চাবির গোছটা নিয়ে খুলে দিল ঘরটা।

বিরাট হলঘর। জানলাগুলোর শার্সি দিয়ে ঘোলাটে আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। কেমন এক গা-ছমছমে পরিবেশ। দরজা-জানলা সব বন্ধ থাকায় ঘরে গুমোট গন্ধ।

সোমেন বললো, তাপুমামা এ ঘরটা ব্যবহার করে না?

ধীরে মাথা নাড়লো রামশরণ। না বাবু। আপনাদের তখন বলছিলাম না এটাই সেই নাচঘর—বুঝলেন?

আমি যাত্রা-থিয়েটার বা সিনেমায় নাচগানের আসর ঢের দেখেছি। কিন্তু জমিদার, রাজারাজড়ার বা কলকাতার বাবুদের গানের জলসা দেখিনি। মনে মনে তার একটা ছবি এঁকে নিলাম।

দুপুরে হোটেলে খেয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম। বিকেলে গেলাম সমুদ্রের ধারে। ঝাউবনের হাওয়ায় দোল খেতে খেতে সমুদ্রের ঘোলা জলে নেমে হাঁটা। কী ভালোই না লাগলো! সোমেন বললো, গতবছর আমরা পুরী গিয়েছিলাম। ওখানে অনেকটাই বালিয়াড়ি। আর বড় বড় ঢেউ। জলটাও খুব নীল। কিন্তু এখানে দেখ জলটা কেমন একটু ঘোলাটে। বালিয়াড়ি নেই বললেই চলে। তবে অনেকটা ভেতরে হেঁটে যাওয়া যায়।

মানে 'মহীসোপান' অনেকটা চওড়া, আর 'মহীঢাল' অনেকটা দূরে—তাই তো?

সোমেন চোখ কুঁচকে ভঙ্গি করে। বাহঃ! এক্কেবারে ভৌগোলিক বিশ্লেষণ!

পরদিন আবার সাগরস্নান। ঝিনুক বিশেষ পাওয়া যায় না। তবুও খোঁজার চেষ্টা। একটা জায়গায় জল শুকিয়ে কাদা-ডোবা। অদ্ভুতদর্শন মোটামাথা মাছ একটা মরে পড়ে আছে। হৈ হৈ করে ল্যজ ধরে বীরদর্পে সোমেনের দিকে নিয়ে আসছি। দেখ দেখ একটা সামুদ্রিক মাছ পেয়ে গেলাম।

সোমেনের চোখমুখে খুশির আলো। জ্যান্ত না কি রে? স্থানীয় এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওঁকে সোমেন জিগ্যেস করলো, কাকু, এই মাছটার নাম কি?

ভদ্রলোক ফিরে তাকালন তারপর হাসতে হাসতে যা বললেন, তাতে ভীষণ বোকা বনে গেলাম। ওটা মাছ নয়, সামুদ্রিক ব্যাঙ।

একটা জায়গায় শঙ্কর মাছ দেখলাম। কী ভয়ঙ্কর তার কাঁটাওলা ল্যাজ। ধরা পড়েছে, কত সামুদ্রিক কচ্ছপ ও জ্যান্ত শাঁখ। স্তূপীকৃত সামুদ্রিক নানাবিধ মাছ। তাদের আঁশটে গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার যোগাড়। এই মাছ চলে যাচ্ছে দূরদূরান্তে। বিক্রি হচ্ছে-হাটে বাজারে ধুমধাম করে। শিয়ালদা মার্কেটেও এই শুঁটকি মাছের রমরমা দেখেছি।

।। তিন ।।

ঘটনাটা ঘটলো ঐ দিন রাতে।

রাত প্রায় দুটো-আড়াইটা হবে। আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। এ কী! এই রাত-দুপুরে ঘুঙুর পায়ে কে নাচছে? নাকি স্বপ্ন দেখছি? চোখ কচলে

খানিকক্ষণং থম মেরে বিছানায় জেগে রইলাম। না। স্পষ্ট ঝমঝম শব্দ। একবার বাড়ে, তো আবার কমে। ঝমঝম...ঝমঝম...ঝমঝম...। কান ঝালাপালার যোগাড়। মনে হলো, দরজার বাইরেই কেউ নাচছে। আশ্চর্য! ফিরে দেখি, সোমেন তখনও নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঠেলা দিয়ে ওকে তুললাম।

একরকম আঁতকে ধড়মড় করে উঠে বসলো ও। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে পরক্ষণেই হাঁ করে থাকলো। বাইরের বারান্দায় তখন নাচের ঝড়। চল তো দেখি ব্যাপারটা কি? হতভম্ব সোমেন চোখ বড় বড় করে বললো।

আমি ওকে আটকালাম, তোর মাথা খারাপ?

আরে, নিশ্চয়ই কেউ নাচছে। তা না হলে শব্দটা আসছে কোত্থেকে!

তুই কি ভূতটুতের কথা ভাবছিস নাকি?

সোমেনের আলটপকা কথায় আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। কারণ আমার মনে তখন রামশরণের সেই গান-বাজনার কথা ভাসছিল। আলতো মাথা নাড়লাম, না-না, তা ভাবছি না, কি....ন-তু....এটা যে স্পষ্ট ঘুঙুরেরই শব্দ।

সোমেন বললো, তা হতেই পারে। নতুন আগন্তুক দেখে কেউ ভয়ও তো দেখাতে পারে।

আমার বুকটা ঢিপঢিপ করছে। নাচঘরের চাবিটা যে আমারই কাছে। তবু সোমেনের কথায় সাহস করে আলো জ্বালালাম। দরজা খুলে বারান্দায় এলাম। অবাক কাণ্ড! তখনো ঐ নাচঘরে ঝমঝম শব্দের তুফান বয়ে যাচ্ছে। চাবি দিয়ে ঘরটা খুলে ঢুকলাম। না কোত্থাও কিচ্ছু নেই। সারাঘর খাঁ খাঁ করছে। নিজেদের খুব বোকা মনে হলো। ঘরে ফিরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এবার কিছু হলে রামশরণকে ডাকবো। আচ্ছা লোক বটে, নাচঘরের কথা বললো অথচ এরকম কাণ্ড যে ঘটে তা তো বলেনি! সেটা কি আমরা ভয় পাবো বলে? সাতপাঁচ ভাবতে লাগলাম। দু'চোখের পাতা আর এক হলো না।

আধঘণ্টা খানেক পরে সেই ঝমঝম শব্দ। এবারে মনে হলো, কোনো মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাচতে নাচতে নেমে যাচ্ছে।

ছিটকিনি খুলে বারান্দায় এলাম। নিঃশব্দে এগোচ্ছি। সেই রহস্যময় পায়েলের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল। হঠাৎ নৈঃশব্দ্যের বুক চিরে জেগে উঠলো সোমেনের বিদ্যুৎ-বজ্র কণ্ঠ—রামশরণ! রাম.....শরণ! ও রাম.....শিউরে উঠলাম ভেতরে ভেতরে। আবার কিছু না একটা ঘটে যায়!

কী আশ্চর্য! মুহূর্তেই ঘুঙুরের শব্দ থেমে গেল। এক্কেবারে শুনশান। টর্চের প্রখর আলোয় দু'একটা বাদুড় মাথা ছুঁয়ে চিক চিক করে উড়ে গেল। আর বুড়ো রামশরণ হেঁড়ে গলায় গর্জে উঠলো, কৌন হ্যায়? প্রতিধ্বনিমুখর সেই অদ্ভুতুড়ে প্রাসাদ বলে উঠলো, কৌন হ্যায়? কৌন হ্যায়...কৌন হ্যায়?

আমরা সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলে রেখেছি। টালমাটাল পায়ে উপরে উঠে আসছে বৃদ্ধ রামশরণ।

কি হয়েছে বাবুজি? ঘুঙুরের আওয়াজ শুনেছেন বুঝি?

আমরা নির্বাক। আশ্চর্য! রামশরণ যেন নির্বিকার।

সিঁড়ি বেয়ে একটু আগে কে যেন নেমে গেল?

রামশরণের ভ্রূ-যুগল কপালে উঠলো। মুখটা কাঁচুমাচু করে ও বললো, আপনারা লিখাপড়া জানা ছেলে। তাই ওসব আর বলিনি। মাঝে মাঝে এরকমই হয়। তাপুবাবুও প্রথম প্রথম ঘাবড়ে

যেতো। ও কুছু না। মানে ঘরটাতে নাচটাচ খানাপিনা হতো তো...। তা ভয় পেলেন নাকি? ভয় পাবেন না। যান যান, শুয়ে পড়ুন গে। রাত তো বেশি নাই। রামশরণ নিচে ফিরে গেল।

আমরা যথারীতি ঘরে ঢুকে আবার শুয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙলো, জানলার ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকেছে। আরে, রামশরণ কি তবে চা নিয়ে ফিরে গেল? সোমেনও উঠলো। হাতের চেটো উল্টে চোখ কচলাতে কচলাতে বললো, না ভাই, আর মামাবাড়িতে কাজ নেই। চল, সকালের বাসেই কেটে পড়ি।

আমি বললাম, আর বলিস না। রামশরণ না থাকলে কাল কী অবস্থা যে হতো!

সোমেন থম মেরে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বেশ চিন্তান্বিতভাবে মাথা নাড়লো, মা এইজন্যই প্রথমে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি—বুঝলি?

হুঁ, তাই তো। বোধহয় রুমা কাকীমা জানতেন ব্যাপারটা। তাই বললেন, পুরনো বাড়ি। তোর মামাও বড় একটা থাকে না। কিন্তু এই ভূতুড়ে কাণ্ড বোধহয় শোনেননি। নাকি আমরা ভয় পাবো বলে....

সোমেনের মুখ রাগে, অভিমানে ফুলে ফুলে উঠছিল। মা—ই এমন করলো!

আমি বললাম, দেখ, রাগ করে তো কিছু হবে না। বাড়ি গেলেই ব্যাপারটা জানা যাবে। রুমা কাকীমা বাড়িটা বিক্রির কথা বলছিলেন না—মনে আছে?

আড়মোড়া ভাঙলো সোমেন। ধ্যুত্তেরি মাঝখান থেকে ঘুমটাই ভালো হলো না!

চল, বাড়ি গিয়ে ঘুমুবি। বলেই আমি উঠে ছিটকিনি খুলে বারান্দায় এলাম। নিচে রামশরণকে দেখতে পাবো ভেবে একবার উঁকিঝুঁকি দিলাম। কিন্তু কই, তাকে তো দেখছি না। তবে কি এখনো ওঠেনি! দু'তিনবার হাঁকডাক দিয়েও কোনো সাড়া না পেয়ে দু'জনেই সিঁড়ি বেয়ে নামছি। সঙ্গে লটবহর। রাতটা তো প্রায় জেগেই কাটলো। এখন বোধহয় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকাটা উচিত হবে কি? কিন্তু চাবিটা দিয়ে যেতে হবে যে।

রামশরণ...ও শরণজী...আরে কিতনা নিঁদ যাতা হ্যায়! ভুলভাল হিন্দী বলেও ওর ঘুম যখন ভাঙলো না, তখন আমরা সত্যিকারের ভয় পেয়ে গেলাম। কাল যা ঘটেছে। ওরে বাপ্‌স! ভেতর থেকে ওর দরজাটা বন্ধ। কিছুতেই যখন উঠলো না, তখন দরজায় দুমদাম লাথি। একসময় পাল্লা দুটো খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট গন্ধ ধাঁ করে ছুটে এল বাইরে। ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার যোগাড়।

রমশরণ কম্বল গায়ে তক্তপোশের নিচে পড়ে আছে। মুখে গ্যাঁজলা। তাড়ির উটকো গন্ধ। চোখ দুটো উল্টানো। মুখটাও হাঁ করা। যেন কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু বলার সময় পায়নি। কম্বলটা সরিয়ে দেখা গেল, হাত-পা একেবারে ঠাণ্ডা। সোমেন নাড়ি টিপে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো, ইস্ বুড়োটাকে আমিই মেরে ফেললাম রে। আমার জন্যই মরলো...উফ্ আমার জন্যেই.....

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম। ধ্যুত্তেরি। তুই মারলি কী করে?

কাল সন্ধ্যায় ও বকশিশ চাইছিল। পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। আর তাতেই তো—সোমেন মাথা চাপড়াতে লাগলো। অহল্যা মঞ্জিলের সেই রাত।

আর আমার তো মাথা খারাপের যোগাড়। শেষরাতের দিকে তবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো কে? তবে কি......

কার্ত্তিক ১৪০৭

কবরের কান্না

রমেন দাস

বিশাল বটগাছটি দেখে তার শীতল ছায়াতে বসল ক্লান্ত লাল্টু। সঙ্গে রামশরণও। কলকাতা রাজভবনের বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ এই মানুষটির সঙ্গে লাল্টুর বেশ ভাব জমেছে। রাজভবনের অতীত দিনের সাহেব-মেম আর লাটসাহেবদের গল্প-কাহিনী রামশরণের কাছে শুনে শুনে লাল্টু তার অনুরাগী হয়ে পড়েছে। নবীন ও প্রবীণের সম্পর্কটা আত্মীয়তার স্তরে পৌঁছেছে। তাই ব্যারাকপুরের লাটবাগান এবং তার পরিবেশ-পরিমণ্ডল চাক্ষুষ করতে লাল্টু রামশরণের সঙ্গী হয়েছে।

বটগাছের নিচে বসে লাল্টু অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলো। রামশরণের সঙ্গে অনেক কথাও বলল। গল্প করতে করতে হঠাৎ কেমন আবেগমুখর হয়ে উঠল সে। অদূরে গঙ্গায় পালতোলা একটি নৌকো ভেসে যাচ্ছিল। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে লালটু বলল, পাশে গঙ্গার স্রোতধারা আর মাথার উপরের বিশাল বটবৃক্ষ—এ এক অপূর্ব পরিবেশ। যিনি এই বটগাছটি লাগান, তাঁর সৌন্দর্যবোধের তারিফ করা উচিত। কথা শেষে লালটু বটগাছটির শাখা-প্রশাখার দিকে তার অবাক দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল।

রামশরণ খোকাবাবুর ভাবসাব দেখে একটু হাসল। শুধু কলকাতার রাজভবন কেন, ব্যারাকপুর লাটবাগানের নাড়িনক্ষত্র তার জানা। বলল, এই লাটবাগান তো কলকাতার রাজভবনেরই একটা অংশ। বিদেশী সাহেবরা যখন এদেশের দখল নিয়ে রাজত্ব শুরু করে, তখন তাদের শখ আর বিলাস-বৈভবের মাত্রা ছিল না। সপ্তাহ শেষে অথবা আমোদ-আহ্লাদ করতে কোথায় যাবে? সেজন্য প্রয়োজন হলো রাজকীয় এক বাগানবাড়ির। সেই তাগিদেই এক বড়লাট ব্যারাকপুরের এই লাটবাগান তৈরি করলেন।

লালটু রামশরণের কথা শুনে কৌতূহলী হয়। জানতে চায়, সেটা কবেকার কথা?

রামশরণ সরল মনেই স্বীকার কর, আমি মুখ্যু মানুষ। রাজভবনে সামান্য এক মালীর কাজ করেছি। সন-তারিখ আর সাহেবসুবাদের নামটাম আমার জানা নেই।

লালটু রামশরণের মুখের দিকে তাকায়। বলে, জানি না জানি না করেও তুমি যা জানো, অনেক শিক্ষিত মানুষেরও তা জানা আছে কিনা সন্দেহ।

রামশরণ একটু লজ্জা পায়। তারপর সসঙ্কোচে বলে, লাটবাগানের বয়েস কত তা আমার জানা নেই ঠিকই। তবে যে বটগাছের নিচে আমরা বসে আছি, তার বয়সের একটা হিসেব আমার জানা আছে।

বটগাছটির দিকে আবার দৃষ্টি বুলায়। দেখেই বুঝতে পারে প্রাচীন বৃটবৃক্ষটি বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত গাছটি লাটবাগানের এক প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক সেনার মতো। যেন এই বাগানের পাহারাদার।

রামশরণ বলে, চাকরি জীবনের প্রথমে যেবার আমি লাটবাগানে আসি, তখন শুনেছিলাম, এ গাছটির সঠিক জন্মতারিখ কারোর জানা নেই। এক বিদেশী বিজ্ঞানী সেবছরই বাগানের পুরনো গাছগাছড়ার হিসেব-নিকেশ করছিলেন। সেটা ১৯২৫ সালের কথা। সেই বিজ্ঞানী-সাহেব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন বটগাছটির বয়স দুশো চল্লিশ বছরের মতো।

রামশরণের মুখে বটগাছটির বয়সের হিসেব শুনে, লালটু বলে, আমি এর চেয়েও প্রাচীন বটগাছ দেখেছি হাওড়ার শিবপুরে বোটানিকাল গার্ডেনে। তার কী বিশাল আকার। ঐ গাছটির বয়সেরও কোনো সঠিক হিসেব নেই।

লালটুর কথায় রামশরণ হাসে। বলে, জানি সে গাছটিও প্রাচীন। তারও অনেক বয়েস। কিন্তু লাটবাগানের এ গাছটির তুলনায় সে শিশু। এবার সে একটু থামে। যেন অতীতের সাগরে ডুব দেয়। বলে, যে বটগাছটির নিচে আমরা বসে এই আলাপ-আলোচনা করছি, একদিন এরই ছায়ায় বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের পত্নী অর্থাৎ লাটসাহেবা এলে ক্লান্তি দূর করতেন। সাজানো প্রাসাদের মনোরম পরিবেশ ছেড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি এখানে বসে বাগানের সৌন্দর্য-শোভা উপভোগ করতেন।

এবার আর লালটু স্থির থাকতে পারে না। বটগাছটির নিচে এতক্ষণ যে বাঁধানো চাতালের উপর বসেছিল সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বাস রে! লাটগিন্নী এই চাতালে বসতেন! আবেগে আনন্দে তার সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে। ইতিহাসের ছাত্র লালটুর সামনে অতীতের একটি অধ্যায় মুখর হয়ে ওঠে। কল্পনার আলপনায় সে ততক্ষণে বিভোর।

লর্ড ক্যানিং পরাধীন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হয়ে লন্ডন থেকে এদেশে আসেন। গোটা ভারতে তখন লর্ড ক্যানিংয়ের আদেশই ছিল শেষ কথা। সারা দেশের শাসনব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। প্রভাব-প্রতিপত্তি আর সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ক্যানিংসাহেবের কোনো জুড়ি ছিল না। স্বামীর এত ক্ষমতা এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও কিন্তু লেডি ক্যানিং ছিলেন খুবই সাদামাঠা নিরহঙ্কারী-আপনভোলা। কারণ তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন শিল্পী।

শিল্পী! বিস্মিতকণ্ঠে লালটু প্রশ্ন করে, লাটগিন্নী লেডি ক্যানিং শিল্পী ছিলেন? তার চোখে-মুখে অবিশ্বাসে ছায়া ফুটে ওঠে।

রামশরণের লেখাপড়া করার সুযোগ হয়নি। সামান্য একজন মালী। নিজের অভিজ্ঞতার অভিধান খুলে ধরেছিল লালটুর কাছে। সে আবার মুখর হলো। বলল, সত্যসত্যই লাটগিন্নী স্বভাবসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন। সময়-সুযোগ পেলেই এই বটবৃক্ষের তলায় বাঁধানো চাতালে বসে অদূরে গঙ্গানদীর গৈরিক জলের মধ্যে প্রকৃতির শোভা খুঁজতেন। তাঁর নির্দেশ ছিল, যখন তিনি এ গাছতলায় আসবেন, তখন যেন কোনো রাজকর্মচারী, আর্দালি বা প্রহরী তাঁর আশপাশে না থাকে। নীরবে-নিভৃতে তিনি তখন তন্ময় হয়ে প্রকৃতির কোলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন।

লালটু অতীতের অনেক বড়লাট আর লাটসাহেবাদের রাজসিক আচার-আচরণ, উদ্ধত অহংকার আর শাসনক্ষমতার অপব্যবহারের কাহিনী শুনেছে। কিন্তু লেডি ক্যানিংয়ের সাদামাঠা জীবনযাপনের কথা শুনতে শুনতে নিজের অজান্তেই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ল। গুণমুগ্ধের মতো রামশরণের কাছে সে প্রশ্ন করল, সৌন্দর্যবোধের জন্যই কি তাঁকে শিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল?

বৃদ্ধ রামশরণ মাথা নাড়ল। বলল, না, এমন সুন্দর পরিবেশ-পরিমণ্ডল কার না ভালো লাগে! তার জন্য তো সকলকে শিল্পী বলা যায় না।

তবে? লালটুর কৌতূহলী প্রশ্ন। রামশরণের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি তৈল-চিত্র। কলকাতার রাজভবনের থ্রোনরুমে টাঙানো ছিল। চাকুরি জীবনের প্রথম দিকে সেই অপূর্ব তৈল-চিত্র সে দেখেছে। একটি সবুজ সতেজ বটগাছ। তার সবুজপাতার ছাতার নিচে বসে উদাসী এক ফকির। পড়ন্ত রোদের আভায় ঝলমল করছে স্রোতস্বিনী গঙ্গার গৈরিক জলধারা। পশ্চিমে ঢলে পড়া নিস্তেজ সূর্য বিদায়ের অপেক্ষায়। ক্লান্ত ফকিরের দৃষ্টিতে নির্লিপ্তভাব। ছবির নিচে শিল্পীর নাম—মিসেস ক্যানিং।

ছবির বিবরণ শেষ হওয়ার আগেই লালটুর প্রশ্ন, মিসেস ক্যানিং-ই কি বড়লাট লর্ড ক্যানিয়য়ে স্ত্রী লেডি ক্যানিং?

রামশরণের চোখ-মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হলো। বলল, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সেকালের খুব নামকরা শিল্পী! প্রতি মাসেই তিনি লাটবাগানে আসতেন বলে শুনেছি। কলকাতার রাজভবনের বিলাসবহুল পরিবেশ ছেড়ে এখানে থাকতেই ভালবাসতেন। আর সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় তিনি এই চাতালে বসে ছবি আঁকতেন।

এখানে বসেই ছবি আঁকতেন? অবাক সুরে প্রশ্ন করে লালটু।

হ্যাঁ, শুনেছি রঙ-তুলি আর সামনে রাখা ক্যানভাস নিয়ে তিনি স্বপ্নের সাগরে ডুবে যেতেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। কেউ তাঁর সামনে যেতে সাহস পেত না, পাছে লাটগিন্নীর ধ্যান ভেঙে যায়।

কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। দুপুরের সূর্য ততক্ষণে গঙ্গার ওপরে ডুবে গেছে। গাছে গাছে পাখিদের দিন শেষের কূজন। দূরের পাখিরা ঘরে ফিরছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার ক্রমে ঘন হচ্ছে। রামশরণ বা লালটুর সেদিকে খেয়াল নেই। গুরু-শিষ্যের মতো দুই প্রবীণ-নবীন লাটবাগানের প্রান্তসীমায় কেমন যেন আনমনা।

আচমকা একটা চাপা কান্নার করুণ সুর শোনা গেল। পাখিদের কাকলি আর বটবৃক্ষের হাজার পাতায় দক্ষিণা বাতাসের ঝড়ো শব্দে অদ্ভুত সেই কান্নার সুরটা ঠিক বোঝা গেল না। অস্পষ্ট সেই কান্নার শব্দে লালটুর মুখের ভাব কেমন যেন বদলে গেল। ওর গা ছমছম করে উঠল। রামশরণ লালটুর চোখমুখে ভীতির ছাপ দেখে বুঝতে পারল, সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃঝুম ঐ গাছতলায় আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। দুজনই উঠে পড়ল। আবার সেই চাপা কান্নার সুর! এবার আর অস্পষ্ট নয়। এ-এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দুজনই দ্রুত পা চালাল।

কিছুটা পথ এগোনোর পর লাটবাগানের নৈশপ্রহরীর টর্চের আলো তাদের চোখে-মুখে পড়ল। দুজন থমকে দাঁড়াল।

তোমরা কারা? নৈশপ্রহরী জানতে চাইল। রামশরণ আর লালটু তাদের পরিচয় দিল। তখনও তারা কাঁপছে। ভয়ে জড়োসড়ো। লাটবাগানের নৈশপ্রহরী প্রশ্ন করল, তোমরা ভয় পাচ্ছ নাকি? আমি এই বাগানের নাইটগার্ড। রাত্রে এখানে পাহারা দিই।

রামশরণ নিজের পুরনো পরিচয় দিতে নৈশপ্রহরীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। সে বলল, চলো, আমার ঘরে বসে একটু বিশ্রাম করবে।

রাজভবনের সাবেক কর্মী লাটবাগানের প্রহরীর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারল না। ওরা তিনজন গিয়ে বসল একটি একতলা বাড়ির বারান্দায়। দক্ষিণখোলা বারান্দায় বসে কথা বলতে বলতে লালটুর চোখ গিয়ে পড়ল একটি উঁচু ঢিবির উপর। আবছা অন্ধকারে জঙ্গলঘেরা উঁচু ঢিবিটা দেখতে যেন একটা মানুষের মতো।

লালটুর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে নৈশপ্রহরী বুঝতে পারল, ওটা দেখে সে ভয় পাচ্ছে। কিঞ্চিৎ হেসে বলল, ওটা ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়, শ্বেতপাথরের একটি ফলক। অন্ধকারে মানুষের মতো মনে হচ্ছে তাই না?

লালটুর মুখে লজ্জার হাসি ফুটল। নিজের দুর্বলতা ঢাকতে সে কিছুটা বীরত্বের ভাব দেখাল। বলল, আগাছায় ভরা জঙ্গলে শ্বেতপাথরের ফলক কেন?

নৈশপ্রহরী এবার রামশরণের দিকে তাকাল। রামশরণ রাজভবনের পুরনো দিনের কর্মী। লাটবাগানের খবরাখবর যে তার অজানা থাকার কথা নয় তা সে জানত। বলতে গেলে রামশরণের

সহাস্য ইঙ্গিত পেয়েই নৈশপ্রহরী মুখ খুলল। বলল, ওখানেই লাটসাহেবা লেডি ক্যানিংকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

লালটু চমকে উঠল, শিল্পী লেডি ক্যানিংয়ের সমাধির এই দুরবস্থা?

এবার রামশরণ নড়চড়ে বসল। বলল, সে আর এক ইতিহাস। লেডি ক্যানিংয়ের হঠাৎ শখ হলো পাহাড়-নদী-বনভূমি—সব নিয়ে তিনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকবেন। বড়লাটের পত্নী বলে কথা। অতএব তাঁর ইচ্ছাপূরণে দেরি হলো না। স্থির হলো তিনি রঙ-তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে যাবেন। ডুয়ার্সকেই তিনি শিল্প-প্রকৃতির স্থান হিসেবে বেছে নিলেন।

ডুয়ার্স মানেই পাহাড়ঘেরা সবুজ বনভূমি। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাজলের ধারায় তিস্তা মহানন্দা করলা তোর্সা সহ ছোট-বড় কত নদী। নানা প্রজাতির গাছ-গাছড়া আর লতাগুল্মের বিচিত্র শোভা। তারই মধ্যে ঘন সবুজ চা-বাগিচা। দলে দলে পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ চা-পাতা তুলছে। শিল্পীর রঙ-তুলিতে একের পর এক ছবি ধরা পড়ে। ছবির স্বপ্ন আর সাধনা লাটগিন্নীকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়।

লালটুর মতো নৈশপ্রহরীরও রামশরণের কথাগুলো হাঁ করে গিলছিল। নৈশপ্রহরী লাটবাগানের কর্মী হলেও এসব কথা তার জানা ছিল না। বলল, এমন গুণী লাটাসাহেবাও এদেশে ছিলেন?

রামশরণ স্মিতহাসি হেসে মাথা নাড়ল। বলল, দুর্ভাগ্য, শিল্পী লাটসাহেবার ঐ ডুয়ার্স যাওয়াটাই কাল হলো। দিনের পর দিন ছবি আঁকার আনন্দে যখন তিনি আপ্লুত, হঠাৎ একদিন তাঁর হাতের তুলি মাটিতে পড়ে গেল। তাঁর সারাশরীরে কাঁপুনি দেখা দিল। হাত বাড়িয়ে তিনি আর তুলিটি তুলতে পারেন না!

লালটুর চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। কেন, কি হয়েছিল লাটসাহেবার?

রামশরণ বলল, দিনের পর দিন ডুয়ার্সের বনাঞ্চলের আবহাওয়ায় অসাবধানতা ও অনিয়মে থাকার ফলে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন। তারপরও ছবি আঁকার নেশা ছাড়তে চান না। কিন্তু রঙ-তুলি নিয়ে ক্যানভাসের সামনে বসবেন কি! তার আগেই ভালুকে জ্বরে তাঁর সারা শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়। আনন্দের মধ্যেও নিরানন্দ, তৃপ্তির মধ্যে অতৃপ্তি ফুটে ওঠে তাঁর চোখেমুখে। তারপর একদিন ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত শিল্পী ক্যানভাস-তুলি-রঙ নিয়ে কলকাতার রাজভবনে ফিরে এলেন।

কিন্তু লাটগিন্নীর সঙ্গে তো নিশ্চয়ই অনেক ডাক্তার রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করেননি? প্রশ্ন রাখে লালটু।

রামশরণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, লাটসাহেবা তো প্রথমটায় কাউকে কিছু বলেনইনি। তাঁর ধারণা ছিল, হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় তাঁর হাত-পা কাঁপছে, অন্য কিছু নয়। তাই সেই শীত দূর করতে তিনি শুধু ঘনঘন চা-কফি পান করতেন।

রামশরণের গলা ভার হয়ে এল। বলল, রাজভবনে নামী ডাক্তারদের ডাকা হলো। চিকিৎসাও চলল। কিন্তু তখনকার দিনে নাকি ম্যালেরিয়া সারানোর মতো ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। তাই শেষ পর্যন্ত গুণী লাটগিন্নী লেডি ক্যানিং কলকাতার লাটভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

নৈশপ্রহরী আর লালটুও রামশরণের কথায় শোকসন্তপ্ত হলো। লালটুর প্রশ্নের উত্তরে রামশরণ জানাল, লাটগিন্নী বুঝেছিলেন, তাঁর জীবনদীপ নিভে আসছে। তাই শেষ সময়ে তিনি স্বামীকে বলেছিলেন, আমার মরদেহ যেন ব্যারাকপুরের লাটবাগানে গঙ্গার তীরের প্রাচীন বটবৃক্ষের নিচে সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর পরে ওটাই হবে আমার শান্তির নীড়।

রামশরণের কথা শেষ হতে না হতে লালটুর চোখ গিয়ে পড়ল অদূরবর্তী সেই শ্বেতপাথরের ফলকটির ওপর। আশেপাশে জঙ্গলে ঘেরা ফলকটি ততক্ষণে আরও ঘন অন্ধকারে ডুবে গেছে।

লাটবাগানের নৈশপ্রহরীর চোখেমুখেও তখন একটা আতঙ্কের ছায়া ভেসে উঠল। লালটুর মতো তার সারা শরীরও কেমন যেন ভার ভার মনে হলো। রামশরণ অভিজ্ঞ মানুষ। সেও কেমন যেন হতভম্ব। তার চোখ গিয়ে পড়ল নৈশপ্রহরীর হাতের টর্চটির উপর। নির্জন নিস্তব্ধ বিশাল বাগানের অসীম অন্ধকারে আর একটি প্রাণীরও তখন সাড়াশব্দ নেই। রামশরণ নৈশপ্রহরীর হাতের টর্চটা টেনে নিয়ে অদূরের শিল্পী-সমাধির উপর আলো ফেলল। গাড়-অন্ধকার ভেদ করে শ্বেতপাথরের ফলকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে অন্ধকারের কিছু প্রাণী সশব্দে ছুটে পালাল। বিশাল বটবৃক্ষে আশ্রয় নেওয়া পাখির ডানার ঝাপটায় চারদিকে এক অদ্ভুত শব্দের ঐকতান শুরু হলো। তার মধ্যেই আবার সেই করুণ সুর ভেসে এল। এ যেন এক দীর্ঘশ্বাস ভরা করুণ সুরের বিলাপ।

লালটু নৈশপ্রহরীকে জড়িয়ে ধরে ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠল। নৈশপ্রহরীরও তখন ভয়ে থরথর করে করে কাঁপছে। বিষাদ-বিষণ্ণ আর ভয়ার্ত পরিবেশে রামশরণও কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখেও কোনো কথা সরছিল না। হাতের টর্চটি সে নিভালো না। টর্চের আলোয় আলোকিত বারান্দায় বসে আপনমনে বলে চলল, শিল্পী-লাটসাহেবার অতৃপ্ত আত্মাই হয়তো তাঁর প্রিয় বটবৃক্ষ আর কবরের আশেপাশে এই ঘোর সন্ধ্যায় ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৌষ ১৪০৩

পেত্নী

সুভদ্রা মুখোপাধ্যায়

বনগাঁ লাইনের এক মফস্বল শহরে নেমে গরুর গাড়ি করে সাত-আট মাইল গ্রামের দিকে গেলে তবে যোগেশ ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তার হিসেবে তাঁর খুব নাম-ডাক। যেমন তাঁর লম্বা-চওড়া চেহারা, তেমনি তাঁর সাহস। লোকে তাঁকে ভয়-ভক্তি দুই করে।

একদিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া করে বারান্দায় বসে যোগেশবাবু পান চিবোচ্ছেন, একটু পরেই শুতে যাবেন, এমন সময়ে গ্রামের একজন লোক এসে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, 'ডাক্তারবাবু, আমার বউকে বাঁচান, আপনি একবার আমার সঙ্গে চলুন।' যোগেশবাবু যত জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছে বল', সে ততই কাঁদতে থাকে, কিছুই বলতে পারে না। যোগেশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'উনি এত রাতে কি করে যাবেন? কাল সকালে এসে বরং নিয়ে যেও।' কিন্তু লোকটি এমনই কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যে যোগেশবাবুকে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বলতে হলো, 'ঠিক আছে চল।'

দূরে কোথাও রোগী দেখতে গেলে বা রাত-বিরেতে বেরুতে হলে যোগেশ ডাক্তার তাঁর ঘোড়াটিকে ব্যবহার করেন। আজও সেই ঘোড়ায় উঠে বসে তিনি লোকটিকে বললেন, 'তুমি পেছনে বস।' বেচারা জীবনে কোনোদিন ঘোড়ায় চড়েনি। ভয়ে কাঠ হয়ে সে ডাক্তারবাবুর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বসল। ঘোড়া ছুটল টগবগ করে।

রোগী দেখে ওষুধের ব্যবস্থা করে যোগেশবাবুর ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ফিরে আসার সময়ে মাঝপথে কি যেন একটা ভারী জিনিস মাথায় ঠেকল। তাড়াতাড়ি টর্চটা বার করে জ্বালতেই যে দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল তা দেখলে সাহসী মানুষও ভিরমি খাবে। যোগেশবাবু দেখলেন গাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে একটা বৌ। পরনে তার লাল পাড় শাড়ি। গভীর রাতে একাকী ওই স্থানে বেশিক্ষণ থাকতে সাহসে কুলালো না তাঁর। যোগেশবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলেন।

রাত্রে ভালো ঘুম হলো না যোগেশবাবুর। থেকে থেকে বউটির মুখখানা মনে পড়তে লাগল। এপাশ-ওপাশ করতে করতে যেই চোখ দুটো একটু বুজেছেন অমনি যেন তিনি শুনতে পেলেন কে বলছে, 'বাবা, আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়েছি, তুমি যেন ওদের ডেথ সার্টিফিকেট দিও না।'

যোগেশবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরের বারান্দায় বসে তিনি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

রাত শেষ হয়ে তখনো ভোরের আলো ফোটেনি, যোগেশবাবু উঠে পড়লেন। তাড়াতাড়ি মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। গ্রামের লোকজনকে ডেকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি দেখলেন আধো অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন লোক গাছ থেকে লাশ নামাতে চেষ্টা করছে। যোগেশবাবু বুঝলেন ব্যাপার সুবিধের নয়, এরা নিশ্চয় বউটির শ্বশুরবাড়ির লোক, লোক জানাজানি হবার আগেই ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা হতে দেবেন না।

সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে যোগেশবাবু রুখে দাঁড়ালেন, 'ডেডবডি যেভাবে আছে সেইভাবেই থাকবে। গ্রামের লোক আসুক, পুলিশকে খবর দিক, তারপর যা করার তারাই এসে করবে। তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাও এখান থেকে।'

যোগেশবাবুর কড়া ধমক শুনে লোকগুলো প্রথম থমকে দাঁড়াল, তারপর তাদেরই একজন বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু, কেন মিছে ঝামেলা করছেন, আপনিই বরং ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিন, তাতে সকলরেই সুবিধে হবে।'

চিৎকার করে উঠলেন যোগেশবাবু। 'না, কখখনো না, তোমাদের মতো খুনে লোকেদের কঠোর শাস্তি হওয়াই উচিত। আমি এখুনি গ্রামের লোকদের ডেকে আনছি।'

পিছন ফিরলেন যোগেশবাবু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল, 'কাজটা ভালো করলেন না, এর ফল আপনাকে পেতে হবে।'

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে হনহন করে চলে এলেন যোগেশবাবু। সকলকে ডেকে নিয়ে আবার যখন অকুস্থলে হাজির হলেন তখন সব ভোঁ ভাঁ। লোকগুলোও নেই আর ডেডবডিও নেই। গ্রামের লোকরা সব শুনে পরামর্শ দিল, 'মিথ্যে ঝামেলায় জড়াবেন না ডাক্তারবাবু। এসব মানুষ পারে না এমন কোনো কাজ নেই। কেন বেঘোরে প্রাণটা দেবেন?'

যোগেশবাবুর স্ত্রীও তাঁকে একই কথা বললেন, 'ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করি। কি দরকার বনে থেকে বাঘের সঙ্গে বিবাদ করার?'

কারোর কথাই কানে তুললেন না যোগেশবাবু। তিনি ছুটলেন কয়েক মাইল দূরের থানায়। সেখান থেকে পুলিশ নিয়ে যখন গ্রামে ফিরলেন তখন সব শেষ। পুলিশের লোক তাঁকে জানাল, 'সব প্রমাণই তো ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে, দেখি কি করা যায়। প্রমাণ ছাড়া শুধু আপনার মুখের কথায় তো কেস দাঁড়াবে না। শুধু আপনিই দেখেছেন ব্যাপারটা, আর কেউ তো ছিল না সেখানে।'

গুম হয়ে গেলেন যোগেশবাবু। শুধু প্রমাণের অভাবে এতবড় অন্যায়টা চাপা পড়ে যাবে!

সেদিন গভীর রাত। যোগেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী অঘোরে ঘুমোচ্ছেন, পাশের ঘরে শুয়ে দুই ছেলে। দুটো ষণ্ডা-গণ্ডা লোক খোলা দা হাতে পাঁচিল টপকে পা রাখল বারান্দায়। লোক দুটোর মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, বেড়ালের মতো নিঃশব্দ তাদের চলাফেরা। সতর্কভাবে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে ওরা এসে দাঁড়াল যোগেশবাবুর বন্ধ দরজার সামনে। গ্রামের বাড়ি, ভেতর থেকে খিল আঁটার ব্যবস্থা। লোক দুটো বন্ধ পাল্লার ফাঁকে খুন্তি ঢুকিয়ে তারই সাহায্যে খিল খুলে ফেলল। তবে কাজটা যত নিঃশব্দে হবে ভেবেছিল তা হলো না। খিল খোলার শব্দে চমকে জেগে উঠলেন যোগেশবাবু। দুটো লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'কে, কে?' সঙ্গে সঙ্গে খোলা দা হাতে একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল। যোগেশবাবু দেখলেন দা-ধরা হাত ওপর দিকে তোলা। সভয়ে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। কয়েক সেকেন্ড, পরমুহূর্তে একটা গোঁ গোঁ শব্দ। চোখ খুলে দেখলেন লোকটা যেমন হাত তুলেছিল তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে কিন্তু তার চোখ দুটো আর জিভ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দেখে মনে হয় বুঝি কেউ আসুরিক শক্তিতে তার গলাটা টিপে ধরেছে। সঙ্গী লোকটাও কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে। পলকের মধ্যে তাঁদের বিস্ফারিত চোখের সামনেই লোকটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠল না। অপর লোকটি ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভয়ে পালাতে যাবে, অমনি কে যেন তাকেও বজ্র আঁটুনিতে চেপে ধরল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

যোগেশবাবুর চিৎকারে তাঁর স্ত্রীরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। খোলা দা হাতে দুজন লোককে ঢুকতে দেখে আর তাদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করে ভয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

লোক দুটো মারা পড়তেই যোগেশবাবু আগে ছুটলেন ছেলেদের ঘরে। ওরা ছোটো, ওদের

কোনো বিপদ-আপদ হয়নি তো? বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দিল ছেলেরা। ভয়ে তারা কাঠ হয়ে গেছে। চিৎকার করে যে লোক ডাকবে সে সাহসও কুলায়নি। ভেবেছে বুঝি বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। যোগেশবাবু দুজনকে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। স্ত্রীর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে তাঁর জ্ঞান ফিরল বটে কিন্তু মুখে কথা সরলো না। কেমন ফ্যালফ্যাল করে দেখতে লাগলেন সবাইকে। ছেলে দুটোরও তথৈবচ অবস্থা। মাটিতে শোয়া লোক দুটোকে নিষ্পলক দেখতে লাগল। তিনজন নির্বাক মানুষকে নিয়ে রাতটা যে কিভাবে কাটালেন যোগেশবাবু তা তিনিই শুধু জানেন।

সকাল হতেই খবরটা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। বহু লোক জড়ো হলো। সবাই বুঝল এ সেই বৌটির শ্বশুরবাড়ির লোকেদের ষড়যন্ত্র, কিন্তু সবাই আশ্চর্য হয়ে ভাবল গুণ্ডাগুলোকে মারল কে! একমাত্র যোগেশবাবুই বুঝেছিলেন এ আর কেউ নয়, সেই বৌটিই তার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। যোগেশবাবু তার কথা শুনেছিলেন তাই সেও তাঁকে বাঁচাল। বেলা বাড়তে আরো এক চাঞ্চল্যকর খবরে গাঁ আবার তোলপাড় হলো। কে বা কারা বৌটির স্বামী এবং শ্বশুরকেও গলা টিপে মেরে রেখে গেছে।

ভাদ্র ১৪০৩

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি

সুব্রত কুমার বসাক

বাসটা যখন পাগলীগঞ্জের স্টপেজে দাঁড়াল তখন আমার হাতঘড়িতে বাজে রাত পৌনে আটটা। আমার সঙ্গে ছিল আমার বন্ধু বংকু। ওকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি নেমে আয়। এতটা রাস্তা হাঁটতে হবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেল।' আসলে আমাদের ওখান থেকে পাগলীগঞ্জে আসতে সময় লাগে একঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা। সেই হিসাবে রওনা দিয়েছিলাম বিকেল সাড়ে চারটের দিকে। কিন্তু মাঝপথে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি।

বংকু নেমে বলল, 'এক কাপ চা খেয়ে নিলে হতো না?'

আমি বললাম, 'তুই বুঝতে পারছিস না, এখান থেকে তিন-চার কিলোমিটার মতো হাঁটতে হবে। মামার ওখানে গিয়ে খাওয়া যাবে, চল।'

আমি ইনসিওরেন্স অফিসে কাজ করি। সেই ব্যাপারে মামাকে দিয়ে একটা বীমা করাব, এই চিন্তা নিয়েই যাচ্ছি। রাতটা থেকে মামার সঙ্গে ভালোভাবে আলোচনা করে পরদিন সকালে কিংবা বিকেলে যোকোনো সময় ফিরলেই হলো। তবে আপাতত ঠিকমতো পৌঁছাতে পারলে হয়। পাগলীগঞ্জ থেকে এখন টানা হাঁটতে হবে প্রায় আধঘণ্টা খানিক। গ্রামের নাম 'পোড়ামাদল'। আমি ছোটবেলায় একবার এসেছিলাম। সেও প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা। একটু যে অসুবিধায় পড়ব সে নিজেও জানি। ঐজন্যই বংকুকে সঙ্গে নিয়েছি। ওর সাহস আছে, তবে কিছুটা গোঁয়াড়।

আমরা পাগলীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডকে পিছনে রেখে এগিয়ে গেলাম। সামনেই আত্রেয়ী নদী আছে। বর্ষার সময় যখন জল দু'কূল ছাপিয়ে যায় তখন নৌকায় করে এপার-ওপার হতে হয়। এখন অবশ্য আমাদের যেতে হবে বাঁশের সেতু পেরিয়ে। বাঁশের সেতু পেরোতে আমার খুব ভয় করে। কেমন নড়বড় করে। আমরা কিছুটা বালুর চর পেরিয়ে সেতুতে উঠলাম। বংকু বলল, 'দরকার হলে আমার হাতটা ধর।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, যেতে পারব।'

সেতুটা বেশ বড়। এত বড় সেতুতে আমরা মাত্র দুজন। চারদিকে কালো অন্ধকার রাত। দূরে অবশ্য টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। ছোট একটা কুঁড়েঘর আছে সেখানে।

বংকু বলল, 'এই নদীর চরে ওখানে কে থাকে রে?'

আমি বললাম, 'কেউ থাকে না তো। এই সেতুর ওপর দিয়ে পার হতে হলে পয়সা দিতে হয় ওখানে। সারাদিন পয়সা কালেকশন করে যে লোকটা, সে হয়তো বাড়ি যাবে এখনই।' তারপর একটু থেমে তাড়াতাড়ি বললাম, 'চল। ঐ লোকটার বাড়ি যদি আমার মামার গ্রামেই হয়, তাহলে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

সেতুটা পার হয়ে আবার আমরা বালুর চরে নামলাম। বালুর চরের মধ্যেই কুঁড়েঘরটা ঘরটা। একটা লণ্ঠন জ্বলছে তবে শলতেটা কমানো। আমি পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করলাম। তারপর কিছুটা নিচু হয়ে কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঘরে কেউ নেই। কোণে ছোট খাটিয়া পাতা। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় ঘরের সমস্ত অন্ধকার সরে যায়নি। কেমন আলো-আঁধারের খেলা চলছে। আমি একটু শব্দ করে ডাকলাম, 'কি ব্যাপার দাদা, কোথায় আপনি?'

উত্তর নেই। খাটিয়ার নিচে কিসের যেন খসখস শব্দ হলো। এবার আমার একটু ভয়ভয় করতে লাগল। চারদিকের পরিবেশটা কেমন নিঝুম। আমি পিছন ফিরে বেরোতে যেতেই পায়ে লেগে লণ্ঠনটা পড়ে গেল। পড়েই দপদপ করতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। আর সেই সময়ই দেখলাম একজন লম্বা লোক কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর নিচু না হয়ে অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়ল কুঁড়েঘরের মধ্যে। অবশ্য আলো-আঁধারের মধ্যে আমি ভুলও দেখে থাকতে পারি। লোকটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বাইরে বেরিয়ে এসে একটা তালা ঝুলিয়ে দিল ঘরে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি জীবনবাবুর ভাগ্নে তো? চলুন আমি ঐ দিকেই যাব।'

লোকটার গলার স্বর কেমন ভাঙা ভাঙা। চোয়াল দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। চোখ দুটো কোটরে। আমি ভেবে অবাক হলাম লোকটা জানল কি করে যে আমি জীবনবাবুর ভাগ্নে! নাকি আমার পোশাক দেখেই বুঝে গেছে! কারণ এই গ্রামে আমার মামাই সবচেয়ে অবস্থাপন্ন। এইসব গ্রাম্য লোকগুলো বেশ সেয়ানা হয় তো দেখছি! ভিতরে ভিতরে আমি কিছুটা সাবধান হয়ে গেলাম। অবশ্য মুখে বললাম, 'তাহলে তো ভালোই হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। ঠিকমতো রাস্তাঘাট চিনে যেতে মুশকিল হতো। আপনি সঙ্গে থাকলে সুবিধেই হবে।'

লোকটা খ্যানখ্যানে গলায় হেসে বলল, 'তা যা বলেছেন। জানেন রাতবিরেতে যেতে আমারও ভয় করে। সঙ্গী না পেলে বাড়ি যাই না। নদীর চরেই থেকে যাই। ঐ বাবু আপনার বন্ধু বুঝি?' বংকুকে এদিকে আসতে দেখে বলল।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

আমার সঙ্গে একজন অপরিচিত লোককে দেখে বংকু প্রথমে কিছুটা অবাক হয়ে গেল। তারপর বলল, 'একে আবার কোথা থেকে যোগাড় করলি?' আমি জানি বংকু অপরিচিত লোক দেখলে একটু বিরক্ত হয়। বললাম, 'মামাকে ইনি চেনেন। আর ঐ গ্রামেই যাবেন। তাই—' আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লোকটি বলল, 'আরে তোমার মামাকে শুধু চিনি কি বলছ হে! তোমার মামার বাড়ি আমি যে কাজ করেছি টানা ছ'বছর। তুমি ছোটবেলায় একবার এসেছিলে লাল্টুবাবু, মনে আছে তো?'

আমি লোকটির কথা শুনে রীতিমতো চমকে উঠলাম। আমি তো এসেছিলাম আজ থেকে প্রায় বছর দশ আগে। তখন এই লোকটা কাজ করত? কি জানি আমার তো মনে পড়ছে না। আমি তখন ছোট হলেও বয়স বারো-তেরো ছিল। একেবারে ভুলে যাওয়ার তো কথা নয়! কিংবা আমি হয়তো চিনতে পারছি না। আমার ছোটবেলার নামটাও দিব্যি মনে রেখেছে তো! আমি চোরাচোখে তার দিকে তাকালাম। সত্যি চেনা মুখ কিনা মনে করতে পারছি না। অবশ্য আমি যে লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তা নয়! একেই তো অন্ধকার তার ওপর নদীর চর পেরিয়ে গ্রামের রাস্তায় পা দিয়েছি। দু' ধারে এখন গাছের সারি। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। ভালো করে দেখার উপায় নেই। তবু আর একবার দেখার চেষ্টা করতেই চমকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। লোকটির সারা মুখে একরাশ কালো অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। আর তার মাঝে চোখ দুটো কাচের মার্বেলের মতো জ্বলজ্বল করছে। মনে হলো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমি ঘাবড়ে গেলাম। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল।

'কি ব্যাপার লাল্টুবাবু, মনে করতে পারছ না তো?'

লোকটির কথায় আমার চমক ভাঙ্গল। বললাম, 'না, মানে সেই ছোটবেলাকার কথা তো।'

'তোমার মনে নেই। অথচ দেখো আমার সব মনে আছে। আমার নাম কি ছিল বলো তো? হরিমাধব। আমাকে ছাড়া তোমার মামার একদণ্ড চলতো না। ঐ যে অত জায়গা-জমি, বড় বড় চারটে পুকুর, গোয়ালভর্তি গরু, সেসব কে সামলাতো?'

বংকু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার থাকতে না পেরে বলে ফেলল, 'কে আবার আপনি। আপনার মতো কাজের লোক এই অঞ্চলে আর কেউ আছে নাকি?'

বংকুর কথা শেষ হতে না হতেই আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। গাছের মাথাগুলো বাতাসে দোল খেতে লাগল। কখন যে আকাশে মেঘ করেছে বুঝতেই পারিনি। একটা গা-ছমছমে বিপদের গন্ধ পেলাম। মনে হলো কিছু একটা ঘটবে। আমরা তখন চলেছি গাছপালায় ভর্তি একটা জঙ্গল জঙ্গল জায়গার মধ্যে দিয়ে। এই সময় ঝড় উঠলে মুশকিলে পড়তে হবে। তার ওপর যদি বৃষ্টি নামে তো কথাই নেই। গ্রামের কাঁচা রাস্তা জল-কাদায় একাকার হয়ে উঠবে।

ভাবতে ভাবতেই ঝড় উঠল। আমাদের চারপাশে ঘিরে শুধু সোঁ সোঁ শব্দ। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে গেল। কাছে কোথায় যেন একটানা গোঙানির মতো শব্দ হচ্ছে। এবার ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। একটা গাছের ডাল ভেঙে যদি মাথায় পড়ে তাহলে আর দেখতে হবে না। হরিমাধবই বা কোথায় গেল এই অন্ধকারের মধ্যে? বংকুর হাতটা ধরে বললাম, 'কি হবে এবার? আমার খুব ভয় করছে।' বংকু বলল বটে, 'অত ভয়ের কি আছে', কিন্তু স্পষ্ট শুনলাম ওর গলার স্বরটা কেঁপে কেঁপে উঠল।

ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়তে লাগল। বিদ্যুৎও ঘনঘন চমকাচ্ছে। ঝড়ের দাপটে এলোমেলো হওয়া গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে ওরা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে আক্রোশে হাত-পা ছুঁড়ছে। আমি বংকুর হাতটা ধরে টান মেরে বললাম, 'আর আমি যাব না। যা হয় এখানেই হোক। তুই গাছতলাতেই দাঁড়া।'

'গাছতলায় দাঁড়ানো তো এখন ভয়ানক রিস্কি। যে কোনো মুহূর্তে—'

ওকে শেষ করতে না দিয়ে বললাম, 'হয় হোক, তুই দাঁড়া।'

এই সময় কোথা থেকে যেন হরিমাধবের গলা ভেসে এল, 'লাল্টুবাবু, তোমার বন্ধুকে বলো আমি একদম মিথ্যা কথা বলি না।'

আমি চিৎকার করে বললাম, 'আপনি কোথায়?'

গলাটা এবার খুব কাছেই শোনা গেল, 'ভয় নেই, আমি তোমাদের কাছেই আছি।'

'আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

আমার কথার উত্তর না দিয়ে হরিমাধব বলল, 'তোমার মামাবাবু আমাকে বিশ্বাস করতেন খুব। আমার ওপর একবার সমস্ত বাড়িঘর ফেলে শহরে গিয়ে দশদিন ছিলেন। আমি নিজে হাতে সবদিক সামলেছি। তোমার মামাবাবু বোধহয় একটু বোকাও ছিলেন। না হলে বাড়ির কাজের লোককে কেউ অত বিশ্বাস করে!' হরিমাধব একটু থামল।

এই সময় একটা প্রচণ্ড আলোর ঝলকানি খেলে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তারপরেই দূরে কোথাও বিকট শব্দে বাজ পড়ল। আমি ভয়ে বংকুকে জড়িয়ে ধরলাম। জীবনে এত ভয়ংকর ঝড় দেখিনি। আবার হরিমাধবের গলা শোনা গেল, 'তোমার মামাবাবুকে দুই চক্ষে দেখতে পারত না তারই এক প্রতিবেশী। হিংসে করত খুব। আর আমাকে বলত জীবনবাবুর ক্ষতি করতে। জানো আমিও একদিন টাকার লোভে রাজী হয়ে গেলাম। তোমার মামাবাবুর বড় বড় পুকুরগুলোতে রাতের অন্ধকারে বিষ ফেলে দিলাম।'

বৃষ্টি শুরু হলো এই সময়। ঝড়টা একটু কমেছে। আমি সাহস সঞ্চয় করছি ধীরে ধীরে। এতক্ষণে বুঝতে পারছি হরিমাধব লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

হরিমাধব বলল, 'শুনছ তো লাল্টুবাবু।'

আমি বললাম, 'শুনছি।'

'তারপর শোনো। পরদিন সকালবেলা তোমার মামাবাবুর আমাকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! এক একটা মাছের সাইজ যদি দেখতে লাল্টুবাবু। ঠিক এত্ত বড়।'

অন্ধকারে যদিও হরিমাধবের দেখানো সাইজ আমি দেখতে পেলাম না, তবে উপলব্ধি করলাম সাইজ বড়ই। বললাম, 'তারপর?'

হরিমাধব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তার ঠিক দু'দিন পরেই শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি নামল। আজকের মতো আকাশে ঘনঘন আলো চমকাতে লাগল। আমি সেই ঝড় উপেক্ষা করেই পথ চলছিলাম। হঠাৎ এই জায়গাটা আসতেই বিপদটা ঘটল। মেঘের গর্জন আর বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটার মধ্যে আমার মাথায় বিরাট একটা গাছের ডাল—সত্যি বলছি লাল্টুবাবু, বিরাট একটা নিমগাছের ডাল ভেঙে পড়ল।'

প্রায় আর্তনাদ করে উঠল বংকু! 'তার মানে?'

হরিমাধব বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, বংকুবাবু, সত্যি বলছি। তোমরা যে গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে আছো ওটাই তো নিমগাছ। ওরই একখানা ডাল আমার মাথাটা থেঁতলে দিল। পরদিন সকালে গ্রামের লোক আমাকে যখন উদ্ধার করে—বুঝতেই পারছ, অত বড় ডাল পড়লে কেউ বাঁচে? একবারে শেষ। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি।'

আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। বংকুকে আমি আরো জোরে জড়িয়ে ধরলাম। বংকু কথা বলতে পারছে না। বুঝতে পারছি এই মুহূর্তে ওর সমস্ত সাহস নিঃশেষ হয়ে গেছে। দূরে এই সময় একটা আলোর রেখা দেখা গেল। সরু আলোর রেখা। এদিকেই আসছে।

আমাদের তখন চলার ক্ষমতা নেই। পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে যেন। কেবলই মনে হচ্ছে এক অশরীরী আত্মা এখনই বুঝি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মামার বাড়ি যখন পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দশটা। মামীকে বললাম, 'তাড়াতাড়ি চা করো। আর পারছি না।'

মামা বললেন, 'আগে হাত-মুখ ধুয়ে ভালো করে বস। তারপর সব শুনছি।'

আমি আর বংকু ভালো করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বিছানায় বসলাম। মামীর চা করা হয়ে গেছিল। আমাকে বললেন, 'নে এবার চা খেতে খেতে সব বল তো।'

আমি চা খেতে খেতে সব বললাম। শুনে তো মামা-মামী দুজনেরই চোখ ছানাবড়া। মামী বললেন, 'বলিস কি! ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে কখন?'

মামা বললেন, 'হরিমাধবই যে আমার পুকুরে বিষ ফেলেছিল সেটা পরে আমি জেনেছি। কিন্তু ততদিনে ও আর বেঁচে নেই। আমিও মনে মনে ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

বংকু জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মামাবাবু, আপনি জানলেন কি করে যে আমরা বিপদে পড়েছি? আলো নিয়ে সেই লোকটি ঠিকমতো সময়ে না পৌঁছলে কি যে হতো!'

মামা বললেন, 'আর বলো না। আমি তখন ঘরে কাজ করছি। এই সময় উঠানের মধ্যে কে যেন এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে চিনতে পারলাম না। শুধু বলল, "বাবু, আপনার ভাগ্নেরা আসতে আসতে ঐ নিমগাছতলায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। শীগগির একজন লোক পাঠান।" তখন গলাটা বুঝতে পারিনি। এখন যেন মনে হচ্ছে—যাক গে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা আর দেরি করিস না। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়।'

সেই রাতে আমরা দুজনেই হরিমাধবের কথা চিন্তা করতে করতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩

আজব বিনুনি

সুধীন্দ্র সরকার

'অ্যাই শোনো!' মেয়েটা বললে, 'হ্যাঁ তোমাকে বলছি।' বলতে বলতে কাস্তের মতো বাঁকা সরু চুলের বিনুনিটা দুলিয়ে আমার সামনে এসে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াল।

মেয়েটার সাহস তো কম নয়! সাত-আট বছর বয়স হবে। অচেনা ছেলেকে এভাবে ডাকে কেউ? তাও আবার ধমকের সুরে? কিন্তু, ছোট্ট মেয়েটার কাণ্ড দেখে আমি হেসে ফেললুম। বিশেষ করে ওর চুলের বিনুনি দেখে। বিনুনির শেষপ্রান্তটা বাঁকা, আকাশমুখো হয়ে ঝুলছিল মাথার পেছন থেকে। হাওয়ায় মৃদু দুলছিল বাঁকা বিনুনি। বিনুনি পিঠের ওপর লতিয়ে থাকে। কিন্তু, ওর বিনুনিটা একেবারে অন্যরকম। মজাদার।

জিগ্যেস করলুম, 'তোমার নাম কী?'

'দুলালী' বলেই বিনুনি দুলিয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। আমি ওর বিনুনিতে হাত দিতে গেলুম।

'উঁহু! বিনুনি সোজা হয়ে যাবে।' এক ঝটকায় আমার হাতটা সরিয়ে দিল দুলালী, 'দিদি খুব বকবে কিন্তু। কত কষ্ট করে বিনুনিটা বেঁধে দিয়েছে দিদি। সামনের রোববার টিউবকলের হ্যান্ডেলের মতো বিনুনি বেঁধে দেবে বলেছে।' দুলালী চলে যাচ্ছিল। আমি জিগ্যেস করলুম, 'তুমি থাক কোথায়?'

'কেন? তুমি কি ছেলেধরা?' দুলালী আমাকে পাল্টা জিগ্যেস করল, 'তুমি থাক কোথায়? এ-গাঁয়ে নতুন দেখছি?'

'নতুনই তো।' আমি হাসলুম, 'আজই তোমাদের গাঁয়ে এলুম। হাই স্কুলের হেডস্যারের বাড়িতে যাব।'

'তাই?' দুলালীর অবাক জিজ্ঞাসা, 'ওঁরই মেয়ে তো আমার বিনুনি বেঁধে দেয়।'

'কে? মধুদি?' আমি জিগ্যেস করলুম, 'তুমি এখন যাবে নাকি মধুদির বাড়িতে?'

'না! মধুদি ভারী রাগী কিন্তু। ইস্কুলে ইংরেজি পড়ায়!' দুলালী পা বাড়াল, 'তুমি আমাকে দেরি করিয়ে দিলে। আমাকে আবার এখন জঙ্গলে গিয়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। তবেই মা হাঁড়ি চড়াবে।' বলেই দুলালী ছুট লাগাল। ছুটতে ছুটতে বললে, 'মধুদিকে আমার বিনুনির কথা বলবে না কিন্তু।'

দেখতে দেখতে শালবনের ভেতর মিলিয়ে গেল দুলালী। একঝাঁক বুনো টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে উড়ে গেল হাওয়া মহলের দিকে। হাওয়া মহলের দিকটা ভারী জঙ্গল। বিষ্ণুপুরের ভাঙাচোরা রাজবাড়ির ভেতরে হাওয়া মহলের ভগ্নপ্রায় অবস্থা! রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিলের পাশে কালো পিচের রাস্তা 'বাহার দরজার' দিকে চলে গেছে।

সেই পিচের রাস্তা দিয়ে একজন মহিলা জোরে সাইকেল চালিয়ে আসছিলেন। আমার পেছনে এসে জোরে ব্রেক কষলেন। ক্রিং ক্রিং.....চমকে উঠলাম! সাইকেলে বসে মধুদি হাসছিল, 'উদোর মতো হাঁটছিস? এটা যদি দু'চাকা না হয়ে চার চাকা হত?'

'ভালোই হত। চার চাকায় রাস্তার ধুলো উড়িয়ে মামার বাড়ি যেতুম।' আমি জিগ্যেস করলুম, 'মামার শরীর কেমন?'

'শরীর ভালো। কিন্তু দুলালীর জন্য মন খারাপ।' মধুদি বিষণ্ণ মুখে বলল। তারপর সাইকেলের হ্যান্ডেল দু'হাতে ধরে জিগ্যেস করল, 'পেছনে ক্যারিয়ারে বসে যেতে পারবি তো?'

'তোমার হাত কেমন?' আমি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম, 'আগে কোনোদিন ডাবল ক্যারি করেছ তো?'

'বাজে বকিস না।' মধুদি ধমকাল, 'বাবাকে ক্যারিয়ারে বসিয়ে কতদিন স্কুলে নিয়ে গেছি।' বলে সালোয়ারের ওড়নাটা কষে কোমরে বাঁধল।

ক্যারিয়ারে বসে দুরু দুরু বুকে চললাম মামার বাড়ি। মাঝে-মধ্যে খানাখন্দে পড়ে সাইকেল লাফাচ্ছিল। মধুদি সালোয়ার কামিজে অভ্যস্ত চালিকা। পরম নিশ্চিন্তে ওর সঙ্গে পৌঁছলুম মামার বাড়িতে।

বাড়িতে ঢুকেই মধুদির কী হাঁকডাক, 'সবাই দেখে যাও কাকে নিয়ে এসেছি। কলকাতা থেকে বাবুল এসেছে!'

মামা গায়ে চাদর জড়াতে জড়াতে ঘরের ভেতর থেকে উঠোনে নামলেন, 'একা এলি? বেণুকে নিয়ে এলি না? কতদিন বিষ্ণুপুরে আসেনি ও। হয়তো ভুলেই গেছে।'

বেণু আমার মায়ের ডাকনাম, 'মায়ের এখন শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সুগার ধরা পড়েছে।'

'কাকে বলছিস?' মধুদি বলল, 'বাবার, পিসির সব একই রোগ।' তারপর মামার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললে, 'ভাইবোনের চিনির গল্প না বলে ছেলেটার খাবার বন্দোবস্ত করতে বলো মাকে। আমি ওকে আমার ঘরে নিয়ে বসাচ্ছি।' বলে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার হাত ধরে টানতে টানতে ওর ঘরে নিয়ে গেল। 'চলে আয় বাবুল। স্থির হয়ে বোস চেয়ারটায় আগে।' চেয়ারের গায়ে একটা ঝাড়ন দিয়ে মুছে বলল, 'আমি তোকে আজ একটা ছোট্ট সাঁওতালি মেয়ের গল্প শোনাব। দুলালীর গল্প। যে মেয়েটার জন্য বাবার মন খারাপ। আমারও বুকটা ভার হয়ে থাকে। কাউকে সত্যি কথাটা না বলা অব্দি বুকের ভেতরটা হাল্কা হবে না! বিনুনির এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে বিপত্তি!'

আমি যে দুলালীকে দেখেছিলুম, মধুদি কি তার কথাই বলছে? আমার কৌতূহল মুখে প্রকাশ করলুম না। শুধু জিগ্যেস করলুম, 'বিনুনি কীভাবে বাঁধতে? এক্সপেরিমেন্ট বলছ?'

'বিনুনির মধ্যে সরু তার ঢুকিয়ে ইচ্ছেমতো আকার দিতাম। কখনও কাস্তের মতো বাঁকা, কখনও জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কখনও আবার টিউবওয়েলের হাতল।' মধুদি বললে, 'দুলালী প্রায়ই আসত আমাদের বাড়িতে। বাবাও খুব ভালোবাসত।'

'মজাদার বিনুনি।' আমি বললুম, 'তোমার এক্সপেরিমেন্ট তো সাকসেসফুল? কী বলো?'

'বলব আর কী?' মধুদি হঠাৎ ঘরে পায়চারি শুরু করল, 'সাকসেসফুল বিনুনিই হল যত নষ্টের মূল!'

'কেন? কেন?' আমার কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

মধুদি পায়চারি করতে করতে বলতে লাগল, 'গতমাসে জঙ্গলে কাঠকুটো কুড়োতে গিয়ে হাতির পালের মধ্যে পড়েছিল দুলালী!' মধুদি খাটে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, 'বিষ্ণুপুরে আমাদের গাঁয়ে হাতির পাল জঙ্গল পেরিয়ে ঢুকতে যাচ্ছিল। দুলালী জানত না। ও হাতির পথের মাঝে ঝুঁকে পড়ে শুকনো শালপাতা একমনে কুড়োচ্ছিল। ওর বিনুনিটা মাথার ওপরে আকাশমুখো হয়ে দুলছিল। অনেকটা হাতির শুঁড়ের মতো। হাতি যখন শুঁড় তুলে মাথায় গায়ে জল ছেটায়, বিনুনিটা সেইরকম দুলালীর মাথার পেছনে শুঁড়ের মতো দেখাচ্ছিল। একটা বাচ্ছা হাতি যেতে

যেতে দুলালির বিনুনিটা শুঁড়ে ছোঁয়াল। ব্যস! বিনুনিটা হাতির শুঁড়ের মধ্যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে পড়ল! বিনুনির শেষপ্রান্তে তারটা আমি পেঁচিয়ে দিতাম, যাতে খুলে না পড়ে। সেই পেঁচানো তারটাই বাচ্চা হাতির শুঁড়ের মুখে বঁড়শির মত আটকে যেতেই, বাচ্চা হাতিটা চিৎকার শুরু করল। দলের অন্য হাতিরা ছুটে এল বাচ্চাটার কাছে। মা-হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে দুলালীকে টান দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে! হাতির দলের বৃংহণে তোলপাড় হল জঙ্গল! হস্তিযূথ যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে গেল জঙ্গলের গভীরে। ফিরল না দুলালী! বিষ্ণুপুরকে হাতির হানা থেকে বাঁচাল। কিন্তু নিজে বাঁচল না! বিট অফিসারের মুখে এই ভয়ংকর ঘটনা শুনে আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছিল। বিনুনিটা তো আমিই বেঁধেছিলাম? দুলালীর জন্য এখনও কষ্টে বুক ফেটে যায়!' একটানা বলে মধুদি লম্বা একটা শ্বাস ফেলল।

এইজন্যেই কী দুলালী বিনুনির কথা মধুদিকে বলতে বারণ করেছিল? মুখে সে কথা কিছু বললুম না। শুধু বললুম, 'দুলালীর কথা ভুলে যাও। তুমি তো বিনুনিটা হাতির শুঁড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দাওনি! ওটা ছিল অ্যাক্সিডেন্ট!'

দু'দিন বিষ্ণুপুরে ছিলাম। রাসমঞ্চ, শ্যামরায় মন্দির, জোড়বাংলো, দলমাদল কামান আর মদনমোহন মন্দির দেখে বুঝলুম মল্লরাজাদের শৌর্যবীর্যের নিদর্শন এখনও অটুট। শুধু টেরাকোটার মাটির কারুকাজগুলো ক্ষয়িষ্ণু।

বাড়ি ফেরার বাস ধরলুম বিকেলবেলা। বেশ ভিড় ছিল বাসটাতে। বসার জায়গা পেলুম পেছনের লম্বা সিটের বাঁদিকে জানলার ধারে। জানলাটা বড় কাচে ঢাকা। খোলা যায় না। ভালোই হল, হেমন্তের ঠান্ডা বাতাস 'হু হু' করে ঢুকবে না।

বাস ছুটছিল বেশ জোরে! বাঁকের পথে হেডলাইটের আলোয় দৃশ্যমান শাল-মহুয়ার জঙ্গল আবছায়ায় ঢাকা। বাকি পথ ঘুটঘুটে অন্ধকার! দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল না।

হঠাৎ সেই অন্ধকার ফুঁড়ে দুলালীর প্রতিবিম্ব দেখতে পেলুম বাসের জানলার কাচে। মাথার চুলের বিনুনিটা কাস্তের মতো বাঁকা। দুলছিল। দেখে মনে হল আমার ডানপাশে দুলালী বাসের সিটে বসে আছে। চকিতে ঘাড় ঘোরালুম ডানদিকে। দুজন অচেনা যাত্রী চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছিল। দুলালী নেই!

আবার বাঁদিকের কাচে তাকাতেই ফের অন্ধকারে দুলালীকে দেখতে পেলুম। আগের মতো বিনুনিটা দুলছে। দুলালী হাসছিল। কাচের ওপাশ থেকে দুলালী কী যেন বলছিল। ঠিক বুঝতে পারলুম না। বাঁ কানটা কাচে ঠেকালুম। যদি কিছু শুনতে পাই! বরফের মতো ঠান্ডা কাচ। শিরশিরিয়ে উঠল শরীর! ঠান্ডার রাতে আমি দরদরিয়ে ঘামতে শুরু করলুম! চোখ বন্ধ করে সিঁটিয়ে বসে রইলুম সিটে। বাকি রাস্তা আর বাঁদিকের কাচে তাকাইনি।

আষাঢ় ১৪২২

লাস্ট সাপার

কালীপদ দাস

মা বোধহয় আজও এল না, মুন্নির গলায় হতাশার সুর স্পষ্ট। গতকালও ওর মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। আজ আর নেই। মুখটাও ওর কেমন শুকিয়ে গেছে।

ডলির আসার কথা ছিল গত পরশু। সাধারণত বাপের বাড়ি গেলে ও ফিরতে দেরি করে না। বিশেষ করে স্বামী একা থাকলে। কারণ সুব্রত মানুষটা বাড়ির বাইরে যত মাতব্বর, বাড়িতে ঠিক ততটাই আনাড়ি। দু'বেলা দুটো সেদ্ধ ভাত ফুটিয়েও খেতে পারেন না। ডলির তাই ওঁকে ফেলে কোথাও শান্তিতে থাকার জো নেই। আর ছেলে-মেয়েকে তো ওঁর ভরসায় রেখে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। হয়তো নিজের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও না খাইয়ে রাখবেন।

এবার ওদের সকলেরই জিয়াগঞ্জ যাওয়ার কথা ছিল। দিদির ছেলের পৈতে। না গেলে ভীষণ খারাপ দেখাবে। দিদি একসঙ্গে তার দুই ছেলের পৈতে দিচ্ছে। দেওয়ার কথা ছিল দ'মাস আগেই, কিন্তু ডলিই সেবার আপত্তি তুলেছিল। সামনে ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা, এ সময়ে কি করে যাবে ওরা। পরে বেবিদি, মেজকা দু'জনেরই কথাটা মনে ধরেছিল। আর তাছাড়া শুধু তো ডলি একা নয়, পরীক্ষার ঝামেলার জন্য জয়নগর থেকে নীলু, কোন্নগর থেকে রঞ্জু ওরা কেউই তো যেতে পারবে না। আর বাড়ির অনুষ্ঠান, বাড়ির ছেলে-মেয়েরাই যদি না আসতে পারে তাহলে উৎসব, আনন্দ উৎসব হয় কি করে! তাই শেষ পর্যন্ত পৈতের দিন পিছিয়ে 'মে' মাসে আনা হয়েছিল। সুব্রতও তাতে খুশি হয়েছিলেন, বলেছিলেন, অনেকদিন পর বেশ জমিয়ে হৈ-চৈ করা যাবে।

কিন্তু হঠাৎই সুব্রতর অফিসে গোলমাল শুরু হলো। মাইনে আটকে গেল পরপর দু'মাস। একটা মাস কোনোরকমে টেনে-টুনে পার করলেও পরের মাসটা সুব্রত খুবই ঠেকে গেলেন। এ অবস্থায় সবাই মিলে পৈতেতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। ডলি শুনে প্রথমে বলেছিল, 'যে মানুষটা প্রায় কারও বাড়ি যেতে চান না, সেই জামাইবাবু নিজে এসে বলে গেছেন, এখন না গেলে বিশ্রী দেখাবে না?' মুষড়ে পড়েছিল মনা-মুন্নিও। পরীক্ষার পর এমনিতেই ওদের ভেতরটা উড়ু-উড়ু করছিল, তার উপর মামার বাড়িতে এমন একটা উৎসব! ওহ! কি দারুণ মজা! আর বাবা কিনা এখন বলছে যাওয়াই হবে না!

কিন্তু পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে ডলি নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ছেলে-মেয়েকেও বুঝিয়েছিল। তাছাড়া শুধু যাওয়াই তো নয়, যাওয়া-আসার খরচা ছাড়াও দেওয়া-থোওয়ার একটা ব্যাপার আছে। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার বারোশোর ধাক্কা! ডলি মন ঠিক করে নিয়েছিল, ভেবেছিল পরে না হয় দিদি-জামাইবাবু আর মেজকাকে যাহোক একটা কিছু লিখে দিলেই হবে।

শেষে গোল বাধাল ডলির জয়নগরের দাদা নীলু। পৈতের দিন তিনেক আগে হঠাৎ ও এসে হাজির ওদের বাড়ি। জানতে এসেছিল কবে কোন ট্রেনে ওরা যাচ্ছে। শেয়ালদা থেকে তাহলে একসঙ্গে হৈ-চৈ করতে করতে যাওয়া যাবে।

ডলি মেজদাকে সব বলল। শুনে নীলু বলল, 'সবই বুঝছি কিন্তু একেবারেই কেউ না গেলে ভীষণ খারাপ দেখাবে। তুই অন্তত চল।'

ডলি তাকিয়েছিল সুব্রতর মুখের দিকে। সুব্রত শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে বলেছিলেন, 'তুমিই না হয় দাদার সঙ্গে চলে যাও। সত্যি, একেবারেই কেউ না গেলে খুবই খারাপ দেখাবে। মনা-মুন্নি থাক।'

শেষ পর্যন্ত ডলি একাই চলে গিয়েছিল ওর মেজদার সঙ্গে। মনা-মুন্নিরা এখন বড় হয়েছে, বুঝতে শিখেছে, ওরা আর তাই বাবার মুখের ওপর কোনো কথা বলেনি।

কথা ছিল দশ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবারই ডলি চলে আসবে। কিন্তু শুক্র গেল, শনি গেল, আজ রবিবার। দুপুরের ট্রেনের সময়ও চলে যাওয়ার পরও যখন ডলি এল না তখন মুন্নি প্রায় কেঁদেই ফেলল। ছেলে-মেয়ে দুজনেরই এই প্রথম মাকে ছেড়ে একা থাকা।

সুব্রতরও যে চিন্তা হচ্ছিল না তা নয়, খানিকটা রাগও হচ্ছিল। কিন্তু মুন্নির মুখের দিকে চেয়ে ভেতরের অসন্তোষ চাপা দিয়ে বললেন, 'শরীর-টরীর হয়তো খারাপ হয়েছে, কিংবা দেখ, সন্ধ্যের ট্রেনেও আসতে পারে।'

'ছাই আসবে! আমরা কখনও সন্ধ্যার ট্রেনে আসি নাকি? আর মা কি করে সন্ধ্যের ট্রেনে একা-একা আসবে?'

সুব্রত মেয়ের কথার জবাব দিতে পারলেন না। জিয়াগঞ্জ গেলে সত্যিই ওরা কখনও সন্ধ্যের ট্রেনে ফেরে না। ট্রেনটা শেয়ালদা আসতে আসতে রাত নটা, কোনো কোনো দিন দশটা-এগারোটাও হয়ে যায়।

'বাবা, কাল তুমি একটা ফোন করবে?'

'ফোন করব? কোথায়? তোর মামার বাড়িতে কি ফোন আছে?'

'না, অন্য কোথাও?'

'অন্য কোথাও ফোন করে কি করে খবর পাব আর তার নম্বরই বা পাব কোথায়?'

এবার মুন্নিকে থামতেই হলো। আসলে কাল থেকে ওর কেমন একটু ভয়-ভয় লাগছিল, আর ভয়-ভয় লাগলেই মুন্নির যত সব খারাপ-খারাপ কথা মনে আসে। কে কোথায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, কোন বন্ধুর বাড়ির ছাদে রোজ রাত্রিবেলায় কে হেঁটে বেড়ায়, কে ঘুমের ঘোরে রাতে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে চলে গিয়েছিল, তারপর সকালে তাকে একটা গর্তের মধ্যে মরে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল—এই সব। আজও সকালে আরতিদি কাজে এসেই ওকে একটা বিচ্ছিরি খবর দিয়েছে, ট্রেনে কাটা পড়ে একটা মেয়ের....

'বাবা, আজ আমি তোমার কাছে শোব।' বাবার পায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে মুন্নি বলল। দাদা রাগাবে তাই ভয়ের কথাটা ও বেমালুম চেপে গেল। বলল, 'দাদা রোজ ঘুমের ঘোরে আমার পিঠের উপর পা তুলে দেয়।'

'এই মিথ্যুক, কবে আমি তোর পিঠে পা তুলেছি? বরং তুই রোজ আমার মুখের উপর হাত চাপিয়ে দিস!'

'হ্যাঁ, দিস তো, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তুই যেন সব দেখতে পাস, না?'

'আর তুমি বোধহয় রাতে জেগে বসে থাকো আমার পা দেখার জন্য?'

'আচ্ছা-আচ্ছা, ঝগড়া করতে হবে না। মুন্নি, তুমি আমার কাছেই শোবে। কিন্তু তার আগে বলো রাতে খাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে?'

'রোস্তক।' মনা বলল।

'না, ভোস্তক।' মুন্নি বলল।

রোস্তক—রুটি, ভোস্তক—ভাত। কথাটা ওরা গতবার পুজোর সময় মামার বাড়ি থেকে শিখে এসেছে। কথাটা বেবিদির ছোট ছেলে সোনার আবিষ্কার।

'না রোস্তক, না ভোস্তক, আমি একটা দারুণ খাবারের কথা ভাবছি।'

'কি?'

'কি?'

মনা-মুন্নি দুজনেই খুব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'ঘরে চাল আছে, ডালও আছে। ডালে আর চালে মিশিয়ে তার মধ্যে তাজা কিছু সব্জী ফেলে দিয়ে দারণ একটা রান্না করব আজ। এই মনা, ঘরে ঘি আছে নাকি রে?'

'জানি না।' মনা রুটি পছন্দ করে, কিন্তু বাবা আর মুন্নি তার ধারে-কাছে দিয়েও যাচ্ছে না দেখে ও গম্ভীর হয়ে গেছে। প্রস্তাবটা ওর মোটেই পছন্দ হয়নি।

'আছে বাবা।' মুন্নি বলল।

'বাহ্ ফাইন! প্রেশারে বসিয়ে দেব—দশ মিনিট। বিদেশে এই খাবারের খুব চল। আমরা তো মহামূর্খ, তাই সব্জীকে কেটে-কুটে-ভেজে ওগুলোর ভিটামিনগুলোকে নষ্ট করি। বিদেশে এটাকে বলে—'

'স্রেফ খিচুড়ি।' মুন্নি বাবার কাছ থেকে উঠে যেতে যেতে বলল।

সুব্রত কায়দা করে অনেকটা মেরে এনেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না, চালাকিটা ধরা পড়ে গেল। আমতা আমতা করে বললেন, 'না ঠিক খিচুড়ি নয়, তবে—'

'অনেকটা খিচুড়ির মতো—' এবার মনা বলল।

মুন্নি তার সঙ্গে যোগ করল, 'ইংলিশ খিচুড়ি।'

'থাম্ তো, আর পাকামো করতে হবে না।' বলে হাত বাড়িয়ে সুব্রত মুন্নির গালটা টিপে দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল—ক-অঁ-অঁ-ক্।

'মনা দেখ তো কে?'

মনা দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল, 'বাবা! মা এসেছে—'

মা এসেছে শুনেই মুন্নি ছুটল।

ডলি ঘরে ঢুকে সুব্রতকে কি বলতে যাচ্ছিল, সুব্রত তার আগেই বললেন, 'তুমি কি সন্ধ্যের ট্রেনে এল?'

'কি করব, ট্রেন লেট, কম ঝামেলা করে এলাম, উঃ!'

'সে তো না হয় আজ। কাল-পরশু কি হয়েছিল?'

'কাজের বাড়ি, আসব বললেই কি আসা যায়! বাচ্চু-বাপিরা একদিন খেতে বলেছিল, ওদের ঘরে একদিন থাকতে হলো। কি করব, ভাই তো, আমি অমন মুখের উপর না বলতে পারি না। কাকাও তো ছাড়তে চাইছিল না, বলছিল, মনা-মুন্নির পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে, এখন তোর অত ফেরার তাড়া কেন? ক'দিন থাক, আমিই তোকে দিয়ে আসব। কিন্তু এই এদের জন্য কি আমার কোথাও গিয়ে থাকবার জো আছে?' বলে ডলি মনা-মুন্নিকে কোলের কাছে টেনে নিল। মুন্নির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'ইস্, মুন্নি তোর মুখটা কি শুকনো লাগছে, খাসনি নাকি কিছু?'

'না, তোমার ছেলে-মেয়েরা না খেয়েই আছে, এখন এসে গেছ, বাঁচিয়েছ, দয়া করে এখন একটু খাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

'তার মানে রাতের খাবার-দাবার কিছু হয়নি? উঃ কি ভীষণ খিদে পেয়েছে, ভাবলাম গিয়েই বসে পড়ব, কপাল! তা ঘরে কি কিছু আছে-টাছে?' বলতে বলতে ডলি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তরকারির ঝুড়ি টেনে দেখল। 'ইস! রান্নাঘরের কি অবস্থা! দুটো দিন নেই, তাতেই এই অবস্থা! ঘর-দোরগুলো ধুলোতে-বালিতে একেবারে কিচকিচ করছে। কিরে মুন্নি, আরতি আসে না? কথা বলছিস না কেন?'

'আসবে না কেন?' মুন্নি এই প্রথম কথা বলল, মার উপর ও খুব রেগে আছে মনে হলো। মা এসে থেকে ওর সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা না বলেই রান্নাঘর নিয়ে পড়েছে।

সুব্রত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আজ রাতে আর হেঁসেল ঠেলতে হবে না।

ডলি দ্রুত সব গুছিয়ে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। রান্না করতে করতেই তিনটে ঘর মুছে ফেলল, আলনা গুছিয়ে নিল, ময়লা কাপড়গুলোকে বাথরুমের মধ্যে ডাঁই করে রাখল। সুব্রত এবার নিশ্চিন্ত হয়ে অসমাপ্ত উপন্যাসটা হাতে তুলে নিলেন।

পড়তে পড়তেই লক্ষ্য করলেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় ডলি ঘরের পুরো চেহারাটাই পাল্টে ফেলেছে।

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হলো তখন রাত প্রায় পৌনে বারোটা।

মনা ততক্ষণে বিছানা ঝেড়ে মশারি টাঙিয়ে ফেলেছে। মুন্নি এসে বাবার মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে গেল।

ডলির সঙ্গে সুব্রতর এসে থেকে তেমন কথাই হয়নি, উনি চাইছিলেন, ডলি আজ তাঁর কাছে শুতে আসুক। কিন্তু মনা-মুন্নি ক'দিন পর মাকে পেয়ে এক মুহূর্তও আর কাছছাড়া করতে চাইছিল না, ডলিরও ইচ্ছা আজ ওদের কাছে নিয়ে শোবে।

অগত্যা সুব্রতকে ঘরের দরজা দিয়ে শুয়ে পড়তে হলো।

ভোর তখন পাঁচটা-পৌনে পাঁচটা হবে বোধহয়, ভাল করে ফর্সাও হয়নি। সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল গ্রিলগেটের খট্ খট্ শব্দে। কে যেন ডাকছে। মেন গেটে তালা, তাই বারান্দার গ্রিলগেট দিয়ে ডাকছে। নিচের তলায় সুব্রতর ঘরটা বারান্দার লাগোয়া। বিরক্ত হলেন। কাল অনেক রাতে শুয়েছেন, তাই চোখ থেকে ঘুম ছাড়ছিল না। রাস্তার দিকে বারান্দায় গ্রিলগেট করে এই এক নতুন ঝামেলা হয়েছে। নিচ থেকে ওপরতলা পর্যন্ত ছটা ফ্ল্যাটের কারও ঘরের লোক এসে গেটে তালা দেখলেই গ্রিলগেটে এসে খট্ খট্— 'একটু তালাটা খুলে দেবেন?' আর বেশির ভাগই এই ঝঞ্ঝাটটা হয় রাতে কিংবা ভোরে। সুব্রত ফ্ল্যাটের ওদের কতদিন বলেছেন, মেন গেটে প্রত্যেকের নামের আলাদা আলাদা কলিং বেল লাগাতে!

সুব্রত খানিকক্ষণ না শোনার ভান করে শুয়েই থাকলেন। তারপর মনে হলো কে যেন ওঁর নাম ধরেই ডাকছে। আমাকে? এত ভোরে? সুব্রত এবার আর না উঠে পারলেন না।

'একি কাকা? আপনি?' সুব্রত দ্রুত গেটটা খুলে দিলেন। 'রাতের ট্রেনে এলেন?'

ডলির মেজকা কান্তিবাবু ভেতরে এলেন।

'বসুন, আমি ওদের ডাকি।'

'না, এখনই ওদের ডাকতে হবে না, তুমি বসো।'

'কি ব্যাপার কাকা, বলুন তো? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

কান্তিবাবু কোনো উত্তর করলেন না।

'আপনার শরীর-টরীর ভাল আছে তো? ওখানে সব ঠিকঠাক আছে তো?'

'বাবা সুব্রত,' বলতে বলতে কান্তিবাবু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললেন : 'একি হলো বাবা সুব্রত? আমি যে অপরাধী হয়ে গেলাম বাবা, আমিই তো ওকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম! আর আমারই বাড়িতে এত বড় সর্বনাশ হবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি, আমার....'

'কেন, কি হয়েছে?' সুব্রতর শুকনো মুখ আরও শুকিয়ে গেল।

'বাবা, ডল—ডল আর নেই, ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' ডলিকে মেজকা আদর করে ডল বলে ডাকতেন।

বিস্মিত সুব্রত কোনোরকমে শুধু বলতে পারলেন, 'কি বলছেন আপনি? আপনার...'

'পৈতের দিন আমার ডল আর বেবি গিয়েছিল গঙ্গায় জল ভরতে। কি করে যে পা হড়কে ও ডুবো জলে চলে গিয়েছিল, কেউ দেখতে পায়নি। দু'দিন পরে তোলপাড় করে খুঁজে গতকাল বিকেলে ভট্টপাড়া ঘাটে এক মাঝি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দিয়েছিল। রাতে পোস্টমর্টম থেকে এনে তোমার কাছে ছুটে আসছি! একটি বার যে তোমাকে যেতে হবে বাবা ওদের নিয়ে। মনাকেই তো মুখাগ্নি করতে হবে।'

'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কাকা, ডলি তো কাল রাতে এখানে চলে এসেছে, ওঘরে শুয়ে আছে—

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি, আসুন, ঐ তো,' বলে সুব্রত উঠে কাকাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

কিন্তু একি! ডলি বিছানায় নেই! মনা-মুন্নির মাঝখানের জায়গাটা খালি, মুন্নির হাতটা কাউকে জড়িয়ে ধরার মতো করে সেখানে পড়ে আছে।

আশ্চর্য! সুব্রতর মনে হলো তাঁর বোধ-বুদ্ধি সব যেন নিমেষে কেমন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তিনি ধপ্ করে বিছানার ওপর বসে পড়লেন। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে, সুব্রতর সব গোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

'কি হলো সুব্রত?'

সুব্রত এক-এক করে গতকালের সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে কাকা বললেন, 'আশ্চর্য! এও কি সম্ভব! আমি যে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে কি—তবে কি—'

সুব্রতর কানে তখন কোনো কথাই ঢুকছিল না। তিনি হাঁ করে তখন তাকিয়ে আছেন ডাইনিং টেবিলটার দিকে। রাতের খাওয়া এঁটো বাসনগুলো তখনও সেখানে পড়ে রয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫

ম্যাকনীল সাহেবের ঘোড়া

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ডাকের গণ্ডগোলে বেশ কিছুদিন পরেই চিঠিটা হাতে এল আমার। চিটি লিখেছে সজল বিহারের মুঙ্গের থেকে। ওদের ওখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আমাদের। আমাদের মানে আমাকে আর রূপককে। সজলের চিঠির শেষ অংশটা পড়ার পরেই আসল কথাটা বুঝতে পারলাম। ও রূপককে তার মনের মতো একটা জিনিস দেখাতে চায়।

রূপক আমাদের দুজনের দারুণ বন্ধু। সজল দূরে চলে যাওয়ার পর আমার সঙ্গেই সময় কাটে রূপকের। যেমন ডানপিটে তেমনই দুর্জয় সাহসী রূপক। ভয় কাকে বলে ও বোধহয় জানেই না। আর তাই মাঝে মাঝে বেশ একটু ঝামেলাতেও জড়িয়ে পড়ে।

রূপকের অদ্ভুত এক নেশা আছে। তা হলো পোড়ো বাড়ি বা ভূতুড়ে বাড়ি বলতে যা বোঝায় সেই সব দেখে বেড়ানো। সন্ধান পেলেই হলো, রূপক ঠিক সেখানে হাজির হবে। ভূতটুত ও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না। কতদিন যে ও এই ধরনের বাড়িতে রাত কাটিয়ে এসেছে হিসেব করে বলা শক্ত। তবে ভূত কোনোদিনই ওর সামনে আসেনি।

সজল রূপকের এই নেশার কথা ভালোভাবে জানে। তাই তো চিঠিতে একটা মোক্ষম টোপ ফেলেছে। লিখেছে, ওদের শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে এমন একটা পোড়ো বাড়ি আর ধ্বংসস্তূপ আছে যা দেখলে রূপক আশ্চর্য তো হবেই এমনকি এদিকটা নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করারও সুযোগ পাবে। রূপকের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট।

চিঠিখানা পাওয়ার পরই রূপকের কাছে ছুটলাম। বাড়িতেই ছিল ও। দেখলাম সজলের চিঠিটা পড়তে পড়তে উত্তেজনায় ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। আমাকে বলল, 'দারুণ হবে, তুই আজই লিখে দে আমরা সামনের হপ্তায় রওয়ানা হব।'

সেই মতোই চিঠি লিখে দিলাম সজলকে। আর একটা টেলিগ্রামও করে জানিয়ে দিলাম কবে আমরা পৌঁছচ্ছি।

স্টেশনে ট্রেন থামা পর্যন্ত যেন রূপক অপেক্ষা করতে পারছিল না। উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল প্ল্যাটফর্মের দিকে। কতক্ষণে সজলের দেখা পাবে। দেখা পেতে অবশ্য দেরি হলো না। সুটকেস হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নামতেই প্রায় ছুটে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরল সজল।

'উঃ, কতদিন পরে দেখা হলো, কত বদলে গেছিস তোরা।' উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে উঠল সজল। 'শেষ পর্যন্ত যে আসতে পারবি ভাবিইনি।'

'যা লোভ দেখিয়েছিস রূপককে, ও না এসে পারে,' আমি হেসে বললাম।

রূপকের দেরি সইছিল না। সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, 'জায়গাটা কতদূরে রে, সজল?'

'আরে দাঁড়া, আগে ক'দিন জমিয়ে আড্ডা দিই, তারপর তো ওসব দেখাব,' সজল হাঁটতে হাঁটতে বলল।

স্টেশনের বাইরে এসে সাইকেল রিকশা নিয়ে রওয়ানা হলাম আমরা। বেশ বড় শহর মুঙ্গের, আগে কোনোদিন আসিনি তাই ভাল লাগল।

সজলদের বাড়ি শহরের প্রায় মাঝখানেই। বেশ বড় বাড়ি, সুন্দর পথ-ঘাট। সজলের বাবা

বড় সরকারী চাকরি করেন তাই আরাম-বিলাসের অভাব নেই। তিনি শহরের সরকারী হাসপাতালের প্রধান।

বাড়ির সকলেই আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। রূপকের ডানপিটে স্বভাব-চরিত্রের কথা সবাই জানেন। তাই নিয়ে সজলের বাবা খুব খানিকটা ঠাট্টা-তামাশা করলেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আর তর সইল না রূপকের। সজলকে তাড়া লাগাল পোড়ো বাড়ি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য তাকে জানাতে। বাধ্য হয়ে সজল বলতে শুরু করল, 'জায়গাটা এখান থেকে মাইল দশেক দূরে, আগাছা আর জঙ্গলে ভরা। শোনা যায় বহু বছর আগে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিল। এই নীলকর সাহেবরা ছিল প্রচণ্ড অত্যাচারী। বহু মানুষকে তারা মেরেছিল। তবে সবার মধ্যে ম্যাকনীল ছিল বড় সাঙ্ঘাতিক প্রকৃতির। যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অত্যাচারী। লোকটার নেশা ছিল ঘোড়ায় চড়া। একটা সুন্দর ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাতে তাকে সব সময় দেখা যেত। ঘোড়ায় চড়া সাহেবকে দেখলেই বুক কেঁপে উঠত সকলের। পোড়ো বাড়িটা ছিল ওই সাহেবেরই বাংলো।'

'তাহলে কালই যাওয়া যাক সেখানে,' উৎসাহ নিয়ে বলল রূপক।

'আপত্তি নেই, তবে দিনের বেলায় যেতে হবে আর ফিরে আসতে হবে অন্ধকার নেমে আসার আগেই,' সজল একটু গম্ভীর হয়ে বলল।

'উঁহু, পোড়ো বাড়ি দিনের আলোয় দেখার কোনো মানেই হয় না', রূপক জোরে মাথা নাড়ল। 'আমরা একটা রাতে ওখানে কাটাব। তবে তো অ্যাডভেঞ্চারটা জমবে।'

'না', সজল দৃঢ়স্বরে বলল, 'বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। আমি তোদের নিয়ে যেতে পারি এক শর্তে—দিনের বেলাতেই যেতে হবে।'

সজলের সঙ্গে রূপকের বেশ তর্ক লেগে গেল এবার। সজলও যাবে না, রূপকও ছাড়বে না। শেষে রূপক জানতে চাইল, 'তুই রাজী হচ্ছিস না কেন বল তো? কিছু ভূতুড়ে ব্যাপার-ট্যাপার আছে নাকি?'

সজল বলল, 'গোলমেলে কিছু একটা যে আছে সেটা ঠিক। এর আগে দু'একজন গিয়ে পালিয়ে এসেছিল।'

'কি রকম গোলমাল?' রূপক প্রশ্ন করল।

'রাতের অন্ধকারে ঘোড়ার পিঠে নাকি ম্যাকনীল সাহেবকে চাবুক হাতে দেখা যায় সেখানে।'

হো হো করে হেসে উঠল রূপক। 'তাহলে তো যেতেই হবে, ম্যাকনীল সাহেবের সঙ্গে একবার মোলাকাত করতেই হবে।'

'না, এ অসম্ভব।'

'তুই একটা ভীতুর ডিম। ঠিক আছে দিনের বেলাতেই তাহলে যাওয়া যাবে আর কালই', বলল রূপক।

সজলের বাবার অনুমতি পেতে দেরি হলো না। আমরা পরের দিনই একটা সাইকেল রিকশায় রওয়ানা হলাম।

শহরের সীমানা ছেড়ে বেশ ঘন ঝোপ-ঝাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এক স্থানে পৌঁছলাম তিনজন। রিকশাওয়ালাকে বাসিয়ে রেখে আমরা এগোলাম। একটু পরেই চোখে পড়ল অনেকগুলো বাড়ির ধ্বংসস্তূপের মাঝে মস্ত একখানা পোড়ো বাড়ি। সারা বাড়িটায় বুনো গাছের ঘেরাটোপ।

বাড়িটায় ঢুকতেই একঝাঁক চামচিকে আর বাদুড় উড়ে পালাল। কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল আমার।

বাড়িটায় বেশ কয়েকখানা ঘর। বিশাল তাদের উচ্চতা। কেমন একটা পচা গন্ধ ভেসে আসছে চারদিক থেকে। নানা ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের ছড়াছড়ি ঘরগুলোয়। একটা ঘরে ঢুকেই থমকে

দাঁড়ালাম তিনজনে। সামনেই দেয়ালে টাঙানো ধুলোমাখা বিরাট একটা অয়েল পেন্টিং। ঘোড়ার পিঠে উদ্ধত ভঙ্গিতে বসে একজন সাহেব, হাতে চাবুক।

'এই সেই ম্যাকনীল সাহেব আর তার ঘোড়া', ফিসফিস করে বলল সজল।

'হুঁ, লোকটা যে নিষ্ঠুর ছিল ওর চোখ দেখলেই বোঝা যায়', রূপক বলল। 'ঘোড়াটাও বেশ জাঁদরেল।'

সারা বাড়িটা বেশ আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল রূপক। ওর কৌতূহল যে ভালো রকম জেগে উঠেছে তা টের পাচ্ছিলাম।

বেলা বেড়ে উঠছিল তাই তাড়া লাগাল সজল, 'এবার যেতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, রূপক।'

'বেশ, চল তাহলে ফেরা যাক', রূপক বলল।

আমি একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। এত সহজে ফিরে যেতে রাজী হলো রূপক! ও যে কেন এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে রাজী হলো তখন না বুঝলেও পরে তা বুঝতে দেরি হলো না।

পরের দিনই রূপক চুপিচুপি আমাকে বলল, 'সন্তু, আজ রাত্তিরে আমরা দুজন ওই পোড়ো বাড়িতে যাব। কিন্তু খবরদার, সজল বা এ বাড়ির অন্য কেউ কথাটা যেন জানতে না পারে।'

ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগল না, তাই বললাম, 'কাজটা খুব খারাপ হবে রূপক। সজলের বাবা অসন্তুষ্ট হবেন, এরকম করা একদম ঠিক হবে না।'

কিন্তু রূপককে বাধা দিলেও যে লাভ হবে না তাও জানতাম। ও আমাকে জানিয়ে রাখল রাত দশটায় সবাই শুয়ে পড়লে আমরা চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ব। ও একটা রিকশাওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করে রেখেছে, সে আমাদের ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে তবে অপেক্ষা করবে না কিছুতেই। বুঝতে পারলাম লোকটি ভয়ে একথা বলেছে।

রাত তখন দশটা, সারা বাড়ি নিঝুম। আমাদের আলাদা ঘর তাই বেরিয়ে পড়লেও কেউ জানতে পারল না।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আবার পৌঁছলাম সেই জঙ্গল মতো জায়গাটায়। এবার সত্যিই কেমন ভয় ভয় করতে লাগল আমার। চারপাশে অদ্ভুত একটা গা-ছমছমে ভাব। অন্ধকারে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে ছোট-বড় গাছ আর ঝোপঝাড়। দূরে কোথায় যেন ডেকে উঠল একটা শেয়াল, কানে এল কোনো রাতজাগা পাখির কর্কশ ডাক।

রূপক আর আমি হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল আমরা একলা নই, কেউ একজন কাছাকাছি রয়েছে। আর ঠিক তখনই দেখতে পেলাম ভয়ঙ্কর একটা দৃশ্য।

পোড়ো বাড়িটার ঠিক সামনে অন্ধকারের পটভূমিতে একটা ঘোড়া আর তার পিঠে একজন সওয়ার। কেমন একটা শীতল স্রোত আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে যেতেই অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম, 'রূপক....!' রূপকও দেখতে পেয়েছিল। ও আমার হাত ধরে টেনে এগিয়ে যেতে চাইতেই আমি প্রাণপণে বাধা দিলাম।

ঠিক তখনই সেই ঘোড়া আর তার সওয়ার এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। বেশ দ্রুত অথচ দুলকিচালে এগিয়ে আসছিল ঘোড়াটা। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ তাই স্পষ্ট দেখা যায় এমন আলো-আঁধারি। ঘোড়াটা একেবারে কাছে এসে পড়ল ততক্ষণে।

আমি চমকে উঠলাম। একি! ঠিক যেমন অয়েল পেন্টিং-এ দেখেছি, অবিকল সেই মূর্তি—ঘোড়া আর তার সওয়ার—সেই নীলকর ম্যাকনীল সাহেব। ঘোড়ার মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে।

ম্যাকনীল সাহেবের চোখেও প্রতিহিংসার আগুন। আমার কানে আসছে ঘোড়ার খুরের শব্দ—খটাখট....খটাখট। শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে....ম্যাকনীল সাহেবের হাতে নিষ্ঠুরতায় লকলক করছে চাবুক। আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলাম। পাশে রূপক দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে। হঠাৎ দেখলাম তীরের মতো ও ছুটে চলেছে সামনে। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রূ....প.....ক!' তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হলো চারদিক রোদ ঝলমল করছে। আমাকে ঘিরে মানুষের ছোটোখাটো একটা জটলা। মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সজল। ওকে দেখে কোনোক্রমে বললাম, 'রূপক—।'

'রূপক হাসপাতালে, ওর জ্ঞান এখনো ফেরেনি।' সজল গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল। 'সকালে তোদের ঘরে না পেয়ে লোকজন নিয়ে এখানে এসে তোদের অজ্ঞান অবস্থায় পাই। রাত্তিরে এখানে এসে খুব অন্যায় করেছিস তোরা।'

আস্তে আস্তে উঠে বসে চারদিকে তাকালাম। গতরাতের সেই ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিকতা আর নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল মাটির বুকে। ধুলোর ওপর অসংখ্য ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ...।

তাহলে কি কাল যা দেখেছি সবটাই সত্যি!

আষাঢ় ১৪০৫

রান্‌সউইক হাউস

অংশুমান বসু

দরজাটা খুলে বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল অর্চি। কী সুন্দর সকাল! কী অপূর্ব চারপাশের প্রকৃতি! কাল রাতের বেলায় ওরা যখন এল, তখন অন্ধকারে কিছু বোঝা যায়নি। এখন দেখল ভারি সুন্দর। রান্‌সউইক হাউসের অবস্থান যে এমন মনমাতানো প্রাকৃতিক পরিবেশে, এখানে আসবার আগে অর্চি ভাবতেও পারেনি। দীঘাতে তো তারা কতবারই এসেছে। কখনও সৈকতাবাস, কখনও কোনও সরকারি বাংলো, কখনও টুরিস্ট লজ বা হোটেলে থেকেছে। কিন্তু রান্‌সউইক হাউস? না, একবারও না। এর নামটাই সে জানত না বলতে গেলে। কিন্তু এখন, এই রান্‌সউইক হাউসের অতিথি হয়ে এবং এই সকালে চারপাশে নজর বুলিয়ে অর্চির মনে হলো এই হাউসের তুলনীয় আর একটি আস্তানাও নেই গোটা দীঘাতে। সাধে কি সরকারের বড় বড় কর্তারা এসে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের এই অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করেন! অর্চির মজা লাগল, রান্‌সউইক হাউসের পয়লা নম্বর ঘরটাতেই জায়গা পেয়েছে তারা। তার মানে তারাও বেশ হোমরাচোমরা কেউ।

অর্চির মা এসে অর্চির পাশে দাঁড়ালেন। 'মা দেখ, কী সুন্দর জায়গাটা।' উচ্ছ্বসিত অর্চি। 'দেখ, বাড়িটা কেমন একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়ে—মনে হচ্ছে যেন কোনও মালভূমি। চারদিকটা উপত্যকার মতো। ওই দেখ, টিলার নিচের দিকে একটা পুকুরও দেখা যাচ্ছে। শালুক ফুটে আছে ওখানে।'

অর্চির মা চোখ ঘোরান। তাঁরও কেমন ঘোর লাগে। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তিনি বলেন, 'ঠিক বলেছিস, অর্চি। দেখ, কী ভীষণ সবুজ জায়গাটা। এই টিলাটা নিশ্চয় এক সময়ে বালিয়াড়ি ছিল। এখন এটা পুরু ঘাসে ঢাকা। লনটা আরও সবুজ। চারপাশে আবার তরতাজা ঝাউ আর নারকেল গাছের সারি। এ যেন সবুজ উপত্যকা—স্বপ্নের সেই গ্রীন ভ্যালি।'

'দেখ দেখ মা। সৈকতাবাসের পাশ দিয়ে সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে—বাঁ দিকে সেই হোটেলটা—সি হক্ না কী যেন।'

অর্চির মা-ও ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। 'সুন্দর! খুব সুন্দর! কত জায়গায় তো আমরা গেছি, কিন্তু এমন মনকাড়া পরিবেশ কোথাও পাইনি।'

'নিচে যাই, মা?'

মা মাথা ঝাঁকাতেই অর্চি একতলায় নেমে আসে। লনের দিককার দরজাটা খুলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ায়। চারপাশে চোখ বুলিয়ে তারপর বারান্দা থেকে নেমে আসে। বাড়িটাকে ঘিরে চক্রাকারে হাঁটতে থাকে সে। কিছুটা এগোতেই ওর চোখে পড়ে বাড়ির দেওয়ালে গাঁথা একটা সাদা মার্বেলের স্মারক। সেটা পড়ে অর্চি। এই বাড়িটা বানানো হয়েছিল কোনও এক জে. এফ. স্নেথের জন্য। রান্‌সউইক হাউস তাহলে স্নেথ সাহেবের বাড়ি ছিল। কে এই স্নেথ সাহেব? দীঘাতেই বা সেই সাহেব বাড়ি বানাতে গেলেন কেন? কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞাসা করবে অর্চি। সামনেই কেয়ারটেকারের অফিস। এই বাড়িটা থেকে খানিক তফাতে টিলাটার ঢালের দিকে পাশাপাশি দুটি আলাদা বাড়ি অর্চির চোখে পড়ে। এই বাংলোর কর্মচারীরা ওখানে থাকে নিশ্চয়।

স্নেথ সাহেবের বাড়িকে প্রদক্ষিণ করে অর্চি সমুদ্রমুখী বারান্দার সামনে আসে।

এখান থেকেই সে শুরু করেছিল। হঠাৎ ওর চোখে পড়ে বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরে লাগোয়া আর একটা ছোট সবুজ টিলার ওপর পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা। রান্‌সউইক হাউস থেকে আলাদা নয়, আবার আলাদাও বলা চলে। ওখানে কী আছে! অর্চি কৌতূহলী হয়ে লনটায় নামে। লনের দেওয়ালের গায়ে বসানো একটা ছোট গেট চোখে পড়ে ওর। সে ছোট গেটটা পার হয়ে বাইরে আসে। না, এটা একটা আলাদা টিলা নয়। রান্‌সউইক হাউসের টিলাটারই দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাওয়া অংশ জায়গাটা। কিন্তু ওয়াল দিয়ে আলাদা করে রাখা জায়গাটায় কী আছে? অর্চির চোখে কৌতূহল চিকচিক করে ওঠে। এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে সে। ছোট ঘেরা জায়গাটা এখানকার শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে। অর্চি আরও এগিয়ে যায়।

এ কি! এটা তো বড়সড় গোছের একটা কবর। কী পরিষ্কার একটা বিশাল মার্বেল কবরের ওপর সাদা চাদরের মতো বিছানো। ক্রুশ আঁটা আলাদা কোনও বেদি-টেদি নেই। অর্চি ভাল করে দেখল। এটা স্নেথ সাহেবের কবর। আলাদা একটা মার্বেল ফলকে বড় বড় করে লেখা স্নেথ সাহেবের পরিচয়—As the first citizen of Digha (দীঘার প্রথম নাগরিক)। জন্ম ও মৃত্যুর তারিখও মার্বেলের গায়ে খোদাই করা। মনে মনে অর্চি হিসাব করে। ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ স্নেথ সাহেবের মৃত্যুর সময় তঁরা বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। অর্চি খুব অবাক হয়ে যায়। এই বাড়িটা যখন তৈরি হয় তখন দীঘা ছিল একটা প্রায় অজানা নগণ্য গ্রাম। বিদেশী এই মানুষটি সমুদ্র উপকূলের এই অজ পাড়াগ্রামটিকে কতখানি ভালবেসেছিলেন যে এখানে তিনি শুধু বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরিই করেননি, মৃত্যুতেও তিনি জায়গাটার মায়া কাটাতে পারেননি। তাই দীঘার এই নিরিবিলি প্রান্তে সমুদ্রের নোনা জোলো বাতাস কবরে লাগিয়ে নিশ্চিন্তে মাটি আর বালির তলায় শুয়ে আছেন। অর্চির শ্রদ্ধা হয়, ভাল লাগে বিদেশ থেকে আসা মানুষটিকে। সে মনে মনে স্নেথ সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

দুই

পরের দু'দিনের মধ্যে অন্যদিকে মন দেবার সময় পেল না অর্চি। হৈ-হৈ করে এ দু'দিন ও শুধু ঘুরে বেড়াল বাবা ও মায়ের সঙ্গে। বলতে গেলে সমুদ্র একাই তার প্রায় পুরো সময়টা নিয়ে নিল। ফাঁকে ফাঁকে আছে নিউ দীঘার ঝাউবন, বালিয়াড়ির সার, সায়েন্স মিউজিয়াম, অমরাবতী—এ সব জায়গায় যাওয়া। একটা বেলা কাটল চন্দনেশ্বর মন্দির আর তালসারির সমুদ্র দেখে। তালসারিতে একটা নদী সমুদ্রে এসে মিশেছে। অর্চি জিজ্ঞাসা করে জেনেছে নদীটা নাকি সুবর্ণরেখা। নদী ও সমুদ্রের মাঝে বিরাট একটা চর—দ্বীপের মতো। নৌকো করে সে দ্বীপেও ঘুরে এল অর্চিরা। পরের দিনটা কাটল শঙ্করপুরের অতিথি নিবাসে। ওখানে সমুদ্র, ঝাউবন, বালিয়াড়ি, বিস্তৃত বেলাভূমি ছাড়াও ছিল অনেক মাছধরা নৌকো। জেলেরা তো ছিলই। শঙ্করপুরে থেমে থাকা সব কটা নৌকোই যন্ত্রে চলে—একটাও সাধারণ ডিঙি নৌকো নয়। অর্চি ঘুরে ঘুরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া লোকগুলোর গল্প শুনল। ওদের কষ্টের কথা জেনেও ওর মনটা খারাপ হয়ে যায়।

শঙ্করপুর থেকে সন্ধ্যা পার করে অর্চিরা যখন রান্‌সউইক হাউসে ফিরল, তখন অর্চির দু'চোখ জুড়ে গভীর ঘুম নেমে আসতে চাইছে। কিন্তু তবুও স্নেথ সাহেবের কথা তার মনে পড়ে গেল। খেতে খেতেই সে শুধাল স্নেথ সাহেবের কথা। কিন্তু যারা খেতে দিচ্ছিল তারা কেউ কিছু জানে না। ওরা শুধু এটুকু জানে স্নেথ সাহেব তাঁর বাড়িটাকে জমি-টমি সহ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

হতাশ অর্চি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। সে যেন একটা জেলে জিঙি চড়ে গভীর সমুদ্রে পাড়ি

দিয়েছে, হাতে তার মস্তবড় মাছধরা নাইলনের জাল। লাল-রঙা মস্ত সূর্যটা আস্তে আস্তে দিগন্তর ঢালে নেমে যাচ্ছে। আর অর্চি এগিয়েই চলেছে সূর্যটাকে তাক করে।

তিন

হঠাৎ একটা শব্দে অর্চির ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নও। জানালায় টোকা পড়ছে। জানলায় কে টোকা দিচ্ছে এত রাত্রে? চোর-টোর নয়তো! নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু ওর খটকা লাগে। চোর হলে জানলায় টোকা দেবে কেন? সে তো নিঃশব্দে ঘরে ঢুকবে। তারপর শব্দ না করেই ঘর ছাড়বে। ওই সঙ্গে নিয়ে যাবে তার পছন্দের জিনিসগুলো। তাই চোর নয়। তবে কি অর্চি ভুল শুনেছে? হয়তো তাই। সে চোখ বন্ধ করে।

জানালার কাচে আবার শব্দ হয়। কেউ যেন সেখানে আঙুলের ডগা দিয়ে ধীরে ধীরে আঘাত করছে। এমন ভাবে আঘাত করছে যাতে অর্চি ছাড়া আর কারও ঘুম ভেঙে না যায়।

বিছানা থেকে নেমে আসে অর্চি। ওর সাহস একটু বেশিই। ও দেখতে চায় এত রাত্রে কে জানালায় টোকা মারছে। সে হাত বাড়িয়ে ছোট আলোটা জ্বালে। কই জানালায় তো কোনও শব্দ নেই। শব্দ নিশ্চয় আগেও ছিল না। যে শব্দ সে শুনেছে তা নির্ঘাত সমুদ্র ছুঁয়ে আসা বাতাসের খেলা। এখন বাতাসের জোর নিশ্চয় কমে গেছে—তাই শব্দও নেই। আলো নিভিয়ে দেয় অর্চি। সাবধানে মশারিটা তুলে বিছানায় ঢুকতে যাবে সে, জানালায় আবার শব্দ। হ্যাঁ, অর্চি এবার ঠিক শুনেছে। জানালায় নিশ্চয় কেউ টোকা দিচ্ছে—থেমে থেমে টোকা দিচ্ছে। ডাকছে, ওকে ডাকছে। শুধু ওকেই ডাকছে। ওর নাম ধরে যেন ফিসফিস করে ডাকছে।

অর্চি উঠে জানালার পাশে এল। বাতানুকূল ঘরের জানালায় ভারী পর্দা টানা। একটানে পর্দা সরিয়ে দেয় সে। বাইরে চাঁদের আলোর জোয়ার। আজ কী তিথি? চতুর্দশী না পূর্ণিমা? চাঁদের আলোর বন্যায় মাঠঘাট স্বপ্নে ভরে যাচ্ছে। কিন্তু জানালায় তো কেউ নেই! কাচের আড়াল থেকে অর্চি উঁকিঝুঁকি মারে। জানালার সামনে খোলা ছাদ। নির্জন ছাদ অর্চিকে দেখে হেসে ওঠে। চাঁদের হাসিতে সমুদ্র গজরাচ্ছে। ভরা পূর্ণিমার জোয়ার আসা শুরু হয়েছে বোধহয়। ঢেউ ভাঙার অবিশ্রান্ত আওয়াজে চাঁদের আলোয় ধোওয়া নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি তটস্থ হয়ে পড়েছে। না, ছাদেও কেউ নেই। কেই বা থাকবে এত রাত্রে! চোর মহাপ্রভুর এত সাহস হবে না যে রান্‌সউইক হাউসের দোতলার ছাদে উঠে আসবে, বিশেষ করে এই হাউসে, যেখানে হোমরাচোমরা লোকের ভিড় লেগেই থাকে। এতক্ষণে অর্চির মনে হয় শব্দ-টব্দ সব ওর মনের ভুল। এ ছাড়া আর কিছু নয়। অর্চি জানালায় পর্দা টেনে দেয়।

কিন্তু আবার টোকার শব্দ। এবার দরজায় যেন। দরজায় এ সময় টোকা দেয় কে! বাতাস তো নয়। বাতাস আসার পথ নেই। ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কেয়ারটেকারের কোনও লোক ডাকছে কী? কিন্তু এত রাত্রে ডাকবে কেন? হয়তো এখন রাত বেশি নয়। অর্চি ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে ভাবছে অনেক রাত। হয়তো জরুরি কোনও কাজে ওর বাবাকে দরকার। এসব ভাবতে ভাবতেই দরজায় টোকা পড়ে পরপর দু'বার। এবার যেন একটু অধৈর্য ভাবে। বড় আলোটা জ্বালে অর্চি। ভাবে বাবা-মাকে ডাকবে। সে ওঁদের দিকে তাকায়। দু'জনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। থাক, অর্চি ওঁদের এখন ডাকবে না। আগে সে দেখবে কী ব্যাপার। তারপর না হয় ডাকবে।

দরজায় আর একবার টক টক আওয়াজ ওঠে। অর্চি আর কিছু ভাবে না। দরজাটা খুলে উঁকি মারে। কে যেন সামনে দাঁড়িয়ে। কে? কে? অর্চি বেশ নার্ভাস বোধ করে। এ কী! এ যে পুরোদস্তুর একজন বিদেশী সাহেব দাঁড়িয়ে! এত রাতে এ কোন সাহেব এখানে এল! টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোয় প্যাসেজটা আলোকিত। সেই আলোতে অর্চি পরিষ্কার দেখতে পায় প্যান্ট-কোট-টাই পরা

সাহেব যথেষ্ট বৃদ্ধ। তঁরা ভারী ধরনের শরীরটার ওপর গোলগাল বড় একটা মাথা। মুখে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুল প্রায় সাদা। হাতের লাল চামড়ায় নোনা সমুদ্র আর প্রখর সূর্যের কালো কালো ছোপ। মুখের চামড়ায় অনেক আঁকিবুঁকি। সাহেবের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অর্চির মনে হলো এই ভদ্রলোক তার খুব চেনা। কোথায় যেন এঁকে দেখেছে। কোথায় মনে করতে পারে না সে।

'হু আর ইউ?' ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র অর্চি জিজ্ঞাসা করে।

'তুমি আমাকে চিনতে পারছ না, অর্চি?' ঝরঝরে বাংলায় সাহেব অর্চিকে পাল্টা প্রশ্ন করেন।

'আপনি বাংলা জানেন?' অর্চি অবাক।

'জানি মানে? এখন এটাই আমার ফার্স্ট ল্যাংগুয়েজ। জানো অর্চি, তোমাদের বাংলায় থাকতে থাকতে আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট বাঙালি হয়ে গেছি।'

'তাহলে আমাদের মতো আপনিও কি ডাল-ভাত-মাছ-তরকারি খান?'

'নিশ্চয়। শুধু খাই না, মোচার ঘণ্ট, বড়ি দেওয়া শুকতো আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মৌরলা মাছের চচ্চড়ি আমার খুব ভাল লাগে। টোস্ট—কাটলেট—সুপ—বার্গার এসব আজকাল কিছুই আমার মুখে রোচে না।'

সাহেবের কথায় অর্চি খুশি হয়।—'আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?'

কথা বলতে বলতে ওরা ছাদে এসে দাঁড়ায়। কথার ফাঁকে অর্চি খেয়াল করেনি ছাদে যাবার দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল কী করে।

'তোমার নাম জানলাম কী করে?' বৃদ্ধ সাহেবের মুখে শিশুর মতো হাসি। 'মন গুনে গো, অর্চিবাবু। তুমি তো অর্চিষ্মান চক্রবর্তী? কলকাতার সেন্ট জেমস স্কুলে পড়।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কি আগে কখনও দেখা হয়েছে? আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। অবশ্য আপনাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় আমাদের দেখা হয়েছে বলুন তো?'

সাহেব খুক খুক করে হাসেন।

'মনে করার চেষ্টা করো। তোমার মেমরি তো খুব শার্প। ভাব, ঠিক মনে পড়ে যাবে।'

এরপর সাহেব প্রসঙ্গান্তরে যান।—'কী সুন্দর এই রাত, দেখেছ অর্চি? চাঁদরে আলোয় চারিদিক ভরে গেছে। আজ পূর্ণিমা। ওই দেখ ক্রুদ্ধ অজগরের মতো সাগর ফুঁসছে। সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। কিন্তু জোরালো বাতাস বইছে না কেন এখনও? এখন তো দক্ষিণ দেশ থেকে বাতাসের দমকা এসে সমুদ্রের ঢেউকে উসকে দেবে বহুগুণ। তাকে উদ্দাম করে দেবে, অগোছালো করে দেবে। অজগরের গর্জন আরও বাড়বে। ঝোড়ো বাতাসে গাছের পাতায় পাতায় মর্মর উঠবে, টুপটাপ করে সেই সাদা জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়বে।'

সাহেবের কথায় কী এক আশ্চর্য যাদু আছে—অর্চি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। একটা নাম-না-জানা অদৃশ্য জগতের রহস্য যেন শিশিরের ছোঁয়ার মতো ওকে ধীরে ধীরে সিক্ত করে তুলতে লাগল। সে কোনও কথা বলল না।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ সাহেব সমুদ্রের দিকে মুখ তোলেন। দৃষ্টি ওঁর বিশ্বচরাচর ছাড়িয়ে কোনও এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে গেছে।—'না, আজ দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস বইবে না। তার মানে আজও সে আসবে না।'

'কে আসবে না?' অর্চি প্রশ্ন করে।

'ডরোথি।'

'কে ডরোথি?'

'ডরোথি আমার ভাইঝি। আমার ছোট ভাইয়ের একমাত্র মেয়ে। সে এসেছিল সেই কতদূরের সাদাম্পটন থেকে স্বামী-সংসার সব ছেড়ে। এসেছিল শুধু আমারই জন্য, আমারই কাছে। সেও তো হয়ে গেল অনেক দিন। যাবার সময় বলেছিল আবার আসবে। বলেছিল বারবার আসবে। কিন্তু এতদিন হয়ে গেল, আর একবারও আসেনি।'

'আপনি ভাববেন না, আপনার ভাইঝি নিশ্চয় আসবেন। হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই এসে হাজির হবেন।' অর্চি বৃদ্ধকে প্রবোধ দিতে চায়।

'না অর্চি, ও আর আসবে না। আমি জানি আসবে না।'

'এ কথা জোর দিয়ে বলছেন কী করে?' অর্চি ভরসা দিতে চায়। 'বলেছেন যখন তখন ঠিক আসবেন। এখন হয়তো কাজেকর্মে ব্যস্ত আছেন।'

'না আসবে না। শেষ ও যখন এসেছিল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। এক বুক তারা ছিল আকাশে, চাঁদ কোথাও ছিল না। চাঁদ সেদিন উঠবে কি না তাও কেউ জানতাম না। সেদিন হয়তো অমাবস্যা ছিল, নয়তো তারই কাছাকাছি কোনও তিথি। ডরোথি সেদিনই বলেছিল।' বৃদ্ধ সাহেব হঠাৎ চুপ করে যান। তঁরা চোখ দুটি আকাশের সীমা ছাড়িয়ে অন্য লোকে যেন চলে গেছে।

'কি বলেছিলেন ডরোথি?' অর্চির কথায় আগ্রহ।

'বলেছিল এবার যখন আসবে তখন পূর্ণিমা দেখে আসবে। আসবে এমন রাতে যখন সমুদ্রে ভরা বান আসবে। সেই সঙ্গে বইবে জোরালো দক্ষিণ দেশের বাতাস। বলেছিল, চাঁদের আলো আর বুকভরা জলকণা নিয়ে আসা জোর বাতাসের তালে তালে ও আমায় গান শোনাবে। আরও বলেছিল সে গানের সুরে লয়ে হারানো স্মৃতির গন্ধ আমার সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। মন ভরে যাবে চিরকালের মতো।'

বৃদ্ধ উদাস নয়ন দুটি মেলে চুপ করে যান।

'ডরোথি যখন বলে গেছেন তখন নিশ্চয় আপনাকে গান শোনাবেন। এই পূর্ণিমায় আসেননি, হয়তো পরের পূর্ণিমায় আসবেন।' অর্চি সান্ত্বনার সুরে বলে।

'না অর্চি, সে আর আসবে না কোনওদিন।' বৃদ্ধ সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'এ কথা কেন বলছেন? আসবেন না কেন?' অর্চি বেশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

'কী করে আসবে বলো?' বৃদ্ধ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। 'শেষবার এখান থেকে দেশে ফেরার পথেই তো অ্যাক্সিডেন্ট হলো। ওদের প্লেনটা ক্রাশ করেছিল। সে প্লেনের একজনও বাঁচেনি। ডরোথিও না। সে এখন শুয়ে আছে আটলান্টিক মহাসাগরের গভীর অতলে। ওর আর আসার উপায় নেই।'

বৃদ্ধ সাহেবের মুখটা ভীষণ দুঃখী দুঃখী লাগে। অর্চি দেখতে পায় ওঁর চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে।

চুপ করে থাকে অর্চি। স্তব্ধ বৃদ্ধ সাহেব। অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙে অর্চি। 'আপনার তো আরও অনেক নিজের লোক আছে—ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী। তাঁরা কেউ আসবেন।'

'না অর্চি। ডরোথি ছাড়া আমার নিজের বলতে আর কেউ নেই যে। আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। আমি তো বিয়েই করিনি। জানো অর্চি, আমি এক সত্যিকারের হতভাগা মানুষ। আমার কেউ নেই—না বন্ধু, না আত্মীয়। আমার কাছে কেউ আসবার নেই, কেউ আসেও না। দু'দিন আগে তুমি এসেছিলে, আমার বুক ভরে গিয়েছিল, অর্চি। আমি যে মানুষকে বড্ড ভালবাসি।' সাহেবের দু'চোখে জল টলমল করে।

বৃদ্ধ সাহেবের শেষ কথাগুলো খট করে অর্চির কানে লাগে। দু'দিন আগে কেন, কোনও দিনই কোনও সাহেবের কাছে সে যায়নি। কী পাগলের মতো উল্টোপাল্টা কথা বলছে এই বৃদ্ধ সাহেব! সে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে। সন্দিগ্ধ ভাবেই সে বৃদ্ধকে জরিপ করতে চাইল।

চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় সামনে দাঁড়ানো প্রবীণ মানুষটার মুখে অলৌকিক ছায়া দোলে। সেদিকে তাকিয়ে অর্চি চেপে চেপে বলে, 'আপনার বাড়ি কোথায়? দীঘাতে আপনি কোথায় উঠেছেন?'

সাহেবের কোঁচকানো মুখে কষ্টের ভাঁজ স্পষ্টতর হয়। 'আমার বাড়ি? হ্যাঁ, আমারই বাড়ি।' আলো-আঁধারির মাঝ থেকে অস্পষ্ট কথা বলার সুরে বৃদ্ধ যোগ করেন, 'এই রান্সউইক হাউসই তো এক সময় আমার বাড়ি ছিল।'

'এটা আপনার বাড়ি ছিল!' অর্চির মুখে হঠাৎ কথা সরে না। কে এই সাহেব? মনে জোর করে সাহস এনে তবু সে বলে, 'এখন আপনি কোথায় থাকেন?'

'এই বাড়িরই কাছাকাছি আমি এখন থাকি। হ্যাঁ খুবই কাছে—পাশাপাশিই বলা যায়।'

চাঁদের প্রখর আলোয় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লান্ত বৃদ্ধ মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে অর্চির হঠাৎ মনে হলো এই লোকটিকে সে চিনে ফেলেছে। এই সাহেবেরই ছবি আছে, হ্যাঁ, শুধু মুখেরই ছবি ঝোলানো আছে রান্সউইক হাউসের দোতলার খাবার ঘরে। একই ছবি আছে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে। কে এই সাহেব? স্নেথ নন তো!

একটা বরফঠাণ্ডা অনুভূতি অর্চির মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে থাকে। তার হাত-পা, সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যেতে থাকে। চেতনার স্তর অতিক্রম করতে করতে সে কোনওমতে বলতে পারে, 'আপনি কি মিস্টার স্নেথ?'

বৃদ্ধ সাহেবের উত্তর শোনার আগেই অর্চি সম্পূর্ণ চেতনা হারিয়ে ফেলে।

চার

'এই অর্চি, অর্চি, ওঠ, কত বেলা হয়ে গেল। আজ আর্লি লাঞ্চ খেয়ে আমরা রওনা হব, খেয়াল নেই নাকি?'

মায়ের ডাকে ধীরে ধীরে চোখ খোলে অর্চি। চারদিকে নজর বোলায়। অবাক হয়ে দেখে সে তার নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে। গত রাত্রের কথা তার মনে পড়তে থাকে। সে কি কাল রাতে কোনও দুঃস্বপ্ন দেখেছিল? নিশ্চয় তাই। বিছানা থেকে নেমে আসে অর্চি।

বাইরে নতুন একটি সকাল। সকালের নরম আলোয় চারদিক হাসছে। সেদিকে না তাকিয়ে অর্চি ডাইনিং রুমে ছুটে আসে। এ ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে এক বৃদ্ধের মুখের ছবি। ছুটে নামে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে। সেখানেও একই ছবি। হুবহু এক। অর্চির সামনে কাল রাতে এসেছিল এই বৃদ্ধ সাহেবই, এই বাংলোর একদা মালিক—জে. এফ. স্নেথ।

ছাদে ছুটে আসে অর্চি। সামনেই লন। লন ছাড়িয়ে স্নেথ সাহেবের কবর। সমুদ্র থেকে স্নিগ্ধ বাতাস আসছে। বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে সেই কবরকে। কবরের নিচে শুয়ে থাকা মানুষটাকেও কি এই বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে না? অর্চির হঠাৎ মন কেমন করে। তার চোখের সামনে কাল রাতে দেখা বৃদ্ধ স্নেথের করুণ মুখটা ভেসে ওঠে। দীঘার প্রথম নাগরিক বিদেশী এই মানুষটা বড় দুঃখী, ভীষণ—ভীষণ দুঃখী। তার কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। মানুষটা একেবারেই একা।

অর্চি আর দাঁড়ায় না। লনের বাগান থেকে চটপট কটা ফুল তুলে নেয়। ফুল হাতে একছুটে চলে আসে স্নেথ সাহেবের কবরে। সাদা পাথরের চাদরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে। চারদিকে অখণ্ড শান্তি। শান্তি কবরের ওপরে। অর্চি জানে না, কবরের নিচে কফিনের ভেতর যে মানুষটা শুয়ে আছে তারও শান্তি অখণ্ড কি না।

হাঁটু মুড়ে থাকা অর্চি এবার চোখ বোজে। মনে মনে ভাবতে থাকে সে যেন কবরের ওপর ফুল ছড়াচ্ছে, ধূপ জ্বালাচ্ছে, মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখছে। স্নেথ সাহেবের নাকি কেউ নেই। না স্নেথ সাহেব, এ আপনার ভুল। এই দীঘাকে আপনি ভালবেসেছিলেন, সেই সঙ্গে এই দেশটাকেও। আমরা, এই দেশের মানুষ, অকৃতজ্ঞ নই। আমরাও আপনাকে ভালবাসি, নিজেদের একান্ত আপনজন ভাবি। আপনি যে আমাদের বড় আপনার।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অর্চির চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। সেই জল না মুছেই সে কবরের প্রশান্তিতে শুয়ে থাকা মানুষটির উদ্দেশে মমতাভরা শ্রদ্ধায় হাতের ফুলগুলিকে ছড়িয়ে দেয়।

শারদীয়া ১৪০৬

মোল্লাখালির সেই রাতে

অনুপম দে

তোমাদের হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ঘটনা একেবারে দিনের আলোর মতো সত্যি। হ্যাঁ, আমার বয়েস তখন কতই বা হবে, এই চোদ্দ-পনের। থাকতাম বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী তালদহ গ্রামে। রানাঘাট থেকে গেদে লাইনে যে ট্রেন যাচ্ছে, ওই লাইনেই ছিল আমাদের গ্রাম। ওখানে তখনো ইলেকট্রিকের আলো পৌঁছায়নি। সন্ধ্যে নামলেই চারিদিকে ঘন অন্ধকার। আমগাছের ডালে, কাঁঠালের পাতায়, লিচুঝাড়ে চারদিকে অসংখ্য জোনাকি। তাদের মিটমিটে আলো, অন্ধকার আকাশে ছড়ানো-ছিটোনো তারার দল আর মাঝে মাঝে বাদুড়-পেঁচার ডানার ঝটপটানি—সব মিলে এই গরমের দিনে একটা অদ্ভুত আমেজ ছিল। আর তখন গরমের প্রকোপও এতটা বাড়েনি। সন্ধ্যে হলেই চূর্ণী নদীর দিক থেকে ভেসে আসত ঠাণ্ডা হাওয়া। এমন সময় মাটির দাওয়ায় বসে চাল-ছোলা ভাজা মেখে খেতে দারুণ লাগত। মাঝে মাঝে মনে হতো সামনের খোলা মাঠটা ধরে অনেকদূর চলে যাই। জানতাম ওই মাঠ পেরিয়ে, তারও পরে একটা খাল আর তার ওপারে দুটো ধানখেত পার হলে বাংলাদেশ। সুন্দর শ্যামল সবুজ নাকি ওই দেশ। কত নদী-নালা! কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় মা কিছুতেই বাড়ির বাইরে যেতে দিতেন না। বলতেন ওই মাঠের ওপারে খালের ধারে নাকি বাংলাদেশ থেকে আসা এক ফকিরের সমাধি রয়েছে। বুড়ো ফকির ওখানেই দেহ রেখেছিলেন। প্রতি অমাবস্যাতে নাকি তাঁর আত্মা ফকিররূপে ওই খালের ধারে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

মূলত ওই আকর্ষণেই বার বার আমার আর আমার এক ডানপিটে বন্ধু বুল্লানের মন ছোঁক ছোঁক করত। অনেকদিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিলাম। এরই মধ্যে একদিন সুযোগ এসেও গেল। বুলিপিসির শরীর খারাপের জন্য তাকে দেখতে মা গেলেন পিসির বাড়ি দুবরাজপুরে। গরমের সময়, তাই আমি এ যাত্রায় বাদ পড়লাম। বীরভূমের শুকনো গরমে কষ্ট হবে তাই ঠাকুমার হাতে আমাকে রেখে মা আর বাবা রওনা হয়ে গেলেন দুবরাজপুরে। আর এই যাওয়াতেই আমি আর বুল্লান প্ল্যান করে ফেললাম যে আগামী পরশু অমাবস্যায় আমাদের যেতেই হবে ওই মোল্লাখালের দিকে। হ্যাঁ, মুসলমান ফকিরের জন্যই ওই খালকে স্থানীয় মানুষ মোল্লাখাল বলতো।

ঠাকুমা তো আমাদের চোখে চোখে রেখেছেন। আমিও ঠাকুমাকে তোয়াজ করতে কখনো পাকাচুল তুলে দিচ্ছি, কখনো পা টিপে দিচ্ছি আর ঠাকুমা আদর করে এটা-ওটা দিলে খেয়েও নিচ্ছি। অন্যসময় হলে, ভাল লাগে না বলে দুধের বাটি সরিয়ে দিতাম কিন্তু এখন এক চুমুকেই সাবাড়। ঠাকুমাও খুব খুশি। এমনি করেই তিনটে দিন চটপট কেটে গেল। এসে পড়ল অমাবস্যার দিন। সকাল থেকেই ওইদিন অনুভব করছিলাম ভীষণ একটা উত্তেজনা। খালি ভাবছিলাম কখন সন্ধ্যে হবে। তারপর ধীরে ধীরে গরমে তেতে পুড়ে সুয্যিমামা পাটে বসলেন আর আস্তে আস্তে নেমে আসতে লাগল গাঢ় অন্ধকার। সন্ধ্যে হতেই ঠাকুমা হ্যারিকেন জ্বেলে দিয়ে গেলেন। পড়তে বসলাম। কিন্তু পড়ায় তখন মন বসে? খালি উসখুস করছি, কখন বুল্লান আসে। একসময় আটটা বাজল। হঠাৎ জানলার ধারে খসখস পায়ের শব্দ। বুল্লান ডাকল, টিকু বাইরে আয়, সময় হয়েছে। আমি চমকে উঠলাম। চমক সামলে পা টিপে টিপে বাইরে এলাম। উঁকি মেরে দেখলাম ঠাকুমা

পাশের ঘরে বসে বসে ঝিমোচ্ছেন। খুব আস্তে দাওয়ায় পা রেখে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। তারপর এক দৌড়ে এক্কেবারে বড় আমগাছটার তলা দিয়ে মাঠে।

মাঠে এসে একটু দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম। আঃ কী ঠাণ্ডা বাতাস! এদিক-ওদিক তাকিয়ে অন্ধকারে চোখটাকে সইয়ে নিয়ে দেখলাম একুট দুরেই দাঁড়িয়ে বুল্লান আমাকে ডাকছে। আমি এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু অদ্ভুত! ও আরও এগিয়ে গেল। আমি বললাম, এই বুল্লান কি হচ্ছে? দাঁড়া না। একসঙ্গে তো যাব। কিন্তু ও চেঁচিয়ে বলল, একসঙ্গে গেলে কেউ দেখে ফেলবে, তার চেয়ে আমি আগে আগে যাচ্ছি, তুই আমাকে অনুসরণ কর। অগত্যা ওই অন্ধকারের আবছা আলোয় ওকে ঠাহর করে আমি এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কতক্ষণ এভাবে চলেছি জানি না। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা মারল আমার মুখে, ভাবলাম নদীর বাতাস। কিন্তু একটু ধাতস্থ হতেই বুঝতে পারলাম আমরা মোল্লাখালের ধাকে চলে এসেছি। আর ভাবামাত্রই একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম, বুল্লান, তুই কোথায়? তোকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ফাঁকা জায়গায় হাসির প্রতিধ্বনি তুলে বুল্লান বলে, কিরে টিকু, ভয় পেলি? আমি তোর সঙ্গেই আছি। তোর পিছনে তাকিয়ে দ্যাখ। পিছনে তাকাতেই দেখি বুল্লান একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে। বলল, তুই ওই পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাক, দেখবি এক্ষুণি ফকিরবাবা বেরোবেন। আমার কেমন অবাক লাগল। বুল্লান এত কথা জানল কি করে? ও কি এর আগে ফকিরবাবাকে দেখেছে? দেখলেও বলেনি তো আমাকে! ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা সুন্দর গন্ধ নাকে এল। ঠিক অনেকটা মসজিদ বা গোরস্থানের ধূপের গন্ধের মতন। সারা শরীর শিরশির করে উঠল। তবে কি? হ্যাঁ ঠিক তাই। খালের পশ্চিম পাড় ধরে একটা মিটমিটে আলো থামতে থামতে এগিয়ে আসছে। বুল্লান বলল, ওই ফকিরবাবা বেরিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আলোটা অমন থামতে থামতে আসছে কেন?

উনি খুঁজছেন।

কি খুঁজছেন?

মানুষ।

বিশ্রি একাট হাসি হেসে ওঠে বুল্লান। সে হাসিতে শরীরের হাড়গুলোতে ঠকঠকানি লেগে যায়। নিজেকে সামলে আমি চেঁচিয়ে উঠি, কি যা তা বলছিস? মানুষ আবার কি?

আবার হেসে ওঠে বুল্লান। হ্যাঁরে একটা মানুষ বড় দরকার ওঁর। একটা মানুষের প্রাণ পেলে ওই তন্ত্রসিদ্ধ ফকির খালের তলায় পোঁতা আরেকটা ফকিরের দেহে সেটা সঞ্চার করে তাকে জাগিয়ে তুলবেন। তাই তো অমাবস্যার প্রত্যেক রাতেই তাঁর এই অভিযান।

বুল্লানের কথা শেষ হবার আগেই আমার মুখ দিয়ে অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে আসে। কোনোরকমে নিজেকে সামলে ছুট লাগাই মাঠের দিকে। বুল্লানের ডাক কানে আসে, শোন শোন, পালাসনি। আমি আছি.....

কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে থাকার সাহস আমার নেই। পিছনে ভেসে আসছে দ্রুতগামী পায়ের শব্দ। আমিও প্রাণপণে ছুটছি। এক মুহূর্তের জন্যে পিছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সর্বনাশ! একটা কঙ্কাল আমাকে তাড়া করে আসছে। তার পরনে চেক লুঙ্গি, গায়ে আলখাল্লা, মাথায় টুপি। আর তার চোয়ালের হাড় থেকে ঝুলছে ঝুরো ঝুরো দাড়ি। সাংঘাতিক এই অবস্থায় কোথা থেকে যেন শরীরের শক্তি একত্রিত হয়ে গেল। আর আমিও দুদ্দাড় করে ছুটে চললাম। কতক্ষণ এভাবে ছুটেছি জানি না। দূরে দেখতে পেলাম অনেক আলো। কিন্তু হঠাৎই আলোগুলো সব নিভে গেল। আমি জ্ঞান হারালাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখি, ভোর হয়েছে। ঠাকুমা উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে।

আর চমকে উঠলাম বুল্টানকে দেখে—সেও আমার মাথার কাছে বসে আছে। ঘোর কাটতে আরো কিছুক্ষণ লাগল। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, বুল্টান তুই?

বুল্টান বলে, হ্যাঁ আমি।

তো-তোর কিছু হয়নি?

না, কেন? কি হবে? বুল্টান অবাক হয়।

তুই কা-ল—

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে ও বলে, না, কাল বড়মামা এসে পড়ায় আমি আসতে পারিনি। তোকে যে সকালে খবর দেবো তাও হয়ে ওঠেনি।

আমি অবাক হয়ে বলি, কিন্তু আমি তো স্পষ্ট তোর ডাক শুনলাম। তোর পিছনে পিছনে গেলাম....তবে?

ঠাকুমা কেঁদে ককিয়ে ওঠেন, ওরে আমার পোড়াকপাল রে! টিকু, তোকে ওই মোল্লাখালির নিশিতে পেয়েছিল রে। মা কালীর কৃপায় তোকে আমি ফিরে পেয়েছি। ঠাকুমার আক্ষেপবাণী থামতেই চায় না।

বড় হওয়ার পর আর মোল্লাখালির খোঁজ নেওয়া হয়নি। কিন্তু আজও ভেবে পাই না। সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল! বুল্টান ছিল না তো কে ছিল? আর ওই আলো.....কঙ্কাল....এসব?

আষাঢ় ১৪০৬

কমেডিয়ান রামু

বিপুল মজুমদার

তেপান্তরের মাঠে হু-হু হাওয়া বইছে। নির্জন মাঠের একপ্রান্তে ছোট ছোট টিলার মতো দাঁড়িয়ে থাকা অশ্বত্থ, বট আর মেহগনির ডালে ডালে শুধু ফিসফাস আর ফিসফাস। একটু আগে মাঠের মাঝখানে ধুলো উড়িয়ে যারা তাণ্ডব নাচ নাচছিল তারা সব থমকে দাঁড়িয়েছে। চারপাশের হি-হি খি-খি হাসি নিমেষে উধাও! গাছের ডালে ডালে চ্যাংড়াগুলির হুটোপুটিও থেমে গেছে। কমেডিয়ান রামুর কান্না শুনে সকলেই যারপরনাই বিস্মিত। সাতদিন গুম মেরে থাকার পর হঠাৎ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল রামু! তার বুকফাটা আর্তরব তেপান্তরের মাঠঘাট ডিঙিয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। এই ক'দিনে কেউ তার ধারেকাছে যায়নি। সোজা কথা হল কাউকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। এমনকি কুশল বিনিময়ের জন্য সর্দার এগিয়ে গেলেও তাকেও সে হাঁকিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি বড্ড ঘোরালো।

তেপান্তরের মাঠে রামুকে প্রথম ঢুকতে দেখে ভূত-পেত্নিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। উল্লাসে ফেটে পড়েছিল চ্যাংড়ার দল। বিস্ময়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে চ্যাংড়াদের একজন বলে উঠেছিল, 'লে হালুয়া, কমেডিয়ান রামু আমাদের মধ্যে। যার এক একটা কথা যেন হাসির এক একটা এটম বম্ব। অঙ্গ-ভঙ্গি দেখলে হাসির চোটে পেটে খিল ধরে যায়। নায়কের সমতুল সেই গ্রেট রমেন দত্ত শেষ পর্যন্ত কিনা তেপান্তরের মাঠে!' খবর রটতেই রামু দর্শনের জন্য ভূত-পেত্নিদের মধ্যে রীতিমতো ঠেলাঠেলি। ভিড় ঠেলে সর্দারই প্রথম এগিয়ে গিয়েছিল, 'তেপান্তরের ভূতের মহল্লায় তোমায় স্বাগতম রামু।'

রামুর মুখে একতিল হাসি নেই। তার ভুতুড়ে মুখখানা বিষাদে পরিপূর্ণ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে বলেছিল, 'মনমেজাজ একদম ভালো নেই আমার। কেউ যেন কোনোরকম বিরক্ত না করে সেটা দেখবেন তো।'

সর্দারের নির্দেশ অনুসারে কেউ বিরক্ত করেনি। ভি. আই. পি ভূত বলে কথা। মেহগনির মগডালে সাতদিন ধরে রামগরুড়ের ছানা হয়ে বসে ছিল রামু। সর্দারের হুকুমে কেউ ধারেকাছে ঘেঁষেনি। দূর থেকে শুধু সম্ভ্রম মাখানো দৃষ্টি ছুড়ে দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে। সবাই দেখেছে সাতদিন ধরে রামু শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে। গাল থেকে হাত যেন আর সরতেই চায় না। প্রাণবন্ত রসিক মানুষটা ভূত হয়েই এমন বদলে গেল কেন সেই রহস্য উদ্ধারে ভূতেরা দারুণ ব্যস্ত। তেপান্তরের মাঠ জুড়ে ক'দিন ধরে সেই নিয়েই কেবল গবেষণা। তারমধ্যেই সবাইকে চমকে দিয়ে রামু হঠাৎ কেঁদে উঠল! হাসির রাজা রামু কাঁদছে! ভূতেরা নিমেষে সব বাক্যহারা হয়ে পড়ল। কৌতূহলী ভূতের সর্দার কাঠির মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে এগিয়ে গেল, 'তোমার কিসের দুঃখু রামু? আমায় বল তো, দেখি যদি কিছু বিহিত করতে পারি।' সর্দারের সহানুভূতি মাখানো কথা শুনে মেহগনি পাতায় চোখ মুছে ভাঙা গলায় রামু বলল, 'অকালে কে আমায় পটল তুলিয়ে দিল গো সর্দার। পেছন থেকে ধাক্কা মেরে কে আমায় নীচে ফেলে দিল। সাতদিন ধরে সেই নিয়েই খালি ভেবে মরলাম। কূলকিনারা কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁদতে বসেছি।'

সবাই বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কমেডিয়ন রামুকে অর্থাৎ রমেন দত্তকে কেউ একজন উঁচু

জায়গা থেকে নীচে ফেলে দিয়েছে। পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে। আর তার দরুনই চন্দ্রবিন্দু যুক্ত রামুর তেপান্তরের মাঠে উদয় হওয়া। সর্দারের ঝোলা চোয়াল আরও খানিকটা ঝুলে পড়ল, 'কোথা থেকে নীচে পড়লে হে—কোনও বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে নাকি?'

রামু মাথা ঝাঁকাল, 'আরে না না, দার্জিলিং পাহাড়ের উপর থেকে! ধাক্কা খেয়ে ছিটকে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম যে!' জিভ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করল সর্দার। তারপর দুঃখী দুঃখী মুখ করে বলল, 'দার্জিলিঙে গিয়েছিলে কী করতে?'

রামুর মুখে বিরক্তি, 'কী আবার করব, শুটিং করতে গিয়েছিলাম। সিনেমার নাম লম্ফঝম্পে হৃদ্‌কম্প!'

সিনেমার নাম শুনেই চ্যাংড়া ভূতেরা খাঁক খাঁক করে সমস্বরে হেসে উঠল। সর্দার তাদের এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, 'হাসির ছবি বুঝি?'

মাথা নাড়ল রামু, 'তা তো বটেই। মেন রোলটা আমারই ছিল যে।' চ্যাংড়া এক মামদো ভূত ভিড়ের মধ্য থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'গপ্পোটা একটু শোনাবেন দাদা?' সঙ্গে সঙ্গে রামুর মেজাজ তিরিক্কে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি মরছি আমার জ্বালায় আর উনি এসেছেন সিনেমার গপ্পো শুনতে! পিঁয়াজি পায়া হ্যায়! কে আমায় আচমকা ধাক্কা মেরে খাদে ফেলে দিল সেটা না জানা পর্যন্ত নো গপ্পো নো কিস্যু! গতবছর বাংলায় বেস্ট কমেডিয়ানের প্রাইজ জিতেছি। এবার এই ছবিতে এমন ফাটাফাটি রোল ছিল যে রাষ্ট্রপতির প্রাইজটা কেউ আটকাতে পারত না। হায় হায়, কে আমার এমন সর্বনাশ করে দিল রে!......' কথা শেষ করে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসল রামু।

রামুর শোকে সকলেই মর্মাহত। নরম প্রাণের হাড়গিলে শাঁকচুন্নিটা রামুর দুঃখে হাউহাউ করে একপ্রস্থ কেঁদে নিল। সর্দারের চওড়া কপালে অজস্র ভাঁজ। লিকলিকে আঙুলগুলি দিয়ে চকচকে টাকে বারকয়েক টোকা মেরে বলল, 'কেঁদো না রামু। রহস্যের সমাধানের জন্য এক্ষুনি আমি গোয়েন্দা লাগিয়ে দিচ্ছি। পুলিশের এক ঝানু গোয়েন্দা ভূত হয়ে আমাদের মধ্যে মজুত রয়েছে। তাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। দু'দিনেই রহস্যের জট খুলে যাবে।'

সর্দারের কথায় রামুর কান্না থেমে গেল, 'হবে বলছেন?'

সর্দার হাসল, 'আলবাৎ হবে।' তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁক পাড়ল, 'কোথায় গেলে হে উমাপতি! শুনেছি মনুষ্যজীবনে অনেক কেস নাকি তুড়ি মেরে সল্‌ভ করেছ। এবার দেখাও দেখি তোমার কারিকুরি। রামুর মুখের হাসিটা আবার ফিরিয়ে দাও দেখি।'

উমাপতি নামে ব্রহ্মদত্যি থপথপ পায়ে এগিয়ে এল। এসে একগাল হেসে বলল, 'সাতদিনের মধ্যে কেস সল্‌ভ হয়ে যাবে। নো প্রবলেম!' পুলিশ ভূতের আশ্বাস শুনে রামুর মুখে হাসি ফুটল। একটু আগে ফাজলামি করা মামদোটা রামুকে চিড়িক করে এক চিলতে হাসতে দেখে তার পাশে দাঁড়ানো স্কন্ধকাটাকে বলল, 'গুরুকে দেখলেই কেমন হাসি পায় মাইরি! এতক্ষণ সত্যি সত্যি কাঁদছিল নাকি নকশা করছিল কে জানে।' স্কন্ধকাটা মামদোর পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, 'চুপ কর। সর্দারের কানে গেলে তেপান্তরের মাঠ ছাড়া করবে।'

মামদো ভূত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কপাল খারাপ মাইরি। ভেবেছিলাম গুরুকে পেয়েছি যখন তখন বড় মাপের একটা জলসা নামাব। দূর দূর, সব কেমন জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। কতদিন যে প্রাণভরে হাসিনি!'....

সাতদিন পর তেপান্তরের মাঠ আবার সরগরম হয়ে উঠল। কটা দিন বাইরে বাইরে ঘোরার পর পুলিশ ভূত আবার তেপান্তরের মাঠে এসে হাজির। মুখখানা কেমন যেন শুকনো শুকনো। রামুকে সঙ্গে নিয়ে আগ্রহভরে দৌড়ে এল সর্দার, 'কাজ হল উমাপতি?'

ব্রহ্মদত্যি উমাপতি হাত কচলাতে থাকল, 'জন্ডিস কেস! সাতদিন ধরে চরকির মতো ঘোরাঘুরি করেও তেমন ফায়দা হল না। কলকাতার কাগজগুলিতে দেখলাম রামুকে নিয়ে তোলপাড় চলছে। কাগজওয়ালাদের সন্দেহ রামু সুইসাইড করেছে!'

ব্রহ্মদত্যির কথা শুনে লাফিয়ে উঠল রামু, 'সুইসাইড করি আমি! সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি—রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, অস্কার সব এক এক করে হাতের মুঠোয় এসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল! সেই আমি কিনা...যত সব আজগুবি সন্দেহ!'

সর্দারের মুখে বিরক্তির ছাপ, 'খবরের কাগজের রিপোর্টিং দেখেই ফিরে এলে! কচুপোড়া তদন্তটা কী করলে শুনি?'

মিনমিন করে উঠল পুলিশ ভূত, 'ক্লু একটা পেয়েছি বটে। দার্জিলিং পাহাড়ের মাথায় যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রামু একা একা প্রকৃতির শোভা দেখছিল তার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবার সময় ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ক্যামেরা কুড়িয়ে পেয়েছি। কোডাক কোম্পানির ওই ক্যামেরার গায়ে খুদে খুদে বাংলা হরফে খোদাই করা রয়েছে—অশোক রায়, বারাকপুর। ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করা। নেগেটিভ খুলে দেখলাম গোটা দশেক মাত্র ছবি তোলা হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছবি খুব সম্ভবত রামুর। ছবিটা রামুর পেছন দিক থেকে তোলা। টাকটা চকচক করছে। আমার অনুমান ক্যামেরার মালিক ধাক্কা মারার ঘটনাটা দেখলেও দেখে থাকতে পারে।'

ছবির কথা শুনে লাফ দিয়ে ব্রহ্মদত্যির ঘাড়ের উপর এসে পড়ল রামু, 'ফিল্মটা আছে? দেখি দেখি।'

নেগেটিভটা খুলে রামুর চোখের সামনে ঝুলিয়ে দিল পুলিশ ভূত উমাপতি। ভূতেরা ডেভলপ না করা নেগেটিভ দেখেও সবকিছু বুঝতে পারে। সন্ধানী চোখ মেলে অনেকক্ষণ যাবৎ নেগেটিভগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর রামু বলল, 'হ্যাঁ, ছবির এই মানুষটা আমিই ছিলাম বটে! কিন্তু এতে খুনের কী কিনারা হবে?'

সর্দার বলল, 'ক্যামেরার মালিকের কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে?'

হতাশভাবে কাঁধ ঝাঁকাল পুলিশ ভূত, 'না। অনেক তো খুঁজলাম তবুও...'

সর্দারের গলাতেও হতাশা, 'তাহলে উপায়?'

ব্রহ্মদত্যি পানসে হাসল, 'হাল আমি ছাড়ছি না। আর কটা দিন দেখি।'

দিন চারেক বাদে এক ছোকরা ভূতকে সঙ্গে নিয়ে আবার পুলিশ ভূত উমাপতি এসে হাজির। মেহগনির মগডালে সপারিষদ বসে থাকা সর্দারের সামনে গিয়ে সে বলল, 'সর্দার, এই সেই অশোক রায়, ক্যামেরার মালিক!'

সর্দারের পাশে বসে থাকা রামু পুলিশ ভূতের কথায় হকচকিয়ে গেল, 'ছেলেটাকে মেরে নিয়ে চলে এলেন নাকি!'

ব্রহ্মদত্যি হাসল, 'আরে না না। বারাকপুরের লাটবাগানে এ ছোকরা ভূত হয়ে লাট খেয়ে বেড়াচ্ছিল! খোঁজ পেতেই ধরে নিয়ে এলাম।'

বিস্ময়ে সর্দারের চোখ তেরছা হয়ে গেল। ছোকরা ভূতটিকে ভালোরকম পর্যবেক্ষণ করে বলল, 'তুমি পটাং করে কীভাবে ভূত হয়ে গেলে ভাই? এই তো ক'দিন আগে দার্জিলিঙে...!'

ক্যামেরার মালিক ছেলেটির প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা, 'দিন তিনেক আগে হঠাৎ খুন হয়ে গেলাম যে! ছবি তোলার শখ আমার বহুদিনের। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে বন্ধুদের থেকে দলছুট হয়ে নিরিবিলিতে ছবি তুলে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ গাছগাছালির আড়াল থেকে দেখলাম একটা লোক আর একটা লোককে ধাক্কা মেরে খাদের মধ্যে ফেলে দিল! খানিক আগেই পাহাড় সমেত নীল

আকাশের ছবি তুলতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধাক্কা খাওয়া মানুষটার ছবি ক্যামেরাবন্দী করেছি। এখন এমন একটা দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা সব অবশ হয়ে এল। আতঙ্কে হাতের ক্যামেরা খসে পড়ল নীচে। পাহাড়ের ঢালে গড়িয়ে যাওয়া ক্যামেরার খোঁজ করব সেই সময় কোথায়! তীব্র আতঙ্কে পড়িমরি করে হোটেলে ফিরে এলাম। ভয়ে সেদিন বন্ধুদের কাউকে কিছু বলিনি। পরদিন লোকের মুখে শুনলাম পাহাড়ের খাদের মধ্যে রামুর লাশ পাওয়া গেছে! সেইদিনই দার্জিলিং মেলে কলকাতা ফেরার পথে ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে ঘটনাটা খুলে বললাম। বন্ধুটির মামা এক টিভি কোম্পানির কর্তাব্যক্তি। পরদিন ভাগনের মুখে ঘটনাটা শুনে সেই মামা তাঁর টিভি চ্যানেলে আমার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। চমক বজায় রাখতে টেলিকাস্ট হওয়ার আগে পুলিশকে কোনো কিছু জানতে বারণ করলেন। শেষ পর্যন্ত প্ল্যানমাফিকই সব কিছু হল। বন্ধুর মামার চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট মিটিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরলাম। ভাবলাম পরদিন সকালেই যা জানি পুলিশকে সব জানিয়ে দেব। কিন্তু কপাল আমার খারাপ! পরদিন সকালে থানায় যাওয়ার পথে হঠাৎ রাস্তার মধ্যে দিনের আলোয় বুকে গুলি খেয়ে শুয়ে পড়লাম! পুলিশকে আর জানানো হল না। মুহূর্তের মধ্যে মানব শরীর ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে গেলাম!'

কথা শেষ হতেই ছোকরা ভূতের কাঁধের কাছটা খামচে ধরল ব্রহ্মদত্যি, 'তুমি বলছ খুনিকে তুমি পেছন দিক থেকে একঝলক দেখেছ। লোকটার বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য তোমার নজরে পড়েছে কি? মনে করবার চেষ্টা কর তো।'

ছোকরা ভূতের চোখ দুটো কুঁচকে গেল। খানিক ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক তেমন কিছু...হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, লোকটার মাথায় লাল রঙের হনুমান টুপি ছিল একটা। উইন্ডচিটারের পিঠের দিকে মাঝ বরাবর সাদা স্ট্রাইপ ছিল। স্ট্রাইপের মাঝখানে ইংরেজিতে লেখা ছিল টাইগার!...'

—'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' রামুর চোখ হঠাৎ কপালে উঠে গেল, 'লাল হনুনান টুপি! উইন্ডচিটারে ইংরেজিতে টাইগার লেখা! মনে হচ্ছে লোকটাকে আমি চিনতে পারছি!'

উত্তেজনায় সর্দারের গলা দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে এল, 'লোকটা কে রামু?' সর্দারের কথার কোনো জবাব না দিয়ে রামু পৈশাচিকভাবে হেসে উঠল। হাসি থামতে না থামতেই চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুল যেন, 'শয়তানের শয়তানিটা ঘোচাই তারপর বলব লোকটা কোন হরিদাস!'

দু'দিন নিরুদ্দেশ থাকার পর রাতদুপুরে রামু আবার তেপান্তরের মাঠে ফিরে এল। এসেই মাঠ কাঁপিয়ে তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি শুনে চারিদিক থেকে অশরীরীরা সব কাজকর্ম ফেলে পঙ্গপালের মতো ছুটে এল। চ্যাংড়া মামদোটা ভাবল, রামুর কমেডির কেরামতি এবার শুরু হয়ে গেল বোধহয়। সে দুদ্দাড় পায়ে ছুটে এসে ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায় কী? সবাইকে ভিড় জমাতে দেখে হাসি থামিয়ে রামু হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই হাসি এই কান্না। রামুকে কাঁদতে দেখে ভূতেরা সব অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। সর্দার অধৈর্য হয়ে পড়ল, 'এবার তোমার দুঃখুটা কী রামু? বেশ তো হাসছিলে, হঠাৎ আবার কান্না কেন!'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে রামু বলল, 'বন্ধুকে মেরে কে কবে হাসতে পেরেছে সর্দার।'

সর্দার হাঁ হয়ে গেল, 'মানে!'

রামু চোখ মুছল, 'ধাক্কাটা কে মেরেছিল জানেন—আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু কমেডিয়ান অরুণ ঘোষ! আমায় পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে কমেডি জগতের একচ্ছত্র সম্রাট হতে চেয়েছিল সে। সব কিছু ঠিকঠাকও হয়েছিল কিন্তু লাল হনুমান টুপি আর টাইগার লেখা উইন্ডচিটারটাই গণ্ডগোল পাকিয়ে দিল! খুন হওয়ার একঘণ্টা আগে অরুণ ঘোষকে ওই পোশাকেই আমি দেখেছিলাম কিনা! একদিন ওর জন্য আমি কী না করেছি। কত রোল নিজে না করে ওকে দিয়ে দিয়েছি। সেই ও কিনা...!

পাজি নচ্ছারটা এখন ছ'তলা শ্রাবন্তী অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু। একুট আগে শ্রাবন্তী অ্যাপার্টমেন্টের ছ'তলার উপর থেকে বদমাশটাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিয়ে এলাম!'

কথা বলা শেষ করে আবার বীভৎসভাবে হেসে উঠল রামু। তার হাসির গমকে তেপান্তরের মাঠঘাট কেঁপে কেঁপে উঠল যেন। গাছের ডালে ডালে বসে থাকা পাখির দল ভয় পেয়ে ঘুমচোখে ডানা ঝাপটে এদিক-সেদিক উড়ে গেল। সবকিছু দেখে হতাশ হয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল চ্যাংড়া মামদো ভূত। এমন হাসি দেখতে মোটেই সে ছুটে আসেনি। যে হাসিতে হাসি পায় না সেটা আবার কমেডি নাকি! সে তো যন্ত্রণা!

অগ্রহায়ণ ১৪১৩

স্বর্ণখনির হত্যা রহস্য

জাহান আরা সিদ্দিকী

গতকাল রাতে এসেছি মেলবোর্নে। হোটেলে যখন প্রবেশ করলাম তখন রাত বেশ গভীর। ইচ্ছে ছিল আজই সব দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়ে রাখব। কিন্তু এত রাতে আর সেটা করার উপায় নেই। হোটেলের ট্যুরিস্ট ডেস্ক বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই। ভাবলাম, কাল ভোরে উঠে বরং এ নিয়ে খোঁজ নেওয়া যাবে।

জাঁকিয়ে শীত পড়ার কারণে কিংবা শ্রান্তির ভারেই হোক না কেন, সারারাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। যখন চোখ খুললাম ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সকাল ন'টা। হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তাপানি খেয়ে হোটেল লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। তারপর হোটেলের ট্যুরিস্ট গাইড ঘেঁটে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে শুরু করলাম। দেখি সব ট্যুরিস্ট বাসই সকালে সুনির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করে ফেলেছে। আমি হতাশ মনে চিন্তা করতে থাকলাম, কী করি। অযথা হোটেলে বসে সময় অপচয় করার অর্থ নেই। গাইডে দেখা যাচ্ছে আশে-পাশে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট স্পট রয়েছে। কোনদিকে যাব বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হোটেলের লোকজনের সঙ্গে আলাপ করলাম। একজন বলল, মিঃ হারুন, আপনি কি কখনও সোনার খনি দেখেছেন?

তার পাশের জন বলল, অস্ট্রেলিয়ায় লোকজন আসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে। সোনার খনি দেখে ওনার কী লাভ? আমি বললাম, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমি দেখেছি। এখানেও গোল্ড কোস্টের অসাধারণ সব দৃশ্য দেখা হয়ে গেছে।

আপনি এসব জায়গা ঘুরে এসেছেন তা বলবেন তো?

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আমি আগ্রহী, কিন্তু সোনার খনি যখন কোনোদিন দেখা হয়নি, ওটাই বরং আগে দেখে ফেলি। কাল না হয় অন্যান্য স্পট দেখা যাবে।

সোনার খনিটা কিন্তু বেশ একটা দেখবার মতো জায়গা। কতকাল আগে মানুষ কীভাবে খনি থেকে সোনা ওঠাত সেসব এখনও সংরক্ষণ করা আছে। ওখানে প্রতিদিনই অজস্র ট্যুরিস্ট দেখতে যাচ্ছে।

আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল। বললাম, আমি তাহলে সেখানেই যাই।

একটু আগেভাগে লাঞ্চ সেরে ট্যাক্সি নিয়ে যাত্রা করলাম। পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় বিকেল, ততক্ষণে ট্যুরিস্টের দল সব চলে যেতে শুরু করেছে। সন্ধ্যের আগেই খনির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতদূর এসেও অল্পের জন্য খনি দেখার সুযোগটা হারালাম। চুপচাপ রুক্ষ চত্বরটাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ অঞ্চলটায় গাছপালা তেমন নেই, বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বহুকাল আগে এখান থেকে সোনা আহরণ করা হত ভাবতে গিয়ে অবাক লাগল। খনিটা এখন পরিত্যক্ত। তবে খনির ভেতরটা নাকি আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। বিভিন্ন দেশের ট্যুরিস্টরা দল বেঁধে এসে দেখে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভাবলাম, এতদূর যখন এসেছি তখন জায়গাটা অন্তত ঘুরে ফিরে দেখে যাই। একটা বড়সড় গাছের নীচে হেলান দিয়ে বসলাম। পায়ের নীচের মাটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নুড়িপাথর যুক্ত। কোনটা খনি বাইরে থেকে বোঝা যায় না। একটা অংশ দেখতে অনেকটা উঁচু ঢিবির মতো। শুনলাম ওটাই খনি। এক জায়গায় ছোট একটা গুহামুখের

মতো, ওটাই প্রবেশপথ, অথচ আমার ধারণা ছিল বড়সড় পাহাড়ের ভেতর সোনার খনিগুলো থাকে। সূর্য পশ্চিম আকাশে একটা টিলার পেছনে অস্ত গেল। অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছিল, আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার ফিরতি যাত্রা করতে হয়। ক'পা এগিয়েছি, সামনে বিশালদেহী একটা লোক এসে দাঁড়াল। আমার দিকে সামান্য ঝুঁকে জিগ্যেস করল, আপনি কি এ অঞ্চলে নতুন এলেন?

ঘাড় হেলিয়ে বললাম, হ্যাঁ।

সন্ধ্যার পরও এখানে আছেন, আপনার সাহস তো কম না।

কেন সন্ধ্যের পর এখানে কিসের ভয়?

লোকটা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বুঝেছি, এ অঞ্চল সম্পর্কে কেউ আপনাকে সাবধান করে দেয়নি।

এখানে খুন-খারাপি হয় নাকি?

এক সময় হত।

জিগ্যেস করলাম, কত বছর আগে?

বহু বছর আগে।

তাহলে এখন ভয় পাব কেন?

লোকটা ফিস ফিস করে বলল, আপনি প্রেতাত্মাদের কথা জানেন না?

এ কথা কেন জিগ্যেস করছেন বলুন তো।

মশাই, সাধে কি আর বলছি, ভূতের উপদ্রবে এ অঞ্চলে টেঁকা যাচ্ছে না। কে মানুষ, আর কে ভূত বোঝা কঠিন।

আমি সশব্দে হেসে ফেললাম। লোকটা আমার হাসি দেখে মুখটা গম্ভীর করে বলল, এটা কি হাসির কথা হল?

আমার কথায় সে নারাজ হয়েছে মনে হতে লজ্জিত হয়ে বললাম, সরি, আসলে আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করি না তো। সেজন্য হঠাৎ ভূতের কথা শুনে হাসি পেয়ে গেল।

ভূতে বিশ্বাস করেন না আপনি, এটা কোনো কথা হল? ভূত না থাকলে পৃথিবীতে এত অজস্র ভূতের কাহিনি হল কিভাবে শুনি!

ওসব মনগড়া গল্প। শুনতে ভালো লাগে। তাই লোকে বানায়।

লোকটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল আমার দিকে। হাতটা নেড়ে বলল, তবে শুনুন, আমিও বলে রাখছি, এ অঞ্চলে যখন এসেছেন, ভূতের দেখা না পেয়ে আপনি ফিরতে পারবেন না।

হেসে বললাম, দেখা পেলেও তো চিনতে পারব না।

কেন?

এই যে আপনি বললেন, মানুষ আর ভূত চেনা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

লোকটা আমার কথা শুনে হাসতে থাকল। আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। আশপাশটা হঠাৎ করেই যেন জনমানবশূন্য হয়ে গেছে। যেসব ট্যুরিস্ট আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল তাদের কাউকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই। ট্যাক্সিটা বেশ খানিকটা দূরে দাঁড় করানো আছে। তাড়াতাড়ি না গেলে অন্ধকারে খুঁজে পেতে অসুবিধা হতে পারে। বললাম, এবার তাহলে আসি।

লোকটা সবিস্ময়ে বলল, সে কি, এতদূরে এসেছেন, খনিটা না দেখেই ফিরে যাবেন—এ কী করে হয়!

আমি একটু অবাক হলাম, লোকটা কি আমার গতিবিধির উপর নজর রাখছিল নাকি? ও

কীভাবে জানল আমি দূর থেকে এসেছি? অবশ্য ট্যাক্সি করে এসেছি, দেখতে ভিনদেশীর মতো, অনুমান করা সহজ। আমি যে শেষ মুহূর্তে এসে খনিটা দেখতে পাইনি সেটাও আমাকে ভালোমতো লক্ষ করেছিল বলেই নিশ্চয় এতটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারল।

বললাম, খনির গেটটা তো তালা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে।

তাতে কী, আমার কাছে চাবি আছে।

ও আপনি বুঝি এখানে কাজ করেন?

লোকটা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, চলুন তাড়াতাড়ি দেখিয়ে আনি। কেউ দেখে ফেললে আর যাওয়া যাবে না।

লোকটা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাইরের প্রকৃতিতে ম্লান আলো থাকলেও খনির ভেতর নিকষ কালো অন্ধকার। সামান্য পথ ঢুকেই হাতের টর্চ জ্বালিয়ে সে আমাকে তার পিছু পিছু নিয়ে চলল। ভেতরে ঢুকে আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। এ যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছি। সরু পায়ে চলা পথ, অনেকটা টানেলের মতো, যতই যাচ্ছি টানেল যেন আর ফুরোচ্ছে না। টানেলের পাশে অমসৃণ পাথুরে দেওয়াল। সুড়ঙ্গ পথ বিভিন্ন দিকে ছড়ানো। একটি জায়গায় গিয়ে সে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, এই দেখুন, এখানে সোনা লেগে রয়েছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি সত্যি খানিকটা সোনালি বস্তু পাথরের মধ্যে লেগে আছে। সোনা যে এভাবে পাথরের মাঝে পাওয়া যায় এ ছিল আমার ধারণারও বাইরে। এরকম বেশ কিছু সোনার ছোট্ট ছোট্ট পিণ্ড পাথরের মধ্যে আটকে থাকা অবস্থায় দেখলাম।

খানিকদূর যেতে চোখে পড়ল দেওয়ালের খাঁজে রাখা জ্বলন্ত মোমবাতি। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, এখানে এটা কেন?

ভূমিকম্প হলে সতর্ক করার জন্য এভাবে জ্বলন্ত মোমবাতি রাখা হয়।

সরি, বুঝতে পারলাম না।

যদি মোমবাতির শিখাটা হেলেদুলে এদিক-ওদিক যেতে থাকে তবে বুঝতে হবে মৃদু ভূ-কম্পন শুরু হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেত বাজিয়ে খনির শ্রমিকদের চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এখানে ভূমিকম্প হয়?

হ্যাঁ।

আমার হঠাৎ যেন দমবন্ধ হয়ে এল। এই পাতালপুরীতে চারিদিকের বন্ধ পরিবেশে হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হলে কী হবে? মাথার উপর থেকে পাথর পড়ে নিশ্চয় এখানেই জীবন্ত সমাধিস্থ হতে হবে। একই সঙ্গে আর একটা ভয় মনের মধ্যে জন্ম নিল, হঠাৎ যদি পথ হারিয়ে যায়? গলির দু'জায়গায় সতর্কবাণী লেখা, ভুলেও কেউ যেন ও পথে না যায়। জিগ্যেস করলাম, ওদিকে বিপদসঙ্কেত দেওয়া আছে কেন?

তাহলে তো বিরাট এক ইতিহাস বলতে হয়।

কিসের ইতিহাস?

কতগুলো খুনের।

আঁতকে উঠলাম আমি। এ কী বলছে লোকটা! খুন হয়েছিল নাকি এ জায়গায়! মাটির নীচে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে খুনের কথা শুনে এমনিতেই ভয় লাগছিল, ঠিক এসময় লোকটার হাতে ধরা টর্চটা দপ করে নিভে গেল। আমি কাঁপা কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলাম, টর্চটা নিভে গেল যে, এখন আমরা ফিরব কীভাবে?

অন্ধকারে লোকটা কর্কশ গলায় হেসে উঠল। কী বিশ্রী রকমের হাসি! শরীরের ভেতর যেন কাঁপুনি ধরে যায়। হাসি থামিয়ে সে আমুদে গলায় জিগ্যেস করল, ভয় পেলে নাকি?

বুঝলাম আমি ভয় পেলে সে আনন্দ পাবে। ইচ্ছে করে ভয় প্রকাশ না করে বললাম, ভয় পাব কেন? ফিরব কীভাবে তাই ভাবছিলাম।

লোকটা অভয় দিয়ে বলল, ভয় নেই। আমি ইচ্ছে করে টর্চটা বন্ধ করে দিয়েছি, ব্যাটারি খরচ হয়ে যাচ্ছে তো। গল্প-টল্প সেরে ফেরবার সময় আবার জ্বালিয়ে দেব।

এই গাঢ় অন্ধকারে অচেনা লোকটার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে খুনের গল্প শোনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আমার। কিন্তু আমার মনের অবস্থাটা টের পেলে ও হয়তো ইচ্ছে করেই দেরি করবে ভেবে মুখে সাহস টেনে জিগ্যেস করলাম, কে খুন হয়েছিল এখানে?

একটা নয়, কয়েকটা খুন হয়েছিল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। ঐ যে সুড়ঙ্গ পথটা দেখলে ওটা ধীরে ধীরে ভূ-গর্ভের বহু নীচে নেমে গেছে। ওদিকের সুড়ঙ্গ পথটা যেমন দুর্গম তেমনি ভয়াবহ। ভেতরে ঢুকলে ভূমিকম্পের সময় বেরিয়ে আসা কঠিন।

ওখানে প্রচুর সোনা মিলত বুঝি? নইলে এত রিস্ক নিয়ে......

ঠিক ধরেছ। সবচাইতে বড় সোনার পিণ্ডটা ওখানকার সুড়ঙ্গের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। ফলে যা হবার তাই হল। জীবনের রিস্ক নিয়ে ওখান থেকে সোনা আহরণের কাজ চলছিল। কিন্তু বেশি দিন সেটা সম্ভব হল না। উপর থেকে পাথর ধসে পড়ল। সুড়ঙ্গের ভেতর বিশাল গহ্বর দেখা দিল। জল চুঁইয়ে ও জায়গাটা দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। খনি কর্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হয়েই ওদিকটা বন্ধ করে দিল। এসময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সুড়ঙ্গে শ্রমিকরা কাজ করছে এমন সময় একটা উৎকট দুর্গন্ধ তাদের নাকে এসে লাগল। মনে হল পচা কিছুর গন্ধ। সবাই মিলে খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করল, দুর্গন্ধটা আসছে ঔ বিশাল গহ্বরের দিক থেকে।

একজন শ্রমিক কৌতূহলভরে ঐ সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে গিয়ে নীচে উঁকি দিল। তারপরই সে চিৎকার করে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। গহ্বরের জলে সে নাকি তার সহকর্মীর মৃতদেহ ভাসতে দেখেছে।

পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করল। প্রথমে অনেকেই ভেবেছিল শ্রমিকটা হয়তো মাতাল অবস্থায় ভুল পথে গিয়ে জলে ডুবে মরেছে। কেউ কেউ আবার ভাবল, জীবনযন্ত্রণা এড়াতে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার জন্য ঐ জায়গাটা সে বেছে নিয়েছে। কিন্তু পুলিশের মনে সন্দেহ জাগল। তারা তদন্ত শুরু করল। মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা গেল শ্রমিকটিকে গলা টিপে হত্যা করে তারপর খাদের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এও জানা গেল মৃত ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় ছিল। তার পেটে ধুতুরার বিষও মিলল। ধারণা করা হল যে, অধিক পরিমাণ ধুতুরা মিশ্রিত মদ্যপানের পর শ্রমিকটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সেসময় শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি তাকে গলা টিপে হত্যা করে ঐ জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে।

এতটুকু বলার পর লোকটা থামল। এতক্ষণ আমি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে আসছিল। কী সর্বনাশ, এই গভীর অন্ধকারে আমরা পথ চলতে গিয়ে ঐরকম কোনো খাদে পড়ে যাব না তো? আমার সঙ্গীটিকে ভরসা কী! সে যদি আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়? এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এমনিতেই দমটা প্রায় আটকে আসছে, তার উপর এই খুনের কাহিনি। আমার শরীরের লোমগুলো যেন কাঁটা দিয়ে উঠছে। এখন আর আমার খুনের কাহিনি শোনার দিকে মন নেই। কী করে এখান থেকে বের হওয়া যায় সে ফন্দি আঁটতে থাকলাম।

লোকটা আমার সাড়াশব্দ না পেয়েই বোধ করি বলল, শুনছ?

বললাম, হ্যাঁ, বেশ ইন্টারেস্টিং। লোকটাকে সম্ভবত গল্প বলার নেশা পেয়ে বসেছে। আপনমনে সে বলতে থাকল, এর দু'মাস পর আবার একই ঘটনা ঘটল।

আবার একজন খুন হল নাকি?

ঠিক তাই। শ্রমিকরা উৎকট দুর্গন্ধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সে জায়গায় গিয়ে হাজির হল। দেখল সেই একই দৃশ্য। এবারও একজন সোনার খনির শ্রমিকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, তারপর?

এরকম আরও দু'দুটো খুন হল।

বল কী, হত্যাকারী ধরা পড়ল না?

লোকটার কণ্ঠস্বর এবার করুণ শোনাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বেচারা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কাকে তুমি বেচারা বলছ?

হত্যাকারীকে। শোনো, সে তো আর শখ করে হত্যা করত না। তার মাথার দোষ ছিল। ক'জন হত্যাকারী সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলো? মাথার দোষ থাকে বলেই তো ওদের খুনের নেশা চেপে বসে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কী করে এরকম একজন নিষ্ঠুর হত্যাকারীর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারলে?

সে বেচারীকেও তো নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে হয়েছিল।

এই প্রথম আমার ভয়ের চাইতেও কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল। জিগ্যেস করলাম, কীভাবে খুন হল সে?

শোন, খুনগুলো করত এই খনির দারোয়ান। তার হাতে খনিতে ঢোকার চাবিটা থাকত। রাতে যখন সবাই চলে যেত, সে তখন কোনো একজন শ্রমিকের সঙ্গে খনির কাছে আড্ডা মারতে মারতে তাকে মদ খাওয়াতো। মদের মধ্যে মেশানো থাকত ধুতুরার বিষ। লোকটা যখন অচেতন হয়ে পড়ত সে তখন তাকে খনির ভেতরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ গর্তের পাশে গলা টিপে খুন করত। একদিন সে যথারীতি এক শ্রমিকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে মদ্যপান করিয়ে জলভর্তি গর্তটার কাছে নিয়ে গেল। টর্চের মৃদু আলোয় খনির ভেতরের অন্ধকারে তাকে গলা টিপে ধরতে যাবে ঠিক তখনই লোকটা হঠাৎ চোখ খুলে হো হো করে হেসে উঠল। এবার হত্যাকারী ভয় পেয়ে গেল। লোকটা উঠে বসে পকেট থেকে পিস্তল বের করে ওকে বলল, সোজা হাত তোল।

হত্যাকারী দু'হাত উপরে তুলে হতভম্ব হয়ে জিগ্যেস করল, কে তুমি?

আমি গোয়েন্দা পুলিশ। তোমাকে আমাদের আগেই সন্দেহ হয়েছিল। খনির মধ্যে দিনের আলোয় কাউকে নিয়ে গিয়ে একবার খুন করা যেতে পারে কিন্তু বারবার এটা সম্ভব না। শ্রমিকরা সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। তখনই আমাদের সন্দেহ হল রাতে কেউ এ কাজ করছে। প্রশ্ন জাগল কার পক্ষে এটা করা সম্ভব? উত্তর মিলল, এমন কেউ একজন যার হাতে খনির চাবি আছে। তখন আমাকে এখানে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা হল। আমিই উদ্যোগী হয়ে তোমার সঙ্গে খাতির পাতালাম। তুমি যখন আমাকে মদ খাবার প্রস্তাব দিলে তখন আমি বুঝলাম শিকার আমার হাতে আসছে। আমি মদ খাবার ভান করে তোমার অজ্ঞাতে সেটা ফেলে দিয়েছিলাম। অন্ধকারের ভেতর তুমি বুঝতেও পারনি। তারপর অজ্ঞান হবার ভান করে পড়ে থাকলাম। জানতাম তুমি আমাকে টেনে হিঁচড়ে এখানে এনে খুন করার চেষ্টা করবে।

খুনি হতবাক হয়ে পুলিশটার কথাগুলো শুনছিল। এবার সে বুঝল তার আর মুক্তি নেই। হয় সারাটা জীবন তাকে কারাগারের মধ্যে পচতে হবে নয়তো তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে মেরে ফেলা হবে। ভয়ে-আতঙ্কে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে উল্টোদিকে দৌড় দিল। তারপর যা হবার তাই হল।ঐ জলভর্তি গর্তের ভেতর তলিয়ে গেল তার দেহটা।

লোকটা এতটুকু বলে হঠাৎ করে চুপ করে গেল। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আচমকা আমার

মাথায় দ্রুত একটা চিন্তা খেলে গেল। এ লোকটি কে? সে এত কথা কীভাবে জানল? ওর বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে পুরো দৃশ্যটাই যেন সে চোখের সামনে দেখেছে। একথা ভাবতেই আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। সবচাইতে বড় কথা এতবড় সোনার পিণ্ড কী করে পাথরের মধ্যে এখনো রয়ে গেছে? এগুলো নিশ্চয়ই মহামূল্যবান, এভাবে এখানে কেউ ফেলে রেখে যাবে না। তবে? এ লোকটা এমন ভাবে কথা বলছে যেন ক'দিন আগের ঘটনা এসব। কিন্তু এ তো বহুকাল আগের পুরনো খনি, বহু বছর এখান থেকে আর সোনা তোলা হয় না। এ কি তবে.....কী সর্বনাশ, কার সঙ্গে খনির ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি! লোকটি কি আমার বুকের কাঁপুনি বুঝতে পারছে?

বিদকুটে হাসি দিয়ে লোকটা বলল, কি, চুপ করে আছ কেন? ভয় পেয়েছ বুঝি?

বললাম, চলো এবার বাইরে যাই।

এত কষ্ট করে তোমাকে জলভর্তি গর্তটার কাছে এনেছি কি ছেড়ে দেবার জন্য? কতকাল আমি একটা খুনও করতে পারিনি। রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে আছি।

আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলাম, কে, কে তুমি?

হঠাৎ লোকটার হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল। অন্ধকার সুড়ঙ্গে সে আলো একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। আর সে আলোতে দেখলাম রক্তাক্ত বীভৎস চেহারার লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি আর্তনাদ করে উল্টোদিকে ছুটতে থাকলাম। অন্ধকার সুড়ঙ্গে কোথায় যাচ্ছি জানি না, শুধু জানি চিৎকার করে ছুটছি আর ছুটছি। খানিক দূরে মৃদু আলোয় একজনকে দেখলাম। ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু ভালোমতো তাকাতেই দেখি সামনে দাঁড়ানো সেই রক্তাক্ত মানুষটাই। মুখে বিকৃত হাসি, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

আমার আর কিছু মনে নেই। কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম জানি না। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছি, মাথার উপর টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দুজন মানুষ উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে ছিল। এদের একজন আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার। সে আমার মুখে জল ছিটাচ্ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চাইলে ওরা বাধা দিয়ে বলল, আপনি শুয়ে থাকুন। শরীর এখনও দুর্বল।

সত্যিই শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। চোখ দুটো বন্ধ করলাম, ওদের দুজনের কথোপকথন কানে এল। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, অচেনা মানুষ পথ-ঘাট চেনে না, রাত বাড়তে থাকল তবু ফিরে এল না, তখনই আমার সন্দেহ হল নিশ্চয় কোনো বিপদ হয়েছে।

আমাকে খবরটা দিয়ে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। খনির মুখে খোলা তালা দেখেই আমার মনে খটকা জেগেছিল। এর আগেও এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছিল। সে ভদ্রলোক হার্ট অ্যাটাকে মারাই গিয়েছিলেন। শুনেছি ভিনদেশী কাউকে পেলে এখানকার সিরিয়াল কিলারের আত্মাটা বিভিন্ন ছলে তাকে এই খনির ভেতর এনে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর কানে এল, ভাগ্য ভালো আমরা ঠিক সময় এসে ওঁকে উদ্ধার করতে পেরেছি।

শারদীয়া ১৪১১

জামু কি ভূত ছিল

পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

যীশু এই বছরেই ক্লাস সেভেনে উঠেছে। এখনও নতুন বছরের ক্লাস শুরু হয়নি। ঠিক দুপুরবেলা, সাধারণত যখন ভূতে মারে ঢিল, সময়টা সেই রকমই। মা ঘরে ভাতঘুমে ডুব দিয়েছে। বড়দি একমনে কাগজ থেকে শব্দজব্দ সমাধান করছে। এই সুযোগেই যীশু বাড়ির পেছনে বাগানটায় এসে ঢুকেছে। আসলে, উদ্দেশ্যটা গুলতি প্র্যাকটিস করা। গুলতি চালিয়ে আম পাড়া, জামরুল পাড়া, পেয়ারা পাড়া এসব করতে ওস্তাদ।

হঠাৎ কোথায় যে কী হল, শূন্য থেকে ওর চারিদিকে ঢিল পড়তে শুরু করল। সামনে, পেছনে, ডানদিকে, বাঁদিকে, সরবার কোনো উপায় নেই। স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যীশু। আশ্চর্য কেউ কোথাও নেই। তবে ঢিল আসছে কোথা থেকে!

থম মারা ভাবটা কাটতেই যীশুর মনে হল, শূন্যে গুলতি চালালে কেমন হয়! যা ভাবা তাই কাজ। গুলতি চালাল। গুলিটা ঠকাস করে শব্দ করে নীচে পড়ে গেল। বোঝা গেল কিছুতে লেগেছে। কিন্তু কিসে লাগল? যীশু ভূতে খুব একটা বিশ্বাস করে না। আবার ঠিক অবিশ্বাসও করতে পারে না। ঠাকুমার কাছে শুনেছিল সত্যি ভূতের গপ্পো। ঠাকুমা মিথ্যে বলেছিলেন বলে তো মনে হয় না। দাদু সুরাট থেকে ফিরে এলেন। হিরে পেলেন না। সে বারেই নাকি সুরাটে খুব প্লেগ হয়েছিল। দাদুর সঙ্গে মেজকাও গিয়েছিল। তখন ওঁরা হুগলির ঝাঁপানডাঙায় থাকতেন। ট্রেন লেট করায় নাকি অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সব অন্ধকার। তার ওপর ঝেঁপে বৃষ্টি। বাপ-ছেলেতে কী আর করে, স্টেশনে নেমে ঠায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দাদুকে ডাকল পানু পিওন। পাড়ায় চেনা লোক। বললে, 'কী বীরেনদা, দাঁড়িয়ে যে? এই বৃষ্টি আর অন্ধকারে সময় নষ্ট করছেন?' ছাতা ধরে টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে সে নাকি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। গভীর রাতে দাদুকে আর মেজকাকে আসতে দেখে ঠাকুমা জিগ্যেস করেছিলেন, অত রাতে ওঁরা এলেন কীভাবে! দাদু সরলভাবে জবাব দিয়েছিলেন। সুরাটে হিরে কেনা হয়নি। প্লেগ দেখে চলে এসেছিলেন। তবে স্টেশন থেকে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি। পানু পিওন পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমা নাকি কিছু না বলে দরজা এঁটে দিয়ে দাদুকে শুয়ে পড়তে বলেছিলেন। পরদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দাদুর দেখা হয়েছিল পানুর ছেলে পার্থর সঙ্গে, ওর মাথা ন্যাড়া। বলেছিল, সেদিন নাকি ওর বাবার শ্রাদ্ধ। দাদু বাড়ি ফিরে চুপ করে বসেছিলেন একটানা ছ'ঘণ্টা। কান যা শুনল, চোখ যা দেখেছিল, মেলাতে পারছিলেন না। তবে এসব তো রাত্তিরে ঘটেছিল। কিন্তু এখন ভরদুপুরে এসব ঢিল কোথা থেকে আসছে!

একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠল। ধুলোর চোটে চোখ বুজে ফেলল যীশু। হাওয়া যখন থামল, ওর হাতের গুলতিটা পেয়ারা গাছে ঝুলছে। একটা খিক খিক হাসির শব্দ আসছে মাথার ওপর থেকে। তবে কি এবার ভূতের পাল্লাতেই পড়ল! তাও এই দিনের আলোয়! যদি সত্যি ভূত হয় ঘাড়ে ঝাঁপাতেও পারে। যাই হোক ভূতকে ভূতের মতন ভাবাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। পি. সি. সরকার এখানে নেই। জাদু তো নয়, বলা যায় না শূন্য থেকে গাঁট্টা কষাতেও পারে। দৌড় করাতেও পারে। দেখা না গেলে, এটাই তো মুশকিল। উঃ! খটা খট গাঁট্টা মারতে থাকলে মাথা আলু হয়ে যাবে।

হাতের গুলতিটাও নেই। একাট সিনেমা দেখেছিল। সেখানে একটা লোককে গাঁট্টা মেরে মেরে দৌড় করাত ভূত। লোকটা থামলেই গাঁট্টা খেত।

সাত-পাঁচ সম্ভাবনার কথা যখন ভাবছে, বিস্মিত হয়ে দেখল, বিশাল উঁচু জামগাছ থেকে জাম উড়ে যাচ্ছে। বীচিগুলো নীচে পড়ছে। কেউ একজন বলছে, আঃ, কী মিষ্টি জাম! মনটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দৈববাণীর মতো কেউ শূন্য থেকে বলল, 'তোমার নাম কি যীশু?' মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল সে। যীশু একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করছিল।

'শোন, আমার একটা পাকাপাখি থাকবার জায়গা চাই। এই জামগাছটা আমি নিলাম। এমনি নয়। ভাড়া দেব।'

'মগের মুল্লুক নাকি? কে তুমি জানি না। নিলাম বলেই নিলে? কে ভাড়া দেবে বলেছে তোমায়?' বেশ খানিকটা রেগেই বলল যীশু।

আবার শূন্য থেকে কথা এল, 'আমি সোনা, টাকা, কাপড়-চোপড় যা চাইবে এনে দেব।'

'তোমার হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া তোমাদের মতো ভূতেদের থাকতে দেওয়ার অসুবিধে আছে। বাগান নোংরা করবে। যখন-তখন গাছ থেকে পা ওপর দিক করে ঝুলবে। ভয় দেখাবে। তোমাদের বিশ্বাস নেই। 'সাজানো বাগান' গল্প আমি পড়েছি। ভূতটা গাছের ওপর বসে নীচে পা ঝুলিয়ে দিত থাকা চলবে না। যেই হও ভাগো।'

এবারে কাকুতি-মিনতি ভেসে এল। 'প্লিজ কিছু একটা করো। আমি এখন বাস্তুহারা। বোসেদের বাগানে ছিলাম। আমগাছের মগডালে বসে আম খাচ্ছিলাম। দেখে ফেলল। ব্যস, ভূতের বাগান বলে বেচে দিল। প্রোমোটার গাছপালা কেটে বাড়ি তুলল। আমাকে পালাতে হল।'

যীশুর খুব দুঃখ হয়। আহা রে ভূত বলে কি মানুষ নয়! কত সরল ওরা। নাপিতের আয়না দেখে ভাবে ভেতরে ভূত বন্দি করা আছে। সেই ভয়ে নাপিতের সব কাজ করে দেয়। বেশ কিছুক্ষণ ভাবল যীশু, তারপর বলল, 'তোমার চেহারাটা না দেখালে কিছু হবে না।' ভূত বলে, 'আমাদের শরীর নেই, তবে হ্যাঁ তৈরি করে নিতে পারি।' বলেই সামনে ঝুপ করে ওপর থেকে প্যাংলা মার্কা একটা লোক আবির্ভূত হল। চোখ দুটোর একটা ওপরে, একটা নীচে। কান নেই, মাথায় চুল নেই। যীশু রেগে বলল, 'এঃ! তুমি এত বাজে কেন?' ভূতটা বলে, 'শরীরের জিনিসগুলো তাড়াতাড়িতে ঠিক ফিট করা হয়নি।' হাত দিয়ে চোখ, নাক, দাঁত সব সেট করে নিল।

যীশু প্রস্তাব দিল, 'একটা শর্তে তোমাকে থাকতে দিতে পারি। ক্যারাম খেলায় আমি হেরো। রোজ গো-হারান হেরে যাই টিঙ্কু মাসি আর ছোড়দির কাছে। এমন ব্যবস্থা চাই, আমি যেন জিতে যাই।' ভূতটা হি হি করে হাসতে লাগল, 'এ আর এমন কী! হবে, হবে, তুমি জিতে যাবে।' যীশু বলল, 'তোমার এই বদ্‌খত চেহারাটা কাউকে দেখিও না। দেখলে মনে হয় পুরোনো ক্ষত হয়ে যাওয়া মূর্তির মতো।' বলতেই মূর্তিটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সন্ধে হতেই যীশু দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল মাসি আর ছোড়দিকে। একটু অবাক হল দুজনেই। যীশু একাই দু'হাত খেলবে বলল। ছোড়দি মিটিমিটি হাসছিল। মাসিকে চোখ টিপল। রেজাল্ট তো জানাই আছে।

খেলা শুরু হল। যীশুকেই হিট করতে বলল মাসি। যীশু হিট করল। কী অদ্ভুত ব্যাপার, স্ট্রাইকার থামেই না। এঁকেবেঁকে ঘুঁটিগুলো এক এক করে পকেটে পড়ে যেতে থাকল। সাপের মতো স্ট্রাইকার চলে নাকি রে বাবা! মাসির মুখ সেই যে হাঁ হয়ে গেছে, বন্ধই হচ্ছে না। ছোড়দির মাথা ঘুরছে। এ যে ভূতুড়ে ব্যাপার। যীশু মুখটা গম্ভীর করে বলল, 'কেন, আমার জেতা দেখে ভিরমি খেলে নাকি!' মনে মনে খুব হাসছিল যীশু। আসল কথাটা খোলতাই না হওয়াই ভালো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, দুপুরের দেখা চেহারাটা হাত নাড়ছে। যীশু ধন্যবাদ দিল। ভূতটা বলল, 'আমি

জামগাছে থাকলাম।' যীশু ঠিক করল ওকে জামুদা বলে ডাকবে। তবে গুলতিটা এখনও গাছে ঝুলছে। ফেরত পায়নি।

রাতে খাওয়ার পর যীশু ওর নিজের পড়ার ঘরে চলে গেল। একপাশে ওর খাট, দেওয়ালে লাগানো টেবিল। হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল। ঝুপ্পুস অন্ধকার। যীশু টর্চটা খুঁজে পেল না। একটা কীরকম গা ছমছম ভাব। ঠান্ডা বাতাস বয়ে গেল। গাটা শিরশির করছে। বুঝতে পারছে না যীশু। একটা পাখার ঝটপট শব্দ শুনল ঘরের মধ্যে। আলমারির মাথায় দুটো নীল বাল্ব জ্বলছে। যীশু নড়তে পারছিল না। তবে কী...। নাঃ, দুপুরের ভুতটা তো ওর বন্ধু হয়ে গেছে। যীশু একদৃষ্টে নীল আলোটার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। ছোড়দির গলা পেল। ইমারজেন্সি ল্যাম্পটা ঘরে আনতেই, আলো। কোথাও কিছু তো নেই! মনে হল, হয়তো মনের ভুল। যীশু মাথা ঘামাল না। ও আলো জ্বালিয়ে রেখেই বিছানায় শুয়ে পড়ল। হঠাৎ বুকের কাছে কী যেন নড়ছে। যীশু তাকিয়ে দেখে সেই লোকটা।

'তুমি এখানে কেন এসেছ?' আস্তে আস্তে জিগ্যেস করে সে। এবার কেমন ভয় ভয় করছিল। দিনের আলোয় দেখা আর রাতের নির্জনে দেখার মধ্যে ফারাক তো আছেই। ছোড়দিকে ডাকতে চাইল। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। লোকটা বলল, 'বাইরে বড্ড মশা, তাই ভেতরে এলাম। তোমার গুলতিটা এনেছি।' গুলতিটা দেখে এবং হাতে পেয়ে যীশু মনে জোর পেল। বালিশের পাশেই একাট ঠোঙায় গুলিগুলো রাখা আছে। যীশু ধমক দিল, 'তাই বলে আমার বিছানায় উঠবে? বেরোও ঘর থেকে। জানো, বাড়ির কেউ টের পেলে কী দশা হবে তোমার! ছোড়দি ক্যাঙারুর মতো লাফাবে। বাবা ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করবে।'

'আমি তোমাকে ক্যারাম খেলায় জিতিয়ে দিয়েছি। বাগান ঝকঝকে করে হাওয়া মেরে সাফ করে দিয়েছি। তবু তুমি তাড়াচ্ছ আমাকে?'

'বেশি কথা বলো না। ভুতেরা মোটেই ঘরে থাকে না জামুদা। আমাকে রাগিও না।'

জামু তাও নড়ে না। দরজায় ধাক্কা দিলেন মা। 'কার সঙ্গে কথা বলছিস রে যীশু?'

'ও কিছু না, নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছি।'

দরজা ধাক্কার শব্দে জামু জানলা দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেল। মা চলে যাওয়া মাত্র আবার ঢুকে পড়ল। যীশু রুলকাঠ দিয়ে মারতে গেল। ডামু ফ্যানের ব্লেড ধরে বন বন করে ঘুরতে লাগল। যীশুকে এবার দাঁত খিঁচোল জামু। গুলতি টিপ করে গুলি ছুঁড়ল যীশু। জামু খাটের ছত্রির ওপর লাফ মেরে ঝুলতে লাগল। বইয়ের আলমারির মাথায় উঠল। ধুন্ধুমার কাণ্ড চলতে থাকল। অবশেষে খাটের তলায় ঢুকল। যীশু ঘর ঝাড়ার পালক লাগানো লাঠিটা দিয়ে খাটের তলায় খোঁচাতে লাগল। জামুর বয়ে গেছে। ও তো হাওয়া হয়ে ঘুরছে তখন। কিন্তু জামু কেঁদে ফেলল যীশুর অমানবিক ব্যবহার দেখে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তোমরা কী ভাব ভূতেরা তোমাদের শত্তুর? ভূতের সিনেমা দেখে দেখে মনে কর যে ভূতেরা সব বদমায়েশ! কেউ কেউ দুষ্টু হতেই পারে। সবাই কি তাই? তোমাদের মধ্যেও তো অনেক মন্দ লোক আছে। তার মানে কি সব মানুষই খারাপ?'

জামুর কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের আলোটা নিভে গেল। সেই নীল আলো দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল। ওপর থেকে নীচে নামতে লাগল। কে যেন যীশুকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে শুইয়ে দিল। জামুর গলা পেল অন্ধকারে, 'খবরদার, এক পাও এগোবে না।' নীল আলো দুটো তীব্র গতিতে একবার বাঁ দিকে একবার ডানদিকে ছুটতে লাগল। যতবার নীচে নামবার চেষ্টা করছে, ঝড়ো বাতাসে ভাসিয়ে যেন ওপরে তুলে দিচ্ছে আলো দুটোকে। যীশু ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্তর উড়ছে। বই উড়ছে, বিছানা উড়ছে। আলমারি দুলছে। একসময় আলো দুটো

জানলা দিয়ে সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল। আবার সব স্বাভাবিক। ঘরটাই শুধু লণ্ডভণ্ড। যীশু দেখল, আলোটা জ্বলে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে জামুকে বলল, 'কী হয়েছিল?' জামু জবাব দিল, 'শুনবে কী হয়েছিল? আশা করি শোনার পরে আর আমায় শত্তুর বলবে না। একটা দস্যু ভূত এসেছিল। তোমার ক্ষতি করত। তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছ তাই। ওকে না আটকালে তোমাদের বাড়িতে ও গ্যাঁট হয়ে বসে যেত।' যীশু বলল, 'ও আসলে কে?' জামু বলল, 'যারা ডাকাত, চোর' মরার পরেও তাদের ভূত তাই-ই থাকে। ওদের থেকে সাবধানে থাকতে হয়। আসলে আমাকে ঢুকতে দেখে পেছন পেছন এসেছিল। আর আসবে না। তুমি তো কারও ক্ষতি করনি। যাই হোক আমি চললাম। সকাল হয়ে এল। এক রাত্তির আশ্রয় দিয়েছিলে তাই ধন্যবাদ।'

চারিদিক নিস্তব্ধ। এখন ভোরবেলার অন্ধকারটা আস্তে আস্তে কাটছে। হঠাৎ যীশুর শরীরটা হাল্কা হয়ে গেল। ও যেন শূন্যে ভাসছে। ঘরের দরজাটা খুলে গেল। যীশু খাটের ছত্রি চেপে থামতে চাইল। পারল না। চারিদিকে শুধু ধোঁয়া। খিক খিক একটা হাসির শব্দ আসছে। ঘুম ভেঙে গেল যীশুর। গুলতিটা বুকের ওপর। 'ওমা, তুই ছাদে শুয়েছিলি কাল রাত্তিরে? যা গরম পড়েছিল। তার ওপর লোডশেডিং। ভালোই করেছিলি। এদিকে কী অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। আমাদের বাগানে কে এক থলে ভর্তি জাম রেখে গেছে। আরও শুনবি? বাগানটা এই সাত সকালে কে ঝকঝকে করে ঝাঁট দিয়ে রেখেছে।' বাবা বললেন, 'আশ্চর্য, কোনো চোর আসেনি তো? জাম নিয়ে পালাতে না পেরে ফেলে গেছে!' যীশু চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হাওয়া নেই। বাতাস নেই। হঠাৎ জামগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল। সবাই চমকে উঠল, মা বললেন, 'একি কাণ্ড রে বাবা!' ছোটকা বলল, 'নিশ্চয়ই পোকা লেগেছে গাছে।' যীশু অবাক হল না। ঠাকুমা অনেকবার বলেছে অশরীরীরা যাবার সময়ে চিহ্ন রেখে যায়। বাবাকে ঠাকুমার ঝুলির গল্প কেউ বলেনি নিশ্চয়ই।

যীশুর হঠাৎ খুব কান্না পেল। আহা রে, জামু এখন কোথায় থাকবে! কেউ দেখলেই তো ওঝা ডেকে মন্ত্র পড়ে ভাগিয়ে দেবে। মানুষ কি ওদের একটুও জায়গা দিতে পারে না? দু'একটা গাছ শুধু ওদের জন্যেই রেখে দিলে ক্ষতি কি। সে সব গাছে ওরা ওদের মতন থাকবে। মানুষকে ডিস্টার্ব না করলেই হল।

অঙ্ক স্যার বলেন, 'ভূত বলে কিছু নেই, সবই কল্পনা আর কুসংস্কার। দুয়ের খিচুড়িতে ভূতের জন্ম।' কিন্তু তাই যদি হবে, তবে জামের থলি কোথা থেকে এল? ক্যারাম খেলায় যীশু জিতল কী করে! বাগানে গাছের একটা মাত্র ডালই বা ভাঙল কেন! তাও অন্য গাছের নয়, জামগাছের!

বড়দির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'ও মা এদিকে এসো, আমাদের শ্বেত পাথরের স্ট্যাচুটা কে ভেঙে দিয়েছে। ইস এত সুন্দর মূর্তিটা!'

'নির্ঘাৎ মূর্তিচোরের কীর্তি।' মন্তব্য করল মাসি। দৌড়ে এল যীশু। ভালো করে খুঁটিয়ে দেখল। চিনতে পারল। ওই তো কালকের জামু। একরকম দেখতে। তবে কী জামু....নাঃ, আর ভাবতে পারছে না যীশু।

কার্ত্তিক ১৪১৮

সুধাংশুবাবুর ছড়ি

সুমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বান্টি দাদুর সঙ্গে হরিশ পার্কে গিয়েছিল বিকালে। যেমন রোজ যায়। গিয়ে ওর বন্ধুদের সঙ্গে খেলে। আর দাদু বসে থাকেন বেঞ্চে। আবার সন্ধ্যে হবার মুখেই দাদুর হাত ধরে টুক্ টুক্ করে বাড়ি ফিরে আসে।

রোজকার মতো আজও গিয়েছিল, তবে ফেরাটা রোজের মতো হলো না।

গরমকাল। ফুরফুরে দখিন বাতাস বইছে। দাদুকে একটা বেঞ্চে বসিয়ে বান্টি ওর বন্ধুদের সঙ্গে 'গদাযুদ্ধ' খেলছিল। বেশ জমেছিল খেলাটা। কিন্তু কখন যে সূর্যটা ডুব মেরেছে তা ওরা খেয়ালই করেনি।

তবে ওদের বাড়ির লোকজনরা ঠিক খেয়াল করেছেন। একে একে সবাইকে খুঁজে খুঁজে যে যার বাড়ির লোক নিয়ে চলে গেলেন। শুধু বান্টির দাদু, সুধাংশুবাবুই খেয়াল করেননি। বান্টি আর কি করে? ফিরে চলল দাদুর কাছে।

কিন্তু ও কি? দাদুর মাথাটা অমন একদিকে হেলে আছে কেন? এক দৌড়ে দাদুর কাছে হাজির হয়ে গেল কেমন একটা ভয় পেয়ে। দাদুর একেবার কাছে যেতেই ওর কানে এল—'ফোঁ-ফোড়ৎ ফোঁ-ফোড়ৎ'। মানে দাদু ঘুমিয়ে কাদা। মিঠে হাওয়ায় আর জেগে থাকতে পারেননি।

সূর্যকে আর দেখতে পাওয়া না গেলেও হরিশ পার্কে এখনও আলো আছে। তবে আবছা মতন। চারদিকে বড় বড় গাছ থাকায় রাস্তার আলোও পার্কের ভেতর তেমন আসতে পারেনি। ডালপাতার ফাঁক গলে টুকরো টুকরো হয়ে কিছুটা ছাড়া। চারদিকে কেমন একটা ছায়া ছায়া মায়াবী পরিবেশ। গাছে গাছে পাখিরা ঘুমোতে যাচ্ছে। হাল্কা একটা আলো দাদুর মুখের ওপর এসে পড়েছে। বান্টি দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। কেমন 'অন্যরকম' যেন মুখটা! বুকটা ধীরে ধীরে উঠছে নামছে। বান্টির মনে হলো দাদুর মুখে হাল্কা হাসির ছোঁয়া। তবে কি দাদু স্বপ্ন দেখছেন?

হঠাৎ কাঁধে একটা হাত পড়তেই বান্টির চমক ভাঙল।

'কি গো, অমন করে কি দেখছো দাদুর মুখের দিকে? দাদু স্বপ্ন দেখছেন কিনা তাই ভাবছো না?'

'হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি। কিন্তু তুমি জানলে কি করে? আর কে-ই বা তুমি?' ভীষণ অবাক বান্টি।

'আমি কে? হি-হি, হি-হি' লোকটা হাসছে।

অদ্ভুত এই আলোছায়া পরিবেশে লোকটাও কেমন যেন ছায়া ছায়া মতো। বান্টি দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু ঠিক যেন স্পষ্ট নয়। লোকটা মানে যাকে অনায়াসে বুড়োই বলা যায়, ওর দাদুর বয়সী। বেঞ্চটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে পাঞ্জাবি, ধুতি। হাতে একটা ছড়ি। ছড়ির মাথাটা চকচক করছে। আর দেখতে ঠিক হাতির মাথার মতো। শুঁড়টা কেমন চমৎকার পাকানো।

বুড়ো লোকটা এবার হাসি থামিয়েছে। বলল, 'আমি হলাম গিয়ে তোমার দাদুর বন্ধু। তোমার বিধুদাদু।'

'তোমায় তো এর আগে কখনও দেখিনি।'

'দেখবে কি করে? আমি তো দেখাই দিইনি।'

বান্টি দাদুকে ডাকে, 'দাদু, দাদু....'

'এই চুপ চুপ, ডেকো না, ডেকো না। দাদু ঘুমোচ্ছে ঘুমুক। বরং এসো আমরা একটু গল্প করি।'

'কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেছে যে। দেরি হলে মা বকবে, আমাকে-দাদুকে—দু'জনকেই। তার চেয়ে বরং চলো, আমাদের বাড়ি চলো।'

'না-না-না, আমি বাড়িটাড়ি যাব না...।'

'কেন! কেন যাবে না?' অবাক বান্টি।

'অসুবিধে আছে। সে তুমি বুঝবে না।'

পার্কের একধারে একটা ছোট্ট মতো স্টলে চপ-কাটলেট-রোল তৈরি হচ্ছে। দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে। বান্টির নাকে সে গন্ধ যেতেই, ও ঐদিকে মুখ ফেরালো।

'তোমার বুঝি খেতে ইচ্ছে করছে?'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমি সব জানতে পারি।' বিধুদাদু মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলতে লাগল—'তুমি কালকে স্কুলে আন্টির হাতে কানমলা খেয়েছো জানি। আর আজ বিকালে পার্কে আসার আগে তোমার মা যে দুধটা তোমায় দিয়েছিল, তার অর্ধেকটা তুমি খেয়েছো আর বাকিটা মিনিকে দিয়ে দিয়েছো। তাও জানি।'

বান্টির চোখ গোল গোল। 'তুমি এসব জানলে কি করে? কোথায় থাকো?'

'তোমাদের বাড়ির কিছুটা দূরে, গঙ্গার একেবারে ধারে যে বাড়িটা আছে, সেটাতেই থাকি।'

'দূর ওটায় আবার কেউ থাকে নাকি? দাদু বলে—ওখানে যত রাজ্যের ভূত থাকে।'

'ঠিকই তো। ভূতই তো থাকে।'

হঠাৎ বিধুদাদু বান্টির হাতে একটা ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'খেয়ে নাও।'

বান্টি দেখল গরম গরম ভেজিটেবল চপ। 'কোথা থেকে পেলে?'

'ঐ দোকানটা থেকে।'

'যাঃ তা কি করে হয়? তুমি তো এখানেই বসে আছো, আর দোকানটা তো ঐ ওখানে, অনেক দূরে।' বান্টি অবাক।

'তাতে কি? আমি ইচ্ছে করলেই হাত লম্বা করতে পারি।'

'করো তো দেখি?' বান্টি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

'দেখবে? কি চাও বলো।'

বান্টি দেখলো উল্টোদিকের ফুটপাথে বারান্দাওলা বাড়িটার সামনে একাট বেলুনওলা। তার কাছে অনেক ভেঁপু আছে।

আঙুল দিয়ে বেলুনওলাটার ভেঁপুগুলো দেখিয়ে ও বলল—'ঐ একটা ভেঁপু দাও তো দেখি।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

এই বলে বান্টির দাদুর বন্ধু, বিধুদাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাতটা কেমন লম্বা হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বান্টি দেখল শূন্যে একাট ভেঁপু ভেসে আসছে। শেষে দেখল বিধুবাবুর হাতে ধরা ভেঁপুটা।

ও তো তাজ্জব। এটা কি সম্ভব!

'তুমি কে? তুমি কি জাদুকর?

'হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ জাদুকর? না-না-না।' মাথা নাড়ে বিধুদাদু।

'তা'লে তুমি এমন কেরামতি করলে কি করে?'

'আমাদের অসাধ্যি কিছু নেই গো দাদুভাই।'

'কিন্তু তোমরা কারা সেটাই তো বলছো না।' বিরক্ত ও।

'তুমি শুনলে ভয় পাবে না?'

'ভয়? ভয় কেন পাবো? বলই না।'

'আমরা হলাম গিয়ে ভূত!'

'ভূত? ওমা তাই নাকি? তুমি ভূত? কি করে হলে?'

'মরে গিয়ে। তোমার ভয় করছে না?'

'কই না তো! ভয় কেন করবে? ঠাম্মার কাছে কত মজার মজার ভূতের গল্প শুনি। তবে শুনেছি ভূতরা নাকি আবার ভয়ঙ্করও হয়। তুমি তো তা নও? কি রকম ভূত তুমি?' ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে বান্টি।

বিধুদাদু জবাব দেয়, 'আমি সাধারণ ভূত।'

'সত্যি! তোমাদের কি মজা! তোমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। আমি বড় হয়ে ভূত হব।'

'ষাট্ ষাট্, তুমি দাদুভাই ভূত হতে যাবে কেন? তুমি ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে।'

'না আমি ভূতই হব। ভূতেদের কত মজা। পড়তে হয় না।'

'ছিঃ ছিঃ, চুপ চুপ, দাদুর ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। শোনো তোমায় একাট কথা বলি', চাপা গলায় বলে বিধুদাদু, 'এই ছড়িটা রইল। এটা তোমার দাদুর ছড়ি। দাদুকে দিয়ে দেবে। সুন্দর দেখতে বলে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরই তো ফট্ করে অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেলুম। তাই আর ফেরত দেয়া হয়ে ওঠেনি।' বেঞ্চিতে ছড়িটা ঝুলিয়ে দিয়ে বললে, 'রইল এখানে। বাড়িতে গিয়ে দাদুকে সব খুলে বলবে, আমি চললুম।'

বান্টি দেখল কেউ কোথাও নেই, শুধু দাদু আর ও নিজে।

হঠাৎ দাদু ধড়মড় করে উঠে বসলেন, 'কি রে কখন সন্ধ্যে হলো? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? আমায় ডাকিসিনি কেন? চল চল বাড়ি চল। এই রে! এ তো বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আজ একচোট হবে'খন। চল চল।' এই বলে বান্টিকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরে গজ্‌গজ্ করতে করতে চললেন।

তাড়াহুড়োয় ছড়ির কথা বেমালুম ভুলে গেল বান্টি।

এদিকে চাটুজ্যে বাড়িতে ভীষণ গোলমাল বেধে গেছে। প্রথমতঃ, বান্টি ও দাদুর দেরি করে বাড়ি ফেরা নিয়ে একপ্রস্থ হৈ হৈ হয়ে গেছে। এর থেকেও বড় ব্যাপার, বান্টি বাড়ি ফিরে উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করে দিয়েছে। বলে কিনা 'আমি ভূত হবই।' ভীষণ জেদ।

বান্টির মা ওর ঠাকুমাকে ডেকে বললেন, 'শুনেছেন আপনার গুণধর নাতির কথা? দেরি করে বাড়ি ফিরে কেমন গপ্পো বানাচ্ছে!'

'কি গপ্পো বানাচ্ছে?' পা ছড়িয়ে পান সাজতে সাজতে ঠাকুমা বললেন, 'কি বলছে?'

'বলে কিনা ওর সঙ্গে নাকি বাবার বন্ধু বিধুদাদুর দেখা হয়েছিল! তিনি তো কবেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, তাই তো।'

'তা'লেই বুঝুন কেমন গপ্পো....'

'না না, আমি মোটেই গল্প বানাইনি।' কোথা থেকে বান্টি এসে হাজির। 'সত্যিই আমার সঙ্গে বিধুদাদুর দেখা হয়েছিল। কত গল্প করলাম। কত কেরামতি দেখাল বিধুদাদু। সব কথা জানে। হাত

কত লম্বা করতে পারে! যঃ! যে ভেঁপুটা দিয়েছিল সেটা ভুলে পার্কেই ফেলে এসেছি। বিশ্বাস করো ঠাম্মা, বিধুদাদু নিজে বলল, 'আমি ভূত!' তবে কি দাদুর বন্ধু মিথ্যেবাদী?'

'তাই তো! অপঘাতে মারা গেছলেন তো, তাই অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াতেও পারেন। বলা কিছু যায় না।'

'কি যে বলেন মা! ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বান্টি নিঘ্‌ঘাত স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে।'

'মোটেই না, আমি স্বপ্ন দেখিনি। সত্যি দেখেছি। সে তুমি যাই বলো, আমি ভূত হবই। কত মজা ওদের! আর ভূতরা কি ভাল। বিধুদাদু কোথায় থাকে জেনে গেছি। একদিন গিয়ে ভূত হবার মন্তরটা শিখে আসবো।'

'মেলা বকিসনি দাদুভাই। খেয়েদেয়ে পড়তে যা। এবার থেকে সন্ধ্যে হবার আগেই বাড়ি ফিরবি। ভূতটুতরা তো তেমন ভাল হয় না, তবে বিধু ঠাকুরপোর অন্য যা দোষ থাকুক, এমনিতে তো ভালমানুষ ছিলেন। তাই কিছু বলেননি। তবু কি দরকার? এখন যাও।'

বান্টি আস্তে আস্তে ঠাম্মার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ ওর ছড়িটার কথা মনে পড়ে গেল। তাই তো! ওটা তো হরিশ পার্কের বেঞ্চেই পড়ে আছে। দাদুকে এখুনি বলা দরকার ব্যাপারটা।

ছড়ির কথা শুনে সুধাংশুবাবু, মানে বান্টির দাদু তো একেবারে হ্যাঁ!

বড় প্রিয় ছিল ছড়িটা। বন্ধু বিধুর যে লোভ ছিল ওটার ওপর তাও জানতেন। একদিন পার্কের বেঞ্চে হেলান দেবার জায়গায় ছড়িটা ঝুলিয়ে রেখে সকালে পায়াচারি করছিলেন। পায়চারি শেষ করে ছড়িটার আর কোনো হদিস পাননি। তবে এখনও সুধাংশুবাবুর স্পষ্ট মনে আছে যে, পায়চারির সময় সেদিন 'কোমরে টান ধরছে' বলে বিধু বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়েছিল। তাই সন্দেহটা বিধুর ওপর গিয়েই পড়েছিল। যতই হোক রুপো দিয়ে তৈরি হাতির মাথাটা। লোভ তো হতেই পারে। আর যেখানে বিধুর হাতটানের কথা সুধাংশুবাবুর ছোটবেলা থেকেই জানা।

তারপর প্রায় সাড়ে চার বছর কেটে গেছে। প্রায় ভুলতে বসেছিলেন ছড়িটার কথা।

আজ হঠাৎ......। তবে কি ভূত হয়ে ভাল হয়ে গিয়ে বিধু ছড়িটা ফেরত দিতে চায়? সুধাংশুবাবু এই বয়সেও ভেতর ভেতর কেমন উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন। রাতে বার বার ঘুম ভেঙে গেল।

পরদিন ভোরবেলা দুধ আনতে যাবার সময় খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলেন হরিশ পার্কের মেন গেটের সামনে। তারপর আরো তাড়াতাড়ি সেই বেঞ্চটার কাছে।

আর কি আশ্চর্য! ঐ তো কি একটা ঝুলছে লম্বা মতো! প্রায় দৌড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন জিনিসটার ওপর। আরে, এই তো, সেই ছড়ি! উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। এও কি সম্ভব? অ্যাদ্দিন পরে ছড়িটা ফেরত পেয়েছেন, সেটা সুধাংশুবাবু বিশ্বাসই করতে পারছেন না। তাও কিনা ভূত মারফৎ? শুনলে তো কেউই বিশ্বাস করবে না। বিধুটা এত ভাল ছিল কে জানত?

কিন্তু সুধাংশুবাবুর অবাক হবার কিছুটা বাকি ছিল তখনও।

আনন্দে-উত্তেজনায় দুধ নিতে ভুলে গিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসে সারা বাড়ির লোককে ডেকে সমস্ত ঘটনা বলে ছড়িটা বড় ছেলে শুভ্রাংশুর হাতে দিতেই, শুভ্রাংশু বলে উঠল, 'বাবা, এটা তো তোমার সেই ছড়িটা নয়। এটা তো সেই ছড়িটার নকল! তোমার হাতিটা ছিল রুপোর আর এই হাতিটা তো নিকেল করা। এই ছড়িটার ডিজাইন অবশ্য হুবহু তোমারটার মতো।'

সুধাংশুবাবু ধপ করে বসে পড়লেন সোফার ওপর। বুঝলেন তাঁর বাল্যবন্ধুর দুষ্টুমি এখনও যায়নি। তার স্বভাবও বদলায়নি একটুও। মারা গিয়েও নয়।

পৌষ ১৩৯৭

সত্যবানের পল্টন

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সত্যবান স্মৃতি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য সব শিক্ষক; এমনকি অশিক্ষক কর্মচারীরাও ঘেরাও হয়ে আছেন বিকেল চারটে থেকে। এখন সন্ধে ছটা বাজে। ক্লাস নাইন থেকে ইলেভেন পর্যন্ত মোট চল্লিশ জন ছাত্র এবারের বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে। সেইসব ছাত্রদের অভিভাবকেরা এলাকার আরও অনেক লোকজনকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঘরে অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেছে। তাদের দাবি হল, যারা ফেল করেছে তাদের প্রত্যেককে পাশ করিয়ে উপরের ক্লাসে তুলে দিতে হবে।

ঘণ্টা দুই ধরে চলছে প্রধান শিক্ষক বিমলবাবুর সঙ্গে ঘেরাওকারীদের জোর বাদানুবাদ। বিমলবাবু বারবার একই কথা বলে চলেছেন—আপনারা আমার কথা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। যারা পাশই করতে পারেনি তাদের আবার কীভাবে প্রমোশন দেব? তাহলে তো পরীক্ষা নেওয়ার কোনও মানেই হয় না?.....কিন্তু কে শোনে কার কথা? একসঙ্গে অনেকে চিৎকার করে বলতে লাগল—ওসব যুক্তি-তর্কের কথা আমরা শুনতে চাই না। যারা ফেল করেছে তারা কেউ ফেল করার ছেলেই নয়। সব দোষ টিচারদের। তাঁরা মন দিয়ে খাতা দেখেননি। অনেককে ইচ্ছে করে কম নম্বর দিয়ে ফেল করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি থেকে আমরা নড়ছি না। ফেল করা ছাত্রদের সবাইকে পাশ করাতে হবে। আপনাকে আমাদের কথা দিতে হবে। আপনি কথা না দিলে আমরা সারারাত আজ সবাইকে ঘেরাও করে রাখব!

আবার একচোট বাদানুবাদ। হৈ-হট্টগোল। বিমলবাবু কিছুতেই এমন অন্যায় দাবি মেনে নেবেন না। এর মধ্যেই ঘর কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠল—আমাদের দাবি মানতে হবে....আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে....!

এভাবে আরও একঘণ্টা কাটল। বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। শুধু এই ঘরেই টিমটিমে আলো। এত লোকের চলাফেরা, কথাবার্তা, কানের কাছে মশার বিনবিন;—বিমলবাবুর অসহ্য লাগছিল।

এসবের মাঝেও অসহায় বিমলবাবু ভাবছিলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সত্যবান চৌধুরীর কথা। অনেককাল আগে এখানকার জমিদার ছিলেন সত্যবান। স্বভাবে ছিলেন দাতাকর্ণ আর প্রজাদরদী। তিনি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যমে আর অর্থে এই মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২০ সালে। পরে এটি উচ্চ-মাধ্যমিক হয়। প্রায় একশো বছর হতে চলল বিদ্যালয়ের। সত্যবান দীর্ঘজীবী ছিলেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৮১ সালে নব্বই বছর বয়সে তিনি দেহ রাখেন। আর বিমলবাবু ১৯৮০ সালে এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে শিক্ষকতার চাকরি পান। সুতরাং মৃত্যুর কিছু আগে সত্যবান চৌধুরীকে বিমলবাবু নিজের চোখে দেখেছেন। অত বয়স! তবুও দীর্ঘদেহী মানুষটা লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটার চেষ্টা করতেন। যখন শিক্ষকদের নিয়ে মিটিং হত, বলতেন, আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হল মন্দিরের মতন। এখানকার পরিবেশ যেন দূষিত না হয়। এখন দেশজুড়ে নানা অনাচার আর দুর্নীতির কথা কানে আসে। আপনারা দেখবেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন এসব থেকে মুক্ত থাকে।......

বিমলবাবুর মন কোন অতীতে চলে গিয়েছিল। তাঁর সম্বিত ফিরল যখন আবার সমস্বরে শ্লোগান আর চিৎকার শুরু হল। একজন লম্বা ও মোটা অভিভাবক বিমলবাবুর সামনে এসে টেবিল চাপড়ে বলল, আপনি আমাদের দাবি মানবেন কী না?......

বিমলবাবু কিছু বলার আগেই হঠাৎ ঘরের আলো নিভে গেল! বারান্দার আলোগুলোও নিভে গেল! অনেকেই চিৎকার করে উঠল—একী? একী? আলো নিভিয়ে আমাদের আন্দোলন ভাঙা যাবে না। এসব এখানকার ষড়যন্ত্র!

চারদিক নিকষ অন্ধকার। তার মধ্যেই বিমলবাবুর মনে হল, ঘরের মধ্যে যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ লেগেছে! মারামারি লেগে গেছে অন্ধকারের মধ্যে! শুধু কানে আসছে—ধাঁই....ধাঁই..... ধুপ্.....ধুপ্! ঘেরাওকারীদের তাড়াতে পুলিশ এল কি? কিন্তু বিমলবাবু তো পুলিশ ডাকেননি! বিমলবাবুর আরও মনে হল, যারা ঘেরাও করতে এসেছে তারাই বোধহয় মার খাচ্ছে! কারা মারছে তাদের? কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না। শুধু শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ—ওরে বাবারে! মেরে ফেললে গো! আমার চুল উপড়ে নিচ্ছে!....আমার কানে কে কামড়ে দিল!....ধুপ্...ধাপ্....ধুপ্....ধাপ্...ওগো আর মেরো না! বাবারে পিঠ ভেঙে দিল কিল মেরে! পালাও! পালাও! আর আন্দেলন করতে হবে না! এখানকার হেডমাস্টার মন্ত্র জানেন! উনি ভূতের দল লেলিয়ে দিয়েছেন!

বিমলবাবু ও অন্যরা বিস্ময়ে হতবাক! এসব কী ঘটছে! কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে আলো জ্বলে উঠল! হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সবাই। কিন্তু কী অবাক কাণ্ড! যারা অন্যায় দাবি নিয়ে ঘেরাও করতে এসেছিল, তারা সব পিঠটান দিয়েছে! একজনও নেই। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে কয়েক পাটি জুতো, ছেঁড়া ফেস্টুন, একটা ভাঙা ছাতা!....

বাংলার স্যার প্রভাসবাবু বললেন, সবকিছু কীরকম অলৌকিক মনে হচ্ছে না? হঠাৎ আলো নিভে গেল আর লোকগুলোকে কারা বেধড়ক মারতে শুরু করল! যারা মারছিল তারাই বা গেল কোথায়? এসবের মানে কী?

বিমলবাবু হাই চেপে বললেন, মানে জেনে কী লাভ? পৃথিবীতে কত কী ঘটছে। সব কিছুর মানে কি আমরা বুঝতে পারি? শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আমাদের একজন রক্ষাকর্তা আছেন। আমাদের স্কুলের পরিবেশকে তিনি কোনওদিন নষ্ট হতে দেবেন না। আমারও ভয় কেটে গেছে। অন্যায় দাবি নিয়ে যতো আন্দোলনই হোক, মাথা নিচু আমি করব না....। রাত অনেক হল। চলুন সবাই। এবার বাড়ি ফেরা যাক।....

* * *

নির্জন, মেঠো পথ ধরে বিমলবাবু একা সাইকেলে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। লোকাল ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরবেন।.....হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে এক আবছায়া মানুষের মূর্তির আবির্ভাব হল। বিমলবাবু দেখলেন, দীর্ঘদেহী, বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়া সত্যবান চৌধুরীকে। ভয় না পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন বিমলবাবু। নেমে পড়লেন সাইকেল থেকে। সত্যবানের মাথার পেছনে আলোর বলয়। সত্যবান বলছিলেন—তোমাদের আজ বড় কষ্টের দিন গেল—না বিমল?....কী অদ্ভুত আর হাস্যকর দাবি! ফেল করা ছেলেদের প্রমোশন দিতে হবে! বড় বাড়াবাড়ি করছিল লোকগুলো। ওদের তাড়াতেই তো আমার পল্টনকে পাঠিয়ে দিলাম। আজ খুব মার খেয়েছে লোকগুলো। হা হা হা হা....। আর তোমাদের জ্বালাতে আসবে না। অন্যায়ের কাছে কোনওদিন মাথা নত করবে না বিমল। আমার হাতে গড়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদা হতে দেবে না। সবসময় মনে রাখবে আমি তোমাদের পাশে আছি.....। মিলিয়ে গেলেন সত্যবান।

বিমলবাবু জোড়হাতে নমস্কার জানালেন তাঁকে। তারপর সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিলেন....।

কার্ত্তিক ১৪২২

ডাক্তার উইলিয়ামসনের প্রেতাত্মা

কুমারী স্বপ্না হালদার

আবার.....আবার সেই শব্দ.....উৎকণ্ঠায় ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অভিজিৎ। নাঃ এভাবে আর পেরে ওঠা যাবে না। আর সহ্য করতে পারছে না সে। আজ তিন দিন হল সে এই বাড়িটায় এসেছে, আর প্রত্যেক দিন রাত্রের এই বিভীষিকা।

মাত্র মাসখানেক হল একটা নতুন কাজ পেয়ে অভিজিৎ বোস ভাগলপুরে এসেছে। বাংলাদেশের ছেলে সে, বিহার দেশটা দেখবার উৎসাহও তার প্রচুর। শুনেছিল বিহার নাকি একটা রুক্ষ, শুষ্ক মরুভূমির মত দেশ, এখানে পৌঁছে কিন্তু ধারণা তার ক্রমশঃই বদলে যাচ্ছে। বর্ষাকাল, অতএব মাঠ-ঘাট জলে থইথই, গাছে সবুজের ছড়াছড়ি, বাংলার মতই শস্যশ্যামল রূপ, শুধু বাংলাদেশের মত পথে-ঘাটে পুকুর আর ডোবা এখানে পাওয়া যায় না।

ট্রেন থেকে নেমে ওয়েটিং রুমে জিনিসপত্র ফেলে সে ছুটেছিল রিচার্ড হ্যানলের বাড়ি খুঁজতে। রিচার্ড তার বন্ধু। অস্ট্রেলিয়ায় তার মা-বাবা থাকেন। সম্প্রতি একটা ব্রিটিশ ফার্মের রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়ে সে এদেশে এসেছে। কলকাতায় এক মাস থাকাকালীন খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল অভিজিতের সঙ্গে। ভাগলপুরে সে ছ'মাসের জন্যে কাজে এসেছে, তাই তার কাছেই থাকার কথা ভাবছিল অভিজিৎ।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে গাঁক্ করে হর্ন দিয়ে অভিজিতের ট্যাক্সি থামল শহর থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট্ট সাদা একতলা বাড়ির সামনে। বাড়িটার তিন দিক ঘিরে ছোট ছোট চারাগাছে ভরা ক্ষেত, একটু দূরে পেছনদিকে একটা চাষীদের বস্তি আর সামনে দিয়ে সদর রাস্তা। একটা গোলাপী ফুলে ঢাকা বোগ্যানভিলার গাছ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাতা আর ডালপালা দিয়ে বাড়িটার ছাদ সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। দরজার গায়ে নেমপ্লেটে লেখা "Happy Nook"। অভিজিতের মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়েছিল—চমৎকার তো!"

দরজায় নক্ করতেই দরজা খুলে "হ্যাল্লো, তুমি কোথা থেকে" বলে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেছিল রিচার্ড। অনেকক্ষণ একথা-সেকথা হওয়ার পর হঠাৎই রিচার্ড প্রশ্ন করেছিল, "তুমি কি থাকার জায়গা ঠিক করেই এসেছ?" অভিজিৎ "না" বলাতে উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা টেলিগ্রাম তুলে এনে বলেছিল—"গতকাল এসেছে, পড়ে দেখ!"

টেলিগ্রামের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে অভিজিৎ বলেছিল—"এর মানে?"

টেলিগ্রামে লেখা ছিল ঃ Mother ill come back—Lisa.

"আমার মা'র অসুখ দেখেই এদেশে এসেছিলাম, বোধহয় এখন বেড়েছে, তাই আমার বোন দেশে ফিরে যেতে লিখেছে। আমি কালই কোম্পানিকে সব বিবরণ জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। আজ রাতের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে পরশু প্লেনে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু এই মাঠের মধ্যে বাড়িতে সমস্ত জিনিসপত্র রেখে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?......তাই বলছিলাম, তুমি যদি এখানে...."

"আমি যদি এখানে থাকি তো তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পার, এই তো? তুমি না বললে আমিই এ প্রস্তাবটা করতাম।" হেসে উঠেছিল অভিজিৎ।

তারপর সেই রাত্রের ট্রেনেই রিচার্ড চলে গেছে। ওকে স্টেশনে পৌঁছে, বাড়িটার সামনে এসে

একমুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল অভিজিৎ। দিনের আলোয় খুব সুন্দর মনে হয়েছিল বাড়িটাকে, কিন্তু রাত্রে এর অন্য রূপ। চারিদিকে ধুধু অন্ধকার মাঠ। বাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া বোগ্যানভিলা গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গাটা ছমছম করে উঠেছিল তার, একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া যেন মুখের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। মনে পড়েছিল স্টেশনে যেতে যেতে এই বাড়িটার সম্বন্ধে ওকে একটা গল্প বলেছিল রিচার্ড। এই বাড়ির প্রকৃত মালিক ছিলেন ডাক্তার জন্ উইলিয়ামসন্। যদিও বহুদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তবু আজও তিনি তাঁর নেটিভ-বিদ্বেষের জন্য কুখ্যাত হয়ে আছেন। কোন 'নেটিভ' বা 'কালা আদমী'কে তিনি সহ্য করতে পারতেন না, তাঁর গেট পেরোবার অপরাধে একবার একজনকে তিনি গুলি করেছিলেন। শেষে এক অজানা কারণে অত্যাচারী ডাক্তার উইলিয়ামসন্ আত্মহত্যা করে মারা যান।

সেদিন রাত্রে শোবার সময়ও অভিজিতের সেই গল্পটা মনে পড়ছিল। বাতিটা নেভাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত যেন ওকে অবশ করে দিয়ে গেল। বিছানায় উঠেও স্বস্তি নেই—কি রকম যেন দম-আটকানো পরিবেশ। ঠিক সেই সময় দরজায় আওয়াজ হল—ঘর্‌র্‌....ঘর্‌র্‌....ঝুপ্। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে অভিজিতের কপালে, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, শুধু মনে হচ্চে ডাক্তার উইলিয়ামসন্ বুঝি তাঁর বাড়িতে একজন 'কালা আদমী'কে দেখে প্রতিশোধ নিতে এসেছেন। ওই বুঝি তাঁর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার দীর্ঘশ্বাস। আবার আওয়াজ হল—খস্‌স্‌স্....খস্‌স্‌স্। জোরে বালিশের মধ্যে মুখটা গুঁজে রাখে অভিজিৎ, কিন্তু আবার, আবার, বার বার আওয়াজটা ঘরের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যায়। সারারাত মনে হয় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাত যেন ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

তিন দিন এইভাবে অনিদ্রায় কাটাবার পর চতুর্থ দিন রাত্রে চাষীদের বস্তি থেকে মোহন সিং নামে এক যুবককে ডেকে আনে সে। সব শোনবার পর মোহন রাজী হয় ওর সাথে রাত্রে থাকতে। প্ল্যান হয় রাতে শব্দটা হলেই দরজা খুলে টর্চ আর লাঠি নিয়ে বেরোবে ওরা—জিনিসটা কি দেখবে, যাহোক কিছু হেস্তনেস্ত আজ হবেই। সেদিন রাত্রে খেতে বসে খাবারগুলো নেড়েচেড়ে উঠে গেল অভিজিৎ। সন্ধ্যে থেকেই গলাটা শুকিয়ে আছে তার। ঠিক নটায় লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে হাজির মোহন সিং।

রাত দশটা....বাতি নিভিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা....ঠিক এমনি সময়ে সেই মৃদু আওয়াজ—খস্‌স্‌স্‌স্....খ স্ স স্ স্। পেছনের জানলা দিয়ে একঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া এল। ভয়ে অভিজিতের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে। মোহন সিং দরজার কাছে এগিয়ে গেল, তার ঠিক পেছনে অভিজিৎ। দরজার পাল্লাদুটো একটানে খুলে ফেলল মোহন সিং, আর সাথে সাথেই বাইরে বোগ্যানভিলার ঝোপের মধ্যে দেখা গেল একজোড়া জ্বলন্ত চোখ। একটা চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল অভিজিৎ। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরতেই ঝোপ থেকে এক লাফ দিয়ে মোহন সিং -এর পায়ের কাছে পড়ল কালো কুচকুচে কেঁদো একাট বেড়াল। চীৎকার করে ছাদ ফাটিয়ে হেসে উঠল মোহন সিং। সে বলে উঠল—"আরে এ তো রিচার্ড সায়েবের বেড়াল 'টম্'।"

রোজ রাতে পাড়া বেড়িয়ে ফিরে দরজা আঁচড়ালেই রিচার্ড তাকে ঘরে ঢুকিয়ে নিতেন। কিন্তু আজ চার দিন ধরে দরজা আঁচড়ে আঁচড়ে ক্লান্ত হয়ে ভোরের দিকে বেচারা ফিরে যেত, অভ্যাসের দোষে আবার ফিরে আসত প্রতিদিন রাত্রে।

জ্ঞান হয়ে অভিজিৎ ততক্ষণে উঠে বসেছে। একবার ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা মোটা বেড়ালটা আর একবার মোহন সিংয়ের হেসে হেসে লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়েই সে ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল। তার কিন্তু তোমার আমার-মত হাসি পাচ্ছিল না মোটেই, তার ইচ্ছা করছিল পাশ থেকে মোটা লাঠিটা তুলে একঘায়ে হতভাগা বেড়ালটাকে শেষ করে দেয় একেবারে....।

ভাদ্র ১৩৭২

জেমস সাহেবের কুঠিতে এক রাত

সৌম্যকান্তি মজুমদার

আমি তখন জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে কাজ করি, সেই সময় আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেটা যে কি করে সম্ভব হয়েছিল তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলা যাক—

আমি নিজের ঘরে বসে কাজ করছি, এমন সময় বেয়ারা এসে বললো বড় সাহেব তলব করেছেন। একটু অবাক হলাম। এমন অসময়ে তো বড় সাহেব ডাকেন না। নিশ্চয় কোনো জরুরি দরকার। হাতের কাজ ফেলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম তাঁর চেম্বারে।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই বড় সাহেব বললেন, এই যে শুভ, এসে গেছো। শোনো তোমায় কিন্তু দু'একদিনের মধ্যেই রওনা হতে হবে, তৈরি থেকো। প্রশ্ন করলাম, কোথায় স্যার? উনি বললেন, কাঠঠুমরী। খবর পেয়েছি ওখানকার পাহাড়ে নাকি তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। তোমায় গিয়ে তা সাতে করে দেখতে হবে।

দিন কয়েক পরেই এসে পৌঁছালাম কাঠঠুমরীতে। সঙ্গে দুই সহকর্মী সুব্রত ও অঞ্জন। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল উইলিয়াম সাহেবের নীলকুঠিতে। নামেই নীলকুঠি, বর্তমানে সেটা পরিণত হয়েছে গেস্ট হাউসে।

কাঠঠুমরী জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর। সকালে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে সুব্রত ও অঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলাম ওরা বেরুবে কিনা। দুজনেই বললো, খুব পরিশ্রান্ত লাগছে, ওই দিনটার মতো রেস্ট নিতে চায়। সুতরাং কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম।

সব থেকে কাছে যে পাহাড়টা, ঠিক করলাম ওটা থেকেই সার্ভে শুরু করব। মনস্থির করে নিয়ে সোজা হাঁটা দিলাম পাহাড়ের দিকে। বেশিক্ষণ হাঁটতে হলো না, সামান্য কিছুদুর যেতেই পাহাড় শুরু হয়ে গেল। চারপাশের পাথর পরীক্ষা করতে করতে আমি পাহাড়ে উঠতে শুরু করি।

বেশ খানিকটা ওপরে আসার পর বনজঙ্গল শুরু হলো। আমার কোনোদিকে হুঁশ নেই। পাথরে তামার ভাগ আবিষ্কার করে সব ভুলে আমি তারই অনুসন্ধান করে চলেছি। কখন যে বেলা পড়ে এসেছে, কখন যে বন আরো ঘন হয়েছে কিছুই খেয়াল করিনি। আলোর অভাবে কাজ করতে অসুবিধা হতেই খেয়াল হলো। তাড়াতাড়ি ঘড়িতে সময় দেখলাম—বিকেল সাড়ে পাঁচটা। তড়িঘড়ি করে নিচে নামতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদুর নেমেই মনে হলো আমি রাস্তা ভুল করেছি। ঘুরে অন্যদিকে। গেলাম তাতেও কোনো লাভ হলো না। ওদিক দিয়ে উঠেছি বলেও তো মনে হলো না। এদিকে অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। কিছু দেখতে না পেলে নামব কি করে? এই ভেবে ঠিক করলাম রাতটা পাহাড়ের কোনো গাছে উঠেই কাটিয়ে দেব। পাহাড়ে জন্তু-জানোয়ার থাকাও বিচিত্র নয়। এই মনে করে একটা সুবিধেমতো গাছ দেখে উঠে পড়লাম। গাছে ওঠা যে আনাড়ি লোকের পক্ষে কি কষ্টকর সেটা সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম।

গাছের ওপরে একটা মজবুত ডাল দেখে বসে আছি। কতক্ষণ কেটেছে কে জানে? হঠাৎ মনে হলো দূরে যেন একটা আলো জ্বলছে। চোখ কচলে ভালো করে চাইলাম কারণ আমার মনে

হয়েছিল জঙ্গলে আলো কোথা থেকে আসবে? কিন্তু ভালো করে তাকাতেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে যেন বল এলো। ভাবলাম গাছ থেকে নেমে আলোর সন্ধানে যাই। পরক্ষণেই থমকে গেলাম, যদি সাপ বা অন্য জানোয়ারের কবলে পড়ি? মন বলল, ধুর, এই গাছে রাত কাটানোর চাইতে ওটা যদি কোনো বাড়ি হয় সেখানে আশ্রয় নিলে অনেক সুবিধে হবে। আর জানোয়ার? এতক্ষণ তো গাছে বসে আছি, কই কোনো জানোয়ারের তো সাড়াশব্দ পাইনি? আর কিছু না ভেবে গাছ থেকে নেমে আলোর উদ্দেশে রওনা হলাম।

কিছুদূর যেতেই বুঝলাম আলোটা কোনো বাড়ির ভিতর থেকেই আসছে কিন্তু সামনে গিয়ে দেখে মনে হলো বাড়িটা খুব পুরনো, ওখানে যে মানুষ থাকতে পারে তা ভাবাই যায় না। আমার তখন সাহায্যের দরকার। তাই ওসব বিষয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আমি গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। গেটটার অবস্থা অতিশয় জীর্ণ, তাতে একটা লোহার শেকল বাঁধা। আমি গেটের সামনে থেকেই জোরে হাঁক দিলাম, ভেতরে কেউ আছো? কোনো সাড়া নেই। আবার ডাকতে যাব এমন সময় দরজায় ছায়া পড়ল, ভেতর থেকে একজন লোক মুখ বাড়াল। আধো অন্ধকারে তার মুখ-চোখ দেখা গেল না ঠিখই, তবে তার পরনে যে কোট-প্যান্ট আর মাথায় যে টুপি আছে এটা বোঝা গেল। আমি বললাম, বড় বিপদে পড়েছি। রাতটার মতো এখানে থাকতে পারি কি? গম্ভীর গলায় উত্তর এলো, নিশ্চয়ই, আসুন। লোকটি এগিয়ে এসে গেট খুলে দিল। অত অল্প সময়ে অত বড় শেকল সে কি করে খুলল তা বিস্ময়ের ব্যাপার। আমি মনে মনে ভাবলাম অভ্যাসের বশে হয়তো। লোকটির পিছনে পিছনে গিয়ে একটি বড় ঘরে ঢুকলাম। ঘরের মধ্যিখানে ডাইনিং টেবিল, টেবিলে শুধু দুটি চেয়ার। লোকটি বললো, আপনি যে ক্ষুধার্ত এটা অনুমান করলে নিশ্চয় ভুল হবে না। বলতে বলতে একটি চেয়ারে বসে অন্যটিতে আমায় বসতে ইঙ্গিত করে ফের বললো, আমি ডিনারের জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম। টেবিলের ওপর অনেক খাবার-দাবার ফলমূল সাজানো, কিন্তু একমাত্র আপেল ছাড়া অন্যগুলোকে আমি চিনতে পারলাম না। এমন সময় লোকটি বললো, আপনি এখানে নিশ্চয়ই থাকবেন তবে আমার একটা অনুরোধ—। আমি বললাম, কি? লোকটি বললো, কোনো ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করবেন না। অদ্ভুত অনুরোধ, তবু মেনে নিলাম।

খেতে খেতে অনেক কথা হলো। জানলাম লোকটির নাম জেমস ব্রুক। সে একাই এই বাড়িতে থাকে। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটি আমাকে একটি মোমবাতি ও দেশলাই দিয়ে বললো, এই দিয়েই আপনাকে সারারাত চালাতে হবে। কোনো অসুবিধা হবে না তো? আমি বললাম, না না, অসুবিধা কি, সারারাত তো ঘুমিয়েই কেটে যাবে। জেমস বললো, তা যদি হয় তবে তো ভালই।

পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমার ঘরের বিছানায় দেখলাম একটি কম্বল ভাঁজ করা রয়েছে। মাথার কাছে ছোট্ট টেবিল। টেবিলে মোমবাতি, দেশলাই রেখে কম্বল গায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলো না, কেবলই ঘুরে-ফিরে জেমস ব্রুকের কথা মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ টুপি পরে থাকায় জেমসের মুখটা ভালো করে বোঝা না গেলেও হাত দুটি দেখেছিলাম। কেমন হলদে, পাংশুটে। যেন বহুদিন বাড়ির বাইরে বের হয়নি। নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। চোখ মেলতেই দেখি জেমস সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় জেমস সাহেব এখানে কী করছে? তাড়াতাড়ি দেশলাই ঘষে মোমবাতি জ্বালালাম। তারপর জেমস সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে, এই সময়? জেমস সাহেব নিরুত্তর। এবার ভালো করে জেমস সাহেবকে লক্ষ্য করলাম। একটু সামনে গেলাম। দেখি একটি পাথরের মূর্তি। অবিকল জেমস সাহেবের মতো দেখতে। হয়তো উনি শখ করে মুর্তিটি তৈরি করেছেন। কিন্তু পাথরের মূর্তি এল কোথা থেকে? ঘরে ঢোকার সময় তো কোনো মূর্তি দেখিনি, তবে? কেউ কি এটাকে এখানে এনেছে? তাই বা কি করে হয়? সবগুলো

দরজা আমি নিজে বন্ধ করেছি। তাহলে? এর কোনো ব্যাখ্যাই খুঁজে পেলাম না। এখন আমি কি করবো? জেমস সাহেবকে ডাকবো? তারপরে ভাবলাম আজকের রাতটারই তো ব্যাপার, কোনোরকমে কাটিয়ে দিই। এই ভেবে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মাথার কাছে এক শীতল অনুভূতি পেলাম। একমাত্র বরফই এমন ঠাণ্ডা হয়। তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললাম। এবার যা দেখলাম তাতে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখতে পেলাম পায়ের কাছে যে মূর্তি ছিল সেটা চলে এসেছে মাথার কাছে। হাত দুটিও উপরে উঠে গেছে। মুখে কেমন হিংস্র হাসি। অথচ আমি বাজি ধরে বলতে পারি মূর্তির মুখে আগে হাসির লেশমাত্র ছিল না। এবার আমি আর পারলাম না। চিৎকার করে উঠলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। আমি কোনোরকমে টলতে টলতে দরজা খুলে দিয়েই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরল শেষ রাতে। চোখ মেলতেই দেখি জেমস সাহেব গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতঘড়িতে সময় দেখলাম সাড়ে তিনটে। উঠে বসলাম। দেখি একাট সোফায় বসে রয়েছি। আমি জেমস সাহেবকে বললাম, কালকে রাতে....। জেমস সাহেব বললো, বুঝেছি, আপনাকে আর বলতে হবে না। ব্যাপারটা তাহলে আপনাকে খুলেই বলি। বলে জেমস সাহেব আমার পাশে সোফায় বসলো। বসতেই সামনের আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠলো। আর সেই প্রতিবিম্ব দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল। আয়নাতে আমি দেখলাম কোট, প্যান্ট, টুপি পরা জেমস সাহেব আমার সামনে বসে রয়েছে। তবে তার মুখে লেশমাত্র মাংস নেই, শুধুই হাড়। দেখামাত্র আমার মনে হলো ছুটে পালাই, কিন্তু পা দুটো যেন পাথরের মতো ভারী লাগছে। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় আমি উঠে দাঁড়ালাম তারপর পড়িমরি ছুটলাম দরজার দিকে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চললাম। হঠাৎ একটি পাথরে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। তারপর আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলতে দেখি আলো ফুটে গেছে। কতগুলি কাঠুরিয়া সামনে দাঁড়িয়ে। তারা বললো, কি হইছে, বাবু? আমি কাল রাতের সমস্ত ঘটনা ওদের বললাম। ওরা বললো, অ, আপনি তাহলে জেমসবাবুর দেখা পেয়েছেন। আমরা গাঁয়ের বুড়ো মানুষদের কাছে শুনেছি, লোকটা ভারি বদমাইশ ছিল। মরার পরেও পাহাড়ের ওপরে তার এই ডাকবাংলোর মায়া কাটাতে পারেনি। কোনো লোক রাতে জঙ্গলে বিপদে পড়লে সাহেব তাকে ভুলিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখায়। মরার পরেও তার স্বভাব যায়নি।

কাঠুরিয়ারাই সঙ্গে করে আমায় সে-যাত্রায় গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়েছিল।

কার্ত্তিক ১৪০৫

ভয়

তৃপ্তি সেনগুপ্ত

রাতটা ছিল পূর্ণিমার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুদীপার। গরমকাল, তবু প্রচণ্ড শীতই তার ঘুম ভাঙার কারণ। সুদীপা পায়ের কাছে রাখা চাদরটা টেনে গায় দিতে গিয়ে শুনতে পায় খোলা জানলার পাল্লাগুলো দড়াম দড়াম আওয়াজে একবার বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করে সুদীপা। ওই তো পরিষ্কার আকাশ থেকে জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে অথচ জানলার পর্দাগুলো এমন এলোমেলো উড়ছে যেন বাইরে ভীষণ ঝড় বইছে। সুদীপা তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে আলো জ্বালায়। জানলা বন্ধ করতে এসে চোখ যায় বাগানের দিকে। ওমা! গাছপালাগুলো হাওয়ার দাপটে যে একেবারে নুয়ে পড়ছে। এত জোর হাওয়া আসছে কোথা থেকে! সকাল পর্যন্ত ওগুলো টিঁকলে হয়। 'সকাল' শব্দটা চিন্তায় আসতেই সুদীপার একটা কথা মনে পড়ে গেল। জানলা দিয়ে ভালভাবে বাগানের দিকে দৃষ্টি ফেলে সুদীপা। উঁচু উঁচু গাছের মত্ত দুলুনির ফাঁকফোকর দিয়ে কংক্রিটের বাঁধানো বেদীটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। সকালে যখন ফুল-ধূপকাঠি নিয়ে বাগানে গিয়েছিল, বেদীর ওপর কোনাকুনি দেখেছিল একটা ফাটলের দাগ। তখুনি স্বামী পলককে ডেকে এনে দেখিয়েছিল সে। পলক মিস্ত্রি এনে সঙ্গে সঙ্গেই ফাটল সারিয়ে তুলেছিল। বলেছিল, খারাপ সিমেন্টই হয়তো বেদীতে এত তাড়াতাড়ি ফাটল ধরার কারণ।

সুদীপা জানলা বন্ধ করে সরে আসে। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খাটে উঠে বসে, কিন্তু শোয়া আর হয় না। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা গোঙানির আওয়াজ। বাড়ির ভেতরের বারান্দার জানলা-পথে সেই গোঙানির আওয়াজ ঘরে ঢুকতে থাকে। সুদীপা জানলার দিকে তাকিয়ে দেখে। আশ্চর্য, এদিককার পর্দা তো হাওয়ায় উড়ছে না! কান খাড়া করে শোনে সুদীপা। গোঙানিটা ধীরে ধীরে যেন বাড়ছে। ভয়ে নয়, কিছুটা কৌতূহলে সে স্বামী পলককে ডেকে তোলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পলক স্ত্রীর তাড়ায় উঠে বসে। তারা দু'জনেই কান পেতে শুনতে থাকে সেই গোঙানি। পলক কৌতূহলী হয়ে ওঠে। দরজা খুলে সে বেরিয়ে আসে বারান্দায়, পিছন পিছন সুদীপাও। বারান্দার আলো জ্বালিয়ে তারা কিছুই দেখতে পায় না, কোনো আওয়াজও আর শুনতে পায় না। সুদীপা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে বারান্দার নিচে উঠোনে বাতাসের কিন্তু কোনো দাপাদাপি নেই। ছুটে ঘরে ঢুকে সে বাগানের দিকের জানলা খুলে ফেলে। দেখতে পায় সেখানে বাতাসের উথাল-পাথাল। হাত ধরে পলককে জানলায় নিয়ে আসে সে। দু'জনে দাঁড়িয়ে দেখে বাগানে বাতাসের তাণ্ডব।

ওদিকে দরজার বাইরে গোঙানির আওয়াজ নতুন মাত্রায় বাড়তে থাকে। পলক ফের বাইরে আসে। আলো জ্বালিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে পাশের ঘর, কিচেন, সিঁড়ি, ছাদ তন্ন-তন্ন করে খোঁজে। কেউ নেই। আলো নিভিয়ে হতাশভাবে ঘরে ফিরে আসে পলক। ভূতে তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

মাঝের দিনগুলি যেমন-তেমন ভাবে কেটে যায়। পরের অমাবস্যায় সুদীপা সকালে স্নান সেরে ফুল-ধূপ নিয়ে বাগানে গিয়ে দেখল সেই কংক্রিটে কোনাকুনি ফাটল। শুধু তাই নয়, বেদীটা দু'দিকে সরে গিয়ে মাঝখানে এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। ঘরে ফিরে স্বামীকে জানাল সে। পলক মিস্ত্রি ডেকে ফাটল সারাল। সে রাতেও পূর্ণিমা রাতের পুনরাবৃত্তি ঘটল। বাগানে বাতাসের তাণ্ডব,

জানলার কপাটের আছাড়ি-পিছাড়ি। দরজার বাইরে সেই গোঙানির আওয়াজ। পলক দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখতে পায় দরজার পাশ থেকে একটি দশ-বারো বছরের মেয়ের ছায়ামূর্তি বারান্দার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরবর্তী পূর্ণিমায় একই ঘটনা। ঐদিন পলক গোঙানির আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দেখে একটা ছায়ামূর্তি যেন হাওয়ায় ভেসে দরজা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল।

পলক এরপর তাদের চার্চের যাজকের কাছে ছুটে গিয়েছিল। ভূতে সে বিশ্বাস করে না, অথচ যা ঘটছে তারও কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না। ধন্ধে পড়ে গিয়েছিল সে। পলকের মুখে সব কথা শুনে যাজক বলেছিলেন, পরের অমাবস্যার রাতটায় আমি তোমার বাড়ি কাটাব। সেইমতো অমাবস্যার দিন পলক নিজে সঙ্গে করে যাজককে তার বাড়ি নিয়ে আসে। প্রথমে বাড়িটা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ঘুরে দেখে নেন যাজক। তারপর স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা আলাদা ভাবে জেনে নেন ঘটনার ইতিবৃত্ত। তাদের সামনেও নিজের কিছু জিজ্ঞাস্য রাখেন। তাঁর কোমল সহৃদয় ব্যবহারে পলক ও সুদীপার মনোদুয়ারের সব অর্গল খুলে যায়। বেরিয়ে আসে জমে থাকা না-বলা ব্যথা। যাজক শোনেন সে দুঃখের কাহিনী। মাস পাঁচ আগে, তখনও তিনি পলকদের চার্চে যাজক হয়ে আসেননি, সেই সময়ের ঘটনা। পলক ও সুদীপার একমাত্র মেয়ে কুটুস হঠাৎ কয়েক দিনের জ্বরে মারা যায়। মেয়েটি ছিল নম্র ধীর কিন্তু ভীষণ ভীতু। এক মুহূর্তও একা থাকতে পারত না। ঘরে সামান্য সময় একা থাকলে ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরত, বলত, ভূত আসছে। সেই মেয়ে মারা যেতে পলক আর সুদীপা তাকে প্রাণে ধরে দূরে চার্চের সংলগ্ন জমিতে রেখে আসতে পারেনি। বাগানে নিজেদের চোখের সামনে তার শেষশয্যা রচনা করেছিল। মেয়ে এক পূর্ণিমায় তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সুদীপা মেয়ের সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধূপ জ্বেলে দেয়। অ্যালবাম খুলে তারা যাজককে দেখায় মেয়ের নানা ভঙ্গির ছবি।

কথায় কথায় রাত বাড়তে থাকে। তিনজন আহার সারে নিঃশব্দে। তারপর যাজক গিয়ে ঢোকেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা ঘরে। পলক ও সুদীপাও যায়। রাত আরো গভীর হয়। ঠিক একটায় শুরু হলো প্রলয়কাণ্ড। চমকে উঠলেন যাজক। জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া ঘরে ঢুকছে. পর্দা, মশারি লণ্ডভণ্ড হয়ে উড়ছে। জানলার পাল্লাগুলো আছড়ে পড়ছে। বাগানেও সেই একই অবস্থা। বাতাসের দাপটে গাছপালার শনশন আর্তনাদ। কি এক শক্তি যেন বাগান থেকে উঠে আসছে। একটু পরেই ভেতরের বারান্দায় শোনা গেল ককিয়ে কান্না। দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে এলেন যাজক। একই সঙ্গে পলকও এল। দু'জনেই দেখলেন সিঁড়ির নিচের ধাপ থেকে ছায়ামূর্তি আলোর পাশ কাটিয়ে উঠে গেল ওপরের অন্ধকারে।

বাকি রাতটা যাজক সুদীপা ও পলককে অনেক করে বোঝালেন। বললেন, দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ছায়ামূর্তিকে আপনারা বার বার দেখছেন সে আপনাদেরই কুটুস। ও একা থাকতে ভয় পাচ্ছে, তাই প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় আপনাদের ঘরের সামনে এসে কাঁদে। ওকে বাগানে একা ফেলে রাখবেন না, অনেকের মাঝখানে সমাধি দিন।

আপনিই কোনো ব্যবস্থা করে দিন, বলল পলক। আর সুদীপা? তার সমস্ত শরীর মথিত করে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কুটুস এই জীবনের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে, অন্যলোকে। তাকে একান্তভাবে কাছে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবে কেন সুদীপা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে তাকে আটকে রাখবে? তার চেয়ে বরং সে যেখানে ভয় পাবে না সেখানেই শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকুক।

পরের দিনই পলককে চার্চের বেরিয়াল গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন যাজক। জমি যোগাড় করে বাগানের কবর খুঁড়ে সযত্নে কুটুসকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন বেরিয়াল গ্রাউন্ডে। সেখানে সারি সারি কবর। কুটুস এ ব্যবস্থায় মনে হয় খুশিই হয়েছিল কারণ আর কোনোদিন সে তার মা-বাবাকে বিভ্রান্ত করতে যায়নি।

মাঘ ১৪০৬

অমাবস্যার রাতে

স্বপন সেনগুপ্ত

অবশেষে ঠিক করলাম অফিসে ছুটি নিয়ে এবার ধারেকাছে কোথাও বেড়াতে যাব। ঘনিষ্ঠ বন্ধু নৃপেনকে আমার একান্ত ইচ্ছার কথাটা জানালাম। বললাম, চ কোথাও দুজনে মিলে ঘুরে আসা যাক। নৃপেন রাজী হলো না। তার দম ফেলার সময় নেই। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে সে এখন ভীষণ ব্যস্ত।

অগত্যা একলা চলো নীতি নিলাম। যাব যখন ভেবেছি, যাবই। এত সুন্দর একটা ইচ্ছাকে তো নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধারেকাছে বলতে কোথায় যাওয়া যায়? প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম নেবার মতো স্থান কাছেপিঠে কি আছে?

নৃপেন বলল, কেন, আমাদের নাকের ডগায় দেওঘর। ভারি মনোরম জায়গা। আমি তো বার দুই গেছি।

কথাটা আমার মনে ধরল। মন্দ বলেনি নৃপেন। সিদ্ধান্ত নিলাম দেওঘরেই বেড়াতে যাব। অফিসে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে, একজনের মতন লটবহর সমেত একদিন বেরিয়ে পড়লাম।

দেওঘরে পৌঁছেই একাট অটো ভাড়া করে সোজা প্রভু জগদ্বন্ধুর আশ্রম। এই আশ্রমের হদিস নৃপেনই আমাকে দিয়েছিল। লজ ভাড়া করে বাইরে থাকা মানে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। নৃপেন আবার প্রভু জগদ্বন্ধুর শিষ্য। তাই আশ্রমের মহারাজজীর সঙ্গে তার ভাল হৃদ্যতা। সে একটা হাতচিঠি মহারাজজীকে লিখে দিয়েছে, যাতে আমার এখানে আহার-বাসস্থানের একটা সুবন্দোবস্ত হয়।

নৃপেনের সেই চিঠির দৌলতে আশ্রমে থাকার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে। জায়গাটা ভারি চমৎকার। একটা ছোট্ট টিলাকে কেন্দ্র করে এই আশ্রম গড়ে উঠেছে। তবে স্থানীয় লোকেরা একে টিলা না বলে, পাহাড় বলে—চড়কি পাহাড়।

যে ঘরটা আমায় দেওয়া হয়েছে, সেটা একটু উঁচুতে। টিলার ধাপকাটা সিঁড়ি বেয়ে তবেই উপরে ওঠা যায়। উপরে উঠলেই ইতস্তত ছোট-ছোট পাহাড়-টিলার সৌন্দর্য। অদূরে তপোবন পাহাড়ের মনোরম হাতছানি। মোহিত হয়ে শুধু তাকিয়েই থাকতে ইচ্ছে করে। এত নিকটে যখন পাহাড়টা, ভাবলাম, কাল বিকেলে একবার হাঁটতে-হাঁটতে ঘুরে আসব।

আমি আসার সময় সঙ্গে করে কিছু পত্র-পত্রিকা নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলো উল্টেপাল্টে সন্ধ্যের সময় দেখছিলাম। এমন সময় দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

দরজা খুলতেই সামনে একজন অপরিচিত লোক। উস্কোখুস্কো, মলিন বেশ। গায়ের রঙ এমন মিশমিশে কালো যে, অন্ধকারে প্রায় বোঝাই যায় না। খ্যাড়খ্যাড়ে কণ্ঠে সে বলল, বাবুসাব, হামারা নাম বদ্রীপ্রসাদ। আমার টাঙ্গা আছে। আশ্রমের কাছে যো হরিজন বস্তি আছে, ওখানে আমি থাকি। তো আপনার টাঙ্গা লাগবে?

দুপুরে একজন ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে আমার পাকা কথা হয়েছিল। তাই বললাম, কাল সকালে ট্যাক্সি করে দেওঘর ঘুরব ঠিক করেছি। আর বিকেলের দিকে ভাবছি, তপোবন পাহাড় পায়দল যাব।

বদ্রীপ্রসাদ আমার কথায় চমকে উঠল যেন—না বাবুজী, বিকালে পায়দল তপোবনের দিকে যাবেন না। কাল অমাবস্যা।

অমাবস্যা তো কী হবে?

সূরয ডুবে গেলে টুলিয়া কা কব্বরস্থান জেগে উঠবে। মুসীবতে পোড়ে যাবেন।

হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো পাহাড়ে যাব। কবরস্থানের প্রশ্ন আসছে কি করে? তাছাড়া এসব কথাবার্তার কোনো যুক্তি নেই। যত্তসব আজগুবি।

তবু বদ্রীপ্রসাদ বলতে থাকল, সচ্ বাত বলছি, মুসীবতে পোড়ে যাবেন। যাবেন না বাবুজী, যাবেন না—কণ্ঠে তার আকুতির সুর স্পষ্ট। সে বারংবার একই কথা বলে আমাকে সতর্ক করতে চাইল। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। কানের গোড়ায় একই কথার ঘ্যানঘ্যানানি ভারি বিরক্তির উদ্রেক করল। বললাম, কিসের মুসীবত? ভূত-প্রেত? ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। আর যদি বলো চোর-ডাকাত, সেক্ষেত্রে ভয়ের একটা ব্যাপার আছে বটে। তবে তোমার চিন্তা নেই, আমি ঠিক সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

একথা শুনে বদ্রীপ্রসাদ ফিরে যাচ্ছিল। বেচারা ভাড়ার আশায় এসেছিল। আমি তখন বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি বরং এক কাজ কর। পরশু সকালে তোমার টাঙ্গা নিয়ে এস।

বদ্রীপ্রসাদ ঘুরে দাঁড়াল, আমি তো সকালে টাঙ্গা চালাই না বাবুসাব। সূরয ডুবে গেলে চালায়।

এ আবার কেমন কথা! সকালে টাঙ্গা চালায় না। বললাম, তাহলে আর কী করা যাবে বলো?

যো আপকা মরজি, বদ্রীপ্রসাদ সিঁড়ির ধাপে নামতে নামতে মুখ ফেরাল, লেকিন বাবুজী সাবধান। আমার কথাটা ইয়াদ রাখবেন। বলেই সে হনহন করে নেমে গেল।

পরদিন বিকেল পাঁচটায় তপোবন পাহাড়ের উদ্দেশে হন্টন শুরু করলাম। পাহাড়টা আশ্রম থেকে যতটা কাছে মনে হচ্ছিল, ঠিক ততটা কাছে কিন্তু নয়। আমার পৌঁছতেই প্রায় এক ঘণ্টারও উপর লেগে গেল। সমতলে হাঁটার অভ্যেস থাকলেও, এখানে ঈষৎ আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পথ, হাঁটা বেশ শ্রমদায়ক। তাই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তবে একটা দোকানে এক ভাঁড় চা পান করতেই হৃতশক্তি পুনরায় ফিরে পেলাম। একজন গাইডকে সঙ্গে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে গেলাম পাহাড়ের নিকটে।

এ পাহাড়ে ওঠা বিশেষ কঠিন নয়। অধিকাংশই সিঁড়ির ধাপ কাটা আছে। বেশ অনেকটা উপরে উঠতেই গাইড পবনকুমার বলল, ভাইসাব, আপনার ভাগ্য খারাপ। তাকিয়ে দেখুন, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

পবনকুমার বাংলাটা মোটামুটি বলে। আমি পশ্চিমাকাশে তাকাতেই আঁৎকে উঠলাম। একটা বিশাল মেঘের চাঁই ধীরে ধীরে শহরটা যেন গ্রাস করে ফেলছে। বৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। দুর্যোগের সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে ওপরে ওঠা বিপজ্জনক। তাই যতটা সম্ভব দ্রুত নিচে নেমে ফেরার তোড়জোড় করতে থাকলাম। সন্ধ্যে তখন নামব-নামব করছে। ভাবছি, হেঁটে ফিরব কিভাবে? পবনকুমারকে আমার অবস্থার কথা বিশদ বললাম। শুনে সে বিস্মিত, আপ আজীব আদমী। হেঁটে এসেছেন! এখান থেকে তো এখন গাড়ি-ঘোড়া পাওয়া বহুত মুশকিল।

বিপদ বুঝি এভাবেই আসে। এখানে আসার সময় কয়েকটা ট্রেকার-অটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। ভ্রমণার্থীরা সে-সব ভাড়া করে এসেছিল। কিন্তু এ মুহূর্তে সেগুলোও উধাও। দুর্যোগের আশঙ্কায় তারাও সব কখন কেটে পড়েছে।

এদিকে মেঘ ক্রমশ হয়ে উঠছে গম্ভীর। দূরের পাহাড়শ্রেণী সেই মেঘপুঞ্জকে টেনে নিতে চাইছে যেন চুম্বকের আকর্ষণে। পাহাড় ও মেঘের এই অপূর্ব ক্রীড়া দু'দণ্ড স্থির হয়ে দেখার মতন। কিন্তু সেদিকে তখন আমার চোখ টানলেও, মানসিক স্থিরতা নেই। মন চঞ্চল হয়ে আছে, কিভাবে আশ্রমে ফিরব। কি যে করব, মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। ওদিকে পবনকুমারও তেমন

কিছু ব্যবস্থা বা ভরসা দিতে পারল না। স্থির সিদ্ধান্ত নিতে বেশ কিছুক্ষণ দোলাচলে কেটে গেল। শেষে যা থাকে কপালে, এই ভেবে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

বৃষ্টি তখনও শুরু হয়নি। তবে ঘনিয়ে এসেছে গুমোট অন্ধকার। ঘনঘটা এমনই ভয়ঙ্কর যে, সন্ধ্যের প্রাক্কালে রাত্রি ঘনিয়ে এল প্রায়। একটু আগেও তপোবন পাহাড়টা অস্বচ্ছ দেখতে পাচ্ছিলাম। এখন সেটাও আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের গভীরে কোথায় হারিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঝেঁপে বৃষ্টি নেমে এল। সঙ্গে হাল্কা ঝোড়ো বাতাস ও ঘনঘন বিদ্যুতের ঝলকানি। মুহূর্তেই ভিজে সপসপে হয়ে গেলাম। ভিজতে ভিজতে এগিয়ে চলেছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার পথ। বেশ কিছুক্ষণ পর আমার মনে হলো, আমি ঠিক পথে যাচ্ছি তো?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আসার সময় এই পথেই এসেছিলাম কী? বিদ্যুৎ-এর ঝলকানিতে পথ চেনার চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা গেল না। অন্ধকারে বর্ষণসিক্ত পথঘাট সব বহুরূপীর মতন পাল্টে গেছে। আমার কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। ভয় হলো, যদি সঠিক পথে না এগোই তবে তো মহাবিপদ।

সাহসে ভর করে তবু এগোতে থাকলাম। পথে কোনো জনপ্রাণী নেই যে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব। কেবল আমিই অন্ধকারে ভূতের মতন হাঁটছি। ইতিমধ্যে অবশ্য বৃষ্টিটা থেমে গিয়েছিল। তবে ঝোড়ো বাতাস ও বিদ্যুৎচমকের কোনো বিরাম নেই। আমিও বিরামহীন হেঁটেই চলেছি। রাস্তা যেন আর শেষ হতে চায় না। কতক্ষণ হাঁটছি কে জানে? পকেট থেকে দামী হাতঘড়িটা সময় জানার জন্যে বার করলাম। বৃষ্টির জন্যে ঘড়িটা এতক্ষণ পকেটে পুরে রেখেছিলাম। ঘড়ির ফসফরাসের আলোয় সময় দেখে চমকে উঠলাম। আটটা বাজে! তার মানে দেড়ঘণ্টা ধরে হাঁটছি। এতক্ষণ তো আশ্রমে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় আশ্রম? তার তো কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। শুধু যেদিকে তাকাই হা-হা অন্ধকার।

আমার আর বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ রইল না যে, আমি ভুল পথের কবলে পড়েছি। তাহলে এখন উপায়? সারারাত্রি কি এভাবে পথের ধাঁধায় মরতে হবে নাকি? একেই সমস্ত শরীর ভিজে ইঁদুরের মতো চুপসে গেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছিও। পা দুটো আর যেন চলতে চাইছে না। ঠিক এমনি সময়ে নজরে পড়ল, দূরে, রাস্তার অপরপ্রান্তে একটি টিমটিমে আলোর বিচ্ছুরণ। সেই অস্পষ্ট আলোয় মনে হচ্ছে যেন কোনো আস্তানা-টাস্তানা সেখানে বিদ্যামান।

আলো জ্বলছে যখন, মানুষজন থাকবে নিশ্চয়ই। এই ভেবে আমি আলো লক্ষ্য করে এগোতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম বিস্তৃত এক ফাঁকা মাঠের মতন। সেখানে ইতস্তত কিছু অনুচ্চ ঢিবি আর বড় বড় গাছ-গাছালি। তারই একপ্রান্তে জীর্ণ পুরাতন, ভগ্নপ্রায় একখানা ঘর। একটি লম্ফের আলো সেই ঘরের চিলতে বারান্দা থেকে নিষ্প্রভ ছড়িয়ে পড়েছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার ফাঁকা মাঠে কেবলমাত্র একটাই জীর্ণ ঘর দেখে মনের মধ্যে কেমন যেন খটকা লাগল। কিন্তু তখন আমার শরীর-মনের অবস্থা এমনই যে, অতশত গুরুত্ব দেবার অবকাশ কই। এখন কোনোক্রমে একটা ঠাঁই পেলেই বর্তে যাই।

আমি সোজা বারান্দায় উঠে গেলাম। লম্ফটা এককোণে জ্বলছে। আমি বারকয়েক এদিক-সেদিক উঁকিঝুঁকি মারলাম। জোরে চেঁচালাম, এখানে কেউ আছ?

প্রত্যুত্তরে কতকগুলো চামচিকের ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল মাত্র। চারিদিক শুনশান। কোনো মনুষ্যপ্রাণীর সাড়া পেলাম না। ক্লান্তিতে আমার সারা শরীর ঝিমিয়ে আসছিল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। তাই সমস্ত ক্লান্তি উজাড় করে ভাঙা বারান্দার উপরেই বসে পড়লাম।

এইভাবে অনেকক্ষণ বসেই আছি, আর ভাবছি, কী কুক্ষণে যে হেঁটে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম! এখন মনে হচ্ছে, বদ্রীপ্রসাদের কথাটায় গুরুত্ব না দিয়ে বড় ভুল করেছি। এদিকে বাইরে বৃষ্টি না হলেও, বাতাস বয়ে চলেছে অবিরত। লম্ফটা আমার পাশেই রাখা ছিল। সেদিকে

নজর যেতেই বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। যেভাবে জোরে বাতাস বইছে, তাতে করে তো লম্ফটা এতক্ষণ জ্বলে থাকার কথা নয়। নিভে যাওয়া উচিত। তবে এটা কিভাবে জ্বলছে!

ব্যাপারটা এতক্ষণ তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় খেয়ালই করিনি। এখন খেয়াল হতেই বুকটা ধুকপুক করে উঠল। ঘটনাটা কী বোঝার জন্যে লম্ফটা হাতে তুলে নিতেই কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

কেউ এসেছে ভেবে সোৎসাহে উঠে দাঁড়াতেই চক্ষুস্থির! রক্ত হিম হয়ে এল। আমার নিকটেই দাঁড়িয়ে এক বিপুলাকার বীভৎস মূর্তি! তার শরীর থেকে মাংসপিণ্ড খসে-খসে পড়ছে! ক্ষত-বিক্ষত মুখাবয়ব। চোখমুখ নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে। শরীরময় অসংখ্য কীট, গলিত দেহে কিলবিল করছে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে উৎকট দুর্গন্ধ!

উঃ, কী নারকীয় দৃশ্য! মুহূর্তের আকস্মিকতায় আমি নিদারুণ আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। বারান্দা থেকে নেমে এলাম ভয়ার্ত আর্তনাদে। তারপর আতঙ্কের বিহ্বলতায় দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য হয়ে লাগালাম প্রাণান্তকর দৌড়—

দৌড়...দৌড়...দৌড়...

খানা-খন্দ, জলকাদা পেরিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়চ্ছি। কতবার যে হোঁচট খেলাম, তবু উঠে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়চ্ছি। এইভাবে দৌড়তে-দৌড়তে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড হাঁপাতে থাকলাম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। চলারও আর কোনো শক্তি রইল না। মনে হচ্ছিল, ওইখানেই বোধহয় সংজ্ঞাহীন লুটিয়ে পড়ব। ভয়ে-অবসন্নে গাছের গুঁড়িকেই আঁকড়ে ধরে আত্মরক্ষা করতে চাইলাম।

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, অকস্মাৎ বাতাসে ভেসে এল 'ঠুনঠুন-ঠুনঠুন' শব্দ। আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। টাঙ্গার শব্দ না! শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে চিৎকার করে উঠলাম, কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও...বাঁচাও...

ক্রমশ সেই ঠুনঠুন শব্দ আমার নিকটে এসে থেমে গেল। মুহূর্তের বিদ্যুৎচমকে দেখতে পেলাম, সম্মুখে একাট টাঙ্গা দাঁড়িয়ে!

বাবুসাব আপ, ইস কব্বরস্থান মে? টাঙ্গাওয়ালার খ্যাড়খ্যাড়ে কণ্ঠ শোনা গেল।

চকিতে মনে পড়ে গেল বদ্রীপ্রসাদের কথা। ক্ষীণস্বরে বললাম, কে, বদ্রীপ্রসাদ?

হাঁ, বদ্রীপ্রসাদ—

বদ্রীপ্রসাদ—এ নাম শোনা মাত্রই দ্বিতীয় জীবন পেলাম যেন। আমি কালবিলম্ব না করে সোজা তার টাঙ্গায় চড়ে বসলাম।

আশ্রমে যখন ফিরলাম, তখন বেশ রাত। গিয়ে দেখি, মহারাজজী আমার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে জেগে বসে আছেন। থমথমে মুখ কিছুটা রাগান্বিতও মনে হলো।

আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা ধীরে ধীরে বললাম। শুনে তিনি কিছুক্ষণ উদাস হয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে স্থিরকণ্ঠে বললেন, আপনার ভাগ্য ভাল, এ-যাত্রায় বেঁচে ফিরেছেন। আর যার জন্যে ফিরলেন সেই বদ্রীপ্রসাদ কোনোদিন কারও ক্ষতি করেনি। বরাবর সকলের ভালই করতে চেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী জানেন, বদ্রীপ্রসাদ আর ইহজগতে নেই। গত বছর এই রকমই এক অমাবস্যার রাতে, ঐ টুলিয়া কবরস্থানের কাছেই সে আর তার ঘোড়াটা রহস্যজনকভাবে মারা যায়!

কথাগুলো বলেই মহারাজজী ধীর পদক্ষেপে বিদায় নিলেন। আমি একাকী স্তম্ভিত বসে রইলাম।

রাত্রি কত হলো কে জানে!

আষাঢ় ১৪১০

চিলেকোঠার ভূত

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

বিশাখাপত্তনম পৌঁছতে প্রায় ভোর ছটা বেজে গেল। মোটঘাট নিয়ে গৌরকিশোর চললেন সমুদ্রের ধারের ভাড়া বাড়িতে। সঙ্গে স্ত্রী মালতী, মেয়ে সবিতা আর দু'ছেলে, পাটাই আর নিতাই।

ভজহরিও সঙ্গে আছে। বহুদিনের কাজের লোক ভজহরি। কাজের লোক হলেও গৌরকিশোরের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী।

এখানে বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন পাড়াতুতো দাদা নন্দলাল বসু। থাকেন বিশাখাপত্তনমে। নন্দদাকে লিখেছিলেন গৌরকিশোর—

'নন্দদা, তোমার বৌমার শরীর খারাপ। বায়ু পরিবর্তন দরকার। ওখানে একটা ঘরের ব্যবস্থা করো।'

সেই কথায় কাজ হয়েছে। ঘর যোগাড় হয়েছে। নন্দলাল স্টেশনে এসেছেন ওদের নিয়ে যেতে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। তাই গৌরের থেকে বছর আটেকের বড় হয়েও ছেলে-মেয়েদের কাকুই রয়ে গেছেন।

বাড়িতে পৌঁছে খুশি সকলে। ফরাসি আমলের দোতলা বাড়ি। লালচে রঙের আর্চ করা দোতলার বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। হুটোপুটি শুরু হয়ে গেছে ছেলে-মেয়েদের। সকলের 'মনপসন্দ' হয়েছে বাড়িটা, ভজু বাদে। সে শুধু খুঁতখুঁত করে, এত বড় বাড়ি এখানে কি দরকার? পরিষ্কার করা কি চাট্টিখানি কথা? ওর কথায় গৌরকিশোর বলেছেন, কলকাতায় তো এতবড় বাড়িতে থাকতে পাস না, থাক না এখানে। তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বলেন, সবিতা, তোমার দায়িত্ব ভাইদের দেখাশোনা করা। ওদের কখনও ছাতে যেতে দেবে না, সমুদ্রের ধারেও না।

কুবুদ্ধির রাজা পাটাই, সবিতা তা ভালভাবে জানে। তাই সে বলে, যদি পাটাই কথা না শোনে?

তখন আমায় বলবে। এই পাটাই-নিতাই, দিদির কথা তোমরা নিশ্চয় শুনবে।

ঘুলঘুলির ভূত

বেশ কয়দিন পর সবিতা দুপুরে একখানা গল্পের বই নিয়ে শুয়েছে। নিঝুম দুপুর। বেশ গা-ছমছমে বইখানা। পড়তে পড়তে একদম ডুবে গেছে সবিতা, এমন সময়ে কানে এল পাটাইয়ের গলা, এই দিদি, ছাতে যাবি?

পাটাই! ঘুমোসনি এখনও?

চল না দিদি, ছাতটা দেখে আসি।

বাবা বকবে।

জানতেই পারবে না।

ভাইয়ের অনুরোধ আর ছাত থেকে সমুদ্র দেখার লোভে রাজী হয়ে যায় সবিতা। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দু'জনে ধাক্কা খায়। ক্ষোভের গলায় সবিতা বলে, এ কী পাটাই, দরজা তো পেরেক পুঁতে বন্ধ করা।

পাটাই উত্তর দেয়, কোনো চিন্তা নেই, এই দেখ, আমি খুলে দিচ্ছি।

তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এতদিন ধরে বন্ধ দরজাটা তুই খুলতে পারবি?

হোক না। 'না পেরু পাটাই'। অর্থাৎ আমার নাম পাটাই।

পাটাইয়ের গলার স্বরে চমকে উঠেছে সবিতা।

এই ভাষা কোথায় শিখলি রে? এটা তো তেলেগু ভাষা।

বলবো কেন?

কথা বলতে বলতে একটানে দরজাটা খুলে ফেলেছে পাটাই। সবিতা আশ্চর্য হয় পাটাইয়ের দরজা খোলায়। বলে, তুই যে ভেলকি দেখাচ্ছিস রে। দরজাটা কি খোলা ছিল?

কোনো উত্তর না দিয়ে পাটাই ছাতের এক কোণ থেকে অন্য কোণে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল, যেন হাওয়ায় ভাসছে।

ছাতের চিলেকোঠায় অনেকগুলো চোরা কুঠরি। সেই চোরা কুঠরিতে অসংখ্য ঘুলঘুলি রয়েছে। পায়রাগুলো ডানা ঝটপটিয়ে উড়ছে। আবার ঢুকে যাচ্ছে ঘুলঘুলিতে।

একটা কুঠরিতে ঢুকে আবার আর একটা কুঠরিতে ঢোকা যায়। সবিতার গা ছমছম করে ওঠে। ভাবে নেমে যাবে, কিন্তু বের হতে পারে না। একি গোলকধাঁধা রে বাবা!

বাবার কাছে শুনেছিল লক্ষ্ণৌয়ের ভুলভুলাইয়ার কথা। এ তো তেমনি মনে হচ্ছে। ভয়ে চিৎকার করে ওঠে, পাটাই, তুই কোথায়? সে কথা পাটাইয়ের কানে গেল কিনা কে জানে!

এই কুঠরি থেকে সেই কুঠরি ঘুরতে ঘুরতে সবিতার ভয়ে দম বন্ধ হবার অবস্থা। হঠাৎই কানে এল চিঁ চিঁ শব্দ।

'আক্কা নেনু ইক্কড়া। ইদি চুড়ু।' অর্থাৎ দিদি আমি এখানে। এই দেখ।

সবিতার নজর যায় ওপরের ছোট ঘুলঘুলিতে। কেমন ছোট্ট হয়ে বসে আছে পাটাই। সে চেঁচায়, পাটাই, নাম বলছি। বাবাকে বলে দেব।

আবার সেই চিঁ চিঁ শব্দ। ভর দুপুর তখন। মনে হলো রাত হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ। গোঁ গোঁ করে শব্দ হতে থাকে সবিতার মুখ দিয়ে।

কি হয়েছে? এই সবিতা, স্বপ্ন দেখছিলি?

সবিতা চোখ মেলে দেখে, বাবা-মা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। বিছানায় শুয়ে আছে সে।

কি হয়েছে মা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সবিতা।

কি আবার হবে গোঁ গোঁ শব্দ করছিলি। যত নষ্টের গোড়া ঐ ভজুটা। যত্ত সব ভূতের গল্প করে এই হাল করছে। গৌরকিশোর রাগে গজগজ করেন।

সবিতা চোখে-মুখে জল দিয়েই ছোটে পাটাই-নিতাইয়ের ঘরে। ওমা! এই তো পাটাই নিতাইকে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই যদি হবে তাহলে ঐ ছাতের পাটাই কে? ওটা কি পাটাই না? সত্যিই কি সে স্বপ্ন দেখেছে? সিঁড়িটাই দেখা যাক না। সবিতা এগিয়ে যায় সিঁড়ির দিকে। একি! এ তো সেই স্বপ্নে দেখা দরজার মতোই দরজা। তবে পেরেক মেরে আটকানো। সবিতা ভাবে এ কথা কাউকে বলা যাবে না। তাহলে ছোটরা ভয় পাবে। সে ফিরে আসে সিঁড়ির থেকে। ভয়ে ঘাড় শিরশির করেছে। পায়রার ঝটপটানি শুনেই তরতরিয়ে লাফিয়ে নামে দোতলায়।

স্বপ্ন দেখেনি। এ বাড়িতে ভূত আছে। মায়ের শরীর খারাপ। তাই মুখ বন্ধ করে রাখে সবিতা। কিন্তু একটা ভয় তাকে তাড়া করে সব সময়।

বিড়ালখেকো ভূত

একদিন গৌরকিশোর ছেলেদের জন্য সুন্দর সুন্দর পাথরের পুতুল নিয়ে এলেন। একটা বিকট মূর্তি দেখিয়ে সবিতা বলে, বাবা, এটা কি গো?

ওটা দক্ষিণ ভারতের লোকেরা ঘরে রেখে দেয়। যাতে কারও কুদৃষ্টি না পড়ে সেইজন্য।

মূর্তিটা হাতে তুলে নেয় সবিতা। ভাবে ভালই হয়েছে। এবার থেকে এই বীভৎস মূর্তিটাই তাকে রক্ষা করবে। মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকে সবিতা। মূর্তি নয়, একটা বিকট মুখ। তার চারপাশে সূর্যের মতো ছটা। ঠোঁটের দুই ধার থেকে বেরিয়ে আছে দাঁত। লম্বা নাকের নিচে ইয়া গোঁফ। রক্তাভ চোখ দেখলে ভয় হবে। পুতুলটায় নিমগ্ন হয়ে গেছে সবিতা। বাবার ধমক কানে এল।

কি হলো পাটাই? ঝগড়া করছো কেন?

দেখো না বাবা, দাদা ঐ ঘোড়সওয়ার পুতুলটা দিচ্ছে না। নিতাই বলে।

পাটাই, দিয়ে দাও ভাইকে।

না। ওটা আমি নেব।

ঠিক আছে কাউকে নিতে হবে না। বলেই একটানে গৌরকিশোর পুতুলটা জঙ্গলে ছুঁড়ে দিলেন।

পাটাইয়ের চোখে জল এসে গেল, অত সুন্দর একটা পুতুল হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়। নিতাইয়েরও কষ্ট হলো পুতুলটা না পেয়ে। কিন্তু দাদা পুতুলটা পায়নি তাতেই কষ্টটা লাঘব হলো।

মুখটা কাছে থাকায় সবিতার ভূতের ভয় কমেছে। তবুও অন্ধকারে ভূতের ভয়ে গা শিউরে ওঠে। খাটের নিচে মনে হয় ভূত লুকিয়ে আছে। পা গুটিয়ে নিয়ে বসে। সেদিন বেশ একটু রাত হয়ে গেল পড়তে পড়তে। ভজহরি দুধ হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও। গ্লাসটা রাখতে রাখতে বলল ভজহরি।

ভজুদা, তুমি একটু বসবে? মিনতি করে সবিতা। আমার একা ভয় করছে।

কেন ভয় করছে? আচ্ছা বসছি, তুমি পড়।

বেশ মন লাগিয়ে পড়ছে সবিতা। হঠাৎ কেমন একটা শব্দ হলো। সবিতা দেখে ভজহরির জায়গায় পাটাই বসে আছে।

এই পাটাই, ভজহরিদা কোথায় গেল?

'নেনু ভজহরি, ইদি চুডু। পাটাই বেলপোইন্দি'। অর্থাৎ আমি ভজহরি, এই দেখ। পাটাই চলে গেছে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে সবিতার। হ্যাঁ ঠিকই তো। ঐ তো ভজহরি ঝিমোচ্ছে। একি দেখছে সবিতা! তবে কি নিজেই ঘুমোচ্ছে?

ও ভজহরিদা।

সবিতার ডাকে ভজহরি মুখ ফেরাল তার দিকে। আঁৎকে উঠল সবিতা। এ কোন ভজহরি! গালের মাংস ঝুলে পড়েছে। হিহি করে হাসছে। সাপের মতো সরু চেরা জিভ মুখ থেকে একবার বেরুচ্ছে আবার ঢুকছে। হঠাৎ একটা বিড়ালছানা বের হয়ে এল ভজহরির মুখ থেকে। ম্যাঁও ম্যাঁও করে হাঁটতে হাঁটতে সে যেই একটু এগিয়েছে অমনি লকলকে জিভ দিয়ে সুরুৎ করে বিড়ালছানাটাকে টেনে নিল ভজহরি। গজদন্ত বের করে বিড়ালের গলা ফুটো করে রক্ত চুষতে লাগল। তারপর মাথাটা হাতে ধরে ছানাটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। সবশেষে মাথাটা সবিতাকে দেখিয়ে তেলেগুতে জিজ্ঞেস করে, খাবে?

সকালে জ্ঞান ফিরতে সবিতা দেখে বাবা-মা, পাটাই-নিতাই সবাই তার পাশে। ভজহরির দিকে চোখ পড়তেই আবার জ্ঞান হারায় সবিতা।

সবিতা অসুস্থ। তাই ডাক্তারের কথা মতো ভজহরি ও পাটাইয়ের সবিতার ঘরে ঢোকা বারণ। দিদি ঘুমোলে পাটাই দিদির কাছে বসে। ছেলের চোখের জল দেখে মালতী সান্ত্বনা দেন—যা শুয়ে পড়। দিদি ভাল হয়ে যাবে।

ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক হয় সবিতা।

ঘোড়সওয়ার ভূত

একমাসও পেরোয়নি। আবার আর এক কাণ্ড। দুপুরে বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। গরম হাওয়া বইছে। ঘুম আসে না নিতাইয়ের। মনে হয় সেই ঘোড়সওয়ার পুতুলটার কথা। খুঁজলে কেমন হয়? দাদাকে ডাকে, এই দাদা, জঙ্গলে ঐ ঘোড়সওয়ার পুতুলটা খুঁজতে যাবি?

না। আবার তুই ঝগড়া শুরু করবি।

সত্যি বলছি, আর করবো না। নিয়ে নিস তুই।

বাবা যদি টের পায়?

চুপ করে যাব আর আসব।

নিঃশব্দে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় দু'জনে। ঝোপঝাড়ে ভরা মাঠ। সেখানেই ওদের বাবা ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই পুতুলটা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা পাক খেয়ে তবে সেই জঙ্গলে আসতে হয়েছে।

এই দাদা, কি সুন্দর ঘাস ওখানটায়। ঐ দ্যাখ একটা ছোট্ট ছেলে। ওমা! কি সুন্দর একটা কালো ঘোড়া।

ওটাকে বলে টাট্টু ঘোড়া। মায়ের কাছে গল্প শুনিসনি? বলে পাটাই। চল ওর সঙ্গে কথা বলি।

দু'জনেই এগিয়ে যায়।

তুমি কোথায় থাক গো? পাটাই প্রশ্ন করে।

হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেয় ছেলেটি যে, ও ওখানেই থাকে। অর্থাৎ ওই মাঠে। নিতাই তাজ্জব বনে যায়। মাঠে কি কেউ থাকে? ছেলেটার হাতে কাজুফুল। সে ওগুলো কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে।

তুমি কি খাচ্ছ গো?

কাজুফুল।

কেমন খেতে?

পাটাই এবার এক ধমক দিয়ে নিতাইকে বলে, হ্যাংলা কোথাকার। ও কি খাচ্ছে তাতে তোর কি? ভাইকে বললেও নিজে এগোয় ছেলেটার দিকে। ঘোড়ার লোভেই যায়। জিজ্ঞেস করে, এই ঘোড়াটা কি তোমার?

'নাকু', মানে হ্যাঁ আমার।

কি সুন্দর ঘোড়া, তাই নারে দাদা!

পাটাইয়ের চোখে খুশির দৃষ্টি। বলে, হ্যাঁ।

এবার আলাপ জমাবার ইচ্ছায় ছেলেটার কাছে ঘেঁষে দু'জনে। কিন্তু ছেলেটা বাংলা জানে না। তাই হিন্দীতেই কথা হয়। হাত নেড়ে ইশারাতেও মনের কথা বোঝাতে চেষ্টা করে তিনজনে।

তোমার নাম কি?

'না পেরু রামণ'। আমার নাম রামণ।

হাসতে হাসতে পাটাই বলে, না পেরু পাটাই। মেরা ভাই নিতাই।

রামণও হাসে পাটাইয়ের কথায়। বলে, ভাই কাদু। ভাই না। তমরু। 'না তমরু, তেলসিন্দা'?

ওর কথায় বুঝে নেয় পাটাই যে তমরু মানে 'ভাই'। আর তেলসিন্দা মানে 'জান'?

রামণ দারুণ খুশি। বলে, পাটাই তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান?

না ভাই। কাছ থেকে কখনও ঘোড়া দেখিনি। দূর থেকে ঘোড়ায় চড়া দেখেছি। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান?

কেন জানবো না। এই দেখ।

হঠাৎ রামণ ঘোড়ায় চড়ে বসে। সাঁ সাঁ করে তীরবেগে ছুটল সে ঘোড়া। সবুজ ঘাসের গালিচা থেকে একেবারে শূন্যে উঠে গেল আকাশপথে।

এই দাদা, ঘোড়াটা হাওয়ায় পা ফেলে ছুটছে রে। তোর ভয় করছে না?

তুই একটা ভীতুর ডিম। ঝাঁসির রানীর ঘোড়ায় চড়া দেখিসনি? মনে হয় না শূন্যে লাফিয়ে চলছে?

সে তো ছবিতে। মাঠে এত ঘাস কোত্থেকে এল রে? একটু আগে তো এমনটা ছিল না?

মাঠে ঘাস থাকবে না তো কোথায় থাকবে? বোকা কোথাকার! দাদার কথায় নিজেকে বোকা মনে করেনি নিতাই। মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খেয়েছে। কেমন যেন গা ছমছমে ভাব এই দুপুরটায়। ওরা যেন একটা অজানা জায়গায় চলে এসেছে।

রামণ ঘোড়া নিয়ে নেমে এসেছে। সেই একই রকম সাঁ সাঁ করে। নিতাই-এর চকচকে ঘোড়াটা ছুঁয়ে দেখতে ভারি লোভ হয়। তাই সে রামণকে বলে, ভাই রামণ, তোমার ঘোড়াটায় একটু হাত দি?

কেন দেবে না? দাও না। ঘোড়ায় চড়বে?

না না। একটু হাত দেব।

নিতাই এগিয়ে গেছে ঘোড়ার কাছে। ঘোড়ার পিঠে হাত ছোঁয়াতেই ভয় পেয়ে যায় নিতাই। হিম বয়ে যায় শিরদাঁড়ায়। এ আবার কেমন ঘোড়া? পাথরের মতো শক্ত শরীর আর বরফের মতো ঠাণ্ডা গা। জ্যান্ত ঘোড়া এমন হতেই পারে না। নিতাইয়ের গলার স্বর কেঁপে ওঠে, এই দাদা, বাড়ি চল। বাবা জানলে কিন্তু মেরে ফেলবে।

এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? ঘোড়ায় চড়বো না?

না, চড়বি না। দাঁড়া, আমি বাবাকে বলছি। বলেই নিতাই দৌড়তে থাকে।

চলি রমণ। তুমি কি রোজই আস? কাল আসবে।

পাটাই ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে ভাইকে। ধমকায় ওকে, তুই কেমন বল তো? যদি বা একাট বন্ধু জুটল, দিলি তো বাগড়া। দিদির শরীর ভাল নেই বলে এমনি মন ভাল নেই।

তুই তো তখন থেকে ঘোড়া ঘোড়া করছিস। একবারও সেই পুতুল ঘোড়াটার কথা বললি?

ঠিক বলেছিস তো নিতাই। থাকগে কাল আবার আসব। রামণের ঘোড়ায় চড়বো।

না। তুই ঐ ঘোড়ায় চড়বি না। ওটা ভাল ঘোড়া না।

আমি চড়বোই চড়বো।

ঠিক আছে, আমি বাবাকে বলে দেব।

আমিও বাবাকে বলে দেব তুই ঐ পুতুল ঘোড়াটা খুঁজতে আমায় ডেকেছিলি।

বাড়ির কাছে এসেই ঝগড়া থেমে যায়। পাটাই বলে, এই নিতাই, চল তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। এখুনি ভজুদা এসে যাবে। দু' ভাই ছুটে এসে ঘরে ঢুকে বিছানায় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। একটু পরেই সেখানে আসে ভজহরি। হাতে হরলিক্স-এর গ্লাস। ভজহরি ডাকে, পটাই, নিতাই উঠে পড়।

তবুও নিঃশব্দ দু' ভাই। এমনটা তো হয় না। অন্যদিন ভজহরি এসে দেখে দু'জনে মারপিট করছে। সন্দেহ হয় তার। নজর যায় পায়ের দিকে। দু'জনের পা-ই কাদা মাখা।

কোথায় গিয়েছিলি তোরা?

আমরা তো ঘুমোচ্ছিলাম। পাটাই-নিতাইয়ের সাফ কথা।

ভজহরি ধমক দেয়, সত্যি করে বল কোথায় গিয়েছিলিস।

কোথাও যাইনি তো। কাঁদো কাঁদো গলা নিতাই-এর।

তাহলে কাদা কোথা থেকে এল? দাদাবাবুকে ডাকি।

ভয় পায় দু'জনেই। বলেই ফেলে কথাটা। তবে আসল ঘোড়ার কথা না বলে নকল ঘোড়া খোঁজার কথা বলে।

ভর দুপুরে বেম্মদত্যি থাকে। জান? ওরা কি করে?

ভয়ে মুখ শুকিয়েছে নিতাইয়ের। আসল ঘোড়ার কথা ভজুদাকে বলতে গেছে, অমনি দাদার এক চিমটি । থেমে গেছে নিতাই।

কী বলছিলি রে নিতাই? কোন ঘোড়া?

ঐ পাথরের ঘোড়া।

তাই বল। আমি ভাবি অন্যকিছু। যা, পা ধুয়ে আয়। রাজ্যের কাদা নিয়ে বিছানায় উঠেছে।

ভাজহরি চলে যেতেই দাবড়ে ওঠে পাটাই, তুই একটা গাধা। ঐ ঘোড়ার কথা ভজহরিদাকে বলে?

ঠিক আছে যা। আমি গাধা। আর তুই পণ্ডিত। যা না, ঐ ঘোড়ায় চড়। ওটা তো ঘোড়া না, ভূত। নইলে অমন শক্ত আর ঠাণ্ডা হয়?

তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিদির মতো স্বপ্ন দেখছিলি।

ভাল। যা, তোর সঙ্গে আর যাব না। তোকে ঘোড়া ভূতে ধরুক।

মার খাবার ভয়ে চোঁ চাঁ দৌড় লাগায় নিতাই মার ঘরের দিকে। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই আবার কলঘরে ছোটে পা ধুতে।

ভূতের শয়তানি

সেদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই কারেন্ট নেই। হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে বসেছে দু'ভাই। পাটাই বারবার হ্যারিকেনের ডাঁটির দিকটা নিতাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। অসুবিধে হওয়ায় নিতাই অভিযোগ করে, অ্যাই দাদা, দেখতে পাচ্ছি না যে!

তোর থেকে আমার উঁচু ক্লাসের পড়া। বেশি আলোটা আমারই দরকার।

নিতাই চুপ করে গেল। ঝগড়া এগোল না। পাটাই উঠে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধ করলি কেন? আমার ভয় করছে।

দরজা খোলা থাকলেই তো ভূত ঢুকবে। তাই বন্ধ করে দিলাম।

বইয়ের অক্ষর ভালমতো দেখতে না পাওয়ায় ঘুম পেয়ে যায় নিতাইয়ের। ঢুলতে থাকে সে। আচমকা চুলে এক টান লাগে। চটক ভেঙে যায়। চোখ চেয়ে নিতাই বলে, এই দাদা, চুল ধরে টানলি কেন রে?

আমি আবার কখন টানলাম? পাটাইও ঘুমে ঢুলছিল। নিতাইয়ের কথায় তাড়াতাড়ি সজাগ হবার চেষ্টা করে।

নিতাই শাসায়, এরপর চুল টানলে বাবাকে বলে দেব।

কিছুক্ষণ পর আবার চিৎকার। এবার পাটাইয়ের।

নিতাই তোর সাহস তো কম নয়। বড় দাদার চুল টানছিস? এক চড় মারব।

নিতাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, তুই-ই তো তখন থেকে আমার চুল টানছিস। আর এখন আমার নামে দোষ দিচ্ছিস। আমি বলে ঘুমাচ্ছি।

মিথ্যা বলিস না।

কে মিথ্যা বলছে। যতবার আমি ঢুলেছি, তুই চুল টানিসনি?

হঠাৎ-ই খ্যাঁক খ্যাঁক করে নাকি সুরে হাসির শব্দ কানে আসে। পাটাই ভাবে বুঝি নিতাই হাসছে। সে আরো রেগে বলে, তোর সাহস তো কম নয় নিতাই। অন্যায় করে আবার হাসছিস!

আমি হাসলাম? না তুই? ভূতের মতো নিজে হাসছে আবার আমাকে বলে।

কি আমায় ভূত বললি?

তোকে বলিনি। তোর হাসিটাকে ভূতের হাসি বলেছি।

ঠিক এই সময় দরজায় ধাক্কা পড়ে। ওপাশে গৌরকিশোরের গলা শোনা গেল, দরজা খোল। দরজা লাগিয়েছ কেন?

দরজা খুলে দিতেই চিৎকার করে ওঠেন গৌরকিশোর, কি হচ্ছে? এত হৈচৈ?

নিতাই নালিশ জানায়, দেখ না বাবা, দাদা আমার চুল টানছে। প্রতিবাদ করে পাটাই, না বাবা, নিতাই আমার চুল টেনেছে বারবার।

কিন্তু কেন ও তোমার চুল টানবে? জানতে চান গৌরকিশোর।

পাটাই বলে, ঘুম পাচ্ছিল, তাই মাথা নিচু করে ঘুমোচ্ছিলাম। নিতাই চুল টেনে উঠিয়ে দেয়।

না বাবা, দাদার মাথায় আমি হাতই দিইনি। দাদাই আমার চুল ধরে টেনেছে।

মিথ্যে বলছে।

ছোট ছেলের চোখের জলে গৌরকিশোর বুঝলেন সে সত্যিই বলছে। এবার পাটাই-এর দিকে ফিরলেন। দেখেন পাটাইয়ের ঘা খাওয়া দৃষ্টি। তার মানে দু'জনের কথাই সত্যি। তবে কে চুল টানল?

ছেলেদের আশ্বস্ত করেন তিনি, এটা নিশ্চয়ই তোমাদের ভজুদার কাজ। মাঝের দরজা দিয়েই ভজু এসেছিল এ ঘরে।

ভজুর কথায় নিতাইয়ের চোখ-মুখ স্বাভাবিক হয়।

গট গট করে নিচে নেমে গেলেন গৌরকিশোর। রান্নাঘরে ঢুকে ভজহরিকে বললেন, তোকে নিতাই কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি তুই ওদের চুল ধরে টেনেছিস।

সে কি কথা? আমি খোকাদের চুল টানব কেন? দেখগে টেনেছে কোন বেম্মদত্যি!

আরে বেম্মদত্যি নয়। ফাঁকা জায়গা তাই উল্টোপাল্টা ভাবে।

ভজহরি গলা নামিয়ে বলে, আমি বলি কি, দাদাবাবু এ বাড়িটা তুমি ছেড়ে দাও। সেদিন কেরোসিনের দোকানে শুনলাম....।

যত্তো সব আজগুবি গল্প। এই তোর জন্য ছেলেমেয়েগুলো অমন ভয়কাতুরে, যেতে যেতে শোনালেন গৌরকিশোর।

হ্যাঁ। তুমি তো কিছুই মাননি। যা খুশি কর। উত্তর দেয় ভজহরি।

রাক্ষুসে ভূত

চিন্তা ধরে ভজহরির। ভাবে ছেলেপিলেগুলোর কিছু যেন না হয়। কি যেন বলল দাদাবাবু?

এই যাঃ, ডালটা শুকিয়ে গেল। মাছের কালিয়া, ডাল আর ডিমের বড়া আজকের রান্না। বড়াটা বাচ্চাদের প্রিয়।

রান্নাঘরে বড়ার প্লেট আনতে গিয়ে দেখল মাত্র ক'খানা পড়ে আছে। কোথায় গেল অতগুলো বড়া? ভয় ধরে গেল ভজহরির। মনে পড়ল ছেলেদের চুল টানার কথা। কাঁপুনি আসছে তার। ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। নতুন করে বড়া ভাজার ক্ষমতা নেই ভজহরির। ভয়টা গ্রাস করছে তাকে। চারপাশে গরম হাওয়া পাক খাচ্ছে। গলায় জোর আনে ভজহরি।

সবিতা, পাটাই, নিতাই—তোমরা খেতে এস।

ছুটতে ছুটতে আসে সকলে।

কি করেছ ভজুদা?

খেতে বস। দেখতে পাবে।

কি রে ভজহরি, খাসা গন্ধ বেরিয়েছে যে। একি! বড়া এত কম কেন রে? গৌরকিশোরের কথায় উত্তর দেয় না ভজহরি।

আর একটা বড়া দাও না ভজুদা। বলতে বলতে সবিতার চোখ পড়ে বড়ার প্লেটের ওপর। ভজহরিদার তো বড়া নেই! সেকথা মাকে বলতেই মালতী বলেন, সেকি! তোমার বড়া নেই! তিনি নিজের পাত থেকে তুলে দিতে যান। ভজহরি বাধা দেয়, না গো বৌ-ঠাকুরুন, তুমি খাও। আজ আমার খাবার ইচ্ছা নেই।

গৌরকিশোর আন্দাজ করেন কিছু একটা হয়েছে। তাই সকলে ওপরে চলে গেলেও তিনি যান না। ভজহরিকে বলেন, নে তুই বসে পড়। আর খেতে খেতে বল আমায় কি হয়েছে?

এ বাড়িতে অপদেবতা আছে।

বাজে কথা বলিস না।

বাজে কথা নয়। চোদ্দটা বড়ার পাঁচটা রইল আর বাকিগুলো গায়েব। কে খেল?

বিড়াল এসেছিল হয়তো।

হ্যাঁ। বিড়াল মানুষের মতো টপাটপ বড়া উঠিয়ে নিতে পারে? তুমি আমায় বিশ্বাস করনি?

তোকে বিশ্বাস করবো না কেন? তবে ভূতে বিশ্বাস নেই। অনেকে চাঁদনী রাতে কলাগাছকে বৌ ভেবে অজ্ঞান হয়ে যায়। ভাবে ভূত রয়েছে।

হঠাৎ-ই হি হি হাসির আওয়াজ। রাগে গৌরকিশোর চিৎকার করলেন, কে রে? বদমায়েশি করার জায়গা পাসনি?

ভাত ফেলে উঠে পড়ে ভজহরি। গৌরকিশোর বলেন, তুই দেখছি আমার মাথাটা খারাপ করে দিবি। তোর ভয় পেলে চলে? তাহলে ওরা কি করবে?

ঠিক আছে দাদাবাবু, এসব কাকখেও বলবো না।

ছাতে ভূতের নৃত্য

সে রাতে ভজহরি ছেলেদের ঘরে শোয়। নিতাই-পটাই দিব্যি ঘুমোয়। কিন্তু ভজহরির চোখে ঘুম আসেনি। সারারাত ছাতে দত্যি-দানবের শব্দ। কান পাতা দায়। এক সময় মনে হয় যেন টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে কেউ। কখনও বা মড়াকান্না। মাঝে মাঝেই ওঠে কচি গলার মরণ আর্তনাদ—

'অ্যাঁই মো নেনু সচ্ পোইন্দি' (ও মা গো মরে গেলাম)।

ভজহরি....এই ভজহরি। বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাকেন গৌরকিশোর। ভজহরি উঠে দরজা খোলে। বলে, তোমারে এত বললাম শুনলে না।

চুপ কর, ধমকে ওঠেন গৌরকিশোর। ছেলেদের দেখিস। কেউ ভয় দেখাতে চাইছে। টর্চটাও আবার জ্বলছে না। সকালে ব্যাটারি ভরেছি টর্চে। এই তো একটু আগে জ্বলল। এখন জ্বলছে না কেন?

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো একটা আলোর স্রোত ঘরে ঢুকে গেল।

ভজহরি আঁতকে উঠল, দাদাবাবুগো!

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হবে। ভয় পাস না। ওদের নিয়ে ও ঘরে চল।

সারারাত চোখের পাতা এক হয় না গৌরকিশোর, ভজহরি আর মালতীর। ভোররে দিকে সব থামতে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিতাই গায়েব

ঘুম থেকে উঠেই পাটাই তাজ্জব। এ ঘরে কখন এল! ওর আর নিতাইয়ের তো অন্য ঘর। নিতাই তো পাশে নেই? অন্য বিছানায় দিদি ঘুমোচ্ছে। মা বিছানায় নেই। পাটাই উঠে বসেছে বিছানায়। মাকে ঘরে ঢুকতে দেখে পাটাই জিজ্ঞেস করে, নিতাই কোথায় গো মা?

কেন? ঝগড়াও করা চাই আবার কাছে না থাকলেও চলে না।

বল না কোথায় গেছে?

নিচে গেছে বোধহয়।

কোনোরকমে হাত-মুখ ধুয়েই নিচে ছুটেছে পাটাই।

ভজহরিদা, নিতাই কোথায় গো?

কেন, ওপরের ঘরে নেই?

না।

শুকনো গলায় ভজহরি বলে, সে কি? কোথায় গেল? উনোন থেকে কড়া নামিয়ে রাখে ভজহরি। হাঁক-ডাক শুরু করে।

বাবার সঙ্গে যায়নি তো? নিচে নামতে নামতে সবিতা প্রশ্ন রাখে। মালতী কাঁদো কাঁদো গলায় ভজহরিকে বলে, ভজহরিদা, বাইরে একটু দেখবে? যদি সমুদ্রের দিকে যায়?

ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেছে ভজহরি।

বেশ কিছুক্ষণ হলো কারোরই পাত্তা নেই। ঘরে ঢুকলেন গৌরকিশোর সঙ্গে নন্দলাল বসু।

মালতী কেঁদে বলেন, নিতাইকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মানে? চমকে ওঠেন গৌরকিশোর। ভজহরি কোথায়?

এরই মধ্যে ভজহরি ওঝাকে নিয়ে হাজির। গৌরকিশোর রেগে গেলেন, নিতাই কোথায়? পেলি না? তাই একে ধরে এনেছিস? উজবুক কোথাকার!

ও ভূত তাড়ায়।

এবার আমি ওকে তাড়াবো।

নন্দলাল গৌরকিশোরকে থামালেন। ওঝা ছুটে গেল তেঁতুল গাছটার দিকে। পাক খেতে লাগল তেঁতুল গাছটাকে। মুখে সমানে মন্ত্র বলে চলেছে।

এমন সময় নিতাই ছাতের সিঁড়ি ধরে নেমে এল। গৌরকিশোর ধমকে উঠলেন, মানা করেছিলাম না ছাতে যেতে?

দাদা তো আমায় ডেকে নিল।

ওমা, আমি আবার কখন ছাতে গেলাম, অবাক হয় পাটাই।

তুই পাটাইকে ছাতে দেখেছিস? গৌরকিশোর জিজ্ঞেস করেন।

হ্যাঁ, দাদা তেঁতুল গাছ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে আবার গাছে উঠেছে, নিতাই বলে।

বাবা, আমিও পাটাইয়ের মতো একটা ছেলেকে ছাতে দেখেছি। ঐ ছেলেটাই ভজুদার রূপ ধরে বসে বিড়ালছানা খাচ্ছিল। দেখে অজ্ঞান হয়ে যাই আমি। সবাই ভয়. পাবে তাই বলিনি। ছাতে অনেক ছোট ছোট ঘর আছে, নারে নিতাই? বলে ওঠে সবিতা।

না। শুধু মাঠ আর তেঁতুল গাছ। আমরা ঘোড়ায় চড়ছিলাম। তাই নারে দাদা?

তুই ঐ সেদিনের ভূতটার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়েছিস।

ওঝার হুংকার বেড়ে যায়। 'ইক্কড়া পিশাচ উন্নদি' অর্থাৎ এখানে পিশাচ আছে। ঘর কেঁপে উঠছে সেই হুংকারে।

ধুনো, ঝাঁটা সবই ভজহরি সাপ্লাই দিচ্ছে। নেশাগ্রস্তের মতো লাল চোখে শিকারের পেছনে ছোটে ওঝা। সিঁড়ি বেয়ে চলল। থমকে দাঁড়াল বন্ধ দরজায়। বহুদিনের সিল করা দরজা।

দিদি, দরজা তো বন্ধ। তুই আর নিতাই কি করে ছাতে গেলি রে?

বহুদিনের দরজা ভাঙা হলো। ময়লা ছাড়া ছাতে আর কিছু নেই। ওঝা আবার ছুটল। মন্ত্র পড়ছে, 'ওঁ হিং ইল্লু খালি কাওয়ালি (ঘর খালি চাই)। পিশাচ গারু ইদি চুরুন্তি (ভূত মশায় এদিকে দেখুন)। নেনু নউ তুরুস্তানু (আমি তোমাকে ঝাঁটাবো)। ওঁ হিং পিশাচ বেল্লু বেল্লু বেল্লু (পিশাচ চলে যা)।

শপাং শপাং করে ঝাঁটার বাড়ি পড়তে লাগল তেঁতুল গাছে। নাকি কান্না শোনা গেল,—'আঁই মো নেনু সচ্‌পো ইন্দি'। সঙ্গে সঙ্গে গাছ ভেঙে পড়ল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল গাছটা। টকাস করে ঘোড়সওয়ারী পুতুলটা পড়ল ছাতে। নিতাই আর পাটাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পাটাই পুতুলটা তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেই আগুনে। তারপর নন্দলাল বসুর দিকে ফিরে বলল, নন্দকাকু, সচপোইন্দি কি গো?

মরে গেছি।

চুরুন্তি কি গো?

দেখুন।

এমা! ভূতকে কেউ আপনি বলে?

হাসে সকলে।

আপনি না বললে যদি ভূত ঘর না ছাড়ে তাই বলে। নন্দলালবাবু বলেন, তোর বাবাকে বলেছিলাম, এ বাড়িতে একটা ছেলে মারা যায়। যে-ই আসে এখানে ভূতটা তাদের বড় জ্বালায়।

নিতাইয়ের চোখে ভয়ের দৃষ্টি দেখে আবার বলেন, আর ভয় নেই। সেই ছেলেটা চলে গেছে। গাছটাও মরে গেছে। বল, আজ কোথায় বেড়াতে যাবি।

লাইট হাউজ। চিৎকার করে বলে নিতাই-পাটাই।

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯

শেষ সংকেত

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে না বেরোতেই বৃষ্টি নামল আবার। একটানা ঝিরঝিরে ক্লান্তিকর বৃষ্টি। আজ রোববার তাই পানাজির এই এলাকায় বিকেল থেকেই দোকানপাট বন্ধ। অন্যদিনের জমজমাট এলাকা অন্যরকম লাগছে তাই। বড়ো রাস্তার মোড় ঘুরলেই হাওয়ায় টালমাটাল সি-বিচ। ঐ নির্জন রাস্তা ধরেই ওদের ফিরতে হবে রানার আস্তানায়।

ওরা মানে রাজু আর মৃদুল। রানা বন্ধুদের নিয়ে এসেছিল সমুদ্রপাড়ের লাগোয়া এই রেস্তোরাঁয় রাতের খাওয়া সারতে। ও পানাজিতে আছে কয়েক বছর। কাজ করে একটি ব্যাঙ্কে। বন্ধুরা এসেছে কলকাতা থেকে বেড়াতে। মুম্বাই-এ রাজুর এক আত্মীয়ের বাড়িতে কয়েক দিন কাটিয়ে দিন দুয়েক হল ওরা পানাজি এসে পৌঁছেছে। কয়েক দিন থাকবে ওরা। বছরের শেষ দিকের জমানো ছুটিগুলো ওদের জন্যই রেখে দিয়েছিল রানা।

কাল একটা গাড়ি ভাড়া করে ওরা মায়াম লেক ঘুরে এসেছে। পানাজি থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। ঘন সবুজ গাছপালায় ঘেরা মায়াম লেকের স্বচ্ছ টলটলে জলে অসংখ্য রঙবেরঙের প্যাডেল-বোট। অনেকটা সময় কেটেছে ওদের। নানা রঙিন ফুলে সাজানো চোখজুড়ানো বাগান। ফেরার পথে সপ্তকোটেশ্বর-এর পুরনো মন্দির থেকে বেরোতে না বেরোতেই বৃষ্টি। আর সে কী তুমুল বৃষ্টি! যেন ঘন চিকের আড়ালে হারিয়ে গেল গোটা শহরটাই। আর কোথাও যাওয়া হয়নি। রানার ফ্ল্যাটে পৌঁছে তারপর শুধু ঘুম আর গল্প। কালকের দিনটা এভাবেই কেটে গিয়েছিল।

আজকেও আকাশের মুখ সকাল থেকেই গোমড়া। থরে-থরে মেঘ জমে আছে। মাঝে-মাঝে সূক্ষ্ম আঁশের মতো ঝরে পড়া অল্প সময়ের বৃষ্টি। এ সময়টায় বৃষ্টি কম হয়। সম্ভবত নিম্নচাপের কারণেই এই অসময়ের বৃষ্টি। সন্ধ্যার একটু পরে ছাতা সম্বল করে কাছাকাছি দু-একটা চার্চ ঘুরতে বেরিয়েছিল ওরা। প্রার্থনার দিন বলেই হয়তো রাস্তাঘাটে লোকের জটলা আজ কম। তার ওপর মাঝে-মাঝেই এই অনির্দিষ্ট খামখেয়ালি বৃষ্টি। ফাঁকাই লাগছিল তাই এলাকাটা।

ঘড়িতে প্রায় সাড়ে নটা বাজে। আজ ওদের খাওয়া-দাওয়া সারতেও দেরি হয়েছে। খাবার স্লিপ হাতে পেয়েও টেবিল ফাঁকা হবার অপেক্ষায় দাঁড়াতে হয়েছে। রোববার এই রেস্তোরাঁয় ভিড়টাও বেশি হয়। মেঘলা আবহাওয়া সত্ত্বেও ব্যতিক্রম হয়নি তার। বৃষ্টি এরপর জোরে নামবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সুনসান রাস্তায় পথচারী মানুষ বড়ো একটি দেখা যাচ্ছে না। ঠান্ডা-কনকনে ভেজা হাওয়া সমুদ্রের দিক থেকে ছুটে এসে উইন্ডচিটার ফুঁড়ে হাড় যেন কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। রানা বলল, দেরি করে আর লাভ কি। রাস্তাঘাটের অবস্থা তো দেখছিস। পায়ে হেঁটে সি-বিচের পাশ দিয়েও ফিরতে সময় নেহাৎ মন্দ লাগবে না। তারপর যদি হঠাৎ রাস্তার আলো নিভে যায়, ঝামেলা বাড়বে বই কমবে না।

বলতে-বলতেই বন্ধুদের উত্তরের ভরসায় না থেকে রানা ফুটপাথে পা বাড়ায়। ওর দেখাদেখি রাজু আর মৃদুলও। আর রাস্তায় নেমেই ওরা যেন কিছুটা স্বস্তি পায়। বৃষ্টিটা ধরেছে এতক্ষণে। হাওয়ার অবশ্য কমতি নেই। নির্জন, আলো-অন্ধকারে মেশানো রাস্তা। বড় রাস্তাটার মোড় ঘুরে সমুদ্রতীর ধরে অনেকটাই পথ এগিয়ে যেতে হবে ওদের। আবার জোর বৃষ্টি নামলেই মুশকিল। হয়তো দাঁড়াবার মতোও আশ্রয় পাওয়া যাবে না। বুকের মধ্যটা কেমন যেন ছমছম করে ওঠে।

এই অসময়ের বৃষ্টি আর নির্জন জনসঙ্গহীন রাস্তা সব মিলিয়ে মিশিয়ে যেন এক আবছা দুর্জ্ঞেয় ভয়ের হাতছানি। যার হয়তো কোনো ব্যাখ্যা নেই। দু-একটা চালকবিহীন ফাঁকা অটোরিকশা এখানে-ওখানে ঝিমুচ্ছে। বোঝাই যাচ্চে রাতের প্যাসেঞ্জার নেবার কোনোই তাগিদ নেই। অগত্যা ফুটপাথ ধরেই এগিয়ে চলে তিন বন্ধু।

রানা একটা সিগারেট ধরায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তোদের যদি আপত্তি না থাকে, একাট ঘটনা বলি। একেবারে চাক্ষুষ ব্যাপার। এখনও চোখ বুজে ভাবতে গেলেই সারা গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে ওঠে। অবিশ্বাস্য, একেবারেই অলৌকিক। বিশ্বাস করা না করা তোদের ইচ্ছে। গল্পের অমোঘ টানে রাজু আর মৃদুল তাকায় ওর দিকে। রাজু শুধু বলে, মন্দ বলিসনি। মুখ বুজে হাঁটতে বোর হয়ে যাচ্ছিলাম। মৃদুলের মুখে ফুটে ওঠে প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস। ও বিলক্ষণ জানে, আড্ডা জমানো গল্প ফাঁদতে রানার জুড়ি নেই।

প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা ফেলে দিয়ে রানা শুরু করে এবার। আমি তখন সবেমাত্র পানাজিতে এসেছি। ব্যাঙ্কে কাজে যোগ দিয়েছি। কাউকেই চিনি না। রাস্তাঘাট, এলাকা সব কিছুই অচেনা-অজানা। অফিস বেরোই ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। বাড়ি ফিরে বই পড়ি, গান শুনি অথবা টিভি দেখি। এভাবেই চলছিল। কিছুদনি পরে অফিস কলিগদের মধ্যে গোমেজ নামে একজনের সঙ্গে আলাপটা বেশ জমে গেল। আলাপি, প্রাণবন্ত, ঝলমলে টাইপ বলতে যা বোঝায়। ওর আর একটা দারুণ গুণ হল চমৎকার মোটরবাইক চালায়। এখানকার রেসিং টুর্নামেন্টে একবার নাকি পুরস্কারও পেয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছিস এরকম একটা শানদার বন্ধুত্বের দরকার ছিল আমার। পরিচিতিটা আর একটু গাঢ় হবার পর থেকে প্রায়ই ছুটি-ছাটায় গোমেজের বাইকে বেরিয়ে পড়তাম। বাড়িতে ওর মা ছাড়া কেউ নেই। একমাত্র বোনের বিয়ে দিয়েছে পুণেতে। সুতরাং একেবারে ঝাড়া হাত-পা। আমিও ঠিক তাই।

মৃদুল হঠাৎ ফুট কাটে—বড্ড ফেনাচ্ছিস রানা, আসল ব্যাপারটা এবার শুরু কর। মাথা ধরে যাচ্ছে রে।

রানা অসহিষ্ণু গলায় বলে—ব্যস্ত হোস না। সে কথাই বলব এবার। খুব শীত পড়েছিল, তেমনি কুয়াশা। জানুয়ারির মাঝামাঝি হবে সময়টা। এক ছুটির দিনে শেষ দুপুরে আওয়াদা ফোর্ট দেখতে গিয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য আমার সঙ্গী হয়েছিল গোমেজ। পাহাড়ের গায়ে কবেকার ঐ প্রাচীন দুর্গ আর তার কুখ্যাত বন্দিশালা। জায়গাটা যেমন নির্জন তেমনি রহস্যময়। অনতিদূরে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা জুয়ারি নদী। প্রাচীনতার গন্ধ মেশানো ঐতিহাসিক জায়গাটা আমাদের টানছিল। আগেই অবশ্য শুনে নিয়েছিলাম এখানকার যাবতীয় বিবরণ। তখনকার দিনে সমুদ্রপথে বোম্বেটে জলদস্যুদের আক্রমণ হত ঘন-ঘন। তাদের নির্মম আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই যুদ্ধবাজ পর্তুগিজরা এই সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি করেছিল।

খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে কখন যে বিকেল গড়িয়ে এসেছে খেয়াল করিনি। ঘড়ি দেখে গোমেজ বললে—চলো ফিরি এবার। অনেকটা পথ যেতে হবে। প্রায় নির্জন ফুরিয়ে আসা বিকেলে আমাদের মোটরবাইকটা সাঁই সাঁই করে হাওয়া কেটে ছুটছিল। মুখে-চোখে এসে লাগছে হিমের ছোঁয়া। কনকনে হাড় জমিয়ে দেওয়া ঠান্ডায় সিঁটিয়ে যাচ্ছিলাম। রাস্তার একপাশে দীর্ঘ নারকেল বাগান। কখনো চোখে পড়ছিল একটা-দুটো পরিত্যক্ত কবরখানা। অনেকক্ষণ থেকেই চায়ের জন্য উসখুস করছিল গোমেজ। আওয়াদা ফোর্ট থেকে লম্বা রাস্তাটা ধরে অনেকটা এগিয়ে আসার পর ডানদিকে চোখে পড়ল একটা জনবিরল ধাবা। হঠাৎই বাইকটা থামিয়ে দিল গোমেজ।—চলো একটু কফি খেয়ে নিই। বড্ড ঠান্ডা লাগছে।

গাড়িটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। অল্প পাওয়ারের দু-একটা আলো জ্বলছে। দোকানটায় আমরা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো খরিদ্দার চোখে পড়ল না। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল। একটু পরেই কফি আর টোস্ট এসে গেল। খেতে-খেতেই মালিকের সঙ্গে

কথা বলছিলাম আমরা। বয়সের ভারে জরাজীর্ণ লোকটির বয়স কম হবে না। সঙ্গে হেলপার ওর নাতি। সে-ই আমাদের কফি আর টোস্ট এনে দিল।

দুঃখ করে বলছিল বুড়ো লোকটি, আগে এই ধাবার অবস্থা এত খারাপ ছিল না। লোকজনের আনাগোনা ছিল। বিক্রিবাটাও ভালো হত। কিন্তু এখন আর তেমন লোকজন আসে না। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে তো একেবারেই না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বুড়ো মানুষটির মুখ আরও যেন গম্ভীর দেখাল। ফিসফিস করে সে শুধু উচ্চারণ করল—ভয়, সাহেব ভয়। আতঙ্কের জন্যই সন্ধ্যার পরে মানুষ আর আসে না। বুকের ঝোলানো ক্রুশটা একবার স্পর্শ করে সে বলল—অচেনা রহস্যময় একটা মোটরবাইক নাকি অনেক রাতে ঘুরে বেড়ায় এখানকার নির্জন রাস্তায়। তার আরোহীকে কেউ দেখেনি। লোকে বলে, যারা সেই মোটরবাইকের সাক্ষাৎ পেয়েছে তারা বেশিদিন বাঁচেনি কেউ। অবশ্য আমরা কোনোদিন দেখিনি। জানি না সত্যি-মিথ্যে কোনটা আসল।—তোমাদের ভয় করে না এভাবে থাকতে এখানে? কোথায় যাব সাহেব! বুড়োর কোঁচকানো মুখে অসহায় হাসি ফোটে—পেটের টান বড় শক্ত টান। কোনোক্রমে দুটো মানুষের দিন চলে যায়। দিনের বেলা কিছু লোকজন আসে।

ওখান থেকে বেরোতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। মোটরবাইকটায় স্টার্ট দিতে গিয়ে গোমেজ দেখল স্টার্ট নিচ্ছে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জনবসতি সেরকম একটা চোখে পড়েনি। একটু আগে শোনা বুড়ো মানুষটার কথাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হলেও কেমন যেন ভাবিয়ে তুলেছিল আমাদের। আমাদের সঙ্গের ব্যাগে বড়ো একটা টর্চ ছিল। গাড়ির ছোটখাটো ঝামেলাগুলো গোমেজ নিজেই সারাতে পারে। আমাকে টর্চটা ধরতে বলে ও ধাবার পাশেই বাইকটাকে নিয়ে কাজে লেগে গেল। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। কনকনে ঠান্ডা হিম যেন বরফের মতো ঘিরে ধরছিল আমাদের। একনাগাড়ে ভারী টর্চটা ধরে রাখতে হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে আমার। ঝোপজঙ্গল, পরিত্যক্ত কবরখানা, অন্ধকার আর এই ভুতুড়ে নির্জনতা। মনটা কেমন যেন কুডাক গাইছিল। অধৈর্য হয়ে ভাবছিলাম, কতক্ষণে কাজ শেষ হবে ওর।

একসময় স্বস্তির একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়ায় গোমেজ। মোটরবাইকে স্টার্ট নিয়ে বলে, যাক এযাত্রায় উদ্ধার পাওয়া গেল। পানাজি পৌঁছাতে এমন কিছু সাঙ্ঘাতিক দেরি হবে না। বলতে বলতেই চটপট উঠে পড়ি আমি। তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম পথের বাঁকে কী অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য!

রানা হঠাৎ চুপ করে যায়। এতক্ষণে ওরা বড়ো রাস্তাটা পেরিয়ে এসে সি-বিচের দিকে ঘুরেছে। বৃষ্টি আর পড়ছে না। অথচ কালো আকাশ যেন পাঁশুটে বাঘের মতোই ওৎ পেতে রয়েছে। কালো অন্ধকার সমুদ্রের দিক থেকে সি-বিচ ছুঁয়ে ছুটে আসছে হাওয়ার অবিশ্রান্ত গররা। ঢেউগুলো যেন আসন্ন বৃষ্টির আভাস পেয়ে আরও বন্য আর বেপরোয়া হয়ে উঠছে। রানা আবার খেই ধরে।

হিম রাত নেমে আসা সুনসান রাস্তায় হেডলাইটের জোরালো আলোয় আমাদের মোটরবাইকটা যেন উড়ে যেতে থাকে। চুপচাপ গাড়ি হাঁকাচ্ছে গোমেজ। ওর মতো আড্ডাপ্রিয় মানুষকে এরকম চুপ হয়ে যেতে দেখিনি আর। আমিও কথা বাড়াইনি।

রাস্তাটা এবার সামান্য খাড়াই হয়ে ওপর দিকে উঠেছে। হেড লাইটের কুয়াশা-ম্লান আলোয় সামনের যেটুকু নজরে আসছিল একেবারে ফাঁকা-সুনসান। শুধু চাপ-চাপ কুয়াশা আমাদের চারপাশে যেন এক অতিপ্রাকৃত জগৎ নিঃশব্দে গড়ে তুলছিল। হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলাম আমি। উল্টোদিক থেকে কী যেন একটা ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে, এদিকেই। কিসের গাড়ি ওটা? এই নির্জন রাস্তায়, এত রাতে....!

বাইক চালাতে-চালাতেই কেমন যেন ভয়ের গলায় গোমেজ বলে ওঠে—মনে হচ্ছে একটা মোটরবাইক আসছে। তবে কি—ভেতরে ভেতরে যেন এক প্রবল জ্বরের তাড়সে কেঁপে উঠলাম আমি।

তক্ষুনি ঘটে গেল ব্যাপারটা। খানিক উঁচু হয়ে যাওয়া রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে হঠাৎই যেন ঘন কুয়াশার ঘেরাটোপ ছিঁড়েখুঁড়ে জেগে উঠল দ্রুত ধাবমান একটা গাড়ির শিল্যুট। আমরা যেন কুয়াশায় মোড়া এক অলৌকিক ঘোরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি। ছুটে আসছে গাড়িটা, দূরত্ব কমছে। তারপর একসময় ঝোড়ো হাওয়ার মতো উল্টো দিকের মোটরবাইকটা আমাদের পেরিয়ে এক মুহূর্তে দূরের কুয়াশায় হারিয়ে গেল। একই সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয়ের আওয়াজ বেরিয়ে এল আমাদের গলা থেকে। এইমাত্র কুয়াশায় মিলিয়ে যাওয়া গাড়িটার কোনো আরোহী ছিল না। ততক্ষণে নিজের মোটরবাইকটা থামিয়ে দিয়েছে গোমেজ। হেড লাইটের আলোয় মনে হল ও কাঁপছে। আমার অবস্থাও তখন ওরই মতো। ধাবার বুড়ো মানুষটার কথাগুলো যদি সত্যি হয়? তবে—

গোমেজ শুধু ফিসফিস করে আমায় বললে—তুমি ঠিক দেখেছ সেনগুপ্ত, সত্যি কেউ চালাচ্ছিল না গাড়িটা? কী করে সম্ভব! না না, কুয়াশার মধ্যে আমাদের দুজনেরই দেখার ভুল হয়েছে। আমিও যেন তখন হারিয়ে ফেলেছি মুখের ভাষা। গোমেজ আর দেরি করল না। মুহূর্তে আবার স্টার্ট দিল ওর গাড়িতে। ফেরার বাকি পথে আমার আর একটাও কথা বলিনি। সেদিন প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে একটু বেশি রাতেই বাড়ি ফিরেছিলাম।

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলতে-বলতে একটু দম নেয় রানা। কেমন অপ্রস্তুত গলায় বন্ধুদের বলে—আর মিনিট দশেক। প্রায় এসে গেছি আমরা। মৃদুল আস্তে আস্তে বলে—তারপর কী হল। কাহিনির শেষটা এবার বলে ফ্যাল। রানা বন্ধুদের মুখের দিকে তাকায় একবার। গত বছর পুজোর সময় একটা মোটর দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায় গোমেজ। সে সময়ে আমি আবার এখানে ছিলাম না। বোনের কাছে পুণে গিয়েছিলাম। খবর পেয়ে ছুটে আসি পানাজিতে। সেদিনও নাকি মোটরবাইক চালাচ্ছিল গোমেজ। একটা লোডেড মিলিটারি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে ওর গাড়ির। এত ভালো গাড়ি চালাত গোমেজ। কী করে যে দুর্ঘটনাটা ঘটল, আজও আমি বুঝতে পারি না। শুধু মনে হয়, সেদিনের ঐ রক্ত জল করা অভিজ্ঞতা, রহস্যময় মোটরবাইক আর তার অদৃশ্য চালক, তবে কি মৃত্যুর কোনো আগাম সঙ্কেত ছিল? সেই থেকে অদ্ভুত একটা আতঙ্ক আমার মনের মধ্যেও ঢুকে গেছে। আমিও যে শরিক ছিলাম ঐ অলৌকিক ঘটনার।

ওরা হাঁটতে থাকে। কেউ আর কথা বলে না। যেন হঠাৎ এক ভয়ের আভাস পেয়ে ফুরিয়ে গেছে সব কথা। ওদের ডানদিকে রাতের সমুদ্র। ঢেউ আর হাওয়ার তুমুল হল্লাট কানে এসে আছড়ে পড়ছিল। এবার ওরা একটা ছোট্ট গলিরাস্তায় ঢুকে যাবে। তারপরই বাড়ি। রাতের বিশ্রাম আর আরামের ঘুম। ওরা পা চালায় দ্রুত।

হঠাৎ ওদের ভীষণ রকম চমকে দিয়ে রাস্তার আলোগুলো নিভে গেল। লোডশেডিং। রাজুর হাতের পেনসিল টর্চটা জ্বলে ওঠে এবার। আর তক্ষুনি অনেকটা দূর থেকেই যেন একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনতে পায় ওরা। নির্জন অন্ধকার সি-বিচের রাস্তা দিয়ে কী যেন একটা ভয়ঙ্কর বেগে ছুটে আসছে। হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ে ওরা। অন্ধকারেই ফ্যাকাশে রক্তশূন্য হয়ে ওঠে রানার মুখ। রাজুর কাঁপা হাতে অস্বচ্ছ আলোর বৃত্তটা ছড়িয়ে পড়ছে।

লোডশেডিং-এর অন্ধকারে যেন ঝোড়ো হাওয়ার মতোই ছুটে আসছে একটা মোটরবাইক। রানা ফিসফিস করে কী যেন বলে ওঠে। ওদের বিস্ফারিত চোখের সামনে দিয়েই অন্ধকারে দূরে কোথায় হারিয়ে যায় রহস্যময় গাড়িটা রাজু পেনসিল টর্চের আলোয় আজও দেখার ভুল হয়নি রানার। চালকবিহীন একাট অলৌকিক মোটরবাইক। তক্ষুনি লোডশেডিং-এর খোয়াব ভেঙে জ্বলে ওঠে সি-বিচের আলো। রানা কোনো কথা বলে না। ওর মনে একটাই প্রশ্ন জেগে উঠতে থাকে, এবার কার পালা।

কার্তিক ১৪১৩

বন্ধু কথা রেখেছিল

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

[লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ইংরেজ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যমণি। দীর্ঘ ৫১ বছর ইনি ইংল্যান্ডের গির্জা সম্প্রদায়ের সর্বসময় কর্তা। ইনি ছিলেন সততার এক মূর্ত প্রতীক। অতীন্দ্রিয়বাদ ও পরলোকচর্চাতেও তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি পরলোকবাসীদের বেশ কিছু ঘটনা সংগ্রহ করেছিলেন। ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই তিনি সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করতেন। বর্তমান কাহিনিটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে যে ব্যক্তির জীবনে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, তিনি নিজের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন বলে এই কাহিনিতে তিনি মিঃ বি—বলেই বর্ণিত হয়েছেন।]

একেবারে ছোটবেলা থেকেই ছেলে দুটি ছিল পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। একটি বড় সরকারি স্কুলে পড়ত তারা। কেউ কাউকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারত না। তারা শপথ করেছিল, তাদের এই বন্ধুত্ব আজীবন বজায় থাকবে। শুধু তাই নয়, নিজেদের আঙুল কেটে সেই রক্তে এক অঙ্গীকারপত্রেও স্বাক্ষর করেছিল দুজন। সেই অঙ্গীকারপত্রে ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল ওদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে, সে মৃত্যুর মুহূর্তেই অন্যজনকে এসে দেখা দেবে। স্কুলজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দুজনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও শোকার্ত হৃদয়ে মিঃ বি-কে চলে যেতে হল আইন পড়তে, এবং তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু উইলি যোগ দিল সেনাবাহিনীতে।

ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে অবশ্য দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করেছিল ওরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে সবসময়েই পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবে। প্রথম দিকে সত্যি সত্যিই ওরা পরস্পরকে দিনে দুখানা করে চিঠি লিখত। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল, ওদের চিঠিপত্র লেখাও ততই কমে আসতে লাগল—প্রথমে দিনে একবার, পরে সপ্তাহে দু'বার। এরপর উইলি যখন ভারতবর্ষে চলে গেল, তখন চিঠিপত্র লেখা আরও কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তা বন্ধই হয়ে গেল। মিঃ বি লন্ডনের এক খ্যাতনামা ব্যারিস্টার হয়ে উঠলেন, আর বন্ধু উইলি ভারতবর্ষে সামরিক পেশায় ব্যস্ত রইলেন। দুজনের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ রইল না। সেই নিবিড় বন্ধুত্ব কোথায় মিলিয়ে গেল।

বহু বছর কেটে গেল এইভাবেই। তারপর একবার বড়দিনের আগে মিঃ বি অনুভব করলেন, কাজের অত্যধিক চাপে তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা একটু বিশ্রাম ও হাওয়া বদল দরকার। তাই এক রবিবার তিনি চলে গেলেন 'ভার্জিনিয়া ওয়াটার' স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, সেখানে গিয়ে 'হোয়েট লিয়েফ' সরাইখানাটিতে উঠলেন তিনি। সেখানে নৈশভোজের পর নীচের হলঘরে বসে বসে পাইপটি ধরিয়েছেন, এমন সময় এক অদ্ভুত, অজানা অস্বস্তিতে ভরে উঠল তাঁর মন। কীরকম একটা অস্থিরতা বোধ করতে লাগলেন তিনি। তারপর তাঁরা মনে হল, জানালার বাইরে থেকে কে যেন উঁকি মারছে। মুখটা তাঁরা খুবই চেনা চেনা মনে হল বটে, কিন্তু মুখটা যে কার সেটা আর তঁরা কিছুতেই মনে পড়ল না। এই জন্য তাঁরা অস্বস্তি বেড়েই চলল।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে মিঃ বি গ্যাসের বাতি থেকে পাইপটা জ্বালানোর পর আস্তে আস্তে জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। জানালার বাইরে যে তাঁর চেনা কেউ আছে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন। আর একবার জানালার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন তিনি আর সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ-চমকের মতো সব কিছু মনে পড়ে গেল তাঁর। জানালার বাইরে যে আছে সে আর কেউ নয়—তাঁর স্কুলজীবনের সেই অভিন্নহৃদয় বন্ধু উইলি। তবে মুখটি আর এখন সেই স্কুলজীবনের মতো নেই—পরিণত বয়সে মুখের যে স্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়া উচিত উইলির তাই হয়েছে।

মিঃ বি অবশ্য নিশ্চিত হতে পারছিলেন না, তিনি ঠিক দেখেছেন কিনা। কিন্তু কিছু যে তিনি একটা দেখেছেন, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আসলে যে ব্যাপারটা কী সেটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি ঠিক করলেন, এর তিনি শেষ দেখে ছাড়বেন। সরাইখানার মালিককে তিনি জানালেন, তাঁর খুব অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তাই তিনি একটু বাইরের বাতাসে ঘুরে আসতে যাচ্ছেন।

ঘরের দরজাটা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালেন মিঃ বি। চারদিকে ঘন অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল, সমস্ত অন্ধকারটা যেন এক জায়গায় গুটিয়ে এসে সেখানেই ঘন হয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে, সেটা যেন কোনো অন্ধকার সুড়ঙ্গের মুখ। তারপর সেই মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা আলোকিত, চলন্ত ট্রেন। ক্রমশই সেটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বিস্ফারিত চোখে মিঃ বি দেখলেন, সেই ট্রেনের একটা কামরায় দুজন লোকের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হচ্ছে। একটা লোক অন্য একটা লোককে ঠেলতে ঠেলতে কামরার দরজার দিকে নিয়ে চলেছে। হঠাৎ কামরার দরজাটা এক ঝটকায় খুলে গেল, আর সেই খোলা দরজা দিয়ে তাঁর বন্ধু উইলি ছিটকে বেরিয়ে তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ল—তার মুখখানা ওপর দিকে তোলা। এই মুখখানাই খানিকক্ষণ আগে মিঃ বি জানালার বাইরে দেখেছিলেন। এক মুহূর্ত মাত্র—তারপরেই ঐ ট্রেন, সুড়ঙ্গ আর উইলির মুখ সবই যেন ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে মিঃ বি একলা দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রচণ্ড আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে মিঃ বি হলঘরে ঢুকে এলেন। সরাইখানার মালিককে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলেন তিনি, শুনুন মশাই, আমি খুব অসুস্থ রোধ করছি। কেন জানি না নানারকম ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমি এখনই লন্ডনে ফিরে যাব, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না।

সৌভাগ্যক্রমে লন্ডনে যাওয়ার শেষ ট্রেনটি তখনও চলে যায়নি। মিঃ বি সেই ট্রেন ধরে লন্ডনে পৌঁছেই নিজের বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন। সকাববেলায় যখন ঘুম ভাঙল, তখন তাঁর শরীর আর মন দুটিই ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। আগের রাতের ঘটনার কোনো প্রভাবই আর এখন তিনি অনুভব করছিলেন না। সারাদিন জরুরি রাজের মধ্যে ডুবে রইলেন তিনি।

সারাদিন পরিশ্রমের পর বিকেলে মিঃ বি পিকাডেলির দিকে একুট বেড়িয়ে আসতে গেলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল উলটো দিকের ফুটপাথ দিয়ে উইলির ভাই হেঁটে যাচ্ছে। চট করে গতরাতের দেখা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গিয়ে তিনি শিউরে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা পেরিয়ে উইলির ভাইয়ের কাছে গিয়ে মিঃ বি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর, তোমার দাদার খবর কী? উইলির ভাইকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ। সে উত্রর দিল—কী আর বলব? খুবই খারাপ খবর—যতদূর খারাপ হতে হয়। মিঃ বি খুব উত্তেজিত ভাবে আবার জানত চাইলেন, তার মানে? উইলি কী মারা গিয়েছে?

হ্যাঁ। কাল রাতে।

কীভাবে মারা গেল? চলন্ত রেলগাড়ির কামরা থেকে পড়ে গিয়ে?

এবার উইলির ভাইয়ের অবাক হওয়ার পালা। হাঁ করে মিঃ বি-এর দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, ঠিক তাই। কিন্তু আপনি সে কথা কী করে জানলেন? আমরা তো সবে আজ সকালেই টেলিগ্রামে দাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি।

স্তম্ভিতভাবে উইলির ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিঃ বি। উইলি তাহলে সত্যিই তার কথা রেখেছে।

মাঘ ১৪২১

প্রোজেক্ট টাইগার

আবীর গুপ্ত

রঞ্জন গাছের মাথায় মাটি থেকে ফুট পনেরো উঁচুতে একটা ডালে বসে ভাবছিল—সুন্দরবনে হ্যারির সঙ্গে না এলেই ভালো হত। বিকাল চারটে হলেও—ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। যেহেতু গভীর জঙ্গল, ঝড়ের খুব বেশি প্রভাব না বুঝতে পারলেও, গাছের ডালটা ভালোমতোই দুলছে। বৃষ্টির জন্য মোটা ডালটাও বেশ পিচ্ছিল। বেশ কষ্ট করে বসে থাকতে হচ্ছে। একটু অসাবধান হলেই একদম নীচে। আর নীচে অপেক্ষা করে আছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। সুন্দরবনের বিভীষিকা!

রঞ্জন ডালটাকে দু'হাতে আর ঝোলানো পা দুটো দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। কাঁধে ব্যাগটার জন্য অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু ব্যাগের মধ্যে যে ক্যামেরাটা রয়েছে। রঞ্জনের ভয়-ডর কোনোকালেই খুব একটা ছিল না। তবে এ পরিস্থিতিতে যে কারোরই আতঙ্কিত হয়ে পড়ার কথা। রঞ্জনেরও হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল ভয়ে। তখনই ওর মনে হল এ পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখার সব চাইতে ভালো উপায় হল অন্য কিছু ভাবা। কোনোরকমে রাতটাকে কাটাতে পারলে নিশ্চয়ই কোনো উপায় বার করা যাবে।

রঞ্জন পেশায় ভূতত্ত্ববিদ। ছোটোবেলা থেকেই ওর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা। মাঝে মাঝেই একা একা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ে। ও খুব ভালো ছাত্রও ছিল। অফিসে চাকরির সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও চালাচ্ছিল। ওয়াশিংটনে একটি সিম্পোসিয়ামে ওর পাঠানো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নির্বাচিত হল। সিম্পোসিয়াম কর্তৃপক্ষ ওকে ডেকে পাঠাল ঐ প্রবন্ধ পাঠ করার জন্য। ওখানেই ওর জীববিজ্ঞানী হ্যারির সঙ্গে আলাপ। পুরো নাম হ্যারল্ড কুক। সবার কাছে হ্যারি নামেই পরিচিত। সিম্পোসিয়ামে হ্যারিও এসেছিল প্রবন্ধ পাঠের জন্য। তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পুরাজীববিজ্ঞান বা ফসিল নিয়ে হলেও তাতে এমন কিছু ছিল যা জীববিজ্ঞানীদের নতুন দিশা দেখাবে। এই কারণে তাকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মাত্র সাতদিনেই রঞ্জনের সঙ্গে হ্যারির এত গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল যে ভারতে ফিরে আসার পরেও রঞ্জন হ্যারির সঙ্গে কাটানো ঐ সাতদিনের কথা ভুলতে পারেনি। হ্যারি ওর সমবয়সী এবং অত্যন্ত ডাকাবুকো ছেলে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মাসের পর মাস কাটিয়েছে। ভারতের অনেক জঙ্গলেও নাকি বেশ কিছুদিন কাটিয়েছে। এসব ওর হ্যারির মুখ থেকেই শোনা। জঙ্গলগুলোতে হ্যারি গবেষণার কাজে গিয়েছিল—সেটা ও শুনেছে। কিন্তু ঠিক কী নিয়ে হ্যারি গবেষণা করছিল সেটা রঞ্জন জানে না। হ্যারি বলেনি। রঞ্জনও জিজ্ঞাসা করেনি।

মাস দুয়েক আগে রঞ্জন হ্যারির কাছ থেকে একটা ই-মেল পেল, সে কলকাতায় আসছে। সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে সুন্দরবনে যাবে দিন সাতেকের জন্য। রঞ্জনকেও সঙ্গে যেতে হবে। ব্যস এইটুকুই ছিল ই-মেলে। রঞ্জন পাল্টা ই-মেলে সুন্দরবন ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে চেয়ে লিখল সুন্দরবন অন্যান্য বনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা—এখানে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ঐ জঙ্গলে রাত কাটানো সম্ভব নয়।

দিন দুয়েক বাদে বাড়িতে হ্যারির ফোন এল। সেই একইরকম প্রাণোচ্ছল গলা। হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি এর আগেও দু'বার সুন্দরবনে গিয়েছি। সুন্দরবনের নাড়ি-নক্ষত্র

সব আমি জানি। তোমাকে আমার ভালো লেগেছে, তাই আমার সঙ্গে যেতে বলছি। তুমি তো অ্যাডভেঞ্চার ভালোবাস—দেখবে ঠকবে না। তাছাড়া, তোমার কোনো বিপদ হবে না। আমি তোমাকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করব—প্রতিজ্ঞা করছি।' ব্যস, তারপর আগস্টের ৩০ তারিখে ও ফোন পেল হ্যারি সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে দমদম এয়ারপোর্টে নামছে।

রঞ্জনকে এয়ারপোর্টে দেখেই হ্যারি ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'মাই ফ্রেন্ড, সুন্দরবনে যেতে ভয় পাচ্ছ? আমি তো আছি। আমরা রয়েল বেঙ্গলের সঙ্গে বসে লাঞ্চ করব।' ওর কথার ধরনে রঞ্জন হেসে ফেলল।

তারপর দু'দিন বাদে স্পিডবোট ভাড়া নিয়ে বাসন্তী থেকে সোজা সুন্দরবন। হ্যারির সব চেনা। আগেও যে বহুবার এসেছে রঞ্জন তা বুঝতে পারল। পারমিশন-টারমিশন সব আগে থেকেই নেওয়া ছিল। এমনকী স্পিডবোটের মালিকও হ্যারির চেনা। একটা বড় আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল থেকে হ্যারিকে স্পনসর করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় হ্যারির ইনফ্লুয়েনস দেখে রঞ্জন অবাক হয়ে গেল। সুন্দরবনের ভিতরে একটা ছোট্ট গ্রামে ওরা প্রথমে গেল। গ্রাম থেকে দুজন লোক এসে হ্যারিকে বলল, 'সাহেব, আপনার নৌকা চাই তো? এবারে কিন্তু কড়াকড়ি আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা দেখতে পেলে—। বাঘের উপদ্রব ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। কালকেই আমাদের একজনকে তুলে নিয়েছে তিন নমম্বর সেক্টর থেকে।'

হ্যারি একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তিন নম্বর সেক্টরে বাঘ! ওখানে তো বাঘ আসার কথা নয়! তাহলে কি—'

রঞ্জন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা গভীর জঙ্গলে ঢুকেছিল কেন?'

'না ঢুকলে খাবে কী? মধু সংগ্রহের জন্য যেতেই হয়। বনদপ্তর সেক্টর ফোর অবধি পারমিশন দেয়। সেক্টর থ্রি-তে বাঘের কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। সেক্টর ওয়ান হল কোর এরিয়া। খুব বেশি হলে বাঘ সেক্টর টু অবধি যায়। অবশ্য মাঝে মাঝে ওরা নদী সাঁতরে এদিক-ওদিক যায়, তবে সেটা আলাদা কথা।'

রঞ্জন হ্যারির কথা শুনে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'আমরা নৌকা নিয়ে কোথায় যাব?'

'আমরা কোর এরিয়াতেই ঢুকব।'

'কোর এরিয়ায় যাওয়ার পারমিশন তো আমাদের নেই। তাহলে?'

'দূর দূর, এখানে কে দেখতে যাচ্ছে? আমার কোর এরিয়াতেই যাব। আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, আমি সব চিনি। তোমার কোনো বিপদ হবে না।'

রঞ্জন কথা বাড়াল না। বুঝল হ্যারি নিয়ম ভাঙতে চলেছে। কতটা বিপদ হতে পারে সেটা যদি ও তখন বুঝত তাহলে হয়তো ও হ্যারিকে তখন আটকানোর চেষ্টা করত।

ওরা পরদিন সকালে রওনা দিল। হ্যারি সঙ্গে কাউকে নিল না। নৌকায় যেতে যেতেই রঞ্জন হ্যারির মুখে তার গবেষণার বিষয়টা শুনল। এমন একটা বায়োকেমিক সিরাম হ্যারি বার করতে চাইছে যেটার প্রভাব প্রাণীজগতের হরমোনের উপর পড়বে। যে প্রাণীর উপর প্রয়োগ করা হবে সেই প্রাণীটির প্রজনন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। হ্যারির উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। যে সমস্ত প্রজাতির প্রাণী পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে তাদেরকে লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচানো। এই উদ্দেশ্যে ও পৃথিবীর বেশ কয়েকটি জঙ্গলে গিয়ে সিরাম প্রয়োগের ব্যবস্থাও করে এসেছে। ভারতের গির অরণ্যে সিংহ আর হিমালয়ান মাউন্টেন কোয়েলের উপরেও নাকি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছে। দু'বার সুন্দরবনে এসে এখানকার বাঘেদের উপরও হ্যারি সিরাম প্রয়োগ করেছে। রঞ্জন শুনে জানতে চাইল এই সিরাম কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। উত্তরে হ্যারি যা বলল তা শুনে রঞ্জন অবাক হয়ে গেল। খাবারের সঙ্গে নাকি মিশিয়ে দিয়েছে ঐ সিরাম। যে ঐ খাবার খাবে

তার মধ্যে যদি সিরামের প্রভাব দেখা দেয় তবেই বোঝা যাবে হ্যারি সফল। এবারে এখানে আসার উদ্দেশ্য হল বাঘেদের পর্যবেক্ষণ করা।

হঠাৎ পায়ে একটা ঠান্ডা স্পর্শ। রঞ্জনের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ওকে সাবধান করে দিল—ঘোরতর বিপদে পড়তে চলেছে। নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ করে নড়াচড়া না করে চুপ করে বসে রইল। এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় ও সাপটাকে খেয়ালই করেনি। সাপটা ডাল থেকে পা বেয়ে কোমরে উঠল। তারপর আরও উপর দিকে ওঠা শুরু করল। আর ওর ডান হাতটাকে ডাল ভেবে সেটাকে জড়িয়ে কুণ্ডলি পাকাল। তীব্র অস্বস্তি হচ্ছে। এদিকে ডান কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগটাও ঝুলছে। সাপটাকে না তাড়ালে মুশকিল আছে। গাছের ডালের দুলুনি সামলাতে গিয়ে নড়লেই ছোবল খেতে হবে। একটা উপায় অবশ্য আছে। দ্রুত ডান হাতটাকে ডাল থেকে সরিয়ে শূন্যে ঝাড়ল। ব্যালেন্স হারিয়ে নিজেও পড়ে যাচ্ছিল। ডালের উপর শুয়ে পড়ে মাটিতে পড়া আটকাল ঠিকই কিন্তু কাঁধ থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ও নীচের দিকে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যেও কয়েকটা ছায়া ছায়া মূর্তিকে ওর মনে হল ব্যাগটার সামনে থেকে ঘুরে গেল। তার মানে এখনও নীচে ওরা অপেক্ষা করে আছে। সাপের জন্য ওর চিন্তায় ব্যাঘাত হয়েছিল। সুন্দরবন সম্বন্ধে ও কিছুই জানে না। হ্যারি ছাড়া ও অসহায়। দিনের আলো ফুটলেই যে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে তার সম্ভাবনা খুবই কম। হ্যারি সুন্দরবন সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল। হয়তো হ্যারির সেই সমস্ত কথা বা ঘটনার মধ্যেই লুকিয়ে আছে উদ্ধার পাওয়ার উপায়। খুব ভালো করে ও দুঃস্বপ্নের মতোই ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে করার চেষ্টা করল।

ওরা নদীনালা দিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর হ্যারি জানাল ওরা এবার নামবে। হ্যারি ওকে বারবার বলছিল নদীনালাগুলো চিনে রাখতে। রঞ্জন তখন পাত্তা দেয়নি। তাছাড়া সব নদীনালাগুলোই ওর কাছে একই রকম দেখতে লাগছিল। ওরা যেখানে নৌকা থেকে নামল সেখানে অত্যন্ত ঘন জঙ্গল। আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখে ওরা বুঝতেও পারেনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কী ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সামনে ওরা পড়তে চলেছে। ঘন জঙ্গলে ঢুকে হ্যারি সবগুলো গাছের গুঁড়িতেই কী যেন একটা দেখছিল। একটা গাছের গুঁড়িতে রঞ্জন খেয়াল করল ছুরি দিয়ে খোদাই করে একটা তীরচিহ্ন আঁকা। নীচে ইংরেজিতে এইচ আর সি লেখা। হ্যারি তীরচিহ্ন যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে হাঁটা লাগাল। একটু এগোতেই আরেকটা গুঁড়িতে একইরকম তীরচিহ্ন। এভাবে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর একটা গাছ দেখিয়ে হ্যারি বলল, 'এটা আমাদের বেস ক্যাম্প।' রঞ্জনের বেশ খিদে পেয়েছিল। হাতঘড়িতে দেখল দুপুর দুটো বাজে। হ্যারি অনায়াসে গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল। রঞ্জন এবারে উপর দিকে তাকিয়ে খেয়াল করল মাটি থেকে অন্তত বারো-চোদ্দ ফুট ওপরে একটা মাচা মতন করা, তার উপরে আচ্ছাদনও আছে। হ্যারি উপর থেকে একটা দড়ির মই নীচে ফেলে দিয়ে ওকে বলল উপরে উঠতে। রঞ্জন দড়ির মই বেয়ে উপরে উঠে বেশ অবাক হল—সাতফুট বাই আটফুটের মতো একটা পাটাতন, তার ফুট ছয়েক উপরে একটা বেশ শক্তপোক্ত আচ্ছাদনও আছে। পাটাতনের উপর একটা স্টোভ, গোটা তিনেক টিনের কৌটো আর একটা বড়ো ট্রাঙ্কও আছে। হ্যারি কাঁধের ঝোলা থেকে শুকনো কিছু খাবার আর একটা জলের বোতল বার করে ওকে দিয়ে বলল, 'তুমি খাবারটা রেডি করো, আমি কফির জল বসাচ্ছি।' রঞ্জন অবাক হয়ে ভাবছিল—হ্যারি সুন্দরবনকে এত ভালো চেনে অথচ ও নিজে কোনোদিন আসেনি। লাঞ্চ সেরে হ্যারি রঞ্জনকে নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা খুঁজে এগোল। রঞ্জন আরও অবাক হয়েছিল যখন হ্যারি ঐ বেস ক্যাম্পের ছাদের উপর একটা লুকানো জায়গা থেকে লাঞ্চ সেরে মাচা থেকে নামার আগে একটা রাইফেল বার করল। ওকে অবাক হতে দেখে হ্যারি হেসে বলেছিল, 'এটা কখনোই আমি ব্যবহার করি না, কিন্তু দরকার তো পড়তেই পারে।'

বেশ কিছুটা এগোনোর পর হঠাৎ ঘন জঙ্গলের মধ্যে ফুট পঞ্চাশেক ব্যাসের একটি ফাঁকা মাঠের মতো দেখে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে গাছপালা নেই? বড় অদ্ভুত তো!' হ্যারি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'এখানেই আজকে আমার কাটাব। কাল অন্য অন্য জায়গায় যাব।' হ্যারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা গাছে উঠে পড়ল। রঞ্জনও বাধ্য হয়ে বহু কষ্টে সেই গাছে উঠল। হ্যারি পকেট থেকে ছোট্ট একটা বাইনোকুলার বার করে চারপাশটা দেখছিল। শেষে হতাশ হয়ে বলল, 'আমি ব্যর্থ। আমার ওষুধ কাজ করছে না।' রঞ্জন জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'একথা কেন বলছ?'

'কারণ আছে। সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা বেশ কমে গিয়েছে। আমার সিরাম কাজ করলে দু'বছরে ঐ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া উচিত। অথচ—একটা বাঘও চোখে পড়ল না।'

সেদিন বিকাল অবধি ওরা ওখানেই কাটাল। কোনো বাঘের দেখা নেই। আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছে। অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে হ্যারি গাছ থেকে নামতে গিয়েও কী ভেবে ভালো করে গাছের পিছনে নীচের দিকে তাকাল। শেষে বাইনোকুলারটা চোখে লাগাল। আঁতকে উঠে বলল, 'নামা যাবে না। ব্যাটা কী ধুরন্ধর, মোটা গাছটার পিছনে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তার মানে অনেকক্ষণ ধরেই আমাদের লক্ষ করছে।'

সেদিন ওরা গাছ থেকে নামতে পারল না। রাতে বৃষ্টি শুরু হল। প্রথমে টিপ টিপ করে পরে বেশ জোরে। ওদের ব্যাগে শুকনো খাবার আর জল যা ছিল তাই ওঁরা ভাগাভাগি করে খেল। সারা রাতে কিন্তু ওরা কোনো বাঘের ডাক শুনতে পেল না। হ্যারি খালি আফশোস করছিল, 'দুপুর থেকে একটা বাঘের ডাক শুনিনি, তার মানে সিরাম কাজ করেনি। এই বাঘটা মুষ্টিমেয় যে কয়েকটা বাঘ আছে তার মধ্যে একটা। বাঘটার জন্য আমাদের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে গেল।'

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ ওরা গাছ থেকে নামবে বলে ঠিক করল। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি হয়েই চলেছে। তবে জোরে নয়। খালি পেট—জলও শেষ, খাবারও নেই—পেটটা মোচড় দিচ্ছে। চারপাশে ভালো করে দেখেও বাঘটাকে নজরে পড়ল না। ওরা গাছ থেকে নেমে ফাঁকা মাঠটার দিকেই এগোল। মাঠে এসে রঞ্জনের দিক ভুল হয়ে গেল—কোন দিকটা উত্তর আর কোনটা দক্ষিণ সেটাই বুঝতে পারছিল না। হ্যারিকে কথাটা বলতেই—হ্যারি হাসতে হাসতে বলল, 'কম্পাস ছাড়া দিক নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হল সূর্য। এখানে সে সুযোগও নেই। তবে, আমার সব জানা। মাঠের মাঝামাঝি চলো, কোন দিক থেকে আমরা এসেছি দেখিয়ে দিচ্ছি।' ওরা মাঠের মাঝামাঝি যাওয়ার পর হ্যারি যেদিকটায় নৌকাটা বাঁধা আছে বলে দেখাল—তা রঞ্জনের মনঃপূত হচ্ছিল না। একটা খসখস শব্দ শুনে ওরা পিছনদিকে তাকিয়েই আতঙ্কে শিউরে উঠল—গোটা তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বাঘ দল বেঁধে ওদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রঞ্জনের হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল, মস্তিষ্কও কাজ করছিল না। হ্যারির চিৎকার শুনল, 'দৌড়ও, আমার সঙ্গে ঐ নদীর দিকে। সামনের গাছগুলোয় ওঠা যাবে না, নিচুতে ডাল নেই।' ওরা দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকতেই বুঝতে পারল বাঘগুলোও খুব কাছে এসে গিয়েছে। সামনেই একটা গাছের ডাল মাটি থেকে ফুট সাতেক উপরে। হ্যারির চিৎকার শুনল, 'সামনের ঐ ডালটা—'

প্রথমে হ্যারি পরে রঞ্জন লাফ দিয়ে ডালটা ধরে ফেলল। রঞ্জন ডালটা ধরে চাপ দিয়ে দেহটা তুলতে চাইল কিন্তু পারল না। দু'বার চেষ্টা করে আতঙ্কিত হয়ে বলল, 'পারছি না, পারছি না।' হ্যারির চিৎকার শুনল, 'চেষ্টা করো—কুইক।' তাকিয়ে দেখল হ্যারি ডালের উপর উঠে পড়েছে। হ্যারির দিকে তাকিয়ে করুণ মুখে মাথা নেড়ে নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষায় চোখ বন্ধ করে ফেলল। পায়ের তলায় একটা ঠেলায় ও বেশ খানিকটা উপরে উঠে পড়েছে দেখে ঐ সাপোর্টে লাফ দিয়ে ডালে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখল হ্যারি নেই। নীচে নেমে ওকে ঠেলে ডালে তুলে দিয়েছে। এবারে

হ্যারি লাফ দিল ডালটা ধরার জন্য। ধরেও ফেলল। রঞ্জন দেখল—হলুদ-কালো ডোরার একটা ঝলক—হ্যারি নেই। শুধু হ্যারির গলা শুনল, 'রঞ্জন, পালাও, পালাও।' আতঙ্কিত চোখে দেখল একটা বাঘের মুখে হ্যারির দেহ। বাঘটা দ্রুত মাঠের দিকে দৌড়চ্ছে—ওর পিছনে আরও কয়েকটা বাঘ। বাকি বাঘগুলো ওর গাছের দিকেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে আতঙ্কে ওর হাত-পা অবশ হয়ে আসছিল। হ্যারির কথা এখন ভেবে লাভ নেই। বুঝতে পারছিল—ওরও সময় হয়ে এসেছে। তাও চেষ্টা ও চালিয়ে যাবেই। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ডাল ধরে ধরে আরও ফুট দশেক উঠে একটা মোটা ডাল দেখে সেটার উপর বসল। চারপাশে গাছের ডালপালা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না—এমনকি মাঠটাও নয়। নীচে দশ-বারোটা বাঘকে গাছে উঠবার চেষ্টা করতে দেখল। শেষে গাছে উঠতে না পেরে তীব্র আক্রোশে গর্জন করতে লাগল। ওর নামার অপেক্ষায় কয়েকটা বাঘকে মাটিতে অপেক্ষা করে থাকতে দেখল। দুপুরের দিকে জোরে বৃষ্টি এল। বাঘগুলো কিন্তু নড়ল না। গাছের নীচটা আলোর অভাবে বেশ অন্ধকার। যতটুকু বুঝতে পারছিল বাঘের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। হাতের রিস্টওয়াচটায় যখন বিকাল পাঁচটা বাজে তখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তারপর থেকে ও ঐ ডালেই। অনেক ভেবে যতটুকু বুঝতে পেরেছে যদি বাঘগুলো সরেও যায় ওর পক্ষে পথ চিনে নদীর ধারে নৌকা অবধি যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ও দিক ভুল করবেই। গাছের ডালে জোরে একটা ঝাঁকুনিতে ওর সম্বিৎ ফিরল। ডালটাকে শক্ত করে চেপে ধরল। কাঁধের ব্যাগটা নীচে পড়ে যাওয়ায় অনেক ভালোভাবে গছের ডালটাকে ধরতে পারছে।

একটু তন্দ্রামতো এসে গিয়েছিল। কীরকম একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। হাতের রেডিয়াম দেওয়া ঘড়িটায় দেখল রাত প্রায় বারোটা। একটা ফিসফিস করে শব্দ। একটু চমকে গেল। ঐ একই গাছের ডালে একটু দূরে কিছু একটা বসে। আতঙ্কে শিউরে উঠল। আবার একটা ফিসফিস করে গলার আওয়াজ, 'আমি হ্যারি, বাঁচতে চাও তো শিগগিরি আমার সঙ্গে এসো। শয়তান বাঘগুলো এখন নেই।' রঞ্জন আঁতকে উঠে বলল, 'হ্যারি, তুমি! তোমায় তো বাঘে—কী করে বাঁচলে!'

'ও সব কথা পরে হবে। এখন খুব তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে নেমে পড়ো।'

রঞ্জন গাছ থেকে নামতেই হ্যারির গলার আওয়াজ শুনল, 'গুঁড়ির কাছ থেকে ক্যামেরার ব্যাগটা নিয়ে নাও।' রঞ্জন ব্যাগটা কাঁধে তুলে নিল। আবার একইরকম ফিসফিস করে আওয়াজ। 'আমার পিছন পিছন এসো।' সামনে একটা ছায়ামূর্তি ওকে হাত দিয়ে ইশারায় ডাকছে। ও ছায়ামূর্তিটার পিছনে হাঁটা শুরু করল। ওর তখন যা অবস্থা—ভাবার ক্ষমতাই ছিল না। আচ্ছন্নের মতন কতক্ষণ ধরে হাঁটছিল খেয়াল ছিল না—হঠাৎ শুনল আবার হ্যারির গলা, 'মন দিয়ে শোনো। সামনেই নৌকা। নৌকায় উঠে বাঁদিকে সোজা যাবে। ডানদিকে একদম যাবে না। বাঁদিকে যেতে যেতে একসময় দেখবে নালাটা দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডানদিকেরটা ধরে কিছুটা এগোলেই বাঁদিকের একটা দ্বীপে যে গ্রাম থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম সেই গ্রামটা পাবে।' কথা বলতে বলতে ওরা বেশ খানিকটা এগিয়ে এসেছিল। রঞ্জন দেখল সামনেই নালার উপর নৌকাটা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। হ্যারি এসে ডাল থেকে দড়িটা খুলে বলল, 'চটপট উঠে পড়ো। শয়তানগুলো তেড়ে আসছে। ওরা টের পেয়েছে। আমি ওদের আওয়াজ পাচ্ছি।' রঞ্জন কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না, ভয় পেয়ে ঝপ করে নৌকায় উঠে পড়ে বলল, 'হ্যারি, তুমিও এসো।'

'না, আমার যাওয়া হবে না।'

'কেন? তোমায় ছাড়া আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।'

'বলছি তো, সম্ভব নয়। ওরা এসে পড়েছে। নৌকা চালাও।'

রঞ্জন সভয়ে দেখলে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা ছায়ামূর্তি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

গর্জন শুনে রঞ্জনের বুক কেঁপে উঠল। তাও ইতস্তত করছিল। হ্যারি জলে নেমে প্রচণ্ড জোরে নৌকায় একটা ঠেলা মারল—নৌকাটা সেই ভীষণ ধাক্কায় প্রায় নালার মাছামাঝি জায়গায় চলে গেল। রঞ্জন আঁতকে উঠল। বাঘগুলো যে হ্যারির পিছনে! ও চিৎকার করে হ্যারিকে বলল, 'হ্যারি সাবধান, তোমার পিছনে!'

'ওরা আমার কিছুই আর করতে পারবে না। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে সব রকমের বিপদ থেকে তোমায় আমি বাঁচাব—তাই আমি এসেছি।'

হ্যারির কথাগুলো শেষদিকে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। রঞ্জন আতঙ্কিত চোখে দেখল হ্যারির দেহটা কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ ভেঙে গেল—তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। তাহলে হ্যারি—!

এখন আর ভেবে লাভ নেই। রঞ্জন দ্রুত নৌকা চালাল শয়তানগুলোর হাত থেকে বাঁচার জন্য। দূর থেকে অস্পষ্ট একটা গলার আওয়াজ শুনল, 'রঞ্জন, আমি সফল হয়েছি। আমার সিরাম কাজ করেছে। তবে—'

বাকিটা রঞ্জন শুনতে না পেলেও অনুমান করে নিল। হ্যারির সিরাম বাঘের সংখ্যা যেমন বাড়িয়েছে তেমনই বাঘের মধ্যে চরিত্রগত পরিবর্তনও এসেছে। ওদেরকে অনেক বুদ্ধিমান আর শয়তান করে তুলেছে।

কার্তিক ১৪১৬

অঘটন

মনোজকান্তি ঘোষ

ঝম ঝম শব্দ তুলে ট্রেন ছুটছে। মনটা ভাল ছিল না। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত বারোটা। সবে বর্ধমান ছাড়ল। গভীর রাতে হাওড়ায় পৌঁছে কোথায় যাব ভাবছি।

কামরায় বেশি লোক ছিল না। ও প্রান্তে দুজন। এ প্রান্তে আমি একা। একাট অল্প আলোর বাতি জ্বলছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হয় অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ ওঠেনি।

কী করব, কিছুই ভাল লাগছিল না। হাতের কাগজটা মেলে ধরলাম চোখের সামনে। সকাল থেকে অনেকবার পড়েছি। আবারও চোখ বোলাতে লাগলাম। কম আলোর জন্য চোখে বড় লাগছিল। ভাঁজ করে রেখে দেব ভেবে প্রথম ভাঁজ করতেই শব্দমালার ছকটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ওটা নিয়েই বসলাম। পাশাপাশি, উপর-নিচে সূত্রগুলো একবার দেখে নিলাম। শব্দমালা সময় কাটাবার মহৌষধ।

চলতে চলতে হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল। চোখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দুই স্টেশনের মাঝে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় সিগন্যাল পায়নি। ঘন অন্ধকার বাইরে। সেখানে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে-নিবছে।

ওখান থেকে একটা লোক উঠল। উস্কখুস্ক চুল। রুক্ষ চেহারা। পরনের জামাকাপড় ভীষণ নোংরা। ও উঠতেই একটা বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। লোকটি গুটিগুটি পায়ে এসে আমার পাশে বসল। বিরক্ত চোখে তাকালাম। মনের মধ্যে চোর-ডাকাতের সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

আগন্তুক হেসে বলল, শব্দমালা দেখছেন?

বেজার মুখে বললাম, দেখছি কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।

লোকটি আমার হাতের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কেন কেন? পারছেন না কেন? জলের মতো সোজা।

এরপর পাশাপাশি, উপর-নিচে সে যা বলল শব্দমালায় লিখে দেখি সব উত্তর ঠিক।

অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললাম, শব্দমালা তৈরি ও সমাধানে শশধরবাবুর খুব নামডাক হয়েছিল। আপনি তো দেখছি তাঁকেও হার মানাবেন।

লোকটি বলল, আপনি শশধরবাবুকে চিনতেন?

বললাম, না, ওনাকে কোনোদিন দেখিনি। তবে তাঁর নাম শুনেছি। এই বর্ধমানের কাছেই কোনো এক গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। কিছুদিন আগে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছেন।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। বেলমুড়িতে তাঁর বাড়ি ছিল।

বললাম, আপনি শশধরবাবুকে চিনতেন?

লোকটি বলল, চিনব না কেন? যাঁরা শব্দমালা তৈরি করেন তাঁদের সকলকেই আমি চিনি। শব্দমালা আমার ধ্যানজ্ঞান।

বললাম, আপনার নামটা জানতে পারি কি? বলতে বলতে গাড়ি এসে একটা স্টেশনে ঢুকল।

লোকটি জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে বলল, কামারকুণ্ডু এসে গেছে। দেখি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি।

এ পাশে আমি একা। একাই বসে রইলাম। কোনো প্যাসেঞ্জার উঠলও না, নামলও না। গাড়ি ছেড়ে দিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে লোকটি আবার আমার পাশে এসে বসল। বসেই সে চমকে উঠল। দূরের দরজায় একজন টিটি। এদিকেই আসছে।

লোকটি ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, সর্বনাশ। আমার কাছে টিকিটও নেই, পয়সাও নেই। এখন কী করি?

অভয় দিয়ে বললাম, বসুন, যা হয় দেখা যাবে।

আগন্তুক লোকটি বসল না। তড়াক করে বসার সিটে উঠে পড়ল। এক পা জানালার উপর রেখে পিছন ফিরে তাকাল। আমি বাধা দিলাম। সে শুনল না। গলা উঁচিয়ে বলল, আপনি আমার নাম জানতে চাইছিলেন না? আমার নাম শশধর। বলেই হুশ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ছানাবড়া চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ট্রেন ছুটছে। দুরন্ত গতিতে ছুটছে।

আষাঢ় ১৪১০

রাধুর ফৌজি জ্যেঠু

মুকুল মাইতি

রাধু আমাদের ক্লাসেই পড়ত। সপ্তম শ্রেণিতে এমন কেউ ছিল না যে রাধুর জ্যাঠামণির কথা জানত না। ক্লাসে টিচার না এলে আমরা রাধুকে বলতাম—নে রাধু, জ্যাঠামণির গল্প শোনা।

রাধুর জ্যাঠামণিকে আমরা কেউই কোনোদিন দেখিনি। তবুও জ্যাঠামণিকে মনে হত আমাদের বহুদিনের পরিচিত আপনজন। রাধুকেই এ ব্যাপারে কৃতিত্ব দিতে হয়। অনেক গল্প আমরা শুনেছিলাম তার কাছে। জ্যাঠামণি তখন পাকিস্তানের সঙ্গে কোন প্রান্তরে লড়াই চালাচ্ছিলেন। আর আমরা তাঁর বীরত্বের কাহিনি শুনতাম ক্লাসে বসে।

যখন উনি ছোট ছিলেন তখন ছোটদের নিয়ে দুটো দল গড়ে তুলতেন হামেশা। দুটো দলের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতেন। প্রায় ঘণ্টাখানিক চলত সে লড়াই বা লড়াইয়ের অভিনয়। যে দল হারত তাদেরকে লড়াইয়ের ময়দানে যেমন করে লাশ পড়ে থাকে তেমনি করে পড়ে থাকতে হত। লড়াইয়ের ময়দানও ছিল রকম রকম। কখনও বনজঙ্গল ভরা ডোবার ধারে। আবার কখনও ধানের গাদার ধারে। যেখানে নিজেকে অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা যায়।

পরদিন লড়াই শুরুর আগে পরাজিত পক্ষ জয়ীদেরকে একটা করে টফি দিত। এই ছিল জ্যাঠামণির ছোটবেলার লড়াইয়ের নিয়ম। এ নিয়ম ভাঙা চলবে না। ভাঙলে তাকে সবাই মিলে বয়কট করবে।

দেওয়ালির রিভলভার নিয়ে লড়াই হবে। দু'একজন ছাড়া কারও কাছে বন্দুক ছিল না। আনো পটকা ফাটানো রিভলবার। যারা পরের বছরের জন্য তুলে রেখেছিল তারা এনে হাজির করল। চেক্ করে দেখা গেল তাতে ক্যাপ ফাটে না। কারণ স্প্রিং খারাপ।

রাধুর জ্যাঠামণির ভালো নাম ছিল রাঘববিজয়। ডাক নাম ছিল রঘু। রঘু উপায় বের করলেন। বললেন, ঠিক আছে। যাদের কাছে বন্দুক, পিস্তল নেই তারা লড়াই করবে তীর-ধনুক নিয়ে। যেমন সাঁওতালরা লড়াই করে। যারা বানাতে পারবে না তারা বাঁশ-কঞ্চি-দড়ি সব আনবে। আমিই বানিয়ে দেব।

এমনি করে জ্যাঠামণি লড়াই চালাতেন ছোটবেলায়। লেখাপড়ায় বিশেষ মন ছিল না। কোনোরকমে টি. টি. এম. পি. হয়ে গেলেন অর্থাৎ টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ।

এই কোয়ালিফিকেশান নিয়ে রঘু জ্যাঠামণির চাকরি মেলে না। বাড়ির অন্ন ধ্বংস আর ঘুরে বেড়ানো ছাড়া রঘু জ্যাঠামণির আর কোনো কাজ ছিল না।

তবে একটি সম্পদ ছিল জ্যাঠামণির। সেটি হল সুস্বাস্থ্য। ছিলেন প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা। ছিল রাবণের মতো পাকানো গোঁফ। নিয়মিত গোঁফের পরিচর্যা করতেন। বাড়তে বাড়তে গোঁফ কান ছুঁই-ছুঁই। কখনও তাতে আঠার মতো কী একটা ওষুধ লাগাতেন। তাতে 'মোচের' ডগাটা সূচের মতো সরু করে পাকানো থাকত। পাড়ার দাদু-স্থানীয় যাঁরা তাঁরা বলতেন, ভারী যত্নে লালন-পালন করছ হে গোঁফখানা, রঘু। এটার জন্য প্রাইজ পেয়ে যেতে পার।

রঘু এসব ব্যাঁকা কথায় কান দেবার লোক ছিলেন না। তেরছা কথার কোনো প্রতিবোদও করতেন না। বুক চিতিয়ে গোঁফ উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

বলতে বলতে রঘু জ্যেঠু একদিন সত্যিকারের একখানা প্রাইজ বগলদাবা করে ফেললেন। কী কাজে যেন শহরের দিকেই গেছিলেন। দেখেন ফৌজি জওয়ান বাহিনীতে ভর্তির জন্য বিরাট লম্বা লাইন পড়েছে। একেবারে রঘু জ্যেঠুর মনের পছন্দমাফিক কাজ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। পাঞ্জাবিটি খুলে ফেললেন, মালকোঁচা মেরে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক লহমায় সিলেক্ট। পরে জানা গিয়েছিল সে নাকি রঘু জ্যেঠুর গোঁফজোড়াটির জন্য। এমন পাকানো গোঁফজোড়া দেখে সিলেক্টার সাহেবের মনমোহিত।

বাড়ি ফিরে এলেন। পুরোপুরি ফৌজি জ্যেঠু। বাড়ির সবাইকে অর্ডার করতে লাগলেন ফৌজি কায়দায়। যেন কমান্ডার-ইন-চিফ হয়ে গেছেন। বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালোই ছিল। কারুর ইচ্ছে নয় জ্যেঠু ফৌজি বাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু নিজেই উনি পোশাক-আশাক ট্রাঙ্কে ভরে ফেললেন। সঙ্গে নিলেন বিছানা-পত্তর। এক ঘণ্টার মধ্যে সব কিছু তৈরি, ঠাকুমাকে প্রণাম করলেন। নিজের জিনিসপত্তর নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাবা-কাকাদের সঙ্গে সামান্য পরামর্শ পর্যন্তও করলেন না। লড়াই করার এমন সুযোগ কি আর কোনোদিন পাওয়া যাবে? এসব মা-কাকিমাদের মুখে শোনা। কারণ তখন আমাদের জন্মই হয়নি।

মাসছয়েক পরে ফৌজি জ্যেঠুর একখানা চিঠি এসেছিল। তিন লাইনের চিঠি। লড়াই চলছে। ভালো আছি। মা প্রণাম নিও। কোথায় আছেন, কবে ফিরবেন বা বাড়ির কে কেমন আছেন বা চিঠি লিখতে দেরি কেন বা কাউকে কোনো অনুরোধ কিছুই নেই চিঠির মধ্যে। চিঠি শেষ। একেবারে ফৌজি কায়দার চিঠি।

ঠাকুমা বললেন, 'ওর মনটা পাষাণ হয়ে গেছে রে। না হলে এমন চিঠি কেউ লেখে? যাক, যেখানেই থাকুক, যেন ভালো থাকে। ঈশ্বর ওর মঙ্গল করুন।

প্রায়ই চোখের জল ফেলতেন ঠাকুমা। কিন্তু রঘু জ্যেঠুর চিঠিপত্র আসত না। কখনও বাবাকে বলতেন, 'তোর দাদার সম্পর্কে খোঁজখবর নে না, বাবা।' আবার কখনও ছোটকাকে ধরতেন। বাবা-কাকারা কোথায় খোঁজ নেবেন? যুদ্ধের সময় কোন ব্যাটালিয়ন কোথায় আছে তা গোপন রাখা হয়। তাই কাউকে জিগ্যেস করে কোনো লাভ হবে না জানতেন। মাকে বাড়িতে এসে বলতেন, 'দাদা ভালো আছেন মা। মিলিটারিতে ভালো-মন্দ খেয়ে দাদার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।'

এ কথা শুনে ঠাকুমা কী খুশি যে হতেন তা বলা যায় না। ডালা সাজিয়ে মন্দিরে পুজো দিয়ে আসতেন। আবার মানত করে আসতেন জ্যেঠু যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসেন।

মাসছয়েক পরে আর একখানা চিঠি এল জ্যেঠুর। 'অনেক উঁচুতে রয়েছি। খুব ভালো লাগছে। লড়াই জারি রয়েছে।' আগের মতোই তিন লাইনের চিঠি। তিনটি বাক্য নীচে নীচে লেখা। ঠাকুমাকে এবারে প্রণামও জানাননি।

এক বছর কোনো চিঠিপত্রের বালাই নেই। ঠাকুমা কান্নাকাটি করেন বৌমাদের কাছে। তাতে সুরাহা কিছু হয় না। জ্যেঠু ওদিকে রণক্ষেত্রে লড়ে চলেছেন। ছোটবেলার শখ যুদ্ধ করবেন। সে যুদ্ধ খতম না করে আসেন কী করে?

সেদিন ছিল ভয়ঙ্কর বর্ষার দিন। সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছিল। একেবারে আঁধার নেমে এসেছিল। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ছিল। আমরা ছোটরা তখন ঠাকুমার ঘরে। গল্প শুনব বলে ছেঁকে ধরেছি ঠাকুমাকে। গল্প বলাও শুরু করেছিলেন ঠাকুমা। এমন সময় ছোটকাকিমা এসে খবর দিলেন বাইরের বসার ঘরে এক মিলিটারি ঢুকে পড়েছে। ঘরের মধ্যে কান্নাকাটির রোল উঠেছে। খিড়কির দরজা দিয়ে সবাই প্রায় প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে। ছোটকাকিমা ছিলেন খুব সাহসী। স্কুলে গার্ল গাইডের ট্রেনিং নিয়েছিলেন। সাহস করে ঠাকুমাকে খবরটা দিতে ছুটে এসেছেন।

উনি ছিলেন আমাদের ফৌজি জেঠু। ছোটকাকিমার চেনার কথা নয়। কারণ জ্যেঠু মিলিটারিতে

যোগ দেওয়ার পরে ছোটকাকার বিয়ে হয়েছিল। কাকিমা ভাবতেই পারেননি দুর্যোগপূর্ণ ঝড়জলের সন্ধেবেলায় কোনো অতিথির আগমন হতে পারে।

খবর শোনার পরে ঠাকুমা একটুকুও ঘাবড়ালেন না। তবে এটুকু ভাবলেন, কোনো অশুভ খবর হয়তো এসে হাজির হয়েছে। মুখখানা তখন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তবে তিনিও সামান্য আতঙ্কিত সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এমন সময় জ্যাঠামণি এসে তঁরা বিশাল দেহখানা নুইয়ে ঠাকুমার পায়ে হাত ছোঁয়ালেন।

জ্যাঠামণির গলার স্বরও নাকি পাল্টে গেছিল। গলার স্বর আগে কেমন ছিল আমাদের জানার কথা নয়। কেমন এক গাঁক গাঁক আওয়াজ আমরা শুনতে পেলাম। আমরা ছোটরা ভয় পেয়ে যে যার মায়ের কাছে দৌড় দিলাম।

মায়ের সঙ্গে যখন এলাম তখন দেখলাম জ্যাঠামণি একগাদা টফি, চকোলেট ও কেক-বিস্কুট সাজিয়ে ফেলেছেন টেবিলের উপর। টেবিলের পাশেই রয়েছে পাশবালিশের আকারের মিলিটারি লম্বা ঝোলা। আমরা ভারী ঔৎসুক্য নিয়ে ঝোলাটা দেখতে লাগলাম। আগে কোনোদিন আমরা ঐ টাইপের ঝোলা দেখিনি।

মা ও ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছেন জ্যাঠামণি। মিলিটারিত রেকর্ড করে ফেলেছেন ছুটি না নেওয়ার জন্য। উপরওয়ালারা তাই খুবই খুশি। ঠাকুমার কাছে গলগল করে বলতে লাগলেন। ঠাকুমা বললেন, হ্যাঁরে, তুই কী ধরনের মানুষ? তোর বাবা কবে আমাদের ছেড়ে স্বর্গে গেছেন। তোকে কত কষ্ট করে বড়টি করলাম। সব ভুলে গেলি? তোর এই দুঃখিনী মায়ের কথা একবারও মনে পড়ত না? সেই বছর দুই পূর্বে দু'খানা তিন লাইনের চিঠি লিখে চুপ করে রয়ে গেলি?

জ্যাঠামণির কোনো জবাব নেই। শুধু একবার বললেন, মা, লড়াইয়ের ময়দানে আমি শুধু লড়াইয়ের কথাই চিন্তা করি। অন্য কারও কথা আমরা মনে থাকে না। মুহুর্মুহু গোলাগুলি চলছে। শত্রুর বিনাশই আমাদের কাজ। এগিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। পেছনে কে আছে বা রয়ে গেল তার কথা একবারের জন্য ভাবি না। আমাদের দেশমাতৃকার কথা ভাবতে হয়।

বাহারে বন্দুকবাজ! এই ঘরের মায়ের কথাটি কে চিন্তা করবে? নিয়মিত চিঠিপত্রও তো মানুষ দেয়, না দেয় না?

মা, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। বললে কী তোমরা বিশ্বাস করবে? সারা মন-প্রাণ দিয়ে লড়ে যাই। তোমরা তো জান ছোট থেকে আমার লড়াইয়ের নেশা।

সে রাতের মতো ঠাকুমা ও জ্যেঠুর সংলাপ শেষ হল। ঠাকুমার জমাট বাঁধা চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা। ঝড়-জলের রাত পার হয়ে ঝলমলে রোদ উঠেছে। আমাদের সকলেরই খুব ভালো লাগছিল। জ্যেঠুর ঘরটিতে একবার চুপিচুপি উঁকি মেরে দেখে গেলাম। যখনই আমরা জ্যেঠুর কাছে যাচ্ছিলাম তখনই দলবেঁধে যাচ্ছিলাম। ঐ দৈত্যের মতো চেহারার কাছে একলা যাওয়ার হিম্মত আমাদের ছিল না।

কোন ভোরে ফৌজি জ্যেঠু উঠে পড়েছিলেন তা আমরা বলতে পারব না। প্রত্যুষে প্যারেড করার অভ্যাস। আমাদেরকে সামনে পেয়ে মুঠো মুঠো ভিজানো ছোলা ধরিয়ে দিলেন। ভয়ে ভয়ে হাতে নিলাম। না নিলে যদি গাঁক গাঁক করে ওঠেন গতকালের মতো। ছোলাগুলো সামনে দাঁড়িয়ে খেতে হল। সঙ্গে সামান্য আদাকুচি। গলা দিয়ে নামতে চায় না। তবুও মুখ বুজে খেয়ে নিলাম।

ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় আমরা গল্প শোনার বায়না করব ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে আগে জ্যেঠুর সঙ্গে কথা বলবে? আমরা তিন-চার ভাই ইতস্তত করতে লাগলাম। জ্যেঠু

আমাদরে মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই বলে উঠলেন, তোমরা যুদ্ধের গল্প শুনতে চাও মনে হচ্ছে? কী ঠিক বলেছি কি না?

আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, হ্যাঁ জ্যেঠু। লড়াইয়ের গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে।

তাহলে তো শুরু করতেই হয়। তোমরা ভয় পেয়ে যাবে না তো?

কথাগুলো বলেই বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন জ্যেঠু। আমরা ভাবতে লাগলাম জ্যেঠু তাঁর সেই বিরাট বন্দুকটা আনবেন। ভয়ে তখন আমাদের বুক দুর দুর করে কাঁপতে শুরু করেছিল। না বললেই বোধহয় ভালো হত। যদি বন্দুকটা এনে বলেন,'এই দ্যাখ, কেমন করে গুলি চালাতে হয়।' তাহলে? আমাদের পোষা পায়রাগুলোর কথা তখন মনে পড়ে গেল। ওদের মধ্যে দু'চারটে হয়তো মরেই যাবে—বাকিগুলো ভয় পেয়ে কোথায় পালাবে কে বলতে পারে? বড় বোকামি হয়েছে আমাদের বলা। হয়তো আমাদেরকে শূন্যে তুলে ধরবেন কোল-পাঁজা করে—তারপর? কী করবেন কিছুই বলা যায় না! যুদ্ধ কেমন হয় বোঝাবার জন্য এসব করতেই পারেন।

না, জ্যেঠু সে-সব কিছুই করলেন না। তাঁর লম্বা ফৌজি ঝোলাটার মধ্য থেকে কী যেন বের করতে লাগলেন। আমরা তখন ভয়ে জড়সড়। কী টেনে বের করবেন কে জানে? বের করলেন একটা মাঝারি সাইজের ফটো অ্যালবাম। তার মধ্যে গত কয়েক বছরের পেপার কাটিং জমিয়ে রেখেছিলেন। যে সমস্ত গ্যালান্ট্রি এওয়ার্ড পেয়েছিলেন তাও এনেছিলেন একটা ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে। উনি ভাবছিলেন দেখাবেন কি দেখাবেন না। বিশেষ করে ঠাকুমাকে। যদি ভয় পেয়ে যান বিশ্রী রকমের? তাহলে হয়তো আর যেতে দেবেন না।

আমাদের ঠাকুমা ছিলেন শক্ত মনের মানুষ। তিনি অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন—কী করে ফৌজি জ্যেঠুকে আটকানো যায়। কিন্তু ফৌজি জ্যেঠুকে আটকায় কার সাধ্যি? এমন লড়াইয়ে নেশা নাকি খুব কম লোকের মধ্যে দেখা যায়। সবাই বলতে লাগলেন, অসম্ভব। মিলিটারিদের নিয়ম-কানুন আলাদা। ছুটিতে এসে ফিরে না গেলে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে। আর নিয়ে গিয়ে বিচার করে সাজা দেবে। তার চেয়ে বরং ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। যদি কপাল ভালো থাকে তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেঁচে ফিরে আসবে।

কোনো জ্যোতিষীর কাছে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না ঠাকুমা। তাবিজ-কবচেও বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বরে ছিল অগাধ বিশ্বাস। ঈশ্বর তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। দীর্ঘদিন পরে ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছেন। এবার চাইছেন ছেলে আর যাতে ফিরে না যায় তাই মন্দিরে মন্দিরে মানত করে বেড়াচ্ছেন।

ঠাকুমা মন্দির থেকে ফিরে এলেন। ছোটকাকিমা ছিলেন প্রধান সংবাদদাতা। ঠাকুমা বসার পরে শুরু করলেন—

মা, বড়দার কোন এক মিলিটারি বন্ধু এসেছেন। ঠিক বড়দার মতো লম্বা আর হুবহু একই রকম দেখতে। মনে হয় যেন যমজ ভাই বা কার্বন কপি। বাইরের ঘরে বসিয়েছি। আপনাকে কিছু বলবেন বলে অপেক্ষা করছেন।

চলো বউমা, আগে দেখা করি। বড় খোকা কোথায় বেরুল?

তা বলতে পারব না। তবে এই সোলজারাটি আসার আগেই বড়দা ঝড়ের বেগে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।

মিলিটারিটি ঠাকুমা আসার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুমা চেয়ারে বসার পরে বললেন, মা, একটি দুঃসংবাদ দেওয়ার ভার আমার উপর পড়েছে। রাঘবভাই কয়েকদিন পূর্বে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না। আমরা একই রেজিমেন্টে কাজ করতাম। আমার খুবই ঘনিষ্ঠ

বন্ধু ছিল। একসঙ্গে ব্যাটল ফিল্ডে থেকেছি। লড়াই করেছি—ট্রেঞ্চেও কাটিয়েছি দিনের পর দিন। আপনার কথা খুব বলত। বলত মায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার খুব দরকার।

ঠাকুমার শোনার পরে মূর্ছিতা হলেন। কাকিমার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। আমার মা আড়াল থেকে শুনে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলেন, আর একটু হলেই মাটিতে পড়ে যেতেন। আর আমরা ছোটরা ব্যাপারটা একেবারেই বুঝতে পারলাম না যখন আমরা স্কুল থেকে ফিরে এসে শুনলাম। বাবা-কাকারা তখন ছিলেন অফিসে। পুরো ঘটনাটি ঘটে গেল আধঘণ্টার মধ্যে। আমাদের মনে তখন প্রশ্ন জেগেছিল সেই ব্যক্তিটি কে যাকে আমরা আগের দিন সকালে দেখেছিলাম এবং যে আমাদের হাতে ভিজোনো ছোলা দিয়েছিল আদাকুচির সঙ্গে? মায়ের সঙ্গে জ্যেঠুর ঘর দেখতে গিয়েছিলাম। ঘরটিতে কিছুই ছিল না—না জ্যেঠুর লম্বা নলওয়ালা বন্দুক, না ওঁর কোলবালিশের মতো মিলিটারি ঝোলা। আগের দুটো দিনকে স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল।

সৈনিকটি যাওয়ার পূর্বে একটি খাম বসার ঘরে রেখে গিয়েছিল। যার মধ্যে ডাক্তারের সই করা জ্যেঠুর ডেথ সার্টিফিকেট রাখা ছিল।

আষাঢ় ১৪১৯

ভূতুড়ে গোলকজেঠু

অমিতাভ পাল

জ্যৈষ্ঠের দুপুর। শেওড়াফুলি স্টেশনে বসে আছি ট্রেন ধরার জন্য। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে লোকজন খুব বেশি নেই। হঠাৎ দেখি, গোলকজেঠু। লোকের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর হনহন করে ওভারব্রিজের দিকে চলে গেলেন।

এখানে কী করছেন গোলকজেঠু? আমাকে দেখে এমন করেই বা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কেন? একটু অবাকই হলাম। একটু পরেই এসে গেল তারকেশ্বর লোকাল। আমি উঠে পড়লাম ট্রেনে।

নামলাম এসে সিঙুরে। তিনটে মাত্র স্টেশন। বেশি সময় লাগল না। একজনের সঙ্গে দেখা করার ছিল। দেখা হল। কাজও মিটে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবার আগেই ফিরে এলাম। মানকুণ্ডু স্টেশনে নেমে আমার বাড়ি। আসার পথেই পড়ে গোলকজেঠুর বাড়ি। ভাবলাম, একবার ঢুঁ মেরে যাই।

গোলকজেঠুর ছেলে গোপাল আমার বয়েসি। ইস্কুলবেলাকার বন্ধু। সেই সুবাদে গোলকজেঠুর বাড়িতে আমার যাতায়াত। গোপাল যাদবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। কলকাতাতে ভালো চাকরি পেয়েছিল। বাবার সঙ্গো ঝগড়া করে কানপুর চলে গেছে।

গোপাল নেই। তাই আগের মতো ঘনঘন আসা হয় না। জেঠিমা ছোটবেলায় আমাদের খুব ভালোবাসতেন। গোলকজেঠুকে লুকিয়ে আমাদের গাছের আম পাকলে আম, আতা পাকলে আতা, লিচু পাকলে লিচু দিতেন।

এবার অনেকদিন পর দেখা হল। জেঠিমা খুব খুশি হলেন। প্লেটে করে নারকেলের নাড়ু খেতে দিলেন। আসার সময় চারটি হিমসাগর আম আমার ব্যাগের মধ্যে গুঁজে দিলেন। আমি শুধোলাম, এবার গাছে অনেক আম হয়েছে বুঝি?

ম্লান হেসে জেঠিমা বললেন, হলই বা, একটা আম কাক-পক্ষীতে খেতে পায় না। গাছের তলায় পড়লে ছেলেপুলেরা কুড়িয়ে খাবে, তারও কোনো উপায় নেই। একটু পাক ধরতে না ধরতেই তোমার গোলকজেঠু লোক ডাকিয়ে সব আম পাড়িয়ে নেন।

আমি হেসে বললাম, আজ গোলকজেঠু বাড়িতে নেই, তাই বুঝি—

ক্ষোভের সঙ্গে জেঠিমা বললেন, নেই আবার? দেখ গিয়ে, আমবাগানে গুলতি দিয়ে কাক আর হনু তাড়াচ্ছেন।

সে তো এখন, এই বিকেলবেলা। দুপুরবেলাও কি বাড়িতে ছিলেন?

সকাল, বিকেল, দুপুর, দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনেরো ঘণ্টা বাগানে জেগে বসে আছেন।

আমার কেমন যেন খটকা লাগল। তবে দুপুরবেলা শেওড়াফুলি স্টেশনে কাকে দেখলাম?

জেঠিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গোলকজেঠুর আমবাগানে এসে ঢুকলাম। বাগান পাহারা দেবার বাঁশের মাচার উপরে বসে গোলকজেঠু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গুলতি তাক করছেন, আমার সাড়া পেয়ে গুলতির তাক ঘুরে গেল আমার দিকে। আমি ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, গোলকজেঠু, আমি, গোপালের বন্ধু।

গোলকজেঠু গুলতি নামিয়ে বললেন, আমি ভেবেছিলাম বুঝি হনুমান।

আমি শুধোলাম, জেঠু, আপনি কি দুপুরবেলা শেওড়াফুলি স্টেশনে গিয়েছিলেন?

গোলকজেঠু যেন আমগাছ থেকেই পড়লেন, আমি? শেওড়াফুলি স্টেশনে? দুপুরবেলা? আমার এখন বাগান ছেড়ে এক পা কোথাও যাবার জো আছে? কাক, হনু, মানুষ সবাই ওৎ পেতে বসে আছে।

তবে কি আমি ভুল দেখলাম? আমারই দৃষ্টিভ্রম?

দৃষ্টিভ্রম যে নয়, টের পেলাম ঠিক দু'দিন পরে। এবারে শেওড়াফুলি নয়, বালি স্টেশনে। ওদিকে গিয়েছিলাম একটা কাজে। ফেরার সময়ে ট্রেন ধরার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম স্টেশনে। ছুটির দিন নয়, তাই প্ল্যাটফর্মে বেশ ভিড়। ভিড়ের মধ্যে দেখি, গোলকজেঠু। লোকের কাছে হাত পেতে কী যেন চাইছেন। এবারে আর ছাড়াছাড়ি নেই। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম গোলকজেঠুর দিকে। গোলকজেঠু আমাকে দেখতে পেয়ে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তারপর হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'গোলকজেঠু!'

গোলকজেঠু কি আর দাঁড়ান? উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা ট্রেন ছাড়ছিল। গোলকজেঠু দৌড়ে গিয়ে চলন্ত ট্রেনের হাতল ধরে ঝুলে পড়লেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই দিকে। উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে গোলকজেঠু কোথায় চললেন?

গোলকজেঠুকে কিপটে বলে জানি। তাই বলে—

একুট পরেই আমার ট্রেন এসে গেল। যথাসময়ে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে এলাম।

গোলকজেঠুরা একসময় খুব গরিব ছিলেন। তখন খুব কষ্ট করেছেন। থাকতেন কুঁড়েঘরে। তারপর চড়া সুদে টাকা খাটানোর কারবার করে ধীরে ধীরে অবস্থা ফিরিয়েছেন। এখন গোলকজেঠুর গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ। ঘরের লাগোয়া মস্ত বড় আম-কাঁঠালের বাগান। কিন্তু—

এই কিন্তুটাই আসল। গোলকজেঠু হারকিপটে। হাত দিয়ে জল গলে না। দুখী ভিখারি ভিক্ষা পায় না। এমনকি কোনো বাউল বা ফকির মাগন চাইতে এলেও গোলকজেঠু তাদেরকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেন। এই নিয়ে জেঠিমার সঙ্গে নিত্য অশান্তি। গোলকজেঠুর নাম গোলকবিহারী মণ্ডল। লোকে আড়ালে-আবডালে ডাকে কিপটে গোলক বলে।

আলতারার কানাই হাজরা বেশ মজার লোক। সে ভিখারি। তবে আর পাঁচজন সাধারণ ভিখারির মতো নয়। সে নানা ধরনের বেশ ধারণ করে ভিক্ষে করে।

কানাই বহুরূপী। সে যে শুধু দেব-দেবীর ছদ্মবেশ ধারণ করে, তা নয়। মাঝে মাঝে বিশিষ্ট লোকের নকল সেজে তার ভাবভঙ্গি নকল করে ক্যারিকেচারও দেখায়। একবার সে চার্লি চ্যাপলিনের বেশ ধরে এমন অঙ্গভঙ্গি করতে শুরু করেছিল যে তাকে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছিল।

সেও কোনোদিন গোলকজেঠুর হাত উপুড় করাতে পারেনি। তাকেও একবার গোলকজেঠু দূর-দূর করে লাঠি হাতে তাড়া করেছিলেন। তাই সে একদিন সন্ধ্যার মুখে সারা গায়ে ভুষোকালি মেখে মুখে আধহাত লম্বা লাল রং করা পিচবোর্ডের জিভ ঝুলিয়ে মা কালী সেজে হাতে টিনের খড়্গা বাগিয়ে লুকিয়ে ছিল গোলকজেঠুর বাড়ির সামনে কাঁঠাল গাছের আড়ালে। অন্ধকারে গোলকজেঠু তাকে দেখতে পাননি। কাছে আসতেই সে হুংকার দিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল গোলকজেঠুর সামনে। ভয়ে গোলকজেঠুর ভির্মি খাবার মতো অবস্থা। মা—মা—মা!

এক হাতে খড়্গা বাগিয়ে অন্য হাতটা সামনে বাড়িয়ে মা কালী বলে উঠল, হয় ভিক্ষে দে, নয় তো মুন্ডু দে।

ব্যস! ধরে ফেললেন গোলকজেঠু, অ, তুই!

তারপর এক ঝটকায় মা কালীর লম্বা জিভটা হাতিয়ে নিয়ে গোলকজেঠু গটগট করে ঢুকে গেলেন বাড়িতে।

সেই জিভ কানাই হাজরা আর কোনোদিন ফেরত পায়নি এবং আর কোনোদিন সেও গোলকজেঠুর বাড়ির দরজা মাড়ায়নি।

একদিন সন্ধ্যার মুখে ট্রেন ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছি মানকুণ্ডু স্টেশনে। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের এদিকটায় কোনো আলো নেই। আবছা অন্ধকারে একটা লোক পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাত পেতে ভিক্ষে চাইল, বাবু, একটা টাকা।

পকেট থেকে এক টাকার একটা কয়েন বার করে ভিখারির হাতে দিতে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। ভিখারি আর কেউ নয়, গোলকজেঠু। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, গোলকজেঠু, আপনি?

অন্ধকারে হয়তো বুঝতে পারেননি। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি গোলকজেঠুর পিছু ছাড়লাম না। গোলকজেঠুর নাগাল পাবার জন্য সাধ্যমতো দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত হাঁটা ছেড়ে ছুটতে লাগলাম। ছুটেও গোলকজেঠুর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলাম না। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মটা যেখানে শেষ হয়েছে, লাইন টপকে গোলকজেঠু ঝোপঝাড়ের মধ্যে নেমে গেলেন। তারপর আর দেখতে পেলাম না।

গোলকজেঠু ভিক্ষে করছেন! কথাটা ভাবতেই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

স্টেশন থেকে আমি সোজা এলাম গোলকজেঠুর বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকতেই জেঠিমার সঙ্গে দেখা। আমি জোরে পা চালিয়ে এসেছি। তাই হাঁপাচ্ছিলাম। আমাকে হাঁপাতে দেখে জেঠিমা শুধোলেন, কী হয়েছে তোর?

আমি সেই কথার কোনো জবাব না দিয়ে সরাসরি জানতে চাইলাম, গোলকজেঠু কোথায়?

জেঠিমা বললেন, তাগাদায় বেরিয়েছেন।

আমি বললাম, না।

জেঠিমা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করলেন, আমি ঠিক বলেছি কিনা। তারপর বললেন, পাওনা আদায় করতে যাননি?

আমি বললাম, পাওনা আদায়ের নাম করে বেরিয়ে গোলকজেঠু গেছেন ভিক্ষে করতে।

কী বলছিস তুই?

মানকুণ্ডু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

ঘৃণায় কুঁচকে গেল জেঠিমার চোখ-মুখ, কথাটা তবে তো মিথ্যে নয়। পাড়ার দু-চারজন আমাকে আগেও বলেছে। কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি।

আমি বুঝতে পারলাম। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের চোখে পড়েছে ব্যাপারটা।

দিবাকর গোলকজেঠুর কাজের লোক। ঘরে জেঠিমার ফাইফরমাশ খাটে। বাইরে গোলকজেঠুর ক্ষেত-খামারের কাজও করে। বদলে খেতে-পরতে পায়। তাকে জিগ্যেস করতেই সে বলল, মা, এতদিন ভয়ে ভয়ে তোমাকে একটা কথা বলিনি। একদিন যাচ্ছিলাম ইস্কুলের সামনে দিয়ে। দেখলাম—

কী দেখলি?

তখন ইস্কুলের টিফিন টাইম। ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে বেরিয়ে এসেছে, ভিড় করেছে ঝালমুড়ি আর ফুচকাওয়ালার চারপাশে। সেই ভিড়ের মধ্যে দেখলাম বাবুকে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে করছেন।

রাগে ও লজ্জায় জেঠিমার ফরসা মুখ রাঙা হয়ে উঠল। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল।

ঠিক সেই সময় গোলকজেঠুও ফিরে এলেন। জেঠিমা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন জেঠুর দিকে। যেন ভস্ম করে ফেলবেন গোলকজেঠুকে।—কোথায় গিয়েছিলে?

গোলকজেঠু মিনমিন করে বললেন, গিয়েছিলাম দিনেমারডাঙায় এক খাতকের বাড়ি। পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করতে।

জেঠিমার গলায় ব্যঙ্গের সুর, তা কত আদায় হল?

একটি কপর্দকও আদায় হয়নি।

দেখি, তোমার পকেট।

এইবার জেঠিমা একটি দুঃসাহসিক কাজ করলেন। কোনওভাবে প্রস্তুত হবার সুযোগ না দিয়েই জেঠিমা গোলকজেঠুর জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনলেন একমুঠো কয়েন। টাকা, দু'টাকা এবং আধুলি। মুখের সামনে খুচরোগুলো নাচাতে নাচাতে জেঠিমা শুধোলেন, এগুলো কোথায় পেলে?

ঘটনার আকস্মিকতায় গোলকজেঠু বোধহয় একটু ঘাবড়ে গেলেন, এগুলো তো আমার পকেটেই ছিল।

মিথ্যে কথা।

বিস্মিত গোলকজেঠু শুধোলেন, মিথ্যে কথা?

হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। এগুলো পেয়েছ ভিক্ষে করে।

আমি ভিক্ষে করি?

পাড়ার অনেকেই তোমাকে ভিক্ষে করতে দেখেছে।

আমাকে ভিক্ষে করতে দেখেছে?

দিবাকর তোমাকে ইস্কুলের ছাত্রদের কাছে ভিক্ষে করতে দেখেছে।

গোলকজেঠু দিবাকরকে শুধোলেন, আমাকে ভিক্ষে করতে দেখেছিস?

দিবাকর মুখে কোনো জবাব দিল না। ঘাড় নিচু করে চুপ করে রইল।

আমাকে দেখিয়ে জেঠিমা বললেন, একটু আগে ও তো নিজের চোখে দেখেছে মানকুণ্ডু স্টেশনে তোমাকে ভিক্ষে করতে।

গোলকজেঠু করুণ চোখে তাকালেন আমার দিকে, আমাকে নিজের চোখে দেখেছ ভিক্ষে করতে?

আপনি তো আমার কাছেও হাত পেতেছিলেন। স্টেশনের আলোগুলো টিমটিম করে জ্বলছিল। তাই হয়তো প্রথমে বুঝতে পারেননি। তারপর চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আমাদের কথার মাঝখানেই জেঠিমা বলে উঠলেন, ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, পুকুর-বাগান, সিন্দুকভর্তি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তাতেও তোমার টাকার খাঁই মিটল না? লোকের কাছে ভিক্ষে করতে শুরু করলে? ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

জেঠিমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন গোলকজেঠু কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। বাড়িতেও ঢুকলেন না তিনি, মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

জেঠিমা চেঁচিয়ে ডাকলেন, এখন আবার কোথায় যাচ্ছ?

গোলকজেঠু ফিরে তাকালেন না। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলেন, ভিক্ষে করতে।

আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। তারপর আমিও হাঁটতে লাগলাম গোলকজেঠুর পিছু পিছু।

আমরা এসে উঠলাম মানকুণ্ডু স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে। একটু আগে একটা আপ লোকাল ছেড়ে গেছে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। শুধু কয়েকজন লোক প্ল্যাটফর্মের পিছনের দিকের একটা

সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে জটলা করছেন। এঁরা কেউ যাত্রী নন। অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ। সন্ধ্যার পর দল বেঁধে হাওয়া খেতে আর সময় কাটাতে আসেন।

এদিকটা প্ল্যাটফর্মের উপরে কোনো শেড নেই। তাই কোনো আলোর ব্যবস্থাও নেই। রহস্যময় আলো-অন্ধকারে ঢাকা ডিসট্যান্ট সিগনালে লাল আলো জ্বলছে। সেই আলোতেও আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, একজন লোক বয়স্কদের সামনে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে চাইছেন। গোলকজেঠুও দেখতে পেয়েছেন লোকটিকে। শুধোলেন, ওই কি তোমার গোলকজেঠু?

একজন গোলকজেঠু আমার সঙ্গে হাঁটছেন। আর একজন গোলকজেঠু একটু দূরে হাত পেতে ভিক্ষে করছেন। সব কিছু যেন আমার কাছে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমি থতমত খেয়ে বললাম, হ্যাঁ। আমাদের দেখতে পেয়েই ভিক্ষুক গোলকজেঠু হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে তিনি বোধহয় লাইন টপকে পালাতে চাইছিলেন কিন্তু তার আগেই আমাদের গোলকজেঠু তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কে তুই?

লোকটি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না?

গোলকজেঠু বললেন, চিনতে পেরেছি বৈকি! কিন্তু তুই আমার ভেক ধরেছিস কেন?

এখন আমি যে কারও ভেক ধরতে পারি। কথাটা বলেই সে আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে লাগল।

একটু দূরেই একটা বাঁশঝাড়। সেই বাঁশঝাড়ের ঝুঁটি নাড়িয়ে একাট দমকা বাতাস এসে ঝাপটা মারল আমাদের চোখেমুখে। মুহূর্তের জন্য হয়তো চোখ বন্ধ করেছিলাম। চোখ খুলতেই দেখি, লোকটা আর নেই। তার বদলে হুবহু আমার মতো একজন লোক লাইন টপকে নেমে যাচ্ছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে।

পরের দিন গোলকজেঠু বেতের ধামায় চাল, ডাল, আলু ও অন্যান্য সবজির বড়োসড়ো একটা সিধে সাজিয়ে দিবাকরের মাথায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দিলেন আলতারার কানাই হাজরার বাড়িতে, সেই সঙ্গে নগদ করকরে একশটি টাকা।

কানাই হাজরা যে কয়েকদিন আগে শেওড়াফুলি স্টেশনে লাইন টপকাতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে সেই খবরটা আমাদের কারও জানা ছিল না।

এরপর থেকে কেমন পালটে গেলেন গোলকজেঠু। পাড়ার অনুষ্ঠানে দরাজ হাতে চাঁদা দিতেন, গরিব, দুঃখী ও ভিখারিকে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। পাড়ার লোকেরাও ধীর ধীরে কিপটে কথাটা ভুলে গেল। আড়ালে-আবডালে গোলকজেঠুকে তারা ডাকতে শুরু করল বাবু গোলকবিহারী মণ্ডল নামে।

কার্ত্তিক ১৪২০

ভূত বেচেছি চড়া দামে

সৈয়দ রেজাউল করিম

একে অমাবস্যার রাত। তার উপর সঙ্গে এসে জুটেছে ঝড়ো হাওয়া, কালো মেঘ। ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক মারছে আকাশে। এখনই হয়তো ঝেঁপে বৃষ্টি আসবে। আর মাথা বাঁচাতে তখন গিয়ে বসতে হবে শ্মশানঘাটের মন্দিরে।

সাধারণত 'মন্দির' বললে আমরা যেমন ভেবে থাকি, শ্মশানঘাটের মন্দিরটা ঠিক তেমন নয়। পুজোর জন্য একটা বিগ্রহ আছে বটে, কিন্তু পূজারী নেই। আছে ঝোপঝাড়, সাপখোপ, আর ভয়ঙ্কর সব মানুষের আনাগোনা। এত কিছু জেনেও কেন এই ঝুঁকি নিতে গেলাম? ভূত আছে কি নেই, সে যে যার নিজের ধ্যান-ধারণা, নিজের বিশ্বাস, এতে প্রমাণ করার কী আছে? এই মূর্খামির জন্য নিজেকেই নিজে ধিক্কার জানালাম।

ভাবতে ভাবতে একসময় ভাবনার তারটা ছিঁড়ে গেল। অদূরে কোথাও কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল। পিলে আমার চমকে উঠল। সেই সঙ্গে শুরু হল ঝড় আর বৃষ্টি। আমি দৌড়ে আশ্রয় নিলাম মন্দিরে। ভয় পেয়ে একটা পাখি উড়ে গেল আমার মাথার উপর দিয়ে, ট্যা ট্যা করতে করতে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গম্ভীর গলায় কেউ একজন কিছু জানতে চাইল। আমি সভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই সময় কে যেন আমার সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। জীব-জন্তু নয়, মনে হল মানুষ। কিন্তু এত রাত্রে কে আসবে এখানে মরতে? গায়ে তার কম্বলের মতো কী ছিল? কেনই বা সে ছুটে পালাল? তাহলে কি....ভাবতে ভাবতে মোমের মতো গলতে থাকল মনের যত শক্ত ভিত। অশরীরীর একটা কালো ছায়া মনের মধ্যে ক্রমশ শক্ত হয়ে চেপে বসল। যুক্তি, তর্ক, বিচার-বিবেচনা সব উবে গেল কর্পূরের মতো। মনের মধ্যে এসে জুটল আতঙ্ক, ভয়। আমি ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকলাম এক অপার্থিব জগতে।

ঝড়-বৃষ্টি কিছুটা কমে এল। আমার কানে এল সমবেত আওয়াজ। 'বলো হরি, হরিবোল।' যাক্ বাঁচা গেল। পাঁচ-সাতটা লোক তো সঙ্গে পাওয়া গেল। মনের মধ্যে যে ভয়টা শিকড় গেড়ে বসেছিল তা অনেকটা দূর হল। 'বলহরি' বলতে বলতে লোকগুলো এসে হাজির হল মন্দিরের সামনে।

আমি সাহস পেয়ে বাইরে এলাম। মশালের আলোতে আমাকে দেখে ওরা খুব অবাক হল। পরিমল শুধাল, তুই এখানে কী করতে এসেছিস?

আমি মিথ্যে করে বললাম, বৃষ্টি এল, মাথা বাঁচাতে ঢুকে পড়লাম।

সুবীর বলল, হরি কোথায় গেল?

হরি কে তা আমি জানতাম না। এর আগে কোনোদিন শ্মশানঘাটে আসিনি। তাই জবাব দিতে ইতস্তত বোধ করলাম। ঠিক সেই সময় সেই লোকটা এসে হাজির হল, যে আমাক সামনে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। একে দেখে এতটা ভয় পেয়েছিলাম!

পরিমল বলল, হরিভাই! একটু কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

হরি ডোম বলল, সব দেব, আগে আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে চলো।

হরির কথা শুনে সকলে তার সঙ্গে চলে গেল। আমাকে রেখে গেল মড়া পাহারা দেবার জন্য। হাতে একটা লাঠি নিয়ে আমি মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে বসলাম। আর কোনো ভয়-ভীতি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল না। কিন্তু কে মারা গেছে তা তো জানা হল না।

হ্যাজাক লাইটের আলো আমার মনে জমে থাকা যত অন্ধকার কালো সব দূর করে দিল। এমন সময় দেখলাম একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি এদিকে আসছেন। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কাছে আসতেই চিনে ফেললাম, বিধুকাকা। নিশ্চয়ই মড়া পোড়াতে ওদের সঙ্গে এসেছে। এই বয়সে ছেলেপুলেদের সঙ্গে কি আসতে আছে? আমি বিরক্তি নিয়ে বললাম, তুমি আবার এদের সঙ্গে আসতে গেল কেন বিধুকাকা?

বিধুকাকা বলল, কী করব বল, ওরাই তো ধরে নিয়ে এল।

আমি বললাম, ভালোই হল, দুজনে গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আসলে বিধুকাকাকে আমার খুব ভালো লাগে। মনের মধ্যে কোনো ঘোর-প্যাঁচ নেই। সোজা কথা সোজাভাবেই বলতে ভালোবাসে। তাতে কেউ চটুক, তাতে তার কিছু যায়-আসে না। তবে ভূতের ব্যাপারে কতটা কী বিশ্বাস করে তা আমার জানা নেই। তাই গল্প করার তাগিদে বিধুকাকা কাছে এসে বসতেই আমি শুধালাম, বিধুকাকা! তুমি কখনো ভূত-টুত দেখেছ?

দেখেছি মানে! আলবাৎ দেখেছি। শুধু কি দেখেছি, ভূত বেচে এসেছি বাজারে।

বিধুকাকর কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। বলে কি বিধুকাকা! এ কি কখনো সম্ভব? যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো বিজ্ঞানসম্মত তথ্য প্রমাণ নেই তাকে বিধুকাকা বাজারে বেচে এল কীভাবে? ব্যাপারটা জানার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। একরাশ বিস্ময় চোখে আমি জানতে চাইলাম, কোন বাজারে বেচে এলে কাকা? কথাটা মিথ্যে নয় তো?

বিধুকাক বলল, মিথ্যে হতে যাবে কেন?

একথা বলে একটু গুছিয়ে বসে বিধুকাকা বলতে শুরু করল, ছেলেবেলা থেকেই আমার শরীরটা রোগাপাতলা। লোকে বলত তালপাতার সেপাই। কিন্তু মনে ছিল আমার অদম্য সাহস। আর ভূত ছিল আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু। ভূতের সঙ্গে মোলাকাত করাই ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান। লোকজন ঠাট্টা করে বলত, তোর যা চেহারার ছিরি, তুই ভূতের সঙ্গে লড়বি কী, ভূত দেখলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবি। আমি বলতাম, ভূতের তো রক্ত-মাংস কিছু নেই, আমার তো হাড়ের উপর চামড়া অন্তত আছে, একবার শুধু ভূতের সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও, তারপর খেলাটা দেখিয়ে দেব।

বন্ধুবান্ধবরাও ছাড়ার পাত্র নয়, তারা একটার পর একটা জায়গার ঠিকানা আমাকে দিয়েছে। ভূত দেখার আশায় আমি সেখানে গেছি, রাত কাটিয়েছি, কিন্তু ভূতের দেখা পাইনি।

একদিন হল কী, সন্ধ্যাবেলায় ইলিশ মাছ নিয়ে বাজার থেকে ফিরছি, এমন সময় ঠকাস করে মাথায় বাড়ি খেলাম। কী লাগল মাথায়? পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বটগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে একটা ভূত। আমাকে দেখে খিক খিক করে হাসল। চিনতে না পেরে নাকি নাকি সুরে শুধাল, 'তুঁমি কেঁ গোঁ'?

সামনাসামনি এরকম একটা জলজ্যান্ত ভূত দেখতে পাব, এ আমার কল্পনায় ছিল না। আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। থরথর করে কেঁপে উঠল সারা শরীর। খাড়া হয়ে উঠল গায়ের লোম। মাছটা ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাব, না ভূতের মোকাবিলা করব, ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। চোয়াল দুটো শক্ত করে বললাম, 'আমিও ভূত।'

আমার কথা শুনে ভূতটা বলল, 'তাঁ বঁন্ধু! এই রাঁতবিঁরেতে মাঁছটা হাঁতে নিঁয়ে চঁললে কোঁথায়?'

আমি বললাম, 'বক্সির হাটে।'

ভূতাট সে কথা শুনে ঝপাস করে গাছ থেকে নামল। মিষ্টি করে বলল, 'আঁমিও তোঁ বঁক্সির হাঁটে যাঁব বঁলে অঁপেক্ষা কঁরছি। ভালোই হঁল, চঁলো একসঙ্গে গঁল্প কঁরতে কঁরতে হেঁটে চঁলে যাঁই।'

ভূতের প্রস্তাব শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। না বলতে গিয়ে কথাটা মুখে আটকে গেল, যদি সন্দেহ করে বসে তাহলে আর বিপদের শেষ থাকবে না। অগত্যা একমুখ হাসি নিয়ে বললাম, 'তা হলে তো খুব ভালোই হয়?'

ভূতও খুব খুশি হল। আমার হাত ধরে অনেক গল্প শোনাল। কীভাবে সে ভূত হয়েছে, এখানে এসে তার কেমন দিন কাটছে, তার পরিবার-পরিজনেরা এখন পৃথিবীতে কেমন আছে, এইসব। হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একসময় ভূত বলল, 'আঁমরা ভাঁই বোঁকার মঁতো কাঁজ কঁরছি। এঁভাবে দুঁজন এঁকসাথে নাঁ হেঁটে, যঁদি আঁমরা এঁকে অঁন্যকে কিঁছুটা পঁথ বঁয়ে নিঁয়ে যেঁতাম তাঁহলে অঁনেকটা পারিশ্রম লাঁঘব হঁত আঁমাদের।'

ক্লান্তি কাটাতে একটু জিরিয়ে নেবার কথা ভাবছিলাম আমি, কিন্তু সেই প্রস্তাব দেবার আগেই ভূতটা আমার ঘাড়ে চেপে বসল। নেহাত ভূতটা হাড় জিরজিরে ছিল, তাই খুব একটা অসুবিধে হল না আমার। আধ মাইল হাঁটার পর ভূতকে ঘাড় থেকে নামিয়ে ভূতের ঘাড়ে চেপে বসলাম আমি। বেশ কিছুটা যাবার পর ভূত জিগ্যেস করল, 'আঁচ্ছা ভাঁই! তোঁমাকে এঁত ভাঁরী লাঁগছে কেঁন? সত্যিঁ তুঁমি ভূঁত তোঁ?'

'ভূত নয় তো কী মানুষ?' রাগান্বিত স্বরে আমি জবাব দিলাম।

ভূত গম্ভীর হয়ে কিছু ভাবছিল। ব্যাপারটা সামাল দেবার জন্য আমি বললাম, 'আসলে আমি নতুন এসেছি তো, তাই একটু ভারী । তা ভাই! একটা কথা জিগ্যেস করব?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বঁলো ভাঁই!'

আমি বললাম, 'আমরা অশরীরীরা কীসে ভয় পাই?'

'ভূঁত হঁয়েছ, অঁথচ এঁকথা তুঁমি জাঁনো নাঁ? তুঁমি কেঁমন জাঁতের ভূঁত গোঁ?'

'আসলে ক'দিন আগে আমি এসেছি, তাই এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে জানা হয়নি এখনো!'

'শোঁনো তাঁহলে।' বিজ্ঞ মাস্টারমশাই-এর মতো ভূতটা বলল, 'আঁমরা ভঁয় পাঁই মাঁনুষের থুঁথু। যঁদি কোঁনো মাঁনুষ এঁকবার আঁমাদের তাঁক কঁরে থুঁথু ফেঁলে, তাঁহলে....'

গল্পে গল্পে আমরা বক্সির হাট বাজারের কাছে পৌঁছে গেলাম। শুধু ঝরনাটা পার হলেই হল। ভূত তো যথারীতি লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে পার হয়ে গেল। আমার পা তো ভূতের মতো লম্বা নয়। তাই পার হতে সময় লাগছিল। ঝপাং ঝপাং আওয়াজ হচ্ছিল। বিস্মিত হয়ে ভূত জিগ্যেস করল, 'জঁলের মধ্যেঁ আঁসতে এঁরকম আঁওয়াজ হঁচ্ছিল কেঁন?'

আমি বললাম, 'আসলে নতুন তো। এখনো সব কিছু রপ্ত করে উঠতে পারিনি।'

ভূত বলল, 'এঁবার তোঁমার পাঁলা, তুঁমি আঁমাকে কাঁধে কঁরে নাঁও।'

আমি কোনো প্রতিবাদ করলাম না। বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে কাঁধে করে তুলে নিলাম। শক্ত করে তার ঠ্যাং দুটো জড়িয়ে. ধরলাম। তারপর সোজা হাঁটা দিলাম বাজারের দিকে।

রাত ক্রমশ শেষ হয়ে এল। ঊষার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভূত বলল, 'আঁমাকে ছাঁড়ো। কাঁধ থেঁকে নাঁমিয়ে দাঁও। এঁতো আঁলো আঁমি সঁহ্য কঁরতে পাঁরছি নাঁ।'

মনে মনে আমি একটা ফন্দি এঁটেছিলাম। তাই শত অনুরোধ সত্ত্বেও ভূতকে ছাড়লাম না। আমি ভূতের দুই পায়ে থুথু করে দু'বার থুথু ফেললাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম হাটে। আমাকে দেখে হাটের কিছু লোকজন এগিয়ে এল। আমাকে জিগ্যেস করল, 'ভাই! কত দামে দেবে?'

আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম তাদের কথা শুনে। কাঁধ থেকে ভূতকে নামাতেই দেখতে

পেলাম, সে আর ভূত নেই, একটা নাদুসনুদুস ভেড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বদবুদ্ধিটা জেগে উঠল মাথায়। আমি আবার থু থু করে তিনবার থুথু ফেললাম ভেড়াটাকে লক্ষ করে। ভেড়া আর কোনোভাবেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারল না অন্যভাবে। বক্সির হাটে ভূতকে চড়া দামে বেচে বাড়ি ফিরেছিলাম আমি।

বিধুকাকার গল্প শুনে আমি একটুও চমকে উঠলাম না। কারণ এ গল্পটা আমার জানা। বহুবছর আগে কোথাও পড়েছিলাম। সম্ভবত চিন দেশের লোককথায়। তবে বই ও সংকলকের নাম মনে করতে পারলাম না কিছুতেই। বিধুকাকা যেভাবে গল্পটা পরিবেশন করল তাতে মনে হল ঘটনাটা সত্যই বিধুকাকার জীবনে ঘটেছে।

বিধুকাকা আমার দিকে তাকাল। অভিমানী সুরে বলল, আমার জীবনে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তবে তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। তুই একটু বোস, আমি প্রমাণটা নিয়ে আসছি।

বিধুকাকা টং টং করে চলে গেল শ্মশানঘাটের দিকে। কী প্রমাণ আনতে গেল কে জানে?

কিছুক্ষণ পরেই শববহনকারীরা ফিরে এল। তাদের মধ্যে বিধুকাকার বড় ছেলে সিধুভাইও ছিল। তারা দেহ নিয়ে যেতে এসেছে। আমি সিধুকে শুধালাম, সিধুভাই! কে মারা গেছে?

সিধু শান্ত গলায় জবাব দিল, আমার বাবা।

আমি সবিস্ময়ে জানতে চাইলাম, তার মানে?

সিধু বলল, বাবা বাজারে গিয়েছিল। ফেরার পথে হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি এল। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য বাবা একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাতে মাথাটা বাঁচল, কিন্তু হঠাৎ বজ্রপাতে প্রাণটা চলে গেল।

কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস হল না আমার। বিধুকাকা তো আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন এতক্ষণ। প্রমাণ আনতে এইমাত্র গেলেন, তিনি মরবেন কীভাবে? ব্যাপারটার মধ্যে কেমন যেন একাট রহস্যের গন্ধ পেলাম। আমি দেহ দেখতে চাইলাম।

সিধু তার বাবার মুখ থেকে ঢাকা দেওয়া চাদরটা সরিয়ে দিল।আমি হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোতে দেখলাম, বিধুকাকা নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে আছেন। মুখে তাঁর মৃদু হাসি। তাঁর মাথার কাছে রাখা আছে একটা বই। আমি বইটা হাতে নিয়ে দেখলাম। গ্রন্থটির নাম 'এনশিয়েন্ট চাইনিজ মিনিয়েচার স্টোরিজ'। সংকলন ও অনুবাদ করেছেন 'মা জিয়াজু'। পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়ল ভূত বিক্রির গল্পটা।

আমার হাতে বইটা দেখে সিধু বলল, বাবার অনেকদিনের শখ ছিল এই বইটি কেনার। বাজারে বইটা পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খুঁজে বইটা সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য বাবার আর পড়া হল না। তাই বাবার মাথার ধারে বইটা রেখে দিয়েছি।

মরা মানুষ কি সত্যি বই পড়তে পারে? এ প্রশ্নের এখনো কোনো জবাব নেই আমার কাছে। তবে ভূত বলে যে কিছু একটা আছে, তা সেদিন রাত্রে সশরীরে হাজির হয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন বিধুকাকা।

মাঘ ১৪২১

দাদু

শৈলেন চক্রবর্তী

দুপুর থেকেই আকাশখান ঘুরঘুট্টি। খেয়েদেয়ে বাবা-মা দুজনেই বেরিয়ে পড়ল তাড়াহুড়ো করে। মামাবাড়ির দিদু হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে তাই দেখতে গেল। কাল সকালেই চলে আসবে। আমাদের সামনে পরীক্ষা। দাদা আর আমি দুজনে বাড়িতে। রাতের খাবার মা ফ্রিজে রেখে গেছে। গ্যাস আভেন জ্বেলে আমি এখন খাবার গরম করতে শিখে গেছি। চা করতে পারি, কিন্তু মা করতে দেয় না।

আমার নাম পুটু। বাবা ডাকে পুতুন। আমি ক্লাস ফোর। দাদা সেভেন। দাদার নাম বব। দাদাকে আমি নাম ধরেই ডাকি। সেই ছোটবেলার অভ্যেস। আর রেগে গেলে কিম্বা ঝগড়া হলে 'দাদা' বলি।

বিকেল থেকে ঝমঝমিয়ে নামল। সন্ধে হবার আগেই অন্ধকার। মা একটু আগে মোবাইলে ফোন করে বলেছে পৌঁছে গেছে। বেশি ভেজেনি। আমরা বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। বারান্দার একাটা জানালা খোলা। সেটা দিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ছাঁট আসছে।

কারেন্ট নেই। আমাদের গ্রামে একটু ঝড়-বৃষ্টি হলেই লোডশেডিং হয়ে যায়।

পড়ার ঘরে আমরা দুজনে বসে আছি। বব বলল, আয় লুডো খেলি। তখনই দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল।

বৃষ্টির মধ্যে কে এল রে?

বব বলল, চোর হতে পারে?

হ্যাঁ, সন্ধেবেলায় চোর আসবে? তোর মাথাটা একটা ওলকচু।

তাহলে ভূত। একটু আগে ঝড়ে পুকুরপাড়ের তালগাছ দুটো কেমন দুলছিল। হয়তো হাত ফসকে ভূত নীচে পড়ে গেছে। তারপর বৃষ্টিতে ভিজে হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে চলে এসেছে ঘরের দরজায়।

তোর আজগুবি গপ্পো লিখে পাঠিয়ে দে। শুকতারা-য় ছাপবে।

তখনই আবার ঠক ঠক ঠক মোবাইলের টর্চটা জ্বাল তো। কে এল দেখি।

পুটু, অত সাহস ভালো নয়। বৃষ্টি পড়ছে। লোডশেডিং। অন্ধকার। বাব-মা কেউ নেই। দরজাটা খুলিস না বুনু।

ববটা সত্যিই ভিতুর ডিম। টর্চ জ্বেলে দরজার কাছে গিয়ে বললাম, কে?

আমি। দরজা খোল।

বব তখনও খাটে বসে। চোর কিম্বা ভূত হলে বুঝি এমনি করে সাড়া দিত?

দরজাটা খুলে দিলাম।

একটা দাদু। বাপরে বাপ, কী বৃষ্টি। বলতে বলতে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল।

বাবা-মা নেই তো? দিদুর বাড়ি গেছে। ভাবলাম, পুঁচকে দুটো একা আছে, একটু গল্প করে আসি। তোমরা বোধহয় আমাকে চিনতে পারছ না।

মোবাইলের টর্চে কতটুকুই বা আলো। ববের দিকে তাকালাম। সেও হাঁ করে দেখছে দাদুকে। ধুতি আর ছাই রঙের একটা পাঞ্জাবি। এত বৃষ্টিতে দাদুর পায়ের পাতা ভেজেনি। দাদু কেমন জুতো

পরে এসেছে? দাদুর ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোথাও বৃষ্টির দাগ নেই। পাঞ্জাবির হাতার বাইরে সরু দুটো লিকলিকে হাত। আঙুলগুলো যেন সজনেডাঁটা, ডাল থেকে দুলছে।

ববের চোখদুটো তখনও ছানাবড়া।

খাটের পাশে নিজেই চেয়ার টেনে বসে পড়ল দাদু। কেমন একটা গন্ধ। বিড়ি-বিড়ি, কিন্তু ঠিক বিড়ি নয়। দাদু কিন্তু বিড়ি খাচ্ছে না। হাসল। দাঁতগুলো ঝকঝকে সাদা। চশমাটা পুরোনো।

বাবা, তোমার যে একেবারে গোয়েন্দার চোখ গো। ও পুটু, বসো।

মা আমাকে মাঝে মাঝে গোয়েন্দা বলে, দাদু জানল কেমন করে?

আমি তো তোমাদের সবই জানি। আসি কম, দেখা হয় না। তাই আমাকে চিনতে পারছ না। কিন্তু আমি তো তোমাদের দেখি। এইটুকুন থেকে দেখতে দেখতে দুজনে কত বড়ো হয়ে উঠলে। এখন আর কোলে নিতে পারব না। তোমরা যখন এত্তটুকুন, কোলে নিয়ে কত ঘুরে বেড়িয়েছি।

দাদু কি থট-রিডার? মনের কথা বুঝতে পারে?

তারপর শুভময়বাবু, ক্লাস সেভেন হয়ে গেল তো? পরীক্ষা সামনে। অ্যালজেব্রা নিয়ে এখনও ভয় কাটেনি।

বব ক্যাবলার মতো ঘাড় নাড়ল। ওর ভালো নাম যে শুভময়, দাদু তাহলে জানে।

আমার দিকে তাকিয়ে দাদু বলল, ইশকুলে তুমি তো দেবদত্তা। সবাই বলে ব্রিলিয়ান্ট গার্ল।

আমরা চিনতে পারছি না। কিন্তু দাদু আমাদের সব জানে। এখন বেশ মজা লাগছে। বললাম, জল খাবে দাদু?

দাও। আমি কিন্তু মিষ্টি খেতে ভালোবাসি। সমীরণ সকালে দুরকম মিষ্টি নিয়ে এসেছিল। দেখো দিকি, আছে কী না।

বাবার নাম সমীরণ। বাবা সকালে মিষ্টি নিয়ে এসেছে? কই, মা দেয়নি তো।

ফ্রিজ খুলে দেখি, মিষ্টি আছে দু-রকম। একটা মাটির ভাঁড়ে পান্তুয়া। বেশ বড়ো বড়ো। আর একটা কাগজের বাক্সভরতি শোনপাপড়ি। আমার প্রিয় মিষ্টি।

মামাবাড়ি নিয়ে যাবে বলে কি বাবা মিষ্টিগুলো এনেছিল? তাড়াহুড়োয় নিয়ে যেতে ভুলে গেল।

কী গো পুটুরানি, মিষ্টি পেলে?

দাদুর ডাকটাও বেশ মিষ্টি। বললাম, যাই দাদু।

একটা প্লেটে দুটো পান্তুয়া আর দুটো শোনপাপড়ি এনে রাখলাম টেবিলে। নাও, চামচ এনে দিই।

চামচ লাগবে না। বরং হাতটা ধুয়ে আসি। বলে দাদু সটান চলে গেল বেসিনে। অন্ধকার কাটছে না মোবাইলের আলোয়। কিন্তু এঘরে দাদুর যেন সব চেনা।

বব বলল, একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই। দেশলাইটা কই রে?

দাদু হাঁ হাঁ করে উঠল। বাচ্চা ছেলে, একদম দেশলাই জ্বালাবে না। আগুন হল মারাত্মক জিনিস। খুব সাবধান। এই তো পুটুর হাতে মোবাইল আছে। ওতেই হবে।

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ববের মুখে একটা বড়ো পান্তুয়া ঠুসে দিল দাদু। বব না পারে চিবোতে না পারে গিলতে। কষ বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ছে।

কী মজা! বলে আমি হাততালি দিয়ে উঠেছি। অমনি আমার মুখেও গপ্‌।

পান্তুয়ার পর দুজনকে দুটো শোনপাপড়ি।

আমি ইশারায় বলতে চাইলাম, তুমি কই খেলে দাদু?

ফ্রিজে আরও মিষ্টি আছে। নিয়ে এসো।

মিষ্টি খেতে খেতে আমাদের দুজনের হাতে আরও একটা করে শোনপাপড়ি তুলে দিয়ে দাদু বলল, পুটুসোনার তো প্রিয় মিষ্টি শোনপাপড়ি।

আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম।

তাহলে ববভায়া, অ্যালজেব্রা না গল্প?

মোবাইলের আবছা আলোতেও দেখলাম, ববের চোখদুটো নেচে উঠল। আর আমি তো গল্পের পোকা।

মনে পড়ল, ববকে দু'পাতা অ্যালজেব্রা কষতে দিয়ে গেছে মা, আর আমাকে অনেকগুলো ট্র্যান্সলেশন, একগাদা গুণ। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, গল্প শুনব গল্প, ভূতের গল্প।

এক্কেবারে ভূত।

জানালার পাশ থেকে ভেতরের দেয়ালের দিকে সরে বসল বব। বলল, এই অন্ধকারে ভূতের গল্প কেন? তায় আবার বৃষ্টি পড়ছে।

বৃষ্টি আর অন্ধকারেই তো ভূতের গল্প জমে।

আমি বললাম, দারুণ জমবে। বলো না দাদু বলো। আনন্দে দাদুর হাতটা ধরে ফেললাম। দাদুর হাতটা কী ঠান্ডা।

দাদু বলল, ভূত কিন্তু সত্যি আছে। জানো তো, ঠিক তোমার আমার মতো। মানুষ যেমন সত্যি, বিজ্ঞান যেমন সত্যি তেমনি ভূতেরাও সত্যি। বিদেশে বিজ্ঞানীরা এখন ভূত নিয়ে নানা গবেষণা করছেন। ভূত নিয়ে এই বিজ্ঞান-চর্চার নাম দেওয়া হয়েছে ভূতবিজ্ঞান।

বব ঢোক গিলে বলল, আমরা পড়ি ভৌতবিজ্ঞান। তুমি বলছ ভূতবিজ্ঞান?

ঠিক। ভৌতবিজ্ঞান নয়, ভূতবিজ্ঞান।

ভূতের গবেষণায় বিজ্ঞানীরা কী বলছে?

ভূত বড়ো ভালো।

বব চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ভালো?

হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে অনেক ভালো। এই ধরো, বানরের চেয়ে মানুষ যতটা ভালো, মানুষের চেয়ে ভূত আরও অনেক বেশি ভালো।

তবে যে লোকে ভূতেদের নামে কত কী বলে?

লোক মানে কে? মানুষ তো? মানুষে তো ভূতের নিন্দে করবেই। বানরেও মানুষের খুব নিন্দে করে।

আচ্ছা, ভূতেরা কেমন ভালো, একটু বলো।

ভূতেরা ঝগড়া করে না। রাস্তাঘাট নোংরা করে না। পানের পিক ফেলে না। পান গুটকা মদ সিগারেট খায় না। ভূতেরা শব্দদূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, কোনো দূষণই করে না। ভূতেরা গাদাগাদা খায় না। বারবার বাথরুমেও যায় না। ভূতেরা স্নো-পাউডার ক্রিম-লিপস্টিক লাগায় না। চুলও আঁচড়ায় না। ভূতেদের মাথায় উকুন নেই।

দাদু সরু সরু আঙুল দিয়ে আমার মাথাটা ছুঁয়ে দিল। কেমন যেন কাতুকুতু লাগল।

মোবাইলের আলোটা কমে এসেছে। চোখ তুলে দেখি, চশমার ভেতর দাদুর চোখগুলো কেমন হলদেটে। টিউবলাইট নিভে যাবার পরও যেমন ফিকে আলো লেগে থাকে টিউবের গায়ে, তেমনি আলো দাদুর চোখে। আর মাথাটা এক্কেবারে ন্যাড়া। একটাও চুল নেই।

হাসল দাদু। ঝকঝকে সাদা দাঁত, যেন আলো জ্বলে উঠল।

বব উসখুস করছিল। ওর গলাটা এখন বেশ চনমনে হয়ে উঠছে। আর ভয় পাচ্ছে না।

বব বলল, ভূতেরা এমন ভালো ছেলে হয়ে তবে কী করে?

সারাদিন বসে বসে অ্যালজেব্রা কষে। বলেই হো হো করে হেসে উঠল দাদু।

কী সুন্দর হাসতে পারে দেখো।

দাদু জিগ্যেস করল, বানরে কী করে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে বব ওস্তাদ। বলল, গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়। ফলপাকুড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। ডাল ভাঙে। আর মগডালে বসে পটি করে। সারাদিন বাঁদরামি।

আর মানুষ? তার কত কাজ। বানরের সঙ্গে মানুষের তুলনাই হয় না। তেমনি মানুষের সঙ্গে ভূতের কাজের কোনো তুলনা নেই। ভূত হল একেবারে যাকে বলে পরোপকারী জীব। শান্তির দূত।

শান্তির দূত?

দেখছো না, মানুষ কেমন যুদ্ধ করে? দেশের মধ্যে যুদ্ধ, দেশের বাইরে যুদ্ধ। দেশে দেশে যুদ্ধ। মানুষের হাতে এত বন্দুক রাইফেল গুলিগোলা কীসের জন্য? মানুষকে মারবার জন্য। মানুষকে শায়েস্তা করবার জন্যই এত থানা-পুলিশ।

সে তো বদমাশগুলোর জন্য।

মানুষই বদমাশ হয়। ভূতেদের মধ্যে বদমাশ নেই। ভূতেরা অল্প খায়। সকলের মঙ্গল কামনা করে। আর সময় পেলেই রামনাম ভজন করে।

ভূতের মুখে রামনাম? তবে যে বলে রামের নাম করলেই ভূত চলে যায়?

ওগুলো ভূতেদের নামে বদনাম। মানুষগুলো ভূতকে দেখতে পারে না বলে এমন অকথা-কুকথা বলে।

বব বেশ মজা পাচ্ছে। এতদিন ও ভূতকে খুব ভয় পেত। কিন্তু এখন শুনছে ভূত তো অন্যরকম। তাই বোধহয় জিগ্যেস করল, তবে যে শুনেছি সুযোগ পেলেই ভূত মানুষের ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলে।

ধুৎ। পানতুয়া থাকতে ভূত মানুষের ঘাড় মটকাবে কেন? পানতুয়ার চেয়ে মানুষের মুন্ডু কি বেশি মিষ্টি? পানতুয়া খেতে ভূত খুব ভালোবাসে। আর খায় মাছভাজা।

কী মাছ?

সব মাছই খায়। যেখানে যেমন পায়। অবশ্য মাঝেমাঝে ঝালমুড়ি কিম্বা ঝুরিভাজাও খায়। তবে ভূত তো আর গাদা গাদা খায় না। মাসে একদিন এই অমাবস্যার রাত্রে।

এত খাওয়ার কথা শুনে বব একবার হাই তুলল। মা বলে, ছেলেটা বড়ো পেটরোগা।

কী রে ঘুম পাচ্ছে?

দুপুরে ঘুমোইনি তো। অঙ্কগুলোও করা হল না। মা কাল কষে বকুনি দেবে। আচ্ছা দাদু, ভূতের রোগ-অসুখ হয় না?

না। ভূতের কোনো রোগবালাই নেই দাদু। জ্বর, সর্দিকাশি হ্যাঁচ্চো কিচ্ছু নেই। ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া পোলিও টিবি ভূতকে ভয় পায়। ভূতের হার্ট খুব স্ট্রং, কখনও ফেলিওর হয় না। রোগ শুধু একটাই। হাড়মড়মড়ি।

সেটা আবার কী?

হাড়গোড়ে ব্যথা হয়। টনটন করে। সে বড়ো কষ্ট।

তখন কী করে?

দেখো, ভূতেরা ওষুধপত্র খায় না। তাদের ডাক্তার বদ্যি হাসপাতালও নেই। ভূত কারও সেবাও নেয় না। নিজের ব্যথা নিজে সারায়।

কী করে?

অর্জুন বহেড়া হরিতকি আমলকি আর বেল হল পাঁচটি মহাবৃক্ষ। এই গাছগুলিতে ভোরবেলায়

পা ঝুলিয়ে ভূতেরা দোল খায়। বুকভরে টাটকা অক্সিজেন নিতে পারলে হাড়ের ব্যথা সেরে যায়। আর কোনো রোগও হয় না। ওই অক্সিজেনই হল আসল। টাটকা অক্সিজেন চাই। অথচ এখন সেটারই বড়ো অভাব।

কেন দাদু?

আরে ভাই, গাছগুলোই তো সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। আগে ওই পুকুরপাড়ে কতগুলো অর্জুন গাছ ছিল, তিনটে হরিতকি গাছ ছিল। আছে এখন? সমীরণ সবগুলো বিক্রি করে দিল। সবারই কত টাকার দরকার। এবার বলছে কুয়োতলার ওই বহেড়া গাছটা কেটে ফেলবে।

হ্যাঁ, দুটো লোক এসেছিল সেদিন বাবার সঙ্গে কথা বলে গেছে।

চারপাশে তাকিয়ে দেখো, গাছ বলতে এখন আকাশমণি ইউক্যালিপটাস বাবলা আর শিশু। শাল নেই শিরিষ নেই নিম-শিমুল-অশ্বত্থ-কৃষ্ণচূড়া নেই। মহানিম অশোক পাকুড় জরুল মেহগনি সেগুন গাছ তো তোমরা দেখতেই পেলে না।

মোবাইলের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দাদুর চোখগুলো কেমন দুঃখী হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দাদু বলল, ভূতেরা এখন বড়ো দুশ্চিন্তায় রয়েছে। ওই বিজ্ঞানীরা ভূতেদের একটা ওয়েবসাইট খুঁজে পেয়েছেন।

ভূতেদের ওয়েবসাইট! বব আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না। বালিশে মাথা রেখে এলিয়ে পড়েছে। কথা বলতে বলতে দাদু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। ছোট্ট একটা হাই উঠল। কী দিদিভাই, ঘুম পাচ্ছে?

না, তুমি বলো। ভূতেদের ওয়েবসাইটে কী লেখা আছে শুনি।

কোন গাছের কী উপকারিতা, সব বলা আছে। আর সারা দেশের মানুষের কাছে আবেদন রাখছে, ওহে আরও গাছ লাগাও। শুধু বাড়িঘর অফিস কারখানা আর ঝকঝকে রাস্তা চকচকে গাড়ি নিয়ে বাঁচা যাবে না। অনেক গাছ চাই, ফ্রেশ অক্সিজেন চাই। রাস্তার পাশে, ফাঁকা জমিতে, বাড়ির আনাচেকানাচে উঠোনে যেখানে ফাঁকা জায়গা পাবে, গাছ লাগাও। আর ফলফুল কাঠের কথা ভেবে নয়, গাছ লাগাও অক্সিজেনের জন্য। অক্সিজেনের বড়ো অভাব গো। অক্সিজেন ছাড়া প্রাণ বাঁচে না।

এক ঘুমেই সকাল।

বব? বব, তুই কোথায়?

এই তো এখানে, কুয়োতলায়।

একটা ছোট কোদাল নিয়ে বব মাটি কোপাচ্ছে। এতটুকুন একটা গর্ত করে ফেলেছে।

কী করছিস রে?

গাছ লাগাব।

দাদুর কথা মনে পড়ল। বললাম, দাদু কই?

চলে গেছে বোধ হয়। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাইনি।

চলে গেল!

তখনই ভুটভুট করে, বাবার মোটরবাইক এসে থামল। এসেই মা চমকে উঠল, মোবাইল বন্ধ রেখেছিস কেন? সারারাত দুশ্চিন্তা। ফোনে পাই না।

মোবাইলে তো চার্জ ছিল না। তাই বন্ধ হয়ে গেছে।

বাবা ধমক লাগাল ববকে, সক্কালবেলা কোদাল নিয়ে কী করছিস?

গাছ লাগাব।

গাছ লাগাবি?।

হ্যাঁ, দাদু বলেছে।

দাদু বলেছে মানে! কোন দাদু?

ওই যে কাল সন্ধেবেলায় এসেছিল।

মা তখন ভেতর থেকে হাঁক পাড়ল। পুটু, কাল রাতে তোরা খাসনি? ফ্রিজ খুলে মা দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, পানতুয়া আর শোনপাপড়ি খেয়েছিলাম।

পানতুয়া আর শোনপাপড়ি কোথায় পেলি?

বাবা যে এনে রেখেছিল সকালে। ফ্রিজে ছিল। আমরা খেলাম, দাদুভাই আমাদের খাইয়ে দিল। ওই দেখো, এখনও কয়েকটা আছে।

মা কেমন করে তাকাল। তোর বাবা আবার কখন মিষ্টি আনল? আর কোন দাদু এসেছিল? কার কথা বলছিস? ওগো শুনছ।

মা একটু জোরেই ডেকে ফেলেছে। বাবা তাড়াহুড়ো করে ঘরে এসে দাঁড়াল। পিছু পিছু বব।

দেখো এরা রাতের খাবার কিছু খায়নি। শুধু মিষ্টি খেয়েছে। তুমি নাকি বড়ো বড়ো মিষ্টি এনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলে। আর ওদের কোন দাদু এসেছিল বলছে।

কই আমি তো মিষ্টি আনিনি। ববও বলল, দাদু এসেছিল। গাছ লাগাতে বলেছে। হ্যাঁরে পুতুন, দাদু দেখতে কেমন? কী নাম? কখন এল, আর গেলই বা কখন?

সন্ধেবেলাতেই তো এল। বৃষ্টি পড়ছিল তখনও। লোডশেডিং। দরজা খুলতেই ভেতরে চলে এল। তোমার নাম বলল বাবা। তোমাকে চেনে। ছোটবেলায় দাদু আমাদের কত কোলে নিয়ে ঘুরেছে।

নাম?

নাম তো জিগ্যেস করিনি। দাদুও বলল না। দাদুর মাথায় চুল ছিল না। একেবারে ন্যাড়া।

বলিস কী রে! বাবা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

মা, বলল, বৃষ্টির মধ্যে বুড়ো মানুষ। কে বল তো?

দাদু কিন্তু একটুও ভেজেনি মা।

ভেজেনি!

একটুও না। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছিল। কালো ফ্রেমের চশমা।

বাবা ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। চোখ দুটো কেমন গোল্লামতো হয়ে গেছে।

মা জিগ্যেস করল, কী হল তোমার?

তুমি কিছু বুঝতে পারছ না? পুতুন, ঠিক করে বল তো, দাদুর পাঞ্জাবিটা কী রঙের ছিল?

ছাই রঙের। লাইট গ্রে।

বাবা চোখ বুজে ফেলেছে। বলল, পায়ে জুতো কিম্বা চটি ছিল না?

ছিল না বোধহয়। আমরা তো দেখতে পাইনি। দাদুটা খুব ভালো, জানো বাবা। আমাদের মিষ্টি খাইয়ে দিল। আর ভূতের গল্প শোনাল।

বব জুড়ে দিল, ভূতবিজ্ঞান। গল্প শুনতে শুনতেই আমার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

দাদু নিজেও মিষ্টি খেল তো? পানতুয়া আর শোনপাপড়ি।

তুমি কী করে জানলে? মা বলছে, তুমি তো মিষ্টি আনোনি।

না, আমি আনিনি। তোদের ওই দাদুই নিয়ে এসেছিলেন। পানতুয়া আর শোনপাপড়ি ওঁর খুব প্রিয় ছিল। ওঁর শ্রাদ্ধের দিন সবাইকে পানতুয়া আর শোনপাপড়ি খাওয়ানো হয়েছিল।

বাবা হঠাৎ কেমন আনমনা হয়ে গেল। শ্মশানযাত্রার সময় ওই ছাইরঙের পাঞ্জাবিটা পরিয়ে দিয়েছিলাম, আর কালো ফ্রেমের চশমা।

তুমি কার কথা বলছ?

বাবা তাকিয়ে থাকল মায়ের দিকে। বুঝতে পারছ না?

দুপুরে খেতে বসেছি একসঙ্গে।

ববের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে মা বলল, তবে যে বলিস অ্যালজেব্রা তোর মাথায় ঢোকে না। খাতাটা দেখলাম, সবকটা অঙ্ক ঠিক হয়েছে। আর পুটুও ভালো লিখেছে। একটাও স্পেলিং মিসটেক হয়নি।

আমার খাওয়া থেমে গেল। দাদু এসে পড়ায় ট্রান্সলেশনের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। খাতাটা নিয়ে বসতেই পারিনি। আর ববই বা কখন অঙ্ক করল। মনে মনে বললাম, থ্যাঙ্কু ডিয়ার দাদু। আবার এসো কিন্তু।

বব কিন্তু আজ মোটেই বোকা হয়ে থাকল না। মুখ তুলে বলল, কুয়োতলার বহেড়া গাছটা তুমি বিক্রি করে দিও না বাবা।

কেন?

দাদু নিষেধ করেছে। আর সব ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগিয়ে দিতে বলেছে। অনেক গাছ। অর্জুন হরিতকি নিম বেল আমলকি।

বাবা বাধ্য ছেলের মতো বলল, আচ্ছা আর একটু বৃষ্টি পড়ুক। মাটি নরম হোক, গাছ লাগিয়ে দেব।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, এ যে ইলিশ! ইলিশ কোথায় পেলে?

মা হেসে বলল, পুটুর দাদু ডিপ ফ্রিজে ইলিশ মাছ রেখে গিয়েছিলেন।

সত্যি! মাকে বললাম, দু'পিস মাছভাজা রেখে দিও তো। দাদুকে দেব।

বাবা আঙুল চেটে বলল, তোদের দাদু মাছভাজা খেতে খুব ভালোবাসত।

শারদীয়া ১৪২১

অশরীরীর মায়া

শক্তিসাধন সেন

মধুপুর স্টেশনে যখন যাত্রীবাহী ট্রেনটা এসে থামল, স্টেশনের ঘড়িতে তখন রাত এগারোটা। পল্লীর স্টেশন। কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই অন্ধকারাচ্ছন্ন স্টেশন চত্বরে লোকজন নেই বললেই চলে। প্রৌঢ় স্টেশনমাস্টার বিমলেন্দু সরকার তঁরা এক সহকারীকে নিয়ে লাল, সবুজ কাচে ঢাকা জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে ট্রেন পাস করানোর জন্য দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মে। যাত্রী বসার বেঞ্চের উপর নিশ্চিন্ত আরামে কুণ্ডলী পাকিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে এক লোমওঠা সারমেয়। ট্রেনের গর্জনে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে আবার পরম নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে সারমেয়টি।

ট্রেন থেকে ব্যাগ হাতে নেমে একমাত্র যাত্রীটি স্টেশনমাস্টারের দিকে এগিয়ে যায়।

বিমলেন্দুবাবু গার্ড সাহেবের সঙ্গে কিছু রসিকতা করে ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাতের নিস্তব্ধতার মাঝে ঐটুকুই তাঁরা উপরি পাওনা। দিনের আলোয় সাধারণ মানুষের দেখা মিললেও রাতের অন্ধকারে এই স্টেশন চত্বরে নৈব নৈব চ। এই অঞ্চলে ইংরেজদের একটি ঘাঁটি ছিল। সেই সুবাদেই তখন এই স্টেশনের পত্তন। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও সেই স্টেশন আজও রয়ে গিয়েছে। বহু দূরপাল্লার ট্রেন এই পথ দিয়ে যাতায়াত করলেও কয়েকটি লোকাল ট্রেন ছাড়া অন্য ট্রেন এখানে থামে না। শহরে মানুষ হওয়া বিমলেন্দুবাবু বেশকয়েক বছর আগেই স্টেশনমাস্টাররূপে পদোন্নতি লাভ করে এই স্টেশনে এসেছেন। কিন্তু এই গ্রাম্য পরিবেশে তাঁর মন পরিতৃপ্ত না হলেও পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে দিবারাত্র এই যখের ধন পাহারা দিয়ে চলেছেন।

তাঁরা নির্দেশে রাতের ট্রেনটি ঝঙ্কার তুলে আপন লক্ষ্যে চলে যাওয়ার পর তিনি নিজের খুপরিতে ফিরতে গিয়ে লক্ষ্য করেন আগন্তুককে।

আরে, শশীভূষণবাবু না? এই দুর্যোগের রাতে.....

আর বলেন কেন বিমলেন্দুবাবু, বুঝতেই তো পারছেন সরকারী চাকরি করি। কাজ সামলে সবকিছু গুছিয়ে বেরোতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আপনার বাড়ি তো সেই মাধবপুর! খানাখন্দে ভরা প্রায় দু-মাইল পথ। শুনেছি, ঐ পথে রাত-বিরেতে নাকি....রাম-রাম-রাম...! চোখ বন্ধ করে বুকে হাত ঠেকিয়ে নামজপ করতে থাকেন বিমলেন্দুবাবু। পল্লীগ্রামে থেকে থেকে তাঁরও ভূত-প্রেতের ওপর বিশ্বাস এসে গেছে।

বিমলেন্দুবাবুর এ হেন কথায় হো-হো করে হেসে ওঠে গ্রামেরই ছেলে শশীভূষণ। তার তাচ্ছিল্যে ভরা হাসির ধাক্কায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শোওয়া সারমেয়টি মুখ তুলে প্রতিবাদ করে উঠল, ঘেউ....ঘেউ....ঘেউ।

আধো অন্ধকারের মধ্যে শশীভূষণের এতোক্ষণ নজরে পড়েনি সারমেয়টিকে। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ কানে আসায় শশীভূষণ সারমেয়টির কাছে এগিয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলে, কিরে, মাস্টারবাবুর মতো তুইও কি 'রাম' নাম জপ করছিস? তুই তো নিজেই একটা ভূত।

ভূত-প্রেত নিয়ে ঠাট্টায় বিমলেন্দুবাবু ভীত কণ্ঠে বলেন, ওসব নিয়ে ঠাট্টা করবেন না শশীবাবু। এখানকার মানুষের মুখেই শুনেছি—মাধবপুর যাওয়ার পথে একটা বুড়ো বটগাছে ওদের বাস।

রাতে পথিককে ভুলিয়ে ঐ গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে তারা। আপনি তো আবার ঐ পথেই যাবেন!

শশীভূষণ উত্তর দেয়, আরে বাবা, সব ভূতই কি খারাপ! অনেক ভালো ভূতও আছে, জানেন। তারা আবার গয়নাগাঁটি দিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। সেরকম কারও দেখা পেলে আর চাকরি করতে কষ্ট করে কলকাতায় যেতে হয় না। দমকা হাসি ছড়িয়ে প্যান্ট গোটাতে গোটাতে শশীভূষণ আবার বলে, গ্রামের ছেলে ওদের সঙ্গেই তো বেড়ে উঠেছি। এখন ওরাই আমাকে দেখলে ভয়ে পালায়। তবে দেখা পেলে দু'একজনকে বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে যাব। হাসতে হাসতে শশীভূষণ যাবার জন্য পা বাড়ায়, চলি বিমলেন্দুবাবু, ভূতে বাঁচিয়ে রাখলে আবার দেখা হবে।

বিমলেন্দুবাবু শশীভূষণের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রাম নাম জপতে থাকেন। শশীভূষণ বাড়ি এলেই বিমলেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা করে যায়। ওর সঙ্গেই বিমলেন্দুবাবু যা মন খুলে দুটো কথা বলেন।

বিমলেন্দুবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে শশীভূষণ স্টেশনের বাইরে এসে দেখে ঘন অন্ধকারের মধ্যে প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার উপর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তাই ছাতা ও টর্চ বের করতে ব্যাগে হাত ঢোকায়। ছাতা পায় কিন্তু টর্চ খুঁজে পায় না! বোধহয় বাসায় ফেলে এসেছে। বাধ্য হয়ে অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়ায়। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় পথের নিশানা দেখে নেয়।

পিছল পথে সন্তর্পণে কিছুদূর যাওয়ার পর পথের একস্থানে থমকে দাঁড়ায় শশীভূষণ। অনেকক্ষণ বিদ্যুৎ-এর ঝলকানি দেখা যায়নি। ফলে পথের হদিস সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। ছাতা বন্ধ করে ব্যাগের মধ্যে রেখে ডান হাতে চোখ ভালো করে রগড়ে দৃষ্টির প্রখরতা বাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিশেষ লাভ হয় না। শুধু নজরে আসে জমাট আঁধারের মধ্যে উপরের দিকে স্থানে স্থানে কিছু কিছু আলোর বিন্দু টিপটিপ করছে। শশীভূষণ বুঝতে পারে ওগুলো জোনাকি। গাছের শাখা-প্রশাখায় জ্বলছে। কানে ভেসে আসে ঝিঁঝিঁর ঝঙ্কারে ভেকের কলতান। ওরই মধ্যে কয়েকবার 'হুক্কা-হুয়া' রব শুনতে পায়। কেমন একটা গা ছমছমে পরিবেশ!

অবশ্য পল্লীর বর্ষণমুখর রাত্রির এ হেন পরিবেশের সঙ্গে শশীভূষণ খুবই পরিচিত। তাই বিন্দুমাত্র মনোবল না হারিয়ে পথ খুঁজে পাওয়ার আশায় পা বাড়ায়। কিন্তু কয়েক পা যাওয়ার পরেই ঝপাং! আর ঠিক ঐ সময়ে—একবার বিদ্যুতের আলোর ঝলকানিতে তার নজরে পড়ে সামনে বিরাট দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অতি প্রাচীন বটগাছ! যার তলায় গর্তের জলে পড়ে গিয়ে নাস্তানাবুদ অবস্থা শশীভূষণের। তার মনে পড়ে ঐ গাছ সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতির কথা! হঠাৎ যেন সে শুনতে পেল কিছু নারী-পুরুষ কণ্ঠের অনুনাসিক সুরের খিলখিল হাসি! সে সচকিত হয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জল-কাদার মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করে। পড়ে যাবার সময় ব্যাগটা যে হাত ছিটকে জলের মধ্যে কোথায় পড়েছে, তা সে অনেক খুঁজেও হদিস করতে পারেনি। অথচ, ব্যাগটা ফেলে রেখে যেতেও মন সায় দিচ্ছে না। ওর মধ্যেই যে রয়েছে প্রিয়জনদের জন্য কেনা জিনিসগুলো।

বিশ দিন আগে লেখা মায়ের চিঠি দু'দিন আগে হাতে পেয়ে সে জানতে পেরেছে তার ছেলে হয়েছে। মনটা তাই আনন্দে ভরপুর। অফিস থেকে ক'দিনের ছুটি নিয়ে চার বছরের মেয়ে রিক্তার ফ্রক, খেলনা, মায়ের থান, বউয়ের শাড়ি, নতুন আগন্তুকের চুষিকাঠি, জামা এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে ঐ ব্যাগের মধ্যে ভরে নিয়ে বাড়ি আসছিল। পথে এই বিপত্তি! এমন অসহায় অবস্থায় এর আগে কোনো দিন পড়েনি। এখন ব্যাগ না নিয়ে....

হঠাৎ শশীভূষণ অনুভব করে পিছন থেকে কে যেন কাঁধে হাত রাখল! 'কে?' চমকে ঘাড়

ঘুরিয়ে কাউকে দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় নিজের উদ্বিগ্ন মনের ভ্রম ভেবে সে যখন আবার ব্যাগ খোঁজার জন্য ফিরছে, সেই সময় আবার কাঁধে হাতের স্পর্শ! এবার সে মুখে কিছু না বলে দ্রুত নিজের একটা হাত কাঁধের ওই স্থানে নিয়ে গিয়ে স্পর্শদাতাকে চেপে ধরার চেষ্টা করে।

কে তুমি? শশীভূষণের মুঠোয় ধরা অন্যের রুগ্ন হাতের কব্জি।

চিনতে পারছিস না? কোলে-পিঠে চেপে এতো বড়ো হয়েছিস....

অন্ধকারের মধ্যে শশীভূষণ সঠিক নজর করতে না পারলেও কণ্ঠস্বর চেনা চেনা লাগে।—বংশী খুড়ো!

চিনতে পেরেছিস তাহলে!

তোমায় চিনব না? কি যে বলো খুড়ো! হাতটা ছেড়ে দিয়ে শশীভূষণ বলল, তবে তোমার আগের সেই ভারী গলাটা কেমন যেন হালকা হালকা নাকি সুরে লাগছে! আর হাতটাও যেন বরফ!

নাকি সুরে? হি-হি করে হেসে ওঠে বংশী খুড়ো, দেখছিস না, ক'দিন ধরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে! ঠাণ্ডা লাগার আর দোষ কি? তা, তুই বুঝি বাড়ির পথ হারিয়েছিস?

এতো অন্ধকার যে ঠিক বুঝতে পারছি না। আর আমার ব্যাগটাও....

হারিয়ে গেছে। তাই তো? হি-হি-হি....। রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বংশী খুড়ো শশীর হাতে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল, দেখ তো, চিনতে পারিস কি না?

বংশী খুড়োর দেওয়া সিক্ত ব্যাগটা হাত বুলিয়ে অনুভব করে বিস্মিত শশীভূষণ বলল, এটার কথা তুমি জানলে কেমন করে?

তুই হাতে করে ওটা নিয়ে আসছিলি, আমি দেখেছি। এখানে গর্তের জলে পড়ে যাওয়ার সময় ওটা তোর হাত থেকে ছিটকে জলে পড়ে গেল।

তুমি এই অন্ধকারের মধ্যেও.....

অন্ধকারে আমার চোখ জ্বলে। হাসির ফুলকি ছড়িয়ে বংশী খুড়ো বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? নে, চল। শশীর হাত ধরে টান দিয়ে বলে, আমি যখন আছি তোর কোনো ভয় নেই। ঠিক পথেই নিয়ে যাব।

বংশী খুড়োর হিমেল হাতের টানে শশীভুষণ বাড়ির পথে যেতে যেতে বলল, তা খুড়ো, এতো রাত্তিরে তুমি এখানে কি করতে এসেছো?

মাছ ধরতে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? দ্যাখ, কোঁচড় ভর্তি কই। শশীর ধরা হাতটা খুড়ো নিজের কোঁচড়ে বুলিয়ে অনুভব করায়।

খুড়োর মাছ ধরার নেশার কথা শশী ভালো করেই জানে। রাত-বিরেতে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত উপেক্ষা করে একাই বেরিয়ে যেত মাছ ধরতে। ঘণ্টা কয়েক পরে প্রচুর মাছ নিয়ে এসে শশীদের ঘরে অর্ধেক দিয়ে বাকিটা নিয়ে যেত নিজের ঘরে। তাই খুড়োর মাছ ধরতে আসার কথায় শশী অবিশ্বাস করতে পারেনি। পাশাপাশি বাড়ি হলেও বেশিরভাগ সময়ই খুড়ো থাকত তাদেরই বাড়িতে। আপদে-বিপদে খুড়ো তাদেরই একজন। নিজের বলতে খুড়িমা, একমাত্র ছেলে, ছেলের বৌ আর দু'মাসের নাতনি।

খুড়োর সহায়তায় বাড়ির সামনে পৌছে শশী অবাক হয়ে যায়। সারা গ্রাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অথচ তার পরিবারের সদস্যরা উঠানের বাইরে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করতে। বিস্মিত শশী মাকে বলল, মা তোমরা এতো রাতে না ঘুমিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো?

বারে, তুই এতোদিন পরে বাড়ি আসছিস আর আমরা ঘুমিয়ে পড়ব?

তোমরা কেমন করে জানলে আজকেই আমি আসব?

তাৎপর্যপূর্ণ হাসি ছড়িয়ে মা বলল, তুই আমার ছেলে, ছেলের মনের কথা মা জানবে না? তুই তো পথ হারিয়ে ফেলেছিলি। ঠাকুরপো পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

মায়ের কথায় শশীভূষণ তাজ্জব হয়ে যায়। বিস্ময় বিমূঢ় নেত্রে মায়ের মুখপানে তাকায়। স্তিমিত দীপালোকে সেই মুখের নাগাল পায় না। তার মনে হয় মা যেন আগের থেকে অনেক লম্বা হয়ে গেছে!

তার চিন্তায় ছেদ পড়ল অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে গিয়ে ভেজা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে নাও। নইলে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।

ঠাণ্ডা লাগার কথা শুনে হেসে ফেলল শশীভূষণ। ব্যঙ্গ করে বলল, তাই বুঝি তোমাদের কথাগুলো সব নাকি সুরে হয়ে গেছে?

আর বলিসনে বাবা, ক'দিন ধরে যা চলছে....

শশীর মায়ের কথা শেষ করতে না দিয়ে বংশী খুড়ো বলল, রাত যে শেষ হয়ে আসছে বৌদি। এখন চলো তো, কইমাছ এনছি, শশী খেতে খুব ভালবাসে। ভাতের সঙ্গে দেবে। কোঁচড় থেকে বড় বড় কইমাছ বের করে উঠানে রাখল বংশী খুড়ো।

না-না—এত রাতে কষ্ট করে তোমাদের আর রান্নাবান্না করতে হবে না। আমাকে এক বাটি মুড়ি আর কয়েকটা বাতাসা দিও, ওতেই হবে।

শশীর আপত্তিকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মা বলল, আমাদের আর কষ্ট কী! ওসবের বালাই এখন আর নেই। তুই আসবি বলে রান্না তো করাই আছে। এখন শুধু মাছগুলো ভেজে রাঁধা। তুই হাত-মুখ ধুয়ে চলে আয়। ততক্ষণে হয়ে যাবে।

এরপর শশীভূষণ পোশাক পাল্টে পরিষ্কার হয়ে এসে কলকাতা থেকে আনা সামগ্রী ব্যাগ থেকে বের করে দেখাতে থাকে। কিন্তু মা, স্ত্রী বা রিক্তা কাউকেই উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গেল না। অবশ্য আত্মতৃপ্তিতে মশগুল থাকায় শশীভূষণের মনে তা বিশেষ রেখাপাত করে না। সে ঐ ঔদাসীন্যকে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি বলেই ধরে নেয়। শুধু তার মনে একটাই দুঃখ, এতো সুন্দর জিনিসগুলো জলে ভিজে গেল!

নবাগতকে দেখতে চাওয়ায় মা বলল, ও এখন ঘুমাচ্ছে। মাঝরাতে জাগালে কান্নাকাটি করবে। কাল দিনের আলোয় দেখিস। এখন খেতে বোস।

স্ত্রী পরম যত্নে ভাতের থালা সাজিয়ে দেয়। মা পাশে বসে ছেলেকে খাওয়ানোর তৃপ্তি অনুভব করতে থাকে।

খেতে খেতে শশীভূষণ বলল, কে রেঁধেছে? এতো ভালো রান্না আগে কখনও তো হয়নি।

অনেকদিন পরে এলি তো বাবা। তাই তোর ভালো লাগছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শশীভূষণ ঘরে ঢুকে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। অচিরেই পরিশ্রান্ত শশীভূষণ ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করে।

ঘুমের মধ্যে একসময় সে দেখতে পায় তাদের বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। মা-বউ-মেয়ে সবাই আটকে পড়েছে। উদ্ধারের জন্য কেউ আসছে না। এমনকি সেও নীরব দর্শক। তার হাত-পা সব অবশ হয়ে গেছে। সে চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারছে না। শুধু গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ।

ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসে শশীভূষণ। তার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বুকে হাত চেপে কান খাড়া করে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করে। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না সে। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল! হয়তো তাই। কেননা, উঠে দাঁড়াতে তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। দরজা খুলে দেখে প্রায় সকাল হয়ে গেছে। উঠোনে বেরিয়ে অবাক

হয়ে যায়। অনাদরে ছড়িয়ে রয়েছে তার ভালবাসার নিদর্শনগুলি। ব্যথাহত অন্তরে শশীভূষণ ক্ষুব্ধস্বরে মা ও স্ত্রীকে ডাকতে থাকে। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ঘরে গিয়েও তাদের দেখতে পায় না। এমনকি তার অদেখা বংশধরকে খুঁজে পায় না! এতো সকালে কোথায় যেতে পারে?

উদ্বিগ্নচিত্তে ঘরের বাইরে এসে খোঁজ করতে গিয়ে নজর পড়ে খড়ের ছাউনি দেওয়া চালের উপর। সব পুড়ে গিয়ে শ্মশানের স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা! আর উঠানের নানা স্থানে ইতস্তত পড়ে রয়েছে আধপোড়া কাঠ-খড়! চরম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায় সে। একটু আগে স্বপ্ন ভেবে যাকে উড়িয়ে দিয়েছিল তা যে কঠোর বাস্তব! কিন্তু ঐ পোড়া অংশগুলোর মধ্যে তো এখন কোনো আগুনের উত্তাপ নেই। এ তো অতীত। তবে...

দিশেহারা শশীভূষণ পরিবারের সদস্যদের খুঁজতে খুঁজতে বংশী খুড়োর বাড়িতে হাজির হয়। তার ব্যাকুলতা ভরা ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে আসে বংশী খুড়োর ছেলে অবনী। কখন এলে শশীদা?

কাল রাতে খুড়োর সঙ্গে। খুড়ো কিছু বলেনি?

কি বলছো শশীদা! বাবার সঙ্গে....কাল রাতে....! যেন আকাশ থেকে পড়ল অবনী।

খুড়ো বাড়িতে আসেনি?

বাবা তো....আর বলতে পারেনি। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে জলের ধারা।

শশীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বংশী খুড়োর স্ত্রী কপালে করাঘাত করতে করতে বেরিয়ে আসে।

কি হয়েছে খুড়ি? কাঁদছো কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

আক্ষেপ করতে করতে খুড়িমা বলল, দুঃখের কথা কি আর বলব বাবা! তোর খুড়ো পাঁচদিন আগে মরে গেছে।

সকাল বেলায় কী আবোল-তাবোল বকছ খুড়ি? প্রায় ধমকে ওঠে শশীভূষণ। কার রাতে খুড়োর সঙ্গে এসেছি। খুড়োর ধরা কইমাছ রেঁধে মা ভাত খাওয়াল। তবে খাবারের এতো ভালো স্বাদ আগে কখনও পাইনি।

কান্না ভুলে বিস্মিত নেত্রে খুড়িমা শশীকে দেখতে দেখতে বলল, এ্যাঁ! সত্যি বলছিস শশী? দিদি আর বৌমা তোকে....

বারে, মিথ্যা বলতে যাব কেন? তবে আজ সকাল থেকে ওদের কাউকেই খুঁজে পাচ্ছি না।

পাবি কি করে? দিনের আলোয় ওর কি থাকে রে? ওরে, তোকে যে ভূতে মাছ-ভাত খাইয়েছে রে।

ভূত! সেই থেকে কী যে সব মাথামুণ্ডু বকে চলেছো, কিছুই বুঝতে পারছি না। অধৈর্য হয়ে উঠল শশীভূষণ।

এবার নিজেকে সামলে নিয়ে অবনী বলল, বুঝতে পারার কথা নয় যে শশীদা। পাঁচদিন আগে বিকালে ঝড়-জলের সময় বাবা, জেঠিমা, বৌদি আর রিক্তা যখন তোমাদের ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প করছিল, হঠাৎ এক বাজ পড়ে। তাকিয়ে দেখি তোমাদের ঘর থেকে খুব ধোঁয়া বের হচ্ছে। ছুটে যাই। ততক্ষণে ঘরে আগুন ধরে গেছে। বর্ষার জন্য আগুনের শিখা খুব না বাড়লেও বিদ্যুতের ছোঁয়ায় বাবা, জেঠিমা, বৌদি ও রিক্তার দেহে প্রাণ নেই। শুধু পড়ে আছে ওদের দগ্ধ দেহগুলো।

শশীভূষণের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন দুলে ওঠে। ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে সে। বন্ধ চোখের সামনে পরপর ভেসে বেড়ায় কাল রাতে ট্রেন থেকে নামার পরের সব ঘটনাগুলো। যা থেকে তার মনের মধ্যে এখন নানা সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। তবে কি সত্যিই...আর ভাবতে পারছে না। মাথার মধ্যে সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে তাকে অবশ করে দিচ্ছে। মাথার চুল মুঠো করে ধরে।

হঠাৎ তার কোলের উপর কিছু একটা পড়তে চোখ মেলে তাকায়! ছোট্ট ফুটফুটে একটা শিশু! তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

ভাসুরের কোলে শিশুটিকে সঁপে দিয়ে অবগুণ্ঠনবতী অবনীর বউ বলল, দাদা, খুব সুন্দর হয়েছে, তাই না? ঠিক যেন নাড়ুগোপাল!

চোখের জল মুছতে মুছতে খুড়িমা বলল, বংশে বাতি ওটিই রেখে গেছে বাবা। তবে মায়া বড়ো কঠিন জিনিস। অপঘাতে মরা....মায়ার টানে বার বার ফিরে আসতে পারে। এখানের ক্রিয়াকর্ম সব মিটে গেলে তুই আর অবু যতো তাড়াতাড়ি পারিস একবার গয়া যা। ওরা শান্তি পাবে।

খুড়িমার কথাগুলো শশীভূষণের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে ছেলের দিকে। মনে হলো তার মনের মধ্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

আষাঢ় ১৪১০

এক রাতের অভিজ্ঞতা

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

রাঁচি-টাটা শেষ বাসটা যখন টাটার সাক্‌চি টারমিনাসে এসে দাঁড়াল তখন পান-সিগারেটের দোকানগুলোও বন্ধ হতে শুরু করেছে। বাসটা প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরিতে এসে পৌঁছোল। রাস্তায় টায়ার পাংচার হয়ে এই যাত্রা-বিভ্রাট। বিনা স্টেপ্‌নিতে এই দূরের যাত্রায় কোন সাহসে যে বাস চালায় তা ওরাই জানে। কলকাতার ট্রেন অনেক আগে চলে গেছে। রাতের মতো কোনো একটা হোটেলেই আশ্রয় নিতে হবে। হাতে একটা বড় অ্যাটাচি, তাতেই যা কিছু। পা চালিয়ে এগোলাম। স্টেশন রোডের ঠিক আগের মোড়ে হেলে পড়া সাইনবোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে পুরোনো হোটেল—'হোটেল বিস্‌ওয়াস'।

গোটা চারেক ক্ষত-বিক্ষত সিঁড়ির ধাপ উঠে ভেতরে পা রাখলাম। কাউন্টারের লোকটির বৈশিষ্ট্য বলতে কাঁধ আর মাথার মাঝখানে গলা বলে কিছু চোখে পড়ল না। ধুমসো থলথলে গোলগাল মেদবহুল একটা বেয়ারা সামনে দাঁড়িয়ে বোধহয় দিনমানের হিসেব-টিসেব দিচ্ছিল আর উনি একমনে একটা খাতায় সেটা মেলাচ্ছিলেন। কী লিখছিলেন ঠিক মনে নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই—লোকটির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। একসময় বাধ্য হয়েই বলতে হল, রাতের জন্য একটা ঘর হবে?

না।

কথা দিয়ে যেন টিল ছুঁড়ল লোকটা। বাধ্য হয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি এমন সময় যেন দৈববাণী হল, একটা ডাবল বেডরুমে বিস্তারা পাবেন, এক্‌সো-দ্যস্‌ দিতে হোবে—

ক্লান্তিতে শরীর আর বইছিল না। একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে বললাম, লিজিয়ে, ঘরটো দিখানেকো বোল দিজিয়ে।

আসলে একশো দশ-এর দশটা যে বাড়িয়ে বলা তা আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওসব জায়গায় দরাদরিটা ব্যবসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। টাকা নিয়ে লোকটা বেয়ারাকে চোখের ইশারা করে বলল, বারা নাম্বার কামরামে লে যাও—

বেয়ারাটা সামান্য ইতস্তত করে বলতে গেল, লেকিন উস্‌ ঘরমে তো—

কথা শেষ করতে না দিয়ে ওকে ধমক লাগাল লোকটা, আবে যো বোলতা শুন তো সহি—

ধমক খেয়ে বেয়ারাটা আর কথা বাড়াল না। আমাকে ইশারায় অনুসরণ করতে বলে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোয়। সিঁড়িগুলো বোধহয় বাঁদরদের জন্যে তৈরি হয়েছিল। যেমন সরু তেমনি খাড়া। দোতলায় উঠতেই প্রায় হাঁফ ধরার জোগাড়।

দোতলায় উঠে বেয়ারাটা আর এগোয় না। বারান্দার শেষ প্রান্তে আঙুল দেখিয়ে বলে, উয়ো আপকো বারা নম্বর কামরা, সিধা চলা যাইয়ে। বলেই সে নেমে গেল।

একটা আধময়লা কম পাওয়ারের আলোয় সবকিছুই ধোঁয়াটে অস্পষ্ট লাগছিল। পর পর ঘরগুলোর সবকটার দরজাই বন্ধ। একমাত্র ঐ বারো নম্বর ঘরটার দরজাটাই সামান্য একটু ফাঁক করা। ভিতরটা অন্ধকার। তখন একটু একটু ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ভেতরটা যেন আরো বেশি ঠান্ডা। আলো জ্বালাতে দেয়ালে সুইচবোর্ডের হদিস করছি এমন সময় ভেতর থেকে সেই

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—যা আজও আমি শুনলে চিনতে পারব।—অনুগ্রহ করে দরজাটা ভেজিয়ে দিন।...আলো আমার সহ্য হয় না। সুইচবোর্ড খুঁজে কোনো লাভ নেই, এ ঘরের আলোটা জ্বলছে না।

চমকে উঠিনি বললে ভুল হবে, কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল বক্তার অবস্থান বুঝতে না পারার অস্বস্তি। গভীর রাতে দূর থেকে গান ভেসে এলে যেমন উৎসের দিকনির্ণয় করতে অসুবিধা হয়, অনেকটা সেইরকম।

আপনি কোথায়? মানে শুয়ে আছেন কি? প্রশ্নটা এসে গেল আমার মুখে।

আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

মানে?

কোনো ঘর তো খালি নেই, এলে এই অন্ধকার ঘরেই আসতে হবে জানতাম। দরজাটা দয়া করে বন্ধ করে দিন। আলো আমার অসহ্য লাগে।

অদ্ভুত আবদার। কিন্তু উপেক্ষা করতেও তো পারলাম না। কারণ বক্তার স্বরে ছিল এক ব্যক্তিত্বময় আন্তরিকতা, যা আমাকে নিশ্চিতভাবেই প্রভাবিত করেছিল।

দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার এমন গাঢ় হয়ে উঠল যে মনে হচ্ছিল এগোতে গেলেই বুঝি দেয়ালে ধাক্কা খাব। কিন্তু তখুনি আবার বাঙ্ময় হল সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, কোনো অসুবিধে নেই, দেয়াল ধরে ডান দিকে তিন পা এগোলেই আপনার বিছানা। ঠিকঠাক পাতা আছে।

কথামতো এগোলাম এবং সত্যি একটা বিছানা পাতা খাট পেয়েও গেলাম সহজেই। সারাদিনের ধকল আর চিন্তায় শরীর এত অবসন্ন লাগছিল যে ব্যাগ আর জুতোটা খাটের নীচে ঠেলে দিয়েই ঢলে পড়লাম বিছানায়।

আঃ! আরামসূচক শব্দটা আপনিই বুঝি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। তারই রেশ ধরে সেই কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করল, শুয়ে পড়লেন? খুবই ক্লান্ত আপনি।

শান্ত কোমল স্বর অথচ কোনদিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছিল না। সেটা যাচাই করতেই যেন বললাম, হ্যাঁ, শুয়ে পড়েছি। রাঁচি থেকে বাস ধরেছিলাম।

সেলসের কাজে বেশ চাপ থাকে।

অবাক হলাম। উনি জানলেন কী করে সে আমি সেলসের কাজে যুক্ত? বললাম, আপনি জানেন আমার কাজ?

এর রাতে শুধু একটা ব্যাগ নিয়ে....বুঝতে পারি।

আসলে আজই কলকাতা ফেরার কথা—

কিন্তু রাস্তায় বাস-বিভ্রাট-এর জন্য ট্রেনটা পেলেন না।

এবার কিন্তু সত্যিই আমি আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। বললাম, আপনি জানেন আমার বাসটা রাস্তায়—

এ আর বলা শক্ত কি! এ সময় তো কোনো ট্রেন নেই। রাস্তার যা অবস্থা, বাসযাত্রীদের প্রায়ই এমন দুর্ভোগ সইতে হয়।

তখনও কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে ভদ্রলোক ঘরের ঠিক কোথায় রয়েছেন। অদ্ভুত ব্যাপার। এদিকে না বোঝার জন্যে বেশ একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম ভেতরে ভেতরে। তাই কথা চালালাম, রাঁচিতে দিন দুয়েকের কাজ ছিল, কিন্তু—

একদিনের মধ্যেই সব সারতে হল, বাড়ি থেকে ফোন পেয়ে। ছেলের অসুখ, চিন্তা তো হবেই।

এবার আমার গায়ে কাঁটা দিল। কে ইনি? কী করে এসব জানলেন? তবে কি—

ছেলেপুলের প্রতি আমি আর কোনো আকর্ষণ বোধ করি না—আমার ভাবনাকে মাঝপথে

থামিয়ে বলতে শুরু করলেন তিনি, অথচ এক সময় ছেলেই ছিল আমার প্রাণ—সব কিছু। মাত্র ষোল বছর বয়সে বিপ্লবের উন্মাদনায় পলিটিক্যাল পার্টিতে ঢুকে এক এনকাউন্টারে মারা গেল। ওর মা মারা গেল পরের মাসে। রইলাম শুধু আমি।

কথা নয় যেন বুকফাটা হাহাকার ঘরের অন্ধকারকে আরো জমাট, আরো অসহ্য করে তুলেছিল। উনি বলে চললেন, আমার জীবনটা শ্মশান হয়ে গেল। বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে হল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁজে বেড়াতাম....কোথাও স্বস্তি পাই না। ঐ অবস্থায় একদিন এই হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি। যেতে যেতে রেললাইনের কাছে পৌঁছে গেলাম। অন্যমনস্ক ছিলাম বোধহয়। লেভেল ক্রসিংটা পেরোতে যাব, হঠাৎ—

ঠিক এই সময় হোটেলের বাইরে আচমকা গুলির আওয়াজ হল। রিভলবার-এর ফায়ারিং হল বার দুয়েক। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ব্রেকের শব্দ। আর তারপরেই বেশ কিছু ভারী বুটের আওয়াজ। হাঁক-ডাক, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি। এত রাতে কিসের এত গণ্ডগোল? বুঝে ওঠার আগেই দরজায় জোর ধাক্কা!—দরজা খোলিয়ে...পোলিস্—

এই 'পুলিশ' কথাটার মধ্যে এমন কিছু একটা শক্তি আছে যা সাধারণ মানুষের বুক হিম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম। তীব্র টর্চের আলোয় ঘরের সব কিছুই পরিষ্কার দেখা গেল। ড্রেসিং টেবিল, টুল, হোল্ডার, হ্যাঙার, ভাঁজ করা একটা ফোলডিং চেয়ার, জলের জাগ রাখা একটা স্ট্যান্ড, গেলাস ইত্যাদি সবই রয়েছে কিন্তু নেই কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব। এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে মুখ দিয়ে খানিকক্ষণ কোনো কথা সরাছিল না। অথচ সামনে তখন যমদূতের মতো এক পুলিশ অফিসার টর্চ আর রিভালবার নিয়ে তর্জন করে চলেছে।

আপকা নাম? কাঁহাসে আ রহে হেঁ? কাঁহা যানা হ্যায়....কোই আইডেন্টিটি হ্যায়...দিখাইয়ে জলদি।

আসলে এক স্মাগলারকে ধাওয়া করে পুলিশ ঐ হোটেলে চড়াও হয়েছিল। কিন্তু তিনি বাবু পাকা ঘুঘু। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গেছেন।

হোটেলের সব বোর্ডারকে নীচে জড়ো করে তাদের জেরা করে নাম-টাম বৃত্তান্ত সব লিখে নিতে নিতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। হাজার দুর্ভাগ্যের মধ্যে তবু বরাত ভালো যে পুলিশ অফিসারটি বাঙালি এবং আমাদের পাড়ার কাছেই নাকি ওনার শ্বশুরবাড়ি। তিনি শেষমেশ সদয় হয়ে বললেন, আপনাকে স্টেশনে নামিয়ে দেব। প্রথম ট্রেনেই বেরিয়ে যান, ছেলের অসুখ যখন—

একটু বোধহয় দেরি হয়েছিল। টিকিট কাটার লাইনে দাঁড়িয়েই শুনলাম গার্ড-এর হুইসল হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকিট নিয়ে দৌড়ে ওভারব্রিজ পেরোতে পোরোতেই দেখলাম ট্রেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে। কী আর করা! ছেলের অসুখের জন্যে একে মনটা উৎকণ্ঠায় ভরে ছিল তার ওপর একের পর এক কী যে ঘটে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে প্ল্যাটফর্মে নেমে এসেই হঠাৎ শুনলাম ট্রেনটা কশান হর্ন দিচ্ছে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি ব্রেকের কিচকিচানি শব্দ। দেখি কি, ট্রেনের পেছনের লাল আলোটা প্ল্যাটফর্ম থেকে কিছুটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়েছে। পড়ি কি মরি করে ছুটলাম। যখন আমি ট্রেনটা প্রায় ধরে ফেলেছি তখুনি আবার নড়ে উঠল সেটা। কিন্তু আমি তখন মরিয়া। গার্ডের চলন্ত কামরার হ্যান্ডেলটা ধরে যখন উঠে এলাম তখন বুকটা যেন হাপরের মতো ওঠানামা করছে। আমাকে ঐভাবে উদয় হতে দেখে গার্ড তো হতবাক! যাই হোক খানিক ধাতস্থ হয়ে বললাম, খুবই তাড়া আছে তাই বাধ্য হয়ে এত দূর দৌড়ে আসতে হল। ভাগ্যিস ট্রেনটা থেমেছিল।

এবার উনি বললেন, আশ্চর্য কাণ্ড মশাই, ট্রেন লেভেল ক্রসিং পেরোচ্ছে এমন সময় দুই মোটরম্যান দেখল একজন মাঝবয়েসী লোক উদ্‌ভ্রান্তের মতো লাইনের ওপর উঠে এল। চোখের

নিমেষে চলে গেল ট্রেনের নীচে। সঙ্গে সঙ্গে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষে ওরা থামাল ট্রেনটা। তারপর তন্ন তন্ন করে ট্রেনের নীচটা দেখা হল। মানুষ তো দূরের কথা একটা কাপড়ের টুকরোও কোথাও নেই। যেন ভোজবাজি। ভুল একজনের হয়, কিন্তু দুজনেই একসঙ্গে ভুল দেখল? Next to impossible.

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে রসিকতার সুরেই বললেন, বোধহয় আপনাকে ট্রেনটা ধরিয়ে দেবার জন্যেই কেউ একজন এই কারসাজিটা করলেন। কী, তাই মনে হচ্ছে না?

শুকনো হাসি মুখে এঁটে ওঁর কথা শুনছিলাম। গতরাতের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলার মতো মনের অবস্থা তখন আর ছিল না। ট্রেনটা ফাঁকাই ছিল। ঘাটশিলায় ট্রেন থামল। একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে বাংকে সটান শুয়ে পড়লাম।

আমি যদি পৌঁছতে আরো দেরি করতাম তাহলে ছেলেটা বাঁচত কিনা বলা শক্ত। ওর রক্তের দরকার ছিল। ওর গ্রুপের রক্ত ব্লাড ব্যাংকে ঠিক সেই সময় ছিল না। ভাগ্যের জোরে আমার আর ওর রক্ত একই গ্রুপের। আমার দেওয়া রক্তে ওর কাজ হল।

ক্রমশ আমার জীবনের মোড় ঘুরতে লাগল। সেলস লাইনের শিক্ষা নিজের ব্যবসায় ভালো ফল দিল। আর্থিক সাচ্ছল্য এল। একটিই ছেলে। ছোটবেলায় ভালোমতো যত্ন পায়নি। বয়েসে সেটা পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। বর্ষার কলমি শাকের মতো বাড় নিয়েছে ওর শরীরটা। মাঝে মাঝে ওকে দেখি আর ভাবি যদি সেই দিন পৌঁছতে দেরি হত? তখনই মনে পড়ে ট্রেনের সেই হঠাৎ থেমে পড়া, সেই 'হোটেল বিস্‌ওয়াস' আর....আর সেই অন্ধকারে ভেসে আসা এক আবেদনশীল কণ্ঠস্বর—যার উৎস এক অদৃশ্য অস্তিত্ব।

অনেকবার ভেবেছি যে একবার গিয়ে খোঁজ করে দেখব অন্তত যে ব্যাপারটা কী। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ব্যবসা আর সংসারের সাতশো ঝামেলায় সে আর হয়ে ওঠেনি।

পৌষ ১৪১২

বইমেলার ভূত

সুজিত হালদার

কলকাতার কলেজ স্টিট বইপাড়ায় হরিবাবুর একটা ছোটোখাটো প্রকাশনার ব্যবসা আছে। নিজস্ব প্রকাশনার বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি হলে খান তিরিশ-চল্লিশ হবে। সে সবের বেশির ভাগটা হল—মেয়েদের ব্রতকথা, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, তাসের জাদু, কম পুঁজিতে ব্যবসায় সাফল্য, লতাপাতার গুণ, নিজের ভাগ্য নিজে ফেরান—এই জাতীয় বই। ভূতের গল্পের বইও আছে খানকয়েক। নিজের বইয়ের সঙ্গে অন্য প্রকাশকের বাজার-চলতি বই দোকানে রেখে বিক্রি করেও দু-চার পয়সা আসে।

বিষ্ণুপদ নামে একটি কমবয়েসি ছেলে হরিবাবুর দোকানে কাজ করে। বিষ্ণুকে সবাই বিষ্টু বলে ডাকে। বেচারা বিষ্টু কোনও মাসে একসঙ্গে থোক মাইনা পায় না। ওদিকে ছাপাখানা, বই বাঁধাই-এর বাইন্ডিংখানা, কাগজের দোকানে ধার-বাকি পড়ে। এমনকি, অন্য প্রকাশকের যেসব বই বিক্রি করেন, তার লাভসহ আসল খরচ হয়ে যায়। পাওনাদাররা তাগাদা দেয়। হরিবাবু সবাইকে বলেন, বইমেলার পরে শোধ দেব। বইমেলার একমাস পরেও যখন সব ধার শোধ করতে পারেন না তখন পাওনাদারদের বলেন, পয়লা বৈশাখ কিংবা অক্ষয় তৃতীয়ায় সব টাকা শোধ দেব।

তো, এইভাবে, বিস্তর পরিশ্রম করে, ফন্দি-ফিকির করে দিন চালান হরিবাবু। তবে, এমনিতে তিনি খুব সজ্জন প্রকৃতির মানুষ। দেরি হলেও খেপে খেপে সবার টাকা শোধ দেন।

ইদানিং হরিবাবু একটা জিনিস লক্ষ করছেন, তা হল—ভূতের গল্প, ভৌতিক উপন্যাস, ভৌতিক অভিজ্ঞতা এবং ভূত বিষয়ক যাবতীয় বইয়ের বাজার আছে। এই বিজ্ঞানের যুগে কচিকাঁচারা ভূতে মজেছে। বইপাড়ার ভাষায় বলা হয়, বাজারে এখন ভূত খাচ্ছে।

হরিবাবুর সেই কর্মচারী ছেলেটি, মানে, বিষ্টু বলল, বাবু, এবারের বইমেলায় বইপাড়ার সব পাবলিশার্স-এর ভূতের বই এনে জড়ো করব আমাদের স্টলে। প্রচার করব ঃ 'বইমেলায় একমাত্র স্টল যেখানে শুধুই ভূত পাবেন।'

হরিবাবু দেখলেন, কথাটা মন্দ বলেনি বিষ্টু। দেখতে দেখতে বইমেলা এসে গেল। কলকাতা বইমেলা। আর মাত্র দিন সাতেক পরে উদ্বোধন হবে কলকাতা বইমেলার। কলেজ স্ট্রিট বইপাড়ায় এখন সাজো সাজো রব! উত্তেজনা তুঙ্গে। তবে সবাই জানে, হরিবাবুর স্টল মানেই দশকর্মা ভাণ্ডার। এই স্টলে ব্রতকথা থেকে হাসির রাজা গোপাল ভাঁড়—সবই আছে। এই নিয়ে অনেকে আড়ালে-আবডালে হাসাহাসি করেন। কিন্তু, হরিবাবু যে এবারের বইমেলায় একটা নতুন চমক দেবেন, সেটা কেউ টের পেলেন না। হরিবাবু আর বিষ্টু ছাড়া কেউ-ই না—এমনকি হরিবাবুর গিন্নি ও বাড়ির অন্য লোকজনও এ খবরটা জানে না।

গোপনে গোপনে কাজে নেমে পড়লেন হরিবাবু। বিষ্টু বইপাড়ার সব প্রকাশকের ক্যাটালগ জোগাড় করে আনল। এমনকি, ইংরিজি ও হিন্দি ভাষায় বই প্রকাশ করে, এমন পাবলিশার্স-এর ক্যাটালগ মানে পুস্তক তালিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে হরিবাবু বাছাই করলেন ভূত ও ভূত সংক্রান্ত বইপত্তর। খালি ভূত আর ভূত! প্রাচীন ভূত। আধুনিক ভূত। বাংলা-বিহার-ওড়িশার ভূত। তামিল-তেলেগু-মারাঠি, পাঞ্জাবিসহ সকল ভারতীয় ভূত। এশিয়া-আফ্রিকা-ইওরোপ -রাশিয়া-অস্ট্রেলিয়া-

আমেরিকা-লাতিন আমেরিকা-আরব কান্ট্রিগুলোর ভূতের গল্প। ভৌতিক উপন্যাস। ভৌতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও যাবতীয় ভূতুড়ে কাণ্ড-কারখানার বই। বলা যায়, হরিবাবু গ্লোবালাইজেশন অব দি ঘোস্ট বা ভূতেদের বিশ্বায়ন ঘটিয়েছেন। আবার জাতীয় স্তরের কতশত ভূতের প্রজাতি, যেমন—গোভূত, ঘোড়া ভূত, গ্রাম্য ভূত, লেটো ভূত—আরও নানাবিধ ভূতের সমাহার! বাপ রে!

বইমেলার দিনসাতেক আগে বিষ্টু বলল, বাবু আপনার নামটা বদলাতে হবে। অন্তত এই মেলার ক'দিনের জন্য আপনাকে একটা অন্য নাম নিতে হবে। এসব ঠাকুর-দেবতার নাম থাকলে ভূত-সমাজ প্রসন্ন হবে না। রেগে যাবে। ব্যবসা হবেই না।

হরিবাবু ভেবে দেখলেন, বিষ্টু কথাটা নেহাত মন্দ বলেনি। ভূতদের রাগিয়ে ব্যবসা হবে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে হরিবাবু তাঁর বাপ-ঠাকুরদার নাম বদলে নিজের নাম রাখলেন—ফটিক। আর বিষ্ণুপদ, মানে বিষ্টুর নাম রাখা হল ন্যাপা।

জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার শুরু হল বইমেলা। কলকাতা বইমেলা। ভাগ্যক্রমে এবার হরিবাবু—থুড়ি ফটিকবাবু স্টল পেয়েছেন মাঠের সেরা জায়গায়। স্টলের সামনে প্রায় পনেরো গজ ফাঁকা মাঠ। তাঁর স্টলের মাথায় বড় বড় ও রঙিন হরফে লেখা হল—'এখানে বাংলা-হিন্দি-ইংরিজি ভাষায় সবরকমের ভূতের বই পাওয়া যায়।' স্টলের ফাঁকা দেওয়ালে রঙিন হরফে লেখা হল ঃ মেছো ভূত, গেছো ভূত, ঘোড়া ভূত, গো-ভূত, গ্রামের ভূত, কলকাতার ভূত।

মেলার দ্বিতীয় দিনের কীভাবে যেন খবরটা চাউর হয়ে গেল। মিডিয়া অর্থাৎ খবরের কাগজ ও বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেলগুলোর লোক জনেরা দৌড়ে এলেন হরিবাবু মানে ফটিকবাবুর স্টলে। খবরের দৌলতে সবাই জেনে গেল এই স্টলের কথা। কচিকাঁচা পড়ুয়ারা তো বটেই বড়দেরও ভিড় বাড়ছে স্টলে। সবাইকে যেন ভূতে পেয়েছে। ফটিকবাবু ও ন্যাপা হিমসিম খাচ্ছে খদ্দের সামলাতে। সে কারণে ফটিকবাবুর গিন্নি ও বাড়ির অন্যেরা এখন হাতে হাত লাগিয়ে বই বিক্রি করছেন।

এদিকে, এই বাংলার মানুষেরা, বিশেষ করে কচিকাঁচারা এখনও যে এত ভূতের বই পছন্দ করে ও পড়ে একথা জানতে পেরে অন্য প্রকাশকেরা ও বিক্রেতারা আফশোস করছেন। তাঁরা হরিবাবুর বিক্রিবাটা দেখে হাত-পা কামড়াচ্ছেন। হায় হায় করছেন।

তার মধ্যে পরিচিত এক প্রকাশক রমেনবাবু বললেন, কী হে হরিবাবু, এবার তো দেখছি আপনি বইমেলার বেস্টসেলার হবেন।

রমেনবাবুর মুখে এই হরিবাবু নামটা শুনে আঁতকে উঠলেন হরিবাবু। বললেন, প্লিজ রমেনবাবু, বইমেলার ক'টা দিন আমাকে ফটিকবাবু বলে ডাকবেন, আর বিষ্টুকে বলবেন ন্যাপা।

এই কথা শুনে রমেনবাবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

ফটিকবাবু বললেন, আসলে ভূত নিয়ে কারবার করতে গেলে এইসব রাম, হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু জাতীয় ঠাকুর-দেবতার নাম চলবে না। তাই এখন আমি ফটিকবাবু হয়ে গেছি।

একথা শুনে কেমন যেন ভড়কে গেলেন রমেনবাবু। তিনি আর কিছু না বলে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা বইমেলা। এবারের বইমেলায় বেশ মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করেছেন হরিবাবু। এবারে সব ধার-দেনা শোধ করলেন। বিষ্টু এখন মাসের এক তারিখেই মাইনা পাচ্ছে। কলেজ স্ট্রিটের দোকানটা নতুন করে রঙ করা হল। হরিবাবু এখন ফুরফুরে মেজাজে আছেন।

সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু বিপদটা যে এমনভাবে আসবে তা আগে থেকে ঠাহর করতে পারেননি হরিবাবু। সে এক বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

দিনটা ছিল আষাঢ় মাসের ঘনঘোর বর্ষণমুখর রাত! একে মেঘাচ্ছন্ন, তার ওপর অমাবস্যা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার! কলেজ স্ট্রিটের দোকান বন্ধ করে হরিবাবু ফিরছেন নিজের গ্রামে। কলেজ স্ট্রিট থেকে শিয়ালদা স্টেশন—সেখান থেকে লোক্যাল ট্রেনে সোনারপুর। সোনারপুর থেকে অটো রিকশায় বা রিকশায় বা সাইকেল-ভ্যানে চেপে গঙ্গাজোয়ারা যেতে হবে। কিন্তু এত রাতে, বিশেষ করে বর্ষার রাত বলে, কোনও গাড়ি পেলেন না হরিবাবু। অগত্যা, হরিবাবু আর বিষ্টু হাঁটা শুরু করলেন ছাতা মাথায়। বিষ্টুর বয়স কম তাই হনহন করে এগিয়ে চলেছে। হরিবাবু একটু মোটা-সোটা তার ওপর বয়স হয়েছে। তাই তিনি একটু পিছিয়ে পড়েছেন। হরিবাবু এই বৃষ্টির মধ্যেও মনের আনন্দে গান করছেন গুন গুন করে।

হরিবাবু হাঁটছেন। এমন সময় মনে হল, কে যেন তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। গান থামিয়ে পিছনে তাকালেন হরিবাবু। কই? কেউ নেই তো! তবে! আবার তিনি পথ চলছেন। আবার মনে হল কে বা কারা যেন তাঁর পিছনে পিছনে আসছে। আবার তিনি পিছনে তাকালেন। এবারও সব ফাঁকা।

আরও কিছুটা পথ চলতেই কে যেন খপাৎ করে হরিবাবুর জামার কলার ধরে বলল, হেঁই, ফঁটিকবাঁবু, দাঁড়াঁন!

কে তুই?

আঁমি কেঁ? আঁমরাঁ কেঁ? পিঁছন ফিঁরে দ্যাঁখ্।

পিছন ফিরে তাকাতেই হরিবাবু ভয়ে হিম হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর পিছনে সারা রাস্তা জুড়ে অসংখ্য কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। কেমন যেন ছায়া ছায়া অবয়ব। মুহূর্তেই হরিবাবু বুঝে ফেললেন—এরা আসলে সেইসব দেশ-বিদেশের নানা কিসিমের ভূত।

সমবেত ভূতেদের মধ্যে একজন লিডার গোছের ভূত বলল, আঁমাদেঁর নিয়েঁ এতোঁ বেঁওসাঁ কঁরলি আঁর আঁমাদের কঁথা ভুঁলে মেঁরে দিঁলি? তুঁই অঁনেক লাঁভ কঁরেছিঁস। তাঁর ভাঁগ দেঁ।

তার মানে?

মাঁনে খুঁব সহঁজ সঁরল। লেঁখকঁরা লেঁখার জঁন্য রঁয়্যালটি পাঁবে। তোঁরা বঁই বেঁচে লাঁভ কঁরবি। আঁমরাঁ ভূঁতেরা বাঁনের জঁলে ভেঁসে এঁসেছি? ভূঁত বঁলে কিঁ আঁমরাঁ মাঁনুষ নঁই? ভূঁতেরাঁ চিরকাঁল বেগাঁর খেঁটে যাঁবে?

এবার অন্য ভূতেরা হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে তেড়ে এল। সমবেত ভূতেরা স্লোগান দিল ঃ

আঁমাদের দাঁবি মাঁনতেঁ হঁবে।
ভাঁগের ট্যাঁকাঁ ছাঁড়তে হঁবে।।

এমনতর ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখে ও ভূতেদের হুজ্জোতি দেখে হরিবাবু ভয়ে জ্ঞান হারালেন। রাস্তায় পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ ছাড়ছেন। সম্ভবত পড়ে যাওয়ার আগে হরিবাবু 'বিষ্টু-বিষ্টু' বলে চিৎকার করেছিলেন। আর, ওই বিষ্টু অর্থাৎ বিষ্ণুর নাম শুনেই ভূতেরা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণে বিষ্টুর চেঁচামেচিতে দু'একজন লোক দৌড়ে এল। সবাই মিলে ধরাধরি করে হরিবাবুকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এল।

আসল ঘটনাটা জানার পর হরিবাবুর মা ও গিন্নি বললেন, আর ভূতের ব্যবসায় দরকার নেই। আমরা বড়লোক হতে চাই না। কেবল বিষ্টু বলল, বাবু, কোনও ভয় নেই। বইমেলার পরে আমি আবার আগের মতো বিষ্ণু মানে বিষ্টু হয়ে যাব। আর আপনি হয়ে যাবেন হরিবাবু—এবার যেমন হয়েছি। এই হরি আর বিষ্ণুর নাম শুনে ভূতেরা পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। এরপর যদি 'রাম রাম' বলা হয়, তা হলে আর দেখতে হবে না। তখন ভূতেরা সাহস পাবে না আমাদের বিরক্ত করতে। সামনের কলকাতা বইমেলায় আমরা আবার বেস্টসেলার হব।

অগ্রহায়ণ ১৪১৯

কঙ্কাল

রূপক চট্টরাজ

গুপি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, জানো মামলুদা, ওখানে একটা আস্ত কঙ্কাল দেখে এলাম। ওটা আবার আমাকে দেখে হাত নেড়ে ডাকছে।

দূর বোকা, তাই আবার ডাকে নাকি?

ডাকবে না কেন? তুমি কি ভাবছ আমি মিথ্যে মিথ্যে বলছি!

তা না তো কী! এত লোক থাকতে তোকেই বা ডাকতে যাবে কেন?

ঠিক আছে, যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তবে এখনই চলো আমার সঙ্গে। গেলেই দেখতে পাবে।

আর বলিস না, তুই যা ভীতু। তা কোথায় কঙ্কাল দেখলি, বল?

ওই যে গো, একটা দোকানে ঝুলছিল ওটা। আমি গেছিলাম একটা বায়োলজি বক্স কিনতে। তখনই তো দেখলাম। তুমি দেখলেও ভয় পেয়ে যেতে। বাপ রে বাপ! কী ভয়ানক দেখতে! ইয়া লম্বা লম্বা যেন হাত-পায়ের আঙুল। মাথা তো নয়, যেন একটা গোলমুন্ডি বল। তাতে আবার চোখ-নাক-মুখের গর্ত। গলা ও বুকের হাড়-পাঁজরগুলো সব পাখার হাওয়ায় দুলছে। আচ্ছা মামলুদা, তুমি কখনও ভূত দেখেছ?

কী যে বলিস, ভূত দেখব না আবার! কত ভূত যে দেখছি সেকথা তোকে আর কী বলব!

না, না মামলুদা, ভূতের কিছু কথা বলো না শুনি? অন্তত একটা ভূতের গল্প বলো এখন।

শুনবি তবে? কিন্তু যেটা বলব সেটা যে-সে গল্প নয়। শুনলে তোর হাড় হিম হয়ে যাবে। ভয়ে গা শিউরে উঠবে বুঝলি। তবে গল্পটা ভূতের না কঙ্কালের তা শুনলেই বুঝতে পারবি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মামলুদা—তাই বলো।

শোন তবে, আমি তখন কলেজে পড়ি। আমরা তিন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম বেড়াতে যাব। আমরা কে কে জানিস? গোপাল, লাল্টু আর আমি। কলেজে পড়ার বয়সটা একবার অনুমান কর। রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে। যা ইচ্ছে হচ্ছে তখন ওই বয়সের উন্মাদনায় সেটাই করছি। তাই যেমন ভাবা তেমনই কাজ। হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্র দেখতে।

আচ্ছা মামলুদা, তোমরা কি দিঘার সমুদ্র দেখতে চলে গেলে?

আরে না রে বোকা। ওই বয়সে তখন ওই ম্যাড়মেড়ে সমুদ্র দেখতে কে যাবে? আমরা গেলাম গোপালপুর। মানে 'গোপালপুর অন সী' বুঝলি! আর সেখানেই তো ঘটল বিপত্তি। তখন ছিল বেড়ানোর মরশুম। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও থাকবার জায়গার কোনো সন্ধান পেলাম না। হতাশ হয়ে তিনজনে সমুদ্র-সৈকতে বসে বসে বলাবলি করছি যে বেলা থাকতে থাকতে এখান থেকে কেটে পড়া ভালো। নইলে রাত হয়ে গেলে ফিরতে অসুবিধা হবে। হাঁটাপথে কোনো রেল-স্টেশন নেই যে ওয়েটিং রুম বা প্ল্যাটফর্মে পড়ে থেকে রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দেব।

সকলে রাজি হয়ে ওখান থেকে উঠতে যাব এমন সময় আমাদের সমবয়সী একজন এসে উপযাচক হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে আপনারা থাকবার জায়গা খুঁজছেন। আমার সন্ধানে এক গেস্ট হাউসে একখানা খালি ঘর আছে। দিন চারেকের জন্য পাওয়া যাবে। ভাড়াও খুব বেশি নয়।

একথা শুনে আমরা তো হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলাম, কোথায় ওটা? এক্ষুনি চলুন।

লোকটি আমাদের আগ্রহ দেখে একটা শর্ত আরোপ করে বললেন, আমি একরাত্রি থাকার জন্য ছোট্ট একটা ঘর খুঁজছি। কোথাও পাইনি। অবশেষে এই একটা চারজনের থাকার ডরমেটারির সন্ধান পেলাম। দেখুন একা থাকব, তাছাড়া অত টাকায় ঘরটা নেবার সামর্থ্যও আমার নেই। তাই বলি, যদি আজকের রাতটুকু আমি সঙ্গে থাকি তবে কোনো অসুবিধা হবে না তো?

লোকটির কথা শেষ হতে না হতেই গোপাল কথার পিঠে বলে উঠল, না, না মশাই, যখন চারজনের ডরমেটারি তখন তো একটা বেড খালি পড়ে থাকবে। সেখানে না হয় আপনি রাতটুকু কাটালেন। আর আমরা তো একটা ঘরই খুঁজছিলাম। চারজনের যা ভাড়া লাগবে তা আমরাই মিটিয়ে দেব। আপনাকে কিছু দিতে হবে না।

একথা শুনে লোকটি খুশি হয়ে একটু দূরে নির্জন এলাকায় একটা পোড়োবাড়ির মতো গেস্ট হাউসে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়িটা একতলা। ঢুকতেই কেমন যেন গা-ছমছম করে উঠল। কেয়ারটেকার এসে ভেতরে নিয়ে গিয়ে পিছনের দিকে রাস্তার ধারের একখানা ঘর খুলে আলো জ্বালিয়ে বলল, এই ঘরখানা শুধু খালি পড়ে আছে। আপনারা ভেতরে যান, আমি খাবার জল, চাদর-মশারি সব বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর যা যা দরকার ওই বেয়ারার কাছে চেয়ে নেবেন। রাতে যদি এখানে খাওয়া-দাওয়া করেন তবে তার অর্ডারটা একটু আগে আগে দিয়ে দেবেন। তৈরি করতে সময় লাগবে, তাই বললাম। আর একটা কথা, পিছনের রাস্তার ধারের জানালাটা খুব প্রয়োজন না হলে খুলবেন না।

কেয়ারটেকার চলে যেতেই লোকটি বললেন, সকলে হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিন। আমি আমার এক বন্ধুকে, রাতের থাকার যে ব্যবস্থা হয়েছে এই খবরটা জানিয়ে আসি। ঘর পাইনি দেখে ও খুব চিন্তায় আছে। আমি রাতের খাবারটা এই বন্ধুর সঙ্গে খেয়ে আসব। ফিরতে দেরি হবে, আপনারা খেয়ে-দেয়ে নেবেন।

॥ ২ ॥

সন্ধে হয়ে এসেছে। সারাদিনের ক্লান্তিতে হাতে-মুখে জল দিয়ে আমরা বেয়ারাকে ডেকে চা ও রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে যে যার মতো খাটে গা এলিয়ে দিয়েছি। তারপর গল্পগুজব করতে করতে সময়টা তাড়াতাড়ি কেটে গেল।

রাতের খাবার তৈরি হতেই বেয়ারা এসে আমাদের ডাইনিং হলে ডেকে নিয়ে গেল। আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময় ঝুপ করে সব আলো নিভে গেল। ব্যাপক লোডশেডিং। গেস্ট হাউসের জেনারেটরটাও একবার জানান দিয়ে দেহ রাখল। একটু পরে বেয়ারা দুটো মোমবাতি এনে ঘরে জ্বেলে দিয়ে গেল। ও বলল, কেবল ফলট্ হয়েছে। পুরো এলাকাটা অন্ধকার। কারেন্ট যে কখন আসবে বলতে পারছি না। দেখি জেনারেটারটা সারানোর জন্য একজন মিস্ত্রি খুঁজে নিয়ে আসি। তা আপনারা বরং চেয়ার নিয়ে সামনের লনে গিয়ে বসুন। ঘরে যা গরম, ওখানে তবু হাওয়া আছে। একটু সাবধানে থাকবেন। ঘরের দিকেও নজর রাখবেন।

আমরা তো হতভম্ব। এ আবার এক উটকো ঝামেলা। বিপদ কিছুতেই দেখছি পিছু ছাড়ছে না। বেয়ারার কথামতো চেয়ার টেনে তিনজনে সামনের লনে গিয়ে বসলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কারোর পাত্তা নেই। না কেয়ারটেকার, না বেয়ারা, না সেই লোকটি। সারাদিনের ক্লান্তিতে আমাদের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। আমি গোপাল ও লাল্টুকে বললাম, চল, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি। শুধু শুধু এখানে বসে মশার কামড় খেয়ে লাভ নেই।

লাল্টু বলল, আমাদের এখন শরীরের যা অবস্থা তাতে বালিশে মাথা ঠেকালেই তো মড়া। একেবারে সকাল হয়ে যাবে। কি বলিস?

গোপাল বলল, ঠিক বলেছিস। তবে মোমবাতি দুটোর অবস্থা দেখ, আর কিছুক্ষণ পরে ওটাও দেহ রাখবে। ভালোয় ভালোয় ওই আলোটুকু থাকতে থাকতে আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ি।

লাল্টু বলল, লোকটি তো এখানো ফিরল না। ওর জন্য কে জেগে বসে থাকবে? আর আমরা ঘুমিয়ে পড়লে কেই-বা ওকে দরজা খুলে দেবে? সেটা ভেবে দ্যাখ একবার।

আমি বললাম, তোরা অত ভাবিস না। ওর দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। ও এসে নিশ্চয় দরজায় খটখট করবে। তখন না হয় আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেব। চল, এখন তো শুয়ে পড়ি।

আমরা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল ও ভেতর থেকে তালা দিয়ে তাড়াতাড়ি মশারি টাঙিয়ে যে যার খাটে শুয়ে পড়লাম। চাবিটা আমার কাছেই রাখলাম। আমার টর্চটাও মাথার কাছে রেখে দিলাম। রাত-বিরেতে কখন ওটা কাজে লাগে কে জানে।

অল্পক্ষণের মধ্যে লাল্টু ও গোপালের মৃদু মৃদু নাকডাকার শব্দ কানে এল। নতুন জায়গা, নতুন বিছানায় আমার দু'চোখের পাতা এক হচ্ছিল না। এসময় মোমবাতির আলো আস্তে আস্তে কমে এল। মোম গলতে গলতে ও দুটোও নিভে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে আমার মনের মধ্যে ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করল। ভয়ে ও গরমে ঘাম হচ্ছে। তাই টর্চ জ্বেলে আমার বেডের পাশের জানালাটা খুলে দিলাম। ফুরফুর করে বাতাস ঘরে ঢুকতে লাগল। চারিদিকে করা নিথর নিশ্চুপ, নিস্তব্ধতা। জানলার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে চাঁদের আলোর আভাস দেখা গেল। দূরে দূরে তারাগুলো মিটিমিটি করে জ্বলছে। আবছা চাঁদের আলোয় বোঝা গেল জানালার পাশ দিয়ে পিছনের মেঠো পথ খানিকটা গিয়ে বন-জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারে তা আর ঠাওর করা গেল না। কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। হঠাৎ একটা উৎকট আওয়াজে মনটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হল শেয়াল-কুকুর কিছু একটা জানালার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। ভেসে আসতে লাগল শেয়ালের প্রহর ডাকার আওয়াজ। বাইরে তখন চাঁদের ক্ষীণ আলোয় জোনাক পোকার সলমাজড়ি। ঝিঁঝিঁদের সমবেত কান্না। মৃদু হাওয়ায় নড়াচড়া করছে গাছের ডালপালা। ওগুলো সরসর খরখর আওয়াজ তুলে তৈরি করছে এক ভীতিপ্রদ পরিবেশ। রাতের বাতাস যেন অজানা এক বেদনায় ভরে উঠেছে। মশারিতে হাওয়া লেগে ঢেউয়ে খেলে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত এক ছায়া। ভেসে উঠছে অজানা-অচেনা এক বীভৎস ছায়ামূর্তি। ভয়ে গলার স্বর ফুটছে না। বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

হঠাৎ একটা খুটখুট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি। নির্জন রাতে ঘুমের ঘোরে ওই ছায়ামূর্তিকে দেখে চোর ভেবে 'কে? কে ওখানে' বলে টর্চ জ্বালতে যাব এমন সময় সে খোনা খোনা গলায় বলে উঠল, 'না না, আলো জ্বেলো না। আমি চোর নই। আমি ভূত। আমি কঙ্কাল। আমি কোনো ক্ষতি করব না। এই ঘরে ওরা আমাকে খুন করে ওপাশের জঙ্গলে কবর দিয়ে দিয়েছে। আমি বাঁচার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না। এই দেখো ওদের ছোরার আঘাতে আমার ডান হাতের দুটো আঙুল কেটে গেছে। এই ঘরে পড়ে আছে আমার ওই দুটো আঙুল। এ জানালাটা খোলা থাকলেই আমি কবর থেকে উঠে আসি ওই আঙুল দুটো খুঁজে নিয়ে যেতে। কিন্তু পাচ্ছি না। ওরা ও দুটো লুকিয়ে রেখেছে অন্য কোথাও।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ছায়ামূর্তি হঠাৎ কঙ্কালের রূপ ধরে টলতে টলতে হাঁটতে হাঁটতে ওই মেঠো পথ ধরে চলে গেল জঙ্গলের দিকে। মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

এই দৃশ্য দেখে আর অশরীরীর খোনা কণ্ঠস্বর শুনে বাকি রাতটুকু আমার দু'চোখের পাতা এক হল না। ভোরের আলো ফুটতেই ভয়টা আস্তে আস্তে কেটে গেল। সকালে গোপাল ও লাল্টুকে ডেকে ঘটনাটার কথা বললাম।

ওরা বিশ্বাস করল না। বলল, তুই নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছিস।

আমি বলি, তোরা যে যা বলিস বল। আমি কিন্তু এ গেস্ট হাউসে আর একরাত্রি কাটাব না। অন্য কোথাও চলে যাব। তোদের থাকতে ইচ্ছে করে তা তোরা এখানে থাকিস।

তারপর মুখ ধুয়ে তিনজনে চায়ের টেবিলে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় গতকালের সেই লোকটি হাজির। এসেই বললেন, গত সন্ধ্যায় আমার বন্ধুটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি রাতে এখানে আসতে পারিনি। আপনারা চিন্তা করবেন তাই জানাতে এলাম। এক্ষুনি বন্ধুকে নিয়ে হাসতাপাতলে যেতে হবে। আচ্ছা, আমি চলি।
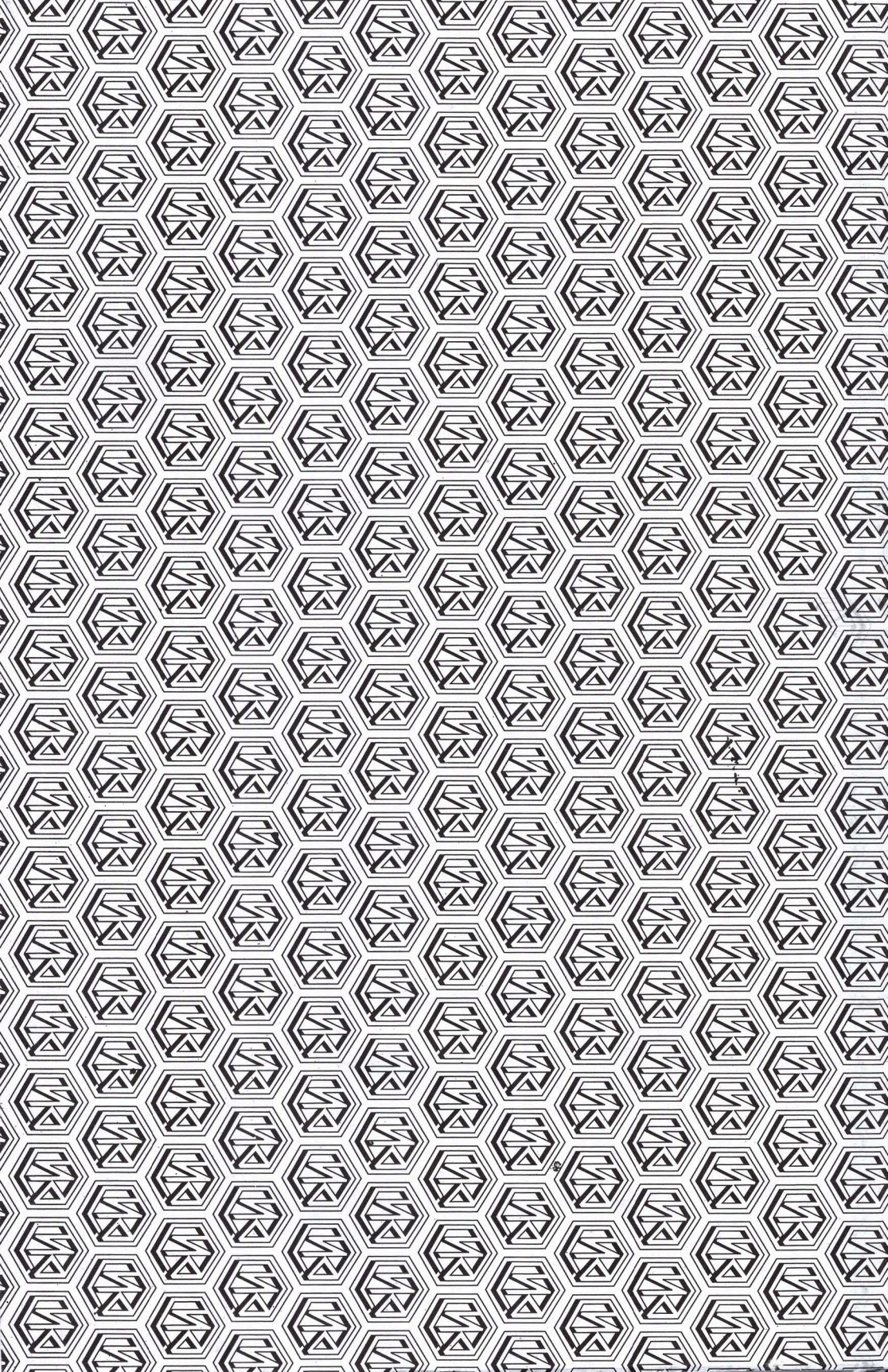
সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতেই অবাক হয়ে গেলাম। দেখি ওর হাত খুব ঠান্ডা, আর ওর ডান হাতে দুটো আঙুল নেই। ঠিক গতরাতের কঙ্কালের হাতের মতো।

আমি বলে উঠি, এ কি! আপনি কে?

লোকটি এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সকলের সামনেই কর্পূরের মতো হাপিস হয়ে গেল।

গোপাল ও লাল্টু আমার দিকে চেয়ে কাতর স্বরে বলল, নারে এ গেস্ট হাউসে সত্যিই থাকা যায় না। চল, অন্য কোথাও যাই।

জানিস গুপি, আর এক মুহূর্তও আমরা আর ওখানে ছিলাম না। তিনজনে প্রাণ নিয়ে কেটে পড়লাম। কবে বল, কী রকম ভূতের খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা। তুই ওখানে থাকলে তোর প্রাণ-পাখি উবে যেত।

আষাঢ় ১৪১৯
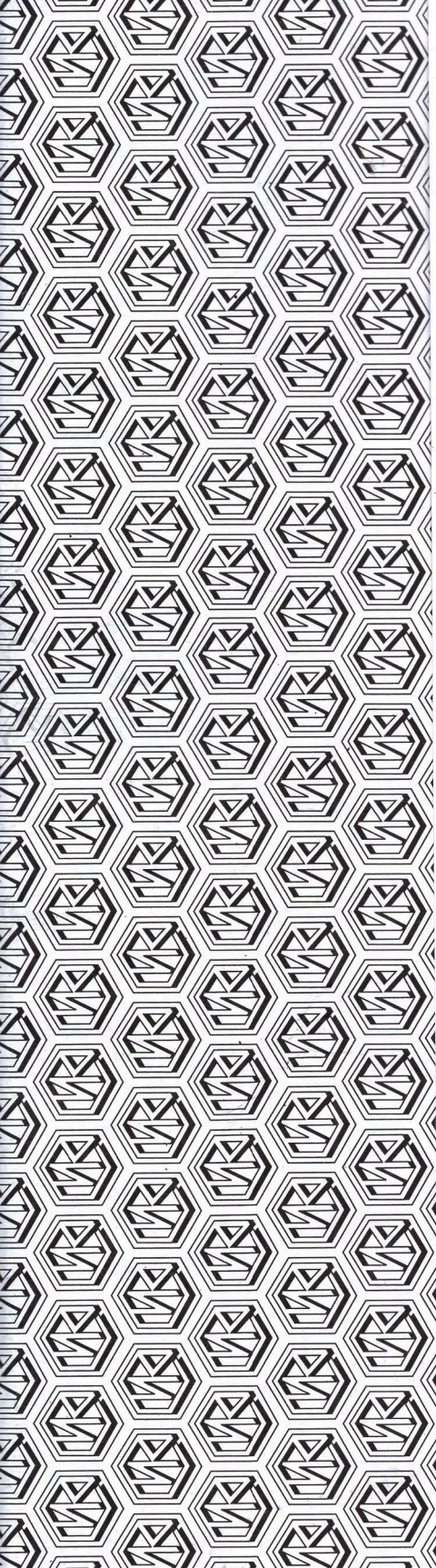
শুকতারার মতো ছোটদের জনপ্রিয় পত্রিকায় গল্প লেখেননি, এরকম নামী সাহিত্যিকও বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছোটদের প্রিয় কাগজ, সেখানে লিখতেনও ছোটদের তাবড়ো তাবড়ো বিখ্যাত সব সাহিত্যিক। ভূতের গল্প ছোটদের তো ভীষণ প্রিয়, কাজেই ছোটদের জন্য যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁরা ভূতের গল্পও লিখেছেন বিস্তর। সেই সব গল্প থেকে একশো এক ভূতের গল্প নির্বাচন করতে গিয়ে আমরা আগেও হিমশিম খেয়েছি, এবারেও তাই হয়েছে। এক একজন নামী লেখকই অনেকগুলি করে ভূতের গল্প লিখেছেন এই পত্রিকায়, কাজেই সেগুলির মধ্যে থেকে সেরা গল্পটি বেছে নেওয়া রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর পরেও আছে আর-একটা সমস্যা। সেকালে যাঁরা ভূতের গল্পে শিহরন জাগাতেন আজকে তাঁরা অনেকেই চলে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের জায়গায় এসেছেন নতুন লেখকের দল, ভূতুড়ে কাণ্ডে চমক লাগাতে তাঁরাও কম ওস্তাদ নন। আমরা দু’ দলের লেখকের গল্পই বেছে নিয়েছি।

প্রত্যেকটাই গা ছমছম করা রোমাঞ্চকর গল্প, একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়া যাবে না। যারা মুখে বলো খুব সাহসী, এবার তাদের পরীক্ষা কে সত্যিই কত সাহসী।

গা ছমছমে
১০১টি ভূতের গল্প
9 789350 600795